দারসে কুরআন

১

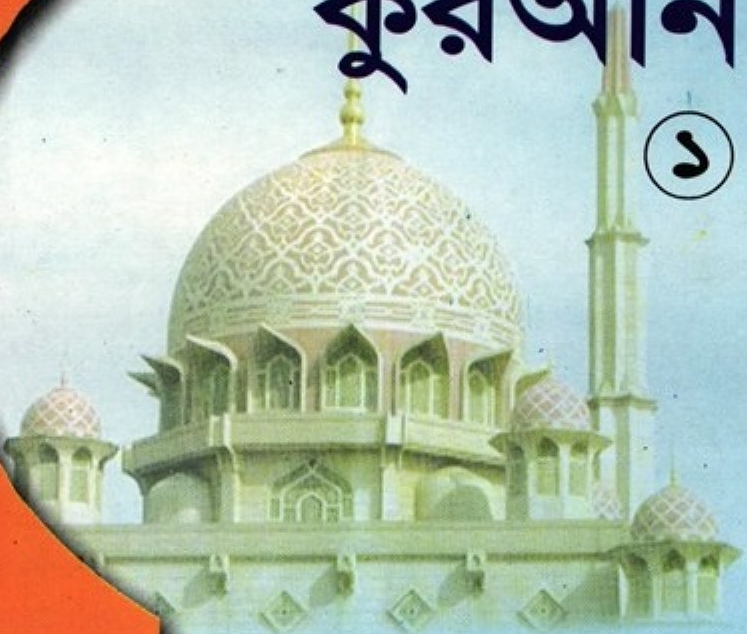

অধ্যাপক আবদুল মতিন

দারসে
কুরআন
১ম খন্ড

অধ্যাপক আবদুল মতিন

দারসে কুরআন ১ম খন্ড
প্রকাশনায় ঃ সাহাল প্রকাশনী
৩০৮/১, খানজাহান আলী রোড,
(তারের পুকুর), খুলনা।
প্রকাশকাল ঃ
প্রথম প্রকাশ ঃ মে, ১৯৯৯ সাল
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ মার্চ, ২০০৫ সাল
১৫ তম মুদ্রণ ঃ নভেম্বর - ২০১১ সাল
ঃ অগ্রহায়ণ-১৪১৮ সন
ঃ জিলহজ্ব-১৪৩২ হিজরি
সত্ত্ব ঃ লেখক কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত।
প্রচ্ছদ ঃ কৃষ্টি কম্পিউটার,
৩০৮/১, খানজান আলী রোড, খুলনা।

অক্ষর বিন্যাস ঃ দি লিমা ইন্টারপ্রাইজ
৪৩৫/এ-২ ওয়ারলেস রেলগেট, ঢাকা।

মুদ্রণে ঃ ঈগল অফসেট প্রেস
৩০, খানজাহান আলী রোড,
শক্তিধাম মোড়,খুলনা।

নির্ধারিত মূল্য ঃ ৬০ টাকা

পরিবেশনায় ঃ সাহাল বুক কর্ণার
৩০৮/১, খানজাহান আলী রোড,
(তারের পুকুর), খুলনা।
মোবাইল ঃ ০১৭১১-৩৮৯০৭৬ (মালিক)
০১১৯১-৭৮২২৮৬ (দোকান)

প্রাপ্তিস্থান

কুরআন মহল, সিলেট।	কাটাবন বুক কর্ণার, ঢাকা।
ইসলামিয়া লাইব্রেরী, বরিশাল।	ঢাকা বুক কর্ণার, পুরানাপল্টন, ঢাকা।
আল-হেলাল লাইব্রেরী, যশোর।	তাসনিয়া বই বিতন, মগবাজার, ঢাকা।
আল-আমীন লাইব্রেরী, সিলেট।	খন্দকার প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা।
আল-আমীন লাইব্রেরী, সাতক্ষীরা।	প্রফেসরস বুক কর্ণার, মগবাজার, ঢাকা।
একাডেমী লাইব্রেরী, দেওয়ান বাজার,চট্টগ্রাম।	আহসান পাবলিকেশন, মগবাজার,ঢাকা।

এ ছাড়াও জেলা শহরের বিভিন্ন লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়।

লেখকের প্রকাশিত বই

১. দারসে হাদীস-১ম খন্ড
২. দারসে হাদীস-২য় খন্ড
৩. দারসে কুরআন-১ম খন্ড
৪. দারসে কুরআন -২য় খন্ড
৫. দারসে কুরআন -৩য় খন্ড
৬. দারসে কুরআন - ৪র্থ খন্ড
৭. নির্বাচিত বিষয়ভিত্তিক হাদীস
৮. ইসলামী সংগঠন ও প্রশিক্ষণ
৯. আল-কুরআনে মানব সৃষ্টি তত্ত্ব
১০. রাসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) রূহানী নামায
১১. বিষয়ভিত্তিক কুরআন হাদীস সংকলন
১২. বাংলা উচ্চারণসহ ১০০ মাসনুন দোয়া
১৩. কুরআন হাদীসের আলোকে পাঁচ দফা কর্মসূচী
১৪. ফাযায়েলে ইক্বামাতে দ্বীন বা দ্বীন প্রতিষ্ঠার (চেষ্টার)মর্যাদা

ভূমিকা

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

আল-কুরআন সর্বশেষ আসমানী কিতাব, যা মানব জাতির পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে মহানবী (সাঃ)-এর উপর অবতীর্ণ হয়।

মানুষের ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবনের যাবতীয় সমাধান আল-কুরআনে রয়েছে। এজন্য প্রতিটি মুসলমানের উচিত আল-কুরআনকে নিজের ভাষায় বুঝে তার শিক্ষানুযায়ী ব্যবহারিক জিন্দেগীতে প্রয়োগ করা। কিন্তু সমস্যা হলো আমাদের দেশের সামাজিক এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় কুরআনের সঠিক শিক্ষাকে তুলে ধরার তেমন কোনো বাস্তব মাধ্যম নেই। যতটুকু আছে তাও আবার সিলেবাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং ভিন্নভাবে কুরআনকে উপস্থাপন করা হয়েছে। যার ফলে কুরআনের আসল স্পীরিটকে নষ্ট করে দিয়ে সমাজের মানুষকে সঠিক শিক্ষা থেকে দূরে ঠেলে দেয়া হচ্ছে।

জীবনের সব ক্ষেত্রে-আল-কুরআনের বিধান মানতে হলে কুরআনের আসল বুঝ থাকা জরুরী। আল-কুরআনের আসল বুঝ দেবার জন্যই আমি কুরআনের বাছাই করা কতগুলো অংশ থেকে "দারসে কুরআন" বইটির প্রথম খন্ড প্রকাশ করলাম। যার সহযোগিতা নিয়ে কুরআনের সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের কর্মীরা সাধারণ মানুষের কাছে মসজিদে মসজিদে অথবা কোনো মজলিসে দারসে কুরআন প্রদানের মাধ্যমে তার সঠিক শিক্ষা সহজে পৌছিয়ে দিতে পারেন।

আমি "দারসে কুরআন" বইটি ইসলামী আন্দোলনের আধুনিক শিক্ষিত ও সাধারণ কর্মী ভাই-বোনদের দারস পেশ করার উপযোগী করে লেখার চেষ্টা করেছি। তাছাড়া বইটির প্রথম দিকে কুরআনকে সহজে বুঝানোর জন্য ধারাবাহিকভাবে দারস দানের পদ্ধতি ও দারসের সময় বন্টনের নমুনা হিসেবে চারটি ছক উল্লেখ করেছি এবং সাধারণ মানুষের উপর যাতে দারসের প্রভাব পড়ে সেই জন্য দারস দানকারীর কতিপয় করণীয়ও উল্লেখ করেছি। বইটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো শ্রোতার সামনে যেন আপনি নিজেই দারস পেশ করছেন।

দারসে কুরআন বইটি লেখা এবং প্রকাশের ক্ষেত্রে যেসব গুণগ্রাহী ব্যক্তি পরামর্শ এবং অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদের শোকরিয়া আদায় করছি এবং আল্লাহ পাকের কাছে উত্তম প্রতিদান কামনা করছি। লেখা ও ছাপার ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক, কোনো সুহৃদয় ব্যক্তির কাছে ভুল-ত্রুটি দৃষ্টি গোচর হলে কিংবা পরামর্শ থাকলে আমাকে জানালে তা কল্যাণ মনে করে ভবিষ্যতে সংশোধনের চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে আল্লাহ পাকের কাছে আমার আরজি, হে আল্লাহ! তোমার এই মহাগ্রন্থের ব্যাখ্যা এবং শিক্ষা পেশ করতে গিয়ে যদি আমার অজান্তে কোন ভুল অথবা বাড়াবাড়ি হয়ে যায় তাহলে তুমি মেহেরবাণী করে আমাকে ক্ষমা করে দিও। আর আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করো এবং আখেরাতে আদালতে একে আমার জন্য নাজাতের অসিলা বানিয়ে দিও। আমিন!

মুহাম্মদ আবদুল মতিন
সহকারী অধ্যাপক, ইসলামীক স্টাডিজ বিভাগ
দৌলতপুর কলেজ, খুলনা।

উৎসর্গ

কুরআনের সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে
অনুপ্রেরণা দানকারী আমার শ্রদ্ধেয়
মরহুম আব্বা-আম্মা আর যারা শহিদী
নজ্‌রানা পেশ করেছেন।

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
○ দারসে কুরআন এর বক্তৃতা দান পদ্ধতি		০৭
○ দারসের সময় বন্টন		১১
○ দারস দানকারীর করণীয়		১৩
○ দারসের কতিপয় পরিভাষার সংজ্ঞা		১৫
○ এক নজরে আল-কুরআনের পরিচয়		১৮
○ মুত্তাকীনদের গুণাবলী	(সূরা বাকারা-১-৫)	১৯
○ মু'মিনদের গুণাবলী	(সূরা মুমেনুন-১-১১)	৩৩
○ বাড়ীতে ঢোকার শিষ্টাচার	(সূরা নূর-২৭-২৯)	৫৭
○ ধ্বংস ও ক্ষতি থেকে মানুষের বাঁচার উপায়	(সূরা আল আসর)	৭১
○ কঠিন আযাব থেকে বাঁচার উপায়	(সূরা সফ্-১০-১৩)	৮৪
○ মানবতার মুক্তির জন্য জিহাদ	(সূরা নিসা-৭৫-৭৬)	৯৩
○ ঈমানের পরীক্ষা	(আলে ঈমরান-১৩৯-১৪১)	১০৩
○ সবরের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা ও শহীদের মর্যাদা	(সূরা বাকারা-১৫৩-১৫৬)	১১৩
○ মরণের আগেই আল্লাহ্‌র পথে অর্থ খরচ	(সূরা মুনাফিকূন-৯-১১)	১২৫
○ কিয়ামতের দৃশ্য	(সূরা হজ্ব-১-২)	১৩৯
○ আনুগত্য-তাকওয়া ও মজবুত ঈমান এবং তার প্রতিদান	(সূরা আনফা'ল-১-৪ আয়াত)	১৪৮

২য় খন্ডে যা আছে

- ○ জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব। (সূরা আলাক-১-৫)
- ○ মুমিনের জেন্দেগী হবে তাকওয়া, আন্দোলন ও দাওয়াতী জেন্দেগী। (সূরা আলে-ঈমরান-১০২-১০৪)
- ○ মুমিন জীবনের লক্ষ-উদ্দেশ্য ও তাদের বৈশিষ্ট্য (সূরা তাওবাহ-১১১-১১২)
- ○ মুমিনদের ছয়টি বর্জনীয় আচরণ। (সূরা হুজুরাত-১১-১২)
- ○ দুনিয়াদারদের প্রতি সতর্ক বাণী। (সূরা তাকাছুর-১-৮)
- ○ ইসলামী আন্দোলনঃ কর্মীদের গুণাবলী। (সূরা মায়েদাহ-৫৪-৫৬)
- ○ আল্লাহর কতিপয় কুদরাত ও নেয়ামত। (সূরা আন নাবা-১-১৬)
- ○ মুনাফিকদের আচরণ। (সূরা বাকারা-৮-১৬)

৩য় খন্ডে যা আছে

- ○ জিহাদ বা ইসলামী আন্দোলনের গুরুত্ব (সূরা তাওবাহ-১৯-২৪)
- ○ কতিপয় সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ ওয়াদা এবং কসম রক্ষা করার গুরুত্ব। (সূরা নহল-৯০-৯৭
- ○ অতীতের নবীদের দ্বীনের ন্যায় একই দ্বীনের দাওয়াত দান এবং প্রতিষ্ঠার নির্দেশ (সূরা শু'রা ১৩-১৬)
- ○ ঈমানের পরীক্ষা দিয়েই জান্নাতে যেতে হবে (সূরা আলকাবুত-১-৭)
- ○ আল্লাহর উপর অবিচল ঈমান। সর্বোত্তম পন্থায় দাওয়াতদান ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন। (হা-মীম-আস-সাজদাহ-৩০-৩৬)
- ○ দাওয়াতে দ্বীনের কাজে অধৈর্য হলে চলবে না (আনয়াম-৩৩-৩৬)
- ○ স্ত্রী, সন্তান এবং ধন-সম্পদ মানুষের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ (সূরা তাগাবুন-১৪-১৮)
- ○ আখেরাতে অবিশ্বাসীদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ও কার্যকলাপ (সূরা মাউন)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দারসে কুরআন-এর বক্তৃতা দান পদ্ধতি

আসমানী কিতাব আল-কুরআন আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে জীবরাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়। কুরআনের এই বিধি-বিধান কিয়ামত পর্যন্ত বলবত থাকবে। সুতরাং এই কুরআনকে বুঝা এবং তার শিক্ষানুযায়ী বাস্তব জীবনে কার্যকরী করা আমাদের অবশ্যই করণীয় কর্তব্য। কিন্তু সমস্যা হলো আল কুরআনের ভাষা আরবী আর আমরা বাংলা ভাষা-ভাষী। ফলে তা সহজে বুঝে বাস্তব জীবনে কার্যকরী করা আমাদের জন্য কষ্টদায়ক হয়ে গেছে। তাই সাধারণ মানুষের কাছে কুরআনকে সহজে বুঝানোর জন্য বেশি বেশি দারসে কুরআন চালু হওয়া প্রয়োজন। মানুষকে নিজের ভাষায় কুরআনকে সহজে বুঝানোর জন্য দারস দানের যে সব পদ্ধতি রয়েছে তা অবলম্বন করে দারস প্রদান করলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে। নিম্নে দারসে কুরআন বক্তৃতা দানের পদ্ধতিগুলো ধারাবাহিক ভাবে উল্লেখ করা হলো ঃ

দারসের পূর্বের কাজ ঃ

১। পরিবেশ এবং মজলিশে কোন ধরনের শ্রোতা উপস্থিত হবেন সেই দিকে খেয়াল রেখে দারসের অংশ বাছাই করে নেবেন।

২। দারস দেবার জন্য কতটুকু সময় পাবেন সেই প্রাপ্ত সময়ের অনুপাতে দারসের অংশ বাছাই করবেন।

৩। দারসের জন্য বাছাইকৃত অংশটুকু বিশুদ্ধ তিলাওয়াতসহ ভালভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন। প্রয়োজনে নোট করে নেবেন।

৪। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সুন্দর লেবাসে নির্ধারিত সময়ের আগেই মজলিশে বা বৈঠকে উপস্থিত হবেন।

দারস-এর বক্তৃতা পদ্ধতিঃ

১। **বিশুদ্ধ তিলাওয়াত ঃ** প্রথমেই আপনি যে অংশের দারস পেশ করবেন সে অংশটুকু তা'উজ (আউ'যুবিল্লাহ) এবং তাসমিয়া (বিসমিল্লাহ্)সহ ধীর স্থীরভাবে সুন্দর লেহানে তিলাওয়াত করে নিবেন। সাবধান থাকবেন যাতে করে কোন ভাবেই তিলাওয়াত 'লেহানে জ্বলী' অর্থাৎ গুনাহর পর্যায়ে পড়ে

না যায়। দারসের জন্য বিশুদ্ধ তিলাওয়াত না হলে যেমন গুনাহগার হবেন তেমনি উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে যারা সহীহ তিলাওয়াত জানেন আপনার ওপর প্রথমেই তাদের ধারণা খারাপ হয়ে যাবে এবং দারসের যে উদ্দেশ্য তা ব্যাহত হবে।

২। **সরল তরজমা বা অনুবাদঃ** দারসের জন্য আপনি যে অংশটুকু তিলাওয়াত করলেন, আয়াত বা বাক্য ভিত্তিক তার তরজমা বা অনুবাদ পেশ করবেন। তবে সময় বেশি পাওয়া গেলে অনুবাদ করবেন নচেত ব্যাখ্যার সময় একই সাথে অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা করবেন।

৩। **সম্বোধনঃ** তিলাওয়াত এবং তরজমার পরে উপস্থিত শ্রোতাদের (পুরুষ-মহিলা থাকলে উভয়কেই) অত্যন্ত সম্মানজনক ভাবে সম্বোধন করবেন। আপনার সম্বোধনে যেন আন্তরিকতার পরিচয় ফুটে ওঠে সে দিকে খেয়াল রাখবেন। আর সম্বোধনের সময় কোন্ সূরার কতো থেকে কতো আয়াত তিলাওয়াত করলেন তাও উল্লেখ করবেন এবং সফলভাবে দারস প্রদান করার জন্য আল্লাহর কাছে তাওফীক কামনা করবেন। অতঃপর নিচের পদ্ধতিগুলো ধারাবাহিকভাবে অবলম্বন করে দারস পেশ করবেন।

৪। **সূরার নামকরণঃ** তিলাওয়াতকৃত অংশ যে সূরার সেই সূরার সংক্ষিপ্তভাবে নামকরণ সম্পর্কে তথ্য পেশ করবেন। কেন এবং কিসের ওপর ভিত্তি করে নামকরণ করা হয়েছে এবং সূরার বিষয়ের সাথে নামের কি সম্পর্ক আছে তা সংক্ষিপ্তভাবে অল্প কথায় তুলে ধরবেন। তবে সময় যদি কম হয় তাহলে নাম করণ সংক্রান্ত বক্তব্য পেশ করার প্রয়োজন নেই।

৫। **নাযিল হবার সময়কাল ঃ** তিলাওয়াতকৃত সূরা বা আয়াতগুলো রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নবুওয়াতের কোন্ সময় বা অধ্যায়ে নাযিল হয় এবং তখন পরিবেশ কেমন ছিলো তা সংক্ষেপে তুলে ধরবেন। তবে এ বিষয়টিও সময়ের ওপর নির্ভর করবে। সময় কম পেলে নাযিল হবার সময়কালের ওপর বক্তব্য পেশ করার প্রয়োজন নেই।

৬। **বিষয় বস্তুঃ** বিষয়বস্তু দু'ধরনের হতে পারেঃ- ক) সূরার বিষয়বস্তু, খ) তিলাওয়াতকৃত আয়াতের বিষয়বস্তু। কম সময় পাওয়া গেলে পৃথকভাবে বিষয়বস্তু উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই।

৭। পটভূমি বা শানে নুযূল ঃ পটভূমি দুটি বিষয়ের হতে পারে ক) সংশ্লিষ্ট সূরার পটভূমি, খ) সংশ্লিষ্ট আয়াতের পটভূমি।

পটভূমিতে নীচের বিষয়গুলো শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরবেনঃ

- আল-কুরআনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।
- স্থান কাল পাত্র উল্লেখ।
- মাক্কী এবং মাদানী সূরার সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ।
- ঐতিহাসিক কোনো ঘটনার যোগসূত্র থাকলে তা সংক্ষেপে উল্লেখ।

শানে নুযূলঃ ঐতিহাসিক কোনো ঘটনা না থাকলে তিলাওয়াতকৃত আয়াতের শানে নুযূল (অবতরণের কারণ) উল্লেখ করবেন।

সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখেই পটভূমি তুলে ধরবেন। সময় কম পাওয়া গেলে পটভূমি তুলে ধরার প্রয়োজন নেই, সংক্ষিপ্তভাবে শানে নুযূল পেশ করবেন।

৮। ব্যাখ্যা ঃ ব্যাখ্যার সময় নীচের বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখবেনঃ

- যে অর্থে আয়াত নাযিল হয়েছে সেই মর্মার্থ তুলে ধরবেন।
- বিশেষ বিশেষ শব্দের ব্যাখ্যা করবেন।
- বিশেষ প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে ব্যাখ্যা পেশ করবেন।
- সূরার এবং আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক রেখে ব্যাখ্যা পেশ করবেন।
- ব্যাখ্যার সময় সাধ্যানুযায়ী সম্পর্কশীল অন্যান্য আয়াত এবং হাদীসের রিফারেন্স (উদ্ধৃতি) প্রদান করবেন।
- ব্যাখ্যার সময় বর্তমান অবস্থার সাথে কি সম্পর্ক আছে তা তুলে ধরবেন।
- ব্যাখ্যার সময় কোনো প্রকার গোজামিলের আশ্রয় নিবেন না। সতর্ক থাকতে হবে কোনভাবেই যেন অপ্রাসঙ্গিক এবং নিজের মনগড়া ব্যাখ্যা পেশ করা না হয়। হাদীসে উল্লেখ আছে 'যে ব্যক্তি কুরআন (বা কুরআনের কোনো আয়াত) সম্পর্কে নিজের খেয়াল খুশি মতো বা অজ্ঞতা নিয়ে কথা বললো, সে যেনো জাহান্নামে তার ঠিকানা খুজে নেয়।" (তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে জরীর, ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত।)

৯। শিক্ষা ঃ সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলো দ্বারা আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের কি

কি শিক্ষা দিতে চান, তা সংক্ষিপ্তভাবে পয়েন্ট আকারে তুলে ধরবেন। শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ তুলে ধরার সময় নিচের বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখবেনঃ

- সাধারণদের জন্য কি কি শিক্ষা রয়েছে।
- ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য কি কি শিক্ষা রয়েছে।
- বর্তমান অবস্থায় ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের কি করণীয় আছে।

১০। আহ্বান ঃ দারসে কুরআন শেষ করার পূর্ব মুহূর্তে ভুল-ত্রুটির জন্য আল্লাহর কাছে মাফ চেয়ে নেবেন। তারপর আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং আখেরাতে নাযাতের জন্য বাস্তব জীবনে (নিজেকে সহ) আমল করার তৌফিক কামনা করে পূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করার আহ্বান জানিয়ে সালাম দিয়ে শেষ করবেন।

প্রশ্নউত্তর

দারসে কুরআন শেষ করে পরিবেশ যদি অনুকূলে থাকে এবং সময় পাওয়া যায় তাহলে যে অংশের দারস পেশ করলেন তার ওপর প্রশ্ন আহ্বান করবেন। প্রশ্নের উত্তর দানের সময় যেটি আপনার ভালভাবে জানা আছে তা স্পষ্টভাবে উত্তর দিবেন। কোনোভাবেই গোজা মিলের আশ্রয় নেবেন না। উত্তর জানা না থাকলে সময় নেবেন এবং পরবর্তীতে জানানো হবে বলে প্রশ্নকারীকে আশ্বস্ত করবেন। প্রশ্নকারীকে কোনোভাবেই কটাক্ষ করবেন না। সময় নিয়ে উত্তর দেয়াটা দুর্বলতার লক্ষণ নয় বরং পান্ডিত্তের লক্ষণ।

দারসের সময় বন্টন

দারস দানকারীকে অবশ্যই নির্ধারিত সময়কে সামনে রেখেই দারসের পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করতে হবে। দারস দানকারীর সুবিধার জন্য নীচে সময় বন্টনের ৪ টি নমুনা উল্লেখ করা হলো ঃ

এক

১ঘন্টা থেকে ১ ঘন্টা ১৫ মিনিট সময়ের দারস

তিলাওয়াত	৫/৬ মিনিট
সরল তরজমা বা অনুবাদ	৫/৬ ”
সম্বোধন	২/২ ”
সূরার নামকরণ	২/৩ ”
নাযিল হবার সময়কাল	২/৩ ”
ঐতিহাসিক পটভূমি (শানে নুযূলসহ)	৭/১০ ”
বিষয়বস্তু	২/৩ ”
ব্যাখ্যা	৩০/৩৫ ”
শিক্ষা	৪/৫ ”
আহ্বান	১/২ ”

দুই

৪৫ মিনিট থেকে ৫৫ মিনিট সময়ের দারস

তিলাওয়াত	৫/৬ মিনিট
সরল তরজমা বা অনুবাদ	৫/৬ ”
সম্বোধন	২/২ ”
সূরার নামকরণ	১/২ ”
নাযিল হবার সময়কাল	১/২ ”
ঐতিহাসিক পটভূমি (শানে নুযূলসহ)	৫/৭ ”
বিষয়বস্তু	১/২ ”
ব্যাখ্যা	২০/৩০ ”
শিক্ষা	২/৪ ”
আহ্বান	২/২ ”

তিন

৩০ মিনিট থেকে ৪০ মিনিট সময়ের দারস

তিলাওয়াত	২/৩	মিনিট
সরল তরজমা বা অনুবাদ	২/২	”
সম্বোধন	১/১	”
সংক্ষিপ্ত পটভূমি (শানে নুযূলসহ)	৪/৫	”
ব্যাখ্যা	২২/৩৫	”
শিক্ষা	২/৩	”
আহবান	২/২	”

চার

২০ মিনিট থেকে ২৫ মিনিট সময়ের দারস

তিলাওয়াত –	২/৩ মিনিট
সম্বোধন –	১/১ ”
শানে নুযূল –	২/৩ ”
অনুবাদ ও ব্যাখ্যা –	১২/১৪ ”
শিক্ষা –	২/৩ ”
আহবান –	১/১ ”

দারস দানকারীর করণীয়

দারসে কুরআন পেশ করার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে বাংলা ভাষায় সহজ করে কুরআনকে বুঝানো এবং তা হতে শিক্ষা গ্রহণ করে বাস্তব জীবনে কার্যকরী করা। এ জন্য দারস দানকারীর সেই উদ্দেশ্য সফলের জন্য কতকগুলো করণীয় রয়েছে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

১। আধুনিক শিক্ষিতদের জন্য আরবী শব্দের অর্থ জানা এবং আরবী ভাষা সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জনের জন্য বাংলায় আরবী ব্যাকরণ এবং 'আল কুরআনের অভিধান" বইটি পড়া।

২। বিশুদ্ধ তেলাওয়াত শিক্ষার জন্য বাংলায় যে সব তাজ্‌বিদের কিতাবগুলো আছে তা পড়া এবং পার্শ্ববর্তী মসজিদের ঈমাম, ক্বারী বা হাফেজ সাহেবদের কাছ থেকে সহীহ্‌ তিলাওয়াত শিক্ষা করা এবং মাঝে মাঝে পড়িয়ে শুনানো। এ কাজটি সর্বাপেক্ষা বেশি প্রাধান্য দিতে হবে। কেননা বিশুদ্ধ তিলাওয়াত ফরজ।

৩। যে অংশটুকু দারস দিবেন তা ভাল ভাবে কয়েকবার তিলাওয়াত করে নিতে হবে। যাতে দারস প্রদানের সময় বেধে বেধে না যায় এবং কষ্ট দায়ক না হয়।

৪। দারসে কুরআনের পূর্বে দেহের পবিত্রতা অর্জনের প্রয়োজন হলে গোছল করে নিতে হবে। নতুবা ওযু করে নিতে হবে। কোন ভাবেই বিনা ওযুতে দারসে কুরআন পেশ করা যাবে না।

৫। দাঁত পরিষ্কার করে নিতে হবে। যারা পান খেতে অভ্যস্ত তারা যেনো মেসওয়াক বা ব্রাসের দ্বারা ভালভাবে দাঁত এবং মুখ পরিষ্কার করে নেন। যারা পান খেতে বেশি অভ্যস্ত তারা যেন কোনো অবস্থাতেই পান চিবাতে চিবাতে দারস প্রদান না করেন। কেন না এতে দারসের আদব নষ্ট হয় এবং উপস্থিত স্রোতাদের মধ্যে বিরক্তির সৃষ্টি হয়।

৬। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিধান করতে হবে। তাতে পোষাক কম দামের হোক অথবা বেশি দামের হোক।

৭। প্যান্ট শার্ট পরে এবং খালি মাথায় দারস না দেওয়া সমিচীন। কেননা এতে দারসের উদ্দেশ্য সফল হয় না।

৮। দাড়ি এবং মাথার চুল ভাল ভাবে চিরুণী করে নিতে হবে। চুল এবং দাড়ি এলোমেলোভাবে রেখে দারস প্রদান করা ঠিক নয়। কেননা এতে স্রোতাদের মধ্যে দারসদানকারীর প্রতি আকর্ষণ নষ্ট হয়ে যায়।

৯। দারস দানকারীর আতর ব্যবহার করা উচিৎ। এতে দারসদানকারীর প্রতি স্রোতাদের আকর্ষণ সৃষ্টি হয় এবং নিজের মন উৎফুল্ল ও উদার থাকে।

১০। যথাসময়ে দারসের মজলিশে বা বৈঠকে উপস্থিত হতে হবে। কোনোভাবেই নির্দ্ধারিত সময়ের পরে হাজির হওয়া যাবে না। কেননা এতে উপস্থিত স্রোতাদের কাছে দারস দানকারীর সময়ের ব্যাপারে দায়িত্বহীণতার পরিচয় ফুটে ওঠে।

১১। দারসের সময় উপস্থিত শ্রোতাদের যাতে সকলকেই দেখা যায় এবং শ্রোতারাও দেখতে পান এ জন্য মজলিশের উপস্থিতি অনুযায়ী একটু উঁচু স্থানে বসার চেষ্টা করা।

১২। দারসের সময় কুরআন শরীফ সামনে রাখার চেষ্টা করতে হবে, না হলে দারসে কুরআনের বই সামনে রেখে দারস প্রদান করতে হবে।

১৩। দারসের জন্য পূর্ব থেকেই প্রয়োজনীয় বিষয়ের নোট করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

১৪। দারসের সময় শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে দারস প্রদান করতে হবে। স্রোতারা যাতে বুঝতে না পারেন যে, দারস দাতা দেখে দেখে পড়ছেন।

১৫। কথার জড়তা না রেখে স্পষ্ট ভাষায় এবং উপস্থিত স্রোতাদের মান এবং ভাষার সাথে মিল রেখেই ভাষা প্রয়োগ করতে হবে।

১৬। দারসের সময় একই কথা বার বার উল্লেখ করা সঠিক নয়।

১৭। দারস দানের সময় (যদি সাধারণ শ্রোতা হয়) তা হলে কোনো ভাবেই কোনো ব্যক্তি বা দলের প্রতি কটাক্ষ বা আঘাত দিয়ে কথা বলা যাবে না। এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা দলের লোকদের দারসের উপরই ধারণা খারাপ হয়ে যায়।

১৮। দারস দান করার সময় নিজেকে বা পরিবারের সদস্যদেরকে উদাহরণ হিসেবে পেশ করা ঠিক নয়। কেননা এতে রিয়া সৃষ্টি হয় এবং স্রোতাদের ধারণা খারাপ হয়ে যায়।

১৯। দারসের কোনো বিষয়ের প্রতি আহ্বানের সময় 'আপনাদের' না বলে 'আমাদের" শব্দ প্রয়োগ করা উচিত। কেননা প্রতিটি বিষয়ে নিজেকে জড়িয়েই কথা বলা সমিচীন। তাছাড়া 'আমি' 'আমি' না বলে 'আমরা' বলা উচিত। কেননা সম্মানি ব্যক্তিরা এমনকি আল্লাহ্ তায়ালাও আল কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় আমি এর পরিবর্তে আমরা ব্যবহার করেছেন।

২০। নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে দারস শেষ করা উচিত। কেননা কথায় আছে "শেষ ভাল যার সব ভাল তার।"

২১। সর্বপরি দারসদানকারীকে বাস্তব জীবনে তাক্ওয়াবান হতে হবে এবং কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী ব্যক্তিগত জীবনে এবং পারিবারিক জীবনে তার প্রতিফলন ঘটাতে হবে। নচেৎ আল কুরআনের দারসের যে উদ্দেশ্য তা পুরোপুরি বিফল হয়ে যাবে।

২২। দারস দানকারীকে অবশ্যই বিশুদ্ধ নিয়্যাত নিয়ে দারস পেশ করতে হবে। কোনোভাবেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা, সম্মান, সুখ্যাতি বা দুনিয়ার কোনো খেয়াল মনের মধ্যে রাখা যাবে না। বক্তৃতার মধ্যে খুলুসিয়াতের পরিচয় তুলে ধরতে হবে।

২৩। দারসদানকারীর জন্য সর্বশেষ করণীয় হলো নিজের এবং অন্যদের জন্য আল্লাহ্ তায়ালার কাছে দোআ কামনা করা।

দারসের কতিপয় পরিভাষার সংজ্ঞা

শানে নুযূলঃ شَأْنٌ (শান) আরবী শব্দটির অর্থ-উপলক্ষ্য, কারণ, হেতু, অবস্থা ইত্যাদি। আর نُزُوْل (নুযূল) শব্দটির অর্থ অবতীর্ণ। অতএব 'শানেনুযূল'-এর আভিধানিক অর্থ দাঁড়ায় অবতরণের হেতু, উপলক্ষ্য বা কারণ।

সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ মহানবী (সাঃ)-এর ওপর একযোগে অবতীর্ণ হয়নি। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অবস্থা, ঘটনা ও প্রয়োজনে দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে ওহীর মাধ্যমে খন্ড খণ্ড ভাবে অবতীর্ণ হয়েছে।

এরূপভাবে সেই সব উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ও সমস্যা সমাধানের মাধ্যম হিসেবে পবিত্র কুরআনের সূরা বা সূরার অংশ মহানবী (সাঃ)-এর ওপর জিবরাঈল (আঃ) এর মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে। আর একেই শানে নুযূল বা অবতরণের হেতু বা উপলক্ষ্য বা কারণ বলা হয়।

মাক্কী ও মাদানী সূরার সংজ্ঞা

মাক্কী সূরাঃ মাক্কী মাদানী সূরার সংজ্ঞা হিসেবে তিনটি মতামত পাওয়া যায়। তার মধ্যে বিশিষ্ট এবং গ্রহণযোগ্য মত হলোঃ মাক্কী সূরা বা আয়াত বলতে সেই সব সূরা বা আয়াতকে বুঝায় যে সব সূরা বা আয়াত মহানবীর মক্কায় অবস্থান কালে অর্থাৎ মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাতের পূর্বে মক্কায় অথবা অন্য কোথাও অবতীর্ণ হয়েছে।

মাদানী সূরা ঃ যে সব সূরা বা আয়াত মহানবী (সাঃ)-এর মদীনায় হিজরাতের পরে তাঁর মাদানী জীবনে মদীনায় অথবা অন্য কোথায়ও অবতীর্ণ হয়েছে, সে সব সূরা বা আয়াতকে মাদানী সূরা বা আয়াত বলে।

মাক্কী ও মাদানী সূরার সংখ্যাঃ

কুরআন মজীদে ১১৪টি সূরা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহ তাআলার নির্দেশ অনুযায়ী সূরাগুলো ধারাবাহিকভাবে বিন্যাস করেছেন।

ইমাম সুয়ুতী তাঁর রচিত কিতাব 'আল ইতকানে' অনেকগুলো বর্ণনা পেশ করেছেন। কোনো বর্ণনায় ২৭টি কোনো বর্ণনায় ২৬টি কোনো বর্ণনায় ২৮টি এবং কোনো বর্ণনায় ২৯টি মাদানী সূরার উল্লেখ পাওয়া যায়।

বাদশাহ ফাহাদ কুরআন ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত কুরআন শরীফে মাদানী সূরা ২৮ এবং মাক্কী সূরা ৮৬টি উল্লেখ করা হয়েছে।

কয়েকটি সূরা এমন আছে, যেগুলো মাক্কী বা মাদানী হওয়ার ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে।

আবার বেশ কয়েকটি সূরা এমনও আছে যেগুলোতে মাক্কী ও মাদানী আয়াতের সংমিশ্রণ আছে।

মাক্কী ও মাদানী সূরা চেনার উপায়ঃ

কাযী আবু বকর তাঁর 'ইন্তেসার' কিতাবে লিখেছেনঃ মাক্কী এবং মাদানী সূরার পরিচয়ের উৎস হলেন সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ)। মহানবী (সাঃ) থেকে এ ব্যাপারে কোনো কথা পাওয়া যায় না। কারণ, তিনি এ ব্যাপারে নির্দেশ পাননি। আর মাক্কী এবং মাদানী সূরা জানা আল্লাহ তাআলা উম্মতের জন্য ফরয করে দেননি। (জালালুদ্দীন সুয়ূতীঃ আল ইত্‌কান ফী উলুমিল কুরআন)।

মাক্কী ও মাদানী সূরা চেনার জন্য নিম্নে কতিপয় বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো ঃ

মাক্কী সূরার বৈশিষ্ট্যঃ

১। যে সব সূরায় كَلَّا শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তা মাক্কী।

২। যে সব সূরায় আদম (আঃ) এবং ইবলিসের ঘটনার বর্ণনা রয়েছে তা মাক্কী। তবে সূরা বাকারা এ মূলনীতির বাইরে।

৩। মাক্কী সূরাগুলো সাধারণতঃ আকারে ছোট ও সংক্ষিপ্ত।

৪। যেসব সূরায় يَاَيُّهَا النَّاسُ অর্থাৎ ‘ওহে মানব জাতি’! বলে সম্বোধন করা হয়েছে তা মাক্কী।

৫। মাক্কী সূরাগুলোর বিষয়বস্তু হচ্ছে তাওহীদ, রিসালাত, ঈমান, আখিরাত ও হাশরের অবস্থা বর্ণনা ইত্যাদি।

মাদানী সূরার বৈশিষ্ট্যঃ

১। যে সব সূরায় জিহাদের নির্দেশ রয়েছে তা মাদানী।

২। যে সব সূরায় মুনাফিকদের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে তা মাদানী।

৩। মাদানী সূরাগুলো সাধারণতঃ আকারে বড় ও বিস্তারিত।

৪। যে সব সূরায় يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا অর্থাৎ ‘ওহে ঈমানদারগণ’! বলে সম্বোধন করা হয়েছে তা মাদানী।

৫। মাদানী সূরাগুলোর বিষয়বস্তু হচ্ছে শরীয়তের হুকুম-আহকাম, সামাজিক আচার-ব্যবহার, হালাল, হারাম, বিবাহ, তালাক, ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসা-বাণিজ্য, মিরাছ, লেনদেন, পররাষ্ট্রনীতি, রাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থা, জিহাদ, বন্দী নীতি, এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান।

এক নজরে আল কুরআনের পরিচয়

● আল-কুরআনের আলোচ্য বিষয়-মানুষ।

● আল-কুরআনের উদ্দেশ্য মানুষের হেদায়েত।

● আল-কুরআন হিজরী পূর্ব ১৩ সনে (৬১০ খৃষ্টাব্দ) রমযান মাসে লাইলাতুল কদরে সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়।

● হিজরী ১১ সনে (৬৩২ খৃঃ) সফর মাসে অবতীর্ণ শেষ হয়।

● সর্ব প্রথম অবতীর্ণ আয়াতগুলো হচ্ছেঃ সূরা আ'লাকের প্রথম ৫ আয়াত।

● সর্ব প্রথম অবতীর্ণ পূর্ণাঙ্গ সূরা হচ্ছেঃ সূরা আল ফাতিহা।

● সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত হচ্ছেঃ সূরা মায়েদার ৪ নং আয়াত।

● সর্বশেষ অবতীর্ণ পূর্ণাঙ্গ সূরা হচ্ছেঃ সূরা আল-নাছর।

● হিজরী ১২ সনে (৬৩৩ খৃঃ) আল-কুরআনের পূর্ণাঙ্গ লিখিতরূপ দেন প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)।

● হিজরী ৭৫ সনে (৬৯৪ খৃঃ) হাজ্জাজ বিন ইউসুফ আল-কুরআনের হরকত (যের, যবর, পেশ) দেন।

● আল-কুরআনের পারা - ৩০টি।

● আল-কুরআনের সূরা - ১১৪টি।

ক) মক্কী সূরা মোট ৮৬টি অথবা ৮৯টি।

খ) মাদানী সূরা মোট - ৩১টি অথবা ২৫টি।

● মনজিল - ৭টি।

● রুকু মোট - ৫৬১টি।

● আয়াত মোট - ৬৬৬৬টি অথবা ৬২৭৩টি।

● শব্দ মোট- ৮৬৪৩০টি অথবা ৭৭৪৩৯টি অথবা ৭৬৪৪০টি।

● অক্ষর মোট - ৩,২৩,৬৭১টি অথবা ৩,১২,৬৯০টি।

● ওয়াক্ফ (বিরতি চিহ্ন) মোট - ৫০৫৮টি।

● আল্লাহ (اَللّٰهُ) শব্দ আছে মোট - ২৫৮৪ জায়গায়।

● মুহাম্মদ (مُحَمَّدٌ) শব্দ আছে মোট-৪ জায়গায়।

● লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ (لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ) আছে মোট-২ জায়গায়।

● সিজদাহ্ - ১৪টি। ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এর মতে ১৫টি।

● আল কুরআনে মোট - ৫৩২৪৩টি যবর, ৩৯৫৮২টি যের, ৮৮০৪টি পেশ, ১৭৭১টি মাদ্, ১২৫৩টি তাশদীদ এবং ১০৫৬৮১ টি নুক্তা আছে।

মুত্তাকীনদের গুণাবলী

সূরা বাকারা ১-৫ আয়াত

نَحْمَدُهٗ وَ نُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ۔

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ٥

الٓمّٓ٥ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَیْبَ فِیْهِ ج هُدًی لِّلْمُتَّقِیْنَ ٥
اَلَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِالْغَیْبِ وَ یُقِیْمُوْنَ الصَّلٰوةَ
وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ یُنْفِقُوْنَ٥ وَالَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِمَا
اُنْزِلَ اِلَیْكَ وَ مَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ج وَ بِالْاٰخِرَةِ
هُمْ یُوْقِنُوْنَ٥ اُولٰٓئِكَ عَلٰی هُدًی مِّنْ رَّبِّهِمْ
وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ٥

সরল অনুবাদঃ এরশাদ হচ্ছে (১) আলিফ লা-ম মী-ম। (২) এটি সেই কিতাব (আল কুরআন) যাতে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। ইহা সেই সব মুত্তাকীন বা পরহেযগারদের জন্য পদ প্রদর্শনকারী জীবন ব্যবস্থা, (৩) যারা গায়েবে অর্থাৎ অদৃশ্যে বিশ্বাস করে এবং যারা (ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে) নামায প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি তাদেরকে যে রুযী দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে। (৪) এবং যারা যে কিতাব (আর কুরআন) তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে ও তোমার আগে (অন্যান্য নবীদের ওপর) যে সব কিতাব নাযিল করা হয়েছে সে সবের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং পরকালের প্রতি যারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। (৫) বস্তুতঃ এ ধরনের গুণের লোকেরাই তাদের প্রতিপালক আল্লাহর পক্ষ থেকে সঠিক জীবন ব্যবস্থার ওপর রয়েছে এবং এরাই সার্থক সফলকামী।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ

ذٰلِكَ - ওটি, এটি। اَلْكِتٰبُ- গ্রন্থ। لَا - না। رَيْبَ - সন্দেহ। فِىْ - মধ্যে। هِ - এতে, তাতে। هُدًى - পথ প্রদর্শক। لِ - জন্য। اَلْمُتَّقِيْنَ - আল্লাহ ভীরু বা পরহেযগার। اَلَّذِيْنَ - যারা। يُؤْمِنُوْنَ - তারা বিশ্বাস করে। بِ - প্রতি বা সাথে। اَلْغَيْبِ - অদৃশ্য। وَ - এবং يُقِيْمُوْنَ - তারা প্রতিষ্ঠিত করে। الصَّلٰوةَ - নামায। مِمَّا - যা হতে। رَزَقْنَا - আমরা রিযিক দিয়েছি। هُمْ - তাদেরকে। يُنْفِقُوْنَ - তারা খরচ বা ব্যয় করে। بِ - প্রতি। مَا - যা। اُنْزِلَ - অবতীর্ণ করা হয়েছে। اِلٰى- প্রতি বা দিকে। كَ - তোমার। مِنْ - হতে। قَبْلِ - পূর্বে। اَلْاٰخِرَةِ - পরকাল। هُمْ - তারা। يُوْقِنُوْنَ - তারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। اُوْلٰئِكَ - তারা। عَلٰى - ওপর। رَبِّ- প্রতিপালক। اَلْمُفْلِحُوْنَ - সফলকামী বা কৃতকার্য।

সম্বোধনঃ দারসে কুরআন মাহফিলে/প্রোগ্রামে উপস্থিত ইসলাম প্রিয় দ্বীনদার (শুধু পুরুষ হলে ভায়েরা। শুধু মহিলা হলে বোনেরা। আর যদি পুরুষ মহিলা উভয়ই থাকে তাহলে ভাই ও বোনেরা)। আসসালামু আলাইকুম অয়া রাহমাতুল্লাহে্ অবারাকাতুহ্। আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কালামে হাকীম আল-কুরআনের সব চেয়ে বড় সূরা সুরাতুল বাকারার ১ থেকে ৫ নং আয়াত পর্যন্ত তিলাওয়াত ও সরল অনুবাদ পেশ করেছি। আল্লাহ্ তাআলা যেন আমাকে আপনাদের সামনে সঠিকভাবে সহীহ সালামতে দারসে কুরআন পেশ করার তৌফিক দান করেন। "অমা তাওফিকী ইল্লা বিল্লাহ"।

সূরার নামকরণ ঃ এ সূরার নাম "সূরাতুল বাকারা"। 'বাকারাহ্' শব্দের অর্থ গাভী বা গরু। এ সূরার ৮ম রুকুর ৬৭-৭১ নং আয়াত পর্যন্ত বনী ইসরাঈলদের প্রতি গরু কোরবানীর হুকুম দিতে গিয়ে 'বাকারা' শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে। বিধায় এই সূরার নাম সূরাতুল বাকারা রাখা হয়েছে। সূরা বাকারা নাম করণের ফলে এটা মনে করা যাবে না যে, এতে শুধু গরু সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কুরআনের প্রায় প্রতিটি সূরাতেই এতো

বেশি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যে, বিষয়বস্তুর দিক থেকে কোনো সূরার নামকরণ শিরোনাম হিসেবে নির্ধারণ করা খুব কঠিন ব্যাপার। এজন্য নবী করীম (সাঃ) আল্লাহর নির্দেশ মতো শিরোনামের পরিবর্তে সূরার মধ্য থেকে কোনো একটি শব্দকে বেছে নিয়ে সূরার পরিচিতি হিসেবে নামকরণ করেছেন। সূতরাং 'বাকারাহ' নামটি এই সূরার পরিচিতি হিসেবে নেয়া হয়েছে।

সূরাটি নাযিল হবার সময় কাল ঃ এই সূরার অধিকাংশ আয়াতই হিজরাতের পর মাদানী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়। অবশ্য এর কিছু আয়াত মাদানী জীবনের প্রায় শেষের দিকে যেমন সূদ হারাম সংক্রান্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। কিন্তু বিষয় বস্তুর সাথে সম্পর্ক থাকার কারণে এই সূরার সাথে সংযুক্ত করা হয়। আবার এই সূরার শেষের আয়াতগুলো হিজরাতের পূর্বে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিলো, কিন্তু বিষয়বস্তুর সাথে মিল থাকার কারণে এই সূরার সাথে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। তবে সবকিছুই করা হয়েছে ওহীর মাধ্যমে।

এই সূরার অধিকাংশ আয়াত হিজরাতের পরে মদীনায় নাযিল হয়েছে বলে এই সূরাকে মাদানী সূরা বলা হয়। এটা কুরআন শরীফের সবচেয়ে বড় সূরা। এতে ৪০টি রুকু ও ২৮৬টি আয়াত রয়েছে।

সূরার বিষয়বস্তু ঃ এই দীর্ঘতম সূরায় ইসলামের অধিকাংশ মূলনীতিগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। এতে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, বিবাহ-তালাক, হালাল-হারাম, ব্যবসা-বাণিজ্য, জিহাদ, যুদ্ধনীতি এবং বিভিন্ন বিষয়ের নীতি-নিয়ম বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। মুত্তাকীনদের বৈশিষ্ট্য, মুনাফিকদের পরিচয়, আদম এবং হাওয়া (আঃ)-এর সৃষ্টির ইতিহাস, বনী ইসরাঈলদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামত এবং তাদের নাফরমানীর কথাও বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশ এবং সবশেষে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ কামনার জন্য আল্লাহ্ পাক তাঁর বান্দাহ্দের এক হৃদয়গ্রাহী মুনাজাত শিখিয়ে দিয়েছেন।

পটভূমি ঃ মাক্কী সূরাগুলোতে আল্লাহ্ পাক সাধারণতঃ মক্কার কাফের ও মুসলমানদেরকে সম্বোধন করেই বিভিন্ন সূরা ও আয়াত নাযিল করেন। তার কারণ মক্কাতে এ দু'টি দলই ছিলো। মুসলমানেরা মুহাম্মদ (সাঃ) কে

আল্লাহর রাসূল এবং কুরআনকে আল্লাহ্‌র কালাম হিসেবে মানতো এবং কাফেরেরা রাসূলের বিরোধীতা করতো ও কুরআনকে আল্লাহর কালাম বলে স্বীকার করতো না। এ জন্য এই দু'দলের উপলক্ষ্যেই কুরআনের আয়াত নাযিল হতো। কিন্তু মদীনায় হিজরাতের পর আরো দু'টি দল 'ইহুদী' ও 'মুনাফিক' এদের মোকাবিলা করতে হলো। ইহুদীরা আহলে কিতাব হবার কারণে তারা নবী, রাসূল, বেহেশত, দোযখ, কিয়ামত, আখেরাত ও আসমানী কিতাব ইত্যাদি সম্পর্কে জানতো এবং সেগুলো বিশ্বাস করতো। অতীতের আসমানী কিতাব তাওরাত, যাবুর এবং ইঞ্জিলে রাসূলের পরিচয় ও তাঁর ওপর নাযিল করা কুরআন আল্লাহ্ তাআলার নিজস্ব কালাম হবার সত্যতা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইহুদীরা খালি খালি হিংসার বশবর্তী হয়ে তার সত্যতা সম্পর্কে জানা-শুনার পরও রাসূলের বিরোধিতা করতো। আর মুনাফেকরা মুসলিম সমাজের সুযোগ সুবিধা পাবার লোভে মুখে মুখে নিজেকে মুসলমান হিসেবে জাহির করলেও ভিতরে ভিতরে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সব সময় শত্রুতা করতো। এমন কি তারা কিভাবে মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তার দলকে ধ্বংস করা যায় তার ষড়যন্ত্রে ব্যস্ত থাকতো এবং সুযোগ পেলেই কাজে লাগাতো। সূরা বাকারা মাদানী হবার কারণে এতে ওপরের চার শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

শানে নুযূল ঃ এ সূরার শানে নুযূল সম্পর্কে মুযেহুল কুরআন নামক কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে মালেক ইবনে সায়ফ নামক জনৈক ইহুদী মুসলমানদের পবিত্র কুরআন সম্পর্কে এ বলে সন্দেহ সৃষ্টির অপচেষ্টা চালাচ্ছিলো যে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে যে কিতাবের ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে এই কুরআন সেই কিতাব নয়। আল্লাহ্ পাক তার ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করবার জন্য সূরা বাকারা বিশেষ করে সূরা বাকারার প্রাথমিক এই ছয়টি আয়াত নাযিল করেন।

ব্যাখ্যা ঃ আল কুরআন এবং সূরা বাকারা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেবার পর এখন আমি আপনাদের সামনে দারসে কুরআনের জন্য তিলাওয়াতকৃত অংশের বিভিন্ন আয়াত এবং প্রয়োজনীয় শব্দগুলোর ব্যাখ্যা পেশ করছি ঃ

الٓمّٓ ঃ 'আলিফ, লা-ম, মী-ম,' এই তিনটি অক্ষরকে 'হুরুফে মুকাত্তায়াত' বা বিচ্ছিন্ন অক্ষর বলা হয়ে থাকে। পবিত্র কুরআনের সর্বমোট

২৯টি সূরার প্রথমে এ ধরনের বিচ্ছিন্ন অক্ষর ব্যবহার করা হয়েছে। আল কুরআনে দুধরনের আয়াত বর্ণিত হয়েছে একটি 'মুহকামাত' স্পষ্ট বা প্রকাশ্য অর্থ বিশিষ্ট এবং অপরটি 'মুতাসাবিহাত' অস্পষ্ট বা অপ্রকাশ্য অর্থ বিশিষ্ট। এই অক্ষরগুলো হলো 'মুতাসাবিহাত'। এসব বিচ্ছিন্ন অক্ষরের প্রকৃত অর্থ একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই ভালো জানেন। তবে কোন কোন তাফসীরকারক ا দিয়ে اَنَا (আমি) ل দিয়ে اَللّٰه এবং م - দিয়ে اَعْلَمُ (বেশী জানি) অর্থাৎ اَنَا اَللّٰهُ اَعْلَمُ 'আমি আল্লাহ্ সবচেয়ে বেশি জানি'। আবার কোনো কোনো তাফসীরকারকের মতে ا -দিয়ে আল্লাহ্ ل - দিয়ে জিবরাঈল এবং م - দিয়ে মুহাম্মদ (সাঃ) কে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর নিকট হতে জিবরাঈল (আঃ) এর মাধ্যমে মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে এই পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। এছাড়া আরো অনেক মনীষী এই অক্ষরগুলোর অর্থ সম্পর্কে বিভিন্ন মত পেশ করেছেন। তবে এসব অর্থের সবগুলোই অনুমান ভিত্তিক। ইসলামী শরীয়তে এগুলোর একটিও সঠিক ও নির্ভরযোগ্য বলে গৃহীত হয়নি। কেননা এই অক্ষরগুলোর অর্থ হুযুর (সাঃ) উল্লেখ করে যাননি। সুতরাং এ অক্ষরগুলোর অর্থ জানার জন্য বাড়াবাড়ি না করাই ভালো। এ সম্পর্কে সূরা ইমরানের ৭নং আয়াতে উল্লেখ রয়েছে

هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ
الْكِتٰبِ وَ اُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ط فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ
زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغَاءَ
تَاْوِيْلِهٖ وَ مَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗٓ اِلَّا اللّٰهُ وَ الرّٰسِخُوْنَ فِي
الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ـ الخ

"(হে নবী) তিনিই আল্লাহ আপনার প্রতি কিতাব (কুরআন) নাযিল করেছেন। তাতে কিছু আয়াত আছে 'মুহ্কামাত (স্পষ্ট) সেগুলোই কিতাবের আসল অংশ। আর অন্যগুলো মুতাসাবিহাত (অস্পষ্ট)। ফলে যাদের অন্তরে কুটিলতা আছে, তারাই মুতাসাবিহাত বা অস্পষ্ট আয়াতের অনুসরণ করে ফিৎনা সৃষ্টি এবং অপব্যাখ্যার জন্য। অথচ সেগুলোর অর্থ

আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না। যারা জ্ঞানী তারা বলে ঃ আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। এ সবই আমাদের রব আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে।"

কিন্তু আফসোস আমাদের সমাজের এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা নিজেদেরকে সুফীবাদী বলে দাবী করে। তারা এ ধরনের আয়াতের অর্থ এবং তাৎপর্য তালাশে সদাসর্বদা ব্যস্ত থাকে এবং তারা আরো এক ধাপ এগিয়ে বলে, কুরআন ৪০ পারা। ৩০ পারা প্রকাশিত আর ১০ পারা গোপন রয়েছে। এরা বিভ্রান্ত, এদের ব্যাপারে আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে।

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ - "এটি এমন এক কিতাব যার মধ্যে সন্দেহ-সংশয়ের কোনো সুযোগ নেই।"

ذٰلِكَ সাধারণতঃ যালিকা শব্দটি কোনো দূরবর্তী জিনিসের প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে। যেহেতু কুরআন নিকটে দূরে নয় সেই জন্য তাফসীরকারগণ যালিকা শব্দের আগে هٰذَا (এই) নিকটবর্তী ইঙ্গিত বাচক একটি শব্দ ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ "هٰذَا ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ" "এটা সেই কিতাব যেই কিতাব সম্পর্কে পূর্বের আসমানী কিতাব সমূহে ভবিষ্যত বাণী করা হয়েছে। এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।"

الْكِتٰبُ এখানে কিতাব দিয়ে আল কুরআন বুঝানো হয়েছে।

رَيْبَ এর অর্থ সন্দেহ-সংশয়। আয়াতের অর্থ হচ্ছে "এ এমন একটি কিতাব যাতে সন্দেহ-সংশয়ের কোন সুযোগ নেই।"

আল্লাহ্ তাআলা তার নিজের রচিত কিতাব আল-কুরআনের ভূমিকাতেই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বললেন ঃ আমার এই কিতাবের ব্যাপারে কোনো সংশয়-সন্দেহের সুযোগ নেই। শুরুতে এ কথা ঘোষণার দ্বারা মানুষের মনে যাতে করে কোনো সন্দেহ সৃষ্টি হতে না পারে তার সুযোগ বন্ধ করে দেন।

বিশেষ করে ইহুদীদের পক্ষ থেকে কুরআনকে আসমানী কিতাবের মর্যাদা না দেবার যে অপচেষ্টা চালাচ্ছিলো তা প্রতিহত করার জন্য প্রথমেই তিনি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন এবং তাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়ে অত্র সূরার ২৩ নং আয়াতে ঘোষণা করেন "আমার বান্দা মুহাম্মদের (সাঃ) প্রতি

যে কিতাব অবতীর্ণ করেছি সে ব্যাপারে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে, তাহলে এর মতো একট একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এসো এবং আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের যে সব সাহায্যকারী আছে তাদেরকেও সাথে নাও, যদি তোমারই সত্যবাদী হয়ে থাকো।" কিন্তু তারা একটি সূরা তো দূরের কথা একটি আয়াতও রচনা করতে সক্ষম হয়নি।

অপরদিকে দেখা যায় দুনিয়াতে মানুষ যে সব বই রচনা করে, তার ভূমিকাতেই তারা নিজের ভুলের জন্য ক্ষমা এবং অপরের পরামর্শ ও সাহায্য কামনা করে থাকে। এটাই স্বাভাবিক। কেননা আল্লাহ তাআলা সকল ভূলের উর্ধ্বে এবং তিনি সব কিছুর স্রষ্ঠা। কিন্তু মানুষ ভুলের উর্দ্ধে নয়। আল্লাহর জ্ঞান অসীম আর মানুষের জ্ঞান সসীম সীমিত। বিধায় মানুষের তৈরি করা গ্রন্থে ভুল থাকাই স্বাভাবিক। আর আল্লাহর কিতাবে কোন ভুল নেই এবং ভুলও হতে পারে না। কুরআনে যে কোনো ভুল নেই এবং সন্দেহের সুযোগ নেই, বর্তমান আধুনিক যুগেও তা প্রমাণিত হয়েছে। পাশ্চাত্য পন্ডিত বিজ্ঞানী ডাঃ মরিস বুকাইলী কুরআনের ভুল-ক্রটি ধরার জন্য গবেষণা করতে গিয়ে, কুরআনের একটি যের যবরের ভুল পর্যন্ত ধরতে পারেননি। বরং তিনিই যে ভুলের মধ্যে ডুবে আছেন, তা ধরে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি কুরআনকে নির্ভুল এবং সংশয়মুক্ত আসমানী কিতাব হিসেবে প্রমাণ করার জন্য বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান তুলনামূলক আলোচনা করে তা বিশ্বের দরবারে পৌছিয়ে দিয়েছেন।

هُدًى - শব্দের অর্থ পথো নির্দেশিকা অর্থাৎ যে পথ দেখায়, সত্য ও সঠিক পথের সন্ধান দাতা, যা অনুসরণের যোগ্য জীবন যাপনের বিধান। কেননা আল-কুরআন হচ্ছে একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। মানুষের ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে সামগ্রীক জীবনের সব নিয়ম-কানুন বিধি-বিধান' কুরআনে উল্লেখ রয়েছে। আর এর বাস্তবে রূপদাতা হলেন স্বয়ং মুহাম্মদ (সাঃ)।

مُتَّقِيْنَ শব্দের অর্থ হলো- খোদাভীরু, পরহেযগার, হুশিয়ার, সাবধানী ও আল্লাহ্র আযাব থেকে বাঁচার জন্য সদা সচেষ্ট ব্যক্তিবর্গ। পবিত্র আল-কুরআন কেবলমাত্র সে ধরনের লোকদের জন্যই পথ নির্দেশিকা বা জীবন বিধান, যারা মুত্তাকী।

কুরআন তিন শ্রেণীর মানুষের জন্য হেদায়েদ বা পথনির্দেশিকা। (এক) সমস্ত মানুষের জন্য (দুই) মুসলমানদের জন্য। (তিন) মুত্তাকীনদের জন্য। এখানে আয়াতে কুরআনকে খাস করে মুত্তাকীনদের হেদায়েত লাভ করার কিতাব বলা হয়েছে।

মুত্তাকীনদের গুণাবলী - আল্লাহ্ তাআলা মুত্তাকীনদের জন্য কুরআনকে পথ নির্দেশিকা বা জীবন বিধান হিসেবে উল্লেখ করে পরবর্তী দুটি আয়াতে মুত্তাকীনদের পাঁচটি গুণের কথা উল্লেখ করেছেন। মদীনায় যারা ঈমান আনার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তাদের জন্যই শুধু নয়, বরং সর্বকালের সকল নিষ্ঠাবান মুমিনদের গুণাবলীই হয়ে থাকে এরকম ঃ

প্রথম গুণ ঃ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ অর্থাৎ তারা (মুত্তাকীনরা) অদৃশ্যে বিশ্বাস করে। মুত্তাকীনদের প্রথম গুণই হলো তারা অদেখা জিনিষ বিশ্বাস করে।

ঈমান কি? ঈমান শব্দের অর্থ হচ্ছে, কারো কথাকে বিশ্বাসের সাথে মনে প্রাণে মেনে নেয়া। এ জন্যই অনুভূতিগ্রাহ্য ও দেখা কোনো জিনিসে কারো কথায় বিশ্বাস করার নাম ঈমান নয়। যেমন উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, কোনো ব্যক্তি যদি এক টুকরো সাদা কাপড়কে সাদা এবং এক টুকরো কালো কাপড়কে কালো বলে এবং আর এক ব্যক্তি তার কথা সত্য বলে মেনে নেয়, তাহলে একে ঈমান বলা যায় না। এতে বক্তার কোনো প্রভাব বা দখল নেই। অপর দিকে রাসূল (সাঃ)-এর কোনো সংবাদ কেবলমাত্র রাসূলের ওপর বিশ্বাসী হয়ে মেনে নেয়াকেই শরীয়তের পরিভাষায় ঈমান বলে।

غَيْبٌ গায়েব অর্থ হচ্ছে এমন সব জিনিস যা বাহ্যিক ভাবে মানুষের জ্ঞানের বাইরে এবং যা মানুষ পঞ্চইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করতে পারে না, চোখ দিয়ে দেখতে পায় না, কান দিয়ে শুনতে পায় না, নাক দিয়ে ঘ্রাণ নিতে পারে না, জিহ্বা দিয়ে স্বাদ গ্রহণ করতে পারে না, হাত দিয়ে ছুইতে পারে না, ফলে সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতেও পারে না।

কোরআনে غَيْبٌ শব্দ দিয়ে সে সব বিষয়কেই বুঝানো হয় যেগুলোর সংবাদ রাসূল (সাঃ) দিয়েছেন এবং মানুষ সে সব বিষয়ে নিজের বুদ্ধিতে ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করতে সম্পূর্ণ অক্ষম।

দ্বিতীয় গুণ ঃ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ অর্থাৎ যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে। কুরআন থেকে হেদায়েত গ্রহণ করার জন্য মুত্তাকীনদের দ্বিতীয় গুণ হলো- তারা শুধু মৌখিক ভাবে স্বীকার করেই দায়িত্ব পালন শেষ করে না। বরং তারা বাস্তব জীবনে নিজেকে মুসলমান হিসেবে প্রমাণ করার জন্য নামায কায়েম বা প্রতিষ্ঠা করে। ঈমান আনার দাবীর সাথে সাথে যখন 'মুয়াজ্জিন' সুমধুর সুরে আজানের ধ্বনি দিয়ে ডাকে 'হাইয়্যালাস্‌সালাহ" তোমরা নামাযের জন্য আসো, তখন যদি একজন ঈমানের দাবীদার আযানের ডাকে সাড়া না দেয়, তাহলে বুঝতে হবে যে, সে বাস্তব জীবনে ঈমানের দাবী পূরণ করতে প্রস্তুত নয়। অতএব নামায ত্যাগ মানেই হলো আনুগত্য ত্যাগ করা। আনুগত্য ত্যাগ করাই হলো মুসলমানিত্য ত্যাগ করা। কেননা হাদীসে এসেছে"بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلٰوةَ"কুফর এবং আবেদের (মুসলমানের) মধ্যে পার্থক্য হলো নামায।' আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আরো বলেন ঃ مَنْ تَرَكَ الصَّلٰوةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ ـ
"যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে নামায ত্যাগ করলো সে কুফরী করলো।"

আমাদের আরো জানা থাকা দরকার যে, নামায কায়েম করা মানে নামায পড়া নয়। বরং এর অর্থ ব্যাপক। কুরআনে যেখানেই নামাযের কথা বলা হয়েছে, সেখানেই নামায প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এই নামায ব্যক্তিগতভাবে আদায় করলে কায়েম অর্থ বুঝাবে না। বরং সবাই মিলে জামায়াতের সাথে আদায় করলে তবেই নামায কায়েম করা বুঝাবে।

নামায কায়েম করার অর্থ সম্পর্কে কোরআন, হাদীস এবং মুফাসসিরগণ যে সব অর্থ নিয়েছেন তা হলো এই -

কুরআনের অভিমত ঃ রাষ্ট্রীয় ভাবে নামায কায়েম করার প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ "তারা যখন দুনিয়ার নেতৃত্ব কর্তৃত্ব পায় তখন তারা প্রথমেই নামায কাযেম করে, যাকাত আদায় করে, ভাল ভাল কাজের আদেশ দেয় এবং খারাপ কাজে বাধা সৃষ্টি করে।" (সূরা হজ্ব ঃ ৪১)

হাদীসের অভিমতঃ যখন (মুসলমান) কোনো ছেলে অথবা মেয়ের দশ বছর বয়স হয়ে যায় তখন তার ওপর নামায ফরজ হয়ে যায় এ সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) বলেন ঃ "তোমাদের ছেলে মেয়েরা যখন সাত বছর বয়সে পড়ে তখন তাদেরকে নামাযের জন্য হুকুম দাও। আর যখন বয়স দশ বছর

হয়ে যাবে তখন তাদেরকে (নামায না পড়লে) মারো এবং প্রয়োজনে আলাদা করে দাও।" (আবু দাউদ)

মুফাস্‌সীরদের অভিমতঃ নামায কায়েম অর্থে মুফাস্‌সীরগণ বলেন ঃ নামাযের যে হক অর্থাৎ, পাক পবিত্রতা অর্জন, নামাযের বাইরের এবং ভিতরের যে সব শর্ত রয়েছে তা যথাযথভাবে আদায়, সময় মতো জামায়াতের সাথে নামায আদায়। মোট কথা নামাযের যে হক রয়েছে তা পূর্ণভাবে আদায় করাই হলো নামায কায়েম করা।

জামায়তের সাথে নামায আদায়– নামায কায়েমের একটি বড় শর্ত। এর গুরুত্ব সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) অনেক কথায় বলেছেন, তার মধ্যে একটি হাদীস হলোঃ "একবার রাসূল (সাঃ) বললেনঃ যারা জামায়াতে নামায পড়তে আসে না তাদের বাড়িতে যদি শিশু এবং নারীরা না থাকতো, তা হলে আমি ইশার নামায শুরু করে দিয়ে যুবদেরকে তাদের ঘরে আগুন লাগাতে পাঠিয়ে দিতাম।" (আহমদ)

সবশেষে উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, একটি বাড়িতে নামায কায়েম তখনই হবে যখন দশ বছর থেকে শুরু করে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত অর্থাৎ বেহুশ না হওয়া পর্যন্ত বাড়ির নারী-পুরুষ সবাই নামায পড়বে। অনুরূপভাবে যখন একটি পাড়া বা গ্রামে সবাই মিলে নামায পড়বে তখন বলা যাবে সেই পাড়া বা গ্রামে নামায কায়েম হয়েছে। এভাবে যখন গোটা দেশের মুসলমান পুরুষ এবং নারী সবাই মিলে নামায পড়বে, তখনই বলা যাবে সেই দেশে নামায প্রতিষ্ঠা হয়েছে। সুতরাং এতে বুঝা যে আমরা এখনো নামায প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি। আমরা নামায পড়ছি মাত্র।

সুতরাং মুক্তাকীনদের বৈশিষ্ট্যই হবে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নামায কায়েম বা প্রতিষ্ঠা করা। আর তখনই তারা কোরআন থেকে হেদায়েত লাভ করতে পারবে।

তৃতীয় গুণ ঃ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ "তাদেরকে যে রুযি দেয়া হয়েছে তা থেকে তারা ব্যয় করতে থাকে।" অর্থাৎ মুত্তাকীনদের তৃতীয় গুণ হলো আল্লাহর পথে ব্যয় করা। 'ইনফাক' তথা দান করা বলতে যাকাত ও সাদকা উভয়কে বুঝায়। যাকাত ফরয হবার আগেই সাধারণত দান সাদকার বিধান চালু হয়েছিলো। পরে যাকাত একটা আলাদা বাধ্যতামূলক

বিষয় হিসেবে বিধান অবতীর্ণ হয়। কিন্তু সাধারণ দান সাদকাহও এর পাশাপাশি চালু থাকে। রাসূলে খোদা (সাঃ) বলেন ঃ "মানুষের ধন সম্পদে যাকাত ছাড়াও কিছু নির্দিষ্ট অধিকার রয়েছে।" সূরা বাকারার এই আয়াত যাকাত ফরয হবার আগেই অবতীর্ণ হয়েছিলো। তাই এই আয়াতে যাকাত ছাড়াও যাবতীয় দান সাদকা যেমন, আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য দান করা। আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশীকে সাহায্য করা। ফকীর, মিসকিন, মুসাফির অসহায় নারী পুরুষকে সাহায্য করা ইত্যাদি বিষয়ে নিজের যে রুযি আছে তা থেকেই যতটুকু সম্ভব দান করা। তবে নিজের পরিবারের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। যাতে তারা তাদের হক থেকে বঞ্চিত না হয়ে যায়।

চতুর্থ গুণ ঃ وَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَ مَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ - "যারা (হে নবী!) আপনার ওপর এবং আপনার আগের নবীদের ওপর নাযিলকৃত ওহীর (কিতাবের) ওপর ঈমান রাখে" এখানে আল্লাহ তাআলা মুত্তাকীনদের চতুর্থ গুণের কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ ঐ সব মানুষও মুত্তাকীনদের দলভুক্ত যারা মহানবী (সাঃ) এর প্রতি অবতীর্ণ আল-কুরআনকে আল্লাহ্র বাণী বলে স্বীকার করে এবং তার আগে পাঠানো অন্যান্য আসমানী কিতাব যেমন- তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জীল প্রভৃতিকেও আল্লাহরই পাঠানো আসমানী কিতাব হিসেবে বিশ্বাস করে। সুতরাং যারা আল-কুরআনকে আল্লাহর কিতাব বলে স্বীকার করে কিন্তু তাওরাত, যাবুর ও ইঞ্জীলকে স্বীকার করে না, তারা মুসলমান হতে পারে না। তবে সেগুলো সম্পর্কে বিশ্বাসের বিষয় হবে এই যে, কুরআনের পূর্বের কিতাবগুলো সত্য ও হক এবং সে যুগে এসবগুলোর বিধানের ওপর আমল করা জরুরি ছিলো। কিন্তু কুরআন অবতীর্ণ হবার পর অন্যান্য আসমানী কিতাবের হুকুম-আহকাম মানসুখ বা রহীত হয়ে গেছে। তাই এখন আমল একমাত্র কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী করতে হবে। তবে অবশ্যই পূর্বের কিতাবকে হক ও সত্য বলে বিশ্বাস করতে হবে।

যদি মুত্তাকীনদের বৈশিষ্ট্য এরূপই হয়, তা হলেই তারা কুরআন থেকে হেদায়েত লাভ করতে পারবে।

পঞ্চম গুণ ঃ وَ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ - "তারা পরকালের ওপর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রাখে"। এটা হচ্ছে মুত্তাকীনদের ৫ম এবং সর্বশেষ

বৈশিষ্ট্য। 'আখেরাত' বা 'পরকাল' একটা ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। এটা কয়েকটা মৌলিক বিশ্বাসের সমন্বয়ে গঠিত হয়। যেমন ঃ-

এক. মানুষ এ জগতে দায়িত্বহীন নয় বরং নিজের যাবতীয় কাজের জন্য আল্লাহর কাছে দায়ী। এ সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) বলেন ঃ "তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। আর প্রত্যেককেই (আল্লাহর কাছে) নিজ নিজ দায়িত্বের জবাবদিহী করতে হবে।"।

দুই. দুনিয়ার এ জগৎ চিরস্থায়ী নয় বরং এক সময় (কিয়ামত) যা আল্লাহ ছাড়া আর কারো জানা নেই, এটা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে সমাপ্তি ঘটবে।

তিন. এ জগৎ ধ্বংস হয়ে যাবার পর আল্লাহ্ তাআলা আর একটি জগৎ সৃষ্টি করবেন। সেখানে সকলকেই পুনরায় জীবন দান করে (হাশরের ময়দানে) তার দুনিয়ার জীবনের যাবতীয় কাজের হিসাব-নিকাশ নেবেন এবং প্রত্যেককেই তার কাজের পূর্ণ প্রতিদান দিবেন।

চার. আল্লাহর এই সিদ্ধান্ত মোতাবেক যারা সৎ ও নেককার হিসেবে গণ্য হবে, তারা জান্নাতে যাবে এবং যারা অসৎ ও গুনাহগার হিসেবে গণ্য হবে তারা জাহান্নামে যাবে।

পাঁচ. বর্তমান দুনিয়ার স্বচ্ছলতা ও অস্বচ্ছলতাই মানব জীবনের সাফল্য ও ব্যর্থতার প্রকৃত মানদন্ড নয়। বরং প্রকৃত পক্ষে শেষ বিচারের দিন যে সফলতা লাভ করবে সেই সফল হবে। আর যে ব্যর্থ হবে সেই চূড়ান্ত ভাবে ব্যর্থ হবে।

সুতরাং উপরোক্ত কয়েকটি বিষয়কে যদি কেহ মনে প্রাণে বিশ্বাস করে এবং মেনে নিতে প্রস্তুত থাকে তাহলেই তারা আখেরাতে দৃঢ় বিশ্বাসী বলে গণ্য হবে।

মুত্তাকীনদের উপরোক্ত পাঁচটি গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্য ছাড়াও কুরআনের অন্যান্য আয়াতেও আরো কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। তবে এখানে যে সব বৈশিষ্ট্যগুলো বলা হলো তা মূলতঃ মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ -

এই আয়াতে উপরোক্ত গুণের অধিকারী মুত্তাকীনদের সফল পরিণতির কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ উপরে বর্ণিত গুণাবলীতে ভূষিত ব্যক্তিরাই কেবলমাত্র

তাদের প্রতিপালকের পছন্দনীয় ও প্রদর্শিত পথে রয়েছে এবং সত্যিকার অর্থে তারাই দুনিয়া ও আখেরাতে চরম সফলতা লাভ করবে।

দুনিয়াতে সবশ্রেণীর লোকজনই মুত্তাকীনদেরকে শ্রদ্ধার এবং সম্মানের পাত্র বলে মান্য করে ও বিশ্বাস করে। আর পরকালেও তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে চূড়ান্ত সফলতা লাভ করবে।

শিক্ষা : সূরা বাকারার ১-৬ নং আয়াত পর্যন্ত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের পর তা থেকে আমরা যে সব বিষয়ের শিক্ষা লাভ করি তা হলো এই যে–

● + সূরার প্রথমে الٓمٓ এর মতো যে সব বিচ্ছিন্ন অক্ষর রয়েছে, যার অর্থ প্রকাশিত নয়। তার অর্থ এবং তাৎপর্য খুজে বেড়ানো যাবে না এবং মনের মধ্যে খুৎখুতেভাব সৃষ্টি করা যাবে না।

● গায়েবের প্রতি বিনা প্রশ্নে বিনা যুক্তিতে ইমান রাখতে হবে।

● পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রের সকল মুসলমান নারী-পুরুষ কে নামায পড়ার মাধ্যমে নামায প্রতিষ্ঠার যে দাবী তা পূরণ করতে হবে। এ জন্য নিজের পরিবারের সকলকে নামাযী বানাতে হবে এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে নামায কায়েমের জন্য কুরআনের আইন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরীক থাকতে হবে।

● আল্লাহ আমাদেরকে যে রুযি দিয়েছেন তা থেকেই সাধ্যমত খরচ করতে থাকতে হবে। কোন ভাবেই অসৎ পথে বা কাজে ব্যয় করা যাবে না। আর অর্থ-সম্পদ জমানোর জন্য বখিল হওয়াও যাবে না। (৫) আল কুরআন সহ অন্যান্য আসমানী কিতাবকে আল্লাহর বাণী হিসেবে বিশ্বাস করতে হবে। তবে কুরআনের বিধান ছাড়া অন্য কিতাবের বিধান মানা যাবে না।

● আখেরাতের প্রতি দৃঢ় ও মজবুত বিশ্বাস রাখতে হবে। এই বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কোনো রকম সন্দেহ বা দোদুল্যমান ভাব দেখানো যাবে না।

● সর্বশেষ শিক্ষণীয় বিষয় হলো দুনিয়ার সফলতাকে প্রকৃত এবং চিরস্থায়ী সফলতা মনে করা যাবে না বরং আখেরাতের সফলতাকেই প্রকৃত এবং স্থায়ী সফলতা মনে করতে হবে।

আহ্বান : সম্মানিত ভায়েরা/বোনেরা/ভাই ও বোনেরা আমি আপনাদের সামনে সূরা বাকারার ১ম থেকে যে কয়েকটি আয়াতের দারস পেশ

করলাম, এতে যদি আমার অজান্তে কোনো ভুল-ত্রুটি হয়ে যায় তার জন্য মহান আল্লাহ্ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর মুত্তাকীনদের যে সব গুণের কথা আলোচনা করা হলো আমরাও যেনো সেই গুণে গুণান্বিত হয়ে চূড়ান্ত এবং চিরস্থায়ী সফলতা লাভ করতে পারি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন। আমীন।

অয়া আখেরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বুল আলামিন। আস্‌সালামু আলাইকুম অয়া রাহমাতুল্লাহি অয়া বারাকাতুহ।

দুই

মু'মিনদের গুণাবলী

সূরা মু'মেনূন ১-১১ আয়াত

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۙ اَلَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۙ اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۚ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَاءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۚ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۘ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ ۙ اَلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ ؕ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

সরল অনুবাদ ঃ এরশাদ হচ্ছে (১) অবশ্যই (সেই সব) মু'মিনেরা সফলকাম হয়ে গেছে, (২) যারা তাদের নামাযে বিনয়ী-নম্র। (৩) যারা বাজে বা বেহুদা কথা-কাজ থেকে দূরে থাকো, (৪) যারা তাযকিয়া বা পরিশুদ্ধির ব্যাপারে কর্মতৎপর। (৫) এবং যারা তাদের যৌনাঙ্গকে (অবৈধ ব্যবহার থেকে) হেফাজত করে। (৬) তবে তাদের স্ত্রীদের এবং অধিনস্থ দাসীদের বেলায় (যৌনাঙ্গ) হেফাজত না করলে তারা তিরস্কৃত হবে না। (৭) তবে কেউ যদি এদের ছাড়া অন্য কাউকে (যৌনক্ষুধা

মেটার জন্য) কামনা করে, তবে (এক্ষেত্রে) তারা হবে সীমালংঘনকারী। (৮) আর যারা তাদের আমানত এবং প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে হুশিয়ার থাকে। (৯) এবং যারা তাদের নামায সমূহকে যথাযতভাবে সংরক্ষণ করে। (১০) তারাই (অর্থাৎ এসব গুণের অধিকারীরাই) হবে উত্তরাধিকারী। তারা শীতল ছায়াঢাকা উদ্যানের (অর্থাৎ জান্নাতুল ফেরদাউসের) উত্তরাধিকারী হবে এবং তাতে তারা চিরকাল থাকবে।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ

قَدْ – অবশ্য। اَفْلَحَ – সফলকাম হয়েছে বা পরিত্রান পেয়েছে। اَلْمُؤْمِنُوْنَ –মুমিনরা। اَلَّذِيْنَ –যারা। هُمْ –তারা। صَلَاتِهِمْ তাদের নামায। خٰشِعُوْنَ বিনয়ীরা। وَ এবং। هُمْ – তাদের। عَنْ – হতে। اللَّغْوِ– বেহুদা বা অনর্থক। مُعْرِضُوْنَ অগ্রাহ্যকারী, প্রত্যাবর্তনকারী। لِ –জন্য। الزَّكٰوةِ – যাকাত বা পবিত্রতা বা পরিশুদ্ধতা। فٰعِلُوْنَ – কাজ সম্পাদনকারী। فُرُوْجِهِمْ – তাদের যৌনাঙ্গ। حٰفِظُوْنَ – সংরক্ষণকারীরা। اِلَّا – ছাড়া। عَلٰى – উপর। اَزْوَاجِهِمْ – তাদের স্ত্রীরা। اَوْ – অথবা। مَا – সাথে। مَلَكَتْ – মালিকানাভুক্ত (দাসী)। اَيْمَانُهُمْ তাদের ডান (হাতের)। فَ – অতঃপর। اِنَّهُمْ – নিশ্চয় তারা। غَيْرُ – ব্যতিরেকে বা বাদে। مَلُوْمِيْنَ – তিরস্কৃত হবে। مَنْ – যে। ابْتَغٰى – কামনা করে। وَرَاءَ – অন্যাকে। فَاُولٰئِكَ – অতঃপর ওরা। الْعٰدُوْنَ – সীমালংঘনকারীরা। اَمٰنٰتِهِمْ – তাদের আমানতসমূহ। عَهْدٌ – ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি। رٰعُوْنَ – সংরক্ষণ করে। صَلَوٰتِهِمْ – তাদের নামাযসমূহ। يُحَافِظُوْنَ – তারা হেফাজত করে। اُولٰئِكَ – ওরাই। الْوٰرِثُوْنَ – উত্তরাধিকারীরা। يَرِثُوْنَ – তারা উত্তরাধিকারী হবে। الْفِرْدَوْسَ – শিতল ছায়াযুক্ত বাগান (সর্ব শ্রেষ্ঠ জান্নাতের নাম)। فِى – মধ্যে। هَا – তা। خٰلِدُوْنَ তাতে চিরদিন থাকবে।

সম্বোধন ঃ উপস্থিত ইসলাম প্রিয় দ্বীনদার ভায়েরা/বোনেরা ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ভাই ও বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম অরাহমাতুল্লাহ্।

আল-কুরআনের দারস পেশ করার জন্য আমি সূরা মু'মিনুনের ১-১১ নং আয়াত পর্যন্ত মোট ১১টি আয়াত তিলাওয়াত করেছি এবং সাথে সাথে তরজমাও পেশ করেছি। আল্লাহ্ তাআলা আমাকে এবং আপনাদেরকে সঠিকভাবে দারস পেশ করার এবং শোনার তৌফিক দান করুন। অমা তাওফিকী ইল্লা বিল্লাহ্। [দরস পেশ করার সময় এভাবে উপস্থিত শ্রোতাদের সম্বোধন করবেন।]

সূরার নামকরণ ঃ অত্র সূরার প্রথম আয়াত قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ এর 'আল-মু'মেনুন' মব্দ থেকে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। যদিও নামকরণের ক্ষেত্রে সব বিষয়ের সাথে মিল রেখে শিরোনাম হিসেবে উল্লেখ করা হয় না। কিন্তু এই সূরার ১ম থেকে ১১ নং আয়াত পর্যন্ত একই সাথে মু'মিনদের বৈশিষ্ট সম্পর্কে যেসব গুণের কথা পেয়ে বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে দেখা যায় যে, এই সূরার বিষয়ের সাথে নামকরণের বেশ মিল আছে।

নাযিল হবার সময়কাল ঃ সূরার বর্ণনাভঙ্গী এবং বিষয়বস্তু থেকে প্রমাণ হয় যে, এটি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মাক্কী জীবনের মাঝামাঝি সময় নাযিল হয়েছিলো। বিধায় সুরাটি মাক্কী। হযরত ওমর (রাঃ) এর এক উক্তি থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। হযরত উরওয়া ইবনে যুবাইর এর বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায়– এ সময় হযরত উমর (রাঃ) সবেমাত্র ঈমান এনেছিলেন। আর হযরত উমরের ইসলাম কবুলের সময় ছিলো রাসূল (সাঃ) এর নবুওয়াতের ষষ্ঠ বছরের শেষের দিকে। এ হাদীসে হযরত উমর (রাঃ) নিজে বলেন ঃ "এ সূরাটি তার সামনেই নাযিল হয়েছে। তিনি নবী করীম (সাঃ) এর উপর ওহী নাযিলের যে বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি হয় তা দেখতে পান। পরে নবী করীম (সাঃ) যখন সেই অবস্থা থেকে অবসর পেলেন, তখন তিনি আমাদেরকে বললেন ঃ "এইমাত্র আমার প্রতি এমন দশটি আয়াত নাযিল হয়েছে, যদি কেউ তার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হতে পারে তবে সে নিঃসন্দেহে জান্নাতে চলে যাবে।" অতঃপর তিনি এই সূরার প্রাথমিক আয়াতগুলো তেলাওয়াত করে শুনালেন। (আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও হাকেম।)

সূরাটি নাযিলের সময় মক্কায় রাসূল (সাঃ) এর সাথে কাফেরদের প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব

চলছিলো। তবে তখনো কাফেরদের যুলুম নির্যাতনের মাত্রা চরম পর্যায়ে পৌঁছেনি। তাছাড়া সূরাটি নাযিলের সময় মক্কায় চরম দুর্ভিক্ষও চলছিলো।

বিষয়বস্তু ঃ এই সূরাটির মূল বিষয়বস্তুই হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আনুগত্য।

তিলাওয়াতকৃত ১১টি আয়াতের মূল বিষয় হচ্ছে, যেসব লোক এই নবীর কথা মেনে নেবে, তাদের মধ্যে এসব গুণ সৃষ্টি হবে। আর নিঃসন্দেহে এসব লোকেরাই দুনিয়া এবং আখিরাতে কল্যাণ লাভ করবে।

সূরার বিশেষ বৈষিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব ঃ মুসনাদে আহমদ কিতাবের এক বর্ণনায় হযরত উমর ফারুক (রাঃ) বলেন ঃ রাসূল (সাঃ) এর উপর যখন ওহী নাযিল হতো, তখন পাশের লোকজনের কানে ঘন্টার ধ্বনি বা মৌমাছির গুঞ্জনের মতো আওয়াজ হতো। একদিন তাঁর কাছে এমনি ধরনের আওয়াজ পেয়ে আমরা সদ্যপ্রাপ্ত ওহী শুনার জন্য থেমে গেলাম। ওহীর বিশেষ অবস্থা শেষ হলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কেবলামুখী হয়ে বসে গেলেন এবং এই দোআ পাঠ করতে লাগলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَاَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَاَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَاٰثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَاَرْضِ عَنَّا وَاَرْضِنَا

"হে আল্লাহ আমাদের বেশী বেশী দাও– কম দিও না। আমাদের সম্মান বাড়িয়ে দাও– লাঞ্ছিত করো না। আমাদেরকে দান করো মাহ্রূম করো না। আমাদেরকে অন্যের উপর অীধকার দাও– অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দিয়ো না এবং আমাদের প্রতি রাযি-খুশী থাকো আর আমাদেরকে তোমার রাযীতে রাযী করো।" এরপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে বললেন ঃ এখনই আমার উপর যে দশটি আয়াত নাযিল হয়েছে। যে কেউ যদি এ আয়াতগুলো পুরোপুরি পালন করে, তবে সে সোজা জান্নাতে চলে যাবে। এরপর তিনি এই সূরার ১ম দশটি আয়াত তেলাওয়াত করলেন।

ইমাম নাসায়ী তাঁর কিতাবের তাফসীর অধ্যায়ে ইয়াযীদ ইবনে বাবনুস থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি একবার হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর চরিত্র কেমন ছিলো? তিনি (আয়েশা) বলেছিলেন ঃ তাঁর চরিত্র আল কুরআনে বর্ণিত আছে। অতঃপর

তিনি এই দশটি আয়াত তেলাওয়াত করে বললেন ঃ এগুলোই ছিলো রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর চরিত্র। (ইবনে কাসীর)

পটভূমিঃ অত্র সূরা বিশেষ করে এই আয়াতগুলো নাযিলের সময় প্রেক্ষাপট ছিলো এই যে, এ সময় একদিকে মক্কার কাফের সর্দারেরা ইসলামী দাওয়াতের চরম বিরোধী ছিলো। তাদের ব্যবসা-বানিজ্য ছিলো উন্নতমানের এবং চাকচিক্য পূর্ণ। তাদের টাকা-পয়সা, অর্থ-সম্পদ ছিলো প্রচুর। দুনিয়ায় স্বাচ্ছন্দের সব উপায় উপকরণ তাদের নাগালের মধ্যে ছিলো। আর অপরদিকে ছিলো ইসলামের অনুসারী রাসূলের সংগী-সাথীরা। এদের মধ্যে কিছু লোক যারা স্বচ্ছল ছিলো এবং তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যা আগে থেকেই সাফল্য মণ্ডিত হচ্ছিলো। কিন্তু ইসলামের দাওয়াত কবুল করার ফলে কাফেরদের চরম বিরোধিতার কারণে তাদেরকে খারাপ অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিলো। এতে কাফের সর্দারেরা নিজেদেরকে বেশী সফল ও সার্থক বলে দাবী করতো এবং নবীর অনুসারীদেরকে বিফল ও ব্যার্থ মনে করতো। তখন আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করলেন, নিশ্চয়ই কল্যাণ বা সফলতা লাভ করেছে ইসলামের দাওয়াত কবুলকারী রাসূলের অনুসারীরা। আর কাফেরেরা দুনিযায় যে সফলতা এবং স্বার্থকতার দাবী করছে, এটাই প্রকৃত সফলতা ও স্বার্থকতা নয়, বরং আখেরাতের সফলতাই হলো প্রকৃত এবং স্থায়ী সফলতা।

ব্যাখ্যা ঃ قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ – "অবশ্য অবশ্যই ঈমান গ্রহণকারী লোকেরা কল্যাণ বা সফলতা লাভ করেছে।"

মু'মিন কারা ঃ এখানে ঈমান কবুলকারী বা মু'মিন বলে সেসব লোকদের বুঝানো হয়েছে, যারা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর দাওয়াত কবুল করেছে, তাঁকে যারা নিজের মুর্শিদ বা পথ প্রদর্শক ও নেতা হিসেবে মেনে নিয়েছে এবং তাঁর উপস্থাপিত জীবন যাপনের নিয়ম-পদ্ধতি অনুসরণ করে চলতে প্রস্তুত হয়েছে।

فَلَحٌ (ফালাহ) শব্দের মানে-কল্যাণ, সাফল্য এবং স্বাচ্ছন্দ। এটা خُسْرٌ। (খুশরান) বা ক্ষতি বা ব্যর্থতার বিপরীত। সাফল্য শব্দটি কুরআন এবং হাদীসে ব্যাপক ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আযান ও একামতে প্রতিদিন পাঁচবার প্রতিটি মুসলমানকে حَيَّ عَلَى الْفَلَحْ বলে সাফল্যের দিকে

ডাকা হয়। এর প্রকৃত অর্থ হলো প্রত্যেক মনোবাঞ্ছা পূরণ হওয়া এবং প্রতিটি কষ্ট দূর হওয়া। এ শব্দটি সংক্ষিপ্ত হলেও এর অর্থ সুদূর প্রসারী। দুনিয়ার কোন মানুষ বা শক্তির পক্ষে মানুষের প্রতিটি মনোবাঞ্ছা পূরণ করা এবং প্রতিটি কষ্ট বিদূর করা সম্ভব নয়। এটা পারেন একমাত্র বিশ্ব জাহানের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ তাবারাকাওয়া তাআলা।

পুরোপুরিভাবে সফলতা লাভ করা দুনিয়াতে কোনভাবেই সম্ভব নয়। এটা একমাত্র আখেরাতে জান্নাত লাভের মাধ্যমেই হতে পারে। কুরআন এবং হাদীসে যেখানেই এই 'ফালাহ' বা সফলতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে- তা চিরস্থায়ী আখেরাতের সফলতার কথাই বলা হয়েছে। এখানেও মক্কার কাফের সর্দারদের দুনিয়ার ধন-সম্পদ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের উত্তরত্তর সফলতার বড়াই এর পরিপেক্ষিতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ তোমরা দুনিয়ার যে সফলতা এবং স্বার্থকতার বড়াই করছো এটাই প্রকৃত সফলতা বা স্বার্থকতা নয়। তোমাদের এই সফলতা ক্ষণস্থায়ী। বরং মুমিন লোকদের জন্য আখেরাতের যে সফলতা সেটাই হচ্ছে প্রকৃত এবং চিরস্থায়ী সফলতা।

বর্তমানে আমাদের সমাজেও অনুরূপ লোক দেখা যায়। প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উত্তরত্তর উন্নতির জন্য এবং নিজের সন্তানদের লেখা-পড়ার ভাল ফলাফল ও দামী চাকুরী পাবার কারণে নিজেকে সফল হয়েছে বলে বড়াই করে। অথচ আখেরাতের জন্য সে কোন কাজই করে না। তাদের দুনিয়ায় এ ধরনের বড়াই পরকালে কোনো কাজেই আসবে না। বরং তারাই ব্যর্থ এবং ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর যারা মুমিন, ইসলামের পথে চলার জন্য দুনিয়ায় বাধাগ্রস্ত হয়ে কষ্টের মধ্যে জীবন-যাপন করতে হয়েছে, বাতিলের বিরোধিতা এবং হামলার কারণে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং চাকুরী-বাকরী ক্ষতি হয়েছে, প্রকৃত পক্ষে তারাই আখেরাতে নেয়ামতে ভরা জান্নাত লাভের মাধ্যমে চিরস্থায়ী সফলতা লাভ করবে।

আল-কুরআনে অন্যত্র সূরা আ'লায় সাফল্য লাভের ব্যবস্থা পত্র দিতে গিয়ে বলা হয়েছে – قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى অর্থাৎ "যে নিজেকে পাপ কাজ থেকে পবিত্র রেখেছে সেই সফলকাম হয়েছে।" এর সাথে সাথে আরও ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, পরিপূর্ণ সফলতা লাভের জায়গা আসলে দুনিয়া নয় পরকাল। যে সফলতা কামনা করে, তার কাজ শুধু দুনিয়া নিয়ে ব্যতিব্যস্ত

থাকা নায়। এ সম্পর্কে সূরা আ'লায় আরো বলা হয়েছে–

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى

(হে মানুষ!) "তোমরা দুনিয়াকেই পরকালের উপর অগ্রাধিকার দিচ্ছো। অথচ দুনিয়ার তুলনায় পরকালের জীবন অতি উত্তম এবং স্থায়ী।"

সুতরাং পরিপূর্ণ এবং স্থায়ী সফলতা তো একমাত্র পরকালে জান্নাতেই পাওয়া যেতে পারে– দুনিয়া এর স্থান নয়। তবে দুনিয়াতেও আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রকৃত বান্দাদের মনের প্রশান্তির মাধ্যমে সফলতা দান করে থাকেন।

মু'মিনদের সাতটি গুণ

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা সেই সব মু'মিনদেরকে সফলতা দানের ওয়াদা করেছেন যাদের মধ্যে সাতটি গুণ রয়েছে। সর্ব প্রথম গুণ হচ্ছে ঈমানদার হওয়া। কিন্তু এটা বুনিয়াদী ও মৌলিক বিষয় বিধায় এটাকে এই সাতটি গুণের মধ্যে শামিল না করে পর পর সাতটি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। নীচে সেগুলো ধারাবাহীকভাবে আলোচনা করা হলোঃ

প্রথম গুণ ঃ اَلَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ অর্থাৎ "যারা তাদের নামাযে বিনয়ী-নম্র।" নামাযে 'খুশূ' বলতে বিনয়-নম্র হওয়া বুঝায়। 'খুশূর' আভিধানিক অর্থ স্থিরতা। শরীয়াতের পরিভাষায় এর মানে অন্তরে স্থিরতা থাকা; অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর কল্পনা অন্তরে ইচ্ছাকৃতভাবে না করা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও স্থির থাকা; অর্থাৎ অনর্থক নড়াচড়া না করা। (বয়ানুল কুরআন)। তাছাড়া এর আরো অর্থ হলো কারও সামনে বিনয়াবনত হওয়া, বিনীত হওয়া, লুণ্ঠিত হওয়া, নিজের কাতরতা ও অক্ষমতা প্রকাশ করা ইত্যাদি।

দেলের 'খুশূ' হয় তখন, যখন কারও ভয়ে ও দাপটে দেল ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে। আর দেহের 'খুশূ' এভাবে প্রকাশ পায় যে, কারও সামনে গেলে তার মাথা নীচু হয়ে যায়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথিল হয়ে পড়ে, চোখের দৃষ্টি নতো হয়ে আসে, গলার স্বর ক্ষীণ হয়ে যায়।

ভীত সন্ত্রস্ত হবার সেসব লক্ষণই বেশী প্রকাশ হয়ে পড়ে যখন কোনো ব্যক্তি কোনো মহাশক্তির প্রচণ্ড দাপটের অধিকারী কোনো সত্তার সামনে হাজির

হয়। আর নামাযে 'খুশূ' বলতে বুঝায় মন ও দেহের অনুরূপ অবস্থা সৃষ্টি হওয়াকে। কেননা নামাযী তার মহাশক্তিধর প্রভুর সামনে হাজির হয়।

নামাযে বিনয় ও একাগ্রতা বা খুশূ-খুজু পয়দা হবার জন্য নামাযের বাহ্যিক কাজেরও বেশ প্রভাব রয়েছে। ইসলামী শরীয়াতে নামাযের যেগুলো নিয়ম-নীতি ও কায়দা-কানুন হিসেবে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে, তা যথাযত ভাবে নিষ্ঠার সাথে আদায় করলে মনের একাগ্রতা বা খুশূ সৃষ্টির জন্য সাহায্য করে। আবার সেসব কাগুলো ঠিকমত না করলেও নামাযের একাগ্রতা ও খুশূ সৃষ্টিতে বাধা দেয়।

নামাযের যেসব বাহ্যিক কাজ নামাযের একাগ্রতা বা খুশূ পয়দায় বাধা সৃষ্টি করে তা হলোঃ

❑ নামাযের মধ্যে নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে খেলা বা নড়া-চড়া করলে নামাযের একাগ্রতা বা খুশূ নষ্ট হয়ে যায়। এ সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে- একবার নবী করীম (সাঃ) এক ব্যক্তিকে নামাযের মধ্যে মুখের দাড়ী নিয়ে খেলা করতে দেখে বললেন ঃ

لَوْ خَشِعَ قَلْبُهُ خَشِعَتْ جَوَارِحُهُ

"যদি এ লোকটির দেলে খুশূ থাকতো তাহলে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপরেও খুশূ বা স্থিরতা থাকতো।" (মাযহারী)

❑ নামাযে এদিক ওদিক তাকালে নামাযের একাগ্রতা বা খুশূ নষ্ট হয়ে যায়। বুখারী এবং তিরমিযী শরীফের হাদীসে হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি নবী করীম (সাঃ) কে নামাযে এদিক ওদিক তাকানো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় রাসূল (সাঃ) বললেন ঃ

هُوَ اِخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ

"এটা নামাযীর (মনোযোগের) উপর শয়তানের থাবা।"

❑ নামাযে ছাদ বা আকাশের দিকে তাকালে নামাযের একাগ্রতা বা খুশূ নষ্ট হয়ে যায়। এ সম্পর্কে হাদীসে উল্লেখ আছে। হযরত জাবির বিন সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন ঃ

لَيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ يَرْفَعُوْنَ اَبْصَارَهُمْ اِلَى السَّمَاءِ فِى الصَّلَاةِ اَوْلَا تَرْجِعُ اِلَيْهِمْ

"লোকেরা যেনো নামাযে তাদের চোখকে আকাশমুখী না করে। (কেননা তাদের চোখ) তাদের দিকে ফিরে নাও আসতে পারে।" (অর্থাৎ নামাযের একাগ্রতা বা খুশূ নষ্ট করে দিবে।)" (মুসলিম)।

❐ নামাযে হেলা-দোলা করা ও নানা দিকে ঝুকে পড়লে নামাযের একাগ্রতা বা খুশূ নষ্ট হয়ে যায়।

❐ পরনের জামা-কাপড় বারবার গুটানো বা ঝাড়া কিংবা তা নাড়াচাড়া করলে নামাযের একাগ্রতা বা খুশূ নষ্ট হয়ে যায়।

❐ সিজদায় যাবার সময় বসার জায়গা বা সিজদাহর জায়গা বারবার পরিষ্কার করলে নামাযের একাগ্রতা নষ্ট হয়ে যায়। (তবে ক্ষতিকারক হলে একবার সরানো যাবে)

এসম্পর্কে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে মহানবী (সাঃ) বলেছেন ঃ

اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ فِى الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحِ الْحَصٰى، فَاِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهٗ

"কোন ব্যক্তি যেন নামাযের অবস্থায় (সিজদাহর জায়গা হতে) কংকর না সরায়। কেননা আল্লাহর রহমত নামাযী ব্যক্তির সামনে প্রসারিত হয়। (আহমদ, নাসায়ী, তিরমিযী, আবু দাউদ, ও ইবনে মাযাহ)।

❐ একটানা ভাবে গর্দান খাড়া করে দাঁড়ানো, খুব কর্কষ সূরে কোরআন পাঠ করা কিংবা গীতের সূরে কেরআত পাঠ করলে নামাযের খুশূ বা বিনয়তা নষ্ট হয়ে যায়।

❐ জোরে জোরে হাই এবং ঢেকুর তোললে, ইচ্ছা করে গলা খেকাড়ী বা কাশি দিলে নামাযের একাগ্রতা নষ্ট হয়। হাদীসে আছে, হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

اَلتَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَاِذَا تَثَاءَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ

"নামাযে হাই উঠে শয়তানের প্রভাব থেকে। যদি কারো হাই উঠে তবে সে যেনো সাধ্যমত হাই প্রতিরোধ করে।" (মুসলিম, তিরমিযী)।

❒ খুব তাড়াহুড়ো করে নামায আদায় করলে নামাযের বিনয়তা বা একাগ্রতা থাকে না। এ সম্পর্কে "হযরত আবু হুরাইরা বর্ণিত হাদীসে মহানবী (সাঃ) 'মুখতাসির' (অর্থাৎ নামাযের কাজগুলোকে হাল্কা ও ঝটপট) রূপে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।"

❒ নামাযের রুকু, সিজদাহ, কিয়াম, বৈঠক সঠিকভাবে আদায় না করলে নামাযের একাগ্রতা নষ্ট হয়। হাদীসে আছে "নোমান ইবনে মোররাহ বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবীদের জিজ্ঞেস করলেন ঃ মদখোর, ব্যভিচারী ও চোর সম্পর্কে তোমাদের মতামত কি? তারা বললেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি (সাঃ) বললেন ঃ ওগুলো কবীরা গোনাহ এবং এর সাজাও খুব। (এবার শুনে নাও) সবচেয়ে জঘন্য চুরি হলো সেই চুরি যে ব্যক্তি নামাযে চুরি করে। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, নামাযে আবার চুরি কিভাবে হয় হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন ঃ যে নামাযে রুকু ও সেজদাহ্ ঠিকমত করে না" (মালেক, আহমদ, দারেমী, মেসকাত)

❒ নামাযীর সামনে পর্দায় কোন ছবি বা সিনারী থাকলে নামাযের খুশূ বা একাগ্রতা নষ্ট করে দেয়। "হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর একটি কাপড়ের পর্দা ছিলো তিনি তা ঘরের একদিকে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। এতে নবী করীম (সাঃ) বললেন ঃ তুমি এ পর্দাটি আমার সামনে থেকে সরিয়ে রাখো। কারণ এর ছবিগুলো সর্বদা আমার নামাযের ক্ষতি (অর্থাৎ একাগ্রতা নষ্ট) করে।" (বুখারী)

অন্তরের যেসব কাজ নামাযের খুশূ বা একাগ্রতা নষ্ট করে তাহলো ঃ

❒ নামাযের মধ্যে জেনে শুনে অপ্রাসংগিক কথা-বার্তা চিন্তা বা খেয়াল করলে নামাযের একাগ্রতা নষ্ট হয়ে যায়। তবে অনিচ্ছাসত্ত্বে কোনো চিন্তা ভাবনা মনে জাগলে তা জাগতে পারে। মানুষের এটা স্বাভাবিক ব্যাপার। কেননা শয়তান মানুষের মনে আসওয়াসা দিয়ে নামাযের একাগ্রতা নষ্ট করার জন্য সদাসর্বদা চেষ্টায় নিয়োজিত থাকে। এ সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) হাদীসে বলেন ঃ "নামাযের জন্য যখন আযান দেয়া হয় তখন শয়তান পিঠ ফিরিয়ে বাতকর্ম করতে করতে পালাতে থাকে– যাতে সে আযানের ধ্বনি না শুনতে পায়। অতঃপর যখন আযান শেষ হয়ে যায় তখন সে ফিরে

আসে। আবার যখন একামত বলা হয় তখন সে পিঠ ফিরিয়ে পালাতে থাকে এবং যখন একামত শেষ হয়ে যায় তখন ফিরে আসে ও মানুষের মনে (একাগ্রতা নষ্ট করার জন্য) খটকা দিতে থাকে। সে বলে ঃ অমুক বিষয়ে খেয়াল করো, অমুক অমুক বিষয়ে খেয়াল করো– যেসব বিষয় তার মনে ছিলো না। অবশেষে নামাযী এরূপ (অমনোযোগী) হয়ে যায় যে, সে বলতে পারে না কত রাকাআত নামায পড়েছে।" (আবু হুরাইরা, বুখারী, মুসলিম)।

নামাযে অন্তরের খুশূ বা একাগ্রতা সৃষ্টির জন্য যেসব কাজ করতে হবে–

❑ নামাযে সব সময় আল্লাহ্ তাআলাকে হাজির-নাজির জানতে হবে। নামাযী যখন নামাযে দাঁড়াবে তখন সে মনে করবে যেনো সে আল্লাহর সামনে হাজির হয়েছে। এ সম্পর্কে "হাদীসে জিবরীলে" 'ইহ্সান' সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) কে জিবরাঈল (আঃ) প্রশ্ন করলে, তার প্রতিউত্তরে তিনি বলেন ঃ

اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهٗ يَرَاكَ

"তুমি এভাবে আল্লাহর ইবাদাত (নামায আদায়) করবে, যেন তুমি স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলাকে দেখতে পাচ্ছো; আর যদি তোমার পক্ষে এটা সম্ভব না হয়, তবে তুমি অবশ্যই মনে করে নিবে যে, আল্লাহ্ তোমাকে সর্বক্ষণ দেখছেন।" (হযরত উমর, মুসলিম)।

❑ নামাযে যেসব দোআ-কালাম পড়া হয় তা অন্তর থেকে পড়তে হবে। স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে ধীর-স্থিরভাবে পড়তে হবে। নামাযে অন্য মনস্ক হয়ে গেলে যখনই খেয়াল হবে তখনই মনকে পুনরায় নামাযের মধ্যে আনতে হবে। সদাসর্বদা এ চেষ্টা অব্যহত রাখতে হবে।

❑ নামাযে মনোনিবেশ বা খুশূ সৃষ্টি করার জন্য নামাযীর দৃষ্টি সেজদার দিকে থাকবে। এ সম্পর্কে হাদীসে মহানবী (সাঃ) বলেন ঃ "হে আনাস! যেখানে তুমি সেজদাহ্ দেবে সেই জায়গাতেই তোমার দৃষ্টি রাখবে।" (বায়হাকী, মেশকাত)

❑ নামাযে মনোনিবেশ সৃষ্টির জন্য নামাযে যা পড়া হবে তার অর্থ নিজের ভাষায় জানতে হবে। দোআ-কালামের মানে জানলে স্বাভাবিকভাবেই নামাযে মনের একাগ্রতা সৃষ্টি হবে।

প্রিয় ভায়েরা মুমিনদের গুণাবলীর প্রথম গুণ নামাযে খুশূ বা বিনয়ী বা একাগ্রতার বিষয়টি এতো দীর্ঘ আলোচনার কারণই হলো একজন মু'মিনে বান্দার প্রথম গুণই হবে নামায আর নামাযের রূহ বা প্রাণই হলো নামাযে খুশূ-খুজূ বা একাগ্রতা। যদি তা না হয় তাহলে নামায পড়াই হবে কিন্তু আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। এজন্য আমাদের নামায পড়তে হলে খুশূ-খুজূর সাথেই নামায আদায় করতে হবে।

দ্বিতীয় গুণ ঃ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ অর্থাৎ "যারা বেহুদা বা অপ্রয়োজনীয় কথা এবং কাজ থেকে দূরে থাকে।"

মুমিনদের দ্বিতীয় গুণ হলো তারা বেহুদা, অপ্রয়োজনীয় ও অকল্যাণকর কথা, কাজ এবং চিন্তা থেকে দূরে থাকে।

لَغْوٌ (লাগয়ুন) বলা হয় এমন প্রতিটি কাজ এবং কথাকে যা অপ্রয়োজনীয়, অর্থহীন এবং নিষ্ফল। যেসব কথা এবং কাজের কোনই ফল নেই; উপকার নেই, যা থেকে কল্যাণবহ ফলও লাভ করা যায় না। যার কোনো প্রয়োজন নেই, যা হতে কোনো ভালো উদ্দেশ্য হাসিল করা যায় না– এসবই অর্থহীন, বেহুদা ও বাজে জিনিস।

مُعْرِضُوْنَ মানে যদিও দূরে থাকা। কিন্তু এতে শব্দটির পূর্ণ অর্থ বুঝায় না। আয়াতটির পূর্ণ অর্থ হলো ঃ তারা বাজে, বেহুদা কাজ বা জিনিসের দিকে লক্ষ্য করে না। সেদিকে যায় না। যেখানে এ ধরনের কাজ বা কথা হয় সেদিকে আকৃষ্ট হয় না। সেখানে যাওয়া হতে দূরে থাকে। সে কাজে অংশগ্রহণ করে না, পরহেয করে, পাশ কেটে চলে যায়, কোথাও কখনও মুখোমুখী হয়ে পড়লেও নিজেকে বাঁচানোর জন্য এড়িয়ে চলে যায়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَإِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا

"তারা যদি এমন কোনো স্থানে যেয়ে পড়ে যেখানে বেহুদা অর্থহীন বাজে কাজ বা কথা হচ্ছে, তা হলে সেখান থেকে তারা নিজের মান সম্মান রক্ষা করে চলে যায়।" (ফুরকান-৭২)

আসলে মুমিন ব্যক্তির জন্য জীবনের প্রতিটি মূহুর্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে প্রতিটি সময় হিসাব-নিকাশ করে চলে। কেননা আল্লাহ তাআলা তার

প্রতিটি মূহূর্তের হিসাব নেবেন। মুমিনের জন্য প্রতিটি মূহূর্ত একজন পরিক্ষার্থীর মতো মূল্যবান। পরীক্ষার্থী যেমন পরীক্ষার হলে প্রশ্নপত্র হাতে পাবার পর পরীক্ষায় আশানুরূপ ফলাফল লাভের জন্য প্রতিটি প্রশ্নের যথাযত উত্তর দেবার মাধ্যমে প্রতিটি মূহূর্তকে কাজে লাগায়, সে আজেবাজে কথা লিখে বা চিন্তা করে সময় কাটায় না। অনুরূপভাবে একজন মুমিন ব্যক্তিও দুনিয়ার এ জীবনের প্রতিটি মূহূর্তকে সঠিকভাবে ও যথাযতভাবে কাটায়। সে চিন্তা করলে কল্যাণকর চিন্তা করে, কথা বললে কল্যাণকর ও গ্রহণযোগ্য কথা বলে, কাজ করলে উপকারী কাজ করে। সে গীবত, পরনিন্দা, পরচর্চা ও চোগলখোরী করে বেড়ায় না। সে হাটে-বাজারে, দোকানে বা রাস্তায় বসে বাজে আড্ডা দেয় না। সে বাজে বা অশ্লীল কোন কাজ করে না। সে গল্প করে, কিন্তু অর্থহীন অশ্লীল গল্প-গুজব করে না। সে হাসি-তামাসা ও রসিকতা করে, কিন্তু তাৎপর্যহীন হাসি-তামাসা ও রসিকতা করে না। সে বিতর্ক করে, কিন্তু অশ্লীল কথা ব্যবহার করে ঝগড়া বিবাদ করে না। সে যে সমাজে গান-বাজনা, রং-তামাসা, অশ্লীল গালি-গালাজ, অন্যায় অভিযোগ, মিথ্যা দোষারোপ, লজ্জাহীন কথা-বার্তার চর্চা হয় সেই সমাজ তার জন্য গাত্রদাহ এবং আযাব বলে মনে হয়। এসব ব্যক্তিদের সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ اِسْلَامُ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيْهِ অর্থাৎ "মানুষ যখন অনর্থক এবং অপ্রয়োজনীয় বিষয়াদি ত্যাগ করে তখন তার (দ্বীন) ইসলাম সৌন্দর্যমণ্ডিত হতে থাকে।" একারণেই আয়াতে একে কামেল মুমিনদের বিশেষ গুণ বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

এসব বান্দাহ্দের জন্য জান্নাতে আল্লাহ্ তাআলার অসংখ্য নিয়ামতের মধ্যে একটি বড় নিয়ামত হলো–

لَا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً

"সেখানে তারা কোনো প্রকার অর্থহীন বাজে কথা-বার্তা শুনতে পাবে না।" (সূরা গাশিয়া)

তৃতীয় গুণ ঃ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ অর্থাৎ "যারা যাকাত বা পবিত্রতার কাজে কর্মতৎপর।" 'যাকাত' দেয়া এবং 'যাকাতের' পন্থায় কর্মতৎপর হবার মধ্যে অর্থের দিক দিয়ে বেশ পার্থক্য রয়েছে। এই আয়াতে

মুমিনদের বৈশিষ্ট্য হিসেবে কুরআনের প্রচলিত وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ বা وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ এর কথা না বলে لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُوْنَ বলে বিশেষ ধরনের কথা বলা হয়েছে। এটা বলার পেছনে বেশ তাৎপর্য রয়েছে।

আরবী ভাষায় زَكٰوةٌ শব্দের দু'টি অর্থ– একটি 'পবিত্রতা' আর অপরটি 'বৃদ্ধি'। অর্থাৎ একটা জিনিসের উন্নতি লাভের পথে যেসব বাধা-বিপত্তি আছে, তা দূর করা এবং উহার মূল জিনিসকে বৃদ্ধি করা। এ দুটি ধারণার সমন্বয়ে 'যাকাত' সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা সৃষ্টি হয়।

আর ইসলামী পরিভাষায় উহার ব্যবহার হয় দু'টি অর্থে। একটি সেই মাল-সম্পদ, যা পবিত্রতা অর্জনের জন্য হিসাব করে আলাদা করা হয়। আর দ্বিতীয়টি খোদ এই পবিত্রতা অর্জনের কাজ। যদি يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ বলা হয়, তবে তার অর্থ হবে, তারা পবিত্রতা অর্জনের জন্য নিজের মাল-সম্পদের একটা অংশ দেয়। এতে শুধু মাল দেয়া পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থকে। কিন্তু যদি বলা হয় لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُوْنَ তবে তার অর্থ হবে তারা পবিত্রতা বা তাযকিয়ার বিধানের কাজ করছে। এতে কেবলমাত্র যাকাত আদায় করার অর্থই বুঝাবে না; বরং এর মানে ব্যাপক অর্থে বুঝাবে। যেমন–

* সে তার মন ও দেহের পবিত্রতা অর্জন করে।
* সে তার চরিত্রের পবিত্রতা অর্জন করে।
* সে তার জীবনের পবিত্র-পরিচ্ছন্নতা অর্জন করে।
* সে তার পরিবারকে পবিত্র বা তাযকিয়া করে।
* সে সমাজ এবং রাষ্ট্রকে তাযকিয়ার কাজে ভূমিকা রাখে।
* আর সে তার ধন-সম্পদেরও যাকাত আদায়ের মাধ্যমে ধন-সম্পদের পবিত্রতা অর্জন করে। ইত্যাদি।

মোট কথা মুমিন ব্যক্তি সে তার ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং ধন-সম্পদের পবিত্রতা বা পরিশুদ্ধির কাজে আত্মনিয়োগ করে। এক কথায় সে নিজেকেও পবিত্র করে এবং অন্য লোককেও পবিত্র করার কাজ আঞ্জাম দেয়। আল্লাহ তাআলা সূরা আ'লায় বলেন ঃ

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ۝ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ۝

অর্থাৎ "কল্যাণ ও সফলতা লাভ করলো সে, যে পবিত্রতার কাজ করলো এবং নিজের রবের নাম স্মরণ করে নামায পড়লো।" আল্লাহ্ তাআলা সূরা শামসে আরও বলেন : قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا অর্থাৎ "সফলকাম হলো সে, যে নিজের নফসকে পবিত্র বা তায্‌কিয়া করলো। আর ব্যর্থ হলো সে, যে নিজেকে কলুষিত করলো।

তবে আলোচ্য আয়তটি এ দু'টি আয়াত থেকে বেশী অর্থপূর্ণ। কেননা এ দু'টি আয়াতে শুধুমাত্র নিজের নফসের পবিত্রতা অর্জনের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে নিজের এবং গোটা সমাজ জীবনের পবিত্রতা বা পরিশুদ্ধির গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

চতুর্থ গুণ : وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ অর্থাৎ "যারা তাদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে।" মুমিনদের চতুর্থ গুণ বা বৈশিষ্ট্য হলো তারা নিজেদের স্ত্রী এবং অধীনস্থ দাসীদের ছাড়া সব রকমের নারী ভোগ থেকে যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে।

حٰفِظُوْنَ এর দু'টি অর্থ রয়েছে– (১) নিজের দেহের লজ্জাস্থানকে ঢেকে রাখে, উলঙ্গপনাকে প্রশ্রয় দেয় না এবং নিজের লজ্জাস্থানকে অপর লোকের সামনে প্রকাশ করে না। (২) তারা নিজেদের পবিত্রতা ও সতীত্বকে রক্ষা করে।

اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۝

অর্থাৎ "তবে যদি তারা তাদের স্ত্রী এবং মালিকানাধীন দাসীদের সাথে যৌন কামনা পূরণ করে তবে তারা তিরস্কৃত হবে না।" তবে এখানে একটা ইঙ্গিত আছে যে, এই প্রয়োজনকে প্রয়োজনের সীমার মধ্যে রাখতে হবে– জীবনের লক্ষ্য বানানো যাবে না। মাঝখানে একথা বলার আসল উদ্দেশ্য হলো– লজ্জাস্থানের 'হেফাজত' করার কথা বলার ফলে যে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল তা দূর করা। অতীতকাল থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত এক শ্রেণীর লোক আছে যারা যৌন শক্তিকে একটা খারাপ কাজ মনে করে। তারা মনে করে দ্বীনদার এবং পরহেজগার লোকদের জন্য এ খারাপ

কাজ করা ঠিক নয়। যদি "সফলকামী ঈমানদার লোকেরা নিজেদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে" এই কথা বলেই ক্ষান্ত হতো তা হলে প্রচলিত এই ভূল ধারণাকে সাপোর্ট দেয়া হতো। তাই মাঝখানে আল্লাহ তাআলা একথা বলে এটা পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, নিজের স্ত্রীদের এবং শরীয়ত সম্মত অধীনস্থ দাসীদের সাথে যৌন খাহেস পূরণ করলে কোনো দোষের কাজ হবে না।

فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ অর্থাৎ "বিবাহিত স্ত্রী অথবা শরীয়ত সম্মত দাসীর সাথে শরীয়াতের নিয়মানুযায়ী যৌন কামনা-বাসনা পূরণ করা ছাড়া কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার আর কোনো পথ বৈধ নয়। আর যারা একাজ করে তারাই হবে সীমালংঘনকারী।" যেমন–

* যিনা যেমন হারাম, তেমনি হারাম নারীকে বিয়ে করাও যিনার মধ্যে গণ্য হবে।

* স্ত্রী অথবা দাসীর সাথে হায়েয-নেফাস অবস্থায় কিংবা অস্বাভাবিক পন্থায় সহবাস করা হারাম।

* পুরুষ অথবা বালক অথবা জীব-জন্তুর সাথে যৌন ক্ষুধা মিটানো হারাম।

* অধিকাংশ তাফসীরবিদদের মতে হস্ত মৈথুনও এর অর্ন্তভূক্ত।

* তাছাড়া যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি করার মতো কোনো অশ্লীল কাজ করা। এসব কিছুই সীমালংঘনের মধ্যে গণ্য হবে।

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ অর্থাৎ "যারা তাদের আমানতসমূহ এবং ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।"

এখানে পঞ্চম ও ষষ্ঠ দু'টি গুণের কথা বলা হয়েছে।

পঞ্চম গুণ ঃ اَمٰنٰتٌ 'আমানাত' শব্দটির অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। এর আভিধানিক অর্থে এমন প্রতিটি বিষয় শামিল, যার দায়িত্ব কোনো ব্যক্তি বহন করে এবং সে বিষয়ে কোনো ব্যক্তির উপর আস্থা রাখা যায় ও ভরসা করা যায়। এখানে অনেক বিষয় জড়িত বিধায় 'আমানাত' শব্দটি বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে।

এতে দু' ধরনের আমানত সংক্রান্ত কথা বলা হয়েছে।

(১) হক্কুল্লাহ্ বা আল্লাহ্র হক সংক্রান্ত আমানত।

(২) হক্কুল ইবাদ বা বান্দার হক সংক্রান্ত আমানত।

● **হুক্কুল্লাহ বা আল্লাহর হক সংক্রান্ত আমানত হলো-**

(১) খেলাফত বা প্রতিনিধি সংক্রান্ত আমানাত। আল্লাহ তাআলা মানব জাতিকে তার খেলাফতের দায়িত্বের আমানাত দিয়ে পঠিয়েছেন। আল্লাহ্ সূরা বাকারায় বলেন-"إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً" "নিশ্চয় আমি (মানুষকে) আমার প্রতিনিধি হিসাবে (দুনিয়াতে) পাঠাতে চাই।" সুতরাং আল্লাহ্র এই খিলাফতের আমানত রক্ষা করা প্রতিটি বান্দার জন্য বড় ধরনের দায়িত্ব।

(২) শরীয়াতে আরোপিত সকল ফরয ও ওয়াজিব যেমন- নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি আল্লাহ্র হক। বিধায় তা ঠিকমত পালন করা এবং যাবতীয় হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা হলো আল্লাহ্র হকের আমানত।

● **বান্দার হক বা অধিকার সংক্রান্ত আমানত হলো-**

(১) টাকা-পয়সার আমানত। যদি কেউ কারো কাছে টাকা-পয়সা আমানাত হিসেবে জমা রাখে তাহলে তা ঠিকমত হেফাজাত করা এবং চাওয়ামাত্র কোন প্রকার গড়িমসি না করে তাৎক্ষণিক ফেরৎ দেয়া।

(২) ধন-সম্পদের আমানাত। যদি কেউ কারো কাছে কোন ধন-সম্পদ বা জমি জায়গার দলিলপত্র গচ্ছিত রাখে, তাহলে তা ঠিকমত হেফাজত করা এবং তা ব্যবহার না করা (হ্যাঁ যদি দাতা ব্যবহার করার অনুমতি দেয় তবে ব্যবহার করা যাবে।) এবং চাওয়ামাত্র টালবাহানা না করে তা ফেরৎ দেয়া।

(৩) গোপন কথার আমানত। কেউ যদি কাউকে বিশ্বাস করে কোনো গোপন কথা বলে, তাহলে তা গোপন রাখাই হলো কথার আমানত হেফাজত করা।

যদি কেউ কারো গোপন কথা ফাঁস করে দেয় তার পরিণতি সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) বলেনঃ "যে ব্যক্তি তার অপর কোন ভাইয়ের গোপন কথা প্রকাশ করে দেয় তাহলে আল্লাহ তাআলাও কিয়াতের দিন তার গোপন তথ্য ফাঁস করে দেবেন।"

(৪) মজুর, শ্রমিক এবং চাকুরী জীবিদের জন্য যে সময় এবং কাজ নির্দ্ধারণ করে দেয়া হয় তা যথাযতভাবে পালন করা তার দায়িত্বের আমানত। এর মধ্যে নিজের কাজ করা এবং সময় দেয়া আমানতের খেয়ানত। কামচুরি এবং সময় চুরি বিশ্বাসঘাতকতার শামিল। এ ব্যাপারে তাকে আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করতে হবে। মহানবী (সাঃ) বলেন ঃ

وَعَبْدُ الرَّجُلُ رَاعٍ عَلٰى مَالِ سَيِّدِهٖ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُ

অর্থাৎ "কোনো লোকের চাকর বা কর্মচারী তার মালিকের সম্পদ এবং দায়-দাযিত্বের রক্ষক এবং সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে (কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র কাছে) জিজ্ঞাসিত হবে।" (বুখারী, মুসলিম)

(৫) দায়-দায়িত্বের আমানাত। সাংগঠনিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে যার যে দয়িত্ব আছে তা যথাযতভাবে পালন করা তার জন্য আমানাত। প্রতিটি দায়িত্বের জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। রাসূল বলেনঃ

اَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَتِهٖ فَالاِمَامُ الَّذِىْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَتِهٖ

"সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমরা প্রত্যেকেই (আল্লাহ্‌র দরবারে) আপন আপন দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। রাষ্ট্র নায়ক যিনি তিনি তার অধিনস্থদের এবং তার দায়-দায়ত্বের রক্ষক। তিনি তার দায়-দায়িত্ব এবং অধিনস্থ নাগরিকদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন।" (বুখারী, মুসলিম)

(৬) সংগঠন বা সমাজের কোন সম্পদের আমানত। যদি কোন নেতার কাছে সংগঠনের বা সমাজের কোনো সম্পদ থাকে সেটা রক্ষণাবেক্ষণকরা তার জন্য বড় ধরনের আমানাত। সুতরাং এই সম্পদের যতেচ্ছা ব্যবহার না করে তা যথাযতভাবে ব্যবহার এবং সংরক্ষণ করতে হবে।

(৭) গণতান্ত্রিক দেশে ভোটারদের ভোটের বা মতামতের আমানত। এই ভোটের ক্ষমতা যথাযত এবং যথা যায়গায় প্রয়োগ করা ভোটের বা মাতামতের আমানাত। এটা আমরা গুরুত্ব না দিলেও আমরা ভোটের বা মতামতের ক্ষমতা যার পক্ষে প্রয়োগ করলাম সে যদি কল্যাণকর কাজ

করে তবে তার প্রতিদান আল্লাহর কাছে পাওয়া যাবে। আবার যদি সেই প্রতিনিধি অন্যায় এবং খোদাদ্রোহী কাজ করে তবে তারও অন্যায়ের শাস্তির অংশ ভোগ করতে হবে।

মোট কথা মু'মিনের জন্য প্রতিটি বিষয়ের আমানাত সঠিকভাবে হেফাজত বা সংরক্ষণ করা ঈমানের পরিচয়। যদি কেউ আমানাত রক্ষা করতে ব্যর্থ হয় তার সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهٗ "তার ঈমান নেই যার মধ্যে আমানাতদারী নেই।" (বায়হাকী)

ষষ্ঠ গুণ ঃ عَهْدٌ ওয়াদা বা অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি পালন করা। অঙ্গীকার দু'ধরনের হতে পারে। ঃ

প্রথমতঃ দ্বিপাক্ষিক চুক্তি, অর্থাৎ যে চুক্তির মধ্যে দু'টি পক্ষ থাকে এবং উভয় পক্ষই একটা বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হয়। তবে উভয়েরই সেই চুক্তি পালন করা অপরিহার্য। কেউ এর খেলাপ করলে তা বিশ্বাসঘাতকতা বা প্রতারণার মধ্যে গণ্য হবে।

দ্বিতীয়তঃ অঙ্গীকার, ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি। অর্থাৎ একতরফাভাবে একজন অন্যজনকে কোনো কিছু দেবার বা কোনো কাজ করে দেবার ওয়দা করা। এরূপ ওয়াদা পূর্ণ করাও শরীয়তের দৃষ্টিতে জরুরী এবং অপরিহার্য। হাদীসে আছে- اَلْعِدَةُ الدَّيْنُ অর্থাৎ "ওয়াদা এক প্রকার ঋণ।" ঋণ আদায় করা যেমন অতীব জরুরী তেমনি ওয়াদা পূরণ করাও জরুরী।

তবে যদি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি বা একতরফা ওয়াদা কোন কারণে পালন করতে সমস্য দেখা দেয় তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সাথে আলাপ করে তার সম্মতির ভিত্তিতে রিভিউ করা বা সময় বাড়িয়ে নেয়া ওয়াদা খেলাপের মধ্যে গণ্য হবে না।

আমরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন কাজে-কামে ওয়াদা করে থাকি, যেমন- পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি, স্বামী-স্ত্রীর সাথে একে অপরে ওয়াদা করে থাকি, যাকে আমরা খুবই হালকা করে দেখে থাকি। যদি এই ওয়াদা পূরণ করা না হয়, তাহলে প্রতারণার পর্যায়ে পড়ে যাবে। তাছাড়া চাকরী-বাকরী, লেন-দেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, সাংগঠনিক এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন কাজে ওয়াদা করে থাকি যা পালন করা অবশ্যকরণীয় কর্তব্য। অথচ দেখা যায় প্রতিনিয়ত এরকমের অসংখ্য ওয়াদা করা হচ্ছে এবং তার খেলাফও

করা হচ্ছে। এর মূল কারণ হলো ওয়াদা পালনের যে গুরুত্ব রয়েছে তার সম্পর্কে চেতনা কম। অথচ এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যা দ্বীনদারীর সাথে সম্পৃক্ত। এ ব্যাপারে মহানবী (সাঃ) বলেন ঃ

وَلاَ دِيْنَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ

অর্থাৎ "তার দ্বীনদারী নেই যার ওয়াদা ঠিক নেই।" (বায়হাকী)

সপ্তম গুণ ঃ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلٰوتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ অর্থাৎ "যারা তাদের নামাযে যত্নবান।" নামাযে যত্নবান হবার অর্থ হলো নামাযের পাবন্দী করা এবং প্রত্যেক মোস্তাহাব ওয়াক্তে আদায় করা। (রুহুল মা'আনী)

এখানে صَلٰوةٌ শব্দটি বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ এখানে পাঁচ ওয়াক্তের নামায বোঝানো হয়েছে। যেগুলো মোস্তাহাব অর্থাৎ আওয়াল ওয়াক্তে যথাযতভাবে পাবন্দী সহকারে আদায় করা বোঝায়।

মু'মিনদের গুণাবলীর মধ্যে প্রথমে বলা হয়েছে, তারা নামায বিনয়ের সাথে মনোনিবেশ সহকারে আদায় করে। তাই এখানে صَلٰوةٌ শব্দটি একবচন ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ এখানে নামাযের জাত হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। তাই সে নামায ফরয অথবা ওয়াজিব কিম্বা সুন্নত অথবা নফল নামায হোক– নামায মাত্রেরই প্রাণ হচ্ছে বিনয়-নম্রভাবে আদয় করা।

এখানে নামাযসমূহের 'সংরক্ষণ' হলো– নামাযের বাইরের এবং ভিতরের যাবতীয় নিয়ম নীতি যথাযতভাবে পালন করা। যেমন–

✷ নামাযের পূর্বশর্তগুলো যেমন– শরীর, পোশাক, নামাযের স্থান (জায়নামায) ইত্যাদি পাক-পবিত্র হওয়া।

✷ সময় মতো মোস্তাহাব ওয়াক্তে, অর্থাৎ আওয়াল ওয়াক্তে নামায পড়া। হাদীসে রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ

اَلْوَقْتُ الْاَوَّلُ مِنَ الصَّلٰوةِ رِضْوَانُ اللّٰهِ وَالْوَقْتُ الْاٰخِرُ عَفْوُ اللّٰهِ

অর্থাৎ "নামায ওয়াক্তের প্রথম সময়ে আদায় করলে আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভ করা যায় এবং শেষ সময় আদায় করলে আল্লাহ্‌র ক্ষমা পাওয়া যায় (অর্থাৎ

শেষ ওয়াক্তে নামায পড়লে সন্তুষ্টি পাওয়া যায় না, কেবল গুনাহ্ থেকে বাঁচা যায় মাত্র)।" (তিরমিযী)

✱ মসজিদে জামায়াতের সাথে নামায আদায় করা। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ لَا صَلٰوةَ اِلَّا بِالْجَمَاعَةِ অর্থাৎ "জামায়াত ছাড়া নামায কল্পনা করা যায় না।"

✱ শুদ্ধ, ধীর স্থির ভাবে দোআ-কালাম পাঠ করা।

✱ নামাযের রোকন যেমন– রুকু, সিজ্‌দাহ্‌, কিয়াম এবং বৈঠক ইত্যাদি মনোযোগের সাথে ধীর-স্থিরভাবে আদায় করা।

✱ খুশূ-বিনয়-নম্র এবং মনোনিবেশ সহকারে নামায আদায় করা।

✱ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয়ভাবে নামায প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নামাযের হেফাজত করা। মুয়াত্তা ইমাম মালেকের হাদীসের কিতাবে আছে, হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর সমস্ত গভর্ণরদের কাছে এই মর্মে নির্দেশ জারি করেছিলেন যে,

اِنَّ اَهَمَّ اُمُوْرِكُمْ عِنْدِى الصَّلٰوةُ فَمَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا حَافِظَ دِيْنَهُ وَمَنْ ضَيَّعُهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا اَضْيَعُ

অর্থাৎ "তোমাদের যাবতীয় দায়-দায়িত্বের মধ্যে নামাযই হলো আমার কাছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং যে সাবধানতার সাথে নিজের নামায আদায় করলো এবং (অন্যদের) নামাযের তত্ত্বাবধান করলো সে যেনো তার পূর্ণ দ্বীনের হেফাজাত করলো। আর যে নামাযের খেয়াল রাখলো না তার পক্ষে অন্যান্য দায়িত্ব পালনে খেয়ানত আদৌ অসম্ভব কিছু নয়।"

সর্বপরি নামায হেফাজাত করা না করার মধ্যে আখেরাতের মুক্তির এবং ধ্বংসের কারণ রয়েছে। এ সম্পর্কে মহানবীর হাদীস। একদিন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাযের হেফাজাত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন ঃ "যে লোক নামায সঠিকভাবে হেফাজাত করবে, তার এ নামায কিয়ামতের দিনে তার জন্যে আলো, দলীল ও মুক্তির কারণ হবে এবং যে তা সঠিকভাবে হেফাজাত করবে না, তার জন্যে নামায কিয়ামতের দিনে আলো, দলীল কিংবা মুক্তির কারণ হবে না। আর ঐ ব্যক্তি হাশরের দিনে

কারুন, ফেরাউন ও উবাই ইবনে খালফের ন্যায় কাফেরদের সাথে উঠবে। (আহমদ, দারেমী, বায়হাকী)

এখানে বিবেচ্য বিষয় এই যে, মুমিনদের সাতটি গুণ নামায দিয়েই শুরু করা হয়েছে এবং নামায দিয়েই শেষ করা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, নামায এমন একটি ইবাদাত যা পরিপূর্ণভাবে এবং পাবন্দী ও নিয়ম-নীতির সাথে আদায় করলে অন্যান্য যাবতীয় গুণগুলো আপনা-আপনি নামাযির মধ্যে সৃষ্টি হতে থাকবে।

আলোচ্য আয়াতগুলোতে চিন্তা করলে দেখা যায়, উল্লিখিত সাতটি গুণের মধ্যে আল্লাহ্র ও বান্দার যাবতীয় হক বা অধিকার এবং এ সম্পর্কিত সব বিধি-বধান প্রবৃষ্ট হয়ে গেছে। যেসব ব্যক্তি এসব গুণে গুণান্বিত হয়ে যাবে এবং এতে অবিচল অটল থাকবে সে কামেল মুমিন হবে এবং ইহকাল ও পরকালের সাফল্যের হকদার হয়ে যাবে।

أُولٰئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

উল্লিখিত সাতটি গুণে গুণান্বিত লোকদেরকে এই আয়াতে জান্নাতুল ফেরদাউসের ওয়ারীশ বা উত্তরাধীকারীর ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এখানে এজন্য উত্তরাধীকারী বলা হয়েছে যে, মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তি যেমন উত্তরাধিকরীদের জন্য প্রাপ্য ও অনিবার্য হয়ে যায় তেমনি এসব গুণের অধিকারী মুমিন ব্যক্তিদের জন্য জান্নাত প্রবেশও সুনিশ্চিত হয়ে যায়।

আল্লাহ্ তাআলা এখানে জান্নাতের কথা বলতে গিয়ে জান্নাতুল ফেরদাউসের কথা বলেছেন। জান্নাতের যে আটটি স্তর রয়েছে তার মধ্যে সর্বউত্তম স্তর হচ্ছে জান্নাতুল ফেরদাউস। যেহেতু মুমিনদের এই সাতটি গুণ বিশেষ গুণ সে কারণে তাদের জন্য বিশেষ জান্নাত "ফেরদাউসের" ওয়াদা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজের জন্য এবং তার উম্মতদেরকে জান্নাত কামনার জন্য উত্তম জান্নাত চাওয়ার বাণী শিখিয়ে দিয়ে বলেছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ الْفِرْدَوْسَ

"হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে জান্নাতুল ফেরদাউস কামনা করছি।"

শিক্ষা ঃ সূরা মু'মিনুনের প্রথম ১১টি আয়াতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে যেসব শিক্ষা পাওয়া যায় তা হলোঃ

* ঈমানদার হবার জন্য ঈমানের যেসব শর্ত রয়েছে তা যথাযতভাবে মানতে হবে। অর্থাৎ অন্তরে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি এবং বাস্তব জীবনে তা প্রয়োগ করতে হবে।

* যে নামাযই হোক না কেনো তা আল্লাহ্কে হাজির নাজির জেনে খুশূ-খুজু ও মনোযোগের সাথে ধীর-স্থিরভাবে আদায় করতে হবে।

* আজে-বাজে এবং অকল্যাণকর কথা, কাজ এবং চিন্তা থেকে দূরে থেকে কল্যাণকর এবং আখেরাতমুখী কথা, কাজ, ও চিন্তা করতে হবে। প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহর স্মরণে অতিবাহিত করতে হবে।

* ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও ধন-সম্পদের পবিত্র ও পরিশুদ্ধির জন্য আত্মনিয়োগ করতে হবে।

* অবৈধ পথে যৌনক্ষুধা না মিটিয়ে বৈধ স্ত্রীর সাথে বৈধ পথে যৌন চাহিদা মিটাতে হবে। তবে একে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বানানো যাবে না। তাছাড়া যৌন সুড়সুড়ি সৃষ্টি হয় এমন কোনো কাজে বা পরিবেশে নিজেকে জড়ানো যাবে না। বেহায়াপনা ও অশ্লীল কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে। জেনার যে মূল দরজা পর্দা, তা ঠিকমত মেনে চলতে হবে।

* আল্লাহর পক্ষ থেকে হোক আর মানুষের পক্ষ থেকে হোক আমানত সমূহ যথাযতভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

* দ্বিপাক্ষিক চুক্তি হোক আর একপক্ষ থেকে ওয়াদা হোক তা যথাযতভাবে মেনে চলতে হবে এবং ওয়াদা ও চুক্তি মতো আদায় করতে হবে।

* পাঁচ ওয়াক্ত নামায হেফাজতের জন্য নিজে যথাযতভাবে যথা সময়ে জামায়াতের সাথে মনোনিবেশ সহকারে নামায আদায় করতে হবে। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ভাবে নামায প্রতিষ্ঠার জন্য বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

* সর্বপরি উপরোক্ত আমলগুলো বিশুদ্ধ নিয়্যাত এবং নিষ্টার সাথে কেবলমাত্র আল্লাহ্কে রাজী-খুশী করে জান্নাতুল ফেরদাউস পাবার আশায়

করতে হবে। সাবধান থাকতে হবে যাতে করে মনের মধ্যে কোনোভাবেই রিয়া বা লোক দেখানোর মনোভাব সৃষ্টি না হয়।

আহ্বান ঃ প্রিয় ভায়েরা আমি আপনাদের সামনে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত সূরা আল-মু'মিনুনের ১-১১ নং আয়াতের যে দারস পেশ করলাম, এতে আমার অজান্তে যদি ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যায় তার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে কায়মনোবাক্যে ক্ষমা চাচ্ছি। আর আজকের এই দারসে মুমিনদের যেসব গুণের কথা জানতে পারলাম তা যেনো আল্লাহ পাক আমাদের জীবনে পালনের তৌফিক দেন। আর এরই বিনিময়ে আমাদরকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করেন। আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। [দারস শেষ করার সময় এভাবে আহ্বান জানিয়ে সালাম দিয়ে শেষ করবেন।]

তিন

বাড়িতে ঢোকার শিষ্টাচার

সূরা নূর- ২৭-২৯ আয়াত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَا اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ۚ وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ○ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ○

সরল অনুবাদ ঃ এরশাদ হচ্ছে (২৭) হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজের বাড়ি ছাড়া অন্যদের বাড়ীতে ঢোকে পড়ো না, যতক্ষণ না তোমরা অনুমতি নাও অথবা আলাপ পরিচয় না করো এবং বাড়ির লোকজনকে সালাম না করো। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম (পথ), যাতে তোমরা স্মরণ রাখো বা উপদেশ গ্রহণ করো। (২৮) তবে যদি তোমরা বাড়ীতে কাউকে না পাও, তাহলে তাতে ঢোকে পড়ো না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদেরকে (ঢোকার) অনুমতি না দেয়া হয়। আর যদি তোমাদেরকে (ভিতর থেকে) বলা হয় 'ফিরে যাও' তবে তোমরা ফিরে যাবে। এতে তোমাদের জন্য অনেক পবিত্রতা রয়েছে এবং তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ তা ভালোভাবেই জানেন। (২৯) তোমাদের জন্য কোন দোষ বা

পাপ হবে না যদি তোমরা এমন বাড়ীতে ঢোকো, যে বাড়ীতে কেউ বসবাস করে না, যাতে তোমাদের জরুরী এবং প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র আছে। আর আল্লাহ ভালো করেই জানেন তোমরা যা প্রকাশ করো এবং যা গোপন করো।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ يَاَيُّهَا - ওহে। اَلَّذِيْنَ - যারা। اٰمَنُوْا - তোমরা ঈমান এনেছো। لَا تَدْخُلُوْا - তোমরা প্রবেশ করো না। بُيُوْتًا - বাড়িগুলোতে। غَيْرَ - অন্য, অপর, ছাড়া। بُيُوْتِكُمْ - তোমাদের বাড়িসমূহ। حَتّٰى - যতক্ষণ পর্যন্ত। تَسْتَاْنِسُوْا - তোমরা অনুমতি গ্রহণ করো। تُسَلِّمُوْا - তোমরা সালাম করবে। عَلٰى - উপর। اَهْلِهَا - তার অধিবাসী। ذٰلِكُمْ - এটা তোমাদের জন্য। خَيْر - উত্তম। لَعَلَّكُمْ - যাতে তোমরা। تَذَكَّرُوْنَ - তোমরা স্মরণ রাখবে বা উপদেশ গ্রহণ করবে। فَاِنْ - অতঃপর যদি। لَمْ تَجِدُوْا - তোমরা না পাও। فِيْهَا - উহাতে। اَحَدًا - কাউকে। فَلَا تَدْخُلُوْهَا - তাতে প্রবেশ করবে না। يُؤْذَنَ - অনুমতি দেয়া হয়। لَكُمْ - তোমাদের জন্য। اِنْ - যদি। قِيْلَ لَكُمْ - যদি তোমাদেরকে বলা হয়। اِرْجِعُوْا - তোমরা ফিরে যাও। هُوَ - এটা। اَزْكٰى - অতি পবিত্র, বিশুদ্ধতম। تَعْمَلُوْنَ - তোমরা কাজ করো। عَلِيْمٌ - জানেন, অবগত আছেন। لَيْسَ - নেই। عَلَيْكُمْ - তোমাদের উপর। جُنَاحٌ - পাপ, দোষ, গুনাহ। غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ - যে ঘরে কেউ বসবাস করে না, বসতিহীন। مَتَاعٌ - দ্রব্য সামগ্রী। تُبْدُوْنَ - তোমরা প্রকাশ করো। تَكْتُمُوْنَ - তোমরা গোপন করো।

সম্বোধন ঃ উপস্থিত সম্মানিত ইসলামপ্রিয় দ্বীনদার/ইসলামী আন্দোলনের কর্মী/ ভাইয়েরা/বোনেরা/ভাই ও বোনেরা। আসসালামু আলাইকুম অয়া রাহমাতুল্লাহি অয়া বারাকাতুহু। আমি আপনাদের সামনে দারসে কুরআন পেশ করার জন্য পবিত্র কালামে হাকীম আল কুরআনের সূরা নূর এর ২৭ থেকে ২৯ নং পর্যন্ত মোট তিনটি আয়াত তিলাওয়াত এবং তরজমা করেছি। আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা যেনো আমাকে সঠিকভাবে এবং

সহীহ্ সালামতে শেষ পর্যন্ত দারসে কুরআন পেশ করার তাওফীক দান করেন। আমিন। অমা তাওফিকী ইল্লা বিল্লাহ্। [উপস্থিত শ্রোতাদের এভাবে সম্বোধন করবেন]

সূরার নামকরণ ঃ সুরা আন-নূরের নামকরণ সম্পর্কে তাফসীরকারকগণ বলেন ঃ এই সূরার ৫ম রুকুর ২৫ নং আয়াত– اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ "আল্লাহ মহাকাশ ও পৃথিবীর নূর।" এখানে উল্লেখিত نُوْرٌ শব্দটি থেকে এই সূরার নামকরণ করা হয়েছে। এর মানে এই যে, এটা সে সূরা যাতে نُوْرٌ শব্দটি উল্লেখ রয়েছে। নূর মানে জ্যৌতি বা আলো। 'নূর' এমন জিনিসকে বুঝায় যার সাহায্যে জিনিসগুলো প্রকাশিত ও উদ্ভাসিত হয়। অর্থাৎ যা নিজেই প্রকাশ হয় এবং অন্যান্য জিনিসকেও আলোকিত করে। অপর দিকে কিছু বুঝতে না পারার অবস্থাকে বলা হয় অন্ধকার, মেঘাচ্ছন্ন, আলোবিহীন। ইসলাম আসার আগে "আইয়্যামে জাহেলিয়াত" বা 'অন্ধকার যুগে' সমাজে যেসব কাজ-কাম হতো সেগুলো সমাজকে অন্ধকার ও কুসংস্কারে ঘিরে রেখেছিলো। সূরা নূরে সেসব অসামাজিক কাজ-কামকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে অন্ধকারকে আলোতে পরিণত করেছে। জাহেলী যুগের অন্ধকার সমাজকে সভ্যতা ও আলোর মুখ দেখিয়েছে সূরা নূরের কঠোর বিধি-বিধান ও নিয়ম-কানুন। সুতরাং বলা যায় যে এই সূরার বিষয়ের সাথে নামের বেশ মিল রয়েছে।

সূরাটি নাযিলের সময়কাল ঃ সর্ব সম্মত মতে সূরাটি মাদানী। এই সূরাটি বনীল মুস্তালিক যুদ্ধ শেষ হবার পর নাযিল হয়েছে এ ব্যাপারে সবাই একমত। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, পঞ্চম হিজরীর শা'বান মাসে মহানবী (সাঃ) কাফের বনী মুস্তালিক গোত্রের বিরুদ্ধে এক অভিযান চালিয়েছিলেন। উক্ত অভিযান হতে ফিরে আসার একমাস পরই এ সূরার কিছু অংশ নাযিল হয়। অবশ্য কারো কারো মতে ষষ্ঠ হিজরীতে নাযিল হয়েছে। তবে প্রসিদ্ধ তাফসীরকারকদের মতে সূরা নূরের সমস্ত অংশই পঞ্চম হিজরীতে নাযিল হয়েছে বলে এক মত পোষণ করেন। (তাফসীরে বাহরুল মুহীত)

তবে পঞ্চম হিজরী হোক আর ষষ্ঠ হিজরী হোক না কেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর মাদানী জীবনের মাঝামাঝি সময় সূরাটি নাযিল হয়।

বিষয়বস্তু ঃ সূরা নূরে পর্দার চূড়ান্ত বিধানসহ সমাজ সংস্কার ও সংশোধনের জন্য অনেকগুলো হেদায়েত এবং সামাজিক বিধি-বিধান ও নিয়ম-কানুন নাযিল করা হয়েছে। কেননা স্বামী, স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, বাপ-মা, ভাই-বোন ও চাকর চাকরানী ইত্যাদি এক অন্নভুক্ত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গড়ে উঠে পরিবার। আর পরিবার হচ্ছে সমাজেরই ভিত্তি। পরিবার থেকেই শুরু হয় মানুষের সামাজিক জীবন। আর সমাজ জীবনের সুষ্ঠতা ও সুস্থতা নির্ভর করে সুন্দর এবং সুষ্ঠু সামাজিক নিয়ম-নীতি ও বিধি-বিধানের উপর। আল্লাহ পাক সূরা নূরের প্রথম দিকে এমন সব বিধি-বিদান লিখে দিয়েছেন যাতে করে সমাজে কোন প্রকার খারাবী সৃষ্টি হলে এর প্রতিরোধ করা যায় এবং দূর করা যায়। আর সূরার শেষের দিকে এমন সব নিয়ম-কানুন ও উপদেশ দিয়েছেন যার মাধ্যমে সমাজে দোষ-ত্রুটি ও পাপের সব পথ বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

সূরা নূরে যেসব সামাজিক বিধি-বিধান ও নিয়ম-নীতি সমূহ রয়েছে তা হলো–

(১) ব্যভিচারের শাস্তির বিধান, (২) ব্যভিচারী নারী-পুরুষের বিবাহ সংক্রান্ত আইন, (৩) মিথ্যা অপবাদের শাস্তির বিধান, (৪) স্বামী-স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ সংক্রান্ত 'লিআনের' বিধান, (৫) ভিত্তিহীন এবং ওড়ো খবর প্রচারকারীর শাস্তির বিধান, (৬) অপরের বাড়ীতে প্রবেশের নিয়ম-নীতি, (৭) পুরুষ-নারী উভয়ের চোখের নযরের সংযম এবং লজ্জাস্থানের হেফাজতের বিধি-বিধান, (৮) মেয়ে লোকদের সৌন্দর্য প্রকাশের বেলায় পর্দা সম্পর্কে বিধান, (৯) অবিবাহীত নারী-পুরুষের বিবাহের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত বিধান। (১০) দাস-দাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার বিধান, (১১) বেশ্যাবৃত্তি সংক্রান্ত আইন-কানুন, (১২) পারিবারিক শিষ্টাচার সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন, (১৩) বৃদ্ধা নারীদের পর্দার বিধান, (১৪) মেহমানদারী ও ইসলামের উদারতা সংক্রান্ত নিয়ম-নীতি, (১৫) সামাজিক কাজে অংশ নেয়া এবং বিনা অনুমতিতে বিরত না থাকার নিয়ম-নীতি এবং (১৬) ভদ্রোভাবে একে অপরকে আহবান বা ডাকা সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন।

পরিশেষে বলা যায় যে, সূরা নূরের বর্ণিত সামাজিক বিধি-বিধান এবং নিয়ম-নীতিসমূহ নাযিল করার মূল উদ্দেশ্যই হলো মুসলিম সমাজকে সব

রকমের খারাবী সৃষ্টির বিস্তার লাভ হতে রক্ষা করা। আর যদি কোন ঘটনা ঘটেও যায় তবে তাড়াতাড়ি তা রোধ করা।

আলোচ্য আয়াতের বিষয়বস্তু ঃ

দারসের আলোচ্য আয়াতের বিষয়বস্তু হলো একে অপরের ঘর বা বাড়ীতে ঢোকার নিয়ম-নীতি, বিধি-বিধান।

শানে নুযূল ঃ অত্র আয়াত অবতরণের উপলক্ষ ছিলো এই যে, একজন আনসার মহিলা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর দরবারে হাজির হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার বাড়ীতে কোনো কোনো সময় এমনভাবে থাকি যে, সে অবস্থায় কেউ আমাকে দেখতে পাক আমি তা চাই না। কিন্তু আমার লোকজনের মধ্যে কেউ না কেউ এমন অবস্থায় বিনা অনুমতিতে আমার ঘরে ঢোকে পড়ে। এখন আমি কি করবো? তখন মহিলাদের পর্দা রক্ষার জন্য এই সূরার ২৭ নং আয়তটি নাযিল হয়।

ব্যাখ্যা ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَاط

"হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য কারো ঘরে প্রবেশ করো না; যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা অনুমতি নাও এবং বাড়ীওয়ালাদের প্রতি সালাম করো।"

আল্লাহ্ তাআলা আয়াতে অপরের ঘরে বা বাড়ীতে অনুমতি না নিয়ে ঢোকতে মানা করে দেয়ার মাধ্যমে বাড়ীতে ঢোকার অনুমতি নেয়ার বেশ কিছু নিয়ম-পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। কেননা অনুমতি চাওয়ার পেছনে বেশ কিছু রহস্য এবং উপকারিতা রয়েছে।

আল কুরআনের আলোকে সামাজিকতার গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম-নীতি হলো কারো সাথে দেখা করতে গেলে প্রথমে অনুমতি নেয়া এবং অনুমতি ছাড়া ঘরে বা বাড়ীতে না ঢোকা। আল্লাহ পাক সকল মানুষকে বসবাসের জায়গা দিয়েছেন। তা নিজের বাড়ি হোক অথবা ভাড়া বাড়ি হোক। সকল অবস্থায় তার ঘরই হলো আবাসস্থল। আবাসস্থলের আসল উদ্দেশ্য হলো শান্তি ও আরাম-বিরাম। এ সম্পর্কে আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, جَعَلَ لَكُمْ

مِنْ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا "আল্লাহ তোমাদের বাড়ি তোমাদের জন্য শান্তি ও আরামের জায়গা করেছেন।" এ শান্তি ও আরাম তখনই ঠিক থাকতে পারে যখন মানুষ অন্য কারো হস্তক্ষেপ ছাড়াই নিজ বাড়ীতে নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী স্বাধীনভাবে কাজ-কাম ও বিশ্রাম নিতে পারে। তার স্বাধীনতার উপর বাধা সৃষ্টি করা ঘরের আসল উদ্দেশ্যকে পণ্ড করে দেয়ার নামান্তর। এটা খুবই কষ্টের কথা। ইসলাম কাউকেও অহেতুক কষ্ট দেয়া হারাম করেছে। আর এ অনুমতি নেয়ার মধ্যে বেশ উপকারিতাও রয়েছে। যেমন—

প্রথম উপকার ঃ অনুমতি চাওয়া বিধানের মধ্যে প্রথম উপকার হচ্ছে মানুষের স্বাধীনতায় বাধা সৃষ্টি ও কষ্ট দেয়া হতে আত্মরক্ষা করা, যা প্রতিটি সম্মানি মানুষের যুক্তিসঙ্গত কর্তব্যও বটে।

দ্বিতীয় উপকার ঃ সাক্ষাৎ প্রার্থী ব্যক্তি যখন অনুমতি নিয়ে ভদ্রভাবে দেখা করবে, তখন প্রতিপক্ষও তার বক্তব্য খেয়াল করে শুনবে। তার কোনো অভাব বা প্রয়োজন থাকলে তা পূরণ করার উৎসাহ তার অন্তরে সৃষ্টি হবে। এর বিপরীতে অভদ্র ভাবে কোন ব্যক্তির উপর বিনা অনুমতিতে চড়াও হয়ে গেলে সে তাকে হঠাৎ বিপদ মনে করে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় বিদায় করে দিতে চেষ্টা করবে এবং সহানুভূতির প্রেরণা থাকলে তা নিস্তেজ হয়ে যাবে। অপরদিকে আগন্তুক ব্যক্তি মুসলমানকে কষ্ট দেয়ার পাপে পাপী হবে।

তৃতীয় উপকার ঃ নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা দমন। কেননা অনুমতি ছাড়া কারো ঘরে বা বাড়ীতে ঢোকলে গায়ের মোহরেম (যার সাথে বিবাহ করা জায়েজ) এমন মেয়ে লোকের উপর দৃষ্টি পড়া এবং অন্তরে কোনো কুভাব সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়। এদিকে লক্ষ্য করেই অনুমতি নেয়ার বিধানগুলোকে আল্লাহ পাক জেনা-ব্যভিচার, মিথ্যা তহমত প্রভৃতির শাস্তির বিধি-বিধান সংলগ্ন বর্ণনা করেছেন।

চতুর্থ উপকার ঃ মানুষ মাঝে মাঝে নিজের বাড়ীতে নিরিবিলি অবস্থায় এমন কাজ করে, যা অপরকে জানানো পছন্দ করে না। যদি কেউ অনুমতি ছাড়া ঘরে ঢোকে তা হলে ভিন্ন লোকজন তার গোপন বিষয় সম্পর্কে জেনে ফেলে। কারো গোপন ব্যাপার জবরদস্তি করে জানার চেষ্টা করাও গুনাহ এবং অপরের জন্য কষ্টের কারণ।

তাই আল্লাহ তাআলা দুনিয়া এবং আখেরাতের অগণিত কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রেখে পরের বাড়ীতে ঢোকার নিয়ম-নীতি এবং বিধি-বিধান অত্র আয়াত নাযিল করে জানিয়ে দিয়েছেন।

একে অপরের ঘর বা বাড়ীতে ঢোকার নিয়ম-নীতিগুলো নীচে ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করা হলো ঃ

এক ঃ আয়াতে يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا "হে মুমিনগণ" বলে পুরুষ লোকদের সম্বোধন করা হলেও মেয়ে লোকেরাও এই বিধানের মধ্যে শামিল। সাহাবীদের স্ত্রীরা এ আয়াতের আলোকে অনুমতি নেয়ার বিধান মেনে চলতেন।

হযরত উম্মে আয়াস (রাঃ) বলেন, আমরা চারজন মেয়েলোক প্রায়ই হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর ঘরে যেতাম। আমরা প্রথমে তাঁর অনুমতি চাইতাম। তিনি অনুমতি দিলে আমরা ভিতরে ঢোকতাম।

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, অন্য কারো ঘরে বা বাড়ীতে ঢোকার আগে নারী-পুরুষ, মুহরিম (যার সাথে বিবাহ হারাম) ও গায়ের মুহরিম (যার সাথে বিবাহ জায়েজ) সকলেরই অনুমতি নিতে হবে। আর এ নিয়মটি সবার জন্যই মঙ্গলজনক।

حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا

দুই ঃ অর্থাৎ "যতক্ষণ তোমরা ঢোকার অনুমতি না নাও এবং ঘরের বা বাড়ির লোকজনকে সালাম দাও।"

এখানে অনুমতি নেবার জন্য দু'টি কাজের কথা বলা হয়েছে। এ দু'টি কাজ না করে কারও ঘরে বা বাড়ীতে ঢোকা ঠিক নয়।

(ক) কাজ দুটির মধ্যে প্রথমটি হলোঃ প্রীতি বিনিময় করা বা পরিচিত হওয়া বা অনুমতি নেয়া। ঘরবাড়ীতে ঢোকার আগে অনুমতি নিলে বা পরিচয় হলে ভিতরের লোকজন সতর্ক হতে পারে। আগন্তুকের সাথে ভাব-বিনিময়ের মধ্য দিয়ে সম্পর্ক ঘনিষ্ট হয় এবং আগমনকারীর ব্যাপারে আতংক বা ভয় কেটে যায়।

(খ) দ্বিতীয় কাজ হলো ঃ ঘরের বা বাড়ীর লোকজনকে সালাম দেয়া।

অনুমতি আগে না সালাম আগে এ বিষয়ে কিছু মতামত আছে তা হলো ঃ

ইমাম কুরতুবীর মতে প্রথমে অনুমতি নিয়ে তার পর ঘরে বা বাড়ীতে ঢোকার সময় সালাম দেবে।

মাওয়ারদী বলেন, যদি অনুমতি নেবার আগেই বাড়ির কোনো লোকজনের সাথে দেখা হয়ে যায়, তাহলে প্রথমে সালাম দেবে, এরপর অনুমতি চাইবে। দেখা না হলে প্রথমে অনুমতি চাইবে। অনুমতি পাওয়া গেলে পরে ঢোকার সময় সালাম দেবে।

কিন্তু বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় যে, বাইরে থেকে প্রথমে সালাম দিতে হবে। তারপর নিজের নাম পদবী থাকলে পদবীসহ স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে বলবে যে, অমুক দেখা করতে চায়।

অনুমতি নেবার সুন্নত তরীকা ঃ

ইবনে জরীর এবং আবু দাউদ শরীফের হাদীসে উল্লেখ রয়েছে একবার এক ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ) এর নিকট এসে দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি করতে লাগলো। বলতে লাগলো– أَ أَلِجُ "আমি ভিতরে আসবো কি?" নবী (সাঃ) তাঁর খাদেমকে বললেন ঃ লোকটি অনুমতি নেবার নিয়ম জানে না। বাইরে গিয়ে তাকে নিয়ম শিখিয়ে দাও। সে বলুক ঃ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَ أَدْخُلُ অর্থাৎ সালাম করার পর বলবে যে, আমি কি ভিতরে আসতে পারি? খাদেম বাইরে যাবার আগেই লোকটি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কথা শুনে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَ أَدْخُلُ বললো। অতঃপর তিনি তাকে ভিতরে ঢোকার অনুমতি দিলেন। (ইবনে কাসীর)

আবু দাউদ শরীফে উল্লেখ রয়েছে– "কালাদা ইবনে হুম্বল নামক এক ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ) এর কাছে কোনো কাজের জন্য এসে সালাম না দিয়েই বসে পড়লো। নবী করীম (সাঃ) বললেন ঃ "বাইরে যাও এবং আসসালামু আলাইকুম বলে ভিতরে আসো।"

বায়হাকী হযরত জাবের (রাঃ) এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর এ উক্তি বর্ণনা করেছেন– لَا تَأْذَنْ لِمَنْ لَا يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ অর্থাৎ "যে প্রথমে সালাম করে না তাকে ভিতরে ঢোকতে অনুমতি দিও না।" (মাযহারী)

ইমাম বোখারী আদাবুল মুফরাদ কিতাবে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ)

থেকে বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি আগে অনুমতি চায়, তাকে অনুমতি দিও না। কারণ, সে সুন্নত তরীকা ত্যাগ করেছে। (রুহুল মা'আনী)

মোট কথা এসব হাদীস থেকে জানা যায় যে, আয়াতে যে সালামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা অনুমতি চাওয়ার সালাম। অনুমতি পাবার জন্যে বাইরে থেকে এ সালাম করা হয়, যাতে ঘরের ভেতরের লোকজন এদিকে খেয়াল করে এবং অনুমতি চাওয়ার বাক্য শোনে। ঘরে বা বাড়ীতে ঢোকার সময় যথারীতি আবার সালাম করতে হবে।

তিন. নিজের নাম উচ্চারণ করে অনুমতি চাওয়া ঃ অনুমতি চাওয়ার সময় অথবা ভিতর থেকে নাম জানতে চাইলে নিজের নাম স্পষ্টভাবে বলতে হবে। আবু দাউদ শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে; হযরত উমর (রাঃ) যখন রাসূল (সাঃ) এর খেদমতে হাজির হতেন তখন বলতেন–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيَدْخُلُ عُمَرَ۔ অর্থাৎ "সালামের পর বললেন, উমর ঢোকতে পারে কি?"

সহীহ মুসলিম শরীফে আছে, হযরত আবু মূসা হযরত উমর (রাঃ) এর কাছে গিয়ে অনুমতি চাওয়ার জন্যে বললেন– اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ هٰذَا اَبُوْ مُوْسٰى اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ هٰذَا الْاَشْعَرِيُّ

এখানে তিনি সালাম দেয়ার পর প্রথমে নিজের নাম আবু মূসা বলেছেন, এরপর আরো নির্দিষ্ট করে বুঝানোর জন্য আশআরী বলেছেন। এর কারণ এই যে, অনুমতি প্রর্থীকে না চেনা পর্যন্ত নির্ভিগ্নে জবাব দেয়া যায় না।

চারঃ দরজার কড়া নেড়ে বা কলিং বেল টিপে নিজের নাম বলাঃ দরজার কড়া নেড়ে বা কলিং বেল বাজিয়ে অনুমতি চাওয়া যাবে। তবে কড়া এতো জোরে নাড়া উচিৎ নয়, যাতে ঘরের লোকজন চমকে উঠে। কড়া নাড়া বা কলিং বেল বাজানোর সময় নিজের নাম বলতে হবে। অথবা ভিতর থেকে পরিচয় জানতে চাইলে আমি আমি না বলে নিজের নাম বলতে হবে। আবু দাউদ শরীফের হাদীসে রয়েছে– "হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রাঃ) বলেন, আমি আমার মরহুম আব্বার ঋণ সম্পর্কে কথা বলার জন্য নবীজির দরবারে গিয়েছিলাম। আমি দরজার কড়া নেড়ে খট খট শব্দ করলে তিনি ভিতর থেকে জানতে চাইলেন– কে? তখন আমি

বললাম, 'আমি'। এতে রাসূল (সাঃ) দুই তিনবার বললেনঃ 'আমি' 'আমি' 'আমি' বললে কি পরিচয় বোঝা যাবে? এ হাদীস থেকে জানা গেলো যে, পরিচয় জানতে চাইলে স্পষ্টভাবে নিজের নাম না বলা বা চুপচাপ থাকা বা 'আমি' 'আমি' বলা ঠিক নয়।

পাঁচ ঃ অনুমতি নিতে গিয়ে ঘরের ভিতর তাকানো বা উঁকি ঝুঁকি মারা যাবে না ঃ নবী করীম (সাঃ) এর নিজের নিয়ম ছিলোঃ "যখন তিনি কারো কাছে যেতেন, তখন দরজার সামনে দাঁড়াতেন না। কেননা সেকালে দরজায় পর্দা ঝুলানো হতো না। তিনি দরজার ডানে অথবা বামে সরে দাঁড়িয়ে ঢোকার অনুমতি চাইতেন।" (আবু দাউদ)। রাসূল (সাঃ) এর খাদেম হযরত আনাস (রাঃ) বলেনঃ একবার এক ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ) এর হুজরার বাহির হতে তাকালো। তখন নবী করীম (সাঃ) এর একটি তীর ছিলো। তিনি সেই লোকটির দিকে এমনভাবে আগিয়ে গেলেন যে, মনে হচ্ছিলো তিনি তিরটি লোকটির পেটে ঢুকিয়ে দেবেন। (আবু দাউদ) অন্য হাদীসে আছে রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ مَنِ اطَّلَعَ دَارَ قَوْمٍ بِغَيْرِ اِذْنِهِمْ فَفَقَؤُا عَيْنَهُ فَقَدْ هَدَرَتْ عَيْنَهُ - "যে কেউ অন্যের ঘরে উঁকি মারবে, যদি ঘরের লোকেরা তার চোখ ফুটা করে দেয়, তবে সেই জন্য তার কোনো দোষ হবে না।"

হযরত হুযাইল ইবনে শুরাহ্‌বীল বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ) এর দরজার উপর দাঁড়িয়ে ভিতরে ঢোকার অনুমতি চাইলে তিনি বললেন ঃ সরে দাঁড়াও, অনুমতি চাওয়ার নির্দেশ তো এজন্য যে ভিতরে যেনো চোখ না পড়ে।"

ছয় ঃ ফিকাহ্‌বিদদের মতে ঘরের ভিতর নযর দেয়ার মতো ঘরের মধ্য থেকে বা বাইরে থেকে কারো গোপন কথা শুনাও অবৈধ। এজন্য অন্ধ লোককেও ঘরে অনুমতি নিয়ে ঢোকতে হবে। কারণ সে চোখে না দেখলেও কানে গোপন কথা শুনতে পাবে।

সাত ঃ অনুমতি ছাড়া কারো চিঠি পড়াও অবৈধ। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন ঃ

مَنْ نَظَرَ فِىْ كِتَابِ اَخِيْهِ بِغَيْرِ اِذْنِهِ فَاِنَّمَا يَنْظُرُ فِىْ

النَّارِ (ابو داؤد)

"যে লোক তার কোন ভাইয়ের চিঠি তার অনুমতি না নিয়ে পড়লো, সে যেনো ঠিক জাহান্নামের দিকে তাকালো।"

আট ঃ আপন মা, বোন ও স্ত্রীর ঘরে ঢোকতেও অনুমতি নিতে হবে ঃ ইমাম মালিক তাঁর মুয়াত্তা কিতাবে বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করলো, নিজের মায়ের নিকট যেতেও কি আমি অনুমতি চাইবো? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। সে বললো, আমি ছাড়া তো তার খেদমতের জন্য আর কেউ নেই, এখন কি আমি প্রত্যেক বারই অনুমতি চাইবো? তখন রাসূল (সাঃ) বললেনঃ اَتُحِبُّ اَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً

"তুমি কি তোমার মাকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখা পছন্দ করবে?"

অপর এক হাদীসে আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ

عَلَيْكُمْ اَنْ تَسْتَاْذِنُوْا عَلٰى اُمَّهَاتِكُمْ وَاَخَوَاتِكُمْ

"তোমরা তোমাদের মা-বোনদের নিকট যেতে হলেও অনুমতি নিয়ে যাবে।" (ইবনে কাসীর)

নয় ঃ কারও ঘরে বা বাড়ীতে হঠাৎ কোনো বিপদ দেখা দিলে তখন অনুমতি নেবার এ হুকুম প্রযোজ্য হবে না। যেমন আগুন লাগলে, চোর ঢোকে পড়লে বা হঠাৎ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে সাহায্য করার জন্য অনুমতি না নিয়ে ঘরে বা বাড়িতে ঢোকে পড়া যাবে।

দশ ঃ অনুমতি হয় বাড়ির মালিক নিজে দেবে, নতুবা এমন ব্যক্তি দেবে, যার অনুমতিকে বাড়ির মালিকের অনুমতি মনে করা যেতে পারে। কোনো শিশু যদি বলে, 'ঘরে আসো' তবে তার এই ডাকের উপর নির্ভর করে ঘরে ঢোকা ঠিক হবে না।

এগার ঃ অনুমতি চাওয়ায় অকারণ বাড়াবাড়ি কিংবা অনুমতি না পেলে দুয়ারে বা গেটে ধর্ণা দিয়ে থাকা যাবে না। তিনবার সালামের মাধ্যমে অনুমতি চাওয়ার পরও যদি বাড়িওয়ালার কোনো উত্তর পাওয়া না যায়, বা সে দেখা দিতে অস্বীকার করে তবে মনে কষ্ট না নিয়ে ফিরে চলে যাওয়া উচিৎ।

فَاِنْ لَمْ تَجِدُوْا فِيْهَا اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ

অর্থাৎ "সেখানে যদি কাউকেও না পাও, তবে ঘরে ঢোকবে না যতক্ষণ না তোমাকে অনুমতি দেয়া হবে।"

বার ঃ এই আয়াতে বোঝা যায় কারও শুণ্য বা খালি ঘরে ঢোকা যাবে না। অবশ্য যদি ঘরের মলিক কাউকে পূর্বে অনুমতি দিয়ে থাকে, তবে অন্য কথা। যেমন যদি আগেই বলে দেয় যে, আমি না থাকলে আপনি কামরায় বসবেন। কিংবা সে যদি অন্য যায়গা থেকে আগন্তুকের আগমনের খবর শুনে বলে যে, আপনি বসুন, আমি আসছি। নতুবা ঘরে কেউ নেই কিংবা ভিতর থেকেও কেউ উত্তর না দেয়, তাহলে ঘরে বা বাড়ীতে ঢোকা যাবে না।

وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا

"যদি তোমাকে বলা হয় ফিরে যাও, তবে ফিরে যাবে।"

তের ঃ অনুমতি না পেয়ে ফিরে যাওয়াকে খারাপ মনে করা ঠিক হবে না। কারও কাছে ঘরে বা বাড়ীতে ঢোকার অনুমতি চাওয়ার পরও যদি বলা হয়, এখন ফিরে যান, পরে দেখা করুন, তবে এতে মনে কষ্ট না নিয়ে খূশী মনে ফিরে আসা উচিৎ।

অনুমতি প্রার্থীর প্রতি এ আদেশ দেয়া হয়েছে ঘরের মালিকের সুবিধা-অসুবিধার দিকে খেয়াল রেখে। কেননা তার বিশেষ কোনো ওজর থাকতে পারে। অপরদিকে হাদীসে বাড়ির মালিককে বলা হয়েছে যে, সাক্ষাৎপ্রার্থী ব্যক্তিরও তোমার উপর হক রয়েছে। তার হক হচ্ছ- তাকে কাছে ডাকা, বাইরে এসে তার সাথে দেখা করা, তার কথা শুনা, তাকে ঘরে বসতে দেয়া, তার খায়-খাতির করা, ক্ষমতা অনুযায়ী মেহমানদারী করা। একান্ত অসুবিধা না থাকলে তাকে ফিরিয়ে না দেয়া।

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ

অর্থাৎ "তোমাদের জন্যে সেই সব ঘরে বিনা অনুমতিতে ঢোকা দোষের নয়, যেটা কারো বসবাসের জায়গা নয়, অথবা সেখানে তোমাদের

প্রয়োজনীয় ব্যবহারের কোনো জিনিস-পত্র আছে। আর আল্লাহ্ জানেন যা তোমরা প্রকাশ করো এবং যা গোপন করো।"

শানে নযূল ঃ যখন বিনা অনুমতিতে কারো ঘরে বা বাড়ীতে না ঢোকার বিধানের আয়াত নাযিল হলো, তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ নিষেধাজ্ঞার পর কুরাইশদের ব্যবসায়ী লোকেরা কি করবে? মক্কা ও মদীনা হতে সুদূর শাম দেশ পর্যন্ত তারা ব্যাবসা-বানিজ্যের জন্য সফর করে। পথের মধ্যে মাঝে মাঝে যেসব সরাইখানা আছে, তারা ওগুলোতে বিশ্রামের জন্য অবস্থান করে, যেখানে কোনো স্থায়ী বাসিন্দা থকে না, এখানে অনুমতি চাওয়ার কি উপায়? কার কাছে থেকেই বা অনুমতি নিতে হবে? তখন আল্লাহ তাআলা এই আয়াতটি নাযিল করেন। (তাফসীরে মাযহারী)।

অর্থাৎ এমন ঘরে বিনা অনুমতিতে ঢোকতে কোনো বাধা নেই; যা কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বসবাসের ঘর নয় বরং সেটাকে ব্যবহার ও সেখানে থাকার অধিকার সবার আছে। যেমন বিভিন্ন শহরে ও নগরের আসপাশে নির্মিত মুসাফিরখানা, মসজিদ, খানকাহ্ মাদ্রাসা, পাঠাগার, হাসপাতাল, রেল ষ্টেশন, হোটেল, রেস্তোরা, সরাইখানা প্রভৃতি জনকল্যাণকর ঘর বা প্রতিষ্ঠানে বিনা অনুমতিতে সকলেই ঢোকতে পারে। তবে এসব ঘরের বা প্রতিষ্ঠানের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক বা পরিচালকের দেয়া নিয়ম-নীতি অমান্য করা ঠিক হবে না।

পরিশেষে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, তোমরা যা কিছু করো এবং যে উদ্দেশ্যেই করো তোমাদের বাইরের এবং মনের সব খবর আমি রাখি। আখেরাতেও আল্লাহ্ তাআলা আমাদের আমল এবং নিয়্যাত দেখেই চূড়ান্ত ফায়সালা করবেন।

শিক্ষা ঃ সূরা নূরের ২৭-২৯ এ তিনটি আয়াত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের পর একে অপরের বাড়ীতে ঢোকার যেসব বিধি-বিধান এবং নিয়ম-নীতিগুলো জানতে পারলাম তা পুরুষ-মহিলা সকলকেই পর্দা রক্ষার জন্য এবং শালিনতা, ভদ্রতা এবং শিষ্টাচার সৃষ্টির জন্য আমাদের প্রত্যেককেই বাস্তব জীবনে আমল করা উচিত। তা নিজের বাসা-বাড়ীতে হোক অথবা অন্যের বাসা বাড়ীতে হোক না কেনো।

আহ্বান ঃ উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা/ ভাই ও বোনেরা এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে পর্দা রক্ষার জন্য এবং সামাজিক শিষ্টাচার শিক্ষার জন্য সূরা নূর থেকে যে দারস পেশ করলাম, এতে যদি আমার অজান্তে কোনো ভুল-ত্রুটি হয়ে যায়, তাহলে মহান আল্লাহ্‌র কাছে আমি ক্ষমা চাচ্ছি। আর এ দরস থেকে যেসব শিক্ষা আমরা লাভ করলাম তা আমাদের ইহকালীন কল্যাণ এবং আখেরাতের মুক্তির জন্য বাস্তব জীবনে আমল করি আল্লাহ্‌ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন। আমিন! অয়া আখিরু দাওয়ানা আনিলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্‌। [দারস শেষে এভাবে আহ্বান জানাতে হবে।]

চার

ধ্বংস বা ক্ষতি থেকে মানুষের বাঁচার উপায়

সূরা আল আসর

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْعَصْرِ ۙ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ ۙ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ؏

সরল অনুবাদ ঃ এরশাদ হচ্ছে (১) কালের শপথ, (২) নিশ্চয় (সকল) মানুষই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে, (৩) কিন্তু তারা বাদে, যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে এবং পরস্পরকে হকের নির্দেশ দেয় এবং একে অপরকে ধৈর্য ধরার উপদেশ দেয়।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ وَ – এখানে কসম বা শপথ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। الْعَصْرِ – সময় বা কাল বা যুগ। اِنَّ – নিশ্চয়। اِنْسَانَ – মানুষ। لَ – অবশ্যই। فِىْ – মধ্যে। خُسْرٍ – ক্ষতি বা ধ্বংস। اِلَّا – ছাড়া। اَلَّذِيْنَ – যারা। / – ঈমানদার। اٰمَنُوْا – এবং। وَ – এবং عَمِلُوْا – তারা আমল করে। الصّٰلِحٰتِ – সৎ কর্মশীলা (স্ত্রী লিঃ) و – এবং। وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ – পরস্পর নির্দেশ বা তাগিদ দেয় সত্যের। وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ – পরস্পর তাগীদ বা পরামর্শ দেয় সবরের।

সম্বোধন ঃ প্রিয় ইসলামী আন্দোলনের কর্মী/ দ্বীনদার মুসলমান ভায়েরা/ বোনেরা/ ভাই ও বোনেরা। আস্‌সালামু আলাইকুম অরহমাতুল্লাহি অয়া

বারাকাতুহ্। আমি আপনাদের সামনে আল-কুরআনের সবচেয়ে ছোট্ট সূরা "আল আসর" তিলাওয়াত এবং তরজমা করেছি। আল্লাহ্ তাআলা যেনো আমাকে আপনাদের সামনে সহিহ্ সালামতে দারস পেশ করার তৌফিক দান করেন। "অমা তাওফিকী ইল্লা বিল্লাহ্।"

সূরার নামকরণ ঃ সূরার প্রথম শব্দ اَلْعَصْرِ কেই এর নাম হিসেবে নেয়া হয়েছে। যার মানে- সময়, যুগ বা কাল। সূরাটিতে মানুষকে মহা ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য যেসব কাজ করার কথা বলা হয়েছে তা সময় বা কালের সাথে অত্যন্ত সঙ্গতিপূর্ণ। বিধায় কুরআন মজিদের ছোট্ট এই সূরাটির বিষয়ের সাথে নামের বেশ সম্পর্ক রয়েছে।

সূরাটি নাযিলের সময়কাল ঃ মুজাহিদ, কাতাদাহ ও মুকাতিল প্রমুখ এ সূরাটি মদীনায় নাযিল হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ তাফসীরকারক একে মাক্কী সূরা বলেছেন। সূরাটির বিষয়বস্তুর দিকে খেয়াল করলে বোঝা যায় যে, সূরাটি মাক্কী যুগের প্রথম দিকে নাযিলকৃত সূরা। কেননা এ সময় খুবই ছোট্ট ও সংক্ষিপ্ত এবং হৃদয়স্পর্শী বাক্যে ইসলামের প্রকৃত আদর্শ এবং শিক্ষা পেশ করা হতো। কেউ একবার শুনলে তা আর ভুলতো না। আর সেসবগুলো লোকজনের মুখে মুখে সবসময় লেগে থাকতো এবং অতি সহজেই পাঠ করা হতো। এই সূরাটিও ঠিক সেই সব গুণ নিয়ে নাযিল হয়। কাজেই এটা যে মাক্কী এবং প্রথম দিকের সূরা এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

সূরার মূল বক্তব্য ও বিষয়বস্তু ঃ এ সূরাটি ছোট্ট ছোট্ট আয়াত বা বাক্যের মাধ্যমে অল্প কথায় কোন্ পথে মানুষের প্রকৃত কল্যাণ এবং মুক্তি আছে আর কোন্ পথে ধ্বংস এবং বিপর্যয় রয়েছে তা স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে।

সূরার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ঃ এই সূরাটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো সাহাবাদের কাছে সূরাটির মর্ম এতো গুরুত্বপূর্ণ ছিলো যে, এ ব্যাপারে হযরত ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে হিস্ন (রাঃ) বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কোনো দু'জন সাহাবীর যখন একে অপরের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ হতো তখন তারা একে অপরে সূরা আসর পাঠ না করে বিদায় হতেন না। (তাবারানী) সূরাটির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন ঃ "যদি মানুষ

কেবলমাত্র এ সূরাটির মর্ম গভীর ভাবে চিন্তা-ভাবনা করতো, তবে এটাই তাদের হেদায়েত এবং মুক্তির জন্য যথেষ্ট হতো।" (ইবনে কাসীর)

ব্যাখ্যাঃ প্রিয় ভায়েরা আলোচ্য সূরাটি তেলাওয়াত ও তরজমাসহ প্রয়োজনীয় প্রাথমিক ধারণা দেবার পর এখন আপনাদের সামনে সূরাটির বিশেষ বিশেষ শব্দের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা পেশ করছি।

সূরাটিতে কালের বা সময়ের শপথ করে বলা হয়েছে, নিশ্চয় সকল মানুষই ক্ষতি বা ধ্বংসের মধ্যে রয়েছে। তবে যাদের মধ্যে চারটি গুণ রয়েছে কেবলমাত্র তারাই (ক্ষতি থেকে) রক্ষা পেতে পারো। সে চারটি গুণ হলো- (ক) ঈমান (খ) সৎ কাজ (গ) একে অপরকে হকের নসীহত করা এবং (ঘ) পরস্পরকে সবুর করার জন্য উপদেশ দেয়া। আল্লাহ তাআলার এই সংক্ষিপ্ত কথার মধ্যে যে ব্যাপক তাৎপর্য এবং ভাব রয়েছে তা জানার জন্য এগুলোর প্রত্যেকটির আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

وَالْعَصْرِ "অল আস্‌র" শব্দটির প্রথম অক্ষর و (অয়াও) শপথের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। একে "অয়াও-এ-কাস্‌মিয়া" বলা হয়। আল্লাহ্ তাআলা কুরআন মজিদের বিভিন্ন স্থানে তাঁরই কোনো সৃষ্টির নামে শপথ করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা কোনো জিনিসের শপথ করলে সেই জিনিসটির গুরুত্ব বুঝানোর জন্য করেন না। বরং তিনি যে কথাটি বলতে চান সেই জিনিস তার সত্যতা প্রমাণ করে বলেই তিনি তার শপথ করেন। সুতরাং এখানে 'কালের' নামে শপথ করার অর্থ হলো এই সূরায় যে চারটি গুণের কথা বলা হয়েছে যাদের মধ্যে এই চারটি গুণ আছে সে সব লোক ছাড়া বাকি সবাই যে মহাক্ষতি ও ধ্বংসের মুখোমুখি- কাল, সময় ও স্রোত তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

اَلْعَصْرِ। 'আল আসর'- সময় বা কাল বা যুগকে বুঝায়। এটা অতীত কালকেও বুঝায় আবার বর্তমান কালকেও বুঝায়। এতে বর্তমান বলে কোনো দীর্ঘ সময় নয়। প্রতিটি মুহূর্তই সাইকেলের চাকার মতো ঘূর্ণায়নমান। প্রতিটি ভবিষ্যত মুহূর্তকে বর্তমান এবং বর্তমানকে অতীত বানিয়ে দিচ্ছে। এখানে কালের শপথের মধ্যে উভয় কালকেই বুঝানো হয়েছে।

চলমান সময় ও স্রোতের শপথ করার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝার জন্য প্রথমতঃ যে বিষয়টি মনে রাখা দরকার তা হলো এই যে, কালের যে অংশটা এখন চলছে তা আসলে দুনিয়ায় কাজ করার জন্য প্রতিটি ব্যক্তি এবং প্রতিটি জাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া সময় বা সুযোগ। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, পরীক্ষার হলে পরীক্ষার্থীকে প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য সময় বেঁধে দেয়া হয়। সে সেই নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগায়। ফলে সে ভাল ফলাফলের মাধ্যমে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। অনুরূপ ভাবে আল্লাহ তাআলা দুনিয়ায় প্রতিটি মানুসের হায়াত বা আয়ুষ্কাল নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। সেই নির্ধারিত আয়ুষ্কালের মধ্যেই মানুষ যদি পরীক্ষার্থীর মতো প্রতিটি মুহূর্তকে কল্যাণকর এবং সঠিক পথে কাজে লাগায় তাহলে সেও সফলতার মাধ্যমে আখেরাতের মহাক্ষতি থেকে বাঁচতে পারবে। সুতরাং মহা ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য যে ভালো কাজ করতে হবে তা বেঁধে দেয়া আয়ুষ্কালের মধ্যেই করতে হবে। এতে বুঝা যায় যে, সময়ই হলো আমাদের জীবনের আসল মূলধন। অথচ এটা দ্রুত গতিতে অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। ইমাম রাযী (রঃ) এ বিষয়ের উদাহরণ হিসেবে একজন মনীষীর উক্তি উল্লেখ করেছেন; উক্তিটি হলো এই "একজন বরফ বিক্রেতার কথা হতেই আমি সূরা আল আসর এর অর্থ বুঝতে পারছি। যেমন বরফ বিক্রেতা বাজারে দাঁড়িয়ে চিৎকার দিয়ে বলছেঃ দয়া করো এই ব্যক্তির উপর যার মূলধন গলে শেষ হয়ে যাচ্ছে। অনুগ্রহ করো সেই ব্যক্তির প্রতি যার পুঁজি ফুরিয়ে যাচ্ছে। সেই ব্যক্তির চিৎকার শুনে আমি বললামঃ অল-আসরে ইন্নাল ইনসানা লা-ফী খুসরীন-এর এটাই তো অর্থ।" ফলে মানুষকে যতটা আয়ুষ্কাল দেয়া হয়েছে, তা বরফ গলার মতো অতি দ্রুত গলে শেষ হয়ে যাচ্ছে। তাকে যদি অপচয় কিংবা ভুল ও অন্যায় কাজে ব্যয় করা হয়, তা হলে বুঝতে হবে, এটাই হলো মানুষের ক্ষতি-এটা ছাড়া মানুষের বড় ক্ষতি আর কিছুই হতে পারে না। সুতরাং চলমান কাল স্রোতের শপত করে এই সূরায় যে কথাটি বলা হয়েছে, তার অর্থ এই যে, এই দ্রুত গতিশীল সময় সাক্ষ্য দেয় এ চারটি গুণ হারিয়ে মানুষ যে সব কাজ করে নিজের আয়ুষ্কাল ক্ষয় করছে তা সবই ক্ষতির কারণ। এ ক্ষতি থেকে কেবলমাত্র এ সব লোকেরাই রক্ষা পাবে যারা এ চারটি কাজ করবে।

اَلْاِنْسَانْ 'আল ইনসান' শব্দটি একবচন। কিন্তু পরবর্তী বাক্য কয়টিতে চারটি গুণধারী লোকদেরকে তা হতে ব্যতিক্রম বলা হয়েছে। এখান থেকে বোঝা যায় যে, এখানে 'ইনসান' শব্দটি গোটা মানব জাতিকে বুঝাচ্ছে।

خُسْرٍ 'খুসরিন'- খাসারা (ক্ষতি) 'মুনাফা' (লাভ) এর বিপরীত অর্থে বুঝায়। কুরআন মজিদে এ শব্দটিকে একটা পরিভাষা হিসেবে নেয়া হয়েছে এবং فَلَاحْ কল্যাণের বিপরীত অর্থ বুঝাবার জন্য ব্যবহার হয়েছে।

কুরআনের এ فَلَاحْ বা কল্যাণ বলতে কেবলমাত্র বৈষয়িক কল্যাণ-ই বুঝায় না, বরং দুনিয়া থেকে আখেরাত পর্যন্ত মানুষের প্রকৃত সাফল্য বুঝাবার জন্যই ব্যবহার করে। তেমনিভাবে خُسْرٍ বা ক্ষতি শব্দটি কুরআনে বৈষয়িক ব্যর্থতা, দুরবস্থা ও বিপর্যকেই বুঝায় না, বরং দুনিয়া থেকে আখেরাত পর্যন্ত মানুষের প্রকৃত ক্ষতি, ব্যর্থতা ও বঞ্চনাকে বুঝায়। এ ব্যাপারে এ কথাটা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, আল কুরআন পরকালে মানুষের সাফল্য লাভকেই প্রকৃত কল্যাণ লাভ এবং সেখানে তার ব্যর্থতাকেই প্রকৃত 'খাসারা' বা ক্ষতি মনে করে। দুনিয়ার মানুষ সাধারণত যে জিনিসকে কল্যাণ মনে করে আসলে তা কল্যাণ নয়। উহার পরিণাম এ দুনিয়াতেই ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই হয় না। আর যে জিনিসকে লোকেরা 'খাসারা' বা ক্ষতি মনে করে, আসলে প্রকৃত পক্ষে তা ক্ষতি নয়, এ দুনিয়ায়ও তা কল্যাণের উপায় মাত্র। তাই এই সূরায় যে ক্ষতি বা ধ্বংসের কথা বলা হয়েছে তা দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় জগতের ক্ষতির কথায় বলা হয়েছে। আর এই ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য যে চারটি গুণের কথা বলা হয়েছে, সেখানে দুনিয়া ও আখেরাতের বাঁচার কথায় বলা হয়েছে।

দুনিয়া ও আখেরাতের ক্ষতি বা ধ্বংস থেকে বাঁচার উপায়ঃ

এই সূরায় মানুষের চরম ক্ষতি থেকে বাঁচার উপায় হিসেবে যে চারটি কাজের কথা বলা হয়েছে, তাহলো ঃ (ক) ঈমান, (খ) সৎ কাজ, (গ) পরস্পরকে সত্য বা হকের উপদেশ দেয়া এবং (ঘ) সবরের উপদেশ দেয়া।

এ চারটি কাজের মধ্যে প্রথম দুটি কাজ ব্যক্তিকেন্দ্রীক এবং পরবর্তী দু'টি সমাজ কেন্দ্রীক। অর্থাৎ প্রথম দুটি আত্ম সংশোধনমূলক আর পরের দু'টি সমাজের অন্যান্য মানুষের হেদায়েত এবং সংশোধনের জন্য।

ব্যক্তিগত কাজ দু'টির প্রথম কাজটি হলো ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا অর্থা 'যারা ঈমান আনে"।

ঈমান কি? কুরআন মজিদের কয়েকটি স্থানে কেবলমাত্র মুখে স্বীকার করাকে ঈমান বলা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ঈমান অর্থ খোলামনে মেনে নেয়া এবং নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করা। মোট কথা ঈমানের মাধ্যম হলো তিনটি–

(১) **তাশ্দিক বিল-জিনান**- অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস।

(২) **ইকরার বিল-লিসান**- মুখে স্বীকৃতি, বা বিশ্বাস অনুযায়ী মুখে প্রকাশ।

(৩) **আ'মাল বিল-আরকান**- বাস্তবে কাজে পরিণত।

অর্থাৎ অন্তরের বিশ্বাস অনুযায়ী মুখে প্রকাশ এবং সেই অনুযায়ী কাজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন।

ঈমানের বিষয় ঃ ঈমানের প্রধান ও মূল বিষয় হলো তিনটি।

(১) **তাওহীদে বিশ্বাস ঃ** অর্থাৎ আল্লাহ্ একক, তাঁর কোন শরীকদার নেই, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, তিনি জীবন-মৃত্যুর মালিক, তিনি রিযিক দাতা, আইনদাতা ও সকল সৃষ্টি জীবের লালন-পালনকারী। ইবাদত বন্দেগী পাবার অধিকারী একমাত্র তিনিই। ভাগ্য নির্ধারণের মালিকও তিনি। তাঁর উপরই ভরসা এবং তাওয়াক্কুল করতে হবে। তাঁর ছাড়া আর কারো কাছে কিছু চাওয়া যাবে না এবং সাহায্য চাইতে হলে তার কাছেই চাইতে হবে ইত্যাদি তাওহীদে বিশ্বাস।

(২) **রিসালাতে বিশ্বাস ঃ** নবী-রাসূল, কিতাব ও ফেরেশতা এই তিনের সমন্বয়ে হলো রিসালাত। অর্থাৎ জীবরাঈল ফেরেশতার মাধ্যমে রাসূলদের উপর ওয়াহী অর্থাৎ কিতাব নাযিল হয়। এই তিনটি বিষয়ের উপর বিশ্বাসই হলো রিসালাতে বিশ্বাস।

(৩) **আখেরাতে বিশ্বাস ঃ** অর্থাৎ মানুষের মৃত্যুর পর হতে যে জীবন আরম্ভ হয়, যেমন- কবরের সওয়াল জওয়াব, কবরের আযাব, কিয়ামত, হাশর, লৌহ্-কলম, মিজান, আমলনামা পুলসিরাত, জান্নাত ও জাহান্নাম ইত্যাদির সমন্বয়ে আখেরাত। অর্থাৎ এসব বিষয়ের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখার নামই হলো আখেরাতের উপর ঈমান।

প্রকৃত ঈমান কি? কুরআন মজীদে যে ঈমানের কথা বলা হয়েছে তা হলো সন্দেহ সংশয়মুক্ত ঈমান। সন্দেহহীনভাবে বিনা প্রশ্নে মেনে নেয়া এবং তার উপর দৃঢ়ভাবে টিকে থাকাকে প্রকৃত ঈমান বলেছে। এ সম্পর্কে সূরা হুজরাতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا ـ

"সেই সব লোকই প্রকৃত পক্ষে মুমিন, যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর আর কোনো রকম সন্দেহে পড়েনি।" (হুজরাত-১৫)

আল্লাহ্ তাআলা সূরা হা-মীম সিজদাহ্তে আরো বলেন-

إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا ـ

"নিশ্চয় যারা বলে আল্লাহই আমাদের রব। অতঃপর এই কথার উপর দৃঢ় ও অবিচল থাকে। (হা-মীম- সিজদাহ-৩০)

মুমিনের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহ্ বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ

"প্রকৃত মুমিনতো হলো সে সব লোক, আল্লাহর নাম উচ্চারণ হলে যাদের দেল (ভয়ে) কেঁপে উঠে। (সূরা আনফাল-২)

উপরোক্ত আয়াত তিনটিতে প্রমাণিত হলো যে, ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করা যাবে না, এবং তার উপর দৃঢ় ও অবিচল থাকতে হবে। আর ঈমানদারেরা যখন আল্লাহর নাম উচ্চারণ করবে তখন তাদের দেল আল্লাহর ভয়ে কেঁপে উঠবে এবং ঈমান বেড়ে যাবে অর্থাৎ ঈমান মজবুত হবে। আলোচ্য সূরায় মানুষের চরমক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য প্রথমে যে শর্তটি আরোপ করা হয়েছে তা হলো এ ধরনেরই ঈমান। যাদের মধ্যে এ ধরনের ঈমান নেই তারা কিছুতেই মহাক্ষতি হতে নিস্তার পেতে পারে না।

দ্বিতীয় কাজ ঃ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ মহা ক্ষতি থেকে বাঁচার দ্বিতীয় উপায় হলো 'আমলে সলেহ' বা সৎ আমল, নেককাজ বা ভালোকাজ কিংবা কল্যাণকর কাজ। সব রকমের নেক এবং ভালো কাজই হলো 'আমলে

সলেহ'। যেমন- আল্লাহ এবং বান্দার হক আদায় করা, মা বাপের খেদমত করা, বড়দের সম্মান করা, ছোটদের স্নেহ করা, আত্মীয়-স্বজন এবং প্রতিবেশীর অধিকার আদায় করা, চাষ-বাস, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরী-বাকরীর ক্ষেত্রে সততার পরিচয় দেয়া, প্রতিটি কাজ-কামে সুন্নত পদ্ধতি অবলম্বন করা ইত্যাদি আমলে সলেহ বা নেক কাজের মধ্যে গণ্য।

নেক কাজ কবুলের জন্য ঈমান শর্ত ঃ কুরআন মজীদে যেখানেই আমলে সালেহ বা নেক কাজের কথা বলা হয়েছে সেখানেই তার আগে ঈমানের শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে। কেননা কাজটি দেখতে যতই সুন্দর, কল্যাণকর এবং নেক মনে হোক না কেন যদি তার সাথে ঈমান সংযুক্ত না থাকে তা হলে তা আল্লাহর কাছে গ্রহণ হবে না। এ জন্য যদি কোনো অমুসলিম ভালো কাজ বা জনকল্যাণমূলক কাজ করে তবে তার প্রতিদান দুনিয়াতেই দিয়ে শেষ করা হবে। আখেরাতে বা পরকালে তা গ্রহণ করা হবে না এবং কোনো প্রকার প্রতিদানও দেয়া হবে না।

এ কারণে কুরআন মজীদে যত সুসংবাদই দেয়া হয়েছে, তা কেবলমাত্র তাদের জন্যই দেয়া হয়েছে, যারা ঈমান আনার পর নেক আমল করে। আলোচ্য সূরাই এ কথাটিই বলা হয়েছে। এ সূরার ঘোষণা অনুসারে মানুষকে ক্ষতি ও ধ্বংস হতে রক্ষার জন্য দ্বিতীয় যে গুণটি অপরিহার্য, তা হলো ঈমানের পর নেক আমল করা। মোট কথা নেক আমল ছাড়া শুধুমাত্র ঈমান মানুষকে ক্ষতি ও ধ্বংস হতে রক্ষা করতে পারবে না।

তৃতীয় কাজ ঃ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ধ্বংস বা ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য এতক্ষণ পর্যন্ত যে দুটি গুণের বা কাজের কথা আলোচনা করা হলো তা ব্যক্তিগত পর্যায়ের। প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে এদুটি গুণ থাকা অপরিহার্য। এখান থেকে বাকী যে দুটি গুণ বা কাজের কথা বলা হয়েছে তা সামষ্টিক পর্যায়ের। অর্থাৎ সামষ্টিক পর্যায়ের প্রথম কাজ বা গুণটি হলো তারা একে অপরকে হক ও সত্যের নসিহত বা উপদেশ দেয়। অর্থাৎ নিজেকেই শুধু ঈমানদার ও নেক আমলের অধিকারী হলে চলবে না। বরং ঈমানের দাবী পূরণের জন্য সমাজের অন্যান্য লোককেও সত্য পথের ও হক কাজের দাওয়াত দিতে হবে। একটা গোটা সমাজকে ঈমানের ভিত্তিতে সত্য ও ন্যায়ের অনুসারী করে গড়ে তোলার জন্য সমাজের একজন সচেতন ও

দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে এ দায়িত্ব পালন করতেই হবে। আর এ কাজটি করা কারো একার দায়িত্ব নয়, বরং সমাজে বসবাসকারী প্রত্যেকেরই একে অপরের দায়িত্ব।

حَقٌّ 'হক' শব্দটি বাতিলের বিপরীত। এ 'হক' শব্দটি সাধারণত দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথম অর্থ হলো সহীহ্ ঠিক ও নির্ভুল, সত্য এবং ইনসাফ ও সুবিচার মোতাবেক এবং প্রকৃত অবস্থার অনুরূপ কথা। সেটা ঈমান ও আকীদার কথাই হোক বা বৈষয়িক কাজ কাম সম্পর্কে কথা হোক।

দ্বিতীয় অর্থ হলো- অধিকার। এ অধিকার আল্লাহর হোক বা বান্দার হোক বা নিজের অধিকার হোক না কেনো সবই এর মধ্যে শামিল। আর এসব অধিকার এমন এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে তা যথাযথভাবে আদায় করা মানুষের অবশ্যই কর্তব্য।

'হক' নসীহত বা উপদেশ দেবার অর্থ হলো ঈমানদার লোকদের সমাজে বাতিল শক্তিকে কখনও মাথা তুলতে দেখে এবং হকের বিপরীত কোনো কাজ হতে দেখে মানুষ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারবে না। বরং তা দেখা মাত্রই প্রতিরোধ করার জন্য দলবদ্ধভাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে। পক্ষান্তরে যেই সমাজের লোকেরা এই ভূমিকা পালন করে না সেই সমাজ ক্ষতি ও ধ্বংস হতে কিছুতেই রক্ষা পেতে পারে না। এমন কি যে সব লোক ব্যক্তিগত জীবনে 'হক' নিয়ে থাকে কিন্তু সমাজের ক্ষেত্রে 'হক' বিপর্যস্ত হয়ে যেতে নীরবে দেখতে থাকে, তা রক্ষা করার জন্য কোনো চেষ্টাই করে না, এই মহা ক্ষতি হতে শেষ পর্যন্ত তারাও রক্ষা পাবে না। এ সম্পর্কে কুরআন এবং হাদীসে বর্ণনা রয়েছে। সূরা মায়েদায় এ কথাটি এভাবে বলা হয়েছে-

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ط ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ○ كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ○

"বণী ইসরাঈলদের মধ্যে যারা কাফের ছিলো তাদেরকে হযরত দাউদ এবং ঈসা ইবনে মরিয়মের মুখ দিয়ে অভিশাপ করা হয়েছে, তার কারণ এই

ছিলো যে, তাদের সমাজে প্রকাশ্যভাবে ও সাধারণ পর্যায়ে পাপ ও সীমা লঙ্ঘনের কাজ অনুষ্ঠিত হতো। কিন্তু সমাজের লোকেরা পরস্পরকে তাহতে বিরত রাখতে চেষ্টা করা ত্যাগ করেছিলো। (মায়িদা-৭৮-৭৯)

সূরা আ'রাফে এ কথাটি এভাবে বলা হয়েছে "বনী ইসলাঈলীরা (দাউদ আঃ এর যুগে) শনিবারের নিষেধ বাণীর বিরোধীতা করে যখন মাছ ধরতে শুরু করলো তখন তাদের উপর আযাব নাযিল করা হলো। সেই আযাব হতে কেবল সেই সব লোকেরাই রক্ষা পেলো যারা এই গুনাহর কাজ হতে লোকদেরকে বিরত রাখতে চেষ্টা করেছিলো।"

যারা অন্যায় কাজে জড়িত থাকে কেবল তারাই যে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তা নয়, তাদের জন্য সমাজের অন্যান্য সকলকেই ক্ষতিগ্রস্থ্ হতে হবে।

'সূরা'- আনফালে বিষয়টি এভাবে বলা হয়েছে-

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً ج وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

"রক্ষা পেতে চেষ্টা করো সেই বিপদ হতে যার আঘাত বিশেষভাবে কেবল সেই লোকদের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে না, তোমাদের মধ্য হতে যেসব লোক সেই গুনাহ্ কার্যত করেছে। অর্থাৎ সবাইকে আঘাত করবে। (২৫ আয়াত)

এ বিষয়টি হাদীস শরীফে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে- 'নবী (সাঃ) সমাজে আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা (আদেশ-নিষেধ) এর মধ্যে শিথিলতা প্রদর্শনকারীদের উদাহরণ একটি দ্বিতল জাহাজের যাত্রীদের সাথে তুলনা করে বলেনঃ একদল লোক দ্বিতল জাহাজে আরোহনের জন্য কোরা (লটারী) করলো। তাতে কারো ভাগ্যে পড়লো জাহাজের নীচের তলা আর কারো ভাগ্যে পড়লো উপরতলা। নীচের তলার লোকেরা পানির জন্য উপর তলার লোকদের কাছে যাওয়া-আসা করতে থাকায় তাদের কষ্টের ও বিরক্তের কারণ হয়ে দাঁড়ালো। তাই নীচ তলার একজন (ক্ষীপ্ত হয়ে) একখানা কুড়াল নিয়ে (পানির জন্য) নৌকার তলা ছিদ্র করতে শুরু করলো। এ দেখে উপর তলার লোকেরা এসে তাকে বললো, কি হয়েছে? তুমি এভাবে (ছিদ্র) করছো কেনো? সে জবাবে বললো, আমাদের জন্য

তোমরা কষ্ট পেয়ে থাকো, অথচ পানি আমাদের একান্ত প্রয়োজন, তাই এভাবে (পানির জন্য) ছিদ্র করছি। (রাসূল বলেনঃ) এখন (নৌকার) সবাই যদি তাকে বাধা দেয় তাহলে ঐ লোকটাকে বাঁচাতে পারবে এবং নিজেরাও (পানিতে ডুবে মরা হতে) বাঁচবে। আর যদি তাকে যা ইচ্ছে তাই করার জন্য ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে ঐ লোকটাকেও ধ্বংস করবে এবং নিজেরাও ধ্বংস হবে। (বুখারী-২৪৯১ নং হাদীস) কুরআন এবং হাদীস থেকে এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, সমাজের এক শ্রেণীর লোক খারাপ কাজ করলে সবাই মিলে তাকে বাধা দিতে হবে। নচেৎ এ কাজের জন্য সবাই ক্ষতিগ্রস্ত কিংবা ধ্বংস হয়ে যাবে।

ঠিক এ কারণেই اَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ 'সৎ কাজের আদেশ' এবং نَهِىْ عَنِ الْمُنْكَرْ 'অর্থাৎ কাজের নিষেধ' করা মুসলিম উম্মতের জন্য অবশ্য কর্তব্য করে দেয়া হয়েছে (ঈমরান-১০৪) আর যারা এ কর্তব্য পালন করে তাদেরকে সর্বোত্তম জাতি বলে আল্লাহ্ বলেন–

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ -

"তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানব জাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উত্থান হয়েছে। (ইমরান-১১০)

চতুর্থ কাজ ঃ وَتَوَا صَوْا بِالصَّبْرِ সমাজের লোকদের পরস্পরকে 'হক' বা সত্য পথের উপদেশ দেবার সাথে সাথে দুনিয়া ও আখেরাতের ক্ষতি হতে বাঁচার জন্য ঈমানদার লোক ও তাদের সমাজের উপর দ্বিতীয় যে শর্ত আরোপ করা হয়েছে তা হলো- সমাজের লোকদের পরস্পরকে 'সবর' ও 'ধৈর্য্যের উপদেশ দান করা। কেন না সমাজের কোনো লোক যখনই সত্য দ্বীন মেনে চলতে যাবে এবং হকের উপর চলা ও টিকে থাকার জন্য অন্যান্য লোকদেরকে নসিহত বা উপদেশ দেবে এবং বাতিলের উত্থানকে দমনের জন্য সক্রিয় হয়ে উঠবে, তখনই তাদেরকে বিভিন্ন বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্ঠে পড়তে হবে এবং বাতিলের পক্ষ থেকে চরম বাধার সম্মুখীন হতে হবে। এমতাবস্থায় নিজেকে এবং হক পন্থীদেরকে এসব দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ এবং বাধা-বিপত্তিকে উপেক্ষা করে হকের উপর টিকে থাকা এবং সামনের দিকে অগ্রসর হবার জন্য ধৈর্য্য ধরতে হবে এবং পরস্পরকে ধৈর্য ধারনের জন্য উপদেশও দিতে হবে।

উপরে বর্ণিত ব্যক্তিগত দু'টি এবং সামষ্টিকভাবে দু'টি মোট চারটি গুণ যদি কারো মধ্যে না থাকে, তবে নিশ্চিত ভাবে দুনিয়া এবং আখেরাতের চরম ক্ষতি বা ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত হবে। পরকালের ক্ষতি মানেই হলো জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়া।

শিক্ষা ঃ প্রিয় ভায়েরা! কুরআনের এই ছোট্ট সূরা আল আসরের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষনের পর তা থেকে যেসব শিক্ষা আমরা লাভ করতে পারি তা হলো-

● আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য যে হায়াত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তার প্রতিটি মুহূর্তেকে অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ মনে করে নেক ও কল্যাণকর কাজের মাধ্যমে অতিবাহিত করতে হবে। কোনোভাবেই সময়কে অন্যায়-অপকর্ম ও অসৎ কাছে অতিবাহীত করা যাবে না।

● আখেরাতের জীবনের কল্যাণ এবং ক্ষতিকেই প্রকৃত কল্যাণ এবং ক্ষতি মনে করতে হবে।

● দুনিয়ার সাময়িক ক্ষতি এবং আখেরাতের স্থায়ী ক্ষতি জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য নীচের দুটি ব্যক্তিগত পর্যায়ের কাজ এবং দুটি সামাজিক কাজ করতে হবে।

● **ব্যক্তিগত কাজ দুটি হলো-**

(১) নিষ্ঠাবান পূর্ণ ঈমানদার হতে হবে।

(২) জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে নেক ও সৎ আমলের মাধ্যমে অতিবাহিত করতে হবে।

● **সামাজিক অপর দুটি কাজ হলো-**

(১) সমাজকে ঈমানদার এবং পরিশুদ্ধ করার জন্য পরস্পরকে হক বা সত্য কাজ করার উপদেশ দিতে হবে এবং বাতিল শক্তির মোকাবিলা করতে হবে।

(২) সত্য ও হক কথা এবং কাজ করতে এবং বাতিলের মোকাবিলা করতে গিয়ে যতো প্রকারের দুঃখ-কষ্ট এবং বাধা-বিপত্তি আসুক না কেনো তার উপর টিকে থাকার জন্য ধৈর্য ধরার এবং সহিষ্ণুতা অবলম্বনের উপদেশ দিতে হবে।

● সর্বপরি আখেরাতের মহাক্ষতি জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য উপরোক্ত কাজগুলো সঠিকভাবে করা এবং সেই কাজের উপর টিকে থাকার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে সার্বক্ষণিক দোয়া এবং সাহায্য কামনা করতে হবে।

আহ্বান ঃ সম্মানিত ভায়েরা এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা আল আসরের যে দরস পেশ করলাম, তাতে যদি কোনো ভুল-ক্রটি হয়ে যায় এ জন্য আল্লাহ তাআল্লার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আর আখেরাতের মহাক্ষতি জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য ব্যক্তিগতভাবে এবং দলগতভাবে সূরা আসরের শিক্ষানুযায়ী কাজ করার আহ্বান জানিয়ে এবং আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করে দরস শেষ করছি। আমিন। অয়া আখেরুদাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রব্বালি আলামীন।

পাঁচ

কঠিন আযাব থেকে বাঁচার উপায়

সূরা সফ্ ঃ ১০-১৩ আয়াত

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ○ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○ وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

সরল অনুবাদ ঃ এরশাদ হচ্ছে (১০) হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসায়ের সন্ধান দেবো, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব (শাস্তি) থেকে রক্ষা করবে? (১১) তা হলো এই যে, তোমরা (ভালভাবে) ঈমান আনো আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি। আর তোমাদের নিজেদের ধন-সম্পদ এবং জান-প্রাণ দিয়ে আল্লাহর পথে জেহাদ করো। এটাই তোমাদের জন্য অতী উত্তম, যদি তোমরা (এর গুরুত্ব) বুঝ। (১২) তাহলে তিনি তোমাদের গুনাহ্-খাতা মাফ করে

দেবেন এবং এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হচ্ছে। আর চিরকাল বসবাসের জান্নাতে তোমাদের অতি উত্তম ঘর দান করবেন। এটাই বড় সাফল্য। (১৩) এছাড়া আরও অন্যান্য নিয়ামত তোমাদেরকে দান করবেন যা তোমরা পছন্দ করো। তা হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এবং খুব নিকবর্তী বিজয়। হে নবী! ঈমানদার লোকদেরকে এর সুসংবাদ জানিয়ে দিন।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ يَاَيُّهَا - ওহে, হে। اَلَّذِيْنَ - যারা। اٰمَنُوْا - ঈমান এনেছো। هَلْ - কি? اَدُلُّكُمْ - আমি তোমাদের সন্ধান দেবো। عَلٰى - উপর (এখানে সম্বন্ধে)। تِجَارَةٍ - ব্যবসা। تُنْجِيْكُمْ - তোমাদের মুক্তি দেবে। مِنْ - থেকে। عَذَابٍ - শাস্তি। اَلِيْمٍ - কষ্টদায়ক। تُؤْمِنُوْنَ - তোমরা ঈমান আনো। بِ - সাথে। وَ - ও। رَسُوْلِهٖ - তার রাসূল। وَ - এবং। تُجَاهِدُوْنَ - তোমরা জিহাদ করো। سَبِيْلِ - পথে। بِاَمْوَالِكُمْ - তোমাদের ধন-সম্পদ দিয়ে। اَنْفُسَكُمْ - তোমাদের জান-প্রাণ দিয়ে। ذٰلِكُمْ - এটাই। خَيْرٌ - উত্তম। لَكُمْ - তোমাদের জন্য। اِنْ - যদি। كُنْتُمْ - তোমরা। تَعْلَمُوْنَ - জানো। يَغْفِرْ - তিনি মাফ করবেন। لَكُمْ - তোমাদের জন্য। ذُنُوْبَكُمْ - তোমাদের গুনাহ সমূহ। يُدْخِلْكُمْ - তোমাদের প্রবেশ করাবেন। جَنّٰتٍ - বাগান বেষ্টিত (জান্নাত)। تَجْرِىْ - প্রবাহিত হয়। تَحْتِهَا - তার পাদদেশে (নীচে)। اَلاَنْهٰرُ - ঝর্ণাসমূহ। مَسٰكِنَ - বাসগৃহ সমূহ। طَيِّبَةً - উত্তম। عَدْنٍ - চিরস্থায়ী। اَلْفَوْزُ - সাফল্য। الْعَظِيْمُ - মহা। اُخْرٰى - অন্য। تُحِبُّوْنَهَا - যা তোমরা পছন্দ করো। نَصْرٌ - সাহায্য। فَتْحٌ - বিজয়। قَرِيْبٌ - আসন্ন বা নিকটে। الْمُؤْمِنِيْنَ - মুমিনদের। بَشِّرْ - সুসংবাদ দাও।

সম্বোধন ঃ সম্মানিত উপস্থিত ইসলামী আন্দোলনের কর্মী/ইসলামপ্রিয় দ্বীনদার ভায়েরা/বোনেরা/ভাই ও বোনেরা। আসসালামু আলাইকুম অয়া রাহমাতুল্লাহ্। আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কালামে হাকীম আল

কুরআনের সূরা সফ্ এর দ্বিতীয় রুকুর ১০ থেকে ১৩ মোট চারটি আয়াত তিলাওয়াত এবং বাংলা অনুবাদ করেছি। আল্লাহ্ তাআলা যেনো আমাকে আপনাদের সামনে তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর সঠিকভাবে দারস পেশ করার তৌফিক দান করেন। আমিন! অমা তাওফিকী ইল্লাহ্বিল্লাহ্।

সূরার নামকরণ ঃ অত্র সূরার ৪নং আয়াত– يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِه صَفًّا হতে এর নাম করণ করা হয়েছে। صَفْ (ছফ) শব্দের অর্থ হলো কাতারবদ্ধ বা দলবদ্ধ। অর্থাৎ এটা সেই সূরা যার মধ্যে صَفْ (ছফ) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। (সূরার নাম করণ সংক্রান্ত আরো প্রয়োজনীয় তথ্য এক নং দারসে উল্লেখ করা হয়েছে)।

নাযিল হবার সময়কাল ঃ সর্বসম্মত মতে এই সূরাটি মাদানী। তবে কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে এ সূরাটি নাযিলের সময়কাল জানা যায়নি। কিন্তু এর বিষয়বস্তু থেকে অনুমান করা যায়, সম্ভবত সূরাটি ওহুদ যুদ্ধের সমসাময়িক সময় অবতীর্ণ হতে পারে। কেননা এতে যে অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে তা এই সময়টিই বিরাজ করছিলো।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য ঃ সংক্ষেপে সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য হলো– ঈমানের ব্যাপারে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা গ্রহণ এবং আল্লাহর পথে জান-প্রাণ উৎসর্গ করার জন্য মুসলমানদেরকে উৎসাহ প্রদান।

দারসে আলোচ্য আয়াতগুলোর বিষয়বস্তু হলো– দুর্বল ঈমানদার লোকদেরকে দৃঢ় ও মজবুত ঈমানের ভিত্তিতে আখেরাতের কঠিন আযাব থেকে নাজাত, পাপ কাজের ক্ষমা, জান্নাত লাভ এবং দুনিয়ায় আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয় লাভের জন্য নিজের মাল-সম্পদ ও জান-প্রাণ দিয়ে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

শানে নুযূল ঃ তিরমিযীর হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ একদা একদল সাহাবায়ে কেরাম পরস্পর আলাপ-আলোচনা করছিলেন যে, আল্লাহ্ তাআলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল কোনটি আমরা যদি তা জানতে পারতাম, তাহলে উহা বাস্তবায়িত করতাম। বগভী (রঃ) এ প্রসঙ্গে আরও বর্ণনা করেন যে, তাঁরা কেউ কেউ একথাও বললেন যে, আল্লাহ্র কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজটি কি জানতে

পারলে আমরা তার জন্যে জান ও মাল সবকিছুই উৎসর্গ করতাম। (মাযহারী)

তাফসীরে ইবনে কাসীর মুসনাদে আহমদের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন, তাঁরা একত্রিত হয়ে পরস্পর এই আলোচনা করার পর একজনকে রাসূল (সাঃ) এর কাছে এ বিষয়ে প্রশ্ন করার জন্যে পাঠাতে চাইলেন, কিন্তু কারও হিম্মত হলো না। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদের প্রত্যেককে নামে নামে নিজের কাছে ডেকে পাঠালেন। (এতে বোঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ওহীর মাধ্যমে তাঁদের সমাবেশ ও আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত হন।) তাঁরা সবাই রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দরবারে হাজির হলে তিনি তাঁদেরকে সূরা 'ছফ' পুরোটাই পাঠ করে শুনিয়ে দিলেন, যা তখনই তাঁদের কথার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছিলো।

এ সূরা থেকে জানা যায় যে, সাহাবারা সবচেয়ে প্রিয় যে আমলটির তালাশে ছিলেন, সেটি হলো আল্লাহ্র পথে জিহাদ। তবে আল্লাহ্ তাআলা এই সূরাতেই তাঁদের এ ধরনের আগে বেড়ে আমল তালাশের সমালোচনা করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ উপস্থিত প্রিয় ভায়েরা! এতক্ষণ পর্যন্ত সূরা 'ছফ' এর তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর প্রয়োজনীয় বিবরণ দেবার পর আপানাদের সামনে অত্র আয়াতগুলোর প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা পেশ করছি।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসার কথা বলবো যা তোমাদের কঠিন আযাব থেকে নাজাত দেবে?"

এই আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা ঈমানদার লোকদের জাহান্নামের কঠিন আযাব থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে সবচেয়ে যে প্রিয় আমল জিহাদকে ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে তুলনা করেছেন। কারণ ব্যবসা-বাণিজ্য এমন জিনিস যাতে মানুষ মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে কিছু ধন-সম্পদ, সময়, শ্রম, মেধা ও যোগ্যতা পুঁজি হিসেবে বিনিয়োগ করে। এই বিষয়ের প্রতি লক্ষ

করেই এখানে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করাকে তিজারাত বা ব্যবসা-বাণিজ্য বলা হয়েছে।

ব্যবসা-বাণিজ্য যেমন মানুষকে অভাব অনটন থেকে বাঁচিয়ে দুনিয়ার কষ্ট থেকে নিস্তার দেয়, তেমনিভাবে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদও ঈমানদার লোকদেরকে পরকালে জাহান্নামের কঠিন আযাব বা শাস্তি থেকে নিস্তার দেয়।

تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ-

অর্থাৎ "তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি (ভালো করে) ঈমান আনো এবং তোমাদের জান-প্রাণ দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করো।"

ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনার জন্য যেমন অর্থ-সম্পদ, সময়, শ্রম, চেষ্টা-সাধনা, মেধা এবং যোগ্যতাকে পুঁজি হিসেবে বিনিয়োগ করতে হয়, তেমনিভাবে জিহাদ পরিচালনার জন্যও মূলধন পুঁজি হিসেবে মজবুত ঈমান, অর্থ-সম্পদ, জীবন অর্থাৎ সময়, শ্রম, চেষ্টা-সাধনা, আত্মত্যাগ ইত্যাদিকে বিনিয়োগ করতে হয়।

সূরা তাওবায় এ বিষয়টিকে এভাবে বলা হয়েছে–

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ -

অর্থাৎ "আল্লাহ্ তাআলা মুমিনদের জান ও মাল-সম্পদকে তাঁর জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন। আর তারা যুদ্ধ-জিহাদ করে আল্লাহর পথে, অতঃপর তারা (দুষমনদেরকে) মারে ও নিজেরা মরে।" (তাওবাহ ঃ ১১১)

এই আয়াতেও জিহাদকে ব্যবসার সাথে তুলনা করা হয়েছে। এই ব্যবসায় মুমিন লোকদের পুঁজি হলো তাদের জান-মাল আর আল্লাহ্‌র পুঁজি হলো জান্নাত। এখানে আল্লাহ্ মুমিনদের জান-মালকে খরিদ করার ওয়াদা করেছেন জান্নাতের বিনিময়ে।

ঈমানদারদেরকে ঈমান আনতে বলার অর্থ ঃ অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা জিহাদ করার জন্য ঈমানদার লোকদেরকে পুনরায় ঈমান আনতে বলার অর্থ হলো– খাঁটি নিষ্ঠাবান মুসলমান হতে বলা। মুখে মুখে শুধু ঈমানের দাবীকেই যথেষ্ট মনে করা ঠিক নয়, বরং যে বিষয়ের উপর ঈমান এনেছে, সেই বিষয়ের উপর টিকে থাকার জন্য সকল প্রকার ত্যাগ ও দুঃখ-কষ্ট স্বীকার করার জন্য প্রস্তুত থাকা। কেননা আখেরাতের কঠিন আযাব থেকে বাঁচার জন্য যে ব্যবসা তার মূল পুঁজিই হলো মজবুত ঈমান। নড়বড়ে, গতানুগতিক ঈমান নিয়ে জিহাদের এ ব্যবসা করা কোনো মুসলমানের পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্যই আল্লাহ্ তাআলা ঈমানদার লোকদেরকে জিহাদের জন্য প্রথমেই – تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ বলে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি মজবুত ও দৃঢ় ঈমান আনার জন্য তাগাদা দিয়েছেন।

ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ "দুনিয়ার ব্যবসায়ের তুলনায় এই জিহাদের ব্যবসায় তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমর এর গুরুত্ব বুঝো।" দেখা যায় সব সময় এক শ্রেণীর মুসলমান অতি সহজে এবং চোরা পথে আখেরাতের আযাব থেকে বেঁচে জান্নাতে যেতে চায়। অথচ কুরআন এবং হাদীসে এমন কোনো পথের সন্ধান দেয়া হয়নি যাতে সহজেই জান্নাতে যাওয়া যায়। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা সূরা আলে ইমরানে বলেন–

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ -

"তোমরা কি মনে করে নিয়েছো, তোমরা এমনিতেই জান্নাতে চলে যাবে? অথচ এখনো আল্লাহ (পরীক্ষা করে) দেখেননি তোমাদের মধ্যে কে তাঁর পথে জিহাদ করেছে এবং কে তাঁর জন্য সবরকারী।" (আলে ইমরান ঃ ১৩৮)

এ জন্যেই আল্লাহ্ তাআলা যারা প্রকৃত ঈমানদার এবং জিহাদের এই লাভবান ব্যবসার গুরুত্ব বোঝে তাদেরকে এই কথা বলেছেন যে, এটাই

জাহান্নাম থেকে বাঁচার এবং জান্নাতে যাবার উত্তম পথ যদি তোমরা এর গুরুত্ব অনুধাবন করো।

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّٰتِ عَدْنٍ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ -

অর্থাৎ "তাহলে তোমাদের অপরাধগুলো ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং এমন জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে যার নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। আর চিরদিন বসবাসের জান্নাতে তোমাদেরকে অতি উত্তম ঘর দান করবেন। এটাই বড় সফলতা।"

ব্যবসা-বাণিজ্যের যেমন উদ্দেশ্য থাকে লাভ করা বা মুনাফা অর্জনের, তেমনিভাবে জিহাদের এই ব্যবসায় ঈমানের সাথে জান-মাল আল্লাহর পথে ব্যয় করার বিনিময়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং আখেরাতে যেসব নিয়ামত পাওয়া যাবে এই আয়াতে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

আখেরাতের প্রতিদান ঃ জিহাদের প্রতিদান বা মুনাফা হিসেবে আল্লাহ তাআলা দান করবেন যা পরকালে পাওয়া যাবে। আর এটাই হলো ব্যবসায়ের আসল মুনাফা। সেগুলো হলো ঃ

- জাহান্নামের কঠিন আযাব থেকে নিষ্কৃতি।
- ঈমানদার জিহাদকারীদের সমস্ত গুনাহ মাফ করা হবে।
- তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে যার নেয়ামতসমূহ অশেষ ও চিরন্তন অবিনশ্বর।

তাছাড়া আল্লাহর পথে জিহাদ করতে গিয়ে যারা মারা যায় তাদেরকে শহীদ বলা হয়েছে। তাদের প্রতিদান সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) তাঁর বাণীতে বলেন— অল্লাহ্‌র কাছে শহীদ ব্যক্তির ছয়টি প্রতিদান রয়েছে ঃ

(১) প্রথম রক্তপাতেই তার গুনাহ্‌ মাফ করে দেয়া হবে।

(২) জান্নাতে তার স্থান তাকে দেখানো হবে।

(৩) তাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করা হবে।

(৪) বড় বিপদ-আপদ থেকে সে নিরাপদ থাকবে।

(৫) তার মাথায় আকর্ষণীয় একটা মুকুট পরানো হবে যার এক একটা মণি-মুক্তা দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা আছে তার চেয়ে উত্তম হবে। আর টানাটানা চোখওয়ালী বাহাত্তর জন হুরের সাথে তার বিয়ে দেয়া হবে। এবং

(৬) তাকে তার সত্তরজন আত্মীয়ের শাফায়াতের জন্য অনুমতি দেয়া হবে। (মিশকাত– মেকদাদ ইবনে মা'দিকারিব)

وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا ط نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ ط

"এছাড়া আরও অন্যান্য নিয়ামত তোমাদের দান করবেন যা তোমরা পছন্দ করো। তাহলো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সাহায্য এবং নিকটবর্তী বিজয়।"

দুনিয়ার প্রতিদান ঃ এই আয়াতে জিহাদকারীদের পরকালের প্রতিদানের সাথে দুনিয়াতেও কিছু প্রতিদান দেয়া হবে তার কথা বলা হয়েছে।

وَاُخْرٰى শব্দটি نِعْمَتٌ এর বিশেষণ। অর্থ এই যে, পরকালীন নেয়ামত ও উত্তম বসবাসের ঘর জান্নাত তো পাওয়া যাবেই; দুনিয়াতেও একটা নগদ নেয়ামত পাওয়া যাবে তা হচ্ছে আল্লাহর সাহায্য ও আসন্ন বিজয়। অর্থাৎ শত্রুদেরকে পরাজিত করার মাধ্যমে বিজয়।

এখানে قَرِيْبٌ শব্দটি পরকালের বিপরীতে ধরা হলে ইসলামের সকল বিজয়ই এর মধ্যে শামিল রয়েছে। আর যদি প্রচলিত অর্থে قَرِيْبٌ ধরা হয়, তবে এর প্রথম অর্থ হবে খয়বর বিজয় এবং এরপর হবে মক্কা বিজয়।

تُحِبُّوْنَهَا এখানে আল্লাহ তাআলা জিহাদকারী মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ তোমরা তো এই নগদ নেয়ামত বা প্রতিদান খুব পছন্দ করো। কারণ মানুষ স্বভাবগতভাবে নগদকে পছন্দ করে। আল-কুরআনে অন্যত্র বলা হয়েছে– وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا অর্থাৎ "মানুষ তড়িঘড়ি পছন্দ করে।" এর অর্থ এই নয় যে, পরকালের নেয়ামত বা প্রতিদান তাদের কাছে প্রিয় নয়। বরং অর্থ এই যে, পরকালের নেয়ামত তো তাদের কাছে প্রিয় কাম্যই, কিন্তু স্বভাবগতভাবে কিছু নগদ নেয়ামতও তারা দুনিয়াতে পেতে চায়, তাও দেয়া হবে।

দুনিয়ার বিজয় ও সাফল্য লাভও যে আল্লাহ তাআলার একটা বড় নেয়ামত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু মুমিন বান্দাহ্র কাছে আসল গুরুত্ব এর নয়, বরং পরকালীন সাফল্যই সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণেই দুনিয়ার এই জীবনে যে ফল লাভ হবে তার উল্লেখ পরে করা হয়েছে। আর যে ফল পরকালে পাওয়া যাবে তার উল্লেখ সর্বপ্রথম করা হয়েছে।

শিক্ষা ঃ প্রিয় ভায়েরা, সূরা 'ছফ' এর ১০ থেকে ১৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের পর যেসব শিক্ষা লাভ করা যায় তা হলো–

● পরকালের কঠিন আযাব থেকে বাঁচার একমাত্র পথই হলো বাতিলের বিরুদ্ধে আল্লাহর পথে জিহাদ করা।

● জিহাদ করার জন্য মুখে মুখে শুধু ঈমানের বুলি না আউড়িয়ে জিহাদে যে ঝুঁকি আছে তার মোকাবেলার জন্য মজবুত ও দৃঢ় ঈমানদার মুসলমান হতে হবে।

● আখেরাতের সফলতা অর্থাৎ গুনাহ মাফ ও জান্নাতের অফুরন্ত নেয়ামত ভোগ করার জন্য নিজের ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা আল্লাহ্র পথে জিহাদের জন্য যখন যা দরকার তা খরচ করা এবং সময় দান, চেষ্টা-সাধনা ও চিন্তা-ভাবনা করা এবং প্রয়োজনে আল্লাহ্র পথে জীবন দান করে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করা।

● পরকালের নেয়ামত ভোগ করার আগেই আল্লাহ্ তাআলা দুনিয়ায় নগদ নেয়ামত দানের যে ওয়াদা করেছেন তাকেই প্রকৃত সফলতা মনে না করা, বরং পরকালের চিরস্থায়ী নেয়ামতকেই প্রকৃত সফলতা মনে করা। আর দুনিয়ায় সফলতা বা বিজয়ের জন্য ব্যতিব্যস্ত এবং পেরেশান না হওয়া।

আহ্বান ঃ সম্মানিত ভায়েরা, এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা ছফ থেকে কয়েকটি আয়াতের দরস পেশ করলাম, এতে যদি আমার অজান্তে কোনো ভুল-ত্রুটি হয়ে যায় তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আর একজন মুমিনের যে চূড়ান্ত লক্ষ্য আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং আখেরাতের নাজাতের মাধ্যমে চিরস্থায়ী নেয়ামত জান্নাত লাভ, তার জন্য আমরা যেনো জিহাদকেই প্রকৃত মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে নিজের জান-মাল কোরবান করতে পারি, তার তাওফিক কামনা করে দারস শেষ করছি। আমিন!

[সালাম দিয়ে শেষ করবেন।]

ছয়
মানবতার মুক্তির জন্য জিহাদ
সূরা নিসা ৭৫-৭৬ আয়াত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ
الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ
الظَّالِمِ اَهْلُهَا ج وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ج
وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ۝ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ج وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا
يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ
الشَّيْطٰنِ ج اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ۝

সরল অনুবাদ ঃ এরশাদ হচ্ছে (৭৫) আর (হে মুমিনেরা) তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই (যুদ্ধ) করছো না সেই সব দুর্বল পুরুষ, অসহায় নারী এবং শিশুদের পক্ষে, যারা (উৎকণ্ঠার সাথে) বলে, হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে এই অত্যাচারী জনপদ থেকে উদ্ধার করো। (এরা তো খুব জালেম)! আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের (পক্ষ অবলম্বনকারী) অভিভাবক বানিয়ে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী ঠিক করে দাও। (৭৬) আর ঈমানদার তো তারাই যারা আল্লাহর পথে জেহাদ করে। আর অপর

পক্ষে যারা কাফের তারা লড়াই করে তাগুতের (শয়তানের) পক্ষে। অতএব তোমরা জেহাদ করতে থাকো শয়তানের পক্ষ অবলম্বনকারীদের বিরুদ্ধে- (দেখবে) শয়তানের চক্রান্ত অত্যন্ত দুর্বল।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ وَ – এবং। مَا – কি? لَكُمْ – তোমাদের জন্য। لَا – না। تُقَاتِلُوْنَ – তোমরা লড়াই করবে। فِىْ – মধ্যে। سَبِيْلِ – পথ। اللّٰهِ – আল্লাহ। اَلْمُسْتَضْعَفِيْنَ দুর্বলেরা। مِنْ – হতে। الرِّجَالِ – পুরুষেরা। النِّسَآءِ – নারীরা। الْوِلْدَانِ – শিশুরা। اَلَّذِيْنَ – যারা। يَقُوْلُوْنَ – তারা বলে। رَبَّنَا – আমাদের রব, প্রতিপালক। اَخْرِجْنَا – আমাদের বের করো। هٰذِهِ – এই। الْقَرْيَةِ – জনপদ (এলাকা)। ظَالِمِ – অত্যাচারী। اَهْلُهَا – তার অধিবাসী। اجْعَلْ لَنَا – আমাদের জন্য বানিয়ে দাও। لَدُنْكَ – তোমার পক্ষ থেকে। نَصِيْرًا – সাহায্যকারী। اَلَّذِيْنَ – যারা। اٰمَنُوْا – ঈমানদারেরা। يُقَاتِلُوْنَ – তারা লড়াই করে। كَفَرُوْا অবিশ্বাসীরা। الطَّاغُوْتِ – প্রত্যাখানকারী (শয়তান)। فَقَاتِلُوْا – অতএব তোমরা যুদ্ধ করো। اَوْلِيَآءَ – বন্ধু বা অভিভাবক। اِنَّ – নশ্চয়। كَيْدَ – চক্রান্ত। ضَعِيْفًا – দুর্বল।

সম্বোধন ঃ সম্মানিত ভাইয়েরা/ বোনেরা/ ভাই ও বোনেরা, আস্‌সালামু আলাইকুম অয়ারাহমাতুল্লাহি অয়াবারাকাতুহ। আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কালামে হাকীম আল কুরআনের সূরা নিসা-এর ৭৫ ও ৭৬ দু'টি আয়াত তিলাওয়াত ও বাংলায় অনুবাদন পেশ করেছি। আল্লাহ্ তাআলা যেনো আমাকে আপনাদের মাঝে সঠিক ভাবে এবং সহিহ্ সালামতে দারস পেশ করার তাওফীক দান করেন। আমিন।

নামকরণ ঃ আলোচ্য সূরার প্রথম আয়াত - وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً এর وَنِسَآءً শব্দ থেকে সূরার নাম করণ করা হয়েছে। মোট কথা এ সূরাটি এমন যার মধ্যে نِسَاء (নিসা) শব্দটি

উল্লেখ রয়েছে। نِسَاء (নিসা) মানে হলো স্ত্রীলোক। (সূরার নামকরণ সংক্রান্ত আরো বিস্তারিত তথ্য এক নম্বর দারসে দেখুন)।

সূরাটি নাযিল হবার সময় কাল ঃ সর্ব্বসম্মত মতে সূরাটি মাদানী। তবে সূরাটি একই সময় নাযিল হয়নি। এ সূরাটি কয়েকটি ভাষণের সমষ্টি। সূরার বিষয়বস্তু এবং ঘটনার দিকে লক্ষ্য করলে বুঝা যায় ওহুদ যুদ্ধের পর অর্থাৎ তৃতীয় হিজরীর শেষের দিক থেকে নিয়ে পঞ্চম হিজরীর প্রথম দিকের সময় কালের মধ্যে বিভিন্ন সময় এর বিভিন্ন অংশ নাযিল হয়।

বিষয়বস্তু ও আলোচ্য বিষয় ঃ মহানবী (সাঃ) এর মদীনায় ইসলামী সমাজ গঠনের দু'তিন বছর অতিবাহিত হয়ে যাবার পর সূরাটি নাযিল হয়। বিধায় এই সূরাতে ইসলামী সমাজের নিয়ম-কানুন ও বিধি-বিধান সম্পর্কিত বিষয়গুলোই বেশী আলোচিত হয়েছে। এই সূরায় পরিবার গঠনের নীতি বর্ণনা করা হয়েছে। বিয়ে-শাদীকে বিধি-নিষেধের আওতাধীন করা হয়েছে। সমাজের নারী ও পুরুষের সম্পর্কের সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। এতিমদের অধিকার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। মীরাস বন্টনের নিয়ম কানুন, অর্থনৈতিক লেন-দেনের পদ্ধতি এবং ঘরোয়া বিবাদ মিটাবার পদ্ধতি শিখানো হয়েছে। অপরাধের শাস্তির বিধান এবং মদ পান নিষেধ করা হয়েছে। পাক-পবিত্রতার বিধান শিক্ষা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ ও তার বান্দাহদের সাথে পরহেজগার লোকদের সম্পর্ক কেমন হবে তা বলা হয়েছে। মানবতার মুক্তির জন্য জিহাদের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। মুসলমানদের দলীয়-সংগঠন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার বিধান দেয়া হয়েছে। আহলে কিতাব এবং মুনাফেকদের কাজের সমালোচনা এবং তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। কোন খবর পেলে তা তাৎক্ষণিক প্রচার না করে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের কাছে পৌছিয়ে দেবার জন্য বলা হয়েছে। ওজু ও গোছলের বিকল্প তায়াম্মুম করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। ইহুদীদের অসংগত কাজের জন্য মুসলমানদের সতর্ক করা হয়েছে এবং তাদেরকে শেষ পর্যন্ত মদীনা থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। চুক্তিবদ্ধ গোত্রের সাথে কি ধরনের ব্যবহার হবে তার বিধান শিখানো হয়েছে। মুসলমানদের নৈতিক চরিত্রের সংশোধন করা হয়েছে। সর্বশেষে ইহুদী, খৃস্টান ও মুশরিকদেরকে দ্বীন ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের মূল বক্তব্য ঃ দরসের জন্য তেলাওয়াতকৃত আয়াত দু'টির মূল বক্তব্য হলো সমাজের নির্যাতিত অসহায় দুর্বল নারী, পুরুষ এবং শিশুদেরকে জুলুমের হাত থেকে বাঁচার জন্য জিহাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মুমিন বান্দাহরা আল্লাহর পথে এবং বাতিল শক্তি শয়তানের পথে জিহাদ করে তা বলা হয়েছে। আর তাগুতি শক্তির ব্যাপারে মুসলমানদেরকে অভয় দান করা হয়েছে।

শানে নুযূল বা অবতরণের কারণ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং তার অনুসারীদের নিয়ে মদীনায় হিজরাত করার পরেও মক্কায় এমন কিছু দুর্বল মুসলমান রয়ে গিয়েছিলেন, যারা শারিরীক দুর্বলতা এবং আর্থিক অনটনের কারণে হিজরাত করতে পারেননি। এদের মধ্যে হযরত ইবনে আব্বাস ও তার মা, সালামা ইবনে হেশাম, ওলীদ ইবনে ওলীদ, আবু জানদাল ইবনে সাহল প্রমুখ। (কুরতবী)। পরে কাফেরেরাও তাদেরকে হিজরাত করতে বাধা দিতে থাকে এবং নানাভাবে জুলুম-নির্যাতন করতে থাকে, যাতে তারা ইসলাম ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু এসব সাহাবী নিজেদের ঈমানী বলিষ্ঠতার দরুণ কাফেরদের অসহনীয় উৎপীড়ন সহ্য করেও ঈমানের উপর টিকে থাকেন। আর তারা এসব অত্যাচার উৎপীড়ন থেকে নিস্তার লাভের জন্য আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করতে থাকলে আল্লাহ্ তাআলা তাদের সেই ফরিয়াদ কবুল করে মুসলমানদের জিহাদ করার নির্দেশ দিয়ে নির্যাতিত এ অসহায় লোকদেরকে উদ্ধারের জন্য অত্র আয়াত নাযিল করেন।

ব্যাখ্যা ঃ উপস্থিত সম্মানিত ভায়েরা এতক্ষণ পর্যন্ত অত্র আয়াত এবং সূরা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপুর্ণ কিছু বিবরণ দেবার পর এখন আপনাদের সামনে আয়াত দু'টির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা পেশ করছি।

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ○

অর্থাৎ "তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই করছো না অসহায় দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা ফরিয়াদ করে বলে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে এই অত্যাচারী (মক্কা) নগরী থেকে উদ্ধার করো। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য অভিভাবক ঠিক করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের (উদ্ধারের)জন্য সাহায্যকারী পাঠাও।"

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে মক্কায় থেকে যাওয়া দুর্বল, অসহায় নারী-পুরুষ এবং শিশুদের মক্কার কাফেরেরা ইসলামের পথ পরিহার করার জন্য কঠিন শারিরীক এবং মানসিক নির্যাতন চালাতো। কিন্তু এসব মুমিন নারী-পুরুষেরা শারিরীক দুর্বলতা এবং আর্থিক অনটনের জন্য রাসুলের সাথে হিজরাত করতে না পারলেও হাজারো নির্যাতনের পরেও তারা ইসলাম ত্যাগ করতে কিছুতেই রাজি ছিল না। এ জন্য তারা ইসলামের উপর টিকে থাকার জন্যই আল্লাহ তাআলার কাছে ফরিয়াদ করে বলেছিলো হে আল্লাহ তুমি হয় আমাদেরকে এই জালেম (মক্কা) নগরী থেকে বের করার ব্যবস্থা করো, নতুবা তোমার পক্ষ থেকে আমাদের উদ্ধারের জন্য সহায়ক বন্ধু, অভিভাবক এবং সাহায্যকারী পাঠাও।

উল্লেখ্য যে আল্লাহ তাআলা এই মাজলুম অসহায় ব্যক্তিদের দুটি ফরিয়াদই এভাবে কবুল করেছিলেন যেমন- মক্কা থেকে বের হয়ে যাবার সুযোগ করে দিয়ে তাদের প্রথম আবেদন পূরণ করেছিলেন এবং মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে তাদের দ্বিতীয় আবেদন পূরণ করেছিলেন।

তাই আল্লাহ তাআলা মক্কার দুর্বল অসহায় বন্দী নির্যাতিত মুসলমানদের ডাকে সাড়া দিয়ে মদীনার মুসলমানদেরকে উল্লেখ করে বলেন ঃ তোমাদের কি হলো যে, তোমরা এমন অসহায় দুর্বল বন্দী নির্যাতিত মুসলমানদেরকে উদ্ধারের জন্য জেহাদ করছো না। যেখানে কঠোর এবং অমানবিক নির্যাতনের দ্বারা মানবতা লুণ্ঠিত হচ্ছে। অথচ মাজলুমকে সাহায্য করা এবং মানবতাকে রক্ষা করা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

এই আয়াতে স্পষ্ট ভাষায় জেহাদ করার নির্দেশ দানের পরিবর্তে وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ বাক্য ব্যবহার করার মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এমন পরিস্থিতিতে জেহাদ করাই স্বাভাবিক দায়িত্ব, যা না করা কোনো ভালো মানুষের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

প্রিয় ভায়েরা তৎকালীন মক্কার কাফের এবং মুশরিকদের দ্বারা যেভাবে দুর্বল, অসহায় নারী পুরুষদেরকে ঈমান চ্যুত করার জন্য অমানবিক নির্যাতন করা হয়েছিলো। অনুরূপভাবে বর্তমান যুগেও সারা দুনিয়ার মুসলমান অসহায় নারী-পুরুষ এবং শিশুরাও ইহুদী, খৃস্টান, মুশরিক এবং মুসলমান নামধারী ধর্মনীরপেক্ষতাবাদীদের দ্বারা নির্যাতিত হচ্চে। তারা মুসলমানদের নাম নিশানা মুছে ফেলার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেছে। যেমন ইউরোপিয়ান দেশ বসনিয়া এবং আলবেনিয়ার মুসলমানদেরকে ইহুদী নাসারাদের দোসর সার্ব এবং ক্রোট নরপশুরা ধর্ষণ, হত্যা, বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে এবং নিজের দেশ থেকে বিতাড়োনর মাধ্যমে চরম নির্যাতন চালাচ্ছে।

মুসলমানদের দেশ ফিলিস্তিনকে গ্রাস করার জন্য মুসলমানদের চির দুষমন ইসরাইলের ইহুদীরা মুসলমানদের ঘরবাড়ী ধ্বংস করে দিচ্ছে, তাদেরকে গুম, হত্যা এবং জেল জুলুমের মাধ্যমে চরম নির্যাতন করছে।

কাশ্মীরের মুসলমানদেরকে ভারতের মুশরিক সেনারা তাদেরকে মুশরিক বানানোর জন্য হত্যা, ধর্ষণ এবং বাড়ীঘর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে চরম নির্যাতনের মাধ্যমে মানবতা বিরোধী কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

এমনিভাবে আলজেরিয়ায় যাতে কোনো দিন মুসলমানেরা ঈমান আকিদা নিয়ে বাঁচতে না পারে তার জন্য সেখানে ইহুদী আমেরিকার এজেন্ট ধর্মনিরপেক্ষাতাবাদী সামরিক সরকারের গোপন বাহিনী দিয়ে রাতের অন্ধকারে গ্রামকে গ্রাম, পাড়াকে পাড়া, নারী-পুরুষ এবং শিশুদের ব্রাস ফায়ার করে এবং যবাই করে হত্যা করছে এবং ইসলামী আন্দোলনের নেতা কর্মীদের জেল যুলুমের মাধ্যমে নির্যাতন চালাচ্ছে।

তুরস্কে চিরদিনের জন্য ইসলামকে মুছে ফেলার জন্য কট্টর ধর্মনীরপেক্ষতাবাদীদের দ্বারা ইসলামের অনুসারীদের চরম নির্যাতন করা হচ্চে এবং ইসলামের তাহযীব তামাদ্দুন এবং আকিদাকে পরিকল্পিতভাবে শেষ করে দেয়ার চেষ্টা হচ্ছে।

এভাবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও ধর্মনীরপেক্ষতার নামে ইসলাম বিরোধীশক্তি আলেম-ওলামা, পীর-মাসায়েখ, হাফেজ, কারী এবং ইসলামী আন্দোলনের নেতা কর্মীদেরকে হত্যা এবং জেল-জুলুমের

মাধ্যমে নির্যাতন করা হচ্ছে। ইসলামকে মুছে ফেলার জন্য ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে।

এভাবে যুলুম-নির্যাতনের কারণ একটিই তা হলো মক্কায় অবস্থানকারী মুসলমানদেরকে ঈমান চ্যুত করা যেনম উদ্দেশ্য ছিল। আজও সারা পৃথিবীর মুসলমান এবং ইসলামি অনুসারীদের ঈমান এবং মুসলমানিত্ব খতম করার জন্য এসব নির্যাতন করা হচ্ছে।

তৎকালীন মক্কায় অবস্থানকারী অসহায় মুসলমানেরা যেমন তাদের ঈমান ও নিজেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর তাআলার কাছে ফরিয়াদ করেছিলো আজকেও ঠিক অনুরূপভাবে নির্যাতিত অসহায় মুসলমান এবং প্রকৃত ইসলামের অনুসারীরা আল্লাহর কাছে তাই ফরিয়াদ করছে।

সুতরাং আল্লাহ তাআলা মক্কার অসহায় নির্যাতিত মুসলমানদের উদ্ধারের জন্য যেমনভাবে আয়াত নাযিল করে মদীনায় মুসলমানদের জিহাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন আজকেও সেই আয়াতও ঈমানদার মুসলমানদেরকে একই নির্দেশ দিচ্ছে। তার কারণ কুরআনের প্রতিটি আদেশ-নিষেধ কেবলমাত্র কুরআন নাযিল হওয়ার সময়কালীন লোকদের জন্যই নয়। বরং তার আদেশ-নিষেধ চিরকালীন সব সময়ের জন্য এবং কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত বলবত থাকবে। কেননা আল কুরআন হলো পরিপূর্ণ এবং সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর অবতীর্ণ কিতাব। বিধায় বর্তমান পরিস্থিতিতে নিজের দেশসহ সারা পৃথিবীতে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা এবং মাজলুম নির্যাতিত মুসলমানদেরকে উদ্ধারের জন্য প্রত্যেকের ওপর জেহাদ করা ফরজের মধ্যে বড় ফরজ।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা ইমানদারদের করণীয় সম্পর্কে আরও পরিষ্কার ভাষায় উল্লেখ করেন

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ ـ

অর্থাৎ "যারা ঈমানদার তারা জেহাদ করে আল্লাহর পথে। আর যারা কাফের তারা লড়াই করে তাগুতি শক্তি শয়তানের পথে।"

এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি দ্ব্যর্থহীন ফয়সালা। আল্লাহর জমিনে একমাত্র আল্লাহর দ্বীন কায়েম বা প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যেই জিহাদ করা হচ্ছে ঈমানদার লোকদের মূল কাজ। এ সম্পর্কে কুরআনের সূরা হজ্জে উল্লেখ রয়েছে। وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ অর্থাৎ (মুমিনেরা) তোমরা আল্লাহর জন্যই (কেবল) জেহাদ করো যেভাবে জেহাদ করা উচিত।"

সুতরাং যারা প্রকৃত ও সত্যিকার মুমিন তারা কখনো জেহাদের এ কাজ থেকে বিরত থাকতে পারে না।

আর অপর দিকে আল্লাহর জমিনে আল্লাহ্ বিরোধী ও খোদাদ্রোহীদের রাজত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তাগুতের (শয়তানের) পথে লড়াই করা হচ্ছে কুফরী শক্তির কাজ। যাতে করে বিশ্বময় কুফরী ও শেরেকী বিস্তার লাভ করতে পারে। আর কুফরী ও শেরেকী যেহেতু শয়তানের পথ, সুতরাং কাফেরেরা শয়তানের কাজেই সাহায্য করে থাকে। কোনো খাঁটি ঈমানদার ব্যক্তি এ কাজ কখনো করতে পারে না।

এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, দুনিয়াতে সব সময় দুটি দল থাকবে, একটি আল্লাহর দল, অপরটি তাগুতি শক্তি শয়তানের পক্ষের দল। কোরআন এবং হাদীসে তৃতীয় কোনো দলের কথা স্বীকার করা হয়নি। অতএব যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা সাধনা করে তারাই হলো আল্লাহর পক্ষের দল, আর বাকিরা যে দলই করুক না কেনো, যে দলের দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার কোনো উদ্দেশ্য এবং পরিকল্পনা থাকে না তা সবই তাগুতি শক্তি শয়তানের দল। حِزْبُ اللّٰهِ وَحِزْبُ الشَّيْطٰنِ। অর্থাৎ একটি আল্লাহর দল এবং অপরটি শয়তানের দল।"

অতঃপর আল্লাহ বলেন ঃ-

فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَاۤءَ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ـ

অর্থাৎ "তোমরা শয়তানের পক্ষ অবলম্বনকারীদের বিরুদ্ধে জেহাদ করতে থাকো দেখবে শয়তানের চক্রান্ত অত্যন্ত দুর্বল।" এখানে বলা হয়েছে শয়তানের চক্রান্ত ও কলাকৌশল অত্যন্ত দুর্বল। ফলে তা মুমিনদের

সামান্যতমও ক্ষতি করতে পারবে না। সুতরাং মুসলমানদেরকে তাগুতি শক্তি অর্থাৎ কাফের মোশরেক ও নাস্তিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে কোনো প্রকারের দ্বিধা বা সংকোচ করা ঠিক নয়। তার কারণ হলো মুমিনদের সাহায্য কারীতো স্বয়ং আল্লাহ তাআলা। অপরদিকে শয়তানের কলাকৌশল কাফেরদের কিছুই উপকার করতে পারে না।

আল্লাহ তাআলা সূরা তাওবায় বলেন ঃ-

قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ -

"তোমরা তাদের (কাফেরদের) বিরুদ্ধে লড়াই করো, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি দেবেন। তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপদস্ত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে জয়ী করবেন এবং দলের লোকদের অন্তরে প্রশান্তি দান করবেন।" (তাওবাহ-১৪)

আয়াতে اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنَ كَانَ ضَعِيْفًا বলে শয়তানের কলাকৌশলকে দুর্বল বলে অভিহিত করা হয়েছে, সে জন্য আয়াতের মাধ্যমেই দুটি শর্তের বিষয় প্রতীয়মান হয়।

প্রথম শর্ত ঃ যে লোকের বিরুদ্ধে শয়তান কলাকৌশল অবলম্বন করবে, তাকে অবশ্যই মুসলমান হতে হবে এবং **দ্বিতীয় শর্তঃ** সে যে কাজে নিয়োজিত থাকবে, তা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হতে হবে। দুনিয়ায় কোন কিছু পাবার আশা বা নিজের কোনো স্বার্থ জড়িত থাকবে না। প্রথম শর্ত اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا দ্বারা এবং দ্বিতীয় শর্ত يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ বাক্যের দ্বারা বোঝা যায়। এ দুটি শর্তের কোনো একটির যদি অভাব থাকে তাহলে শয়তান বা তাগুতি শক্তির কলা কৌশল দুর্বল হয়ে পড়বে না।

এ জন্য জেহাদে বা লড়ায়ে আল্লাহর মদদ বা সাহায্য পেতে হলে এবং শয়তানী বা তাগুতি শক্তিকে পরাজিত করতে হলে অবশ্যই মজবুত ঈমান এবং বিশুদ্ধ নিয়্যাত থাকতে হবে।

শিক্ষা ঃ সম্মানিত ভায়েরা সূরা নিসার ৭৫ এবং ৭৬ নম্বর আয়াত দুটির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমাদের জন্য যে শিক্ষা রয়েছে তা হলো ঃ-

● প্রথমে নিজের দেশ এবং পরবর্তীতে সারা দুনিয়ায় আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য দলবদ্ধ ভাবে জেহাদ বা আন্দোলন করতে হবে।

● দুর্বল অসহায় মাজলুম মুমিন মুসলমানদের সাহায্য এবং উদ্ধারের জন্য ও মানবতাকে রক্ষার জন্য গোটা দুনিয়ার মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে চেষ্টা চালাতে হবে।

● আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী দল ছাড়া অন্য কোনো মতবাদ প্রতিষ্ঠার দলে জড়িত থাকা যাবে না।

● তাগুতি এবং খোদাদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে সদাসর্বদা সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর আইন পরিপূর্ণ ভাবে প্রতিষ্ঠিত না হবে।

● ইসলাম বিরোধী শক্তির অস্ত্রবল, জনবল এবং কুটকৌশল যত বিরাট এবং মজবুত বলে দেখতে মনে হোক না কেনো এতে মুসলমানদের ঘাবড়ানো এবং ভীত সন্ত্রস্ত হওয়া যাবে না। বরং আল্লাহর উপর ভরসা করে ধৈর্য্যের সাথে টিকে থাকতে হবে। কেননা তাদের এইসব বৈষয়িক শক্তি অত্যন্ত দুর্বল।

আহ্বান ঃ প্রিয় ভায়েরা এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে আমি যে দরস পেশ করলাম, এতে যদি কোন প্রকার ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকে তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আর সারা দুনিয়ার অসহায় নির্যাতিত মুসলমানদের উদ্ধারের জন্য এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য দলবদ্ধভাবে জিহাদে অংশ গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়ে দরস শেষ করছি। আল্লাহ আমাদের যাবতীয় প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন। ওয়া আখেরুদাওয়ানা আনীল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

সাত

ঈমানের পরীক্ষা

সূরা আলে ইমরান ১৩৯-১৪১ আয়াত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ○ اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ ط وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ج وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ ط وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ○ وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِيْنَ○

সরল অনুবাদ ঃ এরশাদ হচ্ছে (১৩৯) তোমরা হতাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মু'মিন হও তবে, তোমরাই জয়ী হবে। (১৪০) যদি তোমরা (এখন ওহুদের যুদ্ধে) আঘাত পাও, তাহলে তারাও তো (বিরোধী পক্ষ) তেমনি আঘাত পেয়েছে (বদরের যুদ্ধে)। আর এ দিনগুলোকে আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন ঘটিয়ে থাকি। আর (ওহুদের) এ সময় ও অবস্থাটি তোমাদের ওপর এজন্য আনা হয়েছে যে, আল্লাহ জানতে চান (দেখে নিতে চান) তোমাদের মধ্যে কারা সাচ্চা ঈমানদার। আর তিনি তোমাদের মধ্য থেকে কিছু লোককে শহীদ হিসেবে গ্রহণ করতে চান। আর আল্লাহ অত্যাচারীদেরকে ভালোবাসেন না। (১৪১) তিনি এই পরীক্ষার দ্বারা সাচ্চা মু'মিনদেরকে বাছাই করে নিয়ে কাফেরদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চান।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ وَ - আর। لَا تَهِنُوْا - তোমরা নিরাশ হয়ো না, ভীত হয়োনা, দুর্বল হয়ো না। لَا تَحْزَنُوْا - তোমরা চিন্তিত হয়ো না, দুঃখ করো না। اَنْتُمْ - তোমরাই। اَعْلَوْنَ - বিজয়ী হবে, উচ্চ মর্যাদা পাবে। اِنْ - যদি। كُنْتُمْ - তোমরা হও। يَمْسَسْكُمْ - সে তোমাদেরকে স্পর্শ করছে। قَرْحٌ - যখম, আহত, দুঃখ কষ্ঠ। مَسَّ - স্পর্শ। اَلْقَوْمَ - জাতি, দল। مِثْلُهٗ - তার মত, তার অনুরূপ। تِلْكَ - ঐ, এই। الاَيَّامُ - দিনগুলো। نُدَاوِلُهَا - আমরা উহাকে পরিবর্তন করি, আবর্তন ঘটায়। بَيْنَ النَّاسِ - মানুষের মধ্যে, মানুষের মাঝে। لِيَعْلَمَ اللّٰهُ - যাতে আল্লাহ জানতে পারেন। اَلَّذِيْنَ - যারা, কারা। يَتَّخِذُ - সে ধরে, সে বানাচ্ছে / বানাবে। مِنْكُمْ - তোমাদের থেকে, হতে। شُهَدَآءَ - উপস্থিত, সাক্ষীগণ, শহীদগণ। لَايُحِبُّ - সে ভালো বাসে না। اَلظّٰلِمِيْنَ - অত্যাচারীদের, যালেমদের। لِيُمَحِّصَ - যাতে সে পাক-সাফ করে, খাঁটি করে, পবিত্র করে, নির্ভেজাল করে। يَمْحَقُ - সে ধ্বংস করে, নিশ্চিহ্ন করে।

সম্বোধন ঃ সম্মানিত উপস্থিতি ইসলামী আন্দোলনের কর্মী/ ইসলাম প্রিয় মু'মিন ভায়েরা/ বোনেরা/ ভাই ও বোনোরা! আস্‌সালামু আলাইকুম অয়ারাহমাতুল্লাহি অয়া বারাকাতুহ্। প্রিয় ভায়েরা আমি আপনাদের সামনে কুরআন শরীফের সূরা আলে ঈমরানের ১৩৯ থেকে ১৪১ নম্বর আয়াত পর্যন্ত মোট তিনটি আয়াত তেলাওয়াত এবং বাংলায় অনুবাদ করেছি। আল্লাহ্ তাআলা যেনো আমাকে আপনাদের সামনে শেষ পর্যন্ত দারস পেশ করার তাওফিক দান করেন। 'অমা তাওফিকী ইল্লা বিল্লাহ্'।

সূরার নাম করণ ঃ এই সূরার ৩৩ নম্বর আয়াতে উল্লেখিত اٰلَ عِمْرَانَ শব্দ থেকে এই সূরার নামকরণ করা হয়েছে। যেখানে 'আলে ইমরান' সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে। একেই সূরার পরিচিতির জন্য নামকরণ করা হয়েছে। (সূরার নামকরণ সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ এক নম্বর দরসে দেখুন।)

সূরাটি নাযিল হবার সময়-কাল ঃ আলোচ্য সূরাটি সর্ব সম্মত মতে মাদানী। তবে একই সময় সম্পূর্ণ সূরাটি নাযিল হয়নি। মোট চারটি ভাষণে সূরাটি শেষ হয়েছে। **প্রথম ভাষণটি** সূরার প্রথম থেকে চতুর্থ রুকুর দ্বিতীয় আয়াত পর্যন্ত চলে এবং এটি সম্ভবত বদর যুদ্ধের কাছাকাছি সময়ে নাযিল হয়।

দ্বিতীয় ভাষণটি চতুর্থ রুকুর তৃতীয় আয়াত থেকে শুরু হয়ে ষষ্ঠ রুকুর শেষে গিয়ে শেষ হয়েছে। নবব হিজরীতে নাজরানের প্রতিনিধি দলের আগমনের সময় এটি নাযিল হয়।

তৃতীয় ভাষণটি সপ্তম রুকুর শুরু থেকে নিয়ে দ্বাদশ রুকুর শেষ পর্যন্ত চলেছে। প্রথম ভাষণের সাথে সাথেই এটি নাযিল হয় বলে মনে হয়।

চতুর্থ ভাষণটি ১৩তম রুকু থেকে শুরু করে সূরার শেষ পর্যন্ত চলে। ওহুদ যুদ্ধের পর এটি নাযিল হয়। এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালাই সবচেয়ে বেশি জানেন।

সূরাটির বিষয়বস্তু বা আলোচ্য বিষয় ঃ সুরায় দু'টি দলকে সম্বোধন করা হয়েছে। একটি দল হলো আহলে কিতাব (ইহুদি ও খৃষ্টান) এবং দ্বিতীয় দলটি রাসূলের অনুসারী মুসলমান।

সূরার প্রথমে আহলে কিতাব অর্থাৎ ইহুদী এবং খৃষ্টানদেরকে জোরালো ভাষায় তাদের আকীদাগত বিভ্রান্তি এবং চারিত্রিক দোষ সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে রাসূল (সাঃ) এবং আল কুরআনকে মেনে নেয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

দ্বিতীয় দল অর্থাৎ রাসূলের অনুসারী মুসলমানদেরকে শ্রেষ্ঠতম দলের মর্যাদার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদের মহান দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে। সত্যের পতাকা বহন এবং বিশ্ব মানবতার সংস্কার ও সংশোধনের জন্য পূর্ববর্তী উম্মতদের ধর্মীয় ও চারিত্রিক অধঃপতনের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে দূরে থাকার জন্য সতর্ক করা হয়েছে। একটি সংস্কারবাদী দল হিসেবে তারা কিভাবে কাজ করবে এবং যেসব আহলে কিতাব ও মুনাফেক মুসলমানেরা আল্লাহর দ্বীনের পথে নানা ধরনের বাধা সৃষ্টি করছে তাদের সাথে কি আচরণ করতে হবে, তাদের সেই

আচরণ জানিয়ে দেয়া হয়েছে। ওহুদ যুদ্ধে মুসলমান দলটির মধ্যে যে সব দুর্বলতা দেখা দিয়েছিলো তার পর্যালোচনা এবং দুর্বলতা দূর করার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের মূল বক্তব্য ঃ ওহুদের সাময়িক পরাজয় এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর আহত এবং সাহাবীরা আঘাতে জর্জরিত হওয়ার জন্য মুসলমানদের মধ্যে যে ভয়-ভীতি, হতাশা এবং দুঃখ বেদনার সৃষ্টি হয়েছিল। সেই প্রসঙ্গে আলোচনা হয়েছে এবং মুমিনদের করণীয় সম্পর্কে বলা হয়েছে।

শানে নুযূল বা অবতরণের কারণ ঃ আলোচ্য সূরায় ওহুদ যুদ্ধের ঘটনা বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। এতে জানা গেছে যে, কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে এ যুদ্ধে প্রথম দিকে জয়লাভ করার পর অবশেষে মুসলমানেরা সাময়িকভাবে পরাজয় বরণ করে। ৭০ জন সাহাবী শহীদ হন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)সহ অনেকে আহত হন। কিন্তু এসবের পর আল্লাহ তাআলা যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেন এবং শত্রুরা পিছু হটে যায়।

এ সাময়িক বিপর্যয়ের তিনটি কারণ ছিলো ঃ

(এক) আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের নেতৃত্বে ৫০ জন তীরন্দাজ বাহিনীর গীরিপথ রক্ষার জন্য যে সব নির্দেশ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জারি করেছিলেন, পারস্পরিক মতভেদের কারণে তা শেষ পর্যন্ত পালিত হয়নি। মুসলিম বাহিনীর বিজয়ের ফলে কেউ কেউ বললো ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নির্দেশ অনুযায়ী আমাদের এখানেই অটল থাকা দরকার। অধিকাংশের মত ছিলো এখন এ জায়গায় অবস্থান করার কোনো প্রয়োজন নেই। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সেই নির্দেশ ছিলো সাময়িক। অতএব সবার সাথে মিলিত হয়ে গাণিমাতের মাল সংগ্রহ করা উচিত।

(দুই) খোদ নবী করীম (সাঃ) এর নিহত হবার সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে মুসলমানদের মনে হতাশা সৃষ্টি হয়। ফলে সবাই ভীত ও মনোভাঙ্গা হয়ে পড়ে।

(তিন) মদীনা শহরে অবস্থান গ্রহণ করে শত্রুদের মোকাবিলা করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর আদেশ পালনে যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিলো, সেটাই ছিলো সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রাসূলুল্লাহ

(সাঃ) উৎসাহী যুবক সাহাবীদের অধিকাংশের বাইরে গিয়ে মোকাবিলা করার মতের ভিত্তিতে তিনি মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

মুসলমানদের এ তিনটি বিচ্যুতির কারণেই তারা সাময়িক বিপর্যের সম্মুখিন হয়েছিলেন। এ সাময়িক পরাজয় অবশেষে বিজয়ের রূপ ধারণ করেছিলো বটে; কিন্তু মুসলিম যোদ্ধারা আঘাতে জর্জরিত ছিলেন। মুসলিম বীরদের প্রায় ৭০ জনের মৃতদেহ ছিলো চোখের সামনে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কেও হতভাগারা আহত করে দিয়েছিলো। সর্বত্র ঘোর বিপদ ও নৈরাশ্যের ছায়া বিস্তার করেছিলো। মুসলিম মুজাহিদরা নিজেদের ক্রটি-বিচ্যুতির জন্যেও দুঃখ বেদনায় মুষড়ে পড়েছিলেন। সার্বিক পরিস্থিতিতে দুটি বিষয় প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিলো।

(এক) অতীত ঘটনার জন্য দুঃক-কষ্ট ও বিষাদ।

(দুই) আশঙ্কা যে, ভবিষ্যতের জন্যে মুসলমানেরা যেনো দুর্বল ও হতোদ্যম না হয়ে পড়ে এবং বিশ্ব নেতৃত্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত এ জাতি যেনো অঙ্কুরেই মনোবল না হারিয়ে ফেলে। এ দুটি ছিদ্রপথ বন্ধ করার জন্য আল্লাহ পাকের কোরআনে এ বাণী অবতীর্ণ হয় "তোমরা হতাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না, তোমরাই বিজয়ী হবে, যদি তোমরা মুমিন হও।"

ব্যাখ্যা ঃ প্রিয় ভায়েরা এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে দরসের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য দেবার পর এখন আলোচ্য আয়াতগুলোর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা পেশ করছি ঃ

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ -

অর্থাৎ "ভবিষ্যতের জন্যে তোমরা দুর্বলতা ও শিথলতাকে কাছে আসতে দিয়ো না এবং অতীতের কাজের জন্যেও মনমরা হয়ো না, আবসুস করো না। যদি তোমরা ঈমান ও বিশ্বাসের পথে সোজা হয়ে থাকো এবং আল্লাহর ওয়াদার উপর আস্থা রেখে রাসূর (সাঃ) এর আনুগত্য ও আল্লাহর পথে আন্দোলন ও জেহাদে অনড় থাকো, তবে পরিশেষে তোমরাই জয়ী হবে।'

আয়াতে একথা বলার উদ্দেশ্য হলো এই যে, অতীতে যেসব ক্রটি-বিচ্যুতি হয়ে গেছে, তার জন্য দুঃখ ও শোক প্রকাশ করে সময় ও মনোবল নষ্ট না

করে ভবিষ্যতে সংশোধনের জন্য চিন্তা করা দরকার। আল্লাহর প্রতি দৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাস এবং রাসূলের আনুগত্যই হলো উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিশারী। এগুলো তোমরা কিছুতেই হাতছাড়া হতে দিও না। শেষ পর্যন্ত তোমরাই জয়ী হবে।

কোরআন পাকের এ ঘোষণা ওহুদের যুদ্ধে সাময়িক পরাজিত এবং বিপর্যস্ত সাহাবীদের ভাঙ্গা মনকে চাঙ্গা করে দিলো এবং মৃতপ্রায় দেহে সঞ্জীবনীর কাজ করলো। চিন্তা করে দেখুন, আল্লাহ তাআলা কিভাবে সাহাবায়ে কেরামের আত্মিক চেতনাকে সঞ্জীবিত করেছেন। তিনি চিরদিনের তরে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য একটি মূলনীতি দিয়ে দিলেন যে, অতীতের জয়-পরাজয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনায় সময় নষ্ট না করে বরং ভবিষ্যতে বাতিল শক্তির মোকাবেলার জন্য শক্তি ও প্রভাব সৃষ্টির উপায়-উপকরণ সংগ্রহে আত্ম নিয়োগ করা উচিত। সাথে সাথে একথাও বলে দিলেন যে, বিজয় ও প্রাধান্য অর্জনের মূল সহায়ক একটিই। তা হলো ঈমান ও তার দাবীসমূহ পূরণ করা। যুদ্ধের জন্য বৈষয়িক যে সব প্রস্তুতি নেয়া হয়, সেগুলোও ঈমানের দাবীর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, সামরিক শক্তির মজবুতি, সামরিক সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ এবং বাহ্যিক উপায়-উপকরণাদি দ্বারা সামর্থ অনুযায়ী সুসজ্জিত হওয়া। ওহুদ যুদ্ধের সমগ্র ঘটনাবলী এসব বিষয়েরই সাক্ষ্য বহন করে।

সুতরাং এসব আলোচনা থেকে একথাই প্রমানিত হয় যে, মুমিন ব্যক্তি ইসলামী আন্দোলন করতে গিয়ে আঘাত জনিত কারণে অথবা সাময়িক পরাজয়ের কারণে অথবা বাতিল শক্তির সাময়িক বিজয়ের কারণে হতাশ হতে পারে না, মনভাঙ্গা হতে পারে না, দুঃখ করতে পারে না এবং ভয় ও ভীত সন্ত্রস্ত হতেও পারে না। এটা মোমিন জীবনের বৈশিষ্ট্যের খেলাফ কাজ। এরপর আল্লাহ পাক বলেন ঃ

إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ ط
وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ -

অর্থাৎ "এখন যদি তোমাদের গায়ে আঘাত লেগে থাকে, তাহলে এর আগে (বদরের যুদ্ধে) এমনি ধরনের আঘাত লেগেছে তোমাদের বিরোধী পক্ষের

লোকদের গায়েও। এ-তো কালের উত্থান-পতন, আমি এসব মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন করে থাকি।"

এ আয়াতে ভিন্ন ভঙ্গিতে মুসলমানদের সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে যে, এ যুদ্ধে তোমরা আহত ও নিহত হয়েছো ঠিকই, কিন্তু ইতিপূর্বে তোমাদের প্রতিপক্ষও তো এ ধরনের দুর্ঘটনায় পড়েছে। ওহুদ যুদ্ধে তোমাদের প্রাণ প্রিয় নবী (সঃ) আহত হয়েছেন তোমরা নিজেরাও অনেকে আহত হয়েছো এবং তোমাদের ৭০ জন শহীদ হয়েছে। কিন্তু এক বছর আগে তাদেরও তো নেতা আবু জেহেল সহ ৭০ জন নিহত হয়ে জাহান্নামে চলে গেছে। তাদের অনেকে আহতও হয়েছিল। আর তোমরা তাদের ৭০ জনকে বন্দী করে নিয়ে এসেছিলে। স্বয়ং (ওহুদ) যুদ্ধের প্রথম দিকে তাদের অনেক সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে। বিধায় তোমরাই যে শুধু কষ্ট পেয়েছো তা তো নয়। বরং এর চেয়েও বেশি তারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং কষ্ট পেয়েছে।

তাছাড়া এই আয়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তা হলো ঃ আল্লাহ তাআলার চিরাচরিত নিয়ম হচ্ছে, তিনি কঠোরতা, নম্রতা, সুখ-দুঃখ, কষ্ট ও আরাম-আয়েশের দিনগুলোকে মানুষের মাঝে চক্রাকারে ঘুরিয়ে আনেন। যদি কোনো কারনে কোনো মিথ্যা বা বাতিল শক্তি সাময়িকভাবে বিজয় ও সফল হয়ে যায়, তা হলে তাতে হক ও সত্যপন্থীদের হতোদ্যম ও নিরাশ হয়ে পড়া ঠিক নয় এবং এটা মনে করা উচিত নয় যে, এখন থেকে পরাজয় বরণই ভাগ্যে লিখে দেয়া হয়েছে। বরং এ পরাজয় এবং বিফলতার সঠিক কারণ খোঁজ করার জন্য পর্যালোচনা করা উচিত এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। দেখা যাবে হক ও সত্য পন্থীরাই জয়যুক্ত হবে। এই সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কুরআনের সূরা বনি ইসরাইলে উল্লেখ করেছেন।

রাসূল (সাঃ) দীর্ঘ ত্যাগ-তিতীক্ষার মাধ্যমে মক্কার বিজয়ের পর কাব্বা ঘরে রক্ষিত কাফেরদের দেবতা মূর্তিগুলোকে তার হাতের ছড়ি দিয়ে আঘাত করে ভেঙ্গে ফেলতে ফেলতে বলছিলেন -

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ط اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ـ

"সত্যের বিজয় হয়েছে এবং মিথ্যা বা বাতিলের বিদায় হয়েছে। নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলুপ্ত হবেই। (বনী ইসরাঈল - ৮১)

وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ ط

অর্থাৎ "এ সময় ও অবস্থাটি তোমাদের উপর এজন্য আনা হয়েছে যে, আল্লাহ দেখতে চান তোমাদের মধ্যে সাচ্চা মুমিন কে? আর তিনি তোমাদের কিছু লোককে শহীদ হিসেবে কবুল করতে চান।"

আয়াতের এই অংশে ওহুদের যুদ্ধের বিপর্যয়ের আরো দু'টি উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে। **প্রথম উদ্দেশ্য** ছিলো আল্লাহ তাআলা ওহুদের যুদ্ধের ঘাত-প্রতিঘাত এবং সাময়িক বিপর্যয়ের মধ্যে প্রকৃত মুমিনদের বেছে নিতে চেয়েছিলেন। তার কারণ হলো মুসলমানদের সাথে মুসলমান নামধারী কিছু মুনাফেকদের সংমিশ্রন ছিলো। যুদ্ধ শুরু হবার আগেই মধ্য পথ থেকেই আব্দুল্লাহ ইবনে ওবাইয়ের নেতৃত্বে তিনশত জন মুনাফিক কেটে পড়েছিলো, তার সাথে কিছু দুর্বল মুসলমানও ছিলো। ভবিষ্যতেও ইসলামের বিজয়ের জন্য আরও ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করতে হবে। কারা এসব ঘাত-প্রতিঘাতকে উপেক্ষা করে ইসলামের উপর টিকে থাকতে পারবে তার জন্য তিনি ওহুদের এই সাময়িক বিপর্যয় দিয়ে খাঁটি ঈমানদরদের বেছে নেবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিলো وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ মুসলমানদের মধ্য থেকে কিছু লোককে শহীদ হিসেবে কবুল করে শাহাদাতের মর্যাদা দান। যাতে করে পরবর্তীতে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা শাহাদাতের মর্যাদা লাভের জন্য উদ্বুদ্ধ হয় এবং আল্লাহর পথে জীবন দিতে পিছপা না হয়।

وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِيْنَ -

অর্থাৎ "আল্লাহ তাআলা (ওহুদের) এই পরীক্ষার মাধ্যমে ঈমানদারদের পাক-সাফ করতে চান অর্থাৎ সাচ্চা মুমিনদেরকে বাছাই করে নিয়ে কাফেরদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চান।"

অত্র আয়াতের মাধ্যমে ওহুদের যুদ্ধের এই সাময়িক বিপর্যয় মুসলমানদের জন্য ছিলো একটা পরীক্ষা। এ পরীক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার আরো একটি উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা। তা হলো এই ঘাত-প্রতিঘাত এবং বিপর্যয়ের মাধ্যমে সাচ্চা এবং খাঁটি মুমিনদেরকে বাছাই করে নেয়া এবং এদের দ্বারাই ভবিষ্যতে কাফেরদেরকে চিরদিনের তরে নিশ্চিহ্ন করা।

পরবর্তী মক্কা বিজয়ের মাধ্যমেই আল্লাহ্ তাআলার এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়েছিলো।

শিক্ষা ঃ সম্মানিত ভায়েরা সূরা আলে ইমরানের ১৩৯-১৪১ নম্বর আয়াত পর্যন্ত বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমাদের জন্য যে সব শিক্ষা রয়েছে তা হলো -

● সাময়িক কোন পরাজয় বা বিফলতা, ঘাত-প্রতিঘাত এবং বিপর্যয়ের জন্যে প্রকৃত ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা কোন সময়ের জন্যে হতাশ হবে না, মনোভাঙ্গা হয়ে পড়বে না এবং পরাজয়ের গ্লানির জন্য প্রলাপ বকবে না।

● অতীতের পরাজয়, বিফলতা এবং আঘাত পাবার জন্যে সামষ্টিক ভাবে পর্যালোচনার মাধ্যমে সঠিক কারণ উৎঘাটন করা এবং তারই আলোকে ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে আরো দ্বিগুণ মনোবল এবং আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা রেখে পূর্ণউদ্দমে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

● সাময়িক পরাজয় এবং ঘাত-প্রতিঘাতকে আল্লাহ্ তাআলার একটা নীতি বলে মনে করতে হবে। এতে বোঝা যায় যে ইসলামী আন্দোলনে জয় পরাজয় স্বাভাবিক নিয়ম।

● কোনো প্রকার পরাজয় বা বিফলতাকে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের শাস্তি বা স্থায়ী পরাজয় মনে করা যাবে না। বরং একে ভবিষ্যতের সতর্কতার জন্য আল্লাহর পরীক্ষা বা সতর্কবাণী বলে মনে করতে হবে।

● ঈমানের অগ্নী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্য ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে সদা-সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে।

● শাহাদাতের মর্যাদা লাভের জন্যে নিয়্যাত রাখতে হবে এবং আল্লাহর কাছে কামনা করতে হবে।

● এই আয়াতগুলোর পটভূমিতে বড় দুটি শিক্ষা পাওয়া যায় তাহলো ঃ

(১) বিশেষ করে মূল দায়িত্বশীলের মতের প্রতি বেশী গুরুত্ব দিতে হবে।

(২) নেতার আদেশকে পুরোপুরি মেনে চলতে হবে। নিজেরা বিশ্বাস করে কোনো প্রকার সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে না। কিছু করতে হলে নেতার সাথে আলাপ করেই করতে হবে। যুদ্ধের ময়দানে কোনো ভাবেই সাময়িক

কৌশলের খেলাপ কাজ করা যাবে না। যার পরিণতিতে পরাজয় এবং ঘাত-প্রতিঘাতের স্বীকার হতে না হয়।

আহ্বান ঃ প্রিয় ভায়েরা এতক্ষণ পর্যন্ত কুরআনের যে দারস পেশ করলাম এতে যদি কোন প্রকার ভুল-ক্রুটি হয়ে যায়, এ জন্য আল্লাহর দরবারে কায়মনো বাক্যে ক্ষমা চাচ্ছি। আর আসুন আমরাও ওহুদ যুদ্ধের পর্যালোচনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে ভবিষ্যত জীবনে ইসলামী আন্দোলনে মজবুত ঈমান, ধৈর্য এবং আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা রেখে দৃঢ় মনোবল নিয়ে আন্দোলনের গতীকে আরো বেগবান করি। আল্লাহ তাআলা আমাদের এই কামনা কবুল করুন। আমিন। ওয়া খিরুদাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

আট

সবরের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা ও শহীদের মর্যাদা

সূরা বাকারা ঃ ১৫৩-১৫৬ আয়াত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَ سَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ط اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ○ وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ط بَلْ اَحْيَاۤءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ○ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ط وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ○ الَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ○

সরল অনুবাদ ঃ (১৫৩) ওহে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে (আল্লাহ্‌র কাছে) সাহায্য কামনা করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। (১৫৪) আর যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়, তাদেরকে মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বোঝ না। (১৫৫) এবং অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীলদের, (১৫৬) যখন তারা বিপদে পড়ে, তখন বলেঃ "নিশ্চয়ই আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই কাছে ফিরে যাবো।"

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ يَاَيُّهَا - হে বা ওহে। اَلَّذِيْنَ - যারা। اٰمَنُوْا - ঈমান এনেছো। اسْتَعِيْنُوْا - সাহায্য প্রার্থনা করো। بِ - সাথে, প্রতি। الصَّبْرِ - ধৈর্য। وَ - এবং। الصَّلٰوةِ - নামায। اِنَّ - নিশ্চয়। مَعَ - সাথে। الصّٰبِرِيْنَ - ধৈর্যশীলদের। لَا - না। تَقُوْلُوْا - তোমরা বলো। لِ - জন্য। مَنْ - যে। يُّقْتَلُ - সে নিহত হয়। فِىْ - মধ্যে। سَبِيْلِ اللّٰهِ - আল্লাহর পথে। اَمْوَاتٌ - মৃত। بَلْ - বরং। اَحْيَآءٌ - জীবিত। لٰكِنْ - কিন্তু। تَشْعُرُوْنَ - তোমরা বোঝ। لَنَبْلُوَنَّكُمْ - অবশ্যই আমি তোমাদের পরীক্ষা করবো। شَيْءٍ - কিছু। مِنْ - হতে। الْخَوْفِ - ভয়। الْجُوْعِ - ক্ষুধা। نَقْصٍ - ক্ষতি। الْاَمْوَالِ - সম্পদসমূহ। الْاَنْفُسِ - জানসমূহ। الثَّمَرٰتِ - ফল-ফসলসমূহ। بَشِّرِ - সুসংবাদ দাও। الصّٰبِرِيْنَ - ধৈর্যশীলরা। اَلَّذِيْنَ - যারা। اِذَا - যখন। اَصَابَتْهُمْ - তারা পড়ে বা পতিত হয়। مُّصِيْبَةٌ - বিপদে। قَالُوْا - তারা বলে। اِنَّا - নিশ্চয়ই আমরা। لِلّٰهِ - আল্লাহর জন্য। اِلَيْهِ - তার দিকে। رٰجِعُوْنَ - আমরা ফিরে যাবো।

সম্বোধন ঃ সম্মানিত উপস্থিত ইসলামী আন্দোলনের কর্মী/ইসলাম প্রিয় দ্বীনদার মুমিন ভাইয়েরা/বোনেরা/ভাই ও বোনেরা! আসসালামু আলাইকুম অয়া রাহমাতুল্লাহ্। আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কুরআন শরীফের সবচেয়ে বৃহত্তম সূরা সূরা বাকারার ১৯ তম রুকুর ১৫৩ থেকে ১৫৬ নং আয়াত পর্যন্ত তিলাওয়াত ও তরজমা পেশ করেছি। আল্লাহ তাআলা যেনো আমাকে আপনাদের খেদমতে সঠিকভাবে এবং সহীহ্ সালামতে দারস পেশ করার ক্ষমতা দান করেন। আমিন!

সূরার নামকরণ ঃ এ সূরার নাম "সূরাতুল বাকারা"। 'বাকারাহ' শব্দের অর্থ গাভী বা গরু। এ সূরার ৮ম রুকুর ৬৭-৭১ আয়াত পর্যন্ত বনী ইসরাঈলদের প্রতি গরু জবাই-এর নির্দেশ দিতে গিয়ে 'বাকারাহ' শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে বিধায় এই সূরার নাম "সূরাতুল বাকারাহ" রাখা হয়েছে। (নাম করণ সংক্রান্ত আরো বিস্তারিত তথ্য এক নম্বর দারসে দেখুন)

নাযিলের সময়কাল ঃ এই সূরার অধিকাংশ আয়াতই হিজরতের পর মাদানী জীবনে প্রাথমিক পর্যায়ে নাযিল হয়। অবশ্য এর কিছু আয়াত মাদানী জীবনের প্রায় শেষের দিকে যেমন সুদ হারাম সংক্রান্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। কিন্তু বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্ক থাকার কারণে এই সূরার সাথে যোগ করে দেয়া হয়েছে। আবার এই সূরার শেষের আয়াতগুলো হিজরাতের পূর্বে মক্কায় নাযিল হয়েছিলো, কিন্তু বিষয়বস্তুর সাথে মিল থাকার ফলে এই সূরার সাথে সংযোগ করে দেয়া হয়েছে। তবে সবকিছুই ওহীর মাধ্যমে করা হয়েছে।

এই সূরার অধিকাংশ আয়াত হিজরাতের পর মদীনায় নাযিল হয়েছে বিধায় এই সূরাকে মাদানী সূরা বলা হয়। এটি কুরআন মজীদের সবচেয়ে বড় সূরা। এতে ৪০টি রুকু ও ২৮৬ টি আয়াত রয়েছে।

বিষয়বস্তু ঃ এই দীর্ঘতম সূরায় ইসলামের অধিকাংশ মূল নীতিগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। এতে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, বিবাহ-তালাক, হালাল-হারাম, ব্যবসা-বাণিজ্য, জিহাদ, যুদ্ধনীতি এবং বিভিন্ন বিষয়ের নীতি-নিয়ম বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। মুত্তাকীনদের বৈশিষ্ট্য, মুনাফিকদের পরিচয়, আদম ও হাওয়া (আঃ) এর সৃষ্টির ইতিহাস, বনী ইসরাঈলদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ এবং তাদের অকৃতজ্ঞতার কথাও বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশ এবং সবশেষে দুনিয়া এবং আখেরাতের কল্যাণ কামনার জন্য আল্লাহ্ পাক তাঁর বান্দাদের এক হৃদয়গ্রাহী মুনাজাত শিখিয়ে দিয়েছেন।

আলোচ্য আয়াতের বিষয়বস্তু ঃ এ আয়াতগুলোতে জাতীয় দায়িত্বের সংকট মোকাবেলায় ধৈর্য এবং নামাযের মাধ্যমে মুমিনদের সাহায্য কামনার জন্য বলা হয়েছে। শহীদের মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। আর যখন মুমিনদের বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করা হবে তখন তারা ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহকে স্মরণ করবে।

পটভূমি ঃ (এই সূরার পটভূমি এক নম্বর দরসে উল্লেখ রয়েছে। সেখানে দেখুন) আলোচ্য আয়াতগুলো হিজরাতের ১৬ মাস পরে চূড়ান্তভাবে কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশের পরেই অবতীর্ণ হয়।

ব্যাখাঃ প্রিয় ভায়েরা, তেলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর প্রয়োজনীয় বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়ার পর এখন আপনাদের সামনে আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা পেশ করছি।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ

ইতিপূর্বে আল্লাহ্ তাআলা পূর্ণ এবং স্থায়ীভাবে কাবাকে কেবলা ঘোষণা দেয়ার পর ঈমানদারদেরকে জাতীয় দায়-দায়িত্ব পালনের এবং ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে যেসব করণীয় এ আয়াতে থেক তা উল্লেখ করে বলেন–

"হে মুমিন মুসলমানরা, তোমরা 'সবর' বা ধৈর্য এবং 'সালাত' বা নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করো।" এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষের দুঃখ-কষ্ট, যাবতীয় প্রয়োজন এবং সব রকমের সমস্যা ও সংকটের মোকাবেলা দু'টি বিষয় দ্বারাই সম্ভব। একটি 'সবর' বা ধৈর্য এবং অপরটি 'সালাত' বা নামায।

এখানে اِسْتَعِيْنُوْا শব্দটি বিশেষ কোনো একটি বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট না করে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করার ফলে এখানে এর মর্মার্থ দাঁড়ায় তা হলো এই যে, মানব জাতির যে কোনো সংকট বা সমস্যার সমাধান দিতে পারে একমাত্র সবর ও নামায। মানুষ যে কোনো প্রয়োজনেই এ দু'টি বিষয়ের মাধ্যমে সাহায্য লাভ করতে পারে। (তাফসীরে মাযহারীতে দু'টির তাৎপর্য এভাবে করা হয়েছে।)

اَلصَّبْرِ 'সবর' শব্দের অর্থ ব্যাপক তবে এখানে যা নেয়া হয়েছে তা হলো সংযম অবলম্বন ও নফ্স বা প্রবৃত্তির উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ।

কুরআন এবং হাদীসের পরিভাষায় 'সবর' এর তিনটি শাখা রয়েছে।

এক. নফস বা প্রবৃত্তিকে সব রকমের হারাম এবং নাজায়েয কাজ থেকে বিরত রাখা।

দুই. তাকে এবাদত ও আনুগত্যে বাধ্য করা এবং

তিন. যে কোনো বিপদ-আপদে ও সংকটে ধৈর্য ধরা। অর্থাৎ মানুষের চলার পথে যেসব বিপদ-আপদ এসে হাজির হয়, সেগুলোকে আল্লাহর বিধান বলে মেনে নেয়া এবং এর বিনিময়ে আল্লাহর তরফ থেকে প্রতিদান পাবার আশা

রাখা। অবশ্য কষ্টে বা বিপদে পড়ে মুখ দিয়ে যদি কোনো কাতর শব্দ বের হয়ে পড়ে বা অপরের কাছে তা প্রকাশ করা হয় তবে, তা 'সবর' এর পরিপন্থী হবে না। এটা স্বাভাবিক বিষয়। (ইবনে কাসীর সায়ীদ ইবনে যুবায়ের থেকে বর্ণিত)

প্রতিটি মুমিন মুসলমানের জন্য সবর সংক্রান্ত উপরের তিনটি বিষয় অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। সাধারণ লোকজনের ধারণা শুধু দুঃখ কষ্ট ও বিপদাপদে পড়লেই সবর করতে হয়। প্রথম দু'টি বিষয় যে সবরের জন্য সব চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ সে ব্যাপারে মোটেই ভ্রুক্ষেপ করে না। এমনকি অনেকের জানাও নাই যে, প্রথম দু'টি সবরের মধ্যে গণ্য।

কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় সাবের বা ধৈর্যশীল সেসব লোককেই বলা হয়, যারা উপরের তিনটি বিষয়েই সবর করে। অর্থাৎ প্রবৃত্তিকে সব রকরেমর হারাম কাজ থেকে বিরত রাখবে, আল্লাহর এবাদতে ও আনুগত্যে বাধ্য করবে এবং বিপদাপদে পড়লে বা সংকটে পড়লে ধৈর্য ধরবে।

কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে হাশরের ময়দানে ঘোষণা করা হবে, ধৈর্যশীলরা কোথায়? একথা শোনার সাথে সাথে সেসব লোক উঠে দাঁড়াবে, যারা উপরের তিন প্রকারেই সবর করে দুনিয়ার জীবনকে কাটিয়েছে। এসব লোককে প্রথমেই বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। ইবনে কাসীর এ বর্ণনাটি উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেছেন- إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ অর্থাৎ "সবরকারী বান্দাদেরকে তাদের প্রতিদান বিনা হিসেবে প্রদান করা হবে।" কুরআনের আলোচ্য এই আয়াতে সেদিকেই ইশারা করা হয়েছে।

অতএব সবর এর তাৎপর্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে যেসব বিষয়গুলো আমাদের সামনে স্পষ্ট হয় তা হলো, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল কর্তৃক সব রকমের হারাম এবং নাজায়েয কথা, কাজ এবং চিন্তা থেকে নিজের নফস বা প্রবৃত্তিকে দূরে রাখতে হবে। কেননা নফসের যে চাহিদা তা হলো দুনিয়ার ভোগ বিলাসে মত্ত থাকার জন্য হালাল-হারামের কোনো বাচ-বিচার না করে ভোগ করা। নফসের এসব অবৈধ ও হারাম তাড়নাকে সবর বা ধৈর্যের মাধ্যমে রহিত করতে হবে। এরপর আল্লাহ তাআলার যাবতীয় এবাদত বন্দেগী এবং রাসূল (সাঃ) এর আনুগত্যের ক্ষেত্রে শয়তানের দ্বারা

পরিচালিত প্রবৃত্তিকে সবর এর দ্বারা বাধ্য করতে হবে। আল্লাহর পথে চলতে গিয়ে এবং দ্বীন কায়েমের আন্দোলনে শরীক থাকার কারণে অথবা জাতীয় দায়িত্ব পালনে যেসব বাধা-বিপত্তি, বিপদ-আপদ এবং সংকট দেখা দেবে তা ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং বলিষ্টতা ও সাহসিকতার মাধ্যমে মোকাবেলা করতে হবে।

اَلصَّلٰوةُ সবর এর পর সালাত বা নামাযের মাধ্যমে সাহায্য চাওয়ার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সব রকমের এবাদতই সবরের অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু এর পরও নামাযকে আলাদাভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো, নামায এমনই একটি এবাদত যার মাধ্যমে সবচেয়ে বেশী আল্লাহ্র নিকটবর্তী হওয়া যায় এবং যাতে ধৈর্যের পরিপূর্ণ নমুনা পওয়া যায়। কেননা নামাযের মধ্যে যেমনি নফ্স তথা রিপুকে আনুগত্যে বাধ্য করা হয়, তেমনি যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ, চিন্তা খেয়াল এমনকি অনেক হালাল বিষয় থেকেও দূরে রাখা হয়। যেমন নিজের 'নফস' এর উপর পরিপুর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করে সব রকমের গোনাহ ও অশোভনীয় আচার-আচরণ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখে এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও নিজেকে আল্লাহর এবাদতে নিয়োজিত রাখার মাধ্যমে 'সবরের' যে প্রাক্টিস করতে হয় নামাযের মাধ্যমে তার একটা পুরোপুরি নমুনা ফুটে উঠে।

তাছাড়া সামাজিক এবং জাতীয় দায়-দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি এবং সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তখন যদি বান্দাহ্ নামাযে দাঁড়িয়ে যায় তা হলে তার পেরেশানী লাঘব হয়ে যায়। এ ব্যাপারে আমাদের নবিজীর অভ্যাস ছিলো, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যখনই তিনি কোনো সমস্যা বা সংকটে পড়ে পেরেশান হয়ে যেতেন তখনই তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। আর আল্লাহ্ তাআলা সে নামাযের বরকতেই তাঁর সব রকমের বিপদাপদ এবং পেরেশানী দূর করে দিতেন। এ সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে– اِذَا حَزَنَهُ اَمَرَ فَزَعَ اِلَى الصَّلٰوةِ অর্থাৎ "মুহানবী (সাঃ) কে যখনই কোনো বিষয়ে চিন্তিত করে তুলতো তখনই তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন।"

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ অতঃপর আল্লাহ বলেনঃ "অবশ্যই আল্লাহ্ তাআলা (এ ধরনের) সবরকারীদের সাথে আছন।" নামায এবং সবরের

মাধ্যমে যাবতীয় সমস্যা এবং সংকটের প্রতিকার হবার কারণ এই যে, এ দু'টি পথেই সবচেয়ে বেশী আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়। إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّٰبِرِينَ বাক্যের দ্বারা এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নামাযী এবং সবরকারীদের সাথে আল্লাহর শক্তির সমাবেশ ঘটে। আর এই যৌথ শক্তির কারণে দুনিয়ার কোনো শক্তি কিংবা কোনো সংকটই টিকতে পারে না। বান্দাহ যখন আল্লাহর বলে বলিয়ান হয়, তখন তার গতি অপ্রতিরোধ্য হয়ে যায়। তার চলমান গতিকে ঠেকাবার মতো শক্তি আর কারো থাকে না।

পরিশেষে বলা যায় যে, কোনো কিছুর উদ্দেশ্য পূরণ করা এবং সমস্যা ও সংকট থেকে উদ্ধার পাবার একমাত্র উপায় হলো আল্লাহর বলে বলিয়ান হওয়া।

আল্লাহ্ তাআলা সূরা আলে ইমরানের শেষের আয়াতে বলেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

"হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ করো এবং বাতিল শক্তির মোকাবেলায় দৃঢ়তা দেখাও, হক প্রতিষ্ঠার জন্যে উঠেপড়ে লাগো এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। তাহলে আশা করা যায়, তোমরা সফলকাম হবে।" (আলে ইমরান ঃ ২০০)

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ۝

অর্থাৎ "যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না; বরং তারা জীবিত। কিন্তু তোমরা তা অনুভব করো না।"

এই আয়াতে একথার দিকে দৃষ্টি দেয়া হয়েছে যে, মৃত্যুর কথা এবং তার চিন্তা স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মনে আতংক ও ভয়ের সৃষ্টি করে, এতে মানুষের মনের সাহস-হিম্মত দুর্বল হয়ে যায়। এজন্য যারা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে শহীদ হয় তাদেরকে 'মৃত' বলতে মানা করা হয়েছে। কেননা তাতে ইসলামী দলের লোকজনের মধ্যে জেহাদী জায্বাহ এবং

জীবনদান করার প্রেরণা নিস্তেজ হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। এর পরিবর্তে এখানে একথা বলতে উপদেশ দেয়া হয়েছে আল্লাহর পথে যে জীবন দেয়, সে মূলতঃ অক্ষয় ও চিরন্তন জীবন লাভ করে এ ধারণা মুমিনদের দেলে সুস্পষ্ট এবং জীবন্ত হয়ে থাকা উচিত। আল্লাহ তাআলার শহীদদের বিশেষ এই মর্যাদার ঘোষণার কারণে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের মধ্যে বীরত্ব ও নির্ভীকতার ভাবধারা অধিক থেকে অধিকতর তীব্র ও জীবন্ত হয়ে উঠে।

যারা আল্লাহর পথে নিহত বা শহীদ হয় তাদেরকে আল্লাহ তাআলা জীবিত বলে উল্লেখ করেছেন তার প্রমাণ উভয় জগত থেকেই পাওয়া যায়।

দুনিয়াতে অমর থাকে এভাবে যে, আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন দেবার ফলে তার সংগী-সাথীরা এবং পরবর্তী সময়ের ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা যুগ যুগ ধরে তার কথা স্মরণ করে অনুপ্রেরণা লাভ করে। তার নাম চিরদিন জাতির লোকদের দেলে স্মরণ করার মাধ্যমে দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলা এভাবে তাকে জীবন্ত রাখেন।

আর আখেরাতের জীবনে আলমে বরযখ বা কবরের জগতে সাধারণ মৃতের তুলনায় শহীদদের বেশী অনুভুতি ক্ষমতা দেয়া হয়। এমনকি শহীদদের এ জীবনের অনুভূতি অনেক ক্ষেত্রে তাদের জড় দেহেও এসে পৌঁছে থাকে। অনেক সময় তাদের হাড়-মাংসের দেহ পর্যন্ত মাটিতে নষ্ট করতে পারে না। জীবিত মানুষের দেহের মতই অবিকৃত থাকতে দেখা যায়। হাদীসের বর্ণনা এবং বহু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় এর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। এ কারণেই তাদেরকে জীবিত বলা হয়েছে।

মোট কথা, কবরের এ জীবনে সবচেয়ে বেশী শক্তিমান হবেন নবী রাসূলগণ তারপর শহীদগণ এবং তারপর অন্যান্য সাধারণ মৃত্যু ব্যক্তিগণ।

যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদের কবরের জীবন সম্পর্কে সূরা আলে ইমরানে বলা হয়েছে–

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ -

অর্থাৎ "যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদেরকে তোমরা কখনো মৃত মনে করো না। বরং তারা জীবিত, আর তারা তাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে রেজেক পেয়ে থাকে। (আলে ইমরান ঃ ১৬৯)

একটি বিষয় জানা প্রয়োজন তা হলো যদি কোনো শহীদের লাশ মাটিতে নষ্ট হতে দেখা যায়, তবে এ ধারণা করা ঠিক হবে না যে, সে আল্লাহর পথে শহীদ হয়েছে কিন্তু তার নিয়্যাত ঠিক ছিলো না বলে তার মৃত্যু শহীদের মৃত্যু হয়নি। কেননা শহীদের লাশ মাটিতে নষ্ট হয় না তা নয়। অনেক সময় জমিনের অন্যান্য ধাতু কিংবা অন্য কোনো প্রভাবেও জড়দেহ নষ্ট হতে পারে। নবী-রাসূর এবং শহীদদের লাশ মাটিতে ভক্ষণ করে না বলে হাদীসে যে বর্ণনা রয়েছে, তাতে একথা বোঝায় না যে, মাটি ছাড়া তাদের লাশ অন্য কোনো ধাতু কিংবা রাসায়নিক প্রভাবেও নষ্ট হতে পারে না।

وَلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ "কিন্তু তোমরা শহীদদের মর্যাদা সম্পর্কে বোঝতে পারো না।" যেহেতু বরযখ বা কবরের অবস্থা মানুষের সাধারণ পঞ্চইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করা যায় না সেহেতু কুরআনে শহীদদের সে জীবন সম্পর্কে لَا تَشْعُرُوْنَ (তোমরা বুঝতে পারো না। বলা হয়েছে। এ কথার সারমর্ম হলো এই যে, শহীদের সে কবরের জীবন সম্পর্কে অনুভব করার মতো অনুভূতি ক্ষমতা তোমাদের দেয়া হয়নি। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে বরযখ বা কবরের অবস্থা মানুষ এবং জ্বীন ছাড়া আর সব প্রাণী বুঝতে পারে।

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ـ

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলার চিরা-চরিত নিয়মানুযায়ী মুমিনদের ঈমান পরীক্ষার জন্য তার নীতি হিসেবে বলেছেন ঃ আমি অবশ্যই তোমাদেরকে (দুষমনের) কিছু কিছু ভয় দেখিয়ে, ক্ষুধা-অনাহার এবং জান মালের ক্ষতি করে এবং ফল-ফসলের উৎপাদন কম এবং আমদানীর ঘাটতি দিয়ে তোমাদের পরীক্ষা করবো। প্রকৃতপক্ষে মানুষ দুনিয়াতে যেসব জিনিসকে বেশী মহব্বত করে থাকে সেসব জিনিসের ক্ষতি ঘটাবেন একমাত্র ঈমানের পরীক্ষার জন্য। কারা কারা এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্য ধৈর্য ধারণ করে তা দেখার জন্য। আল্লাহ্‌র তো এটা ইচ্ছা নয় যে বান্দাহর খামাখা ক্ষতি করা। আল্লাহ তো বান্দাহ্‌কে কঠিন আযাব থেকে নাযাত দিতে চান। আর নাযাতের প্রকৃত পথই হলো মজবুত অবিচল ঈমান এবং জেহাদী জিন্দেগী।

আর যখনই কোনো বান্দাহ্ ঈমানের উপর দৃঢ় থেকে আল্লাহ্‌র দ্বীন পতিষ্ঠার জেহাদে আত্মনিয়োগ করবে তখনই তাদেরকে এসবের ক্ষতি এবং ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হবে। আর এক্ষতি এবং ঝুকি থেকে বাঁচার উপায় হলো সবর বা ধৈর্য।

وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ যারা এসব ক্ষতি এবং ঝুকি নিতে প্রস্তুত থাকবে আল্লাহ্ তাআলা এসব অবিচল সহিষ্ণু এবং ধৈর্যশীল লোকদেরকে এই বাক্য দ্বারা সুসংবাদ দানের কথা বলেছেন। এ সুসংবাদ হলো দুনিয়ায় শান্তি এবং আখেরাতে আল্লাহ্‌র দিদার লাভের মাধ্যমে জান্নাত লাভ।

اَلَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ -

"এসব সুসংবাদ এমন সব ধৈর্যশীলদের জন্য যখন তাদের সামনে কোনো বিপদ আসে বা বিপদ-মুসিবতে পড়ে তখন তারা বলে উঠে আমরা তো আল্লাহ্‌রই জন্য এবং আমাদেরকে আল্লাহ্‌রই কাছে শেষ পর্যন্ত ফিরে যেতে হবে।"

এখানে 'বলা' অর্থ কেবল মুখে একথা ও শব্দগুলো উচ্চরণ করাই যথেষ্ট নয়। বরং মনের গভীর কোন হতে অনুভব করতে হবে যে, প্রকৃত পক্ষে আমরা আল্লাহ্‌রই বান্দাহ্। এজন্য আল্লাহ্‌র পথে আমাদের যেসব জিনিসের কোরবানী করা হয়েছে; তা সঠিক খাতেই ব্যয় হয়েছে বলে মনে করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে যার জিনিস, তারই কাজে– তারই জন্য নিযুক্ত ও ব্যয় হয়েছে এবং এটাও অনুভব করতে হবে যে, আল্লাহ্‌র কাছে আমাদেরকেও ফিরে যেতে হবে। অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ায় আমরা চিরদিন থাকবো না, আজ হোক কালা হোক শেষ পর্যন্ত তাঁরই কাছে আমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে। আল্লাহ্ বলেন– ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ "অতঃপর তোমরা তাঁর কাছেই ফিরে যাবে।"

সুতরাং তাঁরই কাজে এবং তাঁরই পথে জীবনদান করে তাঁর কাছে হাজির হওয়াটাই কি আমাদের জন্য উচিত নয়? আমরা যদি নিজেদের ভোগ-বিলাসে লিপ্ত হই এবং এ অবস্থায় মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময়েই কোনো রোগ বা হঠাৎ কোনো দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়। তবে তার চেয়ে আল্লাহর পথে প্রাণ দেওয়াটাই অনেক অনেক উত্তম।

তাছাড়া এ আয়াতে একথাও বলা হয়েছে যে, তারা যেমন অন্তরের অনুভূতিতে একথাকে স্মরণ করে তেমনিভাবে যখনই তারা কোনো বিপদাপদ এবং দুঃখ কষ্টে পড়ে তখনই তারা বলে উঠে "ইন্না লিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রাজিউন।" এতে যেমন আল্লাহ্কে স্মরণ করা হয় তেমনিভাবে মনের মধ্যে সবরও এসে যায় এবং সওয়াবও পাওয়া যায়।

শিক্ষা ঃ সম্মানিত ভায়েরা, আলোচ্য দারস থেকে আমাদের জন্যে যেসব শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে তা হলো ঃ

* সামাজিক এবং জাতীয় দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কুরআনের আইন বিরোধী লোকদের দ্বারা যত প্রকারের বাধা-বিপত্তি আসুক না কেনো তা ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতার মাধ্যমে মোকাবেলা করতে হবে।

* ইসলাম অনুসরণ এবং ইসলামী আন্দোলন করার কারণে পারিবারিক, সামাজিক, এবং জাতীয়ভাবে অথবা বাতিল শক্তির পক্ষ থেকে যত প্রকারের পরীক্ষা আসুক না কেনো তা সবর বা ধৈর্যের মাধ্যমে মোকাবেলা করতে হবে।

* সামাজিকওজাতীয় দায়িত্ব পালন বা ইসলামী আন্দোলন করার জন্য কোনো সমস্যা বা সংকটে পড়ে পেরেশানী দেখা দিলে ওযু করে নফল নামায পড়ার জন্য দাঁড়িয়ে যেতে হবে এবং আল্লাহ্কে হাজির-নাজির জেনে বিনয়ের সাথে নামায পড়তে হবে।

* আল্লাহ্র দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য শাহাদাতের মর্যাদার দিকে খেয়াল রেখে সদা-সর্বদা শহীদ হবার তামান্না মনের মধ্যে রাখতে হবে। তাহলে দেলে আল্লাহর ভয় ছাড়া আর দুনিয়ার কোনো কিছুর ভয় থাকবে না।

* সামাজিক এবং জাতীয় দায়িত্ব পালন এবং ইসলামী আন্দোলনের সঠিক কর্মী কিনা তার জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ভয়-ভীতি, জান-মালের ক্ষতি, ফল-ফসলের উৎপাদন বা আমদানী হ্রাস ঘটার মাধ্যমে পরীক্ষা আসলে আখেরাতের নাজাতের আশায় চরমভাবে ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহর এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

* মৃত্যুর পর সকলকেই যেহেতু আল্লাহ্র দরবারে ফিরে যেতে হবে এজন্য মৃত্যুর ভয় না করে আল্লাহ্র পথে নিহত হয়েই আল্লাহ্র দরবারে হাজির

হবার চেষ্টা করতে হবে এবং আল্লাহ্‌র কাছে শহীদের মৃত্যু কামনা করতে হবে।

* কোনো বিপদাপদ বা দুঃখ-কষ্ট বা কোন কিছুর ক্ষতি হয়ে গেলে বা হারিয়ে গেলে সাথে সাথে "ইন্না লিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রাজিউন" পড়তে হবে।

আহ্বান : প্রিয় ভায়েরা এতক্ষণ পর্যন্ত সূরা বাকারার যে কয়েকটি আয়াতের দারস আপনাদের সামনে পেশ করলাম এতে যদি আমার অজান্তে কোনো ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যায় তার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আর আমাদের সামাজিক, জাতীয় এবং আন্দোলনী জীবনে যত প্রকারের বাধা বিপত্তি, দুঃখ-কষ্ট, সমস্যা এবং সংকট দেখা দেক না কেনো তা সবর এবং সহিষ্ণুতার মাধ্যমে মোকাবেলা করার আহ্বান জানাচ্ছি। আর শাহাদাতের মৃত্যুর মর্যাদার দিকে লক্ষ্য রেখে আল্লাহ্‌র পথেই নিজের জীবন উৎসর্গ করার জন্য সবাইকে আবারও আহ্বান জানিয়ে আমার দারস শেষ করছি। অয়া আখিরু দাওয়ানা আনিলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

[সালাম দিয়ে শেষ করবেন।]

নয়

মরণের আগেই আল্লাহর পথে অর্থ খরচ ঃ

সূরা মুনাফিকুন ৯-১১ আয়াত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَ سَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ٥ وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْ لَاۤ اَخَّرْتَنِيْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ٥ وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا ط وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ٥

সরল অনুবাদ ঃ এরশাদ হচ্ছে (৯) হে মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও ছেলেমেয়ে যেনো তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে না দেয়। যারা এরূপ করবে তারাই ক্ষতিগ্রস্থ হবে। (১০) আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকেই মরণ আসার আগেই ব্যয় করো। নতুবা (যখন মরণ এসে যাবে তখন) সে বলবেঃ হে আমার প্রভু! আমাকে আরও একটু সময় দিলে না কেনো? তাহলে আমি দান-সাদকা করতাম এবং নেককার লোকদের দলভুক্ত হয়ে যেতাম। (১১) অথচ যখন কোনো ব্যক্তির (মৃত্যুর) নির্ধারিত সময় হাজির হয়ে যায়, তখন আল্লাহ কাউকে (বাঁচার) অবকাশ বা সুযোগ দেন না। আর তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ সে সব বিষয়ে খুব খবর রাখেন।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ يَاَيُّهَا - হে, ওহে। اَلَّذِيْنَ - যারা। اٰمَنُوْا - ঈমান এনেছো। لَا - না। تُلْهِكُمْ - তোমাদের গাফেল করে। اَمْوَالُكُمْ - তোমাদের সম্পদ। وَ - ও। اَوْلَادُكُمْ - তোমাদের সন্তানেরা। عَنْ - থেকে। ذِكْرِ اللّٰهِ - আল্লাহর স্মরণ। مَنْ - যে। يَفْعَلْ - তোমরা করবে। ذٰلِكَ - এটা বা ওটা। فَ - অতঃপর। اُوْلٰئِكَ - ঐসব (লোক)। هُمْ - তারাই। الْخٰسِرُوْنَ - ক্ষতিগ্রস্ত। اَنْفِقُوْا - তোমরা খরচ করো। مِنْ - থেকে। مَا - তা বা যা। رَزَقْنٰكُمْ - আমরা তোমাদের রিজিক দিয়েছি। قبل - পূর্বে। ان - যে। يَاْتِىَ - আসে। اَحَدَكُمْ - তোমাদের কারও। الْمَوْتُ - মৃত্যু। فَيَقُوْلَ - অতঃপর সে বলবে। رَبِّ - আমার প্রভু। لَوْ - কেনো। اَخَّرْتَنِىْ - আমাকে অবকাশ দিলে। اِلٰى - দিকে, পর্যন্ত। اَجَلٍ - কাল, সময়। قَرِيْبٍ - কিছু, নিকট। فَاَصَّدَّقَ - তাহলে আমি সাদকা করতাম। اَكُنْ - আমি হতাম। مِنَ الصّٰلِحِيْنَ - নেক্‌কারদের অন্তর্ভুক্ত। وَ - অথচ। لَنْ - কক্ষণ না। يُّؤَخِّرَ - অবকাশ দেন। نَفْسًا - কোন ব্যক্তিকে। اِذَا - যখন। جَاءَ - আসে। اَجَلُهَا - তার নির্ধারিত সময়। وَ - আর। خَبِيْرٌ - খবর রাখেন। بِمَا - যা কিছু। تَعْمَلُوْنَ - তোমরা কাজ করো।

সম্বোধন ঃ সম্মানিত ইসলামী আন্দোলনের কর্মী/ ইসলাম প্রিয় দ্বীনদার ভায়েরা/ বোনেরা/ ভাই ও বোনেরা আস্‌সালামু আলাইকুম অয়ারাহমাতুল্লাহি অয়া বারাকাতুহ্। আমি এই মাহফিলে/ মজলিসে/ বৈঠকে দারসুল কুরআন পেশ করার জন্য সূরা মুনাফিকুন এর ২য় রুকুর ৯-১১ মোট তিনটি আয়াত তিলাওয়াত এবং বাংলা অনুবাদ করেছি। আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা আমাকে এবং আপনাদেরকে সহিহ সালামতে দারস পেশ করার এবং ধৈর্য ধরে শোনার তাওফীক দান করুন। আমিন।

সূরার নামকরণ ঃ এই সূরার প্রথম আয়াত اِذَا جَاءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ উল্লেখিত الْمُنٰفِقُوْنَ শব্দ হতেই এই সূরার নাম 'মুনাফিকুন' করা হয়েছে। এই সূরাটি নামকরণ কুরআনের অন্যান্য সূরা

থেকে আলাদা। কেননা এই সূরার বিষয় বস্তুই হলো মুনাফিকদের আচরণ ও কাজ কামের সমালোচনা পর্যালোচনা প্রসঙ্গে। কাজেই এই সূরার নামকরণ শিরোনাম হিসেবেই উল্লেখ করা হয়েছে।

সূরাটি নাযিলের সময় কাল ঃ সর্বসম্মত মতে সূরাটি মাদানী। বনুল মুস্তালিক যুদ্ধ হতে রাসূলে কারীম (সাঃ) এর ফিরার পথে অথবা মদীনায় পৌঁছে যাবার পর পরই এই সূরা নাযিল হয়। ৫ম অথবা ৬ষ্ঠ হিজরীর শা'বান মাসে বনুল মুস্তালিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো। গোটা সূরাটি একই সময় অবতীর্ণ হয়েছিলো।

সূরাটির আলোচ্য বিষয়বস্তু ঃ সূরাটিতে মূলত মুনাফিকদের আচার-আচরণ এবং তাদের কার্য-কলাপের সমালোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

পটভূমি বা সূরাটি অবতরণের কারণ ঃ সূরাটি নাযিল সম্পর্কে একটি বিশেষ ঘটনা রয়েছে। এই ঘটনাটি মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (রহঃ)-এর বর্ণনা অনুযায়ী ষষ্ঠ হিজরীতে এবং কাতাদাহ ও ওরওয়া (রহঃ)-এর বর্ণনা অনুযায়ী পঞ্চম হিজরীতে বনুল মুস্তালিক যুদ্ধের সময় সংঘটিত হয়। (মাযহারী)

ঘটনাটি ছিলো এই ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সংবাদ পান যে, 'মুস্তালিক' গোত্রের সর্দার হারেস ইবনে যেরার তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। (এই হারেস ইবনে যেরার হযরত জুয়ায়রিয়া (রাঃ) যিনি পরে ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিবিদের অন্তর্ভুক্ত হন, তাঁর পিতা ছিলেন। হারেস ইবনে যেরারও পরে মুসলমান হয়ে যান।)

সংবাদ পেয়ে রাসূলে কারীম (সাঃ) একদল মুজাহিদসহ তাদের মোকাবেলা করার জন্য রওয়ানা দেন। এই জেহাদে মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে ওবাই সহ একদল মোনাফেক গাণিমাতের মালের ভাগীদার হবার লোভে অংশ নেয়।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন তাঁর দলবলসহ মুস্তালিক গোত্রে পৌঁছলেন, তখন 'মুরাইসী' নামে পরিচিত একটি কূপের কাছে হারেস ইবনে যেরারের বাহিনীর সম্মুখীন হলেন। এ কারণেই এই যুদ্ধকে মুরাইসী যুদ্ধও বলা হয়। উভয় পক্ষের মোকাবেলা হলো। এতে মুস্তালিক গোত্রের বহুলোক নিহত

এবং আহত হলো এবং বাকীরা পালাতে লাগলো। আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে এ যুদ্ধে বিজয় করলেন। প্রতিপক্ষের কিছু ধন-সম্পদ গাণিমাত হিসেবে লাভ করলেন এবং কিছু পুরুষ ও নারী মুসলমানদের হাতে বন্দী হলো। এভাবে এ জেহাদ শেষ হলো।

এরপর যখন মুসলমান মুজাহিদ বাহিনী মুরাইসী কূপের কাছেই অবস্থান করছিলো, তখন একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেলো। একজন মুহাজির (হিজরাতকারী) ও একজন আনসারীর (সাহায্যকারী) মধ্যে পানি নিয়ে ঝগড়া শুরু হয়ে হাতাহাতির সীমা অতিক্রম করে সংঘর্ষের মধ্যে জড়িয়ে পড়লো। এতে মুহাজির জাহ্‌জাহ্‌ ইবনে মাসউদ গিফারী সাহায্যের জন্য মুহাজিরদের ডাকলো এবং আনসারী সিনান ইবনে ওয়াবার আল জুহানী আনসারদেরকে ডাক দিলো। উভয়ের সাহায্যের জন্য কিছু লোক এগিয়ে গেলো। এভাবে ব্যাপারটি মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষের কাছাকাছি পৌঁছে গেলো। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি সেখানে গেলেন এবং ভীষণভাবে রেগে গিয়ে বললেন ঃ مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ। "একি জাহেলী যুগের ডাক"! দেশ ও বংশগত জাতীয়তাকে পুঁজি করে সাহায্য ও সহযোগীতার আয়োজন হচ্ছে কেনো? তিনি আরও বললেন دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ এই (জাহেলী) স্লোগান বন্ধ করো। এটা পচা স্লোগান।' তিনি বললেনঃ প্রত্যেক মুসলমানের উচিত অপর মুসলমানের সাহায্য করা- সে যালেম হোক অথবা মজলুম হোক। জালেমকে সাহায্য করার অর্থ হলো জুলুম করা থেকে বাধা দেয়া। আর মজলুমকে সাহায্য করার অর্থ হলো, তাকে যুলুম থেকে রক্ষা করা। আর এটাই তার প্রকৃত সাহায্য। প্রত্যেক ব্যাপারে দেখা উচিত কে যালেম আর কে মজলুম। এরপর মুহাজির, আনসারী, গোত্র ও বংশ নির্বিশেষে প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য মজলুমকে জুলুম থেকে রক্ষা করা এবং জালেমের হাত চেপে ধরা- সে নিজের ভাই হোক অথবা নিজের বাপ হোক। এই দেশ ও বংশগত জাতীয়তা একটা জাহেলিয়াতের পচা স্লোগান। এর প্রতিফল [illegible] বাড়ানো ছাড়া আর কিছুই হয় না।

রাসূলের এই উপদেশবাণী শোনামাত্রই ঝগড়া মিটে গেলো। এ ব্যাপারে মুহাজির জাহজাহের বাড়াবাড়ি প্রমাণিত হলো। তার লাথির আঘাতে

আনসারী সিনান আহত হয়েছিলেন। হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে মাফ করিয়ে নিলেন। ফলে ঝগড়াকারী যালেম ও মযলুম উভয়ই পুনরায় ভাই ভাই হয়ে গেলো।

মুনাফিকদের যে দলটি গাণিমাতের মালের ভাগ পাবার লোভে মুসলমানদের সাথে এসেছিলো। তাদের নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই যখন মুহাজির ও আনসারীর মধ্যে সংঘর্ষের খবর পেলো, তখন সে একে মুসলমানদের মধ্যে ফাটোল ধরাবার একটা সুবর্ণ সুযোগ মনে করে নিলো। সে মুনাফিকদের এক মজলিসে, যাতে মুমিনদের মধ্যে কেবলমাত্র যায়েদ ইবনে আকরাম উপস্থিত ছিলেন। আনসারদেরকে মুহাজিরদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে বললো ঃ তোমরা মুহাজিরদেরকে নিজের দেশে ডেকে এনে মাথায় চড়িয়েছো। নিজেদের ধন-সম্পদ ও সহায়-সম্পত্তি তাদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছো। তারা তোমাদের রুটি খেয়ে লালিত-পালিত হয়ে এখন তোমাদেরই ঘাড় মট্কাচ্ছে। যদি তোমাদের এখনও জ্ঞান ফিরে না আসে, তবে পরিণামে এরা তোমাদের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তোলবে। কাজেই তোমরা ভবিষ্যতে টাকা-পয়সা দিয়ে তাদেরকে সাহায্য সহযোগীতা করো না। এতে তারা আপনা-আপনি ছত্রভঙ্গ হয়ে চলে যাবে। এখন তোমাদের দায়িত্ব হলো, মদীনায় ফিরে গিয়ে সম্মানীরা বহিরাগত এসব বাজে অসম্মানী লোকদেরকে বের করে দেবে।

সম্মানী বলে বুঝাচ্ছিলো তার নিজের মুনাফিক দল ও আনসারদেরকে এবং বাজে এবং অসম্মানী লোক বলে বুঝাচ্ছিলো রাসূলুরাহ (সাঃ) ও মুহাজির সাহাবায়ে কেরামদের। হযরত যায়েদ ইবনে আকরাম (রাঃ) একথা শোনা মাত্রই বলে উঠলেন ঃ আল্লাহর কসম, তুই-ই বাজে অসম্মানিত ও ঘৃণিত লোক। আর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-ই আল্লাহর শক্তির বলে এবং মুসলমানদের ভালোবাসার জোরে মহাসম্মানী।

আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের ইচ্ছা ছিলো যে, বিপদ দেখলে সে তার কপটতার উপর পর্দা ফেলে দেবে। তাই সে স্পষ্টভাষা ব্যবহার করেনি। কিন্তু হযরত যায়েদের রাগ দেখে তার হুঁস ফিরে এলো। পাছে তার মনের কুফরী ফাঁস হয়ে না পড়ে, এই ভয়ে সে হযরত যায়েদের কাছে ওজর পেশ করে বললো ঃ আমি তো একথাটা হাসির ছলে বলেছিলাম। আমার রাসূলের বিরুদ্ধে কোনো কিছু বলার উদ্দেশ্য ছিলো না।

হযরত যায়েদ ইবনে আকরাম (রাঃ) মুনাফিকদের মজলিশ থেকে উঠে সোজা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে গিয়ে সব ঘটনা বিস্তারিতভাবে বলে দিলেন। রাসূলের কাছে সংবাদটি খুবই গুরুতর মনে হলো। তার চেহারার পরিবর্তন দেখা দিলো। যায়েদ ইবনে আকরাম বয়সে ছোট থাকায় রাসূল (সাঃ) তাকে বললেনঃ ছেলে দেখো, তুমি আবার মিথ্যা বলছো না তোঃ যায়েদ কসম খেয়ে বললেন ঃ না, (হুজুর) আমি মিথ্যা বলছি না, আমি নিজ কানে এসব কথা শুনেছি। রাসূর (সাঃ) আবারও জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমার কোনো রকম বিভ্রান্তি হয়নি তোঃ যায়েদ উত্তরে আগের কথাই বললেন। এরপর মোনাফিক সর্দারের এই কথা গোটা মুসলমান বাহিনীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো। তাঁদের মধ্যে এছাড়া আর কোনো আলোচনাই রইলো না। এদিকে সব আনসার যায়েদ ইবনে আকরাম (রাঃ) কে তিরস্কার করতে লাগলো যে, তুমি নিজের জাতির নেতার বিরুদ্ধে অপবাদ দিয়ে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছো। এতে যায়েদ (রাঃ) বললেন ঃ আল্লাহর কসম, গোটা খাযরাজ গোত্রের মধ্যে আমার কাছে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ছাড়া আর কেউ প্রিয় নেই। কিন্তু যখন সে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর বিরুদ্ধে এসব কথাবার্তা বলেছে, তখন আমি সহ্য করতে পারিনি। যদি আমার বাপও এমন কথা বলতো তবে, আমি তাও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলে দিতাম।

অপর দিকে হযরত ওমর (রাঃ) ব্যাপারটি জানতে পেরে রাসূলের কাছে এসে আরজ করলেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই। অন্য বর্ণনায় আছে হযরত ওমর (রাঃ) এ কথা বলেছিলেন ঃ অপনি আমাকে অনুমতি না দিলে ওব্বাদ ইবনে বিশরকে নির্দেশ দেন, সে তার মাথা কেটে আপনার সামনে নিয়ে হাজির করুক।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তার একথায় বললেন ঃ ওমর এটা হয় না। এতে লোকেরা বলবে, দেখো! মুহাম্মদ নিজেই তার সঙ্গী সাথীদের হত্যা করছে। হযরত ওমর (রাঃ)-এর এই কথা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এর পুত্র জানতে পারলেন। তার নামও আব্দুল্লাহ ছিলো। তিনি খাঁটি মুসলমান ছিলেন। তিনি সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে হাজির হয়ে আরজ করলেনঃ

যদি আপনি আমার বাপকে এসব আপত্তিকর কথাবার্তার জন্য হত্যা করার ইচ্ছা রাখেন, তাহলে আমাকেই আদেশ করুন, আমি তার মাথা কেটে আপনার কাছে এই মজলিশ ত্যাগ করার আগেই হাজির করে দেবো। তিনি আরও বললেন ঃ গোটা খাযরাজ গোত্র সাক্ষী, তাদের কেউ আমার চেয়ে বেশী বাপ-মার সেবা ও আনুগত্যকারী নেই। কিন্তু আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে তাদেরও কোনো বিষয় সহ্য করতে পারবো না। আমার ভয় যে, আপনি যদি অন্য কাউকে আমার বাপকে হত্যা করার আদেশ দেন এবং সে তাকে হত্যা করে, তবে আমি আমার বাপের হত্যাকারীকে চোখের সামনে চলা-ফেরা করতে দেখে হয়তো আত্মসম্বরণ করতে পারবো না। এটা আমার জন্য আযাবের কারণ হবে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ(হে আবদুল্লাহ) তাকে হত্যা করার ইচ্ছা আমার নেই এবং কাউকে এ বিষয়ে আদেশও করিনি।

এই ঘটনার পর রাসূলের সাধারণ অভ্যাসের বিপরীতে অসময়ে সফর শুরু করার কথা ঘোষণা করে দিলেন এবং নিজে 'কসওয়া' উটের পিঠে সওয়ার হয়ে গেলেন। যখন সাহাবায়ে কেরাম রওয়ানা হয়ে গেলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে একাকী ডেকে এনে বললেন ঃ তুমি কি বাস্তবিকই এরূপ কথা বলেছো? সে অনেক কসম খেয়ে বললো ঃ আমি কখনও এমন কথা বলিনি। এই ছেলেটি মিথ্যা বলেছে, মোট কথা, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইবনে উবাইয়ের কসম ও ওযরকে গ্রহণ করে নিলেন। জনগণের মধ্যে (রাসুলকে অভিযোগকারী) যায়েদ ইবনে আকরাম (রাঃ) এর বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও তিরস্কার আরও বেড়ে গেলো। তিনি এই অপমানের ভয়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে লাগলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সমগ্র মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে সারাদিন ও সারারাত বিরতিহীন ভাবে সফর করলেন এবং পরের দিন সকালেও একটানা সফর অব্যাহত রাখলেন। অবশেষে যখন সূর্যের তেজ বাড়তে লাগলো, তখন তিনি কাফেলাকে এক জায়গায় থামিয়ে দিলেন। পুরো একদিন একরাত একটানা সফরের ফলে ক্লান্ত-শ্রান্ত সাহাবায়ে কেরাম মনজিলে অবস্থানের সাথে সাথে ঘুমিয়ে পড়লেন।

বর্ণনাকারী বলেন ঃ সাধারণ অভ্যাসের বিপরীতে তাৎক্ষণিক অসময়ে সফর করা এবং দীর্ঘ সময় সফর অব্যাহত রাখার পেছনে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর

উদ্দেশ্য ছিলো আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের ঘটনায় উদ্ভুত জল্পনা-কল্পনা থেকে মুজাহিদদের দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে নেয়া, যাতে এ বিষয়ে চর্চার সুযোগ না পায়।

এরপর রাসূলূল্লাহ (সাঃ) (মদীনার পথে) পুনরায় সফর শুরু করলেন। ইতোমধ্যে ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে উপদেশ দিলেন ঃ তুমি এক কাজ করো। রাসূলের কাছে হাজির হয়ে অপরাধ স্বীকার করে নাও। তিনি তোমার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থণা করবেন। এতে তোমার মুক্তি হয়ে যেতে পারে। ইবনে উবাই এই উপদেশ শোনে মাথা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিলে হযরত ওবাদা (রাঃ) তখনই বললেন ঃ আমার মনে হয়, তোমার এই অবজ্ঞা সম্পর্কে অবশ্যই কোরআনের আয়াত নাযিল হবে।

এদিকে সফর চলাকালে যায়েদ ইবনে আকরাম (রাঃ) বার বার রাসূল (সাঃ) এর কাছে আসতে লাগলেন। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো, এই মুনাফিক লোকটি আমাকে মিথ্যাবাদী বলে গোটা জাতির চোখে হেয় করেছে। অতএব আমার সত্যায়ন ও এই লোকের মিথ্যার মুখোশ উন্মোচন সম্পর্কে অবশ্যই কোরআনের আয়াত নাযিল হবে। এমতাবস্থায় হঠাৎ যায়েদ দেখলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর উপর ওহী নাযিলের আলামত ফুটে উঠেছে। যায়েদ (রাঃ) আশাবাদী হলেন যে, এখন এ সম্পর্কে কোনো ওহী নাযিল হবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ওহীর এই অবস্থা দূর হয়ে গেলো। যায়েদ (রাঃ) বলেন ঃ আমার সওয়ারী রাসূলূল্লাহ (সাঃ) এর কাছ ঘেঁষে যাচ্ছিলো। তিনি নিজের সওয়ারীর উপর থেকেই আমার কান ধরে বললেনঃ

يَاغُلَامُ صَدَقَ اللّٰهُ حَدِيْثَكَ وَنَزَلَتْ سُوْرَةُ الْمُنَافِقِيْنَ فِىْ اِبْنِ اُبَىْ مِنْ اَوَّلِهَا اِلٰى اٰخِرِهَا ـ

অর্থাৎ "হে বালক, আল্লাহ তাআলা তোমার কথার সত্যায়ন করেছেন এবং সম্পূর্ণ সূরা মুনাফিকুন ইবন উবাইয়ের ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।"

এই বর্ণনা থেকে জানা গেলো যে, সূরা মুনাফিকুন সফরের মধ্যেই অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু বগভী (রঃ) এর বর্ণনায় আছে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন মদীনায় পৌছে যান এবং যায়েদ ইবনে আকরাম (রাঃ) অপমানের ভয়ে

বাড়িতে আত্মগোপন করেন, তখন এই সূরা নাযিল হয়েছে। সূরা মুনাফিকুন অবতরণের পটভূমি বা কারণ এতটুকুই।

ব্যাখ্যা ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ -

অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি যেনো আল্লাহর স্মরন থেকে গাফেল করে না দেয়।"

এই সূরার প্রথম রুকুতে মুনাফিকদের মিথ্যা কসম ও চক্রান্ত উল্লেখ করা হয়েছে। দুনিয়ার মহব্বতে জড়িত হওয়াই ছিলো এসব কিছুর সারমর্ম। এ কারণেই তারা একদিকে মুসলমানদের কবল থেকে আত্মরক্ষা এবং অপরদিকে সুযোগ সুবিধা এবং গাণিমাতের মালের ভাগ বসাবার উদ্দেশ্যে নিজেদেরকে বাহ্যিক ভাবে মুসলমান বলে জাহির করতো। মুহাজির সাহাবীদের পেছনে আনসারদের পক্ষ থেকে ব্যয় বা খরচ করার ধারা বন্ধ করার যে চক্রান্ত মুনাফিকরা করেছিলো, এর পেছনেও এ কারণই নিহিত ছিলো।

এই দ্বিতীয় রুকুতে মুনাফিক মিশ্রিত মুসলমানদের মধ্যে খাঁটি মুমিনদেরকে সম্বোধন করে সতর্ক করা হয়েছে যে, তোমরা ঈমানের দাবীদার মুনাফিকদের মতো দুনিয়ার মহব্বতে ডুবে যেয়ো না। যেসব জিনিস মানুষকে দুনিয়াতে আল্লাহ থেকে গাফেল করে দেয়, যে সবের স্বার্থেই ঈমানের দাবী পূরণ, দায়িত্ব পালন থেকে মুখ ফিরিয়ে মুনাফেকী এবং ঈমানের দুর্বলতা কিংবা ফাসেকী বা নাফরমানী কাজে জড়িয়ে পড়ে তার মধ্যে দুটি জিনিষ সবচেয়ে বেশী কাজ করে, তা হলো- (১) ধন-সম্পদ এবং (২) সন্তান-সন্ততি। তাই এই আয়াতে এ দুটির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা সূরা তাগাবুনে ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততিকে ফিতনা হিসেবে উল্লেখ করে বলেন ঃ اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ অর্থাৎ "তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো তোমাদের জন্য ফেৎনা বা পরীক্ষা স্বরূপ। (তাগাবুন-১৫)

মূলত আল্লাহকে ভুলে যাওয়া বা আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে যাওয়া সকল প্রকার অন্যায় কাজের মূল কারণ। মানুষ মোটেও স্বাধীন নয়, এক আল্লাহর বান্দাহ, আর আল্লাহ তার কাজ কাম পুরোপুরি জানেন এবং একদিন তাঁর সামনে হাজির হয়ে নিজের সব কাজ-কামের খুঁটিনাটি হিসাব দিতে হবে, এ কথা যদি মানুষের মনে থাকে ভুলে না যায়, তা হলে কোনো প্রকার গুমরাহী বা পাপ কাজে জড়িয়ে পড়া কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। মানবীয় দুর্বলতার কারণে কখনও যদি পদস্খলন ঘটে যায় তবে হুঁস ফেরার সাথে সাথে সে নিজেকে সামলিয়ে নেয়, ফলে ভুল পথ পরিহার করে সঠিক পথে ফিরে আসতে পারে।

ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মহব্বত সকল অবস্থায় নিন্দনীয় নয়। বরং এগুলো নিয়ে ব্যস্ত থাকা এক পর্যায়ে কেবল জায়েযই নয় জরুরী হয়ে যায়। তবে সর্বদা এই সীমানার দিকে খেয়াল রাখতে হবে যে, এসব জিনিষ যেনো মানুষকে আল্লাহর জিকির (স্মরন) থেকে গাফেল বা ভুলিয়ে না দেয়। এখানে 'আল্লাহর স্মরণের' অর্থ কোনো কোনো তাফসীরবিদদের মতে পাঁচওয়াক্ত নামায, কারও মতে হজ্জ ও যাকাত এবং কারও মতে আল-কুরআন। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ স্মরণের অর্থ এখানে যাবতীয় আনুগত্য ও এবাদত বন্দেগী। এই অর্থ সবকিছুর মধ্যে পরিব্যাপ্ত। (কুরতুবী)

প্রিয় ভায়েরা আল্লাহ তাআলার এই বক্তব্যের সাথে আমাদের জীবনকে একটু মিলিয়ে দেখি। আমরা কি প্রকৃত খাটি ঈমানদার না দুনিয়ার স্বার্থবাজ মুনাফিক মুসলমান। বর্তমানে আমরা নিজেকে ঈমানদার মুমিন মুসলমান হিসেবে জাহির করলেও আমরা এ দু'টো জিনিস ধন-সম্পদ টাকা-পয়সা, গাড়ী-বাড়ী গড়ার কাজে এতো ব্যস্ত যে আল্লাহর দ্বীন কায়েমতো দূরের কথা চিন্তা করারও সুযোগ পাই না। দ্বীন ইসলামের ধার-ধারীনা। নিজের সন্তান-সন্ততিদের মহব্বতে এতো পেরেশান যে তাদেরকে কিভাবে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে, তাতে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক থাক বা না থাক তার চিন্তা করি না। সন্তানদের সুখ শান্তির জন্য সদাসর্বদা উদগ্রীব থাকি। কিন্তু আল্লাহর বিধান মানার ব্যাপারে থোড়াই তোয়াক্কা করি। তাহলে কি আমাদের আচার-আচারণ কাজ কাম

তথাকথিত ঈমানের দাবীদার মুনাফিকদের আচর-আচরণ কাজ কামের সাথে মিলে যাচ্ছে না? একটু ভেবে দেখুন!

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ـ

আর যাদের আচার-আচরণ এবং কাজ-কাম এমন হবে বা যারা দুনিয়াই ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততির মহব্বতে আল্লাহকে ভুলে যাবে তারাই ক্ষতিগ্রস্থ হবে।' যারা দুনিয়ার এসব জিনিসের মহব্বতে ডুবে যাবে তখন স্বাভাবিক ভাবেই আল্লাহকে ভুলে যাবে, আখেরাতের স্মরণ থাকবে না। তবে দুনিয়ার স্বার্থের জন্য নিজেকে মুসলমানের কাতারে রাখবে। আর এর পরিণতি তো মুনাফিকদের মতই হবে। আখেরাতের চরম ক্ষতির সম্মুখীন হবে। আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّمَا الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ـ

অর্থাৎ "নিঃসন্দেহে মুনাফিকদের (আখেরাতে) অবস্থান হবে জাহান্নামের সর্ব নিম্নস্তরে। (নিসা-১৪৫)

আয়াতে خٰسِرُوْنَ বলতে আখেরাতের এই চরম ক্ষতি জাহান্নামের কথায় বলা হয়েছে ঃ

وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ـ

"আমি তোমাদের যে রুযি দিয়েছে, তা থেকে মরণের আগেই ব্যয় করো।" এই আয়াতে মরণ আসা মানে মরণের আলামত দেখা দেয়া। উদ্দেশ্য এই যে, মরণের আলামত সামনে আসার আগেই শরীর সুস্থ্য এবং গায়ে বল থাকা অবস্থায় তোমাদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে খরচ করে পরকালের পুঁজি করে নাও। নাহলে মরার পর এই ধন-সম্পদ টাকা-পয়সা তোমাদের কোনো কাজে আসবে না।

আগের আয়াতে আল্লাহর স্মরণের' মানে করা হয়েছে যাবতীয় এবাদত বন্দেগী এবং শরীয়তের আদেশ-নিষেধ পালন করা। প্রয়োজনে ধন-সম্পদ ব্যয় করাও এর মধ্যে গণ্য ছিলো। এরপর এখানে অর্থ ব্যয় করাকে আলাদাভাবে উল্লেখ করার দুটো কারণ হতে পারে।

(এক) আল্লাহ এবং তার আদেশ-নিষেধ পালনে মানুষকে ভুলিয়ে এবং দূরে রাখার সবচেয়ে বড় মাধ্যম হচ্ছে ধন-সম্পদ। তাই যাকাত, ওশর, হজ্জ ইত্যাদি আর্থিক এবাদত আলাদাভাবে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে।

(দুই) মরার আলামত দৃষ্টির সামনে আসার সময় কারও সাধ্য নেই এবং কেউ কল্পনাও করতে পারে না যে, কাযা নামাজগুলো পড়ে নেবে, কাযা হজ্জ আদায় করবে অথবা কাযা রোযা রাখবে। কিন্তু ধন-সম্পদ টাকা পয়সা সামনে থাকে এবং এ বিশ্বাস হয়েই যায় যে, এখন এই ধন বা অর্থ তার হাত থেকে চলে যাবে। তখনই তাড়াতাড়ি ধন-সম্পদ খরচ করে আর্থিক এবাদতের দোষ থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করে।

হাদীসে "হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, একবার এক লোক রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করলো ঃ কোন সদকায় বা দানে সবচেয়ে বেশি সওয়াব পাওয়া যায়? তিনি বললেন ঃ "যে সদকা বা দান সুস্থ অবস্থায় এবং ভবিষ্যতের দিকে খেয়াল করে অর্থ ব্যয় করে ফেললে নিজেই গরীব হয়ে যাবার আশঙ্কা থাকা অবস্থায় করা হয়।" তিনি (রাসূল সাঃ) আরও বললেন ঃ আল্লাহর পথে ব্যয় করাকে সেই সময় পর্যন্ত দেরী করো না যখন জান তোমার গলার কাছে এসে যায় এবং তুমি মরতে থাকো আর বলো ঃ এই পরিমাণ অর্থ অমুককে দিয়ে দাও, এই পরিমাণ অর্থ অমুক কাজে ব্যয় করো।" (বুখারী, মুসলিম)

অথচ দুনিয়াতে দেখা যায় মানুষ ধন-সম্পদ এবং অঢেল প্রাচুর্যের আশায় কবরে যাবার পূর্ব পর্যন্ত মশগুল থাকে। আল্লাহ সূরা তাকাসূরে বলেন ঃ

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۝ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝

অর্থাৎ "প্রাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে এমন গাফেল রাখে যে, তোমরা কবর পর্যন্ত পৌছে যাও অর্থাৎ তোমাদের মরণ এসে যায়। অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর কাজে সময় দিতে পার না এবং তার পথে অর্থ-সম্পদ খরচ করারও সুযোগ করে উঠতে পারো না।

فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَا اَخَّرْتَنِيْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ـ

"অতপর সে বলে ঃ হে আমার রব, আমাকে আরও কিছু সময় সুযোগ দিলে না কেনো? তাহলে আমি দান সদকা করতাম এবং নেক বান্দাদের দলভুক্ত হয়ে যেতাম।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যে ব্যক্তির যাকাত ফরজ ছিলো, কিন্তু আদায় করেনি অথবা হজ ফরয ছিলো কিন্তু আদায় করেনি, সে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে আল্লাহর কাছে বাসনা প্রকাশ করে বলবে ঃ আমি আবার দুনিয়াতে ফিরে যেতে চাই, অর্থাৎ, আমার মরণ আরও দেরীতে আসুক, যাতে আমি দান-সদকাহ্ করে নিতে পারি এবং ফরয কাজ থেকে মুক্ত হয়ে যেতে পারি।

وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ "আর কিছু সময় পেলে এমন সব ভাল নেক কাজ-কাম করে নেব, যার দ্বারা আমি নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো। যেসব ফরয কাজ বাদ পড়েছে, সেগুলো পুরা করে নেবো এবং যেসব হারাম ও অপছন্দনীয় কাজ-কাম করেছি, সেগুলো থেকে তওবা করে নেবো। কিন্তু এর প্রতি উত্তরে আল্লাহ বলে দিয়েছেন ঃ-

وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا ـ

অর্থাৎ "যখন প্রত্যেক ব্যক্তির (মৃত্যুর) নির্দ্ধারিত সময় হাজির হয়ে যায়, তখন আল্লাহ কাউকেও (মরণের হাত থেকে) রেহায় দেন না।"

আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ আমার এটা নীতি নয় যে, তার জন্য যে মৃত্যুর সময় নির্ধারিত রয়েছে তার এদিক ওদিক করা। তার মৃত্যুর সময় হয়ে গেলে অবশ্যই তাকে মৃত্যুর ডাকে সাড়া দিতে হবে। সুতরাং তোমাদের এই যে বাসনা এটা নিরর্থক, তোমাদের এই বাসনা পূরণ করার কোনো সুযোগ আমার কাছে নেই।

وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ 'তোমরা যা যা করো আল্লাহ তাআলা সে বিষয়ে খবর রাখেন। (অর্থাৎ তোমাদের মুনাফিকী যে আচরণ এটা অন্যরা না জানলেও আল্লাহ বলেন, আমি তোমাদের মনের খবর খুব ভালো করেই জানি। তোমরা মুসলমানদের সাথে দুনিয়ার সুযোগ সুবিধা ভোগ করার জন্য তাল মিলিয়ে চলো, কিন্তু তোমরা মনের মধ্যে ভিন্ন চিন্তা করো। তোমাদের মনে এক, কাজে আরাক এসব বিষয়ের খবর আর কেউ

না জানলেও আমি আল্লাহ ভাল ভাবেই খবর রাখি। তোমাদের এসব কামনা বাসনা প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়।

শিক্ষা ঃ প্রিয় ভায়েরা সূরা মুাফিকুনের ২য় রুকুর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের পর আমাদের জন্য যে সব শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে তা হলো ঃ-

● মুনাফিকী ঈমান পরিহার করে খাঁটি নির্ভেজাল ঈমানদার হতে হবে। কাজের সাথে মনের নিয়্যাতের মিল থাকতে হবে।

● দুনিয়ায় স্বাভাবিকভাবে চলার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু হালাল উপয়ে ধন-সম্পদ কামায়ের চেষ্টা করা যাবে। কিন্তু ধন-সম্পদের প্রাচুর্য গড়ার জন্য আল্লাহর স্মরণ অর্থাৎ, তার আইন-কানুন বিধি-বিধানকে উপেক্ষা করেহালাল-হারামের বাচ-বিচার না করে ধন-সম্পদের পেছনে ছুটে দুনিয়াদারীতে ডুবে যাওয়া যাবে না।

● নিজের সন্তান-সন্ততিকে মহব্বত করা যাবে। কিন্তু সন্তান-সন্তুতির মহব্বতের জন্য আল্লাহর মহব্বতকে ত্যাগ করা যাবে না। ছেলেকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করার যে মানষিকতা তা পরিহার করতে হবে।

● যা কিছু করতে হবে মরণের আগেই আল্লাহকে পাবার জন্য করতে হবে। এ জন্য যতটুকু আল্লাহ রুযি-রেজেক দিয়েছেন তার থেকেই আল্লাহর পথে খরচ করতে হবে। একথা বলা যাবে না যে আল্লাহ আমাকে যখন বেশী ধন-সম্পদ দেবেন তখনই ব্যয় করবো।

● মরণ আসার পূর্বেই অর্থাৎ অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে এবং বৃদ্ধ হবার আগে যৌবনকালকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী, তার আইন-কানুন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এবং মানার মাধ্যমে নেক বান্দাহ হতে হবে।

● আল্লাহর স্মরণ থেকে কোনো সময়ে গাফেল না হবার জন্য সব সময় মরণকে স্মরণ রাখতে হবে।

আহবানঃ সম্মানিত ভায়েরা এতক্ষণ পর্যন্ত সূরা মুনাফিকুনের দ্বিতীয় রুকু থেকে যে দারস পেশ করলাম এতে যদি আমার জ্ঞানের বাইরে ভুল-ত্রুটি হয়ে যায় এজন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আর মুনাফিকী আচরণ পরিহার করে মরণের আগেই বয়স থাকতেই দুনিয়াতে ডুবে না গিয়ে আল্লাহর পথে খরচ, সৎ আমলের মাধ্যমে আল্লাহর প্রকৃত বান্দাহ হবার জন্য সবাই মিলে চেষ্টা করি। আল্লাহ আমাদের চেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন। (অতঃপর সালাম দিয়ে শেষ করবেন)।

দশ

কিয়ামতের দৃশ্য

সূরা হজ্ব ঃ ১-২ আয়াত

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۚ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ ۝ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَمَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ ۝

সরল অনুবাদ ঃ এরশাদ হচ্ছে– (১) ওহে লোকেরা! তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই কিয়ামতের প্রকম্পন একটা ভয়ংকর ব্যাপার। (২) সেদিন তোমরা দেখবে যে, প্রত্যেক দুধ দানকারিণী মা তার দুধের শিশুকে ভুলে যাবে এবং প্রত্যেক গর্ভবর্তী তার গর্ভপাত করে ফেলবে। আর মানুষকে তুমি দেখবে মাতাল, অথচ তারা প্রকৃত মাতাল নয়। বরং (সেদিনের) আল্লাহর আযাব হবে খুব কঠিন।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ يٰاَيُّهَا – ওহে, হে। النَّاسُ – মানুষ। اِتَّقُوْا – তোমরা ভয় করো। رَبَّكُمْ – তোমাদের প্রভু, প্রতিপালককে। اِنَّ – নিশ্চয়। زَلْزَلَةَ – প্রকম্পন। السَّاعَةِ – কিয়ামত। شَيْءٌ – জিনিস, বিষয়, ব্যাপার। عَظِيْمٌ – বড়, ভয়ংকর। يَوْمَ – দিন। تَرَوْنَهَا – তোমরা তা দেখবে, প্রত্যক্ষ করবে। تَذْهَلُ – ভুলে যাবে।

كُلُّ - প্রত্যেক। مُرْضِعَةٍ - দুধ দানকারিণী। اَرْضَعَتْ - দুধপানকারী শিশু। وَ - এবং। تَضَعُ - গর্ভপাত করবে। حَمْلٍ - গর্ভবতী। حَمْلَهَا - তার গর্ভের বোঝা, (সন্তান)। تَرَى النَّاسَ - তুমি মানুষকে দেখবে। سُكٰرٰى - নেশাগ্রস্ত, মাতাল। مَا - নয়। هُمْ - তারা। لٰكِنَّ - বরং, বস্তুতঃ। عَذَابٌ - শাস্তি। شَدِيْدٌ - কঠিন, শক্ত, ভয়ঙ্কর।

সম্বোধন ঃ সম্মানিত ইসলামী আন্দোলনের কর্মী/ইসলামপ্রিয় দ্বীনদার ভায়েরা /বোনেরা/ভাই ও বোনেরা! আসসালামু আলাইকুম অয়া রাহমাতুল্লাহি অয়া বারাকাতুহু। আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কালামে হাকীম থেকে দারস পেশ করার জন্য সূরা হজ্ব এর ১ ও ২নং আয়াত দু'টি তিলাওয়াত ও অনুবাদ করেছি। আল্লাহ্ তাআলা যেনো আমাকে সঠিকভাবে এবং সহীহ্ সালামতে দারস পেশ করার তাওফীক দান করেন। আমিন! অমা তাওফিকী ইল্লাবিল্লাহ্। (দারস দেবার সময় এভাবে বলবেন।)

সূরার নামকরণ ঃ এই সূরার চতুর্থ রুকুর দ্বিতীয় আয়াত- وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ "হজ্জ পালনের জন্য লোকদেরকে আহ্বান জানাও"-এর 'আল-হজ্ব' শব্দটিকে সূরার পরিচিতির জন্য নাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

সূরাটি নাযিলের সময়কাল ঃ এই সূরাটিকে এককভাবে মাক্কীও বলা যায় না আবার মাদানীও বলা যায় না। এতে উভয়ের সংমিশ্রণ রয়েছে। এই সূরা মাক্কী না মাদানী এ ব্যাপারে তাফসীরকারদের মধ্যে মতভেদ আছে। মনে হয় এর বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভঙ্গিতে মাক্কী মাদানী উভয় লক্ষণ দেখা যাবার কারণ এই যে, মাক্কী জীবনের শেষের দিকে সূরার ১ম অংশটি অবতীর্ণ হয় এবং শেষের অংশটি অর্থাৎ ২৫ নং আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত হিজরাতের পর মাদানী জীবনের প্রথম দিকে অবতীর্ণ হয়েছে। এর ফলে এই সূরার মধ্যে উভয় পর্য্যায়ের বৈশিষ্ট্য রয়েছে বিধায় সূরাটি মিশ্র।

সূরার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ঃ ইমাম কুরতুবী (রঃ) বলেন ঃ এই সূরার কতিপয় বৈচিত্র এই যে, এর কিছু আয়াত রাতে, কিছু দিনে, কিছু সফরে, কিছু বাড়ীতে অবস্থানকালে, কিছু মক্কায়, কিছু মদীনায় এবং কিছু যুদ্ধাবস্থায়

ও কিছু শান্তিকালে অবতীর্ণ হয়েছে। এছাড়া এর কিছু আয়াত 'নাসেখ' (রহিতকারী), কিছু 'মানসুখ' (রহিত) এবং কিছু মুহকাম (সুস্পষ্ট) ও কিছু 'মুতাশাবিহ্' (অস্পষ্ট)। সূরাটি নাযিলের সব রকমের বৈশিষ্ট্যই সন্নিবেশিত রয়েছে।

সূরাটির বিষয়বস্তু ঃ এই সূরার প্রথমে মানুষকে আল্লাহ্কে ভয় করার জন্য কিয়ামতের ভয়াবহ চিত্র তুল ধরা হয়েছে। সূরায় মক্কার মুশরিক, দ্বিধাগ্রস্ত ও সন্দেহ প্রবণ মুসলমান এবং খাঁটি ও সত্যিকার নিষ্ঠাবান মুসলমান এই তিন শ্রেণীর লোকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে।

মক্কার মুশরিকদেরকে শক্ত ভাষায় সতর্ক করে দেয়া হয়েছে এবং তাদেরকে জাহেলী চিন্তা পরিহার করে, মুসলমানদের উপর জুলুম নির্যাতন বন্ধ করতে বলা হয়েছে। শিরকের বিরুদ্ধে, তাওহীদ ও পরকালের পক্ষে অকাট্য প্রমাণ তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিধাগ্রস্ত ও সন্দেহপ্রবণ মুসলমানদেরকে ঈমান গ্রহণ করার পর ঝুকি না নেবার জন্য কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করা হয়েছে এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোন বিপদ-আপদ আসলে তা তোমরা কিছুতেই এড়াতে পারবে না বলা হয়েছে।

ঈমানদার লোকদেরকে দু ধরনের কথা বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এক ধরনের সম্বোধন করা হয়েছে তাদের নিজেদের উদ্দেশ্যে এবং আরব দেশের জনমতকে উদ্দেশ্য করে। আর অপর ধরনের সম্বোধন করা হয়েছে কেবলমাত্র ঈমানদার লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে।

এই সূরায় মুসলমানদেরকে কুরাইশদের অত্যাচার যুলুমের জবাবে শক্তি প্রয়োগ করার অর্থাৎ যুদ্ধের প্রাথমিক অনুমতি দেয়া হয়েছে এবং নিজেদের জীবনকে আদর্শবান হিসেবে গড়ে তুলতে বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ প্রিয় ভায়েরা, তেলাওয়াতকৃত আয়াত দু'টির প্রাথমিক ধারণা দেবার পর এখন প্রয়োজনীয় অংশের ব্যাখ্যা পেশ করছি।

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَىْءٌ عَظِيْمٌ

"ওহে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো। নিশ্চয়ই কিয়ামতের কম্পন বড় (ভয়াবহ) ব্যাপার।

এই আয়াতটি সফরের অবস্থায় রাসূল (সাঃ) এর উপর অবতীর্ণ হয়। (মুসলিম) এখানে গোটা মানব জাতিকে কিয়ামতের সেই কঠিন ভয়াবহতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সতর্ক করা হয়েছে। এই আয়াত এবং পরবর্তী আয়াতে কিয়ামতের ভয়াবহ একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

কিয়ামতের এই زَلْزَلَة প্রকম্পন কিয়ামতের শুরুতে হবে না মানুষের পুনরুত্থিত হবার পর ভূকম্পন হবে এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। কোন কোন তাফসীরকারের মতে এটা কিয়ামতের শুরুতে যে কম্পন সেটাকে বুঝানো হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, ভূকম্পন পুনরুত্থান ও হাশরের পর হবে। উভয়ের মতের পক্ষে হাদীসও রয়েছে। কিন্তু প্রথম মতের পক্ষে হাদীসও যেমন রয়েছে তেমনিভাবে এর সপক্ষে কুরআনে আরো অন্যান্য সূরায় বর্ণিত অনেক সামঞ্জস্যপূর্ণ আয়াত রয়েছে। আমি আলোচ্য আয়াতের' প্রকম্পন'কে কিয়ামতের প্রাথমিক অবস্থার ভূকম্পন হিসেবে ধরে নিয়ে এর একটি সংক্ষিপ্ত দৃশ্য কুরআন-হাদীসের আলোকে তুলে ধরছি।

শিংগায় ফূঁক তিনবার দেয়া হবে ঃ হযরত আবু হুরাইরার (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কিয়ামতের যে দৃশ্য তুলে ধরেছেন সেখানে বলা হয়েছে– শিংগা ফুঁক দেবার তিনটি সময় নির্দিষ্ট রয়েছে ঃ

প্রথম ফুঁক ঃ 'নফ্খে কাযা' অর্থাৎ বিভীষিকা সৃষ্টিকারী ফুঁক;

দ্বিতীয় ফুঁক ঃ 'নফ্খে সায়াক' অর্থাৎ বিপর্যয়ের ফুঁক।

তৃতীয় ফুঁক ঃ 'নফ্খে কেয়াম' অর্থাৎ হাশরের মাঠে উঠার ফুঁক।

এভাবে বলা যায় যে, প্রথম ফুঁকে কিয়ামতের বিভীষিকা সৃষ্টি করবে। দ্বিতীয় ফুঁকে সবকিছু মরে ধ্বংস হয়ে যাবে। এবং তৃতীয় ফুঁকে সবাই জীবিত হয়ে উঠে আল্লাহ্র দরবারে হাজির হবে। অতঃপর প্রথম ফুঁকের বিস্তারিত বিবরণ দিতে গিয়ে রাসূলে কারীম (সাঃ) বলেন ঃ তখন দুনিয়ার অবস্থা হবে সেই নৌকাটির মতো, যা প্রচণ্ড তুফানের ঘুর্ণাবর্তে পড়ে ঢেউয়ের ঘাত প্রতিঘাতে ডুবু ডুবু হয়ে পড়েছে। অথবা সেই ঝুলন্ত বাতিটির মতো, যা বাতাসের ঝাপটায় প্রচণ্ডভাবে দুলছে। সেই সময় মানুষের অবস্থা কেমন হবে সেই প্রসঙ্গে পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ

كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكْرٰى وَمَا هُمْ بِسُكْرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ ০

"কেয়ামতের সেই ভূকম্পনের দিন তোমরা দেখবে প্রত্যেক দুধদানকারী মা তার দুধের শিশুকে ভুলে যাবে এবং প্রত্যেক গর্ভবর্তী নারীর গর্ভ খসে পড়বে এবং লোকজনকে দেখবে তোমরা মাতাল। অথচ এই মাতলামী কোনো নেশার কারণে নয়। বরং আল্লাহর কঠিন আযাবে এই অবস্থা হবে।"

এখানে যে অবস্থার চিত্র অংকন করা হয়েছে তা হলো এই যে, কিয়ামতের মহাকম্পন যখন শুরু হবে, তখন মায়েরা তাদের আদরের সন্তান শিশুদের দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে ছেড়ে দিয়ে পালাবে। কোনো মা'ই নিজের প্রিয় সন্তানের কি অবস্থা হচ্ছে সেদিকে এক বিন্দু খেয়াল করতে পারবে না। আর যাদের পেটে সন্তান রয়েছে কঠিন ভয়াবহতার কারণে তাদের গর্ভপাত হয়ে যাবে অথচ টের পাবে না। আর লোকজন নেশা করলে যেমন মাতাল হয়ে যায় সেরকম তারা মাতাল হয়ে যাবে।

কিয়ামতের এই মহাপ্রকম্পনের সময় মানুষ এবং অন্যান্য সৃষ্টির যে অবস্থা হবে, কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতে তার চিত্র অংকিত হয়েছে। এ সম্পর্কে কয়েকটি আয়াত এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

সূরা ক্বারিয়ায় আল্লাহ বলেন ঃ

اَلْقَارِعَةُ ০ مَاالْقَارِعَةُ ০ وَمَا اَدْرٰكَ مَا الْقَارِعَةُ ০ يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ০ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ০

"করাঘাতকারী, করাঘাতকারী কি? করাঘাতকারী সম্পর্কে তুমি কি জানো? সেদিন মানুষ বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মতো ছুটোছুটি করবে এবং পাহাড়-পর্বত ধুনিত রঙ্গীন তুলার মতো উড়তে থাকবে।" (ক্বারিয়া ঃ১-৫)

সূরা যিলযালে আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا - وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ০ وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَالَهَا -

"যখন পৃথিবী ভীষণভাবে কেঁপে উঠবে, তখন উহা তার ভিতরের সমস্ত বোঝা বাইরে নিক্ষেপ (বের) করে দেবে এবং তখন মানুষ বলবে উহার কি হয়েছে?" (যিলযাল ঃ ১-৩)

সূরা ওয়াকেয়ায় আল্লাহ বলেন ঃ

إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا ۝ وَّبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۝ فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًّا ۝

"যেদিন যমীনকে (কঠিনভাবে) নাড়াছাড়া দেয়া হবে এবং পাহাড় রেণু রেণু হয়ে ধুলার মতো উড়তে থাকবে।" (ওয়াকেয়াহ ঃ ৪-৬)

সূরা হাক্কাহ্তে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ ۝ وَّحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً ۝ فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝

"শিঙ্গায় যখন একটি ফূঁক দেয়া হবে এবং পৃথিবী ও পাহাড়-পর্বত একই ধাক্কায় চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে, তখন সেই বিরাট (কিয়ামতের) ঘটনাটি ঘটবে। (আল হাক্কাহ ঃ ১৩-১৪)

সূরা নাযিয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۝ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ۝ قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ ۝ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۝

"যেদিন প্রথম শিঙ্গা ধ্বনি বিশ্বকে প্রকম্পিত করবে। পরে দ্বিতীয় শিঙ্গা ধ্বনি হবে, সেদিন লোকদের দেল কেঁপে উঠবে এবং দৃষ্টিসমূহ ভীত-সন্ত্রস্ত হবে। (নাযিয়াত ঃ ৬-৯)

আল্লাহ্ তাআলা সূরা মুজাম্মিলে বলেন ঃ

فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا ۝ السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ ـ

"তোমরা যদি নবীর কথা অমান্য করো, তাহলে কেমন করে রক্ষা পাবে সেদিনের বিপদ হতে, যেদিন শিশুদেরকে বৃদ্ধ বানিয়ে দেবে এবং যার কঠোর তীব্রতায় আসমান ফেটে যাবার উপক্রম হবে।(মুজাম্মিলঃ ১৭-১৮)

কিয়ামতের দৃশ্য সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ كَاَنَّهُ رَاْىُ عَيْنٍ فَلْيَقْرَا-"اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ" وَاِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ" وَاِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ"-

"যে ব্যক্তি নিজ চোখে কিয়ামতের দৃশ্য দেখতে চায় সে যেনো আত্ তাকভীর, আল ইনফিতার এবং আল ইনশিক্বাক সূরাগুলো পড়ে নেয়।" (তিরমিযী)

প্রিয় ভায়েরা, আমরা এবার এই তিনটি সূরায় কিয়ামতের দৃশ্য কিভাবে আল্লাহ পাক তুলে ধরেছেন তা একবার পাঠ করে দেখি-

সূরা তাকভীরে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

وَاِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ○ وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ ○ وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ○ وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ○ وَاِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ ○ وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ○

"যখন সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে, যখন নক্ষত্রসমূহ মলিন হয়ে যাবে, যখন পর্বতমালা (তার যায়গা থেকে) অপসারিত হবে, যখন দশ মাসের গর্ভবতী (প্রিয়) উটনিকে ছেড়ে দেয়া হবে, যখন বন্য পশুরা এক জায়গায় জড়ো হয়ে যাবে, যখন সমুদ্রকে উথাল-পাথাল করে তোলা হবে। (তাকভীর ঃ ১-৬)

আল্লাহ পাক সূরা ইনফিতারে বলেন ঃ

اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ○ وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ○ وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ○ وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ ○ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ ○

"যখন (কিয়ামতের ভয়াবহতায়) আকাশ ফেটে যাবে, যখন নক্ষত্রসমূহ ছিটকে পড়বে, যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে। এবং যখন কবরগুলোকে খুলে দেয়া হবে, তখন প্রত্যেকে জানতে পারবে সে কি আগে পাঠিয়েছে এবং কি পেছনে ছেড়ে এসেছে। (ইনফিতার ঃ ১-৫)

সূরা ইনশিকাকে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ○ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ○ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ○ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ○ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ○ -

(কিয়ামতের প্রকম্পনে) যখন আকাশ ফেটে যাবে ও তার রবের আদেশ পালন করবে এবং আকাশ এরই উপযুক্ত। অতঃপর যখন পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হবে এবং জমিন তার গর্ভে যা আছে তার সবকিছুই (উপরে) নিক্ষেপ করে শূন্যগর্ভ হয়ে যাবে এবং তার পালনকর্তার আদেশ পালন করবে আর পৃথিবী এরই উপযুক্ত। (ইনশিকাক ঃ ১-৫)

সম্মানিত ভায়েরা, কিয়ামতের শিঙ্গা ধ্বনির প্রথম কম্পনের ভয়াবহতার যে চিত্র তুলে ধরা হলো এতে মানব জাতির কেমন পরিণতি হবে তা বলা হয়েছে। পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র এবং নদী-নালা, আকাশ, চন্দ্র-সূর্য এবং তারকারাজীর কি কি অবস্থা হবে তাও তুলে ধরা হয়েছে।

কিয়ামতের ভয়াবহতা সৃষ্টিকারীর দায়িত্বে নিয়োজিত হযরত ইসরাফীল (আঃ) সার্বক্ষণিকভাবে আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায় আছেন। আল্লাহর নির্দেশ পাওয়া মাত্রই তিনি পর পর তিনবার শিঙ্গায় ফুঁক প্রদানের মাধ্যমে অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন। তাঁর দায়িত্বের এলার্টনেস এবং মানুষের করণীয় সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) বলেন ঃ

كَيْفَ أَنْعَمُ وَصَاحِبُ الصُّوْرِ قَدِ الْتَقَمَهُ وَأَصْغَى سَمْعَهُ وَقَنَى جَبْهَتَهُ يَنْتَظِرُ مَتَى يُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ - فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَاذَا تَأْمُرُنَا، قَالَ قُوْلُوْا "حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ" -

"কিভাবে আমি ভোগ-বিলাসে জীবন যাপন করতে পারি যেখানে শিঙ্গাধারী (ইসরাফীল আঃ) মুখে শিঙ্গা ধরে, কান খাড়া করে, কপাল নুইয়ে, আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায় আছে? লোকেরা বললো ঃ হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে আমাদের প্রতি আপনার নির্দেশ কি? তিনি বললেন ঃ তোমরা বলো

"হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল" অর্থাৎ আমাদের জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বোত্তম পৃষ্ঠপোষক। (তিরমিযী)

শিক্ষা ঃ সম্মানিত ভায়েরা, কিয়ামতের দৃশ্য সম্পর্কে সুরা হজ্বের ১ম দু'টি আয়াত থেকে যে দারস পেশ করলাম তা থেকে আমাদের জন্য শিক্ষা হলো–

● কেয়ামত কবে হবে আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো জানা নেই।

● কেয়ামতের ভয়াবহ আযাব সকলকেই ভোগ করতে হবে।

● যেহেতু কেয়ামত কবে হবে জানা নেই এ জন্য প্রতিটি মূহুর্ত আল্লাহ্ স্মরণে অতিবাহিত করতে হবে।

● আখেরাতের চিরস্থায়ী কঠিন আযাব থেকে বাঁচার জন্য দুনিয়ায় ভোগ-বিলাসে ডুবে না গিয়ে আখেরাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

● আল্লাহর বিধান সকল ক্ষেত্রে মানার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিৎ। এজন্য মুমিনের জিন্দেগীই হবে মজবুত ঈমান এবং জেহাদের জিন্দেগী।

আহ্বান ঃ প্রিয় ভায়েরা, এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা হজ্জের ১ ও ২ নং আয়াত থেকে যে দারস পেশ করলাম এতে যদি কোন ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যায় এজন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আর আসুন আমরা কিয়ামতের সেই কঠিন ভয়াবহতার কথা স্মরণ করে আল্লাহর এবং তার রাসূলের বিধানকে মেনে চলার সবাই চেষ্টা করি। আমরা দারস থেকে যে শিক্ষা লাভ করলাম তা বাস্তব জীবনে মানার তাওফীক কামনা করে শেষ করছি।

এগার
আনুগত্য-তাক্ওয়া-মজবুত ঈমান ও তার প্রতিদান

(সূরা আনফাল-১-৪)

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّى عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۰ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۰ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۰ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ۰

সরল অনুবাদ ঃ ইরশাদ হচ্ছে- (১) (হে রাসূল!) তোমার কাছে (তাঁরা) গনীমতের মাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে ? বলে দাও, এই গনীমতের মাল তো আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের। অতএব তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো এবং নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককে সংশোধন (সুদৃঢ়) করে নাও। আর আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো-যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো। (২) প্রকৃত ঈমানদার তো তারাই- যাদের অন্তর আল্লাহ্র স্মরণকালে ভয়ে কেঁপে উঠে। আর আল্লাহ্র আয়াত তথা কালাম যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা তাদের রবের উপর আস্থা এবং ভরসা রাখে। (৩) তারা নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রুযী দিয়েছি তা থেকে (আমার পথে) খরচ করে। (৪) এসব লোকেরাই হলো সত্যিকারের মুমিন। তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট উচ্চ মর্যাদা, অপরাধের ক্ষমা এবং সম্মানজনক রুযী।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ يَسْئَلُوْنَكَ - তোমাকে তারা জিজ্ঞেস বা প্রশ্ন করে।

عَنْ - সম্পর্কে। اَنْفَال- অতিরিক্ত (গনীমত)। قُلْ- বলো বা বলুন। لِلّٰهِ - আল্লাহর জন্য। فَاتَّقُوا اللّٰهَ- অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। وَ- এবং। اَصْلِحُوْا- তোমরা সংশোধন করো। ذَاتَ- অবস্থা। بَيْنِكُمْ–তোমাদের মধ্যকার। اَطِيْعُوْا - তোমরা আনুগত্য করো। اِنْ- যদি। كُنْتُمْ- তোমরা হও। اِنَّمَا- প্রকৃতপক্ষে। اَلَّذِيْنَ- যারা। اِذَا- যখন। ذُكِرَ اَللّٰهُ- আল্লাহর স্মরণ হয়। وَجِلَتْ- কেঁপে উঠে। قُلُوْبُهُمْ- তাদের অন্তর বা দেল। تُلِيَتْ - পাঠ করা হয়। عَلَيْهِمْ- তাদের নিকট। اٰيٰتُهٗ- তাঁর আয়াত বা কালাম। زَادَ - বৃদ্ধি। هُمْ اِيْمَانًا- তাদের ঈমান। عَلٰى- উপর। رَبِّهِمْ- তাদের রব বা প্রতিপালকের। يَتَوَكَّلُوْنَ -তারা নির্ভর বা ভরসা রাখে। يُقِيْمُوْنَ - কায়েম করে। اَلصَّلٰوةَ - নামায। رَزَقْنٰهُمْ- আমি তাদের রুযী দিয়েছি। يُنْفِقُوْنَ- তারা ব্যয় বা খরচ করে। اُوْلٰئِكَ- এসব লোক। هُمْ- তারাই। حَقًّا- প্রকৃত বা সত্যিকার। لَهُمْ- তাদের জন্য। دَرَجٰتٌ- উচ্চ মর্যাদা। عِنْدَ- কাছে বা নিকটে। رَبِّهِمْ- তাদের রবের। وَمَغْفِرَةٌ- এবং ক্ষমা। رِزْقٌ كَرِيْمٌ- সম্মানজনক রুযী।

সম্বোধন ঃ দারসে কুরআন মাহফিলে/অনুষ্ঠানে উপস্থিত সম্মানিত ভায়েরা/বোনেরা/ ভাই ও বোনেরা! আস্‌সালামু আলাইকুম। আমি আপনাদের সামনে সূরা আনফাল-এর ১-৪ নং পর্যন্ত মোট চারটি আয়াত তেলাওয়াত ও সরল অনুবাদ পেশ করেছি। আল্লাহ্ পাক যেন আমাকে সঠিকভাবে দারস পেশ করার তাওফীক দান করেন। আমিন।

সূরার নামকরণ ঃ অন্যান্য সূরার ন্যায় এই সূরাটিও প্রতিকী বা চিহ্ন হিসেবে ১ম আয়াতে উল্লেখিত اَنْفَالُ শব্দটিকেই সূরার নামকরণ করা হয়েছে। اَنْفَالُ শব্দটি نَفْلٌ (নফল)এর বহুবচন। যার অর্থ অতিরিক্ত, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বা 'গনীমত'। এই সূরাটির নাম শিরোনাম হিসেবে না হলেও এই সূরায় যুদ্ধলব্ধ সম্পদ গনীমত সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

সূরাটি নাযিল হবার সময়কাল ঃ সূরাটি মাদানী। এই সূরাটি হিজরী দ্বিতীয় সনে প্রথম যুদ্ধ বদর যুদ্ধের পরে নাযিল হয়। এতে ইসলাম ও কুফর-এর মধ্যে প্রথম সংঘটিত যুদ্ধের বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়েছে। সূরার আলোচ্য বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করলে মনে হয় সম্ভবতঃ সম্পূর্ণ ভাষণটি এক সঙ্গেই নাযিল হয়েছে। তবে এটাও সম্ভব যে, এর কোন আয়াত বদর যুদ্ধজনিত সমস্যা ও বিষয়াদি সম্পর্কে

পরে নাযিল হয়েছে এবং ধারাবাহিকতায় উপযুক্ত স্থানে তা সন্নিবেশিত করে একটি ধারাবাহিক ভাষণের রূপদান করা হয়েছে।

সূরার বিষয়বস্তু ঃ মাদানী সূরা আনফালের পূর্ববর্তী সূরা আ'রাফে মুশরেকীন তথা অংশীবাদী এবং আহলে কেতাব তথা ইহুদী-নাসারাদের মূর্খতা, বিদ্বেষ, কুফরী, ফেৎনা-ফাসাদ এবং বিশৃংখলা সম্পর্কে আলোচনা এবং বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আর বর্তমান এই সূরা আনফালে আলোচিত অধিকাংশ বিষয়ই বদরের যুদ্ধকালে সেই কাফের মুশরিক ও আহলে কিতাবিদের অশুভ পরিণতি, তাদের পরাজয় ও বিফলতা এবং তাদের মোকাবেলায় মুসলমানদের বিজয় ও সফলতা যা মুসলমানদের জন্য ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে একান্ত কৃপা এবং কাফের মুশরিকদের জন্য ছিলো আযাব ও প্রতিশোধ স্বরূপ।

আর যেহেতু এই কৃপা ও দানের সব চাইতে বড় কারণ ছিলো মুসলমানদের নিঃস্বার্থতা, পারস্পরিক ঐক্য, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পরিপূর্ণ আনুগত্যের ফল, সেহেতু সূরার প্রথমেই তাক্ওয়া-পরহেযগারী, আল্লাহ্ এবং আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য, যিকির ও আস্থা এবং ভরসা প্রভৃতি নৈতিক বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তাছাড়া এই সূরায় যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে শিক্ষামূলক কথা বলা হয়েছে। এই সূরায় যুদ্ধলব্ধ সম্পদ গনীমতের বিলি-বন্টন সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

এই সূরায় যুদ্ধ ও সন্ধির আইন সংক্রান্ত কতকগুলি নৈতিক হেদায়াত দান করা হয়েছে। সূরার সর্বশেষে ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক আইনের কতকগুলি ধারার উল্লেখ করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ প্রিয় ভাই ও বোনেরা! তেলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর দারস সহজে বুঝার জন্য এতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনাদের সামনে সূরার কতিপয় প্রয়োজনীয় বিষয় উল্লেখ করলাম। এখন আমি আপনাদের সামনে সূরা আনফালের ১-৪র্থ নম্বর পর্যন্ত আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা পেশ করছি।

মহান আল্লাহ্ সূরা আনফালের ১ম আয়াতে বলেন ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ-

(হে রাসূল!) তোমার কাছে (তাঁরা) গনীমতের মাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে? তুমি তাদেরকে বলে দাও, এই গনীমতের মাল তো আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককে সংশোধন তথা সুদৃঢ় করে নাও। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো– যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো।

শানে নুযুল ঃ অত্র এই আয়াতটি মুসলমানদের প্রথম সম্মুখযুদ্ধ বদর যুদ্ধে সংঘটিত একটি ঘটনার সাথে সম্পর্কিত।

ঘটনাটি হলো এই যে, কাফের ও মুসলমানদের সাথে প্রথম যুদ্ধ বদরে যখন মুসলমানদের বিজয় হয়ে গেল এবং কিছু গনীমতের মাল-সামান হাতে এলো, তখন সেগুলোর বিলি-বন্টন নিয়ে সাহাবাদের মধ্যে এমন এক ঘটনা ঘটে, যা নিঃস্বার্থতা– এখলাস ও ঐক্যের সেই উচ্চমানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিলো না, যার উপর ভিত্তি করে সাহাবায়ে কেরামের গোটা জীবন ঢেলে সাজানো ছিলো। সেই জন্য সর্বাগ্রে এ আয়াতে তার সমাধান দেয়া হয়, যাতে করে এই পুতঃপবিত্র এবং নিষ্কলুষ সম্প্রদায়ের অন্তরে বিশ্বাস ও নিঃস্বার্থতা এবং ঐক্য ও আত্মত্যাগের প্রেরণা ছাড়া অন্য কিছু থাকতে না পারে।

এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ বদর যুদ্ধে স্বয়ং অংশগ্রহণকারী হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। যা মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা, মুসতাদরাকে-হাকেম প্রভৃতি কিতাবে উল্লেখ রয়েছে।

হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) এর কাছে কোন এক লোক আয়াতে উল্লেখিত اَنْفَالُ (আনফাল) শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ এ আয়াতটি তো আমাদের অর্থাৎ বদর যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেছিলাম তাদের সম্পর্কেই নাযিল হয়। সে ঘটনাটি ছিলো এই যে– গনীমতের মালামাল বিলি-বন্টন সংক্রান্ত বিষয়ে আমাদের মাঝে সামান্য মতোবিরোধ হয়ে যায় যা আমাদের চরিত্রে একটা অশুভ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। আল্লাহ্ এই আয়াত নাযিলের মাধ্যমে গনীমতের সমস্ত মালামাল আমাদের হাত থেকে নিয়ে রাসূলে করীম (সাঃ) দায়িত্বে অর্পণ করেন। আর রাসূলে করীম (সাঃ) বদরে অংশগ্রহণকারী সবার মধ্যে সমান ভাবে সেগুলো বিলি-বন্টন করে দেন।

ব্যাপার ঘটেছিলো এই– বদরের যুদ্ধে আমরা সবাই রাসূলের সাথে বেরিয়ে যাই এবং উভয় দলের মধ্যে তুমুল যুদ্ধের পর আল্লাহ্ তাআলা যখন শত্রুদের পরাজিত করে দেন, তখন আমাদের সেনাবাহিনী তিনটি ভাগে ভাগ হয়ে যায়। কিছু লোক শত্রুদের পিছন ধাওয়া করে যাতে তারা পুনরায় ফিরে আসতে না পারে। কিছু লোক কাফেরদের ফেলে যাওয়া মালামাল সংগ্রহ করতে থাকে। আর কিছু লোক রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর পাশে এসে তাঁর হেফাজতে আত্মনিয়োগ করে। যুদ্ধ শেষ করে যখন সবাই একই স্থানে উপস্থিত হলো তখন যারা গনীমতের মালামাল সংগ্রহ করেছিলো– তারা বলতে লাগলো যে, এসব মালামাল যেহেতু আমরা সংগ্রহ করেছি, সেহেতু এতে আমাদের ছাড়া আর কারো ভাগ নেই। অপর দল যারা শত্রুদের পিছন ধাওয়া করেছিলো তারা বললো, এতে তোমরা আমাদের চাইতে বেশী হকদার নও। কারণ, আমরাই তো শত্রুকে হটিয়ে দিয়ে তোমাদের গনীমতের মালামাল নিশ্চিন্তে সংগ্রহ করার সুযোগ করে দিয়েছি। পক্ষান্তরে যারা মহানবী (সাঃ) এর হেফাজতের জন্য তাঁর কাছে ছিলো, তারা বললো, আমরাও

তো ইচ্ছা করলে গনীমতের মাল সংগ্রহ করার জন্য তোমাদের সাথে অংশগ্রহণ করতে পারতাম। কিন্তু আমরা জেহাদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ আল্লাহর নবীর হেফাজতে নিয়োজিত ছিলাম। অতএব আমরাও এর হকদার। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবাদের এসব কথা-বার্তা আল্লাহ্‌র রাসূলের কাছে পৌঁছলে এই আয়াতটি নাযিল হয়। এতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এসব মাল-সামান আল্লাহ্ তাআলার। একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া এর অন্য কেউ মালিক বা হকদার নয়; শুধু তাকে ছাড়া যাকে রাসূল (সাঃ) দান করেন। সুতরাং মহানবী (সাঃ) আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ অনুযায়ী এসব মাল-সামান জেহাদে অংশগ্রহণকারী মোজাহীদদের মধ্যে সমানভাবে বন্টন করে দেন। (ইবনে কাসীর)।

গনীমত সংক্রান্ত এই বিধান নাযিল হবার পর সকল গ্রুপই আপন আপন দাবী প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ্ ও রাসূলের এই সিদ্ধান্তের উপর রাজী হয়ে যায় এবং তাঁদের মহান মর্যাদার পরিপন্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিলো তার জন্য সবাই লজ্জিত হন।

আসলে গনীমতের মাল সম্পর্কে সাহাবাদের মাঝে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিলো এটা তাদের ইচ্ছাকৃত কোন বিষয় ছিলো না। কেননা ইসলাম কবুল করার পর এটাই তাদের প্রথম যুদ্ধ এবং প্রথম বিজয়–এই কারণে যুদ্ধ ও যুদ্ধলব্ধ মাল-সামান কিভাবে বিলি-বন্টন হবে এটা তাদের জানা ছিলো না এবং এর কোন স্পষ্ট বিধানও ছিলো না। জাহেলিয়াতের যুগের প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী তারা গনীমতের মাল আপন আপন স্থানে থেকে দাবী করে বসেছিলো।

اَنْفَالُ (আনফাল) শব্দটি বহুবচন। একবচনে نَفْلُ (নফল) বলা হয়। যার আভিধানিক অর্থ– অনুগ্রহ, দান, উপঢৌকন। ব্যবহারিক অর্থে نَفْلُ (নফল) বলা হয় আবশ্যকীয় ও মূল পাওনার অতিরিক্ত জিনিসকে। নফল নামায, নফল রোজা, সদকা প্রভৃতিকে এ কারণেই نَفْلُ (নফল) বলা হয়। এসব আমল বা কাজ যারা করে তারা নিজের খুশীতেই করে থাকে। কুরআন এবং হাদীসের পরিভাষায় নফল ও আনফাল গনীমত তথা যুদ্ধলব্ধ মালামালকে বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। আল কুরআনে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে তিনটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে ঃ (১) اَنْفَالُ(আনফাল) (২) غَنِيْمَةُ (গনীমাত) এবং (৩) فَئٌ- (ফাই)। اَنْفَالُ শব্দটি তো এই আয়াতেই উল্লেখ করা হয়েছে। আর غَنِيْمَةُ- (গনীমাত) শব্দ অত্র সূরার একচল্লিশ তম আয়াতে উল্লেখ রয়েছে। আর فَئٌ (ফাই) সূরা হাশরের ছয় নম্বর আয়াতে উল্লেখিত وَمَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ এর ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে।

গনীমাত ঃ সেই সমস্ত মাল-সম্পদকে বুঝায়– যা যুদ্ধ-জিহাদের মাধ্যমে বিরোধী পক্ষের কাছ থেকে অর্জন করা হয়।

ফাই ঃ আর ফাই বলা হয় সেই মাল-সামানকে যা কোন যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়াই কাফেরদের কাছ থেকে পাওয়া যায়। তা সেগুলো ফেলে কাফেরেরা পালিয়েই যাক অথবা স্বেচ্ছায় দিয়ে দিতে রাজী হোক।

আনফাল ঃ নফল বা আনফাল শব্দটি অধিকাংশ সময় এনআম বা পুরস্কার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যা জেহাদের নায়ক বা প্রধান সেনাপতি কোন বিশেষ মুজাহিদ বা সৈন্যকে তার কৃতিত্বের বিনিময় হিসেবে গনীমতের প্রাপ্য অংশের অতিরিক্ত পুরস্কার দিয়ে থাকে।

গনীমাত এবং ফাই এর বন্টন পদ্ধতি ঃ

সাহাবীদের আভ্যন্তরীণ মতানৈক্য এবং রাসূল (সাঃ) কে প্রশ্ন করার কারণে প্রথমে গণীমতের মাল-সামান আল্লাহ্ এবং রাসূলের বলে আল্লাহ্ ঘোষণা করেন। তার অর্থ এই যে, এগুলোর প্রকৃত মালিকানা আল্লাহ্র এবং রাসূল (সাঃ) হচ্ছেন সেগুলোর ব্যবস্থাপক। পরবর্তীতে অত্র সূরার ৫ম রুকুর ৩১ নম্বর আয়াতে উহা বন্টনের নীতি মালা বর্ণনা করা হয়েছে– যা এক কথায় বলা যায় গনীমাতের পাঁচ ভাগের এক ভাগ বায়তুলমাল তথা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হবে এবং বাকী চার ভাগ যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী মুজাহীদদের মধ্যে সমভাবে বন্টিত হবে।

আর 'ফাই' যেহেতু বিনা যুদ্ধেই ধন-সম্পদ অর্জিত হয়– সেইহেতু এর হকদার বা অধিকারী আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ নয়। এই জন্য উহার সমস্ত সম্পদ বায়তুল মাল তথা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হবে এবং যুদ্ধ জিহাদের কাজে ব্যয় ব্যবহার হবে।

আর 'আনফাল' শব্দটি উভয় মালামালের জন্য সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত হয় এবং সেই বিশেষ পুরস্কার বা উপঢৌকন অর্থেও ব্যবহার হয়– যা জেহাদের নেতা বা অধিনায়ক দান করেন।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এই আয়াতের মোটামুটি বিষয়বস্তু দাঁড়াল এই যে– এতে আল্লাহ্ তাআলা রাসূলে কারীম (সাঃ)কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন যে, তোমার কাছে লোকেরা 'আনফাল' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে তুমি তাদেরকে বলে দাও যে, 'আনফাল' (গনীমাত) সবই হলো আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের। অর্থাৎ নিজস্বভাবে কেউ এসবের অধিকারী বা মালিক নয়। আল্লাহর নির্দেশক্রমে রাসূল (সাঃ) এসবের ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত নেবেন– তাই কার্যকর হবে। এখানে আর বিস্তারিত ভাবে অন্য কিছু না বলার উদ্দেশ্য এই যে, প্রথম পর্যায়েই আল্লাহ্র নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করার ভাবধারা পূর্ণত্ব লাভ করা

আয়াতের পরবর্তী অংশে মহান আল্লাহ্ তাআলা সাহাবাদের মধ্যে সাময়িকের জন্য যে সৌহার্দ্য ও ঐক্য বিনষ্ট হয়েছিল তা ফিরিয়ে পাবার জন্য ঘোষণা করেন–

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, নিজেদের মধ্যকার সম্পর্ককে সংশোধন করে নাও এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো– যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো।

এই আয়াতাংশে ইঙ্গিত করা হয়েছে সে ঘটনার প্রতি যা বদর যুদ্ধে গনীমাতের মাল-সম্পদ বন্টন সংক্রান্ত বিষয়ে সাহাবাদের মাঝে ঘটে গিয়েছিলো। আর তা পূরণের কেন্দ্রবিন্দু হলো তাক্ওয়া বা খোদাভীতি।

وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ অর্থাৎ (তাক্ওয়া ও খোদাভীতির মাধ্যমে) তোমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের সংশোধন করো। এরই কিছুটা বিশ্লেষণ করে পরবর্তী অংশে বলা হয়েছে

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ **অর্থাৎ তোমরা যদি মুমিনই হবে তাহলে আল্লাহ্ ও তার রাসূলের পূর্ণ আনুগত্য করো। অর্থাৎ ঈমানের দাবীই হলো আনুগত্য। আর আনুগত্যের ফল হলো তাক্ওয়া। কাজেই** মানুষ যখন ঈমানের ভিত্তিতে আনুগত্য করে তাক্ওয়া অর্জন করতে সমর্থ হয়– তখন তাদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ, লড়াই-ঝগড়া আপনা আপনিই দূর হয়ে যায় এবং শত্রুতার স্থলে অন্তরে সৃষ্টি হয় প্রেম-ভালবাসা ও সৌহার্দ্য।

অত্র সূরার ২য় এবং ৩য় আয়াতে আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসূলের আনুগত্যের মাধ্যমে তাক্ওয়া অর্জনকারী ঈমানদারদের পাঁচটি গুণ বা বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ২য় আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ-

নিশ্চয়ই যারা মুমিন তারা এমন যে– যখন তারা আল্লাহর নাম যিকর বা স্মরণ করে তখন তাদের অন্তর কেঁপে উঠে, আর যখন তাদের সামনে তাঁর কালাম পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা তাদের রবের উপর আস্থা ও ভরসা রাখে।

এই আয়াতে মুমিনদের তিনটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম বৈশিষ্ট্য ঃ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ যখন আল্লাহ্র যিকির বা স্মরণ হয় তখন তাদের অন্তর (ভয়ে) কেঁপে উঠে। অর্থাৎ মুমিনদের অন্তর আল্লাহ্র মহত্ব ও প্রেমে পরিপূর্ণ, যার দাবী হলো ভয় ও ভীতি। পবিত্র কুরআনের

অন্য এক আয়াতে খোদাপ্রেমিকদের সুসংবাদ দিয়ে বলা হয়েছে–

وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ

(হে নবী) তুমি সুসংবাদ দিয়ে দাও সে সব বিনয়ী, কোমলপ্রাণ লোকদেরকে, যখন তাদের সামনে আল্লাহ্‌র আলোচনা হয়, তখন তাদের অন্তর ভীত-সন্ত্রস্থ হয়ে উঠে।

এই উভয় আয়াতে আল্লাহ্‌র আলোচনা ও স্মরণের একটা বিশেষ অবস্থা সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে– তা হলো ভয় ও ত্রাস। অবশ্য অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্‌র স্মরণের অবস্থা বর্ণনা করে বলা হয়েছে –

أَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ আল্লাহ্‌র যিকর বা আলোচনার দ্বারাই আত্মা শান্তি লাভ করে– প্রশান্ত হয়।

এতে বোঝা যায় যে– আয়াতে যে ভয় বা ভীতির কথা বলা হয়েছে, তা মনের প্রশান্তি এবং স্বস্তির পরিপন্থী নয়– যেমন জঙ্গলের হিংস্র জীবজন্তু বা শত্রুর দ্বারা মানুষের শান্তিকে ধ্বংস করে দেয়। আল্লাহ্‌র যিকিরের দ্বারা অন্তরে যে ভয় সৃষ্টি হয় তা সম্পূর্ণ আলাদা। সেজন্য এখানে خَوْفٌ এর পরিবর্তে وَجَلٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন যে, এখানে আল্লাহ্‌র যিকির বা স্মরণ অর্থ হচ্ছে– কোন ব্যক্তি যখন কোন পাপ কাজে লিপ্ত হতে ইচ্ছা করে, আর তখনই আল্লাহ্‌র কথা তার স্মরণ হয়ে যায় তখন আল্লাহ্‌র আযাবের ভয়ে সে ভীত হয়ে নিজে পাপ কাজ থেকে বিরত থাকে। এক্ষেত্রে ভয় অর্থে হবে আযাবের ভয়। (বাহরে মুহীত)

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ঃ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ إِيْمَانًا এবং এখন তাদের সামনে আল্লাহ্‌র আয়াত পাঠ করা হয় তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায়। সকল বিশেষজ্ঞ আলেম, তাফসীরবিদ ও হাদীসের বিশেষজ্ঞদের সর্বসম্মত মতে– ঈমান বৃদ্ধির অর্থ হলো ঈমানের শক্তি, অবস্থা এবং ঈমানী জ্যোতির উন্নতি। বাস্তবতা ও অভিজ্ঞতার দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, সৎ কর্মের দ্বারা ঈমানীশক্তি এবং এমন আত্মিক প্রশান্তি পয়দা হয়– যার প্রেক্ষিতে সৎ আমল বা কর্ম করা ঈমানদার মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। আর এই অভ্যাস পরিহার করতে গেলে মারাত্মক কষ্ট হয় এবং পাপ কাজের প্রতি স্বাভাবিক ভাবেই ঘৃণা সৃষ্টি হয়, যার ফলে সে তার কাছেও যেতে পারে না। ঈমানের এ অবস্থাকেই হাদীসে "ঈমানের মাধুর্য্য" শব্দে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তবে একথা ঠিক যে মানুষের এ ধরনের মজবুত ঈমান থাকা সত্ত্বেও শয়তানের ওয়াসওয়াসায় পদস্খলন ঘটতেও পারে।

এজন্য আল্লাহ্‌র কাছে সদা সর্বদা দোআ করা উচিত ঃ
যেমন মহান আল্লাহ্ আমাদের দোআর ভাষা শিখিয়ে দিয়ে বলেন ঃ

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ

হে আমাদের পরওয়ারদেগার! হেদায়াতের সঠিক পথ দেখানোর পর তুমি আমাদের অন্তরকে বিগড়িয়ে দিও না এবং তোমার অনুগ্রহ আমাদেরকে দান করো। তুমি তো সবকিছুর দাতা। (আলে ঈমরান-৮)

আমাদের আরো দোআ করা উচিত: যেমন আল্লাহ্‌র রাসূল (সঃ) সর্বদা দোআ করতেন- يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبُ سَبِّتْ قُلُوْبَنَا عَلٰى دِيْنِكَ **হে আমাদের অন্তরকে পরিবর্তনকারী, আমাদের অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখো** আল্লাহ্ রাসূল আরো দোআ করতেন :

يَا مُصَرِّفَ الْقُلُوْبُ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلٰى طَاعَتِكَ **হে আমাদের দেলকে উলট-পালটকারী, আমাদের দেলকে তোমার আনুগত্যের দিকে ঘুরিয়ে দাও।** (মুসলীম)

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আয়াতের সারমর্ম হলো এই যে, একজন পরিপূর্ণ মুমিনের এমন গুণ-বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক যে, তার সামনে যখনই আল্লাহ্‌র আয়াত পাঠ তথা তার হুকুম বা নিদর্শনাবলী উচ্চারিত হবে- তখনই তার ঈমানের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পাবে, তাতে উন্নতি সাধিত হবে এবং সৎ কাজের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পাবে। অতএব কুরআনকে নিজের ভাষায় বুঝে পড়া-অধ্যয়ন করা উচিত। অর্থ এবং ভাব না বুঝে শুধু প্রচলিত তেলাওয়াত করলে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য ঃ وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ **আর তারা তাদের রবের উপর তাওয়াক্কুল তথা আস্থা ও ভরসা রাখে।**

আলোচ্য আয়াতাংশে মুমিনদের তৃতীয় বৈশিষ্ট্যের যে কথা বলা হয়েছে তা হলো তারা সদা-সর্বদা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখে, আস্থা রাখে। 'তাওয়াক্কুল' অর্থ হলো- আস্থা ও ভরসা। অর্থাৎ ঈমানদারেরা তাদের যাবতীয় কাজ-কর্মে এবং সকল অবস্থায় একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার উপরই পরিপূর্ণ আস্থা ও ভরসা রাখে। সহীহ্ হাদীসে উল্লেখ রয়েছে- তার অর্থ এই নয় যে, নিজের প্রয়োজনের জন্য পার্থিব উপকরণ এবং চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে পরিত্যাগ করে বসে থাকবে। বরং এর প্রকৃত অর্থ হলো এই যে- কেবলমাত্র পার্থিব উপায়-উপকরণ এবং চেষ্টা-

প্রচেষ্টাকেই যথেষ্ট মনে করবে না বরং নিজের সামর্থ, সুযোগ ও সাহস অনুযায়ী পার্থিব উপায়-উপকরণ ও চেষ্টা-প্রচেষ্টার পর সাফল্য আল্লাহ্ তাআলার উপর ছেড়ে দেবে এবং মনে করবে যে– যাবতীয় উপায়-উপকরণ তাঁরই সৃষ্টি এবং সে উপায়-উপকরণের ফলাফলতো তিনিই দেবেন। তবে মানুষের প্রকৃতগত অভ্যাস হলো যে, যে কোন কাজের ফলাফল তাড়াতাড়ি পেতে চায়। আর এর জন্যই তারা আল্লাহ্‌র উপর আস্থা হারিয়ে অন্য কিছুর দিকে ধাবিত হয়। এটা প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য পরিপন্থী। বরং ফলাফল লাভের জন্য ধৈর্য্যের সাথে অপেক্ষা করতে হবে।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য ঃ اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ আর তারা নামায কায়েম বা প্রতিষ্ঠা করে।

আয়াতের এই বৈশিষ্ট্যে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে– এখানে নামায পড়ার কথা বলা হয়নি। বরং নামায প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। اِقَامَتْ শব্দের আবিধানিক অর্থ হলো– কোন কিছুকে সোজা করে দাঁড় করানো। কাজেই اِقَامَتِ الصَّلٰوةَ এর অর্থ হলো নামায প্রতিষ্ঠা করা।

নামায প্রতিষ্ঠার দুটি অর্থ ঃ

প্রথম অর্থ ঃ তাফসীরকারক এবং মুহাদ্দীসগণ নামায প্রতিষ্ঠার অর্থ করেছেন নামাযের বাইরের এবং ভিতরের যাবতীয় আহ্কামগুলো যথাযথ ভাবে পালন করা। নামাযের পূর্বে ও নামাযের ভিতরে যে সমস্ত আদব-কায়দা, রীতি-নিয়ম ও শর্তাবলী আছে তা এমন ভাবে সম্পাদিত করা, যেমন ভাবে রাসূলে কারীম (সাঃ) কথা ও বাস্তবতার মাধ্যমে বাতলিয়ে দিয়েছেন।

দ্বিতীয় অর্থ ঃ নামায কায়েমের দ্বিতীয় অর্থ হলো– সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ভাবে নামাযকে প্রতিষ্ঠা করা। একটি ইসলামী সমাজে যখন সকলেই (নারী-পুরুষ) নামায পড়বে তখনই কেবল নামায প্রতিষ্ঠা হয়েছে বলা যাবে। কেননা নামায কায়েম করার দায়িত্ব হলো– ইসলামী রাষ্ট্রীয় সরকারের। আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ–

যখন তোমাদের মধ্যে কেউ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবে, তখন সে নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা চালু করবে, সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ ও অন্যায় কাজে বাধা সৃষ্টি করবে। (সূরা হজ্জ-৪১)

নামায যখন আমলের পদ্ধতির দিক থেকে এবং সামাজিক ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে তখনই প্রকৃত উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হবে। নামাযের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন ঃ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ নিশ্চয়ই নামায

সকল প্রকার অশ্লীলতা এবং পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।

আর যখনই সমাজের লোক নামাযের প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারবে তখনই গোটা সমাজ ব্যবস্থা সংশোধিত হয়ে যাবে। তখন মানুষ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় জগতে কল্যাণ লাভ করবে।

পঞ্চম বৈশিষ্ট্য ঃ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ **এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে তারা (আল্লাহ্‌র পথে) খরচ করে।**

প্রকৃতি মুমিনের পঞ্চম গুণ-বৈশিষ্ট্য হলো আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে যে রিযিক বা জীবিকা দিয়েছে তা থেকে তারা আল্লাহ্‌র পথে তথা আল্লাহ্‌র যমীনে আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে খরচ করে। আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য যখন যা প্রয়োজন তারা তাদের অর্জিত সম্পদ থেকে খরচ করতে থাকে, কার্পণ্য করে না, কত দান করলো তাও হেসাব করে দেখে না। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং জান্নাত লাভের আশায় তারা সৎ নিয়তে খরচ করতে থাকে। তাছাড়া তারা শরীয়ত নির্ধারিত যাকাত-ফেতরা আদায় করে এবং দান-খয়রাত সহ মানুষের কল্যাণে সাহায্য-সহযোগীতাও করে থাকে। পরবর্তী আয়াতে মুমীনদের বৈশিষ্ট্যের স্বকৃতিস্বরূপ প্রতিদানের কথা ঘোষণা করে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ اُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا–

তারাই হলো প্রকৃত ঈমানদার। এই আয়াতে উপরে বর্ণিত পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ঈমানদারদের গুণ ও বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি দান করে বলা হয়েছে যে এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ঈমানদার লোকেরাই হলো প্রকৃত এবং সত্যিকারের ঈমানদার। এ থেকে বোঝা যায় যে, শুধুমাত্র কালেমার স্বীকৃতি মুখে মুখে দিলেই প্রকৃত মুমিন হওয়া যায় না, তার বাস্তব প্রয়োগ ও প্রতিফলন আবশ্যক। মুখে স্বীকৃতি এবং বাস্তব প্রয়োগে যদি মিল না হয় তাহলে তাদেরকে মুনাফিকদের আচরণের সাথে তুলনা করে মহান আল্লাহ্ সূরা সফ্-এর ২-৩ আয়াতে উল্লেখ করে বলেন ঃ

لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۔ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۔

তোমরা সেকথা কেন বলো যা তোমরা বাস্তবে আমল বা প্রয়োগ করো না। এটা আল্লাহ্‌র নিকট অত্যন্ত গর্হিত কাজ যে, তোমরা যা বলো তা তোমরা করো না।

প্রকৃত মুমিনদের মর্যাদা ও প্রতিদান ঃ

لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ

তাদের জন্য তাদের রবের পক্ষ থেকে রয়েছে উচ্চ মর্যাদা, ক্ষমা এবং উত্তম রিযিক।

আয়াতের এই অংশে এবং দারসের সর্বশেষ অংশে মহান আল্লাহ্ পাক উপরোক্ত গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী লোকদের সত্যিকারের ঈমানদার স্বীকৃতি প্রদান করে তার স্বীকৃতি স্বরূপ এতে তিনটি প্রতিদানের ওয়াদা করা হয়েছে- (১) সুউচ্চ মর্যাদা (২) মাগফেরাত বা ক্ষমা (৩) সম্মানজনক রিযিক।

তাফসীরে বাহরে-মুহীতে উল্লেখ রয়েছে যে- এর পূর্ববর্তী আয়াত দু'টিতে মুমিনদের যেসব গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে সেগুলো তিন প্রকৃতির (১) সেসব বৈশিষ্ট্য যার সম্পর্ক অন্তর ও অভ্যন্তরের সাথে। যেমন- ঈমান, খোদাভীতি, আল্লাহ্র উপর ভরসা বা আস্থা। (২) যার সম্পর্ক দৈহিক কার্যকলাপের সাথে। যেমন- নামায, রোযা প্রভৃতি এবং (৩) যার সম্পর্ক ধন-সম্পদের সাথে যেমন- আল্লাহ্র পথে খরচ করা।

উপরোক্ত এই তিনটি গুণ-বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে তিনটি পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে এক. আত্মিক গুনাবলীর জন্য 'সুউচ্চ মর্যাদা' দুই. যেসব আমল বা কর্ম মানুষের দেহের সাথে সম্পর্কিত সেসব আমল বা কর্মের জন্য 'মাগফিরাত' বা ক্ষমা যেমন- নামায, রোজা, জিহাদ ইত্যাদি এবং তিন. যার সম্পর্ক সম্পদের সাথে সে সমস্ত সম্পদ খরচের জন্য রয়েছে সম্মানজনক রিযিক। মুমিন আল্লাহ্র পথে যা ব্যয় করবে, পরকালে সে তার চেয়েও বহুগুণ উত্তম ও বেশী প্রাপ্ত হবে।

শিক্ষা ঃ প্রিয় ভাই ও বোনেরা! সূরা আনফালের প্রথম চারটি আয়াতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমাদের জন্য যেসব শিক্ষনীয় বিষয় পাওয়া যায় তা হলো ঃ

❒ আল্লাহ্র দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য সার্বক্ষণিক ভাবে আত্মনিয়োগ করা। প্রয়োজনে বদরের যুদ্ধের মতো যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া।

❒ ভবিষ্যতে যদি বদর যুদ্ধের ন্যায় কোন গনীমতের মাল-সম্পদ হস্তগত হয় তবে তার লোভে পড়ে যেন আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসূলের আনুগত্য লংঘিত না হয়। অথবা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলে কিংবা রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য পাওয়া গেলে বৈষয়িক কোন কিছু পাবার আশায় হন্যে হয়ে ছুটে না বেড়া এবং বেশী বেশী স্বার্থ উদ্ধারের জন্য নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে না পড়া।

❒ প্রতিটি মুমিনের উচিত সদা-সর্বদা সকল অবস্থায় আল্লাহ্কে ভয় করা, আল্লাহ্র ভয়েই সকল বৈষয়িক স্বার্থ, অন্যায়-অপকর্ম এবং পাপ কাজ থেকে বিরত থাকা।

❒ ইসলামী আন্দোলন করতে যেয়ে যদি কোন কারণে কোন বিষয়ে নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য হয় কিম্বা তিক্ততার সৃষ্টি হয়, তাহলে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য এবং

পরকালের কল্যাণের আশায় নিজেদের মধ্যে আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে সংশোধন করে নেয়া।

❑ নিজের পক্ষে হোক আর বিপক্ষেই হোক মুমিনদের সকল অবস্থায় আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের নির্দেশকে মান্য করে চলা।

❑ আল্লাহ্র প্রেম এবং ভীতি সৃষ্টির জন্য সার্বক্ষণিক ভাবে আল্লাহ্র ক্ষমতা, মর্যাদা, মাহাত্ম এবং বড়ত্বের কথা স্মরণ করা। যাতে করে শয়তানের ওয়াসওয়াসায় পড়ে আল্লাহ্ বিমুখ না হয়ে যায়।

❑ ঈমানের মাধুর্য্য এবং মজবুতির জন্য আল্লাহ্ তাআলার আয়াত সমূহ বুঝে তেলাওয়াত বা পাঠ করা এবং অধ্যয়নের মাধ্যমে অনুধাবন করা।

❑ নিজের যোগ্যতা এবং বৈষয়িক উপায়-উপকরণের মাধ্যমে সার্বিক ভাবে চেষ্টা সাধনা করা এবং আল্লাহ্র উপর পূর্ণ আস্থা ও নির্ভরতা রাখা। কেননা চেষ্টা-চরিত্র না করে হাত-পা ছেড়ে দিয়ে কেবলমাত্র আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করা প্রকৃত তাওয়াক্কুল নয়।

❑ প্রকৃত ও সত্যিকার ঈমানদারের স্বীকৃতি পেতে হলে বৈষয়িক স্বার্থ ত্যাগ করা, আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূলের আনুগত্য করা এবং নির্দেশ সমূহ মান্য করা, সকল অবস্থায় আল্লাহ্র ভয় অন্তরে রাখা, সকল সময় ও সকল অবস্থায় আল্লাহ্কে স্মরণ করা, আল্লাহ্র কালাম বুঝে পড়া এবং অনুধাবন করা, সকল অবস্থায় আল্লাহ্র উপর আস্থা ও ভরসা রাখা, নামায কায়েম তথা প্রতিষ্ঠা করা এবং নিজের জীবিকা থেকে আল্লাহ্র পথে খরচ করা।

❑ উপরোক্ত আমল বা কর্ম সম্পাদন করতে পারলে মহান আল্লাহ্ পাক উভয় জগতে সম্মানজনক মর্যাদা দান করবেন। ঘটে যাওয়া অপরাধ মাফ করে দেবেন অথবা সৎ কাজের কারণে অন্যায় কাজগুলো উপেক্ষা করবেন এবং উভয় জগতেই সম্মানজনক এবং বেশী বেশী রুযী দান করবেন।

আহবান ঃ প্রিয় ভাই ও বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত সূরা আনফালের ১-৪ আয়াত পর্যন্ত যে দারস পেশ কালাম এতে যদি আমার অজান্তে ভুল অথবা বাড়াবাড়ি হয়ে যায় তার জন্য মহান আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর অত্র দারস থেকে আমরা যেসব শিক্ষা লাভ করলাম তা যেন বাস্তব জীবনে আমল করে উভয় জগতে সফলতা লাভ করতে পারি সেই তাওফীক কামনা করে দারস শেষ করছি।

——— ঃ সমাপ্ত ঃ ———

রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়। - আল হাদীস

লেখকের অন্যান্য বই

দারসে হাদীস-১ম খন্ড
দারসে হাদীস-২য় খন্ড
দারসে কুরআন-১ম খন্ড
দারসে কুরআন-২য় খন্ড
দারসে কুরআন-৩য় খন্ড
দারসে কুরআন-৪র্থ খন্ড
ইসলামী সংগঠন ও প্রশিক্ষণ
বিষয়ভিত্তিক নির্বাচিত হাদীস
আল কুরআনে মানব সৃষ্টি তত্ত্ব
রাসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) রূহানী নামায
বিষয়ভিত্তিক কুরআন হাদীস সংকলন
বাংলা উচ্চারণসহ ১০০ মাসনুন দোয়া
কুরআন হাদীসের আলোকে ৫দফা কর্মসূচী
ফাযায়েলে ইক্বামাতে দ্বীন বা দ্বীন প্রতিষ্ঠার (চেষ্টার) মর্যাদা

সাহাল প্রকাশনী

দারসে কুরআন

২

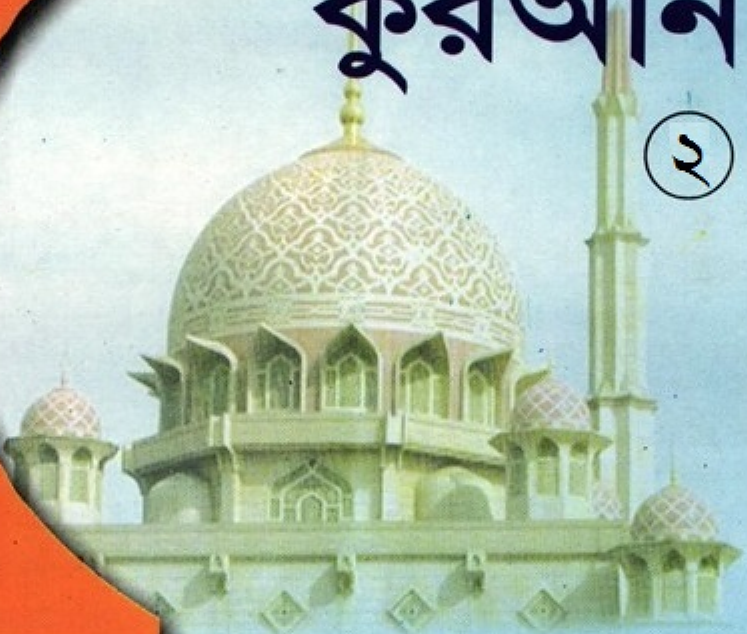

অধ্যাপক আবদুল মতিন

দারসে
কুরআন

২য় খন্ড

অধ্যাপক আবদুল মতিন

দারসে কুরআন- দ্বিতীয় খন্ড

প্রকাশনায় ঃ সাহাল প্রকাশনী
৩০৮, খানজাহান আলী রোড,
(তারের পুকুর) খুলনা।

প্রকাশকাল ঃ
১ম প্রকাশ ঃ মে- ২০০৪ ইং
১৬তম প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর- ২০১৩ ইং
ঃ পৌষ- ১৪২০ সন
ঃ সফর- ১৪৩৫ হিজরী

সত্ত্ব ঃ লেখক কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত।

প্রচ্ছদ ঃ কৃষ্টি কম্পিউটার,
৩০৮, খানজাহান আলী রোড, খুলনা।

অক্ষর বিন্যাস ঃ দেশ কম্পিউটার
৪৪/৩ শামসুর রহমান রোড, খুলনা।

নির্ধারিত মূল্য ঃ ৭০ টাকা

পরিবেশনায় ঃ সাহাল বুক কর্ণার
৩০৮, খানজাহান আলী রোড,
(তারের পুকুর) খুলনা।

মোবাইল ঃ ০১৭১১-৩৮৯০৭৬ (লেখক)
ঃ ০১১৯১-৭৮২২৮৬ (দোকান)

প্রাপ্তিস্থান

ইসলামিয়া লাইব্রেরী, বরিশাল।	কাটাবন বুক কর্ণার, ঢাকা।
আল-হেলাল লাইব্রেরী, যশোর।	ঢাকা বুক কর্ণার, পুরানাপল্টন, ঢাকা।
আল-আমীন লাইব্রেরী, সিলেট।	প্রফেসরস পাবলিকেশন, মগবাজার, ঢাকা।
আল-আমীন লাইব্রেরী, সাতক্ষীরা।	প্রফেসরস বুক কর্ণার, মগবাজার, ঢাকা।
একাডেমী লাইব্রেরী, দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম।	খন্দকার প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা।

এ ছাড়াও জেলা শহরের বিভিন্ন লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়।

ভূমিকা

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

নাহ্‌মাদুহু অনুসাল্লি আ'লা রাসূলিহিল কারীম, আম্মা বা'দ। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন মহানবী (সাঃ) এর উপর নাযিলকৃত সর্বশেষ আসমানি কিতাব। যা মানব জাতির হেদায়েত এবং জীবন পরিচালনার জন্য পরিপূর্ণ জীবনবিধান। যাতে মানুষের ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক জীবন সম্পর্কে সমাধান দেয়া হয়েছে। সুতরাং প্রতিটি মুমিন মুসলমানের উচিত আল-কুরআনকে নিজের ভাষায় বোঝে তার শিক্ষানুযায়ী জীবন যাপন করা। কিন্তু সমস্যা হলো আমাদের দেশে সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় ভাবে কুরআনের সঠিক শিক্ষাকে তুলে ধরার তেমন কোনো উপযোগী ব্যবস্থা নেই। যতটুকু আছে তাও আবার সিলেবাসের গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং ভিন্নভাবে কুরআনকে চিত্রিত করা হয়েছে। যার কারণে কুরআনের প্রকৃত স্প্রীরিটকে নষ্ট করে দিয়ে সমাজের মানুষকে সঠিক শিক্ষা থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে।

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল-কুরআনের বিধি-বিধান মানতে হলে, কুরআনের সঠিক বুঝ থাকা জরুরী। কুরআনের সঠিক বুঝ সৃষ্টি এবং শিক্ষা গ্রহণের জন্য আমি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত সাধারণ মানুষের জন্য সহজ-সরল ভাষায় আল-কুআনের বিভিন্ন অংশ থেকে বিষয় ভিত্তিক 'দারস' লেখা আরম্ভ করি। আলহামদুলিল্লাহ্‌! ইতিমধ্যে দারসে কুরআনের **'প্রথম খন্ড'** প্রকাশিত হয়েছে এবং পাঠক ভাই-বোনদের মাঝে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। তাদের দাবী এবং পরামর্শ অনুযায়ী **'দ্বিতীয় খন্ড'** প্রকাশিত হলো। আগামীতেও পরবর্তী খন্ডগুলো লেখা এবং প্রকাশের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ্‌। এ ব্যাপারে আপনাদের সহযোগীতা এবং আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা করছি।

দারসে কুরআন **'দ্বিতীয় খন্ড'** লেখা এবং প্রকাশের ক্ষেত্রে যেসব হিতাকাংক্ষী ভাই-বোন পরামর্শ ও অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন, তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং আল্লাহ পাকের কাছে তাদের জন্য উত্তম প্রতিদান কামনা করছি। লেখা এবং ছাপার ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। কোনো সুহৃদয় ব্যক্তির কাছে ভুল-ত্রুটি ধরা পড়লে ও পরামর্শ থাকলে আমাকে অবগত করালে তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ থাকবো এবং ভবিষ্যতে সংশোধনের চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ্‌।

সবশেষে আল্লাহ্‌ পাকের দরবারে আমার আরজ, হে আল্লাহ্‌! তোমার এই পবিত্র মহাগ্রন্থের ব্যাখ্যা এবং শিক্ষা পেশ করতে গিয়ে যদি কোনো ক্ষেত্রে আমার বাড়াবাড়ি ও ভুল-ত্রুটি হয়ে যায় তার জন্য তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও। আর আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করিও এবং কেয়ামতের সেই ভয়াবহ দিনে নাজাতের জারিয়া বানিয়ে দিও। আমীন।

বিনীত

মুহাম্মদ আবদুল মতিন
সহকারী অধ্যাপক, ইসলামীক স্টাডিজ বিভাগ
দৌলতপুর কলেজ, খুলনা।

উৎসর্গ

কোলকাতা হাইকোর্টে দায়েরকৃত "কুরআন বাজেয়াপ্ত" মামলার প্রতিবাদে ১৯৮৫ সালের ১১ই মে, চাঁপাই নবাবগঞ্জের ঈদগাহের আম্রকাননে পুলিশের গুলিতে নিহত আট শহীদের স্মরণে।

২য় খন্ডের সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা নং
১। জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব	(সূরা ঃ আলাক-১-৫)	৭
২। মুমিনের জেন্দেগী হবে তাকওয়া, আন্দোলন ও দাওয়াতী জেন্দগী	(সূরা ঃ আলে-ঈমরান-১০২-১০৪)	২০
৩। মুমিন জীবনের লক্ষ-উদ্দেশ্য ও তাদের বৈশিষ্ট্য	(সূরা ঃ তওবাহ-১১১-১১২)	৪৬
৪। মুমিনদের ছয়টি বর্জনীয় আচরণ	(সূরা ঃ হুজুরাত-১১-১২)	৬৯
৫। দুনিয়াদারদের প্রতি সতর্ক বাণী	(সূরা ঃ তাকাছুর-১-৮)	৯৪
৬। ইসলামী আন্দোলন ঃ কর্মীদের গুণাবলী	(সূরা ঃ মায়েদাহ-৪৫-৫৬)	১১০
৭। আল্লাহর কতিপয় কুদরাত ও নেয়ামত	(সূরা ঃ আন নাবা-১-১৬)	১২৭
৭। মুনাফিকদের আচরণ	(সূরা ঃ বাকারা-৮-১৬)	১৪৩

১ম খন্ডে যা আছে

- দারসে কুরআন এর বক্তৃতা দান পদ্ধতি।
- দারসের সময় বন্টন।
- দারস দানকারীর করণীয়।
- দারসের কতিপয় পরিভাষার সংজ্ঞা।
- এক নজরে আল-কুরআনের পরিচয়।
- মুত্তাকীনদের গুণাবলী, (সূরা- বাকারা-১-৫)
- মু'মিনদের গুণাবলী। (সূরা- মুমেনুন-১-১১)
- বাড়ীতে ঢোকার শিষ্টাচার। (সূরা-নূর-২৭-২৯)
- ধ্বংস ও ক্ষতি থেকে মানুষের বাঁচার উপায় (সূরা- আল আসর)
- কঠিন আযাব থেকে বাঁচার উপায়। (সূরা-সফ্-১০-১২)
- মানবতার মুক্তির জন্য জিহাদ। (সূরা-নিসা-৭৫-৭৬)
- ঈমানের পরীক্ষা। (আল ঈমরান-১৩৯-১৪১)
- সবরের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য কামনা ও শহীদের মর্যদা। (সূরা- বাকারা-১৫৩-১৪১)
- মরণের আগেই আল্লাহর পথে অর্থ খরচ। (সূরা- মুনাফিকুন-৯-১১)
- কিয়ামতের দৃশ্য। (সূরা-হজ্ব-১-২)

৩য় খন্ডে যা আছে

- জিহাদ বা ইসলামী আন্দোলনের গুরুত্ব (সূরা তাওবাহ-১৯-২৪)
- কতিপয় সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ ওয়াদা এবং কসম রক্ষা করার গুরুত্ব (সূরা নহল-৯০-৯৭)
- অতীতের নবীদের দ্বীনের ন্যায় একই দ্বীনের দাওয়াত দান এবং প্রতিষ্ঠার নির্দেশ (সূরা-শু'রা-১৩-১৬)
- ঈমানের পরীক্ষা দিয়েই জান্নাতে যেতে হবে (সূরা আনকাবুত-১-৭)
- আল্লাহর উপর অবিচল ঈমান। সর্বোত্তম পন্থায় দাওয়াতদান ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন। (হা-মীম-আস- সাজদাহ-৩০-৩৬)
- দাওয়াতে দ্বীনের কাজে অধৈর্য হলে চলবে না (আনয়ান-৩৩-৩৬)
- স্ত্রী, সন্তান এবং ধন-সম্পদ মানুষের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ (সূরা তাগাবুন-১৪-১৮)
- আখেরাতে অবিশ্বাসীদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ও কর্যকলাপ (সূরা মাউন)

গ্রন্থপঞ্জি ঃ

✪ তাফহীমুল কুরআন	মাওঃ সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী (রহঃ)
✪ তাফসীরে ইবনে কাসীর	মাওঃ হাফেজ ইমামুদ্দীন ইবনু কাসীর (রহঃ)
✪ তাফসীরে মা'রেফুল কুরআন	মাওঃ মুফতী মুহাম্মদ শাফী (রহঃ)
✪ তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন	সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ (রহঃ)
✪ বোখারী শরীফ	ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বুখারী (রহঃ)
✪ মুসলিম শরীফ	ইমাম মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ নিশাপুরী (রহঃ)
✪ মেশকাত শরীফ	নূর মোহাম্মদ আযমী (রহঃ)
✪ রিয়াদুস সালেহীন	ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আননববী (রহঃ)
✪ হাদীস শরীফ	মাওঃ আবদুর রহীম (রহঃ)
✪ হাদীসে রাসূল (সাঃ)	অধ্যাপক হাবিবুর রহমান
✪ সংকলন (বিষয় ভিত্তিক কুরআন হাদীস)	অধ্যাপক মাওলানা আবদুল মতিন

আবেদনঃ দারসে কুরআন-এর সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আমার আবেদন, কুরআনের ব্যাপক প্রচারের জন্য অন্যদের মাঝে–পাড়ায় মহল্লায়, মস্‌জিদে, মক্তবে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আপনি দারসে কুরআন পেশ করুন। আপনার দারস্‌ পেশ করার উপযোগী করেই বইটি লেখা হয়েছে।

এক

জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব

সূরা আলাক ১-৫

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ-

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ- خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ- اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ- الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ- عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ-

সরল অনুবাদ ঃ ইরশাদ হচ্ছেঃ (১) (হে মুহাম্মদ সঃ) তুমি পড়ো তোমার রবের নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। (২) যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট বাঁধা রক্ত থেকে। (৩) তুমি পড়ো, তোমার রব (তোমার উপর) বড়ই মেহেরবান। (৪) যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। (৫) শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ اِقْرَاْ-পড়ো। بِسْمِ-নামে। رَبِّكَ-তোমার রবের। اَلَّذِيْ-যিনি। خَلَقَ-সৃষ্টি করেছেন। اَلْاِنْسَانَ-মানুষকে। مِنْ-থেকে, হতে عَلَقٍ-জমাট রক্তপিন্ড। وَ-এবং, আর। اَلْاَكْرَمُ-বড়ই মেহেরবান বা দয়ালু। عَلَّمَ-শিক্ষা দিয়েছেন। بِالْقَلَمِ-কলমের সাহায্যে। مَا-যা। لَمْ-না। يَعْلَمْ-সে জানতো।

সম্বোধনঃ উপস্থিত সম্মানিত /প্রিয় / ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ভায়েরা/ বোনেরা! আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি অয়াবারাকাতুহ। আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কালামে হাকীম আল-কুরআনের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াতগুলো তেলাওয়াত ও সরল অনুবাদ পেশ করেছি। মহান

রাব্বুল আলামীনের কাছে কামনা করছি, তিনি যেনো অত্র আয়াতগুলোর দারস সঠিকভাবে পেশ করার তৌফিক দান করেন। আমিন।

সূরার নামকরণঃ অত্র সূরার দ্বিতীয় আয়াতে উল্লেখিত علق (আলাক) শব্দকেই এই সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

"আলাক' মানে "জমাট রক্ত"। আলোচ্য বিষয়বস্তু হিসেবে যদিও সূরাটির নাম শিরোনাম হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি। তথাপিও এই সূরার মূল বিষয়ের সাথে নামের বেশ সম্পর্ক রয়েছে।

সূরাটি অবতীর্ণ হবার সময়কালঃ সূরাটি একই সময় নাযিল হয়নি। এর দুটি অংশ রয়েছে। প্রথম অংশ হলোঃ ১-৫ আয়াত। আর দ্বিতীয় অংশ হলো ৬ আয়াত থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত। সূরার প্রথম অংশ অর্থাৎ ১-৫ আয়াত নাযিলের ব্যাপারে সকল মুফাস্‌সীরগণ একমত হয়েছেন যে, এটাই হলো নবী করীম (সাঃ) এর উপর সর্বপ্রথম অহী, যা হেরা গুহায় অবতীর্ণ হয়েছিলো। আর তা ছিলো নবী করীম (সাঃ) এর ৪০ বছর বয়সে অর্থাৎ ৬১০ খৃষ্টাব্দে।

ইমাম আহমদ, বুখারী, মুসলিম এবং অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসকে বিশুদ্ধ হাদীস হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া হযরত ইবনে আব্বাস, আবু মুসা আশআরী (রাঃ) সহ বিপুল সংখ্যক সাহাবী হতেও এ কথাই বর্ণিত হয়েছে।

সূরার দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ ৬ থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত পরবর্তী সময় অবতীর্ণ হয়। নবী করীম (সাঃ) যখন কাবা ঘরে নামায পড়তে শুরু করেছিলেন, তখন আবু জেহেল ধমক দিয়ে এ কাজ হতে তাঁকে বিরত রাখতে চেষ্টা করেছিলো, ঠিক সেই সময়ই সূরার এই দ্বিতীয় অংশ অবতীর্ণ হয়।

সূরার মূল বিষয়বস্তু ঃ সূরাতে জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব তুলে ধরে অহীর জ্ঞান অর্থাৎ আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সাথে সাথে মানুষকে তাঁর সৃষ্টির হাকীকতের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। মানুষ যখন অভাব মুক্ত হয়ে যায় তখন সে স্বাভাবিক ভাবেই আল্লাহ্কে ভুলে গিয়ে বিদ্রোহী হয়ে যায়। এ ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত তাদেরকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে।

তাছাড়া নবী করীম (সাঃ)কে নামাযে বাধাদানকারী আবু জেহেল সহ এ ধরনের আচরণকারীদের ধমক দিয়ে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। আর এটাও স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, মানুষ যা কিছুই করুক না কেন, আল্লাহ্‌পাক সব কিছুই দর্শন করছেন।

ওহীর সূচনা ঃ বোখারী, মুসলিম ও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে প্রমাণিত রয়েছে এবং আগের ও পরের বেশীরভাগ আলেম এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, সূরা আলাক থেকেই ওহীর সূচনা হয় এবং এই সূরার প্রথম পাঁচ আয়াত مَا لَمْ يَعْلَمْ পর্যন্ত সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়।

ইমাম বোখারী (রঃ) তাঁর কেতাবে হযরত আয়েশা (রাঃ) এর হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ **হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ প্রথমে যে অহী** রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর কাছে আসতো তা হলো ঘুমের মধ্যে তাঁর সত্য স্বপ্ন। তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন তা ভোরের আলোর মতই স্পষ্ট হতো। এরপর তাঁর কাছে নিরিবিলি জীবন যাপন ভালো লাগলো। তাই তিনি একাধারে কয়েকদিন পর্যন্ত নিজ পরিবারের কাছে না গিয়ে হেরা গুহায় নির্জন পরিবেশে আল্লাহ্‌র ইবাদতে মগ্ন থাকতে লাগলেন। আর এ উদ্দেশ্যে তিনি কিছু খাবার সাথে নিয়ে যেতেন। পরে তিনি বিবি খাদিজা (রাঃ) এর কাছে ফিরে এসে আবার ঐরূপ কয়েকদিনের জন্য কিছু খাবার সাথে নিয়ে যেতেন। এভাবে হেরা গুহায় (এবাদতে) থাকা অবস্থায় তাঁর কাছে সত্য (অহী) এলো। জিবরীল ফেরেশ্‌তা সেখানে এসে তাঁকে বল-লেন ঃ

اِقْرَأْ (পড়ুন)। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেনঃ مَا أَنَا بِقَارِئٍ **আমি তো পড়তে পারি না।** রাসূল বলেনঃ ফিরিশ্‌তা তখন আমাকে বুকে (ঝাপটে) ধরে এতো জোরে চাপ দিলেন যে, এতে আমি বেশ কষ্ট পেলাম। এরপর ফেরেশ্‌তা আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন ঃ اِقْرَأْ-(পড়ুন)। আমি বললামঃ مَا أَنَا بِقَارِئٍ **আমি পড়তে পারি না।** তখন তিনি দ্বিতীয়বার আমাকে (বুকে) ধরে খুব জোরে চাপ দিলেন। তাতে আমার ভীষণ কষ্ট হলো। এরপর আমাকে ছেড়ে তিনি পড়তে বললেন।

আমি বললাম ঃ مَا اَنَا بِقَارِئٍ আমি তো পড়তে পারি না। রাসূল বলেনঃ জিবরীল ফেরেশ্‌তা তৃতীয়বার আমাকে (বুকে) ঝাপটে ধরে এমন জোরে চাপ দিলেন যে, আমার প্রচন্ড কষ্ট হলো। এবার তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেনঃ

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ- خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ- اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ- اَلَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ- عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ-

পড়ো! তোমার রবের নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্ত থেকে। পড়ো! তোমার রব বড়ই দয়ালু। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানতো না। রাসূল(সঃ)এই আয়াত কয়টি আয়ত্ত করে বাড়ি ফিরলেন। তাঁর অন্তর তখন ভয়ে কাঁপছিলো। তিনি বিবি খাদিজা (রাঃ) এর কাছে এসে বললেনঃ **আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও। "আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও।** তিনি তাঁকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। পরে তাঁর ভয় চলে গেলে তিনি বিবি খাদিজা (রাঃ) এর কাছে সব ঘটনা বর্ণনা করে বললেনঃ আল্লাহ্‌র কসম! আমি আমার নিজের জীবন সম্পর্কে ভয় করছি। খাদিজা (রাঃ) সান্তনা দিয়ে বললেনঃ ভয় নাই। আল্লাহ্‌র কসম! তিনি কখনও আপনাকে অপমানিত করবেন না। তার কারণ আপনি আত্মীয়-স্বজনদের সাথে ভাল ব্যবহার করেন, দুর্বল ও দুঃখীদের খেদমত করেন, বঞ্চিত ও অভাবীদেরকে উপার্জনক্ষম করেন, মেহমানদারী করেন এবং বিপদগ্রস্থদেরকে সাহায্য করেন। অতঃপর খাদিজা (রাঃ) তাঁকে সাথে নিয়ে তাঁর চাচাত ভাই **'অরাকা বিন নওফেল'** এর কাছে গেলেন। অরাকা যাহেলী যুগে ঈসায়ী (খৃষ্টান) ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইবরাণী ভাষায় কিতাব লিখতেন। আরবী ও হিব্রু ভাষায় ইঞ্জিল লিখতেন। তিনি এই সময় খুব বেশী বৃদ্ধ ও অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। হযরত খাদিজা তাঁকে বললেন ঃ ভাইজান! আপনি আপনার ভাতিজার সব ঘটনা জানুন। 'অরাকা' তাঁর ভাতিজা অর্থাৎ রাসূলের কাছে সব ঘটনা

শুনতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁকে সব ঘটনা বিস্তারিত ভাবে শুনালেন। ঘটনা শুনে অরাকা বললেনঃ এ সেই রহস্যময় নামুস (ওহী বহনকারী ফেরেশ্‌তা)। যাকে আল্লাহ্ পাক হযরত মূসা (আঃ) এর প্রতি নাযিল করেছিলেন। তিনি আবসুস করে বললেনঃ হায়! আমি যদি তোমার নবুয়তের সময় যুবক বয়সের হতাম! হায়!! আমি যদি সেই সময় বেঁচে থাকতাম, যখন তোমার জাতির লোকেরা তোমাকে মক্কা থেকে বের করে দেবে!! রাসূল (সাঃ) অরাকাকে জিজ্ঞেস করলেন, সত্যই কি তারা আমাকে বের করে দেবে ? অরাকা বললেনঃ হ্যাঁ, তুমি যা নিয়ে এসেছো, তদ্রুপ কোনো কিছু নিয়ে যে ব্যক্তিই এসেছে, তার সাথে শত্রুতাই করা হয়েছে। আমি তোমার যুগে বেঁচে থাকলে তোমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করবো। কিন্তু এর অল্পকাল পরেই অরাকা ইন্তেকাল করলেন এবং অহীও (তিন বছর পর্যন্ত) স্থগিত রইলো।

সর্বপ্রথম সূরা ঃ বোখারী, মুসলিম ও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে সকল ওলামায়েকেরাম একমত পোষণ করেন যে, সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াতের মাধ্যমেই অহীর সূচনা হয়। তবে প্রথম সূরা সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেউ কেউ সূরা **মুদ্দাস্‌সিরকে** প্রথম সূরা এবং কেউ কেউ সূরা **ফাতিহাকে** সর্বপ্রথম সূরা বলে মত প্রকাশ করেন। যারা সূরা **মুদ্দাস্‌সিরকে** প্রথম সূরা বলে মত প্রকাশ করেন, তাদের বক্তব্য হলো সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত নাযিলের পর দীর্ঘ তিন বছর অহী বন্ধ থাকে। এতে রাসূল (সাঃ) ভীষণ মানুষিক অশান্তির মধ্যে থাকেন। এর পর হঠাৎ করে জিবরাইল (আঃ) সামনে আসেন এবং সূরা মুদ্দাস্‌সির অবতীর্ণ হয়। এই সূরা নাযিলের সময় রাসূল (সাঃ) ভীষণ ঘাবড়িয়ে গিয়েছিলেন এবং ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। যেভাবে সূরা আ'লাকের প্রথম আয়াতগুলো নাযিলের সময় হয়েছিলেন। এভাবে অহী নাযিলের বিরতির পর সূরা মুদ্দাস্‌সিরের প্রথম দিকের আয়াতগুলো নাযিল হয়। ফলে একেও প্রথম সূরা বলে ধরে নেয়া যায়। সূরা ফাতিহাকে প্রথম সূরা বলার কারণ এই যে, পূর্ণ সূরা হিসেবে একত্রে সূরা ফাতিহাই সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়। এর আগে কয়েকটি সূরার অংশ বিশেষ অবতীর্ণ হয়েছিলো। (মাযহারী)।

উপরোক্ত দলিলের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, সর্ব প্রথম আয়াত হলো সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত এবং সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ সূরা হলো সূরা ফাতিহা।

ব্যাখ্যাঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা আ'লাকের প্রাথমিক ধারণা পেশ করলাম। এখন আমি তেলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা পেশ করছি।

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ –পড় (হে নবী!) তোমার রবের **নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন!** আয়াতে প্রথমতঃ আমভাবে اِقْرَاْ পড় দ্বারা পড়ার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। আর اِسْمٌ দিয়ে আল্লাহ্‌র নামের সাথে পড়তে বলা হয়েছে। যেই পড়ার শুরুতে বা মধ্যে আল্লাহ্ নেই, সেই পড়ার দ্বারা জ্ঞান অর্জন করাতে মানুষের কোন কল্যাণ নেই। কেননা, যারা অহীর জ্ঞানে জ্ঞানী কেবল তারাই আল্লাহ্‌কে বেশী ভয় করে থাকে, যেমন আল্লাহ্‌পাক বলেনঃ

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ط

নিশ্চয় বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই আল্লাহ্‌কে ভয় করে। (সূরা ফাতির-২৮)।

আল্লাহ্‌পাক সূরা যুমার এর ৯নং আয়াতে জ্ঞানী এবং মূর্খদের মধ্যে তুলনা করে বলেনঃ

هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ–

যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে? ঈমানদার জ্ঞানীদের মর্যাদার কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্‌পাক বলেনঃ

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ–

তোমাদের মধ্যে যারা ইমানদার এবং জ্ঞানী আল্লাহ্ তাদের মর্যাদা উঁচ করে দিয়েছেন। (সূরা মুজাদালাহ্ -১১)

দ্বিতীয়তঃ اِقْرَاْ পড় দ্বারা খাসভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর উপর অহীর সুচনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ভূমিকায় অহীর সূচনায় উল্লেখ করেছি, হেরা গুহায় ফেরেশ্‌তা জিবরাইল (আঃ) যখন নবী করীম (সাঃ) কে বল-লেন, اِقْرَاْ **পড়** তখন তিনি জবাবে বললেনঃ مَا اَنَا بِقَارِئٍ **আমি তো পড়তে পারি না** এটা হতে জানা যায় যে, অহীর এই শব্দগুলো লি-খিত আকারে তাঁর সামনে পেশ করা হয়েছিলো এবং সেই লিখিত জিনিসই পড়তে বলা হয়েছিলো। কেননা, ফেরেশ্‌তার কথার অর্থ যদি এই হতো যে, আমি যেভাবে বলতে থাকি আপনিও সেই ভাবে পড়তে থাকুন, তা হলে তার উত্তরে নবী করীম (সাঃ)কে 'আমি পড়তে পারি না' বলতে হতো না। তার কারণ হলো লিখিত জিনিস পড়তে না পারলেও কারও উচ্চারণকে অনুসরণ করে তার মতো উচ্চারণ করা যে কোনো মূর্খ লোকের পক্ষেও সম্ভব।

রাসূলকে উম্মী বা নিরক্ষর বানানোর হাকীকতঃ উম্মী বা নিরক্ষর ব্যক্তিকে রাসূল বানানোর হাকীকত এই হতে পারে যে, যদি লেখা-পড়া জানা ব্যক্তির উপর অহী অর্থাৎ আল-কুরআন নাযিল হতো, তাহলে তৎকালীন এবং পরবর্তী যুগের কাফের এবং খোদাদ্রোহী শক্তি কুরআনকে নবী লিখিত কেতাব বলে অভিযোগ দেয়ার সুযোগ পেত। ফলে দুর্বল-চেতা মানুষেরা এই কথায় বিশ্বাস করে ফেলতো বা সন্দেহ সংশয়ের মধ্যে পড়ে বিভ্রান্ত হয়ে যেতো। আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে সেই সুযোগ না দেবার জন্যই একজন নিরক্ষর ব্যক্তির উপর পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা আল-কুরআন নাযিল করেন। এতো কিছুর পরেও কাফেরেরা রাসূল (সাঃ)কে 'সায়ের' (কবি) 'কাহেন' (যাদুকর) এবং 'মাজনুন' (পাগল) বলে আখ্যায়িত করেছিলো। কিন্তু তাদের এই উক্তির প্রতিউত্তরও আল্লাহ্ তাআলা সাথে সাথে দিয়ে দিয়েছিলেন। যার কারণে তাদের এই উক্তি সমাজে টিকে নাই।

জানার বিষয় হলো এই যে, রাসূল (সাঃ) উম্মী ছিলেন, লেখা-পড়া জানতেন না। কিন্তু তাঁকে আল্লাহ্পাক এত জ্ঞান ও পান্ডিত্য দান করেছিলেন যে, তাঁর সামনে বড় বড় পন্ডিত ব্যক্তিরাও হার মানতে বাধ্য

হয়েছিলো। মহানবী (সাঃ) এর পান্ডিত্য, নেতৃত্ব এবং উত্তম আদর্শের কারণে আধুনিক বিশ্বেও তাঁকে সেরা ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। বিশ্বের সর্বোচ্চ শিক্ষাকেন্দ্র "অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটির" কর্তা ব্যক্তিরা সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান গেটের নাম ফলকে পৃথিবীর একশো জন সেরা ব্যক্তিদের নামের তালিকায় লিখা সর্বপ্রথম এবং সর্বউচ্চে মহামানব হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর নামটি আজও উজ্জ্বল অক্ষরে জলজল করছে।

بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ **তোমার রব এর নামে পড়**। এই হতে এ কথাও জানা যায় যে, নবী করীম (সাঃ) অহী নাযিলের মাধ্যমে নবুয়াত লাভের পূর্বেও আল্লাহ্কে রব হিসেবে জানতেন এবং মানতেন। যার কারণে সরাসরি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়াই বলা হয়েছে **তোমার রব এর নাম নিয়ে পড়**।

خَلَقَ **যিনি সৃষ্টি করেছেন**। এখান থেকে রব বা প্রতিপালকের কতিপয় গুনাবলী যা মানুষের জন্য নেয়ামত, তা বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ্র গুণাবলীর মধ্যে বিশেষভাবে সৃষ্টিগুণ উল্লেখ করার মধ্যে সম্ভবতঃ রহস্য এই যে, সৃষ্টি তথা অস্তিত্ব দান করাই সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ্ তাআলার সর্বপ্রথম নেয়ামত বা অনুগ্রহ। এই خَلَقَ দ্বারা ব্যাপক অর্থের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ গোটা বিশ্ব জগতকে বোঝানো হয়েছে।

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ **মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট বাঁধা রক্ত পিন্ড থেকে**। আগের আয়াতে সাধারণভাবে গোটা বিশ্ব জগতের সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ আয়াতে বিশেষভাবে সৃষ্টির সেরা জীব মানুষের সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যায়, গোটা বিশ্ব জগতের সার নির্যাস হচ্ছে মানুষ। জগতে যা কিছু আছে তার প্রত্যেকটির নযীর মানুষের মধ্যে আছে। তাই মানুষকে ক্ষুদ্র জগৎ বলা হয়। বিশেষভাবে মানুষ উল্লেখ করার এক কারণ এও হতে পারে যে, নবী-রাসূল ও কুরআন অবতীর্ণ করার লক্ষ্য হলো আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ পালন করানো। আর এই কাজটি বিশেষভাবে মানুষেরই। তাই এই আয়াতে মানুষের সৃষ্টির কথা খাসভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

عَلَقٍ-বহুবচন। একবচন- عَلَقَةٌ-এর অর্থ জমাট বা দলা বাধা রক্ত।

মায়ের পেটে সন্তান ধারণ করার পর প্রাথমিক কয়েক দিনের মধ্যে এরূপ অবস্থা হয়। মায়ের গর্ভে মানুষ সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর বোখারী শরীফের এক হাদীসে আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের বর্ণনায় মহানবী (সাঃ) বলেনঃ মানুষের বীর্য ৪০দিন পর্যন্ত গর্ভাশয়ে জমা থাকে। ৪০ দিন পর তা জমাট রক্তে পরিণত হয়। এরপর আরও ৪০ দিন অতিবাহিত হলে তা মাংসপিন্ড হয়ে যায়। অতপরঃ (হাড়-হাড্ডি সহ মানুষের আকার-আকৃতি সৃষ্টি করে) তাতে আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে একজন ফেরেশ্তা পাঠানো হয়। সে তাতে রূহ ফুঁকে দেয়। عَلَقٍ-বা জমাট রক্তপিন্ড হচ্ছে মানুষ সৃষ্টির মধ্যবর্তী অবস্থা। আয়াতে এই মধ্যবর্তী অবস্থা উল্লেখের মাধ্যমে এর আগের ও পরের অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত হয়ে গেছে। অতঃপর আল্লাহ্পাক পুনরায় পড়ার নির্দেশ দিয়ে বলেনঃ

اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ পড়, তোমার রব বড়ই দয়ালু। এখানে اِقْرَاْ আদেশের পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয়বার এটা উল্লেখ করার কারণ এরূপও হতে পারে যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পাঠ করার জন্যে প্রথম اِقْرَاْ বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় اِقْرَاْ-দাওয়াত, তাবলীগ বা প্রচার ও অন্যদেরকে পড়ানোর জন্য বলা হয়েছে। সুতরাং এই اِقْرَاْ দ্বারা গোটা মানব জাতিকে পড়ার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের কথা বলা হয়েছে। এই কাজ আল্লাহ্র নবী (সাঃ) বাস্তবে রূপ দিয়েছিলেন তার প্রমাণ আল্লাহ্পাক সূরা আল জুমুআতে উল্লেখ করেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ

তিনিই আল্লাহ্! নিরক্ষরদের মধ্যে থেকেই একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কেতাব ও হিকমত। (সূরা জুমুআ-২)

اَلْاَكْرَمُ-ইহা একটি আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ গুণ। এই বিশেষ গুণের মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, জগৎ এবং মানুষ সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ্ তাআলার নিজের কোনো স্বার্থ এবং লাভ নেই। বরং এগুলো সব দয়ার বা দানের কারণে করা হয়েছে। ফলে জগৎ এবং মানুষের এই অস্তিত্বের সৃষ্টি আল্লাহ্পাকের এক বিশেষ নেয়ামত এবং দান। অতঃপর আল্লাহপাক বলেনঃ

اَلَّذِىْ عَلَّمَ بِا الْقَلَمِ। **যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষাদান করেছেন।**

এটাও একটি আল্লাহ্পাকের বিশেষ গুণ এবং মানুষের জন্য এক বড় নেয়ামত। মানুষ সৃষ্টির পর মানুষের শিক্ষা-দীক্ষার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, শিক্ষাই মানুষকে অন্যান্য জীবজন্তু থেকে পৃথক এবং **আশরাফুল মাখলুকাত** বা সৃষ্টির সেরা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এটা সৃষ্টি জগতের মধ্যে খাস করে মানুষের জন্য আল্লাহ্ তাআলার এক বিশেষ অবদান, এক অতি বড় নেয়ামত বা অনুগ্রহ।

শিক্ষার মাধ্যম ঃ শিক্ষার মাধ্যম সাধারণতঃ দু'টি। (১) মৌখিক শিক্ষা। (২) কলম বা লেখার মাধ্যমে শিক্ষা। সূরার শুরুতে اِقْرَاْ শব্দের মধ্যে মৌখিক শিক্ষা রয়েছে। আর এ আয়াতে কলমের সাহায্যে শিক্ষাকে বোঝানো হয়েছে।

শিক্ষার প্রথম উপকরণ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ **আল্লাহ্পাক যখন আদিকালে সবকিছু সৃষ্টি করেন, তখন আরশে তাঁর কাছে সংরক্ষিত কেতাবে একথা লিখেন যে, আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর প্রবল থাকবে।** হাদীসে আরও বলা হয়েছে ঃ **আল্লাহ্ তাআলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেন এবং তাকে লেখার নির্দেশ দেন। সেমতে কলম কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে সব লিখে ফেলে। এ (লিখিত) কেতাব আল্লাহ্র নিকট আরশে সংরক্ষিত আছে। (কুরতুবী)।**

আল্লাহ্পাক মানুষকে কেবল জ্ঞান ও বিবেকে সম্পন্ন করেই ক্ষান্ত হননি। বরং তিনি মানুষকে কলমের সাহায্যে লেখার কৌশল, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রচার, প্রসার ও উন্নয়ন এবং বংশ পরম্পরাই জ্ঞানের

উত্তরাধিকারী সৃষ্টি ও বিকাশ, স্থায়িত্ব ও সংরক্ষণের মাধ্যম বানিয়েছেন। আল্লাহ্পাক মানুষকে যদি কলমের ব্যবহার এবং কলমের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা না করতেন, তাহলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়ন এবং স্থায়িত্ব লাভ করা সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব হয়ে পড়তো। তাইতো মানুষ আজ আল্লাহ্ প্রদত্ত এই কলমের সাহায্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে উর্দ্ধ থেকে আরও উর্দ্ধে, যমীনের নীচ থেকে আরও নীচে এবং গভীর পানির তলদেশ থেকে আল্লাহ্র সৃষ্টি রহস্য উৎঘাটনের জন্য আত্মনিয়োগ করেছে। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে অনেক অজানাকে জানা এবং দূরের জিনিসকে নিকট থেকে আরও নিকটতর করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অতপরঃ আল্লাহ পাক পরবর্তী আয়াতে বলেনঃ

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ **শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না।**

মূলতঃ মানুষ মুর্খ, জ্ঞানহীন। কোনো বিষয়ে তার কোনো জ্ঞান নেই। সে যদি কিছু জানে বা কোনো বিষয়ে তার জ্ঞান থেকে থাকে তবে তা একান্তভাবে আল্লাহ্রই দান। আল্লাহ্-ই সেই জ্ঞান দান করেছেন। মুখে এবং কলমের সাহায্যে যে শিক্ষা দিয়েছেন তা দুনিয়ার জীবনে দিয়েছেন এবং তা অর্জনের জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টারও প্রয়োজন আছে। কিন্তু আল্লাহ্ মানুষকে খেলাফতের দায়িত্ব দিয়ে পৃথিবীতে পাঠানোর পূর্বেই যখন আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করলেন, তখন তার কোনো জ্ঞান ছিলো না। খেলাফতের দায়িত্ব পালনের উপযোগী এবং **আশরাফুল মাখলুকাত** বা সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানের জন্য আল্লাহ্পাক ফেরেশ্তাদেরকে আনুগত্য প্রকাশের নির্দেশ দেবার আগেই তাঁকে দুনিয়ার সমস্ত জ্ঞান দিয়ে সমৃদ্ধ করলেন। সূরা বাকারার ৩১ নম্বর আয়াতে তা উল্লেখ করে বলেনঃ

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا **আল্লাহ্ আদমকে দুনিয়ার সমস্ত জিনিসের নাম শিক্ষা দিলেন।** এই জ্ঞান হলো মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের জ্ঞান,

যা আল্লাহ্পাক প্রতিটি মানুষের মাঝে দান করেছেন। এই জ্ঞান হলো আল্লাহ্ প্রদত্ত সুপ্ত জ্ঞান। এই সুপ্ত জ্ঞানকে প্রকাশিত, প্রসারিত এবং উদ্ভাসিত করার জন্যই বৈষয়িক জ্ঞান পড়া-লেখার প্রয়োজন হয়। তবে এই জ্ঞান আল্লাহ্ই দিয়ে থাকেন যতটুকু তিনি মানুষকে দেওয়া সমিচীন মনে করেন। আয়াতুল কুরসীতে এ কথাটি এই ভাষায় বলা হয়েছেঃ

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ

এই লোকেরা তাঁর (আল্লাহ্র)জ্ঞান ভান্ডার থেকে কোনো কিছুই আয়ত্ব করতে পারে না-ততটুকু ছাড়া, যতটুকু তিনি নিজে চান (সূরা বাকারা-২৫৫)। মানুষ যেসব জ্ঞান-বিজ্ঞানকে উদ্ভাবন বা আবিস্কার মনে করে, আসলে আগে তা তার জ্ঞানের আওতার মধ্যে ছিলো না। আল্লাহ্ই যখন চেয়েছেন, তখন সেই জ্ঞান থেকে তাকে দান করেছেন। যদিও মানুষ অনুভব করে না যে, এই জ্ঞান তাকে আল্লাহই দান করেছেন। এই জ্ঞান হলো মানুষের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বিশেষ নেয়ামত বা অনুগ্রহ।

প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এ পর্যন্ত আয়াত পাঁচটি নবী করীম (সাঃ) এর উপর সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছিলো। অহী নাযিল হওয়ার এই প্রথম অভিজ্ঞতা রাসূলে করীম (সাঃ) এর পক্ষে বড়ই কঠিন, দুঃসহ ও কষ্টদায়ক ছিলো। এর বেশী সহ্য করা বা নিজের মধ্যে ধারণ করা তার পক্ষে মোটেই সম্ভব ছিলো না। এই কারণে এই প্রথম অহীর দ্বারা শুধু এতটুকুই জানিয়ে দেয়া যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। (এর পর প্রায় তিন বছর ওহী বন্ধ ছিলো)।

শিক্ষা ঃ সম্মানিত ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াতের যে ব্যাখ্যা পেশ করলাম, এর মাধ্য-মে আমাদের জন্য যেসব শিক্ষা রয়েছে, তা হলো ঃ

❒ আমরা যখন কুরআন তিলাওয়াত করবো তখন আল্লাহ্র নাম বিস্মিল্লাহ্ দিয়েই তিলাওয়াত করা শুরু করবো। শুধু তিলাওয়াতই নয় বরং যে কোনো কাজ বিসমিল্লাহ্ দিয়েই শুরু করবো।

❒ অহীর জ্ঞান তথা আল-কুরআনের জ্ঞান অর্জন করার জন্য আত্মনিয়োগ করতে হবে। তার কারণ, যতো বেশী কুরআনের জ্ঞান সৃষ্টি হবে ততো বেশী মানুষের মধ্যে আল্লাহ্‌র ভয় এবং ভক্তি সৃষ্টি হবে।

❒ সমস্ত জগত মানুষের কল্যাণের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং এই বিশেষ দানের জন্য আমরা আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে যাবো।

❒ বিশেষ ভাবে মানুষ সৃষ্টির কথা উল্লেখের মাধ্যমে আল্লাহ্‌পাক এখানে মানুষের বিশেষত্ব তুলে ধরছেন। সুতরাং মানুষের উচিৎ হবে, আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগীতে আত্মনিয়োগ করা।

❒ আল্লাহ্‌র দয়া-মায়া, এবং অনুগ্র লাভের জন্য মানুষের উচিত পড়া এবং লেখার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করে খেলাফতের সঠিক দায়িত্ব আন্‌জাম দেয়া।

❒ মানুষ কিছুই জানতো না। আল্লাহ্‌ই মানুষকে তার বিশেষ মেহেরবানী করে শিক্ষা দিয়েছেন, একথা মানুষকে সব সময় স্মরণ রাখতে হবে। একথা মনে করতে হবে যে, আমি যা শিখেছি তা আল্লাহ্‌ পাকের বিশেষ মেহেরবাণীতেই শিখেছি। কেননা জ্ঞান অর্জন আল্লাহ্‌র বিশেষ দান।

আহবান ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াতের যে ব্যাখ্যা এবং শিক্ষা পেশ করলাম, এতে যদি আমার অজান্তে কোনো ভুল-ত্রুটি হয়ে যায়, তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আর দারস থেকে যে সব শিক্ষা আমরা লাভ করলাম, তা যেনো বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারি, সেই তৌফিক কামনা করে আমি আমার দারস শেষ করছি। **অয়াআখেরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন।**

দুই

মুমিনের জিন্দেগী হবে তাকওয়া, আন্দোলন ও দাওয়াতী জিন্দেগী

সূরা আলে-ঈমরান-১০২-১০৪

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِا للّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُو اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ- وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا - وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْكُنْتُمْ اَعْدَاۤءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖۤ اِخْوَانًا- وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ- وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ-

সরল অনুবাদঃ ইরশাদ হচ্ছে (১০২) হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো, যেমন করে ভয় করা উচিত। আর (প্রকৃত) মুসলমান না হয়ে তোমরা মৃত্যুবরণ করো না। (১০৩) তোমরা সবাই মিলে আল্লাহ্‌র রজ্জু (দীন)-কে শক্ত হাতে ধারণ করো; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যেও না। আর তোমরা আল্লাহ্ তাআলার সেই অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো যা তোমাদেরকে তিনি দান করেছেন। (তা হলো) তোমরা একে অপরের দুষমন ছিলে, অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদের দেলের মধ্যে ভালোবাসা পয়দা করে দিয়েছেন। ফলে এখন তোমরা তাঁর দয়ায়

পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেছ। তোমরা তো এক আগুনের কুন্ডলীর পাড়ে অবস্থান করছিলে। অতঃপর তিনি (মেহেরবাণী করে) সেখান থেকে তোমাদেরকে উদ্ধার করেছেন। এভাবেই আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করেন। যাতে তোমরা হেদায়েত লাভ করতে পারো। (১০৪) আর তোমাদের মধ্যে (সদাসর্বদা) এমনএকটা দল বা সংগঠন থাকা দরকার, যারা সৎ কাজের দিকে মানুষকে ডাকবে, ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে। (প্রকৃতপক্ষে) তারাই হলো সফলকাম।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থঃ يَاَيُّهَا-ওহে। اَلَّذِيْنَ-যারা। اِتَّقُوْ-তোমরা ভয় করো। حَقَّ-অধিকার, যথাযথ। تُقَتِهٖ-তাঁর ভয়। وَ-এবং। لَا-না। تَمُوْتُنَّ-তোমরা মরো। اِلَّا-ছাড়া, ব্যতীত। وَاَنْتُمْ-তোমরা। وَاعْتَصِمُوْ-তোমরা শক্তভাবে ধরো। حَبْلِ--রশি (দ্বীন) جَمِيْعًا-দলবদ্ধ বা সংগঠিতভাবে। لَا تَفَرَّقُوْا-তোমরা পৃথক হয়ে যেও না। وَاذْكُرُوْ-এবং তোমরা স্মরণ করো। عَلَيْكُمْ-তোমাদের উপর। اِذْ-যখন। كُنْتُمْ-তোমরা ছিলে। عَلٰى--উপর। شَفَا-কিনারা বা প্রান্তর। حُفْرَةٍ-কুন্ডলী বা গর্ত। اَلنَّارِ-আগুন। فَاَنْقَذَكُمْ- অতঃপর তোমাদেরকে উদ্ধার করলেন বা পরিত্রাণ দিলেন। مِنْهَا- সেখান থেকে। كَذٰلِكَ-এভাবে। اللّٰهُ يُبَيِّنُ-আল্লাহ্ প্রকাশ বা বর্ণনা করেন। لَكُمْ-তোমাদের জন্য। اٰيٰتِهٖ-তাঁর নিদর্শনসমূহ। لَعَلَّكُمْ-যাতে তোমরা। تَهْتَدُوْنَ-তোমরা সঠিক পথ পাও। وَلْتَكُنْ-এবং অবশ্যই থাকা উচিত। مِنْكُمْ-তোমাদের মধ্যে। اُمَّةٌ-জাতি বা দল। يَدْعُوْنَ-তারা ডাকে বা আহবান করে। اِلٰى-দিকে বা প্রতি। اَلْخَيْرِ-উত্তম। يَاْمُرُوْنَ -তারা আদেশ করবে। بِا- সহিত। مَعْرُوْفِ- ভালো বা উত্তম। وَيَنْهَوْنَ-তারা বারণ করবে বা নিষেধ করবে। عَنْ-থেকে বা হতে। اَلْمُنْكَرْ-মন্দ বা অপছন্দনীয়। وَاُولٰئِكَ-এবং ওরাই। هُمْ- তারাই। الْمُفْلِحُوْنَ-সফলকাম।

সম্বোধনঃ প্রিয় ভায়েরা/ বোনেরা! আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্‌। আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কালামে হাকীম আল-কুরআনের সূরা আলে ঈমরানের ১০২-১০৪ পর্যন্ত মোট ৩টি আয়াত তিলাওয়াত ও সরল তরজমা পেশ করেছি। আল্লাহ্‌ পাক যেনো আমাকে আপনাদের উপস্থিতিতে দারসের জন্য তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা এবং শিক্ষা তুলে ধরার তৌফিক দান করেন। "অমা তাওফীকি ইল্লাহ বিল্লাহ্‌।"

সূরার নামকরণঃ এই সূরার ৩৩ নং আয়াতে উল্লেখিত وَاٰلَ عِمْرٰنَ এই শব্দকে কেন্দ্র করে এর নামকরণ সূরা **আলে ঈমরান** করা হয়েছে। সূরার নামকরণ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য এক নম্বর দারসে উল্লেখ করা হয়েছে।

সূরাটি নাযিলের সময়কালঃ সূরা আলে ঈমরান একই সময় একই ভাষণে নাযিল হয়নি। কয়েকটি ভাষণে সূরাটি নাযিল হয়েছে। তা হলোঃ

● প্রথম ভাষণটি সূরার প্রথম থেকে শুরু হয়ে ৪র্থ রুকুর প্রথম দু'আয়াত অর্থাৎ ৩২ নম্বর আয়াত পর্যন্ত চলেছে। আর এটা সম্ভবতঃ বদর যুদ্ধের কাছাকাছি সময়ে নাযিল হয়।

● দ্বিতীয় ভাষণটি ৪র্থ রুকুর ৩৩ নম্বর আয়াত থেকে শুরু হয়ে ষষ্ঠ রুকুর শেষ পর্যন্ত চলেছে। ৯ম হিজরীতে নাজরানের প্রতিনিধি দল রাসূলের কাছে আগমনের সময় এটা নাযিল হয়।

● তৃতীয় ভাষণটি ৭ম রুকুর শুরু থেকে নিয়ে ১২তম রুকুর শেষ পর্যন্ত চলেছে। প্রথম ভাষণের সাথে সাথেই অর্থাৎ বদর যুদ্ধের কাছাকাছি সময়ে নাযিল হয় বলে ধারণা হয়।

● চতুর্থ ভাষণটি ১৩তম রুকু থেকে শুরু করে সূরার শেষ পর্যন্ত চলেছে। ওহুদ যুদ্ধের পর এটা নাযিল হয়।

বিষয়বস্তুঃ এই সূরায় দুটো দলকে সম্বোধন করে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। এক দল হলো আহলে কিতাব অর্থাৎ ইহুদী ও কৃষ্টান এবং দ্বিতীয় দলটি হলো ঈমানদার, রাসূলের সংগী-সাথীরা।

সূরা বাকারায় ইসলামের বাণী প্রচারের যে ধারা শুরু হয়েছিলো এই সূরায় প্রথম দলটির কাছে সে একই ধারায় প্রচার আরো জোরালো করা

হয়েছে। তাদের আকীদার বিভ্রান্তি ও চারিত্রিক দুষ্কর্ম সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এই রাসূল (সাঃ) এবং এই কুরআন এমন এক দ্বীনের দিকে নিয়ে আসে, যা এর আগের সকল নবীই এরই দিকে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে এসেছেন। আর সেটা হলো আল্লাহ্‌র প্রকৃত সত্য দ্বীন। সুতরাং তোমরা এই সত্য দ্বীনের সোজাপথ ছেড়ে যে পথ ধরেছো এটা সঠিক পথ নয়। আর তোমরা কুরআনকে বাদ দিয়ে অন্যান্যগুলো আসমানী কিতাব বলে স্বীকার করো এটাও সঠিক নয়। কাজেই তোমরা যার সত্যতা নিজেরা অস্বীকার করতে পার না তার সত্যতা স্বীকার করে নাও।

দ্বিতীয় দলটি শ্রেষ্ঠতম দলের মর্যাদা লাভ করার কারণে তাকে সত্যের পতাকাবাহী ও বিশ্ব মানবতার সংস্কার ও সংশোধনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে সূরা বাকারায় যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো এখানে তা আরো বৃদ্ধি করা হয়েছে। পূর্বের উম্মতদের ধর্মীয় ও চারিত্রিক অধঃপতনের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরে তাদেরকে তার অনুসরণ করা হতে দূরে থাকার জন্য সতর্ক করা হয়েছে। একটি সংস্কারবাদী দল হিসেবে তারা কিভাবে কাজ করবে এবং যেসব আহলে কিতাব (ইহুদী নাসরা) ও মুনাফিক মুসলমান আল্লাহ্‌র পথে নানা ভাবে বাধা বিপত্তি সৃষ্টি করছে, তাদের সাথে কি ধরনের আচরণ করবে, তাও তাদেরকে জানানো হয়েছে। ওহুদ যুদ্ধে তাদের মধ্যে যেসব দুর্বলতা দেখা দিয়েছিলো এই সূরায় পর্যালোচনা করে তা দূর করার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের বিষয়বস্তুঃ দারসের জন্য তিলাওয়াতকৃত আয়াত তিনটিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। তার মধ্যে দু'টি হলো ইসলামী জীবনের কেন্দ্রীয় চরিত্র। দু'টি মুসলমানদের জাতীয় শক্তির ভিত্তি। আর একটি হলো মুসলমানদের সামষ্টিক কল্যাণ।

ইসলামী জীবনের কেন্দ্রীয় চরিত্রের প্রথমটি হলো 'ঈমান' আর দ্বিতীয়টি হলো 'ভ্রাতৃত্ব'। যার উপর মুসলিম জাতি দাঁড়িয়ে আছে।

মুসলমানদের জাতীয় শক্তির উৎসের প্রথমটি হলো 'তাকওয়া' আর দ্বিতীয়টি হলো 'ঐক্যবদ্ধ জীবন বা জামায়াতী জিন্দেগী।'

মুসলমানদের সামষ্টিক কল্যাণ হলো 'দাওয়াত' ও 'তাবলীগ' বা প্রচার।

ব্যাখ্যাঃ উপস্থিত প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত সূরা আলে ঈমরান এর তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর প্রয়োজনীয় বিবরণ দেবার পর এখন আপনাদের সামনে গুরুত্বপূর্ণ শব্দ ও আয়াতের ব্যাখ্যা পেশ করছি।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো, যেমন করে ভয় করা উচিত। আর প্রকৃত মুসলমান না হয়ে মৃত্যু বরণ করো না।

اِيْمَانٌ-(ঈমান) ঃ اِيْمَانٌ-শব্দটি اَمْنٌ-ধাতু থেকে লওয়া হয়েছে। যার অর্থ 'নিরাপত্তালাভ'। সাধারণ অর্থে 'বিশ্বাস'। মুসলমান হবার জন্য প্রথম শর্ত হলো ঈমান। ইসলামের যাবতীয় ইবাদাত এবং সৎ কাজের বুনিয়াদ হচ্ছে ইমান বা বিশ্বাস। ঈমান ছাড়া কোনো আমল তা দেখতে যতই নেক মনে হোক না কেন, তা আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এটা হলো ইসলামী জীবন যাপনের কেন্দ্রীয় প্রথম চরিত্র। সুতরাং যাদের মধ্যে ঈমান আছে তাদেরকেই এই আয়াতে اٰمَنُوْا-অর্থাৎ ঈমানদার বলে সম্বোধন করেছে।

اِتَّقُوا اللّٰهَ-**তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো।** تَقْوَا-(তাকওয়া) শব্দটি وِقَايَةٌ-(বিকায়া) থেকে উৎপত্তি হয়েছে। যার অর্থ বেঁচে থাকা, বিরত থাকা, দূরে থাকা ও ভয় করা ইত্যাদি বোঝায়। সাধারণ অর্থে আল্লাহ্ভীতিকে তাক্ওয়া বলে। ফারসী ভাষায় তাকওয়াকে পরহেযগারী বলা হয়।

ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায় তাক্ওয়া অর্থ হলো-ইসলাম যেসব বিষয়ে চিন্তা করতে, বলতে ও করতে নিষেধ করেছে, কেবলমাত্র আল্লাহ্ তাআলার ভয়ে সে সব চিন্তা-ভাবনা, কথা-বার্তা ও কাজ-কাম করা থেকে বিরত থেকে দ্বীন ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা-তদবীর করাকেই তাক্ওয়া বলা হয়। যারা এ গুনের অধিকারী হন তাদেরকে 'মুত্তাকীন' বা পরহেযগার বলা হয়।

তাক্ওয়া সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাঃ আমাদের সমাজে অধিকাংশের মধ্যে ইসলামের সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে তাক্ওয়া বা পরহেযগারী সম্পর্কে ধারণা হলো বাহ্যিক বেশ-ভূষা। যার মুখে লম্বা দাড়ি, মাথায় পাগড়ী, হাতে তাস্বীহ্ এবং গায়ে লম্বা জামা থাকে তাকেই মুত্তাকী বা পরহেযগার বলে মনে করে। অথচ শরীয়ত তাক্ওয়ার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বাহ্যিক দিকের প্রতি তেমন গুরুত্ব দেয়নি। প্রকৃতপক্ষে তাক্ওয়া হলো মনের মধ্যে আল্লাহ্র ভয়। আল্লাহ্র নবী (সাঃ) সাহাবীদের সামনে অক্ওয়া সম্পর্কে বক্তব্য দিতে গিয়ে তাঁর নিজের বুকের (কলবের) দিকে হাতের ইশারা দিয়ে তিন তিনবার বললেনঃ اَلتَّقْوَائُ هَا هُوْنَا

তাক্ওয়া হলো এখানে (বুকের মধ্যে)। অর্থাৎ অন্তরে যদি আল্লাহ্র ভয় পয়দা হয়ে যায় তাহলে তার প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে এবং আমলে তার প্রভাব পড়ে। এ সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) বলেনঃ

اَلاَ اُنَبِّئُكُمْ بِخِيَارِكُمْ قَالُوْا بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ خِيَارُكُمُ الَّذِيْنَ اِذَا رُءُوْا ذُكِرَ اللّٰهُ وَاذْكُرَاللّٰهَ

আমি কি তোমাদের উত্তম লোকদের সম্পর্কে বলবো ? সাহাবীরা বললেনঃ জি হ্যাঁ বলুন হে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ)। তিনি বললেনঃ তোমাদের মধ্যে তারাই উত্তম যাদের (আমল) দেখলে আল্লাহ্র কথা স্মরণ হয়। (অর্থাৎ অন্তরের তাক্ওয়ার কারণে বাহ্যিক দিকও তাক্ওয়ার প্রভাব ফুটে উঠে)। (ইবনে মাযা, রাবী আস্মা বিনতে ইয়াজীদ)।

তাক্ওয়ার একটি বাস্তব নমুনাঃ তাক্ওয়া সম্পর্কে প্রচলিত একটি ঘটনা আছে। তা হলো, একজন আলেম ওস্তাদ তাঁর কতিপয় ছাত্রের হাতে একটি চাকু ও একটি করে মুরগী দিয়ে বললেনঃ তোমরা মাঠের এমন এক নির্জন স্থান থেকে একে যবাই করে নিয়ে আসবে যেখানে কেউ দেখবে না। সেই ছাত্ররা ওস্তাদের কথা মতো হাতে চাকু এবং মুরগী নিয়ে মাঠের মধ্যে চললো এবং নির্জন মাঠের মধ্যে গিয়ে সবাই জবাই করে নিয়ে আসলো। কিন্তু একজন ছাত্র আস্ত মুরগী এবং চাকুটি হুজুরের কাছে ফেরত দিলো। এতে ওস্তাদ সেই ছাত্রটিকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি

তো মুরগী যবাই করোনি ? প্রতিউত্তরে ছাত্রটি বললো, হুজুর আপনি মুরগী যবাই করার সাথে একটি শর্ত জুড়ে দিয়েছিলেন, তা হলো-**কেউ যেনো না দেখে**। কিন্তু আমি মাঠের নির্জন থেকে নির্জন স্থানে যেখানেই যবাই করতে যাই, সেখানেই কোনো মানুষ না দেখলেও মহা শক্তিধর আল্লাহ্‌পাক আমার এই কাজটি দেখছেন। তাই আমি আর যবাই না করে আপনার শর্ত অনুযায়ী আস্ত মুরগী ফেরৎ নিয়ে এসেছি। প্রিয় ভায়েরা, এটাই তো হলো তাক্‌ওয়া বা খোদাভীতির বাস্তব নমুনা। তার কারণ মানুষ যে অবস্থায় যেখানেই থাকুক না কেনো, আর মনের মধ্যে যাই থাকনা কেনো, সবকিছুই পরখ করছেন মহান সেই আল্লাহ্ তাআলা।

তাক্‌ওয়া হচ্ছে এমন একটি মৌলিক গুণ যার উপর গোটা মুসলিম জামায়াত টিকে আছে এবং তাদের প্রতিদিনের কর্তব্য পালন করে যাচ্ছে। তাক্‌ওয়ার এই গুণটির অভাবে একটি সমাজ জাহেলী সমাজে পরিণত হয়। মানুষের মধ্যে কোনো সৎ নেতৃত্ব গড়ে উঠতে পারে না। এ গুণটি যেই নেতৃত্বের মধ্যে নেই সেই নেতৃত্ব যত বলিষ্ঠ নেতৃত্বই হোক না কোনো, তা হবে জাহেলী নেতৃত্ব, যা সাধারণ মানুষের জন্য কোনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না।

আয়াতে উল্লেখিত ইসলামের কেন্দ্রীয় চরিত্র ঈমান এবং জাতীয় শক্তি তাক্‌ওয়ার যখন সমন্বয় ঘটবে তখনই প্রতিটি কাজ ও পদক্ষেপ জাতির কাছে এবং আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। আর তার প্রতিদান হিসেবে আল্লাহ্‌পাক দেবেন রহমত এবং বরকত। মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ

যখন কোনো দেশের জনগণ ঈমান এবং তাক্‌ওয়ার ভিত্তিতে সমাজ পরিচালনা করে, তখন আল্লাহ্ পাক সেই সমাজের জন্য আসমান এবং যমীনের সমস্ত রহমতের দরজা খুলে দেন। (আ'রাফ-৯৬)

حَقَّ تُقٰتِهٖ **তাক্‌ওয়ার হক আদায় করে ভয় করো।**

তাক্‌ওয়ার হক কিঃ? তাক্‌ওয়ার হক এর ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ, রবী, কাতাদাহ ও হাসান বসরী (রাঃ) বলেন, তাছাড়া

রাসূল (সাঃ) নিজেও বলেছেনঃ তাক্ওয়ার হক হলো, প্রতিটি কাজে আল্লাহ্র আনুগত্য করা, আনুগত্যের বিপরীত কোনো কাজ না করা, আল্লাহ্কে মনের মধ্যে সার্বক্ষণিক স্মরণ রাখা, কখনও ভুলে না যাওয়া এবং সবসময়ই তাঁর শোকরিয়া আদায় করা এবং অকৃতজ্ঞ না হওয়া। (বাহ্রে মুহীত)।

হকঃ অর্থ প্রাপ্য, পাওনা বা অধিকার। যেমন পিতার মৃত্যুর পর সন্তানেরা তার সম্পদের হকদার বা উত্তরাধিকারী হয়ে যায়। যা কেউ হস্তক্ষেপ করার অধিকার রাখে না। তেমনি ভাবে আল্লাহ্কে ভয় করার যে হক বা প্রাপ্য রয়েছে সেভাবে হক আদায় করে ভয় করতে হবে। তাই আল্লাহ্ তাআলা এখানে বলেছেনঃ **তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো যেভাবে ভয় করা উচিত**। সূরা হজ্বের শেষ আয়াতে আল্লাহ্পাক জিহাদের কথা বলতে গিয়ে বলেছেনঃ

وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ

তোমরা আল্লাহ্র জন্য জিহাদ করো জিহাদের হক আদায় করে। সাধারণভাবে কোনো কাজ নিখুতভাবে করতে চাইলে আমরা বলে থাকি, **কাজের মতো কাজ করো। খেলার মতো খেলা করো, পড়ার মতো পড়ো, লেখার মতো লেখ** ইত্যাদি। অর্থাৎ যে কাজটি যেভাবে করা উচিত তা সেভাবে এবং নিখুত ও আন্তরিকতার সাথে করার তাগাদা দেবার জন্যই আমরা এভাবে বলে থাকি।

তাক্ওয়ার স্তরঃ তাক্ওয়ার কতকগুলো স্তর বা পর্যায় রয়েছে। তার মধ্যে

প্রথম স্তর বা সর্বনিম্ন স্তরঃ কুফর ও শিরক থেকে বেঁচে থাকা। এ অর্থে প্রত্যেক মুসলমানকেই মুত্তাকীন বলা যায়- যদিও সে গোনাহ্র মধ্যে জড়িত থাকে। এ অর্থে কুরআনের অনেক জায়গায় 'মুত্তাকীন' বা 'তাক্ওয়া' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

দ্বিতীয় স্তর বা পর্যায়ঃ যা আসলে কাম্য, তা হলো এমন সব বিষয় থেকে বেঁচে থাকা, যা আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রাসূলের পছন্দনীয় নয়। কুরআন ও হাদীসে তাক্ওয়ার যেসব ফজিলাত ও কল্যাণের কথা বলা হয়েছে, এ স্তরের তাক্ওয়ার উপর ভিত্তি করেই বলা হয়েছে।

তৃতীয় স্তর বা সর্বোচ্চ স্তরঃ নবী রাসূলগণ এবং যারা তার প্রকৃত অনুসারী তারাই এ স্তরের তাক্ওয়া অর্জন করে থাকেন। অর্থাৎ অন্তরকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যসব কিছু থেকে বাঁচিয়ে রাখা এবং আল্লাহ্র স্মরণ ও তাঁর সন্তুষ্টি হাসিলের মাধ্যমে অন্তরকে পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ রাখা। আলোচ্য আয়াতে حَقَّ تُقٰتِهٖ অর্থাৎ তাক্ওয়ার হক আদায় করে আল্লাহ্কে ভয় করা। এ স্তরটিই হলো প্রকৃত তাক্ওয়ার হক। এ স্তরে পৌঁছার জন্য প্রতিটি মুমিন নর-নারীর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা উচিত।

তাক্ওয়াবান ব্যক্তি প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহ্কে স্মরণ রেখে ভয় করে চলে। যার কারণে তার জিহবা কোনো খারাপ বা গোনাহ্র কথা উচ্চারণ করে না, চোখ খারাপ কিছু দেখে না, কান খারাপ কিছু শোনে না, মাপে কম দেয় না, হারাম ভক্ষণ করে না, হারামের পর্যায়ে পড়ে এমন কোনো কাজ বা ভূমিকা রাখে না, সদাসর্বদা হারাম থেকে বেঁচে হালাল তালাশে থাকে এবং তার জন্য আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করে। হারামের মধ্যে জড়িয়ে যাবার ভয়ে সন্দেহযুক্ত হালাল এমনকি অনেক সন্দেহমুক্ত হালাল জিনিসও পরিহার করে। এ সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) বলেনঃ

لَايَبْلُغُ الْعَبْدُ اَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ حَتّٰى يَدَعَ مَالَا بَاْسَ بِهٖ حَذَرًالِّمَابِهٖ بَاْسٌ

বান্দাহ ততক্ষণ পর্যন্ত মুত্তাকীদের মধ্যে শামিল হতে পারে না, যতক্ষণ না সে গোনাহ্র কাজে জড়িয়ে পড়ার ভয়ে ঐসব কাজও পরিহার করে যে সব কাজে কোনো গোনাহ্ নেই। (তিরমিযী, রাবী আতিয়া আস-সাআদী রাঃ)। অন্য হাদীসে হযরত উমর (রাঃ) বলেছেনঃ **হারামে জড়িয়ে যাবার ভয়ে আমরা হালাল জিনিসের দশ ভাগের নয় ভাগই পরিত্যাগ করে থাকি।**

বাস্তব উদাহরণঃ একজন রাখালের জন্য গরু-ছাগল মাঠে ফসলের জমির সীমানা বা আইল পর্যন্ত চরানো বৈধ। কিন্তু পাশের জমির ফসলে হঠাৎ করে মুখ দিয়ে ক্ষতি করার ভয়ে সে তার গরু-ছাগল জমির ফসলের আইল থেকেও অনেক দূরে রাখে। এটাই হলো একজন মুত্তাকী ব্যক্তির

তাক্ওয়ার বাস্তব উদাহরণ। দুনিয়ার জীবনে পাপ থেকে বাঁচার উদাহরণ দিয়ে হযরত উমর (রাঃ) বলেনঃ "কন্টাকাকীর্ণ রাস্তায় চলাচলের সময় যেমন কাপড়-চোপড় গুটিয়ে আঁটো-সাঁটো হয়ে চলতে হয়। তেমনিভাবে দুনিয়ার জীবনে পাপ থেকে বাঁচার জন্য একজন মুত্তাকী ব্যক্তিকে সতর্কতার সাথে বেছে বেছে চলতে হয়।"

তাই শুধু–নামায, রোজা, হজ্ব পালন করেই ইসলামের সব কাজ করা হয়েছে মনে করে দুনিয়ার জীবনে গা ভাসিয়ে দিয়ে চললে হবে না। দুনিয়ার এই প্রতিকুল পরিবেশেই আল্লাহ্কে পাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। দুনিয়ার এই জীবনে প্রতিটি ধাপ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ফেলতে হবে। প্রতিটি কাজ আল্লাহ্কে ভয় করে তারই সন্তুষ্টির জন্য করতে হবে। প্রকৃত পক্ষে একজন মুত্তাকী ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য এটাই হওয়া উচিৎ। অতঃপর আল্লাহ্ পাক মুমিনদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ

وَلَاتَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ

আর তোমরা প্রকৃত মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। অর্থাৎ ইসলামের উপরই মৃত্যুবরণ করো। সারা জীবন ইসলামের উপর কায়েম থাকো, যাতে করে মৃত্যুও তার উপরেই হয়। ঈমান ও তাক্ওয়ার বহিঃপ্রকাশ হলো, ইসলামের যাবতীয় হুকুম আহকাম পালন করা। আর যারা ইসলামের যাবতীয় কাজ আঞ্জাম দিয়ে আল্লাহ্র আনুগত্য করে, তাদেরকেই মুসলমান বলা হয়। মৃত্যু এমন এক অদৃশ্য বস্তু, কখন যে মানুষকে পাকড়াও করবে তা সে মোটেই জানে না। সুতরাং যে ব্যক্তি মুসলমান না হয়ে মরতে রাজি নয়, তার কাজ হবে সব সময় এবং প্রতিটি মুহূর্ত একশভাগ মুসলমান হয়ে থাকার চেষ্টা করা। কেননা যার যে অবস্থার উপর মরণ হবে তার উপরই কিয়ামতের দিন তাকে উঠানো হবে। হযরত জাবের (রাঃ) বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর মৃত্যুর তিনদিন আগে তাঁর মুখে বলতে শুনেছিঃ "দেখ, তোমরা মৃত্যুর সময় আল্লাহ্র প্রতি ভালো ধারণা রাখবে।" (মুসলিম)। মুসনাদে বায্যারে রয়েছে, "রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এক আনসারী রুগীকে দেখতে গেলেন। সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, অবস্থা কিরূপ? তিনি প্রতিউত্তরে বললেনঃ

আলহামদু লিল্লাহ্ ভালই আছি। আল্লাহ্র দয়ার আশা করছি এবং তাঁর শাস্তির ভয় করছি। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তখন বললেনঃ জেনে রেখো এরূপ অবস্থায় যার অন্তরে আশা ও ভয় দুটোই থাকে আল্লাহ্ তার আখাংকার জিনিস প্রদান করেন এবং ভয়ের জিনিস হতে রক্ষা করেন।"

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ইসলামের উপর টিকে থাকার জন্য প্রায় অধিকাংশ সময়ই আল্লাহ্র কাছে দোয়া করতেন ঃ

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبُ ثَبِّتْ قُلُوْبَنَا عَلٰى دِيْنِكَ

হে আমাদের দেলকে পরিবর্তনকারী, আমাদের দেলসমূহকে তোমার দ্বীনের উপর রাখো।

يَا مُصَرِّفَ الْقُلُوْبُ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلٰى طَاعَتِكَ

হে আমাদের দেলসমূহকে উলট-পালটকারী, আমাদের দেলসমূহকে তোমার আনুগত্যের দিকে ঘুরিয়ে দাও। (মুসলিম)। আয়াতে প্রকৃত মুসলমান বলতে পূর্ণভাবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে এবং অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকতে বলা হয়েছে। **হে পরওয়ার দেগার! আমাদেরকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ইসলামের উপর টিকে থাকার তাওফীক দাও এবং মৃত্যুর সময় কালেমার সাথে মৃত্যু দান করিও, আমিন।**

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا - وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖ اِخْوَانًا - وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ-

আর তোমরা সকলে আল্লাহ্র রজ্জু (দ্বীন)কে ঐক্যবদ্ধভাবে শক্ত হাতে ধারণ করো; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যেও না। আর তোমরা আল্লাহ্র সেই অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো, যা তোমাদেরকে তিনি দান করেছেন। (এক সময়) তোমরা একে অপরের শত্রু ছিলে, অতঃপর

আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা পয়দা করে দিয়েছেন। ফলে এখন তোমরা তাঁর অনুগ্রহের কারণে একে অপরে ভাই ভাই হয়ে গেছো। (আসলে তো) তোমরা এক অগ্নিকুন্ডের পাড়ে অবস্থান করছিলে। অতঃপর তা থেকে তোমাদেরকে তিনি উদ্ধার করেছেন। এভাবেই আল্লাহ্ তাঁর নিজের নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা সুপথ পাও।

শানে নুযুলঃ আলোচ্য আয়াতটি অবতরণের কারণ সম্পর্কে ইবনে কাসীর তাঁর তাফসীরে তিনটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

প্রথম ঘটনাঃ মদীনায় আল্লাহ্র রাসূল আগমনের ফলে চির দুষমন 'আউস' ও 'খাযরাজ' গোত্র দুটি ইসলাম কবুল করে একে অপরে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায়। এটা তাদেরই পড়শী ইহুদীরা বরদাস্ত করতে পারছিলো না। তাই তারা তাদের পূর্ব শত্রুতার দিকে পুনরায় ফিরিয়ে নেবার জন্য সুযোগ খুজছিলো। এমনি ভাবে একটা মহা সুযোগ তারা পেয়ে যায়। একবার এক ইহুদী আউস ও খাযরাজদের সম্মিলিত স মাবেশের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। এসময় উক্ত গোত্র দু'টির পারস্পারিক মিল-মহব্বত ও একতার দৃশ্য দেখে তার গা জ্বালা হয়ে যায়। ফলে সে হিংসার বসবতী হয়ে শত্রুতার উদ্দেশ্যে চক্রান্তের জন্য তাদের সমাবেশে যোগদানের জন্য একজন লোক পাঠায়। লোকটি এসে তাদের কথাবার্তায় যোগ দেয় এবং সুযোগ বুঝে ঐ গোত্র দু'টির মধ্যে অতীতের শত্রুতা ও যুদ্ধ বিগ্রহের কথা বিশেষ করে 'বুআস' যুদ্ধের তিক্ত ইতিহাস তুলে ধরে এবং তাদের মধ্যে বিদ্বেষ ও বিভেদ ছড়ানোর ষড়যন্ত্র করে। অবশেষে তার এই হিংসাত্মক ষড়যন্ত্র সফল হয় এবং আউস ও খাযরাজ গোত্র দু'টির মধ্যে ভীষণ প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে ওঠে। ফলে নিভে যাওয়া তাদের আক্রোসের আগুন পুনরায় দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে এবং একে অপরের বিরুদ্ধে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। তারা ক্রোধের আগুনকে আরো বাড়িয়ে দেবার জন্য বিভিন্ন প্রকার উস্কানীমূলক শ্লোগান দেওয়া শুরু করে এবং হাতাহাতি ও অস্ত্র চালানোর পর্যায়ে চলে যায়। এমনকি 'হারারা' নামক ময়দানে একে অপরের সাথে মোকাবেলা করার জন্য ডাকাডাকি করতে থাকে। এ ঘটনাটি রাসূল (সাঃ) জানতে পেয়ে সাথে

সাথে তাদের সভাস্থলে ছুটে আসেন এবং অবস্থা বেগতিক দেখে তিনি তাদেরকে শান্ত করতে গিয়ে বলেনঃ "কী আশ্চর্য ব্যাপার! আমি তোমাদের মাঝে উপস্থিত থাকার পরেও তোমরা যাহেলিয়াতের যুগের মতো একে অপরকে শক্তির বাহাদুরী পরীক্ষার জন্য ডাকাডাকি শুরু করে দিয়েছো?" অতঃপর তিনি তাদের সামনে অত্র আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। আল্লাহ্ পাকের মেহেরবাণীতে তাদের উপর কোরআনের এই আয়াতের প্রভাব পড়ে, ফলে তারা লজ্জিত হয়। তারা একে অপরের সাথে কোলাকুলি করে। এভাবে ইহুদীদের চক্রান্ত চরম ভাবে ব্যর্থ হয়ে যায়।

দ্বিতীয় ঘটনাঃ হুনায়েন যুদ্ধে বিজয় লাভ করার পর ধর্মীয় মঙ্গলের কথা চিন্তা করে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) গাণিমাতের মাল বন্টন করতে গিয়ে কোনো কোনো লোককে কিছু বেশী দেন। এতে কোনো একজন লোক রাসূলের এই কাজে কটুক্তি করে। ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আনসার দলকে একত্রিত করে একটি ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি এ কথাও বলেনঃ "হে আনসারের দল! তোমরা কি পথভ্রষ্ট ছিলে না, অতঃপর আমার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের সুপথ দান করেন ? তোমরা কি দলে দলে বিভক্ত ছিলে না, অতঃপর আল্লাহ্ আমারই কারণে তোমাদের অন্তরে ভালোবাসা সৃষ্টি করেন? তোমরা গরীব কি ছিলে না, অতঃপর আল্লাহ্ আমারই মাধ্যমে তোমাদেরকে ধনী করেন ? প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে এই পবিত্র দলটি আল্লাহ্র শপথ করে সবাই একই সুরে সুর মিলিয়ে বলে ওঠেনঃ আমাদের উপর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) এর অনুগ্রহ এর চেয়েও বেশী রয়েছে।

তৃতীয় ঘটনাঃ হযরত ইকরামা (রাঃ) বলেনঃ হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) কে যখন মুনাফিকরা মিথ্যা দোষারোপ করেছিলো এবং তাকে দোষ থেকে মুক্ত করে আল্লাহ্ তাআলা আয়াত নাযিল করেছিলেন, তখন মুসলমানেরা একে অপরের বিরুদ্ধে লেগে পড়েছিলো, সেই সময় এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিলো।"

মোট কথা মদীনার আউস ও খাযরাজ গোত্র রাসূল (সাঃ) এর আগমনে এবং ইসলাম কবুল করার কারণে তাদের মধ্যে জাহেলিয়াতের যুগের চির

দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে যে মহব্বত পয়দা হয়ে ইস্পাত তৈরী প্রাচীরের ন্যায় ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলো। এটা তাদেরই পড়শী ইসলামের শত্রু বানু নাযীর ও বানু কাইনুকা গোত্রের ইহুদীদের চক্ষুশূল ও গা জ্বালার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। এজন্য তাদের উভয়ের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টির জন্য তারা সর্বদা চেষ্টায় নিয়োজিত ছিলো।

حَبْلِ اللّٰهِ অর্থ -আল্লাহ্‌র রজ্জু। রজ্জু বলতে কুরআন তথা দ্বীনকে বোঝানো হয়েছে। হযরত যায়েদ ইবনে আরকামের বর্ণনায় বলা হয়েছেঃ

حَبْلُ اللّٰهِ هُوَ الْقُرْاٰنُ অর্থাৎ **আল্লাহ্‌র রজ্জু হচ্ছে কুরআন।**

(ইবনে কাসীর)। কুরআন অথবা দ্বীনকে রজ্জুর সাথে তুলনা করার কারণ হলো, এটা এমন এক সম্পর্ক, যা একদিকে আল্লাহ্‌র সাথে ঈমানদারদের সম্পর্ক জুড়ে দেয়, অপরদিকে সমস্ত ঈমানদারদেরকে একে অপরের সাথে মিলিয়ে এক জামায়াতবদ্ধ করে দেয়।

جَمِيْعًا–অর্থ ঐক্যবদ্ধ, দলবদ্ধ বা জামায়াতবদ্ধ। এটা হলো মুসলমানদের জাতীয় শক্তির দ্বিতীয় ভিত্তি।

ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দুঃ যে কোনো ঐক্যের একটি বিশেষ কেন্দ্র থাকা উচিত। বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন মত রয়েছে। কোথাও বংশগত, কোথাও গোত্রগত, কোথাও ভাষাগত, আবার কোথাও বর্ণগত সম্পর্ককে ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছে। কিন্তু আল-কোরআন এই ঐক্যকে স্বীকার করে না। বরং এসব কিছুকে বাদ দিয়ে ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু "হাবলুল্লাহ" অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রজ্জু তথা দ্বীন ইসলামকে নির্ধারণ করেছে। আর ইসলাম এও বলে দিয়েছে যে, মুমিন মুসলমানেরা সবাই একই জাতি। চাই সে যে জাতি, বর্ণ, গোত্র বা রং এর হোক না কোনো।

মোট কথা আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদেরকে দুটো বিষয়ে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রথমতঃ তোমরা সবাই আল্লাহ্‌র পাঠানো জীবন ব্যবস্থা আল-কুরআনের অনুসারী হয়ে যাও। দ্বিতীয়তঃ একে সবাই মিলে জামায়াতবদ্ধ ভাবে আকড়ে ধরো, যাতে করে মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। জামায়াতবদ্ধ জীবন যাপন করার নির্দেশ

দেবার পরক্ষণেই আল্লাহ্পাক বলেনঃ

وَلَا تَفَرَّقُوْا **তোমরা দলাদলি করে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেও না।** আয়াতে আল্লাহ্পাক প্রথম দিকে ঐক্যের পজেটিভ দিক তুলে ধরার পর নেগেটিভ দিক। وَلَا تَفَرَّقُوْا **তোমরা পরস্পর বিভেদ সৃষ্টি করো না** বলে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছেন। আল-কুরআনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো মুসলমানদেরকে প্রায় জায়গায় নির্দেশ দিতে গিয়ে যেমন পজেটিভ কথা বলা হয়েছে। তেমনি সাথে সাথে সেখানে নেগেটিভ কথাও বলে দেয়া হয়েছে। অনুরূপ ভাবে এখানেও ঐক্যবদ্ধ বা জামায়াতবদ্ধ জীবনের বিপরীত পথে অগ্রসর হতে বারণ করে দেয়া হয়েছে।

সহীহ মুসলিম শরীফে উল্লেখ রয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ্ তাআলা তিনটি কাজে খুশী হন এবং তিনটি কাজে বেজার হন। যে তিনটি কাজে আল্লাহ্ খুশী হন তা হলোঃ (১) একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার ইবাদত করা এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক না করা। (২) ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহ্র দ্বীনকে ধারণ করা এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে না যাওয়া। আর (৩) মুসলমান শাসকদের সহযোগীতা করা। যে তিনটি কাজে আল্লাহ্ বেজার হন তা হলোঃ (১) বাজে ও অনর্থক কথা বলা। (২) বেশী বেশী প্রশ্ন করা এবং (৩) সম্পদ ধ্বংস করা। (ইবনে কসীর)।

মোট কথা মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্যের ফলই হলো তাদের পতন ও ধ্বংস। যুগেযুগে দেখা গেছে যখনই তাদের দ্বীনের ব্যাপারে অনৈক্য সৃষ্টি হয়েছে, তখনই তাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। বর্তমানকালে গোটা দুনিয়ার মুসলমানেরা দ্বীনের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ না হবার কারণেই নিজেদের মধ্যে কাদা ছোড়াছোড়ি করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। আর এই সুযোগে আল্লাহ্, আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) এবং মুসলমানদের চির শত্রু ইহুদী, খৃষ্টান এবং মুশরিকরা অন্যায় এবং যুলুম নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। আর ষড়যন্ত্র করে মুসলমানদেরকে উসকিয়ে দিয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিগ্রহে জড়িয়ে দিচ্ছে।

মুসলমানদেরকে জামায়াতবদ্ধ জীবন যাপন এবং পরস্পর হানাহানি থেকে

বিরত থাকার নির্দেশ দেবার পর আয়াতের পরবর্তী অংশে তাঁর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন ঃ

اُذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا

"তোমরা স্মরণ করো আল্লাহ্‌র সেই অনুগ্রহের কথা যখন তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু। অতঃপর তিনিই তোমাদের অন্তরগুলো ভালোবাসায় জুড়ে দিয়েছেন। ফলে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ ও মেহেরবানীতে ভাই ভাই হয়ে গেলে।"

অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা মুমিনদেরকে দু'টো অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

প্রথম অনুগ্রহঃ আয়াতে মুমিনদের জন্য প্রথম অনুগ্রহ হলো ভ্রাতৃত্ব। যা ইসলামী জীবনের দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় চরিত্র। জাহেলিয়াতের যুগে মদিনার আউস এবং খাযরাজ গোত্র দু'টির মধ্যে কেন্দ্রীয় কোনো রাষ্ট্র ব্যবস্থা না থাকার কারণে তাদের নিজেদের মধ্যে মারামারি, কাটাকাটি, ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকতো। তারা একে অপারের চরম দুষমন ছিলো। কেউ কাউকে বরদাস্ত করতে পারতো না। তাদের এই শত্রুতা দীর্ঘদিন থেকে চলতে ছিলো। এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌পাক মেহেরবাণী করে তাঁর পিয়ারা হাবীবকে দ্বীন ইসলাম সহ হিজ্‌রাতের মাধ্যমে মদীনায় আগামন ঘটিয়ে তাদের মধ্যে দীর্ঘদিনের লালিত শত্রুতা দূর করলেন। তাদের অন্তরে দ্বীনের কারণে মহব্বত ও ভালবাসা পয়দা করে দিলেন। ফলে তারা একে অপরের বন্ধুতে পরিণত হয়ে গেলো। তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে পূর্বের সব কিছু ভুলে গিয়ে এক হয়ে গেলো। হিংসা-বিদ্বেষ বিদায় নিলো। তারা পরস্পর ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ভাই ভাই হয়ে গেলো। তারা নেকীর কাজে একে অপরের সাহায্যকারী এবং আল্লাহ্‌র দ্বীনের খাদেম বনে গেলো। আল্লাহ্‌র রাসূলের পাশে এসে দাঁড়ালো। এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌পাক অন্য আয়াতে বলেনঃ

هُوَ الَّذِيْٓ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ- وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ

তিনিই সেই আল্লাহ্ যিনি নিজ মদদ দিয়ে এবং মুমিনদের সাহায্য দ্বারা তোমাকে শক্তিশালী করেছেন এবং তাদের অন্তরে প্রেম-প্রীতি পয়দা করে দিয়েছেন। (সূরা আনফাল–৬১-৬২)

এখানে একটি বিশেষ তাত্ত্বিক দিক হলো এই যে, আল্লাহ্পাক আয়াতে فَأَلَّفَ بَيْنَكُمْ– **তোমাদের পরস্পরকে জুড়ে দিলেন** না বলে বলেছেনঃ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ **তোমাদের পরস্পরের অন্তরগুলোকে জুড়ে দিলেন।** তাত্ত্বিক দিক হলো, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে একে অপরের মধ্যে জুড়ে দিলে সেটা স্থায়ী হয় না। সেই মিল হয় ঠুনকো মিল যা সামান্যতেই ভেঙ্গে যায়। কিন্তু অন্তর বা মনের দিক থেকে যদি কারো মিল মহব্বত হয়ে যায়, তখন সেটাই হয় স্থায়ী এবং শক্তিশালী। আর মনের মিলের জন্যই তো মুমিনেরা একে অপরের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়।

মুসলমানদের মিল-মিশ বা ঐক্য আল্লাহ্র আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল। তাদের অন্তরের এই মিল-মহব্বত আল্লাহ্র আনুগত্য এবং দ্বীনের কারণে। এটা দুনিয়ার কোনো স্বার্থের কারণে নয়। আউস এবং খাযরাজ গোত্রের মধ্যে চিরদিনের দুষমনির অবসান ঘটিয়ে অন্তরের যে মিল-মহব্বত সৃষ্টি হয়েছিলো, তা একমাত্র আল্লাহ্র দ্বীনের কারণেই হয়েছিলো। তারা আল্লাহ্র আনুগত্য এবং রাসূলকে সাহায্য করার জন্য একমত হয়েছিলো। তাই এটা ছিলো আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে তাদের প্রতি, শুধু তাদের প্রতিই নয়, দুনিয়ার সকল মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ্র বিশেষ দয়া বা অনুগ্রহ।

দ্বিতীয় অনুগ্রহঃ

وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا

হে মুমিনগণ! তোমরা একেবারে অগ্নিকুন্ডের পাড়ে অবস্থান করেছিলে। সেখান থেকে আল্লাহ্ তোমাদেরকে উদ্ধার করেছেন। এই আয়াতাংশের অর্থ মুফাস্সীরগণ দু'ভাবে করেছেন। একজন মুফাচ্ছির এভাবে অর্থ করেছেন "হে মুমিনগণ! মূলতঃ তোমরা ছিলে শত্রুতা ও

হানাহানির আগুনে ভরা গভীর খাদের কিনারায় দাঁড়ানো। যে কোনো সময় সেখানে নিমজ্জিত হয়ে নিশ্চিত ধ্বংস হয়ে যেতে। সেই নিশ্চিত ধ্বংসের কবল থেকে আল্লাহ্ তাঁর দ্বীনের রহমত দিয়ে তোমাদেরকে সেখান থেকে উদ্ধার করলেন। "আউস ও খাযরাজ গোত্রের দীর্ঘদিনের হানাহানির কারণে যে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিলো এখানে তাকে অগ্নিকুন্ডের সাথে তুলনা করা হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহে রাসূলের আগমন ঘটিয়ে দ্বীন ইসলামের বন্ধন দিয়ে তোমাদেরকে সেই অশান্তির আগুনের ধ্বংসকূপ থেকে উদ্ধার করেছেন।" (সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ)।

অপর মুফাস্সির এভাবে অর্থ করেছেন- "হে মুমিনগণ! তোমরা একেবারে দোযখের আগুনের ধারে পৌঁছে গিয়েছিলে এবং তোমাদের কুফরী তোমাদেরকে তার ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দিতো। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের ইসলাম গ্রহণের তাওফীক প্রদান করে তোমাদেরকে সেই আগুন থেকে বাঁচিয়ে নিয়েছেন।" (ইবনে কাসীর)। এখানে আউস ও খাযরাজ গোত্র জাহেলিয়াতের কারণে হানাহানির মাধ্যমে যে চরম গোনাহর মধ্যে লিপ্ত ছিলো। যার পরিণতি ছিলো নিশ্চিত জাহান্নাম। পরবর্তীতে আল্লাহ্পাক মেহেরবাণী করে রাসূল (সাঃ)কে পাঠিয়ে ইসলাম কবুল করার সুযোগ করে দিয়ে তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচিয়ে নিলেন।

আমার ব্যক্তিগত মতে উভয় অর্থই সঠিক। কেননা জাহেলিয়াতের কারণে হানাহানিতে লিপ্ত থেকে তারা দুনিয়ার জীবনকে অশান্তির অগ্নিকুন্ড বানিয়ে নিয়েছিলো। অপরদিকে তাদের জাহেলিয়াতের এই পাপের কারণে আখেরাতেও জাহান্নামে যাবার ব্যবস্থা করে নিয়েছিলো। অর্থাৎ উভয় জগতে তারা নিজেদেরকে নিজেরাই ধ্বংস করতে বসেছিলো। আল্লাহ্ মেহেরবাণী করে ইসলাম কবুল করার সুযোগ করে দিয়ে তাদেরকে উভয় জগতের ক্ষতি থেকে মুক্তি দান করেন। এটা হলো আল্লাহ্র অনুগ্রহের মধ্যে দ্বিতীয় অনুগ্রহ।

প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! ইহুদীরা যেমন মদীনার মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির মাধ্যমে ঐক্য বিনষ্ট করতে সদা তৎপর ছিলো, অনুরূপ ভাবে

আজও সেই ইহুদী, খৃষ্টান এবং তার দোষরেরা একই চক্রান্ত অব্যাহত রেখেছে। শুধু এখন কেন, আগামীতেও তাদের তৎপরতা অব্যাহত রাখবে। তাই আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানদেরকে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করে বলেনঃ তাদের অনুসরণ করো না, তাদের কথায় কান দিও না এবং তাদের ষড়যন্ত্রের জালে পা ফেলিও না।

সুতরাং মুসলমানদের এখন কর্তব্য হবে-ইহুদী, খৃষ্টান ও তাদের দোষরদের ষড়যন্ত্র ও আক্রমণের মুখেও নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য সতর্ক থাকা এবং সংগ্রাম আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া। আল্লাহ্র যমীনে আল্লাহ্র দ্বীনকে পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা এবং মিথ্যার উপর সত্যকে বিজয়ী করার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে আমরণ সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। অতঃপর আল্লাহ্পাক বলেনঃ

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ

এমনি ভাবে আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শন সমূহ বর্ণনা করেন।

মোট কথা মুসলমানেরা যদি শক্তিশালী সংগঠন ও ঐক্য কামনা করে, তবে এর একমাত্র উপায় হলো আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্যকে সব সময়ের জন্য মনে প্রাণে মেনে নেয়া। যারা সত্যিকার অর্থে সচেতন, তারা উপরে বর্ণিত আলামতগুলো দেখে নিজেরাই আন্দাজ করতে পারেন। মুসলমানদের জন্য কল্যাণ রয়েছে দ্বীনকে মজবুত ভাবে আকড়ে ধরে আল্লাহ্র আনুগত্যের মধ্যে। তাদের প্রকৃত হিতাকাংখী ও কল্যাণকামী হলেন স্বয়ং আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সাঃ)। ইহুদী, খৃষ্টান মুশরিক, মুনাফিক এবং তার দোষরেরা কোনো দিনই এবং কোনো সময়ের জন্যই মুসলমানদের হিতাকাংখী ও কল্যাণকামী হতে পারে না। এজন্য তাদেরকে সবসময় দুষমন মনে করে সতর্কতার সাথে চলতে এই আয়াতের শেষাংশে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ্পাক মুসলম-ানদের করণীয় সম্পর্কে বলেনঃ

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِط وَاُوْلٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা সৎ কাজের দিকে ডাকবে, ভাল কাজের নির্দেশ দিবে এবং অন্যায় ও খারাপ কাজ থেকে বারণ করবে। আর তারাই হলো সফলকাম।

মুসলমানদের জাতীয় ও সমষ্টিগত কল্যাণঃ এই আয়াতে আল্লাহ্পাক মুসলমানদের সামগ্রিক কল্যাণ কিসে নিহিত আছে তা উল্লেখ করেছেন। আগের আয়াতে মুসলমানদের সামগ্রিক কল্যাণের প্রথম নির্দেশটি বর্ণনা করেছেন। তা হলো খোদাভীতি ও আল্লাহ্র দ্বীনকে জামায়াতবদ্ধ হয়ে শক্ত ভাবে ধারণ করে আত্মসংশোধন করা। আর অত্র আয়াতে দ্বিতীয় নির্দেশটি উল্লেখ করে বলা হয়েছে, প্রচার বা তাবলীগের মাধ্যমে অপরের সংশোধন করা।

امة-(উম্মাহ্) শব্দের অর্থ জাতি, দল, গোষ্ঠি বা সম্প্রদায়। হযরত যাহ্হাক (রাঃ) বলেনঃ এই দল হতে ভাবার্থ হচ্ছে-বিশিষ্ট সাহাবা (রাঃ) ও বিশিষ্ট হাদীসের বর্ণনাকারীগরণ। অর্থাৎ মুজাহিদ ও আলেমগণ। (ইবনে কাসীর)।

হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ-আয়াত তেলাওয়াত করে বলেছিলেনঃ এ সম্প্রদায়টি হচ্ছে বিশেষ ভাবে সাহাবায়ে কেরামের দল। (ইবনে জরীর)। কেননা, তাঁদের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেকে এ কাজের জন্য দায়ী মনে করতেন।

এখন সাহাবায়ে কেরাম উপস্থিত নেই। কিন্তু যারা তাঁদের অনুসারী তারাই হচ্ছে সত্যনিষ্ঠ দল। কেননা, কোরআনের কোনো আয়াত সাময়িক কোনো নির্দেশ বা উপদেশ নিয়ে অবতীর্ণ হয়নি। এর কার্যকারিতা কেয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত বলবত থাকবে।তাই وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ امة বলতে সদাসর্বদা সত্যনিষ্ঠ একদল লোক থাকবে, যারা নিজেদের

আমল-আখলাককে আল্লাহ্র দেয়া আইন দ্বারা সংশোধন করবে এবং অপর ভাইদেরও আমল-আখলাককে সংশোধন করার জন্য চেষ্টা চালাবে। এ ব্যাপারে সূরা আসরে আল্লাহ্পাক বলেনঃ

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ-

(পরকালের ক্ষতি থেকে কেবলমাত্র তারাই রক্ষা পাবে) যারা ঈমান আনবে, সৎকাজ করবে, পরস্পরকে ভালো ও কল্যাণকর কাজের জন্য নির্দেশ দেবে এবং পরস্পরকে ধৈর্য্য ধরার জন্য পরামর্শ দেবে।

সত্যনিষ্ঠ দলের কাজঃ

প্রথম কাজঃ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ -এই সত্যনিষ্ঠ দলের প্রথম কাজ হবে তারা মানুষকে খায়ের বা কল্যাণের দিকে ডাকবে। এ কল্যাণ বলতে এমন কল্যাণ যা দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় জগতের জন্য উপকারী বা কল্যাণকর হবে।

দাওয়াতের পর্যায়ঃ কল্যাণের দিকে ডাকার দু'টি পর্যায় রয়েছে।

প্রথম পর্যায়ঃ কল্যাণের দিকে ডাকার প্রথম পর্যায় হলো অমুসলিমদেরকে খায়র তথা ইসলামের দিকে আহবান জানানো। এ কাজটি প্রতিটি মুসলমান সাধারণভাবে এবং উল্লেখিত বিশেষ (সত্য নিষ্ঠ) দলটি বিশেষভাবে দুনিয়ার সব জাতির লোকদেরকে ইসলামের দিকে ডাকবে-মুখের দ্বারা এবং বাস্তব চরিত্র ও কর্মের মাধ্যমে। তার কারণ হলো **দায়ী ইলাল্লাহ্র 'দায়ী'** বা আহবানকারীদের কথায় ও কাজের মিল থাকতে হবে। তাদেরকে আর সব জাতির লোকদের থেকে জ্ঞান গরিমা, শিক্ষা-দীক্ষা, কর্ম ও চরিত্রের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে প্রাধান্য অর্জন করতে হবে। যেভাবে রাসূল (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীরা অর্জন করেছিলেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ঃ 'খায়র' বা কল্যাণের প্রতি স্বয়ং মুসলমানদের আহবান করা। অর্থাৎ সকল মুসলমান সাধারণ ভাবে এবং উল্লেখিত (সত্য নিষ্ঠ) দলটি বিশেষ ভাবে মুসলমানদের মধ্যে তাবলীগ বা প্রচারের কাজ চালাবে

দাওয়াত দু'ভাবে হবেঃ প্রথমটি হলো ব্যাপক দাওয়াত অর্থাৎ সকল মুসলমানদেরকে শরীয়তের প্রয়োজনীয় বিধিবিধান ও ইসলামী চরিত্র সম্পর্কে অবহিত করবে। আর দ্বিতীয়টি হলো বিশেষ দাওয়াত অর্থাৎ মুসলমানদেরকে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র বিশেষ শিক্ষায় বিশেষজ্ঞ তৈরী করতে হবে।

সর্বউত্তম কথাঃ যারা 'দায়ী' বা দাওয়াতী কাজ করে তাদের কথার মর্যাদা সম্পর্কে বলতে গিয়ে আল্লাহ্‌পাক বলেনঃ

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ–

তার কথার চেয়ে কার কথা সবচেয়ে বেশী উত্তম, যে আল্লাহ্‌র দিকে মানুষকে ডাকে এবং নিজে ভালো কাজ করে, আর দাবী করে নিশ্চয়ই আমি মুসলমান। (হা-মীম-সিজদা-৩৩)

সত্যনিষ্ঠ দলের দ্বিতীয় কাজঃ অতঃপর পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্‌পাক এই সত্যনিষ্ঠ দলের বিশেষ কাজ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেনঃ

وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِط وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ–

তারা সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ ও অন্যায় কাজে বাধা সৃষ্টি করে।

مَعْرُوْف ("মায়ারূফ) শব্দের অর্থ- **পরিচিতি**। ইসলাম যেসব সৎ ও নেক কাজের নির্দেশ দিয়েছে এবং প্রত্যেক নবী আপন আপন যুগে যেসব সৎ কাজের প্রচলন করেছেন, তা সবই আয়াতে উল্লেখিত 'মারূফ' তথা সৎ কাজের অন্তর্ভূক্ত। যেহেতু এসব সৎকাজ সাধারণ ভাবে সবার কাছে পরিচিত। তাই এগুলোকে 'মারূফ' বলা হয়েছে।

مُنْكَرْ–(মুন্‌কার) শব্দের **অর্থ অপছন্দ**। অর্থাৎ আল্লাহ্‌পাক যেসব কাজ অপছন্দ করেন বা নিষেধ করেছেন, যেসব কাজে গোনাহ রয়েছে, সেসব

কাজই 'মুন্‌কার' এর পর্যায়ভুক্ত। আয়াতে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, পূর্বের বাক্যে يَدْعُوْنَ -বা আহবানের কথা বলা হয়েছে। আর এই বাক্যে يَأْمُرُوْنَ-বা আমর বা নির্দেশের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলার দু'টি নির্দেশের মধ্যে প্রথম নির্দেশটি দাওয়াত বা আহবানের জন্য ক্ষমতার প্রয়োজন হয় না। এখানে শুধু তাবলীগ বা প্রচারের মাধ্যমে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু পরবর্তী নির্দেশে امر বা আদেশ দিতে বলা হয়েছে। যেখানে ক্ষমতা না থাকলে এই কাজটি করা যায় না। সুতরাং বিশেষ দলের দ্বিতীয় কাজটি আঞ্জাম দেবার জন্য ক্ষমতার প্রয়োজন। কেননা নির্দেশ সেই দিতে পারে যার হাতে নির্দেশ দেবার মতো পাওয়ার বা ক্ষমতা থাকে। সুতরাং এই দলটিকে আল্লাহ্র নির্দেশ কার্যকরী করার জন্য ক্ষমতার অধিকারী হতে হবে। আর এই জন্য আন্দোলন সংগ্রাম করতে হবে। অসৎ নেতৃত্ব ও খোদাদ্রোহী শক্তিকে উৎখাত করে সৎ খোদাভীরু নেতৃত্ব কায়েমের মাধ্যমে আল্লাহ্র বিধান চালু করতে হবে। আর ক্ষমতা পেলে তখনই ভালো কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজে নিষেধ করা যাবে। ভালো কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজে নিষেধের ক্ষেত্রে ক্ষমতার প্রয়োজন যে অবশম্ভাবী সে ব্যাপারে আল্লাহ্পাক বলেনঃ

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ-

তারাই খাঁটি ঈমানদার, যাদেরকে আমি পৃথিবীতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করলে তারা প্রথমেই নামায প্রতিষ্ঠা করে (জনগণের চরিত্র সংশোধন করে)। যাকাত ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে (অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করে) এবং (ভালো কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করে) সৎ কাজের নির্দেশ দেয় এবং (খারাপ কাজের পথ বন্ধ করে দিয়ে) অসৎ কাজে বাধা সৃষ্টি করে। (সূরা হজ্জ-৪১)

এখানে এই আয়াতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রধানের মৌলিক চারটি কাজের মধ্যে দু'টি কাজ সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ। সুতরাং এ কাজ

দু'টি করার জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রয়োজন। মন্দ কাজে বাধা দানের ক্ষেত্রে হাদীসে ঈমানদারদের তিনটি পর্যায় উল্লেখ করা হয়েছে-

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرُوْهُ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ (হে ঈমানদারগণ,) তোমাদের কেউ যখন কোনো অন্যায় ও অপরাধ হতে দেখবে, তখন যেনো সে হাত (ক্ষমতা) দ্বারা তা প্রতিহত করে। যদি এ কাজ করার পরিবেশ না পায়, তবে সে যেনো যবান (বক্তৃতা, বিবৃতি, আলাপ-আলোচনার) দ্বারা তা বন্ধ করে। এতেও যদি সে সক্ষম না হয়, তবে সে যেনো তার অন্তর দ্বারা ঘৃণা করে (এবং তা বন্ধ করার জন্য পরিকল্পনা করতে থাকে)। আর এটা (অন্তর দ্বারা ঘৃণা) হচ্ছে ঈমানের দুর্বলতম পর্যায়। (মুসলিম, মিশকাত)।

সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ না করার পরিনামঃ কোনো মুমিন মুসলমান যদি সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে বাধা সৃষ্টি না করে তবে তাদের পরিনাম সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) বলেনঃ

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْ يُوْشِكَنَّ اللّٰهُ اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ عِنْدِهٖ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهٗ وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ

যে সত্তার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ, তোমরা সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে বারণ করতে থাকো। নতুবা আল্লাহ্ তাআলা অতিসত্ত্বরই তোমাদের উপর তাঁর শাস্তি অবতীর্ণ করবেন। অতঃপর তোমরা (তা থেকে বাঁচার জন্য) দোআ করবে কিন্তু তা কবুল করা হবে না। (আবু দাউদ)

দারসের আয়াতের সর্বশেষ অংশে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ-

وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ **(যারা একাজ করে) তারাই হবে সফলকাম।**

অত্র আয়াতের শেষে আল্লাহ্পাক দাওয়াত দানকারী দলের প্রশংসা করে তাদের দুনিয়া এবং আখেরাতে সফলতার কথা ঘোষণা করেছেন। অর্থাৎ যারা **দায়ী ইলাল্লাহ্র** কাজ করে দুনিয়ার ক্ষমতা অর্জন করে। অতঃপর আল্লাহ্র বিধান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধের ভূমিকা পালন করে, তারা দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় জগতে সফলকাম হবে।

শিক্ষাঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! সূরা আলে ঈমরানের ১০২-১০৪ নম্বর আয়াত পর্যন্ত বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমাদের জন্য যেসব **শিক্ষনীয় রয়েছে তা হলোঃ**

❒ আমাদেরকে খাঁটি এবং নিষ্ঠাবান ঈমানদার হতে হবে। ঈমানের ক্ষেত্রে কোথাও কোনো দূর্বলতা ও সংশয় রাখা যাবে না।

❒ খোদাভীতি এমনভাবে অর্জন করতে হবে, যাতে শয়নে-বসনে, চলনে-বলনে, প্রতিটি অবস্থায় এবং প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহ্র ভয় মনের মধ্যে জাগরুক থাকে। দেহের প্রতিটি অংগে খোদাভীতি ফুটে উঠে।

❒ সদাসর্বদা ইসলামের উপর কায়েম থাকতে হবে। ইসলামের প্রতিটি আহকাম মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত পালন করে যেতে হবে। কুফরী বা গোনাহ্র কাজে জড়িত হবার সাথে সাথে আল্লাহ্র ভয় এবং মরণের কথা স্মরণ করে সে সব কাজ থেকে দূরে সরে যেতে হবে। আর আল্লাহ্র কাছে সদাসর্বদা এই বলে দোয়া করতে হবে "হে আল্লাহ্ আমাকে জীবিত রাখো দ্বীন ইসলামের উপরে এবং মৃত্যু দান করিও ঈমানের হালাতে।"

❒ আল্লাহ্র দ্বীনের উপর টিকে থাকার জন্য সদাসর্বদা জামায়াতবদ্ধ বা সংগঠনভূক্ত থাকতে হবে এবং সংগঠনের ভেতরে ও বাইরে সংকট সৃষ্টি করে পৃথক হয়ে যাওয়া যাবে না। বরং সংগঠনের ভেতরে ও বাইরে

ঐক্যকে টিকে রাখার জন্য চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

❒ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য সংগঠনের কর্মীদের মধ্যে দ্বিনী সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। আঞ্চলিকতা ও ইজম সৃষ্টি করা যাবে না। কেননা এটা জাহেলিয়াতের নিদর্শন।

❒ ইসলামী আন্দোলনের সকল জনশক্তির মাঝে ইস্পাত প্রাচীর ভ্রাতৃত্ব গড়ে তুলতে হবে। যাতে শয়তানি শক্তি বিলীন হয়ে যায়।

❒ সাহাবীদের অনুকরণীয় একটি সত্যনিষ্ঠ দলের সাথে জড়িত থেকে নিজেকে সংশোধন করতে হবে এবং অপরকে সংশোধনের জন্য দায়ী' ইলাল্লাহ্‌র কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

❒ একজন মমিন হিসেবে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ করার কাজ অব্যাহত রাখতে হবে এবং নির্দেশ দেবার অধিকারী হবার জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জনের জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে।

❒ দুনিয়া এবং আখেরাতের সফলতা অর্জনের জন্য দায়ী' ইলাল্লাহ্‌র ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। কেননা আল্লাহ্ তাদেরকেই প্রকৃত সফলকামী বলে সার্টিফিকেট দিয়েছেন।

আহবানঃ প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আমি দীর্ঘ সময় ধরে আপনাদের সামনে সূরা আলে ঈমরানের ১০২-১০৪ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও শিক্ষনীয় বিষয় তুলে ধরেছি। এতে যদি আমার অজান্তে কোনো ত্রুটি হয়ে যায়, তার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। আর এসব আয়াতে যেসব শিক্ষনীয় বিষয় আমরা জানতে পারলাম, তা যেনো বাস্তব জীবনে প্রতিফলন ঘটিয়ে ইহকাল ও পরকালে সফলতা অর্জন করতে পারি সেই তৌফিক কামনা করে দারস শেষ করছি।

তিন

মুমিন জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও তাদের বৈশিষ্ট্য

সূরা তাওবাহ্-১১১-১১২

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ
بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ
وَيُقْتَلُوْنَ- وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ
وَالْقُرْاٰنِ ط وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا
بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖط وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ-
اَلتَّائِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّائِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ
السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ ط وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ-

সরল অনুবাদঃ ইরশাদ হচ্ছে, (১১১) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদের জান-মাল জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন। তারা লড়াই করে আল্লাহ্র পথে, অতঃপর তারা (কাফেরদের) মারে এবং (নিজেরাও) মরে। (জান্নাত দানের) এই খাঁটি ওয়াদা এর আগে তাওরাত ও ইঞ্জিলে করা হয়েছিলো, আর (এখন) কুরআনেও করা হচ্ছে। আর আল্লাহ্র চেয়ে কে বেশী ওয়াদা পূরণ করতে পারে? অতএব (হে মুমিনেরা), তোমরা খুশী হয়ে যাও সেই কেনা-বেচার জন্য যা তোমরা তাঁর সাথে করেছো। আর এটাই তো হলো বড় সাফল্য। (১১২) তারা (অর্থাৎ আল্লাহ্র দ্বীনের মুজাহীদরা) হয়

তওবাকারী, (নিষ্ঠার সাথে) এবাদতকারী, প্রশংসাকারী, (আল্লাহ্র পথে) ভ্রমণকারী, রুকু ও সিজদাহ্ আদায়কারী, সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দানকারী এবং আল্লাহ্র নির্ধারিত (হালাল-হারামের) সীমা রক্ষাকারী। অতএব হে নবী! (এসব গুনের অধিকারী) মুমিন মুজাহীদদেরকে (জান্নাতের) সুসংবাদ দান করুন।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ اِنَّ-নিশ্চয়। اِشْتَرٰى-খরিদ বা ক্রয় করা। -مِنْ-থেকে বা হতে। اَلْمُؤْمِنِيْنَ-মুমিনদের। اَنْفُسَهُمْ-তাদের জান বা জীবন। وَ-এবং। اَمْوَالَهُمْ-তাদের মাল বা ধন-সম্পদ। بِاَنَّ-বিনিময়ে। لَهُمْ- তাদের থেকে। يُقَاتِلُوْنَ- তারা লড়াই বা যুদ্ধ করে। فِىْ-মধ্যে। سَبِيْلِ اللّٰهِ-আল্লাহ্র পথে। فَيَقْتُلُوْنَ-অতঃপর তারা মারে বা হত্যা করে। يُقْتَلُوْنَ- তারা মরে বা নিহত হয়। وَعْدًا- প্রতিশ্রুতি বা ওয়াদা। عَلَيْهِ-উহার উপর। حَقًّا-সত্য বা খাঁটি। مَنْ-কে। اَوْفٰى-পূরণ বা রক্ষা। بِعَهْدِهٖ- তাঁর প্রতিশ্রুতি। مِنَ اللّٰهِ-আল্লাহ্র চেয়ে। فَاسْتَبْشِرُوْا- অতএব তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো বা খুশি হও। بِبَيْعِكُمُ-তোমাদের বেচা-কেনা বা ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য। اَلَّذِىْ- যারা। بَايَعْتُمْ بِهٖ- তোমরা তাঁর সাথে যা বেচা-কেনা বা চুক্তি করেছো। ذَالِكَ-এটা বা ঐটা। هُوَ-উহা বা তা। اَلْفَوْزُ-সাফল্য। اَلْعَظِيْمُ-উত্তম। اَلتَّائِبُوْنَ-তাওবাকারী। اَلْعٰبِدُوْنَ-(নিষ্ঠার সাথে) এবাদতকারী। اَلْحٰمِدُوْنَ-প্রশংসাকারী। اَلسَّائِحُوْنَ- ভ্রমণকারী অন্য অর্থে রোযা পালনকারী। اَلرّٰكِعُوْنَ-রুকুকারী। اَلسّٰجِدُوْنَ-সিজদাহ্ আদায়কারী। اَلْاٰمِرُوْنَ-নির্দেশ

দানকারী। اَلْمَعْرُوْفِ-উত্তম বা নেক। اَلنَّاهُوْنَ-নিশেধকারী বা বাধাদানকারী। عَنْ-থেকে। اَلْمُنْكَرِ-অপছন্দনীয় বা খারাপ। اَلْحٰفِظُوْنَ- সংরক্ষণকারী বা হেফাজতকারী। لِ-জন্য। -لِحُدُوْدِاللّٰهِ-আল্লাহ্‌র (নির্ধারিত) সীমা বা শরীয়াত। بَشِّرْ-সুসংবাদ দাও। اَلْمُؤْمِنِيْنَ-মুমিনদের।

সম্বোধনঃ দারসে কুরআন মাহফিলে/প্রোগ্রামে উপস্থিত ইসলাম প্রিয় দ্বীনদার/ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ভায়েরা/বোনেরা! আস্‌সালামু আলাইকুম অয়া রাহমাতুল্লাহি অয়াবারাকাতুহ্। আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কালামে হাকীম আল কুরআনের সূরা তাওবার ১১১ ও ১১২ দু'টি আয়াত তিলাওয়াত ও সরল অনুবাদ পেশ করেছি। আল্লাহ্‌পাক যেন আ-মাকে আপনাদের সামনে সঠিক ভাবে দারস পেশ করার তাওফীক দান করেন। "অমা তাওফীকি ইল্লাহ্ বিল্লাহ্"।

সূরার নামকরণঃ এই সূরাটি দু'টি নামে পরিচিত। একটি "তাওবাহ্' আর অপরটি "বারাআত"।

তাওবাহ্ নামকরণঃ এই সূরাটির 'তাওবাহ্' নামকরণের কারণ এই যে, এই সূরার একস্থানে কোনো কোনো ঈমনাদার লোকদের তওবা কবুল করে গোনাহ্-খাতা মাফ করে দেবার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

বারাআত নামকরণঃ 'বারাআত' নামকরণের কারণ হলো সূরার শুরুতে মুমিনদেরকে মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। 'বারাআত' অর্থ সম্পর্ক ছেদ। তবে যে নামই হোক না কেনো তা প্রতিকী বা চিহ্ন হিসেবেই করা হয়েছে। শিরোনাম হিসেবে নামকরণ করা হয়নি।

সূরার শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ না লেখার কারণঃ সূরাটির শুরুতে 'বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রাহীম' লিখা হয়নি। এর কারণ হিসেবে তাফসীরকারকগণ বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করেছেন। কেউ বলেছেন, আল্লাহ্‌পাক মুশরিকদের আচরণে রাগান্বিত হয়ে সূরাটি নাযিল করেন, তার জন্য তিনি বিস্‌মিল্লাহ

বলেননি। আবার কেউ বলেন যে, পূর্ব সূরা (আনফালের) জের। তাই আর বিস্‌মিল্লাহ্‌র প্রয়োজন হয়না। ইমাম রাযী (রঃ) যে কারণটি উল্লেখ করেছেন সেটিই হলো সবচেয়ে বেশী সঠিক এবং গ্রহণযোগ্য। আর তা হলো, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজেই এই সুরার শুরুতে **বিস্‌মিল্লাহ্** লিখেননি। বিধায় পরবর্তীতে সকলেই তাঁর অনুকরণ করেছেন।

জানার বিষয়ঃ তেলাওয়াতের সময় সূরার শুরু থেকে আরম্ভ করলে বিস্‌মিল্লাহ্ পড়া যাবে না। তবে যদি সূরার মাঝপথ হতে তেলাওয়াত করা হয় তবে 'বিসমিল্লাহ্' দিয়েই শুরু করতে হবে।

সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার সময়কালঃ সূরা তাওবাহ একই ভাষণে একই সময় অবতীর্ণ হয়নি। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। সূরাটি তিনটি ভাষণে সমাপ্ত হয়েছে।

প্রথম ভাষণঃ সূরার শুরু থেকে ৫ম রুকু পর্যন্ত চলেছে। ইহা অবতীর্ণ হওয়ার সময়টা হলো নবম হিজরীর যিলক্বদ মাস বা তার কাছাকাছি সময়। এ বছর নবী করীম (সাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ) কে **আমীরুল হজ্ব** বা হজ্ব যাত্রীদের নেতা করে মক্কায় পাঠিয়েছিলেন। সেই সময় এই ভাষণটি অবতীর্ণ হয়। আর তাই নবী করীম (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ) কে এ ভাষণটি হাজীদের পাঠ করে শোনানোর জন্য মক্কায় পাঠিয়ে দিলেন। এ ভাষণে মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক ছেদের ঘোষণা রয়েছে।

দ্বিতীয় ভাষণঃ ৬ষ্ঠ রুকুর শুরু হতে নবম রুকুর শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় ভাষণটি চলেছে। ইহা নবম হিজরীর রজব মাস বা তার কিছু আগে অবতীর্ণ হয়, যখন নবী করীম (সাঃ) তৎকালীন পরাশক্তি রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে তাবুক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এখানে প্রকৃত ঈমানদারদের যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং দুর্বল মুমিন এবং মুনাফিকদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে।

তৃতীয় ভাষণঃ সর্বশেষ এই ভাষণটি দশম রুকু থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত চলেছে। এটি তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরার পথে অবতীর্ণ হয়েছিলো। এই অংশে এমন কতকগুলো আয়াত রয়েছে যা বিভিন্ন সময় অবতীর্ণ হয়। বিভিন্ন অংশের বিষয় একই হওয়ার কারণে অহীর নির্দেশে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এই ভাষণের সাথে সংযোগ করে দেন। এতে মুনাফিকদেরকে

তাম্বীহ করা হয়েছে এবং তাবুক যুদ্ধে না যেয়ে যারা পেছনে রয়ে গিয়েছিলো তাদেরকে ভর্ৎসনা করা হয়েছে। আর যেসব লোক ঈমানদার হওয়া সত্ত্বেও জিহাদে অংশ গ্রহণ হতে বিরত ছিলো তাদের ক্ষমার ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

সূরার বিশেষ দিকঃ তিনটি ভাষণ নাযিল হওয়ার ধারাবাহিকতার দৃষ্টিতে প্রথম ভাষণটির স্থান সূরার সব শেষে হওয়া উচিৎ ছিলো। কিন্তু বিষয়বস্তুর গুরুত্বের দৃষ্টিতে উহার স্থান সর্বপ্রথম হওয়ার কারণে নবী করীম (সাঃ) সূরাতে সংযোজনকালে উহাকেই প্রথমে রেখেছেন। তবে যা কিছু করা হয়েছে ওহীর নির্দেশেই করা হয়েছে।

সূরার বিষয়বস্তুঃ

● সূরার প্রথম অংশে অর্থাৎ ২৮ নম্বর আয়াত পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্রের মুসলমানদেরকে মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা বলা হয়েছে।

● দ্বিতীয় অংশে অর্থাৎ ২৯ থেকে ৩৫ নম্বর আয়াতে আহলে কিতাব তথা ইহুদী নাসারাদের সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের সম্পর্ক ছেদের কথা বলা হয়েছে।

● তৃতীয় অংশে অর্থাৎ ৩৮ থেকে ৪১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে তাবুক যুদ্ধে যাবার জন্যে সাধারণ নির্দেশ আসার পরও যারা দূর্বলতা ও অলসতার কারণে পেছনে থেকে গেছে এবং যুদ্ধে যায়নি তাদের সমালোচনা করা হয়েছে।

● চতুর্থ অংশ এটি সবচেয়ে দীর্ঘ এবং সূরার অর্ধেকেরও বেশী অংশ জুড়ে বিস্তৃত। এ অংশে মুনাফিকদের সমালোচনা, ভর্ৎসনা, মুসলিম সমাজে তাদের অপতৎপরতার নিন্দা ও তিরস্কার করা হয়েছে। তাদের মানসিক এবং বাস্তব বিবরণ পেশ ও জেহাদ থেকে তাদের পিছু হঠার ছল-ছুঁতো, ওযর-বাহানা এবং দুরভিসন্ধির স্বরূপ উদঘাটন করা হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ, ভুল বুঝাবুঝি ও কাপুরুষতার বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা এবং রাসূল (সাঃ) ও নিষ্ঠাবান মুমিনদের নানাভাবে কষ্ট দেয়া ও উত্যক্ত করার বিবরণ দেয়া হয়েছে। সেই সাথে মুনাফিকদের চক্রান্ত থেকে নিষ্ঠাবান মুসলমানদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। মুসলমান ও মুনাফিকদের মধ্যে সম্পর্ক ছেদ এবং তাদের কার্যকলাপ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে।

● পঞ্চম অংশে মদীনার ইসলামী সমাজের সবচেয়ে শক্তিশালী জনবল আনসার ও মোহাজের ছাড়াও তাদের চারপাশে আরও কিছু দল ও শ্রেণী ছিলো যেমন বেদুঈনরা। তাদের ভেতর নিষ্ঠাবান মুমিন, মুনাফিক ও দূর্বল মু'মিন ছিলো। সাথে মদীনাবাসী মুনাফিকও ছিলো। অনরূপ আরো একটি দল এমন ছিলো, যাদের মধ্যে সৎকাজ ও অসৎ কাজের মিশ্রণ ঘটেছিলো এবং যাদের চরিত্রে ইসলামের মজবুত প্রভাব ছিলো, তবে তাদের ইসলামের প্রতি তেমন গভীর আকর্ষণ ছিলো না। আরো একটি দল ছিলো, যাদের প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানতো না। তাদের পরিনাম কি হবে তা আল্লাহ্ই জানেন। আরো একটি দল ছিলো যারা ইসলামের নামে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকতো। সূরাতে এসব দল ও শ্রেণী সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। মুসলিম সমাজে এদের সাথে কি ধরনের আচরণ করতে হবে, তা জানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং রাসূল (সাঃ) ও একনিষ্ঠ মুসলমানদেরকে এদের সবার সাথে আচরণের কি পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে, তাও শিখিয়ে দেয়া হয়েছে। । এই অংশ ৯৭-১১০নম্বর আয়াত পর্যন্ত চলেছে।

● ষষ্ঠ অংশে আল্লাহ্র সাথে মুমিনদের ওয়াদা, এই জিহাদের ধরণ এবং মদীনাবাসী ও তার আশ-পাশের বেদুঈনদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে আরো বলা হয়েছে, মদীনাবাসীদের এটা বৈধ নয় যে, তারা আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জীবন রক্ষার ব্যাপারে উদাসীন হয়ে কেবল নিজেই ব্যস্ত থাকবে। তাছাড়া মুশরিকদের সাথে মুমিনদের সম্পর্ক ছেদের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ অংশে এক পর্যায়ে এমন কয়েকজন মুমিনদের যুদ্ধে অনুপস্থিতির ঘটনা ও তার শাস্তি বিধানের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, যারা খাঁটি মুমিন ছিলেন। এই অংশ ১১১-১২৭ নম্বর আয়াত পর্যন্ত চলেছে।

● সূরার সবশেষে উপসংহারে রাসূল (সাঃ)-এর গুণাবলীর বর্ণনা দেয়া হয়েছে এবং তাঁকে একমাত্র আল্লাহ্র উপরই নির্ভরশীল হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এটা ১২৮ থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত চলেছে।

দারসের জন্য তিলাওয়াতকৃত আয়াত দুটির বিষয়বস্তুঃ এখানে প্রকৃত

মুসলমানদের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য ও পাউনা হওয়া উচিৎ জান্নাত তা বলা হয়েছে। আল্লাহ্‌র সাথে মুমিনদের বায়আত বা চুক্তির কথা বলা হয়েছে এবং মুমিন মুজাহিদদের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করা হয়েছে।

শানে নযূলঃ অধিকাংশ মুফাসসিরদের মতে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে **বায়আতে আকাবায়** অংশগ্রহণকারী লোকদের ব্যাপারে। এ বায়আত নেয়া হয়েছিলো হিজরতের পূর্বে হজ্ব মৌসুমে আগমকারী ইয়াসরীব (মদীনা) বাসীদের কাছ থেকে। তাই সূরাটি মাদানী হওয়া সত্ত্বেও এ আয়াতগুলোকে মাক্কী আয়াত বলা হয়েছে।

বায়আতে আকাবাঃ "আকাবা" বলা হয় পর্বতাংশকে। আকাবা বলতে বুঝায় মিনার জমরায়ে আকাবার সাথে মিলিত পর্বতাংশকে। ইয়াসরীব (মদীনার পূর্ব নাম) থেকে আগত হাজীদের কাছ থেকে তিন দফায় বায়আত নেয়া হয়। ইসলামের ইতিহাসে একেই **বায়আতে আকাবা** বলা হয়।

প্রথম বায়আতঃ প্রথম দফা বায়আত নেয়া হয় নবুওয়াতের একাদশ বর্ষে। হজ্বের মওসুমে এসময় মদীনার ৬ জন লোক গোপনে আকাবায় রাসূল (সাঃ) এর কাছে বায়আত গ্রহণ করেন। এরা মদীনায় ফিরে গিয়ে ঘরে ঘরে ইসলাম ও রাসূলের (সাঃ)দাওয়াত দেন।

দ্বিতীয় বায়আতঃ পরের বছর অর্থাৎ নবুওয়াতের দ্বাদশ বর্ষে হজ্বের মৌসুমে ১২ জন মদীনাবাসী আকাবায় একত্রিত হয়ে রাসূলের হাতে বায়আত নেন। এদের মধ্যে পূর্বের ৫ জন এবং নতুন ৭ জন ছিলেন। এই বায়আতকে ইসলামের ইতিহাসে **দ্বিতীয় বায়আত** বলা হয়। এবারে তারা রাসূল (সাঃ) এর কাছে আবেদন জানান যে, ইয়াসরীব বাসীদের কুরআনের তায়ালীম (শিক্ষা) দেবার জন্য একজন মুয়াল্লিম (শিক্ষক) পাঠানো হোক। এতে মহানবী (সাঃ) তাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে সাহাবী মুসআব বিন ওমাইর (রাঃ) কে তাদের সঙ্গে পাঠান। তিনি সেখানে গিয়ে ব্যাপক ভাবে ইসলামের দাওয়াত এবং কুরআনের তায়ালীম (শিক্ষা) দিতে থাকেন। তার ফলে ইয়াসরীব বাসীর বিপুল সংখ্যক জনগণ ইসলামে সামিল হয়ে যায়।

তৃতীয় বায়আতঃ অতঃপর নবুওয়াতের ১৩তম বর্ষে ৭০জন পুরুষ ও ২

জন মহিলা সহ মোট ৭২জন হজ্বের মৌসুমে আকাবায় একত্রিত হয়ে নবী করীম (সাঃ) এর হাতে হাত রেখে বায়আত নেন। একে ইসলামের ইতিহাসে **তৃতীয় আকাবার বায়আত** বলা হয়। এই বায়আতটি ইসলামের মৌলিক আকিদা ও আমল, বিশেষ করে কাফেরদের সাথে জিহাদ এবং মহানবী (সাঃ) মদীনায় গেলে তাঁর হেফাজত ও সাহায্য সহযোগীতার জন্য নেয়া হয়। বায়আত নেওয়ার সময় সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা (রাঃ) বলেছিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ)! এখন ওয়াদা নেয়া হচ্ছে; আপনার রব কিংবা আপনার সম্পর্কে কোনো শর্ত থাকলে তা তাদেরকে পরিস্কার করে বলে দেয়া হোক। তখন হুজুর (সাঃ) বললেনঃ আল্লাহ্র ব্যাপারে শর্ত হলো এই যে, তোমরা সবাই তাঁরই ইবাদত করবে, তাঁকে ছাড়া আর কারও ইবাদত করবে না। আর আমার নিজের ব্যাপারে শর্ত হলো এই যে, তোমরা আমার হেফাজত করবে যেমন ভাবে নিজের জান-মাল ও সন্তানদের হেফাজত করো। তখন তারা আরয করলেন, এ শর্ত দু'টি পূরণ করলে তার বিনিময়ে আমরা কি পাবো ? প্রতিউত্তরে তিনি বললেনঃ এর বিনিময়ে তোমরা জান্নাত পাবে। তারা পুলকিত হয়ে বললেনঃ আমরা এর জন্য রাযী। এমন রাযী যে, নিজেদের পক্ষ থেকে এ চুক্তি রহিত করার আবেদন কোনো দিনই করবো না এবং রহিত করাকে পছন্দও করবো না। তখনই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

মহানবী (সাঃ) এর মক্কায় অবস্থানকালে জিহাদের এই আয়াত ছাড়া কোনো আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। তবে এর আমল শুরু হয় হিজরতের পরে। এরপর জিহাদের দ্বিতীয় আয়াত নাযিল হয় হিজরতের পর সূরা হজ্বের ৩৯ নম্বর আয়াত।

ব্যাখ্যাঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা তওবার তিলাওতকৃত অংশের প্রয়োজনীয় বিবরণ পেশ করলাম। এখন আপনাদের সামনে আয়াত দুটির সংক্ষেপে ব্যাখ্যা পেশ করছি।

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ط

নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা মুমিনদের জানমাল জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন।

আল্লাহ্ পাক আয়াতটি এমন এক প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ করে মুমিনদের জান্নাত দেওয়ার পাকা-পোক্ত ওয়াদা করছেন, যখন-তাঁর হাবীব মুহাম্মদ(সাঃ) কে নিজ জন্মভূমির মক্কার কঠোর দেলের কাফের-মুশরিকরা আর মোটেই বরদাস্ত করতে পারছিলো না। এমনকি তারা তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য চিন্তা-ভাবনা শুরু করে দিয়েছিলো। তাঁর দলের লোকদের ইসলাম কবুল করার অপরাধে নির্যাতনের মাত্রা এমন চরম পর্যায়ে পৌছিয়ে গিয়েছিলো যে, মহানবী (সাঃ) তাদেরকে আবিসিনিয়ায় হিজরত করার অনুমতি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁর নবুয়াতের দায়িত্ব পালনের সহযোগিনী, বিপদের সাথী, চির সঙ্গিনী খাদিজাতুল কোবরা (রাঃ) এবং তাঁর আশ্রয়দাতা চাচা আবু তালিবের মৃত্যুর পর মক্কার কোনো ব্যক্তি তাঁকে আশ্রয় দেবার মতো হিম্মত রাখছিলো না এবং বহীর দেশেও তাঁকে আশ্রয় দিতে সাহস পাচ্ছিলো না। কেননা, মক্কার কাফেরদের আক্রমণের সমূহ আশংকা ছিলো। এমতাবস্থায় ইয়াসরীব (মদীনার পূর্বনাম) বাসীরা মহানবীকে (সাঃ) শুধু আশ্রয়ই নয় বরং তাঁকে তাদের দেশের নেতা বানানোর জন্য এগিয়ে আসেন এবং হিজরতের পূর্বে হজ্বের মওসুমে মক্কায় আগমন করে আকাবা নামক স্থানে পর পর তিন বছরে তিনবার রাসূলের কাছে বায়আত গ্রহণ করে ইসলাম কবুল করেন এবং চূড়ান্ত বায়আত যাকে তৃতীয় বায়আতে আকাবা বলা হয়) ইয়াসরীবে যাবার জন্য তারা রাসূল (সাঃ)কে আমন্ত্রণ জানান। রাসূল (সাঃ) তাদের দেশে গেলে তাদের জন্য যে চরম ঝুঁকি আছে তা তাদেরকে জানিয়ে দেন। তাঁরা সকল প্রকার ঝুঁকি জান-প্রাণ দিয়ে মোকাবেলা করবেন বলে রাসূল (সাঃ)কে আশ্বস্তঃ করেন। তাছাড়া মদীনায় যাবার ব্যাপারে যদি কোনো শর্ত থাকে তাও আরোপ করার জন্য রাসূল (সাঃ) কে তারা আহবান জানান। এতে রাসূল (সাঃ) বেশ কিছু শর্তের সাথে মৌলিক দু'টি শর্ত আরোপ্ করেন। তা হলো, আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো এবাদত করবে না এবং নিজের জীবন রক্ষার জন্য যে সব ঝুঁকি গ্রহণ করে থাকে তারা তাঁর জীবন রক্ষার জন্যও সেরকম জীবনের

ঝুঁকি নেবে কি না ? তারা স্বতস্ফূর্তভাবে শর্ত দু'টি মেনে নিতে রাযি হয়ে যায় এবং এসব শর্ত পূরণ করলে বিনিময়ে কি পাওয়া যাবে তা জানতে চায় ? প্রতিউত্তরে রাসূল (সাঃ) বলেনঃ এর বিনিময়ে জান্নাত পাওয়া যাবে। জান্নাত পাবার আশায় মদীনাবাসী মুমিনগণ শর্ত ভঙ্গ না করার অঙ্গিকারবদ্ধ হন। তখন আল্লাহ্ পাক মুমিনদের চূড়ান্ত বায়আত গ্রহণের কারণে তাঁর পক্ষ থেকে সুসংবাদ জানিয়ে বলেনঃ **নিশ্চয় আল্লাহ্ মুমিনদের জান-মাল জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন।**

আয়াতাংশে রাসূলের সাথে নয় বরং আল্লাহ্র সাথেই মুমিনদের কেনা-বেচারচুক্তি হয়েছে। মাধ্যম হচ্ছেন আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ)। ক্রয়কারী হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা আর বিক্রয়কারী হচ্ছে মুমিনেরা। বিনিময় হচ্ছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে জান্নাত, আর মুমিনদের পক্ষ থেকে তাদের জীবন এবং ধন-সম্পদ।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, জান্নাত এবং মানুষের জান-মাল সব কিছুই তো আল্লাহ্ তাআলার। সেখানে কেনা বেচার তো কোনো প্রশ্নই উঠে না। আসল কথা হলো আল্লাহ্ তাআলা অপরের হক বা অধিকারে হস্তক্ষেপ করেন না। যখন মানুষকে তার জীবন এবং ধনসম্পদ দান করেছেন তখন থেকে তা ব্যবহার করা তার এখতিয়ারভুক্ত হয়ে গেছে।

অধিকার দু'প্রকারঃ একটি আল্লাহ্র অধিকার যাকে -حَقُّ اللّٰهِ বলা হয়, অপরটি বান্দার অধিকার যাকে حَقُّ الْعِبَادْ- বলা হয়।

হাদীসে এসেছে- হাশরের মাঠে বিচারের সময় অধিকারের প্রশ্নে বান্দা যদি আল্লাহর্ অধিকারে হস্তক্ষেপ করে থাকে তবে আল্লাহ্ তাকে মাফ করতে পারেন আবার নাও করতে পারেন। কিন্তু কোনো বান্দা যদি কোনো বান্দার অধিকারে হস্তক্ষেপ করে থাকে তাহলে সেই বান্দা দুনিয়াতে তাকে মাফ না করা পর্যন্ত আল্লাহ্ তাকে মাফ করবেন না।

যেহেতু মানুষের জান এবং ধন-সম্পদ حَقُّ الْعِبَادْ বা বান্দার অধিকারভুক্ত, তাই তিনি এ বিষয়টি বান্দার স্বাধীনতার উপর ছেড়ে দিয়েছেন। তবে তিনি তার অধিকার প্রয়োগের কল্যাণ-অকলাণের পথও

বাতলিয়ে দিয়েছেন। তাকে সে জ্ঞান বুদ্ধিও দিয়ে দিয়েছেন।

মুমিনদের জন্য বিনিময় বস্তু এক বড় নেয়ামতঃ আল্লাহ্ এবং মুমিনদের মধ্যে যে পণ্যের বিনিময়ে কেনা-বেচার চুক্তি হচ্ছে তা হলো- আল্লাহ্র পক্ষ থেকে স্থায়ী জান্নাত এবং মুমিনদের পক্ষ থেকে অস্থায়ী জান-মাল। মুমিনদের এই তুচ্ছ এবং ক্ষণস্থায়ী জীবন ও ধন-সম্পদের বিনিময়ে তারা পাচ্ছে- আল্লাহ্র নেয়ামতে ভরা অতীব মূল্যবান চিরস্থায়ী জান্নাত। এটা মুমিনদের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এক বড় নেয়ামত। আর এ নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার মাধ্যম হলো, আল্লাহ্র পথে জান-মাল দিয়ে জিহাদ করা।

আমানত রক্ষা করাঃ আল্লাহ্ তাআলা তাঁর জান্নাতের বিনিময়ে মুমিনদের জান-মাল খরিদ করে নিয়ে আবার তাদের কাছেই আমানত হিসেবে রেখে দিয়েছেন। এখন যেসব মুমিন জান্নাত পেতে চায়, জান্নাত লাভই তাদের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হয় এবং যারা এই চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য আল্লাহ্র সাথে জান-মাল দিয়ে চুক্তিতে আবদ্ধ, তাদের তো জান-মাল আমানত হিসেবেই জমা আছে। এখন সে আর নিজের ইচ্ছেমত খরচ ব্যবহার করতে পারে না। যেহেতু আল্লাহ্রই ক্রয়কৃত মাল সেহেতু আল্লাহ্ যখন যখন চাইবেন, বান্দাহ্ তখন তখন দিতে বাধ্য থাকবেন। কোনো প্রকার টালবাহানা করতে বা দিতে অস্বীকার করতে পারবেনা। যদি এ ধরনের কোনো আচরণ করা হয় তা হবে আমানতের স্পষ্ট খেয়ানত। খেয়ানত করা হলো ঈমান বহির্ভূত কাজ। এ সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ

لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَنَتَ لَهُ **তার ঈমান নেই যার আমানত দারী নেই**। যার চূড়ান্ত পরিণতি হবে জান্নাত তো নয়ই বরং জাহান্নাম।

আমানত রক্ষার মাধ্যমঃ মুমিনের কাছে আল্লাহ্র ক্রয়কৃত জান-মালের আমানত রক্ষার মাধ্যমই হলো **জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ্** বা আল্লাহ্র পথে জিহাদ বা ইসলামী আন্দোলন। কেননা, জিহাদ বা ইসলামী আন্দোলনেই প্রয়োজন হয় জান-মাল খরচ করার। এই পথ ছাড়া অন্য কোন পথে জান-মাল খরচ করার প্রয়োজন হয় না। ইসলামী আন্দোলন করলেই

তো ইসলাম বিরোধী তাগুতি শক্তি বাধা সৃষ্টি করে। আর বাধা সৃষ্টি হলেই লড়াইয়ের প্রশ্ন আসে। আর লড়াইয়ের প্রশ্ন আসলেই জান-মাল খরচের প্রশ্ন আসে।

বায়আত সম্পর্কে ধারণাঃ

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জীবনকালেঃ আল্লাহ্‌র নবীর জীবনকালে সাহাবাগণ বিভিন্ন সময় তার হাতে হাত রেখে বায়আত গ্রহণ করেন। যেমন **বায়আতে আকাবা, বায়আতুস্ সাজারা** (হুদাই বিয়ার সন্ধির বায়আত) ইত্যাদি। এই বায়আত ছিলো রাসূল (সাঃ)-এর হাতে হাত রেখে নিজের জান-মালকে আল্লাহ্‌র পথে বিলিয়ে দেবার শপথ।

খেলাফত কালেঃ রাসূল (সাঃ) এর ওফাতের (মৃত্যুর) পর সাহাবাগণ খেলাফতের যুগে হাতে হাত রেখে খেলাফতের আনুগত্যের বায়আত গ্রহণ করেছেন। যেমন প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রাঃ) এর হাতে হাত রেখে হযরত ওমর (রাঃ) প্রথম খেলাফতের আনুগত্যের বায়আত গ্রহণ করেন। তার পর উপস্থিত সকলেই বায়আত গ্রহণ করে খেলাফতের আনুগত্য প্রকাশ করেন। তবে তারা সকলেই রাসূলের যুগেই জান-মাল আল্লাহ্‌র পথে বিলিয়ে দেবার বায়আতে আবদ্ধ ছিলেন।

প্রচলিত বায়আতঃ বর্তমান সময়ে হাতে হাত রেখে অথবা পিঠ ছুঁয়ে অথবা পরস্পর পাগড়ী ধরে যে বায়আতের প্রচলন আছে তা ইসলামের দৃষ্টিতে কোনো বায়আতের মধ্যেই পড়ে না। এই বায়আত শরীয়ত সম্মত নয়।

শরীয়ত সম্মত বায়আতঃ একজন মুমিনের ঈমানের প্রাথমিক দাবীই হলো জান্নাত লাভের উদ্দেশ্যে নিজের জান-মালকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় বিলিয়ে দেবার জন্য বায়আতে আবদ্ধ হওয়া। আর এই বায়আত গ্রহণের পদ্ধতিই হলো ইসলামী আন্দোলন বা সংগঠনের কাছে দ্বীন কায়েমের জন্য খালেস নিয়াতে নিজের জান-মালকে খরচ করার জন্য বায়আত গ্রহণ করা। এ বায়আত কোনো ব্যক্তির কাছে হবে না এবং কারো হাতে হাত রাখাও যাবে না বরং সংগঠনের কাছেঃ

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার কুরবাণী, আমার জীবন এবং আমার মরণ একমাত্র বিশ্ব প্রভু আল্লাহ্‌র জন্য এই বাক্য পাঠের মাধ্যমে শপথ গ্রহণ করে নিজের জান-মালকে সোপর্দ করে দিতে হবে। এই বায়আতে আবদ্ধ হওয়া হলো প্রতিটি মুমিনের জন্য অবশ্যই করণীয় কর্তব্য। কেননা বায়আতবদ্ধ জীবন যাপন না করলে মুমিনের চূড়ান্ত লক্ষ্য জান্নাত লাভ করা সম্ভব নয়।

বাকিতে জান্নাতঃ আল্লাহ্‌র সাথে মুমিনদের যে বিনিময়ের চুক্তি। তা হলোঃ মুমিনেরা নগদে খরচ করবে অথচ বাকিতে জান্নাত পাবে। এর কারণ হলো, আল্লাহ্ পরীক্ষা করে দেখতে চান যে, মুমিনেরা-জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার চুক্তিতে টিকে থাকতে পারছে কি না। কেননা, একজন মুমিনকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আল্লাহ্‌র দ্বীন আন্দোলনে প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে টিকে থাকতে হবে। মুমিন জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ইসলামের পথে লড়তে গিয়ে হয় শহীদ হবে, নয় তো গাজী হিসেবে বেঁচে থাকবে।

অতঃপর আল্লাহ্‌পাক বায়আত গ্রহণ কারীদের করণীয় সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেনঃ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ **(বায়আত গ্রহণের পর) তারা আল্লাহ্‌র পথে লড়াই করে, অতঃপর (কাফেরদের) হত্যা করে এবং (নিজেরাও) নিহত হয়।**

এখানে আল্লাহ্‌পাক وَيُقْتَلُوْنَ বলে জিহাদের চূড়ান্ত পর্যায় অর্থাৎ শত্রুদের সাথে সরাসরি লড়াই এর কথা বলেছেন। যদিও এই শব্দ কোনো কোনো ক্ষেত্রে জিহাদ বা আন্দোলন অর্থেও ব্যবহৃত হয়। পরবর্তী শব্দ দু'টি তারা মারে এবং মরে, এটা সম্মক সমরেই (যুদ্ধে) সংঘটিত হয়।

একজন মুমিন বান্দাহ্ নিজের জান-মালের বিনিময়ে জান্নাত লাভের চুক্তি সম্পাদন করার পর বাড়ীতে, খানকায় বা মসজিদে বসে থাকলে চলবে না। তাকে অবশ্যই **জিহাদ ফিসাবিলিল্লাহ্** বা **ইসলামী আন্দোলনে** জড়িত থাকতে হবে। আর যখনই সে আন্দোলনে জড়িত থাকবে তখনই খোদাদ্রোহী তাগুতি শক্তির বাধার সম্মুখীন হবে। বাধা আসলেই তখন জান-মাল খরচের প্রশ্ন আসবে। প্রয়োজনে সে শত্রুর মোকাবেলায় যুদ্ধে

অবতীর্ণ হয়ে কাফের-মোশরেক এবং খোদাদ্রোহী শক্তিকে প্রতিহত করতে গিয়ে তাদেরকে হত্যা করবে, অপর পক্ষে বিরোধীদের আক্রমণে পিছপা না হয়ে বরং নিজের জীবন দান করে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করবে। আল্লাহ্পাক বায়আত গ্রহণকারী মুমিন মুজাহীদদের কাছ থেকে এ ধরনের চূড়ান্ত আমলই কামনা করেন।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! লক্ষ্য করুন, প্রচলিত পীরের কাছে বায়আত গ্রহণকারীদের কি উপরোক্ত ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হয় ? বরং তাদেরকে বাতিল শক্তি সহায়তা করে থাকে। নানা ধরনের দামী দামী হাদীয়া পাঠিয়ে থাকে। তাদের কর্মসূচীর মধ্যে কি দ্বীন কায়েমের কোনো কর্মসূচী পাওয়া যায় ? তাদের কি যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয় ? তাদের জীবনে কি কাফের মারা এবং নিজেদের মরার কোনো সুযোগ হয় ?

অপর পক্ষে দেখা যাচ্ছে বর্তমান যুগেও আল্লাহ্র দ্বীন কায়েমের কর্মসূচী নিয়ে যারা ইসলামী দলের কাছে নিজের জান-মাল আল্লাহ্ রাস্তায় বিলিয়ে দেবার জন্য বায়আত গ্রহণ করে। তখন তাদেরকেও তাগুতি শক্তির মোকাবেলায় ইসলামী আন্দোলনে সব ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এমনকি শেষ পর্যন্ত নিজের জীবন দান করে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করছে।

অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা মুজাহীদদের সাথে তার চুক্তি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেনঃ

وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ

তাদেরকে এই (জান্নাত দানের প্রতিশ্রুতি আসমানি কিতাব তাওরাত, ইঞ্জিল ও এই কোরআনেও তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল।

আল্লাহ্ পাক মুমিনদের জান-মালের বিনিময়ে জান্নাত দেবার যে খাঁটি ওয়াদা করেছেন, শুধু তিনি এই কোরআনেই করেননি বরং এর আগের আসমানী কিতাব তাওরাত এবং ইঞ্জিলেও করেছিলেন।

অবশ্য বর্তমানে তাওরাত এবং ইঞ্জিল যে অবস্থায় আছে সেখানে ইঞ্জিলে এই বিষয়টি কিছু উল্লেখ থাকলেও তাওরাত কিতাবে মোটেও উল্লেখ পাওয়া যায় না। কেননা বর্তমানে তাওরাত এবং ইঞ্জিলের যে অস্তিত্ব

পাওয়া যায়, তা ইহুদী এবং নাসারাদের প্রায় ৯০ ভাগই মনগড়া কথা। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আল-কুরআনকে অবিক্রীত অবস্থায় সংরক্ষণের জন্য আল্লাহ্পাক স্বয়ং যেভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, অনুরূপ দায়িত্ব আগের আসমানি কিতাব সমূহের ক্ষেত্রে গ্রহণ করেননি। আর দুনিয়াতেও তা সঠিক ভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়নি। একজন খাঁটি মুমিনের উচিত হবে কুরআনে যা উল্লেখ আছে তা সন্দেহাতীত ভাবে বিশ্বাস করা। সুতরাং তাওরাত এবং ইঞ্জিলে জান্নাত দেবার যে খাঁটি ওয়াদা আল্লাহ্ পাক করেছেন তা বর্তমানে দেখতে পাওয়া না গেলেও বিশ্বাস করা। কেননা আল্লাহ্পাক তাঁর পরিপূর্ণ কিতাব আল-কুরআনে তা উল্লেখ করেছেন।

অতঃপর আল্লাহ্পাক তাঁর ওয়াদা পূরণ সম্পর্কে বলেনঃ

وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ

আর আল্লাহ্র চেয়ে ওয়াদা পূরণ করতে কে বেশী পারে ?

ওয়াদা রক্ষার বিষয়ে যাতে কারও মধ্যে সামান্যতম সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি হতে না পারে, তার জন্য আল্লাহ্পাক ঘোষণা দিচ্ছেন- মুমিনেরা ওয়াদা খেলাপ করলেও তিনি তাঁর ওয়াদা পূরণ করবেনই। তাঁর চেয়ে ওয়াদা পূরণ কারী আর কেউ হতে পারে না। আল্লাহ্র ওয়াদা পূরণ সংক্রান্ত বিষয়টি জোর দেবার জন্যই প্রশ্নের মাধ্যমে কথাটি উল্লেখ করেছেন।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক আয়াতের শেষ অংশে মুজাহীদদের সুসংবাদ এবং প্রতিদানের কথা বলতে গিয়ে বলেন ঃ

فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ط وَذٰلِكَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

অতএব তোমরা রাজী-খুশী হয়ে যাও সেই লেন-দেনের জন্যে, যা তোমরা তাঁর সাথে করেছো। আর এটাই হলো (তোমাদের জন্য) বড় সফলতা।

আল্লাহ্ তাআলার সাথে মুমিন বান্দাহ্ জান্নাতের বিনিময়ে জান-মাল, লেন-দেনের যে চুক্তি করেছে এর জন্য আনন্দ প্রকাশ করা উচিত।

কেননা, মুমিনেরা এমন এক নেয়ামতে ভরা স্থায়ী জান্নাতের বিনিময়ে ক্ষণস্থায়ী জান-মালের বিনিময় করেছে, যা মুমিনদের জন্য এক অতি বড় নেয়ামত। প্রকৃতপক্ষে একজন মুমিনের সবচেয়ে বড় এবং চূড়ান্ত সফলতাই তো হলো জান্নাত লাভ। এর চেয়ে বড় পাওনা মুমিনদের জন্য আর কিছু হতে পারে না। মুমিন জীবনের চূড়ান্ত লক্ষই হলো আখেরাতে নাজাতের মাধ্যমে জান্নাত লাভ।

বায়আত গ্রহণকারী মুজাহীদদের করণীয় কর্তব্য এবং তাদের চূড়ান্ত সফলতার কথা উল্লেখের পর আল্লাহ্ পাক মুমিন মুজাহীদদের বাস্তব জীবনের কতকগুলো গুণ বা বৈশিষ্টের কথা উল্লেখ করে বলেনঃ-

اَلتَّائِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّائِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ

(মুজাহীদদের গুণাবলী হলোঃ) তারা তাওবাকারী, এবাদতকারী, প্রশংসাকারী, (দ্বীনের পথে) ভ্রমণকারী, রুকু সেজদাহ্ আদায়কারী, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা দানকারী এবং আল্লাহ্র (শরীয়তের) সীমা রক্ষাকারী। (হে নবী এসব গুণের অধিকারী) মুমিনদের (জান্নাতের) সুসংবাদ জানিয়ে দিন।

অত্র আয়াতে আল্লাহ্পাক বায়আত গ্রহণকারী মুমিনদের মৌলিক ৭টি গুণের কথা উল্লেখ করেছেন, যা মুমিন মুজাহীদদের মধ্যে থাকা অতীব জরুরী। নিম্নে ধারাবাহিক ভাবে তা উল্লেখ করা হলোঃ

এক. اَلتَّائِبُوْنَ- **তারা তাওবাকারীঃ** তাওবার অর্থ হলো মন্দ কাজ থেকে ভালোর দিকে ফিরে আসা। মানুষ ভূল-ক্রটির উর্দ্ধে নয়। কম হোক বেশী হোক মানুষ ভুল করে থাকে। এজন্য একজন মুমিন মুজাহীদের বৈশিষ্ট্যই হবে ভুল-ক্রটির জন্য বার বার তাওবা করা। ভুল হলেই এস্তেগফার করা। **তাওবাতুন্ নাসুহা** বা গ্রহণযোগ্য তাওবার নিয়মই হলোঃ (১) বান্দাহ্ যে ভুল করেছে তার স্বীকৃতি দেয়া এবং লজ্জিত হওয়া। (২) সেই ভুলের জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং

(৩) সে ভুল আর করবে না এই বলে স্বীকৃতি দেওয়া।

মহানবী (সাঃ) এর অভ্যাসই ছিলো, প্রতিদিন ৭০ থেকে ১০০ বার পর্যন্ত তাওবা বা এস্তেগফার করা। সুতরাং একজন মুমিন মুজাহীদের প্রথম গুণই হবে বার বার তাওবা করা।

দুই. اَلْعٰبِدُوْنَ। **তারা এবাদতকারীঃ** অর্থাৎ মুমিন মুজাহীদদের দ্বিতীয় গুণ হবে-একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহ্ তাআলারই এবাদত গুজারী করা। এবাদতের অর্থ হলো, প্রতিটি কথা-কাজ, 'পদক্ষেপ এবং তৎপরতা আল্লাহ্র বিধানের অনুকূলে হওয়া। আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও আনুগত্য না করা। আনুষ্ঠানিক এবাদত-বন্দেগী করলে খালেছ দেলে একনিষ্ঠভাবে তা আদায় করা। যেখানে থাকবেনা কোনো লৌলিকতা। এবাদতের নিয়ম প্রসংগে বলতে গিয়ে **হাদীসে জীবরিলে** মহানবী (সাঃ) জীবরাঈল (আঃ)-এর এহ্সান সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেনঃ

اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهٗ يَرَاكَ

তুমি যখন আল্লাহ্র এবাদত করবে তখন যেন স্বয়ং আল্লাহ্কে (হাজির-নাজির) দেখতে পাচ্ছো। আর যদি এটা সম্ভব না হয়, তবে মনে করতে হবে যে, আল্লাহ্ তোমাকে সর্বক্ষণ দেখছেন। (রাবী হযরত ওমর, মুসলিম শরীফ।)

তিন. اَلْحٰمِدُوْنَ। **তারা প্রশংসাকারীঃ** মুমিন মুজাহীদদের তৃতীয় গুণ হবে, তারা সুখের অবস্থায় হোক আর দুঃখের অবস্থায় হোক আল্লাহ্র প্রশংসাকারী। তাঁর অসংখ্য নেয়ামত ভোগ-ব্যবহারের জন্য শুকোর আদায়কারী। তারা শুধু সুখ এবং ভাল অবস্থায় শুকরিয়া আদায় করে না, বরং দুঃখ এবং বিপদের সময়েও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পরীক্ষা মনে করে সবর করে। সে মনে করে এর মধ্যেই কোনো কল্যাণ নিহীত আছে, যা তার জানা নেই, কিন্তু আল্লাহ্র জানা আছে। বিপদ মুসিবতে পড়লে মুমি-নদের করণীয় সম্পর্কে আল্লাহ্পাক সূরা বাকারার ১৫৬ নং আয়াতে বলেনঃ

اَلَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ-

যখন তারা (মুমিনেরা) বিপদ-মুসিবতে পড়ে, তখন বলে, নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহ্‌র জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই কাছে ফিরে যাবো।

চার. اَلسَّآئِحُوْنَ তারা (আল্লাহ্‌র পথে) ভ্রমণকারীঃ মুমিনদের চতুর্থ এই গুণটি সম্পর্কে তাফসীরকারকগণ বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ করেছেন। কেউ বলেন এর মানে হলো মোহাজের, কেউ বলেন মোজাহেদ, কেউ বলেন দ্বীনি ইলম সন্ধানের উদ্দেশ্যে ভ্রমণকারী, আবার কেউ বলেন এর মানে রোযা পালনকারী।

اَلسَّآئِحُوْنَ শব্দটি سِيَاحَةٌ-থেকে উদ্ভুত, যার অর্থ দেশ ভ্রমণ। সুতরাং আভিধানিক অর্থের দিক থেকে দেশ ভ্রমণ নেয়াটা বেশী যুক্তিযুক্ত হবে। সুতরাং এ অর্থই যদি ধরে নেয়া হয় তাহলে এর অর্থ খালি খালি দেশ-বিদেশে ঘোরাফেরা করা নয়। যাতে আল্লাহ্‌র কোনো সন্তুষ্টি হাসিলের উদ্দেশ্য থাকে না। বরং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি হাসিলের উদ্দেশ্যে দ্বীনি ইলমের সন্ধান, দ্বীনের দাওয়াত এবং প্রচার, দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার জিহাদ, প্রয়োজনে হিজরাত, সমাজ সংস্কার ও সংশোধন, আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী দেখা এবং হালাল রুযি তালাশের জন্য দেশ-বিদেশে ভ্রমন করা।

এ গুণটি মুমিনদের জন্য একটি বিশেষ গুণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে এজন্য যে, যেসব লোক ঈমানের দাবীদার হবার পরেও জিহাদের ডাকে সাড়া দেয় না, ঘরের বাইরে বের হতে চায় না, তাদেরকে বলা হচ্ছে- প্রকৃত মুমিন ব্যক্তি ঈমান আনার পর মুখে শুধু ঈমানের দাবী করে কোনো দিনই বসে থাকতে পারে না। বরং সে আল্লাহ্‌র দ্বীন কবুল করার পর দ্বীনের প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তার দাবি পূরণের জন্য প্রাণপন চেষ্টা সাধনায় নিয়োজিত থাকে। আর এজন্য সে যে কোনো ঝুঁকির মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত থাকে।

পাঁচ. اَلرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ। তারা রুকু ও সেজদাহ্ আদায়কারীঃ রুকু ও সেজদাহ্কারী বলে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা সমাজে নামাজ কায়েম করে এবং নামাজের উপর নিজেরাও কায়েম থাকে। যারা রুকু এবং সেজদাহর মাধ্যমে নিজের সমস্ত আমিত্বকে জলাঞ্জলি দিয়ে আল্লাহর সামনে মাথা নীচু করে দেয়। এখানে আরও একটি অর্থ নেয়া যায় যে, মুমিনেরা ইহুদীদের ন্যায় রুকু ছাড়া নামায আদায় করে না বরং তারা রুকু-সেজদাহ্ সহ পূর্ণভাবে নামায আদায় করে।

ছয়. اَلْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ তারা ভাল কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে বাধাদেয়ঃ মুমিন মুজাহীদদের ৬ষ্ঠ গুণ হলো তারা ভালো, কল্যাণকর ও নেক কাজে আদেশ দেয়, উৎসাহ প্রদান করে এবং ভালো কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করে। অপর পক্ষে মন্দ, অকল্যাণকর এবং গোনাহ্র কাজে বাধা সৃষ্টি করে, মন্দ কাজ করতে উৎসাহ দেয়না। বরং খারাপ কাজের পথ রোধ করে দেয়।

এই গুণটি আদায়ের জন্য যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রয়োজন তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। কেননা এখানে اَمْرٌ (আমর) বা নির্দেশ বাচক শব্দ উল্লেখ রয়েছে। নির্দেশতো সেই দিতে পারে, যার হাতে ক্ষমতা থাকে। এজন্য ভালো কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজে বাধা সৃষ্টির জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রয়োজন।

ভালো কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজে বারণ তখনই করতে পারবে যখন মুসলমানদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থাকবে। দেশের আইন এবং সমাজ ইসলামী শরীয়াত কুরআন সুন্নাহ্ অনুযায়ী পরিচালিত হবে। ভালো কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজে বাধাদান সমাজের অংগে পরিণত হবে। কিন্তু যখন সমাজ ক্ষমতা মুসলমানদের হাতে থাকবে না, দেশের আইন ব্যবস্থা কুরআন হাদীস অনুযায়ী চালিত হবে না। তখন ঐ সমাজের মুমিনদের জন্য প্রধান ভালো কাজ হবে আল্লাহ্র যমীনে আল্লাহ্র বিধান প্রতিষ্ঠা করা। আর মন্দ কাজে বাধাদান করা হবে ইসলামী সমাজ

প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী তাগুতি শক্তিকে প্রতিহত করা এবং বিরোধী শক্তিকে নির্মূল করা।

মন্দ অসৎ এবং গোনাহর কাজকে সমাজ থেকে উৎখাত করার জন্য রাসূল (সাঃ) ঈমানের দাবী হিসেবে উল্লেখ করে বলেনঃ-

مَنْ رَاٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ

তোমাদের কেউ যখন কোনো অন্যায় ও অপরাধ হতে দেখবে, তখন যেনো সে তার হাত (ক্ষমতা) দিয়ে তা প্রতিহত করে। যদি সে একাজ করতে পরিবেশ না পায়, তখন যেনো সে তার জবান (অর্থাৎ বক্তৃতা, বিবৃতি, শ্লোগান, আলাপ-আলোচনার) দ্বারা তা প্রতিহত করে। এতেও যদি সে সক্ষম না হয়, তবে সে যেন তার অন্তর দিয়ে (ঘৃণা) করে এবং (তা প্রতিহত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে।) আর এটা হলো ঈমানের দুর্বলতম পর্যায়।

অত্র হাদীসে ঈমানের তিনটি শ্রেণী করা হয়েছে। প্রথম শ্রেণীর ঈমানের দাবীই হলো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মাধ্যমে মন্দ কাজকে প্রতিহত করা।

সাত. وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ এবং তারা আল্লাহ্র (শরীয়তের) সীমারেখা রক্ষা করে ঃ

আয়াতে মুমিনদের সর্বশেষ গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ তারা আল্লাহ্র দেয়া জীবন বিধান পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মেনে চলে। আল্লাহ্র দেয়া শরীয়তের সীমা অতিক্রম করেনা। তারা তাঁর বিধি–বিধান সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করে না। আল্লাহ্র শাস্তির বিধান 'হদ' এবং কেসাসকে বর্বর বা মধ্যযুগীয় বলে আখ্যায়িত করে না। তারা হালালকে হালাল হিসেবে গ্রহণ করে এবং হারামকে হারাম হিসেবে বর্জন করে।

আল্লাহ্র সীমা তথা তার বিধি-বিধান রক্ষা করা তখনই সম্ভব যখন সেই দেশের জনগণ ইসলামী শরীয়তের অনুশাসন মেনে চলার সুযোগ লাভ

করে। যখন সে সমাজে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব এবং তাঁরই বিধি-বিধান কায়েম থাকে। মুমিনদের এই গুণটি অর্জনের জন্য ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার প্রয়োজন।

অতএব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আল্লাহ্র সাথে বায়আতের চুক্তি মোতাবেক নিজের জান-মাল দিয়ে আল্লাহ্র যমীনে আল্লাহ্র বিধান প্রতিষ্টার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। যারা আল্লাহ্র সাথে চুক্তি অনুযায়ী তাদের কাছে রক্ষিত আমানত জান এবং মাল খরচের জন্য আল্লাহ্র রাস্তায় দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যুক্ত থাকে, যাদের ব্যবহারীক এবং চারিত্রীক জীবনে উপরোক্ত সাতটি গুণ বা বৈশিষ্ট থাকবে তাদের জন্য খোশ খবরি জানিয়ে আল্লাহ্পাক আয়াতের সর্বশেষ অংশে বলেনঃ

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ **(হে নবী) আপনি তাদেরকে অর্থাৎ মুমিন মুজাহীদদেরকে (জান্নাতের) সুসংবাদ টুকু জানিয়ে দিন।**

শিক্ষাঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! উপরোক্ত আয়াত দু'টির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমাদের জন্য যেসব শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে, তা হলোঃ

❑ একজন মুমিনের জীবনের মূল এবং চূড়ান্ত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হওয়া উচিত আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং আখেরাতে নাজাতের মাধ্যমে জান্নাত লাভ করা।

❑ জান্নাত পেতে হলে রাসূল (সাঃ) এর কর্মসূচী অনুযায়ী বাস্তব এবং বিজ্ঞান সম্মত কর্মসূচী গ্রহণকারী ইসলামী জামায়াত বা সংগঠনের কাছে বায়আত গ্রহণের মাধ্যমে আল্লাহ্র রাস্তায় নিজের জান মালকে ওয়াক্ফ করে দেয়া।

❑ কোনো ব্যক্তিকে খুশি করার জন্য বায়আত গ্রহণের মাধ্যমে মুরিদ না হওয়া।

❑ সংগঠনের কাছে বায়আত গ্রহণ করার পর বাড়ীতে বসে না থেকে পূর্ণভাবে দ্বীন ইসলাম কায়েমের জিহাদে আত্মনিয়োগ করা। প্রয়োজনে তাগুতি শক্তির বিরুদ্ধে সম্মক সমরে (যুদ্ধে) ঝাঁপিয়ে পড়া।

❑ বিক্রয়কৃত জান-মাল আল্লাহ্র বা দ্বীন কায়েমের আন্দোলনে যখন যা প্রয়োজন তা সতস্ফূর্তভাবে দেওয়া। কোন প্রকারের বাহানা বা গড়িমোসি

না করা। জান এবং মালকে নিজের বলে দাবী না করা।

❑ সংগঠনের কাছে বায়আত গ্রহণকারী মুমিন মুজাহীদদের মধ্যে নিচের সাতটি গুণ বা বৈশিষ্ট থাকাঃ

১. নিজের ভুল-ত্রুটির জন্য সার্বক্ষণিক ভাবে আল্লাহ্র কাছে এস্তেগফার করা। প্রতিদিন ৭০ থেকে ১০০বার মৌখিক ভাবে এস্তেগফার করা।

২. প্রতিটি মুহূর্ত এবং প্রতিটি সময় আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী নিজের জীবন পরিচালিত করা। একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই একনিষ্ঠভাবে এবাদত-বন্দেগী করা।

৩। **সদা সর্বদা আল্লাহ** তা'য়ালার প্রশংসা করা। সুখের অবস্থায় হোক আর দুঃখের অবস্থায় হোক আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করা। সুখ বা ভালো কাজের জন্য **আলহামদুলিল্লাহ** বলা এবং দুঃখের এবং বিপদের সময় **ইন্নালিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রাজিউন** বলে ধৈর্য ধারণ করা।

৪. আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দ্বীন ইসলামের জ্ঞান অর্জনের জন্য দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করা। দ্বীন কায়েমের জন্য জিহাদ করা, প্রয়োজনে হিজরাত করা। ফরজ এবং মাঝে মাঝে নফল রোযা পালন করা।

৫. আল্লাহ্ তাআলার পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশের জন্য নিজের জীবনে রুকু সিজদার মাধ্যমে পূর্ণভাবে নামায কায়েম করা এবং সমাজ জীবনে নামায কায়েম করার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।

৬. ভালো কাজে আদেশ এবং মন্দ কাজে বাধা দান করার জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জনের উদ্দেশ্যে ইসলামী আন্দোলনে প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখা। অনইসলামিক সমাজেও সুযোগ অনুযায়ী ভালো কাজে আদেশ এবং মন্দ কাজে বাধা দানের কাজ অব্যাহত রাখা।

৭. এই গুণটি অর্জন করার জন্যও ইসলামী রাষ্ট্রের প্রয়োজন। আল্লাহ্র

সীমা বা বিধি বিধান নিজে মেনে চলা এবং সমাজে আল্লাহ্‌র সীমা সংরক্ষণের জন্য ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জান-প্রাণ দিয়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো।

আহবানঃ সম্মানিত ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনাদের সামনে সূরা তাওবার ১১১ ও ১১২ নম্বর আয়াত দু'টির যে সব বিবরণ এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পেশ করলাম এতে যদি আমার অজান্তে কোনো ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যাই তার জন্য আল্লাহ্ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর আয়াত দু'টিতে যে সব শিক্ষণীয় বিষয় আমরা জানতে পারলাম তা যেনো বাস্তব জীবনে আমল করতে পারি সেই তৌফিক কামনা করে শেষ করছি। **অয়াআখেরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন।**

চার

মুমিনদের ছয়টি বর্জনীয় আচরণ

হুজুরাত-১১-১২ আয়াত

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسٰى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ

সরল অনুবাদঃ ইরশাদ হচ্ছেঃ (১১) হে মুমিনগণ! কোনো পুরুষ যেনো অন্য কোনো পুরুষকে উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। আর কোনো নারী অপর কোনো নারীকেও যেনো উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারিনী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরকে খারাপ উপনামে ডেকোনা।

ঈমান আনার পর মন্দ নামে ডাকা গোনাহ্র কাজ। যারা এসব আচার-আচরণ থেকে বিরত হবে না, তারাই হবে যালেম। (১২) হে মুমিনগণ! তোমরা বেশী বেশী ধারণা থেকে দূরে থাকো। কেননা, কোনো কোনো ধারণায় পাপ হয়ে থাকে। তোমরা কারো গোপনীয় বিষয় তালাশ করে বেড়িও না। আর তোমাদের কেউ যেনো অন্য কারও অসাক্ষাতে গীবত (পরনিন্দা) না করে। তোমাদের কেউ কি তার মরা ভাই এর গোশ্ত খাওয়া পছন্দ করবে ? অথচ তোমরা তা অপছন্দ করো। আল্লাহ্কে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ يَاَيُّهَا-ওহে বা হে। اَلَّذِيْنَ-যারা اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছো। لَا–না। يَسْخَرْ–উপহাস/ঠাট্টা/বিদ্রুপ করা। قَوْم-জাতি বা গোত্র, এখানে পুরুষ। مِنْ-থেকে। عَسٰى-হতে পারে বা কেননা। يَكُوْنُوْا তারা হবে। خَيْرً-উত্তম। مِنْهُمْ-তাদের থেকে। وَ -এবং। نِسَاءٌ -স্ত্রী লোক/নারী।-يَكُنَّ -তারা হবে (স্ত্রী লিঃ)। مِنْهُنَّ-তাদের থেকে (স্ত্রী লিঃ)। لَاتَلْمِزُوْا-তোমরা দোষারোপ করো না।اَنْفُسَكُمْ-তোমাদের নিজেদেরকে। وَلَا تَنَابَزُوْا- তোমরা ডেকো না বা সম্বোধন করো না। بِالْاَلْقَابِ-খারাপ উপনামে বা উপাধীতে। بِئْسَ-গানাহ্/ খারাপ। لِاسْمُ-নাম। اَلْفُسُوْقُ-ফাসেকী/ মন্দ/ খারাপ। بَعْدَ-পরে। اَلْاِيْمَانِ-বিশ্বাস। مَنْ-যে। لَمْ يَتُبْ–তাওবা করবে না বা বিরত হবে না। فَاُولٰئِكَ-অতঃপর ওরাই। هُمْ-তারা। اَلظّٰلِمُوْنَ-যালেম/অত্যচারী।

اِجْتَنِبُوْا-তোমরা বিরত থাকো বা দূরে থাকো। كَثِيْرً-বেশী বা অধিক। اَلظَّنِّ -ধারণা/অনুমান। اِنَّ-নিশ্চয়, কেননা। بعض-কোনো কোনো। اِثْمٌ-পাপ, গোনাহ্। لَاتَجَسَّسُوْا-তোমরা খোজাখুজি বা তালাশ করো না। لَا يَغْتَبْ-গীবত বা বদনাম করো না। بَعْضُكُمْ-তোমাদের কেউ। بَعْضًا-অপরের। اَيُحِبُّ-তোমরা কি পছন্দ করো? اَحَدُكُمْ-তোমাদের কেউ। اَنْ يَّاكُلَ-তোমরা যদি খাও। لَحْمَ-গোশ্ত। اَخِيْهِ-তার ভাই। مَيْتًا-মৃত। فَكَرِهْتُمُوْهُ-অতঃপর তোমরাই তা অপছন্দ করো। وَاتَّقُوا اللّٰهَ-তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো। تَوَّابٌ-ক্ষমাকারী বা তাওবা কবুলকারী। رَحِيْمٌ-দয়ালু/মেহেরবান।

সম্বোধনঃ দারসে কুরআন মাহফিলে/প্রোগ্রামে উপস্থিত ইসলাম প্রিয় দ্বীনদার/ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ভায়েরা/বোনেরা! আস্সালামু আলায়কুম অয়ারাহমাতুল্লাহি অয়া বারাকাতুহ। আমি আপনাদের সামনে পবিত্র আল-কুরআনের সূরা হুজুরাতের ১১ ও ১২ নম্বর দু'টি আয়াত তিলাওয়াত ও সরল অনুবাদ পেশ করেছি। আল্লাহ্ পাক যেনো আমাকে আপনাদের সামনে সহীহ্ সালামতে এবং সঠিকভাবে দারস পেশ করার তৌফিক দান করেন। **অমা তাওফীকি ইল্লাহ্ বিল্লাহ্।**

সূরার নামকরণঃ এই সূরার চতুর্থ আয়াতের مِنْ وَّرَاۤءِ الْحُجُرٰتِ-এর اَلْحُجُرٰتِ (আল-হুজুরাত) শব্দটিকেই গোটা সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। 'হুজুরাত' শব্দের অর্থ চার দেয়াল বিশিষ্ট ঘর। সুতরাং এটা সেই সূরা যার মধ্যে 'আল-হুজুরাত" শব্দটি উল্লেখ রয়েছে। সূরার

এই নামকরণ শিরোনাম হিসেবে নয় বরং প্রতিকী বা চিহ্ন হিসেবে করা হয়েছে। (সূরার নামকরণ সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ এক নম্বর দারসে দেখুন)।

সূরাটি নাযিল হবার সময় কালঃ সূরাটির বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত অনেকগুলো সামাজিক আইন-কানুন, রীতি-নীতি ও বিধি-বিধান বিভিন্ন সময় ও অবস্থায় অবতীর্ণ হয়। সূরার বিষয়বস্তু দেখলে এবং বিভিন্ন হাদীসের বর্ণনা থেকে এর সত্যতা প্রমাণিত হয়। হাদীসের বর্ণনা হতে এটাও জানা যায় যে, সামাজিক এই বিধি-বিধানগুলো অধিকাংশই মাদানী জীবনের শেষের দিকে নাযিল হয়। যেমন ৪ নম্বর আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো ৯ম হিজরীতে বনী তামীম গোত্রের প্রতিনিধি আগমন উপলক্ষে। ৬ নম্বর আয়াত অবতীর্ণ হয় অলীদ ইবনে উক্‌বা সম্পর্কে। তাকে নবী করীম (সাঃ) বনুল মুস্তালিক গোত্রের কাছে যাকাত আদায়ের জন্য পাঠিয়েছিলেন। আর তিনি মক্কা বিজয়কালে মুসলমান হয়েছিলেন।

সূরার বিষয়বস্তুঃ এই সূরাটির মূল বিষয় হলো মুসলমানদেরকে ঈমানের উপযোগী আদব-কায়দা, নিয়ম-নীতি ও সামাজিক শিষ্ঠাচার শিক্ষা দেওয়া। যেমন–

প্রথমতঃ সূরায় মুমিনদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় আচার-আচরণ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ মুমিনদের কোনো উড়ো খবর শুনেই সিদ্ধান্ত না নেবার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বরং সংবাদ বা খবরটি সঠিক কি না তা আগে যাচাই-বাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে বলা হয়েছে । না হলে হিতে বিপরীত হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

তৃতীয়তঃ যদি দু'জন মমিন ব্যক্তি বা দু'টি দল দ্বন্দ্বে বা বিবাদে জড়িয়ে পড়ে, তাহলে তাদের মধ্যে মিমাংসা করে মিটমাট করে দেবার জন্য বলা হয়েছে।

চুতর্থতঃ মানুষের মধ্যে সম্পর্ক বিনষ্টকারী এবং সামাজিক শৃংখলা নষ্টকারী

মৌলিক এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছয়টি খারাপ আচারণ বা কাজ যেমন- ঠাট্টা-বিদ্রুপ, দোষারোপ, মন্দ উপনামে ডাকা, বেশী বেশী ধারণা, পরের দোষ খোজা-খুজি এবং গীবত বা পরনিন্দা করা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

পঞ্চমতঃ মানুষকে গোত্রীয় এবং বংশীয় মর্যাদার জন্য অহংকার করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা সকলেই একই পিতা-মাতার ঔরষজাত সন্তান। বিভিন্ন গোত্রে ও বংশে বিভক্ত আল্লাহ্ই করেছেন কেবলমাত্র পরিচিতির জন্য।

ষষ্ঠতঃ সূরার সব শেষে আল্লাহ্পাক জনগণকে মৌখিক ঈমানের দাবী না করে, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান এনে তাঁর জন্যই নিজের জান-মালকে সঁপে দিতে বলা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াত দুটির বিষয়বস্তুঃ দারসের জন্য তিলাওয়াতকৃত আয়াত দু'টির মূল বিষয়বস্তু হলো, মানুষের মধ্যে সম্পর্ক বিনষ্টকারী এবং সামাজিক পরিবেশ নষ্টকারী ছয়টি খারাপ আচরণ পরিহার।

ব্যাখ্যাঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! সূরা হুজুরাত এর তিলাওয়াকৃত আয়াত দু'টির প্রয়োজনীয় বিবরণ প্রদানের পর এখন আপনাদের সামনে ব্যাখ্যা পেশ করছি। আয়াত দু'টিতে মানুষের মধ্যে সম্পর্ক শিথিলকারী ছয়টি বদ আচরণের উল্লেখ করা হয়েছে।

মুমিন মুসলমানদের ছয়টি হারাম বা নিষিদ্ধ কাজ বা আচরণের মধ্যে প্রথম আয়াতে তিনটি যেমন- (১) কোনো মুসলমানকে উপহাস বা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা। (২) কাউকে দোষারোপ করা ও (৩) কাউকে অপমানকর উপনামে ডাকা। পরবর্তী আয়াতে তিনটি যেমন- (৪) কূধারণা করা। (৫) গোয়েন্দাগিরী করা এবং (৬) গীবত বা পরনিন্দা করা।

আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰٓ أَن

يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٍ عَسٰى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ

হে মুমিনগণ! কোনো পুরুষ যেনো অপর কোনো পুরুষকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ বা উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। আবার কোনো নারীও যেনো অপর কোনো নারীকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ বা উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারিনী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে।

প্রথমত নিষিদ্ধ আচরণঃ لَايَسْخَرْ ঠাট্টা-বিদ্রুপ বা উপহাস না করা।

এখানে ছয়টি নিষিদ্ধ আচরণের প্রথম আচরণটি উল্লেখ করা হয়েছে। ঈমাম কুরতবী (রঃ) বলেনঃ কোনো ব্যক্তিকে হেয় ও অপমান করার জন্য তার কোনো দোষ এমন ভাবে উল্লেখ করা যাতে উপস্থিত শ্রোতারা হাঁসতে থাকে, তাকে سَخْرِيَةٌ ও اِسْتِهْزَاءٌ-বলা হয়। এটা যেমন মুখে করা যায়, তেমনি হাত-পা ব্যঙ্গ করে কিংবা ঈশারা ইঙ্গিতের মাধ্যমেও করা যায়। আবার কারো কথা শুনে অপমানের ভঙ্গিতে বিদ্রুপ করার মাধ্যমেও হতে পারে। কেউ কেউ বলেনঃ উপস্থিত লোকদের হাঁসির খোরাক হতে পারে, এমনভাবে কারও সম্পর্কে আলোচনা করাকে سَخْرِيَةٌ বা উপহাস বলা হয়। কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী এসবই হারাম বা নিষিদ্ধ।

পূরুষদের জন্য قَوْمٌ (কাউম) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ হলো, অভিধানে এ শব্দটি পুরুষদের জন্যই নির্ধারিত। সাধারণতঃ আল-কুরআনে পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য 'কওম' শব্দ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এখানে পূরুষ-নারী সম্ভবতঃ দু'টি কারণে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম কারণ হলোঃ ?سَخْرِيَةٌ অর্থাৎ ঠাট্টা-বিদ্রুপ বা উপহাসের আচরণটি গুরুত্বের সাথে নিষিদ্ধ করার জন্য পুরুষ-নারী পৃথক ভাবে

উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় কারণ হলোঃ ঠাট্টা-বিদ্রুপতো এমনি নিষিদ্ধ, তারপর শরীয়াত পুরুষ-নারীর এক সাথে মেলা-মেশা হারাম করেছে। আর এ কাজটি একই সাথে খোলামেলা বা উঠাবসা না করলে কোনো ভাবেই করা সম্ভব হয় না। এজন্যই পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

আয়াতাংশের সারমর্ম হলো এই যে, যদি কোনো ব্যক্তির দেহে, আকার-আকৃতিতে কিংবা গঠন প্রকৃতিতে কোনো দোষ বা ত্রুটি চোখে পড়ে তা হলে তা নিয়ে কারও ঠাট্টা-বিদ্রুপ, উপহাস অথবা হাঁসাহাঁসি বা তামাশা কিংবা মস্‌করা করা কারো জন্য উচিত নয়। তার কারণ হলো, সেই ব্যক্তির সততা, আমলের আন্তরিকতা এবং নিয়াতের বিশুদ্ধতা ইত্যাদির কারণে আল্লাহ্‌র কাছে তার চেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ হলেও হতে পারে। যা উপহাসকারীর জানা নেই।

আয়াতের প্রভাবঃ এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর সাহাবীদের মধ্যে এমন প্রভাব পড়ে যে, হযরত আমর ইবেন শোরাহ্ বিল (রাঃ) বলেনঃ কোনো ব্যক্তিকে বকরীর স্তনে মুখ লাগিয়ে দুধ পান করতে দেখে আমার হাঁসি আসলে আমি আশংকা করতাম, না জানি আমিও বুঝি এরূপ হয়ে যাই। "হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ কোনো কুকুরকেও ঠাট্টা করতে আমার ভয় লাগে, না জানি আমিও কুকুর হয়ে যাই।" (কুরতবী)।

শরীয়তে মানুষের অন্তরের নিয়তের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সহীহ্ মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) মহানবী (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেনঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلٰى صُوَرِ كُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَلٰكِنْ يَّنْظُرُ اِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ-

(কিয়ামতের দিন) নিশ্বয় আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের চেহারার সৌন্দর্য ও ধন-সম্পদের দিকে দৃষ্টি (গুরুত্ব) দেবেন না, বরং তিনি তোমাদের

অন্তরের নিয়াত ও আমলের প্রতি দৃষ্টি (গুরুত্ব) দেবেন।

হাদীসে একজন মানুষের বাহ্যিক বেশ-ভূষা, আকার-আকৃতি, চলা-ফেরা এবং ধন-সম্পদ, মান-সম্মান ইত্যাদির গুরুত্ব দেয়া হয়নি বরং গুরুত্ব দেয়া হয়েছে নেক আমল এবং নিয়াতের পরিচ্ছন্নতা ও আন্তরিকতাকে।

দ্বিতীয় নিষিদ্ধ আচরণঃ وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ **এবং তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ বা অভিশাপ করো না।** لَمْزٌ এর অর্থ কারও দোষ ও খুত খুঁজে বের করা, দোষ প্রকাশ করা এবং দোষ ও খুতের কারণে ভর্ৎসনা করা ইত্যাদি। আয়াতে উল্লেখিত দ্বিতীয় এই নিষিদ্ধ আচরণ দ্বারা পরস্পরের সম্পর্ক নষ্ট করে এবং সমাজে মারাত্মক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। এ কারণে এসব আচরণ ইসলামে হারাম ঘোষণা করেছে।

আয়াতে **পরস্পর দোষ ত্রুটি বের করো না** বলার পরিবর্তে। لَا يَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ। **নিজেদের প্রতি দোষারোপ করো না** বলা হয়েছে। এটা অত্যন্ত উন্নতমানের বাচন ভঙ্গী। এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, অন্যের প্রতি দোষারোপ করার অর্থই হলো নিজের উপর দোষারোপ করা। কারণ হলো, কেউ কারো দোষ বা খুত বের করলে সেতো তার দোষ খুজে বের করবে। কেননা কোনো মানুষ দোষ-ত্রুটি মুক্ত নয়। যখন কেউ অন্যের দোষ খুজতে যায় তখন সে তাকেও নিজের দোষ খোজার সুযোগ করে দেয়। সুতরাং এতে পরস্পরের সম্পর্কে ফাটল ধরে এবং সামাজিক শৃংখলা নস্ট হয়।

তৃতীয় নিষিদ্ধ আচরণঃ وَلَاتَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ **এবং (একে অপরকে) মন্দ উপনামে ডেকো না।**

আয়াতে নিষিদ্ধ তৃতীয় বিষয় হচ্ছে অপরকে মন্দ বা খারাপ উপনামে ডাকা। যদ্দরুন সে অপমানবোধ করে বা অসন্তুষ্ট হয়। যেমন কাউকে ফাসেক বা মুনাফিক বলা। কাউকে অন্ধ, কানা, খোড়া, বোবা, ঠসা (বইরা) বলে ডাকা, অথবা কাউকে নিজের বাবা-মায়ের বা বংশের দোষ

কিংবা কোনো ত্রুটি ধরে সম্বোধন করা। কারও ঈমান এনে ইসলাম কবুল করার পরও তার পূর্বের ধর্মের নাম যেমন- হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, এবং ইহুদী বলে অভিহিত করা। কোনো ব্যক্তি, পরিবার, গোত্র বা বংশের নিন্দা বা অপমানজনক নামকরণ করা ইত্যাদি।

শানে নযূলঃ হযরত আবু যুবায়ের আনসারী (রাঃ) বলেনঃ এই আয়াতটি আমাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন হিজরত করে মদীনায় আসেন, তখন আমাদের অধিকাংশ লোক দুই তিনটি করে নামে পরিচিত ছিলো। তার মধ্যে কোনো কোনো নাম কোনো কোনো ব্যক্তিকে লজ্জা এবং অপমান করার জন্য লোকেরা ব্যবহার করতো। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তা জানতেন না। তাই মাঝে মধ্যে সে সব মন্দ নাম ধরে তিনিও ডাকতেন। তখন সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) বলতেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) সে এ নাম শুনলে অসন্তুষ্ট হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অত্র আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

মন্দ কাজ থেকে তওবা করার পরেও তাকে সেই মন্দ কাজের নামে ডাকা নিষেধঃ

بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ কেউ কোনো গোনাহ্ বা মন্দ কাজ থেকে তওবা করার পরও তাকে সেই মন্দ কাজের নাম ধরে ডাকা অন্যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়-চোর, ডাকাত, জেনাখোর, মদখোর, সূদখোর, তাড়িখোর ইত্যাদি বলে ডাকা। যেসব লোক চুরি, ডাকাতি, জেনা-ব্যভিচার, মদ, জুয়া ইত্যাদি অপরাধমূলক কাজ থেকে তওবা করে নিয়ে সংশোধণ হয়ে যায়, তাকে অতীত কুকর্মের দ্বারা লজ্জা দেয়া, হেয় বা খাটো করা হারাম। রাসূল (সাঃ) বলেনঃ যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে এমন গোনাহ দ্বারা লজ্জা দেয়, যা থেকে সে তওবা করেছে। তাহলে তাকে (যে লজ্জা দেয়) সেই গোনাহ্‌তে জড়িয়ে আ-খেরাতে লাঞ্ছিত করার দায়িত্ব আল্লাহ্ তাআলা নিজে গ্রহণ করেন। (কুরতবী)

পরিচিতির জন্য মন্দ নামে ডাকা জায়েজঃ কোনো লোক এমন নামে বা

উপনামে পরিচিত হয়ে যায়, যা আসলে মন্দ। কিন্তু সেই নাম ছাড়া তাকে কেউ চেনে না। সেই ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে লজ্জা দেয়া বা ছোট করার উদ্দেশ্য না থাকলে এই মন্দ নাম বা উপনামে ডাকা জায়েজ। হাদীস বিশারদগণ **আসমাউর রিজালে** 'সুলাইমান আল-আ'মাশ' (নির্বোধ সুলাইমান) এবং 'ওয়াছিল আল-আহদাব' (কুজা ওয়াছিল) প্রভৃতি পরিচয়মূলক শব্দ ব্যবহার করা জায়েজ বলেছেন।

আবার একই নামের কয়েকজন থাকলে তাদেরকে আলাদা করে চেনার জন্য যে খুত আছে তাকে সেই নামে সম্বোধন করা অবৈধ নয়। যেমন অন্ধ হলে 'অন্ধ আবদুল্লাহ', খোড়া হলে 'খোড়া আব্দুল্লাহ্' বলে ডাকা। যদিও কথাটি শুনতে ভালো শোনায় না।

অনুরূপ ভাবে যেসব নামে বাহ্যত কাউকে ছোট করা বোঝায়। কিন্তু আদর বা স্নেহ ভালোবাসার জন্য হয়ে থাকে। আর যাকে এই নামে ডাকা হয় তাতে সে নিজেও মাইন্ড করে না বা অসন্তুষ্ট হয় না, এমন পদবী ব্যবহার করা নিষেধ নয়। যেমন আবু হুরাইরা (বিড়ালের বাপ বা বিড়ালওয়ালা), আবু তোরাব (মাটির বাপ বা মাটি মিশ্রিত) ইত্যাদি। রাসূল (সাঃ) নিজেই এসব পদবী দিয়েছেন এবং ডেকেছেন।

উত্তম নামে ডাকা সুন্নতঃ "রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ এক মুমিনের উপর আর এক মুমিনের হক বা অধিকার হলো, তাকে অধিক পছন্দনীয় নাম ও পদবীর সাথে ডাকা।" এ কারণেই আরবে ডাক নামের খুব প্রচলন ছিলো। রাসূল (সাঃ)ও তা পছন্দ করতেন। রাসূল (সাঃ) বিশেষ বিশেষ কিছু সাহাবীকে কিছু পদবী দিয়েছিলেন। যেমন, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)-কে 'আতীক', হযরত ওমর (রাঃ)-কে 'ফারুক', হযরত হামযা (রাঃ)-কে 'আসাদুল্লাহ্' এবং খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রাঃ)-কে 'সাইফুল্লাহ্' পদবী দান করেছিলেন।

নাম ডাকার সময় সতর্কতা ঃ নাম ডাকার সময় সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। যদি কারো নাম আল্লাহ্র সিফাতী নাম হয়, তবে তার আগে 'আব্দুল' শব্দটি ব্যবহার করা উচিত। যেমন আব্দুর রহমান, আব্দুর রহীম,

আব্দুস সাত্তার, আব্দুল খালেক ইত্যাদি।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ-

যারা (মন্দ নামে ডাকার) একাজ থেকে বিরত হয় না তারাই যালেম। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি ঈমান আনার পরেও তার পূর্বের আমল বা ধর্মের নামে ডাকা কিংবা খোটা দেয়া অত্যন্ত বাজে অভ্যাস। এ ধরনের অভ্যাস পরিত্যাগ করা অবশ্যই উচিত। তার পরও যদি কেউ এই আচার-আচরণে অভ্যস্ত থাকে তবে সে মানুষের আত্ম-মর্যাদা, হক বা অধিকার নষ্ট করার দায়ে যালেম হিসেবে আখ্যায়িত হবে।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ পাক নিষিদ্ধ পরবর্তী তিনটি আচরণের কথা উল্লেখ করে বলেনঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْاوَ لَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا

হে মুমিনগণ! তোমরা বেশী বেশী ধারণা হতে বিরত থাকো। কেননা কোনো কোনো ধারণায় পাপ হয়ে থাকে। তোমরা (পরের দোষ) তালাশ করে বেড়িও না। আর তোমাদের কেউ যেনো কারো গীবত বা পরনিন্দা না করে।

চতুর্থ নিষিদ্ধ আচরণঃ ظَنّ তথা ধারণা। এসম্পর্কে আয়াতে বলা হয়েছে اِجْتَنِبُوا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ **তোমরা বেশী বেশী ধারণা থেকে বেঁচে থাকো।** এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে-**নিশ্চয় কতক ধারণা পাপ।** এ থেকে জানা যায় যে, আয়াতে সব ধরনের ধারণা বা অনুমান একেবারেই নিষেধ করা হয়নি। তবে অতি ধারণা বা অনুমানের উপর ভিত্তি করে খুব বেশী কাজ করা, কথা বলা এবং প্রতিটি

বিষয়ে ধারণা অনুমানের অনুসরণ করা হতে নিষেধ করা হয়েছে। এখন আমাদের জেনে নেওয়া দরকার যে, কোন্ কোন্ ধারণা পাপ বা নিষেধ এবং কোন্ কোন্ ধারণা জায়েয।

ধারণার প্রকারঃ 'কোনো কোনো ধারণা পাপ' এই কথাটি বিশ্লেষণ করলে ধারণা বা অনুমান কয়েক প্রকারের।

ইমাম আবু বকর জাস্সাস তাঁর রচিত "আহকামুল কুরআনে" ধারণার চারটি প্রকার উল্লেখ করেছেন। (১) এক প্রকার **ধারণা হারাম** বা নিষেধ। (২) দ্বিতীয় প্রকার ধারণা করা ওয়াজিব বা জরুরী। (৩) তৃতীয় প্রকার ধারণা করা মুস্তাহাব বা মোটামুটি। (৪)চতুর্থ প্রকার ধারণা জায়েয বা বৈধ।

উল্লেখিত চার প্রকার ধারণার বিশ্লেষণ নিচে আলোচনা করা হলোঃ

১. হারাম বা নিষিদ্ধ ধারণাঃ আল্লাহ্র প্রতি কু-ধারণা রাখা নিষেধ। যেমন 'তিনি আমাকে শাস্তিই দেবেন অথবা বিপদেই রাখবেন এটা আল্লাহ্র ক্ষমা ও রহমত থেকে নিরাশা। এ ব্যাপারে রাসূল (সাঃ) বলেনঃ **আল্লাহ্র প্রতি ভালো ধারণা রাখা ছাড়া তোমাদের মৃত্যু বরণ করা উচিত নয়া।** (রাবী যরত জাবের রাঃ)। অন্য এক হাদীসে রাসূল (সাঃ) বলেনঃ (আল্লাহ্ পাক বলেন), **আমি আমার বান্দার সাথে তেমনি ব্যবহার করি যেমন সে আমার ব্যাপারে ধারণা রাখে।** এ থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্র প্রতি ভালো ধারণা রাখা ফরয এবং খারাপ ধারণা রাখা হারাম। অনুরূপ ভাবে রাসূলের প্রতিও ভালো ধারণা রাখা ফরয এবং খারাপ ধারণা রাখা হারাম। এমনিভাবে যে সব ঈমানদার মুসলমান বাহ্যিক অবস্থার দিক দিয়ে ভালো, চরিত্রবান। যাদের সাথে সবসময় উঠা-বসা এবং মিল মিশ থাকে, তাদের প্রতি ভালো ধারণা রাখা। তাদের সম্পর্কে কোনো প্রমাণ ছাড়া খারাপ ধারণা করা হারাম বা নিষেধ। এ সম্পর্কে রাসূল(সাঃ) বলেনঃ

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ

তোমরা ধারণা থেকে বেঁচে থাকো। কেননা ধারণা বড় মিথ্যা কথা। (রাবী আবু হোবায়রা রাঃ)। এখানে সবার মতেই ধারণা বলতে প্রমাণ ছাড়া মুসলমানদের প্রতি কু-ধারণা বোঝানো হয়েছে। কারও প্রতি অকারণে খারাপ ধারণা পোষণ করা ও কারো সাথে সম্পর্ক নির্ধারণে সব সময় খারাপ ধারণা দিয়েই শুরু করা হতে নিষেধ করা হয়েছে। কিংবা যারা সৎ ও ভদ্রলোক এদের ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করাই পাপ।

২. ওয়াজীব বা জরুরী ধারণাঃ এই প্রকারের ধারণা-অনুমান প্রয়োগ ছাড়া বাস্তব জীবনে কোনই উপায় থাকে না। যেমন-পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ মিমাংসা এবং আদালতে বিচারকের স্বাক্ষীদের স্বাক্ষ্যের উপর প্রবল ধারণার ভিত্তিতে রায় ঘোষণা করা জরুরী। যেখানে আল-কুরআনে কোনো বিধান বা সমাধান উল্লেখ নেই। এসব ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির স্বাক্ষ্য অনুযায়ী কাজ করা বিচারকের জন্য জরুরী। এ লক্ষ্যে স্বাক্ষীর স্বাক্ষের উপর প্রবল ধারণা রাখা ওয়াজিব। এমনিভাবে যেখানে কেবলা কোন্ দিকে জানা থাকে না এবং জেনে নেবার কোনো ব্যবস্থা থাকে না, সেখানে নিজের প্রবল ধারণা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করা ওয়াজিব। আবার কোনো ব্যক্তির উপর কোনো ক্ষতিপূরণ দেয়া ওয়াজিব হলে সেই জিনিসের দাম ধারণার ভিত্তিতে ধার্য্য করে তা বাস্তবায়ন করা জরুরী।

৩. জায়েয ধারণাঃ এই প্রকারের ধারণা অনুমান এমন যা খারাপ মনে হলেও তা জায়েয। যেমন এক ব্যক্তি বা দলের লোকদের চরিত্র, কাজ-কাম, ভূমিকা কিংবা তার লেন-দেন, সম্পর্ক-সম্বন্ধ রক্ষা ও ধরণ-ধারণে এমন সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যার ফলে তার প্রতি ভালো ধারণা করার কোনো বাস্তবতা নেই বরং তার প্রতি খারাপ ধারণা করাই উপযুক্ত কারণ বর্তমান থাকে। এরূপ অবস্থায় তার প্রতি সাদা দিলে ভালো ধারণা রাখতে হবে শরীয়ত এমন কথা বলেনি। তবে এর সীমা আছে। তার ক্ষতি এবং অকল্যাণ হতে বাঁচার জন্যই কেবলমাত্র সতর্কতামূলক খারাপ ধারণা করা জায়েয। যেমন নিজের জিনিস অন্য কাউকে না দেয়া। এর মানে এই নয় যে তাকে চোর মনে করা হচ্ছে।

জায়েয ধারণার আরও উদাহরণ হলো- যেমন নামাজ পড়ার সময় নামাজের রাকায়াতের ব্যাপারে দুই না তিন রাকাত পড়লাম সন্দেহ হলে এ অবস্থায় প্রবল ধারণার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়া জায়েয।

৪. মোস্তাহাব বা উত্তম ধারণাঃ প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি সু ধারণা রাখা উত্তম। এর জন্য সওয়াব পাওয়া যায়। যদি কোনো মানুষের মধ্যে ভাল-মন্দ দু'টোই থাকার সম্ভাবনা থাকে, তবে ভালো দিকটি ধরে নেয়াটাই উত্তম এবং খারাপ দিকটির ব্যাপারে সতর্ক এবং সচেতন থাকা উত্তম।

এসব আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ধারণা-অনুমান কোনো নিষিদ্ধ জিনিস নয়। বরং কোনো কোনো অবস্থায় এটা অত্যন্ত পছন্দনীয় এবং কোনো কোনো সময় এটা জরুরী। আবার কোনো কোনো অবস্থায় তা মোটামুটি যা একটা সীমা পর্যন্ত জায়েয। তারপর আর জায়েয নয় এবং কোনো কোনো সময় তা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এ কারণে কুরআনের এই আয়াতে ধারণাকে একেবারেই নিষিদ্ধ করা হয়নি। বরং বলা হয়েছে বেশী বেশী ধারণা-অনুমান করা পাপ। এতে বোঝা যায় যে, সব ধারণায় পাপ নয়।

পঞ্চম নিষিদ্ধ আচরণঃ وَلَا تَجَسَّسُوْا-তোমরা কারও দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়িও না। আয়াতে দ্বিতীয় এবং দারসের পঞ্চম নিষিদ্ধ আচরণ হলো - تَجَسَّسُوْا অর্থাৎ কারো দোষ-ত্রুটি তালাশ বা খোজা-খুজি করা। এ শব্দে দু'টি উচ্চারণ আছে। একটি لَاتَجَسَّسُوْا 'জীম' সহকারে এবং দ্বিতীয়টি تَحَسَّسُوْا 'হা' সহকারে। বোখারী এবং মুস-লিম শরীফের হাদীসে এ দু'টি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। وَلَاتَجَسَّسُوْا এবং لَاتَحَسَّسُوْا উভয় শব্দের অর্থ কাছাকাছি। সুতরাং একে অপরের দোষ-ত্রুটি তালাশ করে বেড়ানো, কারো অবস্থা এবং কাজ-কামের ব্যাপারে দোষ ধরার উদ্দেশ্যে ওঁত পেতে থাকা। এ ধরনের কাজ মনের

মধ্যে খারাপ ধারণা নিয়ে হোক কিংবা কারো ক্ষতি করার উদ্দেশ্যেই হোক, অথবা কৌতুহল সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই হোক সকল অবস্থায়ই হারাম বা নিষিদ্ধ।

একজন মুমিন মুসলমানের কাজ এটাতো হতে পারে না যে, সে কারো গোপন বা অপ্রকাশ্য কাজ আতি-পাতি করে খুজে বেড়ানো। পর্দার আড়ালে কি আছে তা চোখ পেতে দেখার চেষ্টা করা। কার কতটা দোষ-ক্রটি বা দুর্বলতা আছে তা জানার আপ্রাণ চেষ্টা করা।

ব্যক্তিগত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করাও এর অন্তর্ভূক্তঃ অন্যের চিঠি-পত্র না বলে পড়া, দু'জনের ব্যক্তিগত কথাবার্তা কান পেতে কিংবা আঁড়ি পেতে শোনা, প্রতিবেশীর ঘরে ওঁত পাতা বা চোখ পাতা কিংবা কান পেতে শোনা বিভিন্নভাবে একে অপরের বা স্বামী-স্ত্রীর একান্ত কথা-বার্তা শোনা বা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার-স্যাপার আতি-পাতি করে তালাশ করে বেড়ানো, ঘুমের ভান করে কারও কথা শোনাও অত্যন্ত নিম্ন চরিত্রের লোকদের কাজ। এতে সমাজে নানা ধরনের বিপর্যয় ও অশান্তি সৃষ্টি হয়।

গোপন তথ্য খুঁজে বেড়ানো লোকদের সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) একবার তাঁর বক্তৃতায় বলেনঃ

"হে মুখে মুখে ঈমানের দাবীদারেরা, যাদের অন্তরে একখনও ঈমান প্রবেশ করেনি, তোমরা শুনে রাখো, মুসলমানদের দোষ-ক্রটি খোজা-খুজি করে বেড়িওনা। কেননা, যে ব্যক্তি মুসলমানদের দোষ-ক্রটি তালাশ করে বেড়ায়, আল্লাহ্ নিজেই তার দোষ-ক্রটি প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। আর আল্লাহ্ যার পেছনে লেগে যান, তাকে তার নিজের ঘরেই লাঞ্ছিত করে ছাড়েন।" (আবু দাউদ)

রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দাগিরী নিষেধঃ অপরের দোষ-ক্রটি খোজা-খুজি করে বেড়ানোর কাজ থেকে দূরে থাকা শুধু ব্যক্তির ক্ষেত্রেই করণীয় নয়। বরং ইসলামী রাষ্ট্রের জন্যও এটা করণীয়। ইসলামী শরীয়াত অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করা ও বিরত রাখার দায়িত্ব সরকারের উপর অর্পণ করেছে। কিন্তু এটা অনুমতি দেয়নি যে, সরকারের একটা গোয়েন্দা বিভাগ

গড়ে তুলে নাগরিকদের গোপন দোষ-ত্রুটি খুজে খুজে বের করবে এবং তাদের ধরে ধরে এনে শাস্তি দেবে। বরং সরকারের কাজ হবে নাগরিকদের মধ্যে তাকওয়ার গুণ সৃষ্টি করে তাদেরকে গোপন দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করা। এজন্য শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, উপদেশ, ওয়াজ-নসীহত এবং সাধারণ জনগণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। ভালো কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং মন্দ ও পাপ কাজের পথ বন্দ করে দেওয়ার মাধ্যমে একটি পবিত্র তাকওয়াপূর্ণ সামাজিক পরিবেশ গড়ে তোলার চেষ্টা করা। উদাহরণ হিসেবে দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) এর ঘটনা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই ঘটনায় সরকার এবং নাগরিকদের বিশেষ শিক্ষা রয়েছে। ঘটনাটি হলো "একবার রাতের বেলায় ঘুরতে ঘুরতে হযরত ওমর (রাঃ) এক ব্যক্তির গলার আওয়াজ শোনতে পেলেন। লোকটি নিজের ঘরে বসে গান গাইতেছিলো। গান শুনে তাঁর মনে সন্দেহ জাগলো। তিনি লোকটির প্রাচীরের উপর উঠে বসে নিজ চোখে দেখতে পেলেন ঘরের মধ্যে মদ ও নারী উভয়ই লোকটির পাশে রয়েছে। খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) ডাক দিয়ে বললেনঃ ও হে আল্লাহ্র দুশমন! তুই কি মনে করে বসেছিস যে, তুই আল্লাহ্র নাফরমানী করবি, আর আল্লাহ্ তোর গোপন নাফরমানীর কথা প্রকাশ করে দেবেন না ? একথা শোনে লোকটি জবাব দিলো, আমীরুল মু'মিনীন! খুব তাড়াহুড়ো করবেন না। একটু বুঝতে চেষ্টা করুন, আমি একটা পাপ করে থাকলে আপনি তো এক সাথে তিনটি পাপ করে বসলেন। (এক) আল্লাহ্ অন্যের দোষ-ত্রুটি খুজে বেড়াতে নিষেধ করেছেন, অথচ আপনি তাই করলেন। (দুই) আল্লাহ্র নির্দেশ হলো- অন্যের ঘরে প্রবেশের সময় মূল দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে, অথচ আপনি প্রাচীরের উপর চড়ে বসেছেন। (তিন) আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন, নিজেদের ঘর ছাড়া অন্যের ঘরে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করবে না, অথচ আপনি আমার কাছে অনুমতি না নিয়েই আমার ঘরে চলে এসেছেন ? লোকটির মুখে এ কথাগুলো শোনে হযরত ওমর (রাঃ) নিজের ভুল বোঝতে পেরে ত্রুটি স্বীকার করে নিলেন। ফলে তিনি এই লোকটির বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন না।

অবশ্য তিনি লোকটির কাছ থেকে ভবিষ্যতে ভালো পথে চলার অঙ্গীকার নিলেন। (মাকারীমে আখলাক, আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে জাফর আল-খারায়েতী থেকে বর্ণিত।)

এই ঘটনা থেকে জানা গেলো যে, কেবল ব্যক্তিদের জন্যই নয়, ইসলামী সরকারের জন্যেও জায়েয নয় আতি-পাতি করে খুজে খুজে লোকদের ব্যক্তিগত পাপের সন্ধান করা ও তাদেরকে পাকড়াও করে শাস্তি দেয়া।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ

প্রশাসন কর্তৃপক্ষ যদি জনগণের প্রতি সন্দেহের বশবর্তী হয়ে তাদের দোষ খোজতে শুরু করে, তখন তারা তাদেরকে বিপর্যস্তই করে ছাড়ে। (আবু দাউদ)।

ক্ষেত্র বিশেষে অনুসন্ধান করা জায়েযঃ উপরের অনুসন্ধান করা সংক্রান্ত ব্যাপারে যেসব বিষয় নিষেধ করা হয়েছে এটা ইসলামের সাধারণ নিয়ম। কিন্তু এই সাধারণ নিয়মের কিছু ব্যতিক্রমও আছে। যেখানে খোজ খবর নেবার প্রয়োজন আছে। যেমন যদি কোনো ব্যক্তি বা দলের আচার-আচরণে সমাজে বিপর্যয়ের স্পষ্ট আলামত লক্ষ্য করা যায় এবং তার বা তাদের কোনো অপরাধের মধ্যে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা হয়, তখন সরকার তার বিশেষ গোয়েন্দা বাহিনী দ্বারা তার বা তাদের প্রকৃত অবস্থা বা গতিবিধি জানার জন্য অনুসন্ধান চালাতে পারে। অথবা কোনো পরিবারে বিয়ের প্রস্তাব দিলে কিংবা কারও সাথে যৌথ ব্যবসা-বাণিজ্য করতে ইচ্ছা করলে, তখন সে নিজের প্রতি আস্থা আনার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের সঠিক বিষয় জানার জন্য যাচাই-বাচাই করতে পারে। শরীয়তে এটা নিষেধ করা হয়নি।

ষষ্ঠ নিষিদ্ধ আচরণঃ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا **আর তোমরা একে অপরের গীবত (পরনিন্দা) করো না।** আয়াতের তৃতীয় এবং দারসের সর্বশেষ নিষিদ্ধ বিষয় হলো-গীবত বা পরনিন্দা করা।

গীবত কি ? গীবত হলো কোনো ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে এমন কথা বলা, যা জানতে পারলে সে অসন্তুষ্ট হবে। গীবত সম্পর্কে স্বয়ং নবী করীম (সাঃ) বলেনঃ

ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرُهُ قِيْلَ اَفَرَأَيْتَ اِنْ كَانَ فِىْ اَخِىْ مَا اَقُوْلُ ؟ قَالَ اِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ اَغْتَبْتَهُ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهُ-

গীবত হলো- তুমি তোমার ভাই এর সম্পর্কে এমনভাবে উল্লেখ করবে যে, তা তার অপছন্দ হবে। জিজ্ঞেস করা হলো আমার ভাই এর মধ্যে যদি সেই দোষ পাওয়া যায় যা আমি বলছি। তা হলে (সেটাও কি গীবত হবে) আপনার মত কি ? রাসূল (সাঃ) বললেনঃ তার মধ্যে সেই দোষ যদি পাওয়া যায়, তবেই তো তুমি তার গীবত করলে। আর যদি তার মধ্যে সেই দোষ নাই থেকে থাকে, তা হলে তুমি তো তার উপর মিথ্যা দোষারোপ করলে। (যা আরো কঠিন অপরাধ এবং পাপ কাজ)। (রাবী আবু হুরাইরা (রাঃ)- মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজী)

অত্র হাদীস থেকে জানা গেলো, কারও বিরুদ্ধে তার অসাক্ষাতে মিথ্যা অভিযোগ তোলাকে **বুহতান** বলা হয়। আর তার সত্যিকার দোষের কথা বলাই **গীবত**। এরূপ বলা স্পষ্ট ভাষাতে হোক, কিংবা ইশারা ইংগিতে হোক, উভয় অবস্থায় এটা নিষেধ। অনুরূপ ভাবে এটা ব্যক্তির বেঁচে থাকা অবস্থায় হোক, কিংবা মৃত্যুর পর করা হোক, উভয় অবস্থায় এটা গীবত। এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

এখানে 'অনুপস্থিতিতে' কথা থেকে এরূপ বোঝা ঠিক হবে না যে, ব্যক্তির উপস্থিতিতে মনে কষ্ট দেয়া কথা বলা জায়েয হবে। কেননা এটা গীবত নয়। لَمْز । তথা দোষ বের করার অন্তর্ভুক্ত। সূরা হুমাযায় আল্লাহ্

পাক বলেন- وَيۡلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ **প্রত্যেক পেছনে এবং সামনা সামনি পরনিন্দাকারীর জন্য ধ্বংস**। এতে বোঝা যায় যে ব্যক্তির সামনেও কষ্টদায়ক কথা বলা যাবে না।

ক্ষেত্র বিশেষে গীবত করার অনুমতি রয়েছেঃ কারও অনুপস্থিতিতে বা কারও মৃত্যুর পর তার দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা যদি বাস্তবিকই প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং প্রয়োজনটা শরীয়ত সম্মত হয়, আর সেই প্রয়োজন গীবত ছাড়া পূরণ করা সম্ভব না-ই- হয়। এমনকি গীবত না করলে এর চেয়ে আরও বড় ধরনের ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে সেই গীবত হারাম বলে গণ্য হবে না। নবী করীম (সাঃ) অনুমোদিত গীবত সম্পর্কে একটি নীতি কথা উল্লেখ করে বলেছেনঃ **কোনো মুসলমানের মান-সম্মানের উপর অকারণ ও অন্যায় আক্রমণ খুব নিকৃষ্ট ধরনের বাড়াবাড়ি।** (আবু দাউদ)।

এই কথাটিতে 'অকারণ ও অন্যায়' বলে যে শর্ত আরোপ করা হয়েছে তা হতে স্পষ্টভাবে বোঝতে পারা যায় যে, 'কারণে ও ন্যায় সংগত' হলে গীবত করা যাবে। যেমনঃ

১. যদি কেউ কোনা মজলিশে শরীয়ত বিরোধী কোনো ভুল বা ভিত্তিহীন কথা বলে এবং তার উপস্থিতিতে সংশোধন করার সুযোগ না দিয়েই চলে যায়। তা হলে উপস্থিত সাধারণ মানুষকে ভুল তথ্য থেকে মুক্ত করার জন্য উক্ত ব্যক্তির অনুপস্থিতে ত্রুটি বলা যেতে পারে। তাছাড়া সঠিক ফতোয়া পাবার উদ্দেশ্যে কোনো মুফতীর নিকট সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করা যেতে পারে।

২. বিয়ে-সাদীর ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ে উভয়ের মধ্যে যদি কোনো দোষ-ত্রুটি থাকে তবে তাদের অস্বাক্ষাতে সম্পর্ক সৃষ্টিকারীদেরকে অবহিত করা যেতে পারে। **যেমন একবার ফাতিমা বিনতে কাইস নামে এক মেয়েকে বিবাহ করার জন্য একই সংগে ও একই সময় হযরত মুয়াবিয়া এবং আবুল জাহাম (রাঃ) প্রস্তাব দেন। প্রস্তাব পাবার পর মেয়ে পক্ষের**

লোকেরা নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে পরামর্শ চাইলে তিনি বলেনঃ মুয়াবিয়া গরীব মানুষ। আর আবুল জাহাম স্ত্রীদেরকে খুব মারপিট করে থাকে। (বুখারী মুসলিম)। রাসূল (সাঃ) বৃহত্তর স্বার্থে মেয়েটির ভবিষ্যৎ জীবনের দিকে লক্ষ্য রেখেই তাদের উভয়ের দোষ বলে দেয়া জরুরী মনে করেছিলেন।

৩. স্ত্রী তার যালেম স্বামীর অনুপস্থিতিতে অভিযোগ পেশ করলে গীবত হবে না। **যেমন, এক সময় হযরত আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা নবী করীম (সাঃ) এর কাছে এসে অভিযোগ করলেন, আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ লোক। আমাকে এবং আমার ছেলে-মেয়েদেরকে প্রয়োজনীয় জীবিকা সংগ্রহ করে দেয় না।** (বুখারী মুসলিম)। রাসূল (সাঃ) এটা স্বামীর বিরুদ্ধে গীবত হবার পরেও তাকে এতে বারণ করেননি। কেননা মাযলুম যালেমের বিরুদ্ধে এমন ব্যক্তির কাছে অভিযোগ পেশ করতে পারে যিনি তা দূর করার ক্ষমতা রাখেন।

৪. সংশোধনীর উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তি, শ্রেণী বা গোষ্ঠীর দোষ-ত্রুটি এমন সব লোকের সামনে পেশ করা, যে বা যারা তা দূর করতে পারে বলে মনে করা যাবে।

৫. কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের দুষ্কৃতির ব্যাপারে জনগণকে সতর্ক করে দেয়া, কেউ কারো প্রতিবেশী হিসেবে বসবাস করতে চাইলে বা বাড়ি বাঁধতে চাইলে তার প্রকৃত অবস্থা জানিয়ে দেয়া। অথবা কেউ কারো সাথে যৌথ ব্যবসা-বাণিজ্য করতে চাইলে, কিংবা কেউ কারো কাছে কোনো মূল্যবান আমানত রাখতে চাইলে, বা কেউ ঋণ চাইলে এবং সে কারও পরামর্শ চাইলে, তখন তার ভালো-মন্দ ও দোষ-গুণ যা সে জানে স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া তার করণীয় কর্তব্য। এ জন্য যে, সে না জানার কারণে প্রতারিত না হয়।

৬. অশ্লীল-সন্ত্রাসী এবং শরীয়াতের সীমাংলঘণকারী এবং বিজাতির দোষ-ত্রুটি অস্বাক্ষাতে বলা শুধু জায়েযই নয় বরং জরুরী। যেমন-একবার নবী করীম (সাঃ) আয়েশা (রাঃ) এর ঘরে থাকা অবস্থায় এক ব্যক্তি এসে

স্বাক্ষাতের আবেদন করলো। তখন নবী করীম (সাঃ) আয়েশাকে বললেন, এই লোকটি তার গোত্রের মধ্যে খুব খারাপ লোক। পরে তিনি ঘর থেকে বের হয়ে এসে লোকটার সাথে খুব নম্র ভাবে কথা-বার্তা বললেন। ঘরে ফিরে আসার পর হযরত আয়েশা (রাঃ) রাসূল (সাঃ)কে জিজ্ঞেস করলেনঃ আপনি তো বাইরে যাবার সময় লোকটি সম্পর্কে একথা বললেন, অথচ আপনি তার সাথে খুব ভালোভাবে কথা-বার্তা বললেন? তখন রাসূল (সাঃ) বললেন ঃ-

إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اِتِّقَاءَ فُحْشِهِ-

নিশ্চয়ই মানুষের মধ্যে সেই ব্যক্তি নিকৃষ্ট যার অশ্লীল কথা-বার্তার ভয়ে মানুষ তার সাথে দেখা স্বাক্ষাৎ করা ছেড়ে দেয়। (বুখারী মুসলিম)।

রাসূল (সাঃ) যদি আয়েশাকে একথাটি না বলতেন তাহলে তার সাথে ভালো ব্যবহার দেখে ভবিষ্যতে হয়তো তারা প্রতারিত হতে পারে।

৭. কোনো লোক যদি খারাপ উপনামে বিখ্যাত হয়ে থাকে এমন ভাবে যে, এই নামে ডাকা না হলে তাকে চিনতে পারা যায় না, তবে তাকে সেই উপনামে ডাকা যেতে পারে। তবে হেয় করার উদ্দেশ্যে করা যাবে না। শুধু পরিচিতি দানই হবে তার আসল উদ্দেশ্য। (বায়ানুল কুরআন, রুহুল মায়ানী)।

এসব সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র ছাড়া কারও অনুপস্থিতিতে দোষ-ত্রুটি বলা সম্পূর্ণ নিষেধ বা হারাম। কারো দোষ-ত্রুটি সত্য হলে তা অস্বাক্ষাতে বলা হবে **গীবত** মিথ্যা অভিযোগ ও ভিত্তিহীন হলে তা হবে **বুহতান**। আর দু'ই ব্যক্তিকে পরস্পরের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে হলে তা হবে **চোগলখোরী**।

গীবত শোনাও নিষেধঃ ইসলামী শরীয়াতে গীবত বা পরনিন্দা করা যেমন হারাম, তেমনি গীবত শোনাও হারাম। কেননা উভয়ে একই অপরাধে অপরাধি। হযরত মায়মুনা (রাঃ) বলেনঃ **আমি একদিন স্বপ্নে দেখলাম,**

জনৈক সঙ্গী ব্যক্তির মরা দেহ পড়ে আছে এবং এক ব্যক্তি আমাকে বলছে একে খাও। আমি বললাম একে কেনো খাব ? সে বললোঃ কারণ তুমি অমুক সঙ্গী গোলামের গীবত করেছ। আমি বললাম, আল্লাহ্‌র কসম, আমি তো তার সম্পর্কে কখনোও কোনো ভালমন্দ কথা বলিনি। সে বললোঃ হ্যাঁ, একথা ঠিক। কিন্তু তুমি তো তার গীবত শুনেছো এবং এতে সম্মত হয়েছে। (বাধা দাওনি)। এ ঘটনার পর হযরত মায়মুনা (রাঃ) কখনও কারো গীবত করেননি এবং তার সামনে কারও গীবত করতে দেননি।

সুতরাং প্রতিটি মুমিন মুসলমানের কর্তব্য হবে, যখনই তার সামনে কারো গীবত করা হবে, তখন চুপ করে না শোনে বাধা দেয়া। শরীয়াত সম্মত কারণ ছাড়া কারো দোষ-ক্রটি বর্ণনা করা হতে থাকলে তাকে আল্লাহ্‌র ভয় দেখাতে হবে এবং একাজ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিতে হবে। যদি এতেও সে বিরত না হয়, তা হলে তার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে হবে।

গীবতের পরিণামঃ অতঃপর আল্লাহ্ পাক গীবতের পরিণাম সম্পর্কে বলেনঃ

أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ

তোমাদের মধ্যে এমন কি কেউ আছে, যে তার মরা ভাই এর গোশ্‌ত খাওয়া পছন্দ করবে ? অথচ তোমরা তা ঘৃণা করো। আয়াতের এই অংশে আল্লাহ্ তাআলা গীবত করাকে মরা ভাই এর গোশ্‌ত খাবার সাথে তুলনা করে এ কাজটির জঘন্যতা ও বীভৎসতা প্রকট করে তুলে ধরেছেন। মরা মানুষের গোশ্‌ত খেলে যেমন তার (মৃত্যু ব্যক্তির) কোনো কষ্ট হয় না, তেমনি অনুপস্থিত ব্যক্তি যে পর্যন্ত তার গীবতের কথা না জানে, তারও কোনো কষ্ট হয় না। তাছাড়া মরা দেহকে খেলে যেমন সে প্রতিরোধের সম্মুখীন হয় না, তেমনি গীবত করলেও প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয় না। প্রতিরোধ না থাকার ফলে দীর্ঘসময় ধরে গীবত হতে থাকে এবং এ কারণে এতে মানুষ জড়িয়ে পড়েও বেশী। এসব কারণে গীবতের

নিষিদ্ধতার উপর বেশী জোর দেয়া হয়েছে।

গীবতকারীর পরিণতিঃ "হযরত হাসান ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাঃ) বলেনঃ আমাকে (মে'রাজে) নিয়ে যাওয়া হলে আমি এমন এক দলের পাশ দিয়ে গেলাম যাদের 'নখ' ছিলো তামার। তারা তা দিয়ে নিজের মুখমন্ডল এবং দেহের গোশ্ত আঁচড়াচ্ছিলো। আমি জিব্রাঈল (আঃ)কে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তিনি বললেনঃ এরা তাদের ভাই এর গীবত করতো এবং তাদের ইজ্জতহানি করতো"। (তাফসীরে মায্হারী)

গীবতের গেনাহঃ হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) ও জাবের (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ اَلْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا

গীবত জেনা-ব্যাভিচারের চাইতেও মারাত্মক গোনাহ্। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, এটা কিরূপে? তিনি উত্তরে বললেনঃ এক ব্যক্তি জেনা-ব্যাভিচার করার পর তাওবা করলে তার গুনাহ্ মাফ করা হয়। কিন্তু যে গীবত করে, তার গোনাহ্ যার গীবত করা হয়েছে সে মাফ না করা পর্যন্ত মাফ হয় না। (মাযহারী)

গীবতের গোনাহ্ থেকে মাফ পাবার উপায়ঃ

উপরের এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, গীবতের মাধ্যমে আল্লাহ্ এবং বান্দাহ্র উভয়ের হক (অধিকার) নষ্ট করা হয়। তাই যার গীবত করা হয় তার কাছ থেকে মাফ চেয়ে নেয়া উচিত। কোনো কোনো ওলামায়ে কেরামের মতে, যার গীবত করা হয়, গীবতের সংবাদ তার কাছে না পৌছা পর্যন্ত বান্দাহ্র হক নষ্ট হয় না। তার জন্য তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়া জরুরী নয়। (রুহুল মায়ানী)।

কিন্তু বয়ানুল কুরআনে বলা হয়েছে, গীবতের সংবাদ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কানে না পৌছার কারণে যদিও তার কাছে ক্ষমা চাওয়া জরুরী নয়, কিন্তু যার সামনে গীবত করা হয়, তার সামনে নিজেকে মিথ্যাবাদী বলা এবং নিজের অপরাধ স্বীকার করা জরুরী। যদি সেই ব্যক্তি মারা যায়, কিংবা

লাপাত্তা হয়ে যায় তবে তার কাফ্ফারা হলো, যার গীবত করা হয়েছে তার জন্য আল্লাহ্র কাছে মাগফিরাতের দোআ এভাবে করা যে, **হে আল্লাহ্ আমার ও তার গুনাহ্ খাতা মাফ করে দাও।** হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে-রাসূল (সাঃ) এরূপই বলেছেন।

সর্বশেষে আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ **তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাওবা কবুলকারী মেহেরবান।**

আয়াতের সর্বশেষ অংশে আল্লাহ্ পাক মুমিনদেরকে উপরোক্ত গোনাহ্র কাজ থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ্কেই ভয় করার আহবান জানিয়েছেন। কেননা, যার মধ্যে আল্লাহ্র ভয় থাকবে সে তখন এসব সামাজিক সম্পর্ক বিনষ্টকারী হারাম কাজ হতে দূরে থাকবে। সাথে এও বলা হয়েছে যে, তোমরা যেসব গোনাহ্র কাজ করে ফেলেছো তার জন্য আল্লাহ্র কাছে তাওবা করো। তিনি তোমাদের তাওবা কবুল করবেন। কেননা, আল্লাহ্ পাক তাওবাকারীকে খুব বেশী পছন্দ করেন।

শিক্ষাঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা, সূরা হুজুরাতের আয়াত দু'টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমাদের জন্য বাস্তব জীবনে যেসব শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে তা হলোঃ

❒ কোন পূরুষ অন্য নারীকে তো দূরের কথা বরং এক পুরুষ অন্য পুরুষকে এবং এক নারী অন্য নারীকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ, উপহাস এবং টিট্কারী হতে দূরে থাকবে। কেননা এতে নিজের মধ্যে বড়ত্বের ভাব সৃষ্টি হয় এবং অন্যকে হেয় বা খাটো করা হয়। আর এতে সে মনে কষ্ট পায়।

❒ কেউ কাউকে দোষারোপ বা অভিসম্পাত দেবে না।

❒ লজ্জা বা অপমানবোধ করে এমন উপনামে ডাকা যাবে না। সমাজে দেখা যায় কারো কারো নামের আগে বা পরে এমন বিকৃত উপনাম বা পদবী সংযোগ করে ডাকা হয়, যা শোনতেও খারাপ লাগে। কোনো মু-মিনের পক্ষে এভাবে ডাকা শোভনীয় নয়।

❒ কোনো নব মুসলিমকে তার পূর্বের ধর্মের বা জাতের নামে খোটা দেয়া ঠিক হবে না। ঈমান আনার পর তাকে এভাবে ডাকা বা খোটা দেয়া

ফাসেকী কাজ।

❒ মানুষের প্রতি কু-ধারণা পোষণ না করে, বরং সু-ধারণা রাখা উচিত এবং উত্তম।

❒ দুশ্চরিত্রের লোকের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য সু-ধারণা পোষণ না করে বরং সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। কেননা, অনেক সময় মানুষ সতর্কতার অভাবে বিপদের মধ্যে পড়ে যায়।

❒ অন্যের দোষ-ক্রুটি খোঁজাখুজি করে বেড়া থেকে দুরে থাকতে হবে। কারো যদি কোন দোষ-ক্রুটি নিজের চোখে ধরা পড়ে তবে তাকে সংশোধনের জন্য ইহ্তেসাব করতে হবে। যদি সংশোধিত না হয় তবে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত না হলে তার দোষ গোপন রাখা উত্তম। কেননা কেয়ামতের দিন দোষ গোপনকারীর দোষ আল্লাহ্ও গোপন করে রাখবেন।

❒ কারো অস্বাক্ষাতে গীবত করা যাবেনা এবং গীবত শোনাও যাবে না। কেউ গীবত করেল বাধা দিতে হবে। নয়তো সরে যেতে হবে।

❒ গীবত থেকে বাঁচার জন্য সংশ্লিষ্ট ভাই এর সংশোধনের উদ্দেশ্যে গঠনমূলক ইহ্তেসাব করতে হবে।

❒ যদি কারো গীবত হয়েই যায় তবে নিজের গোনাহ্র জন্য এবং তার মাগফিরাতের জন্য কাফ্ফারা হিসেবে দোআ করতে হবে।

❒ সমাজে বিশৃঙ্খলা এবং মানুষের হক নষ্টের গোনাহ্ থেকে বাঁচার জন্য সদাসর্বদা আল্লাহ্র ভয় দেলের মধ্যে রাখতে হবে।

❒ মানুষ যেহেতু ক্রুটির উর্দ্ধে নয়। এজন্য নিজের গোনাহ্র কথা খেয়াল করে আল্লাহ্র কাছে তাওবা করতে হবে। প্রতিদিন রাসূলের সুন্নত অনুযায়ী কমসে কম ৭০ থেকে ১০০ বার এস্তেগফার করতে হবে।

আহবানঃ প্রিয় দ্বীনি ভায়েরা/বোনেরা! দীর্ঘ সময় ধরে সূরা হুজরাতের দু'টি আয়াতের যে সব বিবরণ এবং ব্যাখ্যা পেশ করলাম। এতে যদি আমার অজান্তে কোনো ভুল-ক্রুটি হয়ে যায়, তার জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর দারস থেকে যেসব শিক্ষা লাভ করলাম তা যেন আমরা বাস্তব জীবনে আমল করতে পারি, সেই তাওফীক কামনা করে দারস শেষ করছি।

পাঁচ

দুনিয়াদারদের প্রতি সতর্ক বাণী

সূরা তাকাছুর

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ- حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ- كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ- ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ- كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ- لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ- ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ

সরল অনুবাদ ঃ ইরশাদ হচ্ছে (১) (হে মানব!) বেশী বেশী ধন-সম্পদ পাবার লোভে তোমাদেরকে (আল্লাহ্‌র ব্যাপারে) গাফেল করে রেখেছে। (২) এমনকি, (এই চিন্তায়)তোমরা কবরের মুখ পর্যন্ত পৌঁছে যাও। (৩) এটা কক্ষনও উচিত নয়। তোমরা খুব শীঘ্রই জানতে পারবে। (৪) অতঃপর এটা কক্ষনও উচিত নয়। তোমরা অতি শীঘ্রই জানতে পারবে। (৫) কক্ষনই নয়; যদি তোমরা (এই আচরণের পরিণতি) নিশ্চিত জানতে, (তা হলে তোমরা এ ধরনের আচরণ কখনই করতে না।) (৬) তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখতে পাবে। (৭) আবার(শোন), তোমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিত সহকারে অবশ্যই তা দেখতে পাবে। (৮) এরপর অবশ্যই সেদিন (বিচারের দিন) তোমাদেরকে এ সব নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থঃ اَلْهٰكُمُ-তোমাদেরকে গাফেল রাখে। تَكَاثُرُ-বেশী বেশী ধন-সম্পদের লোভ বা লালসা। حَتّٰى-যতক্ষণ, এমনকি। -زُرْتُمُ তোমরা পৌছে যাও। مَقَابِرَ -কবরের মুখে । كَلَّا-কক্ষনও নয়। سَوْفَ-অতিসত্তর, শীঘ্রই। تَعْلَمُوْنَ-তোমরা জেনে নেবে বা জানতে পারবে। ثُمَّ-ফের, অতঃপর। لَوْ-যদি। عِلْمَ الْيَقِيْنِ-নিশ্চিত জ্ঞান। لَتَرَوُنَّ -তোমরা অবশ্যই দেখবে বা দেখতে পাবে। -الْجَحِيْمَ জাহান্নামের একটি স্তরের নাম। لَتَرَوُنَّهَا-অবশ্যই তোমরা তা দেখবে বা প্রত্যক্ষ করবে। عَيْنَ চোখে, দৃষ্টিতে। اَلْيَقِيْنِ-দিব্য প্রত্যয়, স্পষ্ট। لَتُسْئَلُنَّ-অবশ্যই তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে। يَوْمَئِذٍ-সেদিন (বিচারের দিন।) عَنِ-সম্পর্কে। اَلنَّعِيْمِ। নেয়ামত বা অনুগ্রহ ।

সম্বোধনঃ উপস্থিত প্রিয় দ্বিনদার ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ভায়েরা/ বোনেরা! আস্‌সালামু আলাইকুম অয়া রাহমাতুল্লাহি অয়া বরাকাতুহ্। আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কালামে হাকীমের ছোট্ট সূরা সমূহের মধ্যে সূরা তাকাছুর তেলাওয়াত এবং সরল অনুবাদ পেশ করেছি। আল্লাহ্ পাক যেনো আমাকে শেষ পর্যন্ত সঠিক ভাবে দারস পেশ করার তাওফীক দান করেন। **অমা তাওফীকি ইল্লাহ্ বিল্লাহ।**

সূরার নামকরণঃ সূরায় উল্লেখিত প্রথম আয়াতের (আত্‌তাকাছুর) শব্দটিকেহ্ প্রতিকি বা চিহ্ন হিসেবে নামরূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

সূরাটি নাযিলের সময় কালঃ আবু হাইয়্যান ও শওকানী বলেন, সকল মুফাস্‌সেরীনদের মতে এই সূরাটি মাক্কী। ইমাম সুয়ূতী (রঃ) বলেন, সব চেয়ে বেশী পরিচিত কথা হলো এই যে, এটি মাক্কী সূরা। তবে হাদীসের কোনো কোনো বর্ণনায় একে মদীনায় অবতীর্ণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

তথাপিও অধিকাংশ মুফাস্‌সেরীন এই সূরাটি মাক্কী হওয়ার ব্যাপারে একমত। এই তাফসীরকারকদের মতে সূরা 'তাকাছুর কেবল যে মক্কায় নাযিলকৃত সূরা তাই নয়, বরং এর বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য এবং এর বাচনভঙ্গি হতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এটি মক্কার প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরা সমূহের অন্যতম।

সূরাটির বিষয়বস্তুঃ মানুষ দুনিয়ার জিনাত বা সৌন্দর্যে এবং বৈষয়িক দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বেশী বেশী ধন-সম্পদ, মান-সম্মান লাভের আশায় এবং ভোগ বিলাসে এমন ভাবে মত্ত হয়ে পড়ে যে, একে অপরকে প্রতিযোগীতায় ছাড়িয়ে যাবার জন্য মাতুয়ারা হয়ে যায়। আর এসব জিনিস লাভ করে গর্ব-অহংকারে ফেটে পড়ে। তারা একক এই চিন্তায় এমন ভাবে মশগুল হয়ে পড়ে যে, শেষ পর্যন্ত তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে বেখেয়াল হয়ে যায়। তাদের এই চিন্তার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে এই সূরায় সতর্ক করা হয়েছে। এই সাবধানতার পর তাদেরকে এও সতর্ক করে দেয়া হয়েছে, তোমরা আল্লাহ্ পাকের অগনিত নেয়ামত ভোগ-ব্যবহার করছো, এগুলো তোমাদের পরীক্ষাও বটে। কিয়ামতের দিন তোমাদের কাছ থেকে প্রতিটি নেয়ামতের পাই পাই হেসাব নেয়া হবে।

ব্যাখ্যাঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত সূরা 'তাকাছুর'এর গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিবরণ পেশ করলাম। এখন আপনাদের সামনে সূরাটির বিভিন্ন শব্দ এবং আয়াতের ব্যাখ্যা পেশ করছি। আল্লাহ্ পাক সূরার প্রথমেই বলেনঃ

أَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ "বেশীবেশী ধন-সম্পদ লাভের লালসা তোমাদেরকে গাফেল করে রেখেছে।" প্রথম আয়াতের এই শব্দ দু'টির অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক, যা তার অন্তর নিহিত সব কথার তরজমা একটিমাত্র বাক্যে প্রকাশ করা খুব কঠিন ব্যাপার।

أَلْهٰكُمُ এর মূল রুট হলো لَهْوٌ যার অর্থ গাফলতি, বে-খেয়ালী,

আত্মভোলা। কিন্তু আরবী ভাষায় এই শব্দটি বলা হয় এমন প্রতিটি ব্যস্ততা বোঝানোর জন্যে যার প্রতি মানুষ গভীরভাবে আকৃষ্ট হয় এবং তার আকর্ষণে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বা বিষয় হতে সম্পূর্ণ বে-খেয়াল হয়ে পড়ে। এ থেকে أَلْهٰكُمُ শব্দ বানালে এর তাৎপর্য হবে-কোনো বিশেষ বে-খেয়ালী তোমাদেরকে এমনভাবে গ্রাস করে ফেলেছে যে, তার চেয়ে আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের প্রতিও তোমাদের খেয়াল থাকে না। তোমাদের ঘাড়ের উপর যেনো সেই জিনিসের ভূত সওয়ার হয়ে আছে। তার চিন্তা-ভাবনায় তোমরা দিন-রাত মশগুল হয়ে থাকো। আর মানসিকভাবে তোমরা এমন ভাবে জড়িয়ে গিয়েছো যে, তোমাদেরকে একেবারে গাফেল বানিয়ে দিয়েছে।

تَكَاثُرُ এর মূল রুট كَثْرَتٌ এর তিনটি অর্থ ঃ

এক. অতিমাত্রায় বেশী বেশী লাভ করার চেষ্টা-তদবীরে লেগে থাকা।

দুই. অতি মাত্রায় বেশী বেশী লাভের জন্যে পরস্পরে প্রতিযোগীতা করা এবং একে অপরকে পেছনে ফেলে দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা-ফেকের করা।

তিন. একে অপরের তুলনায় বেশী পাবার কারণে এই বলে গর্ববোধ করা যে, সে অন্যদের চেয়ে অনেক বেশী লাভ করেছে।

সুতরাং أَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ আয়াতের অর্থ হলোঃ বেশী বেশী পাবার চিন্তা তোমাদেরকে এমনভাবে মশগুল করে ফেলেছে যে, ওর নেশায় তোমাদেরকে তার চেয়েও বেশী গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হতে গাফেল ও বে-খেয়াল করে দিয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার এই আয়াত তেলাওয়াত করে বললেনঃ এর অর্থ হলো"হারাম পথে সম্পদ যোগাড় করা এবং আল্লাহ্র নির্ধারিত খাতে ব্যয় না করা"। (কুরতবী)।

আয়াতে কোন্ জিনিস পাবার লোভের কথা বলা হয়েছে ?

আয়াতে দুনিয়ার সব জিনিসের সুযোগ-সুবিধা, স্বার্থ, বিলাস-সামগ্রী, স্বাদ-আস্বাদনের উপায়-উপকরণ এবং শক্তি ও ক্ষমতার উৎস বেশী বেশী লাভ করার চেষ্টা সাধনা করা। তা লাভের জন্যে প্রতিযোগীতায় অন্যদের চেয়ে বেশী এগিয়ে যাবার চেষ্টা করা এবং অন্যদের চেয়ে বেশী পাবার জন্য গর্ববোধ করার কথা বলা হয়েছে।

আয়াতে কাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে ?

আয়াতে বেশী বেশী দুনিয়ার স্বার্থ লাভ এবং সেই জিনিস পাবার জন্যে প্রতিযোগীতায় নেমে পড়া, অন্যদের তুলনায় বেশী লাভের জন্য গর্ববোধ করার এই কথা বিশেষ কোনো ব্যক্তিকে বলা হয়নি। বরং প্রত্যেক ব্যক্তি এবং জাতিকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে।

আয়াতে কিসে থেকে গাফেলের কথা বলা হয়েছে ?

আয়াতে মানুষকে বেশী বেশী প্রাচুর্য লাভের নেশা গাফেল করে দিয়েছে বলা হয়েছে। কিন্তু কিসে থেকে গাফেল করে দেয়া হয়েছে তা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। ফলে এর তাৎপর্য অত্যন্ত ব্যাপক। "তাকাছুর" বেশী বেশী পাবার লোভ এমন প্রতিটি জিনিস হতে তাদেরকে গাফেল করে দিয়েছে যা তার তুলনায় বেশী গুরুত্বপূর্ণ। যেমন তাদেরকে আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগী, আইন-বিধান কায়েমের ব্যাপারে গাফেল করে রেখেছে, পরকালের জবাবদিহি এবং তার পরিণতির ব্যাপারে গাফেল করে রেখেছে, নৈতিক সীমা ও নৈতিক দায়-দায়িত্বের দিক দিয়েও গাফেল রেখেছে। হকদারের হক এবং তা ঠিকঠিক ভাবে আদায় করার ব্যাপারেও তারা গাফেল রয়েছে। নিজের জীবনের মান উন্নত করার চিন্তা-ভাবনায় তারা মশগুল। কিন্তু মনুষ্যত্বের মান যে কতখানি নীচে নেমে গেছে, তার চিন্তা থেকেও তারা গাফেল হয়ে পড়েছে। গাড়ী-বাড়ি, টাকা-কড়ি, ধন-সম্পদ কেমন করে বেশী বেশী কামায় করা যায় সেই চিন্তায় তারা দিশেহারা। কিন্তু কোন্ উপায়ে পাওয়া যাবে, আবার সেই উপায়গুলো হালাল না হারাম সে ব্যাপারে তাদের কোনই চিন্তা-বিবেচনা নেই।

আনন্দ-ফূর্তি, সুখ-শান্তি এবং দৈহিক স্বাদ-আস্বাদনের উপায় উপকরণ তাদের পেতে হবে, কিন্তু এর পরিণাম যে কতো ভয়াবহ সে ব্যাপারেও তারা গাফেল হয়ে পড়েছে। এক দেশ আর এক দেশের চেয়ে বেশী বেশী শক্তি, সৈন্য-সামন্ত এবং অত্যাধুনিক মারনাস্ত্র সংগ্রহের জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে, এ জন্যে তারা চরম প্রতিযোগীতায় নেমে পড়েছে। শক্তিধর দেশের তালিকায় নাম লেখার জন্যে এ্যাটম বোমার পর আনবিক ও রাষায়নিক বোমা পরীক্ষার মহড়ায় আত্মনিয়োগ করেছে। কি করে বেশী বেশী অস্ত্র সংগ্রহ করা যায়, তার জন্য দিন-রাত মশগুল ও পেরেশান হয়ে আছে। কিন্তু এসবের দ্বারা আল্লাহ্‌র এই জমীনে ব্যাপক যুলুম-নির্যাতনে 'যে কতো বনি আদম ধ্বংস হয়ে মানবতা ভুলণ্ঠিত হচ্ছে, সেই কথা একবারেও তাদের মনের মধ্যে উদয় হয় না। এক কথায় 'তাকাছুর'. বেশী বেশী পাবার লোভ অনেক রকমের, অনেক ধরনের ও নানা রূপের এবং তা দুনিয়ায় ব্যক্তি, জাতি, গোষ্ঠী ও দেশ সকল বিষয়ই এর মধ্যে নিহিত রয়েছে। ফলে দুনিয়া-দুনিয়ার স্বার্থ ও সুখ-শান্তির উর্ধে অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের প্রতিও তাদের এক বিন্দু ভ্রুক্ষেপ নেই। অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ **এমনকি, তোমরা কবরের মুখ পর্যন্ত পৌঁছে যাও।** এখানে কবর পর্যন্ত পৌঁছে যাও অর্থ মরে কবরে পৌঁছা। অর্থাৎ তোমরা নিজেদের গোটা জীবনটায় এই চিন্তায় কাটিয়ে দাও এবং মরার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তোমরা এই চিন্তা থেকে অবসর পাওনা। এর তাফসীর প্রসঙ্গে মহানবী (সাঃ) এক হাদীসে বলেনঃ حَتّٰى يَأْتِيَكُمُ الْمَوْتُ **এমনকি তোমাদের মরণ এস যায়।** (ইবনে কাসীর) সুতরাং আয়াতের মর্মার্থ হলো, এই ধন-সম্পদের প্রাচুর্য অথবা ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও বংশ গোত্রের বড়াই তোমাদেরকে গাফেল ও উদাসীন করে রাখে। নিজেদের পরিনতি ও পরকালের হেসাব-নেকাশের কোনো চিন্তা তোমরা করো না। আর এমনি অবস্থায় তোমাদের মরণ

এসে হাজির হয়ে যায়। আর মরণের পর তোমরা কঠিন আযাবে গ্রেফতার হয়ে যাও।

হযরত আবদল্লাহ্ ইবনে শিখ্খীর (রাঃ) বলেনঃ আমি এক দিন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) -এর দরবারে হাজির হয়ে দেখলাম, তিনি " اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ "

তেলাওয়াত করে বললেনঃ "মানুষ বলে আমার ধন, আমার ধন, অথচ তোমার অংশ তো ততটুকুই যতটুকু তুমি খেয়ে শেষ করে ফেলো কিম্বা (পোশাক)পরে ছিঁড়ে ফেলে দাও অথবা সদ্কা করে (আখেরাতের জন্য) সামনে পাঠিয়ে দাও। এছাড়া যা আছে, তা হাত থেকে চলে যাবে তুমি অপরের জন্যে ছেড়ে চলে যাবে। [ইবনে কাসীর (তিরমিযী, আহমদ ।)] অন্য এক হাদীসে হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ

আদম সন্তান যদি দুই উপত্যকা পরিমান ভর্তি সম্পদ পায়, তবুও সে তৃতীয় উপত্যকা কামনা করবে। আদম সন্তানের পেট মাটি ছাড়া অন্য কোনো কিছু দিয়ে ভর্তি করতে পারে না। (বুখারী)।

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, মানুষ দুনিয়াতে এমন ভাবে মত্ত হয়ে আছে যে, আল্লাহ্ এবং আখেরাতের জবাব দিহীতাকে বিলকুল ভুলে গিয়ে হায়াতের এই জিন্দেগীটুকু ফুরিয়ে ময়ূত এসে হাজির হয়ে যাবে।

এই জন্য আল্লাহ্ পাক সন্তান-সন্ততি এবং ধন-সম্পদকে ফেৎনা বা পরীক্ষা বলে উল্লেখ করে বলেনঃ

اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ **নিশ্চয় তোমাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি ফেৎনা বা পরীক্ষার বস্তু।** (তাগাবুন ১৫) সুতরাং এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ পাক মুমিনদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ-

হে মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততির (মহব্বত) যেনো তোমাদেরকে আল্লাহ্র স্মরণ থেকে গাফেল করে না দেয়। যারা এ কারণে গাফেল হবে, তারাই হবে (আখেরাতে) ক্ষতিগ্রস্ত। (মুনাফিকুন-৯) অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ **কক্ষনই নয়। অতি শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে।** আয়াতে দুনিয়াদার লোকদের সতর্ক করে বলা হয়েছে, আসলে তোমরা মস্ত বড় ভুলের মধ্যে পড়ে আছো। তোমরা মনে করে নিয়েছো যে, দুনিয়ার এই অর্থ-কড়ি, গাড়ী-বাড়ি, ধন-দৌলতের প্রাচুর্যের বিপুলতা এবং আরও বেশী বেশী লাভ করতে পারা-ই-বুঝি প্রকৃত উন্নতি এবং সফলতা। অথচ এটা কখনই প্রকৃত উন্নতি এবং সফলতা নয়। দুনিয়ার এই চমক লাগানো উন্নতি ও সফলতার পরিণতি যে কতো মারাত্মক ও ভয়াবহ তা তোমরা খুব শীঘ্রই জানতে পারবে। তাছাড়া তোমরা যে, কতো বড় ভুল ও মারাত্মক বিভ্রান্তির মধ্যে জীবন অতিবাহিত করছো তা তোমাদের কাছে খুব তাড়াতাড়ি পরিস্কার হয়ে যাবে।

سَوْفَ **অতি তাড়াতাড়ি** বলতে পরকালও হতে পারে আবার মরণও হতে পারে। কেননা মানুষের মরণ যে কোনো মুহূর্তে ঘটে যেতে পারে। সুতরাং এটা মানুষের জন্য অতি নিকটে। আবার প্রতিটি মানুষ মরার সাথে সাথে জানতে পারবে, দুনির জীবনের ভোগ-বিলাস এবং ব্যস্ততা তার জন্য পরম সৌভাগ্যের বিষয় ছিলো, না তার জন্যে চরম দুর্ভোগের কারণ ছিলো ?

ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ **আবার (শোন) কক্ষন-ই-নয়। তোমরা অতি শীঘ্রই জানতে পারবে।** এই আয়াতে পূর্বের বিষয়গুলো যে অতি গুরুত্বপূর্ণ তা মানুষের মনের মধ্যে গেঁথে দেবার জন্যে এবং আরও বেশী সতর্ক করার জন্য-ই পুনরায় একই কথা রিপিটেসান (পুনরাবৃত্তি) করা হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ

"কক্ষন-ই নয় যদি তোমরা নিশ্চিত জানতে।" আয়াতে لَوْ এর জবাব এখানে উহ্য আছে। অর্থাৎ أَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা যদি কেয়ামতের হেসাব-নেকাশে দৃঢ় বিশ্বাসী হতে, তবে কখনও তোমরা তোমাদের ধন-দৌলত টাকা-পয়সা গাড়ী-বাড়ির বড়াই করতে না এবং আল্লাহ্ এবং পরকালের হেসাব-নেকাশ সম্পর্কে একেবারেই গাফেল বা উদাসীন হতে না। অতঃপর আল্লাহ্পাক তাদের পরিণতি সম্পর্কে বলেনঃ

لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ- **তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে।**

আয়াতে এখানে যারা দুনিয়াদারীতে মাতুয়ারা হয়ে যায় এবং আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান থেকে দূরে সরে যায়, আখেরাতে তাদেরকে তাঁরই সামনে হাজির হতে হবে এবং তাঁর কাছেই জবাবদিহী করতে হবে, এই অনুভূতিটুকুও জাগে না, তাদেরই সাথে জাহান্নামের স্বাক্ষাৎ ঘটবে। অর্থাৎ তাদেরকে জাহান্নামের একটি স্তর 'জাহীম' নামক দোযখে অবস্থান করতে হবে। অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ **অতঃপর তোমরা নিশ্চিত সহকারে সরাসরি দেখতে পাবে।** عَيْنَ الْيَقِيْنِ এর অর্থ-সেই প্রত্যয় বা বিশ্বাস, যা চাক্ষুষ দেখার মাধ্যমে অর্জিত হয়। এটা বিশ্বাসের সর্বোচ্চ পর্যায়। না দেখে বিশ্বাস, আর সরাসরি দেখে বিশ্বাস-এর মধ্যে পার্থক্য আছে। যেমন- উদাহরণ হিসেবে বলা যায় হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ মূসা (আঃ) যখন তুর পাহাড়ে (৪০দিন) অবস্থান করছিলেন, তখন আল্লাহ্ তাআলা তুর পাহাড়েই তাকে (অহীর দ্বারা) অবহিত করেছিলেন যে, বনী ইসরাঈলেরা গরুর বাছুরের পূজায় জড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু "মূসা (আঃ)-এর মধ্যে" এ বিষয়ে তেমন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি, যেমন ফিরে এসে স্বচক্ষে দেখার পর (প্রতিক্রিয়া) দেখা দিয়েছিলো। তিনি তাদের এই আচরণে রাগে তওরাতের তক্তিগুলো (যাতে তাওরাত লেখা ছিলো) হাত থেকে ফেলে দিয়েছিলেন" (মাযহারী)।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক তাঁর নেয়ামতের বিষয়ে বলতে গিয়ে বলেনঃ

ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ

অতঃপর সেই (বিচারের) দিন তোমাদেরকে প্রতিটি নেয়ামতের (ব্যবহার) সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সূরার সব শেষ আয়াতে আল্লাহ্র নেয়ামত বা অনুগ্রহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে এটা মনে করা ঠিক হবে না যে, যেহেতু আগে জাহান্নামে যাবার কথা বলা হয়েছে বিধায় জাহান্নামে যাবার পরই বুঝি নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, আসলে তা নয়। এই জিজ্ঞাসাবাদ তো হাশরের মাঠে আল্লাহ্র আদালতের হেসাব নেবার সময় অনুষ্ঠিত হবে। তা হলে কথার অর্থ মোটামুটি এই দাঁড়ায়, তোমাদের এই সংবাদ দিচ্ছি যে, এই নেয়ামত বা অনুগ্রহ সমূহ সম্পর্কে তোমাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

মুমিন কাফের সকলকে নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবেঃ

নেয়ামতের জিজ্ঞাসাবাদ সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) এর যে সব হাদীস বর্ণিত হয়েছে তাতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তাআলা দুনিয়ায় মানুষকে যেসব নেয়ামত দান করেছিলেন, সেই সব বিষয়ে মু'মিন ও কাফের সকলকেই আল্লাহ্র দরবারে জবাবদিহি করতে হবে। তবে যারা আল্লাহ্র প্রতি অকৃতজ্ঞতা দেখায়নি, বরং শোকর গোজার হয়ে জীবন অতিবাহিত করেছে, এই জিজ্ঞাসাবাদে তারা পুরোপুরি উত্তীর্ণ হবে। অপর পক্ষে যারা আল্লাহ্র এই নেয়ামত সমূহের হক আদায় করেনি, তা যথাযথ ভাবে ব্যবহার করেনি এবং কথায় -কাজে আল্লাহ্র নাশোকরি করেছে, তারা এই জবাবদিহি হতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যাবে। হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবর নবী করীম (সাঃ) আমাদের ঘরে আসলেন। আমরা তাঁকে সদ্য তোলা টাট্কা খেজুর খেতে দিলাম এবং ঠান্ডা পানি পান করতে দিলাম। তখন নবী করীম (সাঃ) বললেন, "এটা সেই নেয়ামত যে বিষয়ে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে। (মুসনাদে আহমদ, নাসায়ী, বায়হাকী।)

অপর হাদীসে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ "নবী করীম (সাঃ)

হযরত আবু বকর ও হযরত ওরম (রাঃ)-কে বললেনঃ চলো আমরা আবুল হাই সাম ইবনে তীহান আনসারীর ঘরে যাই। তিনি তাঁদেরকে সাথে নিয়ে ইবনে তীহানের খেজুর বাগানে হাজির হলেন। ইবনে তীহান এক ছড়া খেজুর তাঁদের সামনে এনে রাখলেন। নবী করীম (সাঃ) বল-লেনঃ তুমি কেনো নিজে খেজুরগুলো ছড়া থেকে ছিড়ে আনলেনা ? তিনি জবাব দিলেন, আমি চাই আপনারা নিজেরাই বেছে বেছে নিজ হাতে ছিঁড়ে খান। অতঃপর তাঁরা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেজুর খেলেন এবং ঠান্ডা পানি পান করলেন। খেয়ে-দেয়ে নবী করীম (সাঃ) বললেনঃ "যার হাতে আমার জীবন তাঁর কসম করে বলছি, এই নেয়ামতগুলো সম্পর্কে তোমাদেরকে কেয়ামতের দিন জবাবদিহি করতে হবে-এই শীতল ছায়া, এই ঠান্ডা পানি।"(মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী)। হাদীসের এসব বর্ণনা থেকে অকাট্য ভাবে জানা যায় যে, আল্লাহ্র দেয়া নেয়ামতসমূহ সম্পর্কে কেবল কাফেরদের কাছেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না, বরং নেক্কার মুমিনদেরকেও এই বিষয়ে জবাবদিহি করতে হবে।

কোন্ কোন্ নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ?

মানুষকে দেয়া আল্লাহ্র নেয়ামতের কোনো সীমা সংখ্যা বা পরিমাণ নেই। তবে তার মধ্যে কিছু নেয়ামতের কথা আল্লাহ্পাক আল-কুরআনে উল্লেখ করে বলেনঃ

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

এতে মানুষের শ্রবনশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও হৃদয় সম্পর্কিত লাখো নেয়ামত অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়, যেগুলো সে প্রতি মুহূর্তে ভোগ ব্যবহার করে।

আবার অনেক নেয়ামত এমন আছে যা মানুষের জানা নেই। তার পরিমাণ বা সংখ্যা শুধু নয় তার অস্তিত্ব সম্পর্কেও মানুষ অবহিত বা সচেতন নয়। আল্লাহ্পাক বলেনঃ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا

তোমরা যদি আল্লাহ্র নেয়ামত সমূহ গুনতে চাও, তবে তা তোমরা

শুনে শুনে কিছুতেই শেষ করতে পারবে না। (ইব্রাহীম-৩৪)

নেয়ামতের প্রকারঃ আল্লাহ্‌র নেয়ামত সমূহের মধ্যে অনেক নেয়ামত এমন- যা আল্লাহ্ তাআলা নিজ হতেই সরাসরিভাবে মানুষকে দান করেছেন। যেমন মানুষের দেহের কাঠামো এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, আসমান, জমীন এবং মাটির নীচের নেয়ামত সমূহ। আর অনেক অনেক নেয়ামত এমন যা মানুষ তা উপার্জনের মাধ্যমে অর্জন করে। যেমন জ্ঞান বিজ্ঞান, ধন-সম্পদ, প্রযুক্তি ইত্যাদি।

মানুষের অর্জিত নেয়ামত সমূহ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে সে তা কোন্ পথে বা পন্থায় আয়ত্ব করেছে এবং কোন্ পথে ও খাতে তা ব্যয়-ব্যবহার করেছে ? আর আল্লাহ্‌র সরাসরি দেয়া নেয়ামত সমূহ সম্পর্কে হেসাব দিতে হবে- সেগুলোকে সে কিভাবে কাজে লাগিয়েছে ও ভোগ-ব্যবহার করেছে এবং কোন্ কাজে ব্যয়-খরচ করেছে? মোট কথা সকল প্রকারের নেয়ামত সম্পর্কেই মানুষকে কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র দরবারে পুঙ্খানু-পুঙ্খভাবে জবাবদেহী করতে হবে।

নেয়ামত সমূহের শোকরিয়া আদায়ের পদ্ধতিঃ আল্লাহ্ তাবারাক ওয়াতাআলা আশ্‌রাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ জাতির ভোগ-ব্যবহার এবং কল্যাণের জন্যেই অসংখ্য নেয়ামত দান করছেন। সাথে সাথে কেয়ামতের হেসাবের দিন প্রতিটি নেয়ামতের শোকরিয়া আদায় করেছে কি না সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। সুতরাং মানুষের জানা থাকা জরুরী যে কিভাবে সে তার শোকরিয়া আদায় করবে। নেয়ামতের শোকরিয়া আদায় তিনটি পদ্ধতিতে করা যায়।

প্রথম পদ্ধতি হলো ইলম বা জ্ঞান ঃ শোকরিয়া আদায় করতে হলে প্রথমেই মানুষের মধ্যে সেই ইলম বা জ্ঞানটুকু থাকতে হবে যে আল্লাহ্‌র নেয়ামতগুলো কি কি এবং কোন্‌টা কিভাবে ব্যয়-ব্যবহার খরচ এবং প্রয়োগ করতে হবে ? এজন্যই ইলমের প্রয়োজন। রাসূল (সাঃ) জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন ঃ

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمِيْنَ (وَفِىْ رِوَيَةٍ) مُسْلِمٰتٍ

প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ (অন্য বর্ণনায় আছে)এবং নারীর জন্য জ্ঞান অর্জন করা ফরয।

দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো আমল ঃ বাস্তব জেন্দেগীতে তা প্রয়োগ করতে হবে। নেয়ামত সমূহের জ্ঞান এবং ব্যয়-ব্যবহার ও প্রয়োগের জ্ঞান লাভের পর তা দুনিয়ার জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে। জানার পর আমল না করা আরো মস্তবড় অপরাধ। যারা মুখে বলে কিন্তু কাজে করে না তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ-

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ-

তোমরা যা কারো না, তা বলা আল্লাহ্র কাছে খুবই অপছন্দনীয়। (সফ্ফ-৩)

তৃতীয় পদ্ধতি হলোঃ নেয়ামতের জ্ঞান অর্জন এবং আমল বা বাস্তব জীবনে প্রয়োগের সময় তার টার্গেট থাকবে একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। নেয়ামতের শোকরিয়া আদায়ের সময় দুনিয়ার খেয়াল-খুশি থাকবে না। থাকবে না কোনো গর্ব-অহংকার। বরং অত্যন্ত বিনয়, নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তা বাস্তব জীবনে ব্যয়-ব্যবহার এবং প্রয়োগ করতে হবে। কেননা কেয়ামতের দিন হেসাব-নেকাশ নেবার সময় আল্লাহ্ পাক মানুষের দু'টি বিষয়কেই একমাত্র গুরুত্ব দেবেন যেমন- রাসূল (সাঃ) বলেনঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلٰى صُوَرِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَلٰكِنْ يَّنْظُرُ اِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ

নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা কেয়ামতের (হেসাব-নেকাসের) দিন তোমাদের চেহারার রূপ সৌন্দর্য ও ধন-সম্পদের দিকে লক্ষ্য করবেন

না বা গুরুত্ব দেবেন না, বরং তিনি তোমাদের অন্তরের নিয়াত ও নিষ্ঠা এবং আমল বা কার্যক্রমের দিকে লক্ষ্য করবেন বা গুরুত্ব দেবেন। [আবু হুবাইয়া রাঃ (মুসলিম)]।

প্রকৃত শোকরিয়া আদায়ঃ আল্লাহ্‌র নেয়ামতের প্রকৃত শোকরিয়া আদায় হলো, আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান মেনে চলে, সেই প্রকৃত আল্লাহ্‌র নেয়ামতের শোকরিয়া আদায় করে; আর যে আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান মেনে চলে না, সে আল্লাহ্‌র নেয়ামতের শোকরিয়া আদায় করতে পারে না। আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

وَاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ

যদি তোমরা আল্লাহ্‌রই ইবাদত করে থাকো, তা হলে তাঁর নেয়ামতের শোকর গোজার করো। (নাহল-১১৪)। কিন্তু আল্লাহ্‌র নেয়ামতের প্রকৃত শোকরিয়া আদায়কারী লোকের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। আল্লাহ্ পাক বলেনঃ قَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ

বলুন, (হে রাসূল) আসলে কৃতজ্ঞ বান্দার সংখ্যা খুবই কম।

সুতরাং নেয়ামতের বিস্তারিত আলোচনায় এটাই বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ পাকের প্রতিটি নেয়ামতের শোকরিয়া আদায় করতে হলে সমাজে আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান তথা আল-কুরআনের আইন চালু থাকতে হবে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা ছাড়া কোনো ভাবেই আল্লাহ্‌র নেয়ামতের প্রকৃত শোকর গোজারী হওয়া সম্ভব নয়। এজন্য যেখানে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা চালু নেই সেখানে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য জান-প্রাণ এবং ধন-সম্পদ দিয়ে জিহাদ বা সংগ্রাম, আন্দোলন করা সব ফরজের বড় ফরজ।

শিক্ষাঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! সূরা তাকাছুরের বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে যেসব শিক্ষা পাওয়া যায় তা হলো ঃ

❑ দুনিয়াকে ভোগের স্থান বানানো যাবে না, বরং আখেরাতে নাজাতের ক্ষেত হিসেবে কাজে লাগাতে হবে।

❒ ধন-সম্পদের প্রাচুর্য গড়ার জন্য আত্মনিয়োগ করা যাবে না।

❒ একটার পর আর একটা গাড়ী-বাড়ীর মডেল চেঞ্জ করার প্রতিযোগিতায় নামা যাবে না।

❒ আল্লাহ্ যদি নেয়ামত হেসেবে বৈধ পথে অর্থ-সম্পদ দান করেন তার জন্য গর্ববোধ না করে বরং আল্লাহ্র বেশী বেশী খরচ করতে হবে এবং শোকরিয়া আদায় করতে হবে।

❒ দুনিয়ার আকর্ষণে ভুলে গিয়ে দুনিয়ায় ডুবে যাওয়া যাবে না। নৌকা যেমন পানির উপর দিয়ে চলে কিন্তু ডুবে যায় না। তেমনি মানুষকে দুনিয়াতেই চলতে হবে, ডুবে যাওয়া যাবে না। নৌকা যেমন পানিতে ডুবে গেলে ধ্বংস হয়ে যায়, তেমনি মানুষও যদি দুনিয়ায় ডুবে যায় তবে তারও ধ্বংস অনিবার্য।

❒ হালাল বা বৈধ পথে আয়-উপার্জন করতে হবে এবং বৈধ ও কল্যাণকর কাজে ব্যয় করতে হবে।

❒ দুনিয়ার সফলতা প্রকৃত সফলতা নয় বরং আখেরাতের সফলতাকেই প্রকৃত সফলতা মনে করতে হবে।

❒ আল্লাহ্র ভয় সবসময় দেলের মধ্যে রাখতে হবে এবং মরণকে স্মরণ রাখতে হবে।

❒ আল্লাহ্র নেয়ামতের শোকরিয়া আদায়ের জন্য জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে বাস্তব জীবনে তা আমল করতে হবে।

❒ নেয়ামতের প্রকৃত শোকর গোজারী হবার জন্য আল্লাহ্র প্রতিটি বিধি-বিধান ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে মানার জন্য আল্লাহ্র এই জমীনে আল্লাহ্র দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরীক থাকতে হবে।

❑ সুখে-দুঃখে সকল অবস্থায় আল্লাহ্‌র শোকরিয়া আদায় করতে হবে সরাসরি আল্লাহ্‌র দেয়া নেয়ামত হোক অথবা মানুষের অর্জিত নেয়ামত হোক, প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র প্রশংসা স্বরূপ **আলহামদুলিল্লাহ্‌** বলে মৌখিক স্বীকৃতি দিতে হবে এবং কাজে পরিণত করতে হবে।

আহ্‌বানঃ সম্মানিত ভায়েরা/বোনেরা! আম্মাপারার এই সূরাটির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে যদি আমার অজান্তে বা অজ্ঞাতে কোনো ভুল-ক্রটি হয়ে যায়, তার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর এই সূরার মধ্যে যেসব শিক্ষা আমরা লাভ করলাম, তা যেনো বাস্তব জীবনে আমল করতে পারি সেই তৌফিক কামনা করে দর্‌স শেষ করছি। “অয়া আখেরু দাওয়ানা আনিল হামদু-লিল্লাহি্‌ রাব্বিল আ’লামীন।”

ইসলামী আন্দোলনঃ কর্মীদের গুণাবলী

সূরা মায়েদাহ-৫৪-৫৬

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗۤ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ- اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ- وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ-

সরল অনুবাদঃ ইরশাদ হচ্ছেঃ (৫৪) হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্যে থেকে যদি কেউ নিজের দ্বীন হতে ফিরে যায়, তবে অচিরেই আল্লাহ্ তাআলা (তাদের স্থলে) এমন অনেক লোক পয়দা করবেন, যাদেরকে তিনি ভালোবাসবে এবং তারাও তাঁকে ভালোবাসবেন। তারা মুমিনদের প্রতি হবে নম্র ও বিনয়ী এবং কাফেরদের প্রতি হবে অত্যন্ত কঠোর ও কঠিন। তারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ (সংগ্রাম) করবে এবং কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারের পরোয়া করবে না। এটা আল্লাহ্

পাকের দয়া, তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আর আল্লাহ্ তাআলা বিশাল প্রাচুর্যের মালিক, মহাজ্ঞানী। (৫৫) (হে মুমিনগণ!) তোমাদের বন্ধু ও অভিভাবক তো কেবলমাত্র আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং সেইসব ঈমানদার লোক যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ্র সামনে নত থাকে। (৫৬) আর যারা আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং মুমিনদেরকে বন্ধু ও অভিভাবক হিসেবে বরণ করে; তারাই আল্লাহ্র দল এবং পরিণামে তারাই হবে বিজয়ী।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থঃ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ-ওহে তোমরা যারা। اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছো। مَنْ-যে। يَرْتَدَّ-ফিরে যাবে। مِنْكُمْ-তোমাদের মধ্য থেকে। عَنْ-হতে, থেকে। دِيْنِهٖ-তার দ্বীন বা ধর্ম। فَسَوْفَ-অতিসত্তর বা শীঘ্রই। يَاْتِى اللّٰهُ-আল্লাহ্ আনবেন বা পয়দা করবেন। بِقَوْمٍ-জাতি বা সম্প্রদায়। يُحِبُّهُمْ-তাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন। وَّ এবং। يُحِبُّوْنَهٗ-তারা তাঁকে ভালোবাসবে। اَذِلَّةٍ -বিনয়-নম্র। عَلٰى-উপর, এখানে প্রতি। اَعِزَّةٍ-কঠিন, কঠোর। يُجَاهِدُوْنَ-তারা -জিহাদ (সংগ্রাম) করে। فِىْ-মধ্যে। سَبِيْلِ اللّٰهِ-আল্লাহ্র পথে। لَا না। يَخَافُوْنَ-তারা ভয় পায়। لَوْمَةَ -তিরস্কার বা ভর্ৎসনা। لَائِمٍ - তিরস্কারকারী বা বিদ্রুপকারী। ذٰلِكَ-ওটা বা এটা। فَضْلُ اللّٰهِ - আল্লাহ্র অনুগ্রহ বা দয়া। يُؤْتِيْهِ -তিনি তাদেরকে দেন বা দান করেন। مَنْ يَّشَاءُ -যাকে ইচ্ছা। وَاسِعٌ -ঐশ্বর্য্য বা প্রাচুর্য। عَلِيْمٌ-মহাজ্ঞানী। اِنَّمَا-নিশ্চয় যারা। وَلِيُّكُمْ-তোমাদের বন্ধু বা অভিভাবক। وَرَسُوْلُهٗ -তাঁর রাসূল। يُقِيْمُوْنَ-তারা প্রতিষ্ঠা করে। اَلصَّلٰوةَ-নামায। وَيُؤْتُوْنَ-তারা দেয় বা আদায় করে। هُمْ-তারা। رٰكِعُوْنَ- -বিনয়ী-

অবনমিত। وَمَنْ–এবং যে। يَّتَوَلَّ اللّٰهَ-আল্লাহ্কে বন্ধু বা অভিভাবক বানায়। وَرَسُوْلَهٗ-তাঁর রাসূল। فَاِنَّ-অতঃপর নিশ্চয়। حِزْبَ দল الْغٰلِبُوْنَ هُمُ-তারাই হবে বিজয়ী।

সম্বোধনঃ উপস্থিত ইসলামী আন্দোলনের কর্মী/ ইসলাম প্রিয় মু'মিন ভায়েরা/বোনেরা/ ভাই ও বোনেরা! আস্সালামু আলাইকুম অয়া রাহমাতুল্লাহি অয়া বারাকাতুহ্। প্রিয় ভায়েরা! আমি আপনাদের সামনে পবিত্র আল-কুরআনের সূরা মায়িদার ৫৪ থেকে ৫৬ মোট তিনটি আয়াত তিলাওয়াত ও সরল অনুবাদ পেশ করেছি। আল্লাহ্ পাক যেনো আমাকে আপনাদের সামনে শেষ সময় পর্যন্ত দারস পেশ করার তাওফিক দান করেন। আমীন।

সূরার নামকরণঃ সূরায় উল্লেখিত اَلْمَائِدَةُ (আল-মায়েদাহ্) **শব্দটিকেই** এই সূরার নাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। مَائِدَةٌ- (আল-মায়িদাহ্) অর্থ দস্তরখানা বা যার উপর খাবার খাওয়া হয়। অন্যান্য অধিকাংশ সূরার মতই এই সূরাও নামের সাথে বিষয় বস্তুর তেমন কোনো মিল নেই। অন্যান্য সূরা থেকে পৃথক করে পরিচিতির জন্যই চিহ্ন ও নিদর্শন হিসেবে এই নাম গ্রহণ করা য়েছে। (সূরার নামকরণ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য ১নং দারসে দেখুন।)

সূরাটি নাযিল হবার সময়কালঃ সর্বসম্মত ক্রমে সূরাটি মাদানী। কেউ কেউ একে কুরআন মজীদের সর্বশেষ সূরাও বলেছেন। মুসনাদে আহমদ কিতাবে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) ও আস্মা বিনতে ইয়াজীদ (রাঃ) এর বর্ণনায় বর্ণিত আছে; সূরা মায়িদাহ্ যে সময় নাযিল হয়, সে সময় রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সফরে 'আযবা' নামক উটের পিঠে চড়ে ছিলেন। সাধারণত রাসূর (সাঃ) এর উপর ওহী নাযিলের সময় যেরূপ অসাধারণ ভারী ও বোঝামনে হতো, তখনও তাই মনে হচ্ছিল। এমনকি ওহীর ওজনের চাপে উট বসে পড়ার উপক্রম হলে রাসূল (সাঃ) নীচে নেমে

পড়েন। কোনো কোনো বর্ণনার দৃষ্টিতে বোঝা যায় যে, এটি ছিলো বিদায় হজ্বের সফর। আর বিদায় হজ্ব ৯ম হিজরীর ঘটনা। এই হজ্ব থেকে ফিরে আসার পর হুজুর(সাঃ) ৮০ দিন বেঁচে ছিলেন। ইবনে হাব্বান 'বাহরে মুহীত' গ্রন্থে উল্লেখ করেন; সূরা মায়েদাহ্র কিছু অংশ হোদায়বিয়ার সন্ধির সফরে, কিছু অংশ মক্কা বিজয়ের সফরে এবং কিছু অংশ বিদায় হজ্বের সফরে নাযিল হয়। এতে বোঝা যায় যে, এ সূরাটি সর্বশেষ না হলেও শেষ দিকে অবতীর্ণ হয়।

'রুহুল মা'আনী' গ্রন্থে আবু ওবায়দাহ্ হামযা ইবনে হাবীব এবং আতিয়্যা ইবনে কায়স বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, সূরা মায়েদাহ্ কুরআন নাযিলের শেষ পর্যায়ে নাযিল হয়েছে। এতে যা হালাল করা হয়েছে, তা চিরকালের জন্যে হালাল করা হয়েছে এবং যা হারাম করা হয়েছে, তা চিরকালের জন্যে হারাম করা হয়েছে। মোট কথা চূড়ান্ত হালাল-হারামের ঘোষণা এই সূরায় উল্লেখ করা হয়েছে।

সূরার বিষয়বস্তুঃ সূরা মায়েদার বিষয়বস্তুকে তিনটি অংশে বিভক্ত করা যেতে পারে।

এক. মুসলমানদের ধর্মীয় তামাদ্দুনিক এবং রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে আরও বেশী আইন-কানুন ও হেদায়েত দান করা হয়েছে। এসব বিধানের মধ্যে হজ্বের সফরের নিয়ম-কানুন ঠিক করা হয়েছে। আল্লাহ্র নির্দেশের প্রতি সম্মান করা ও কাবা ঘর জিয়ারত কারীদের প্রতি বাধা সৃষ্টি না করার নির্দেশ দেয়া হয়। খানা-পিনার জিনিসের হালাল-হারামের সুনির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। আহলে কিতাবদের (ইহুদী ও খৃষ্টান) সাথে খাওয়া-দাওয়া ও তাদের মেয়েদের বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়েছে এবং আল্লাহ্র নামে কসম ভঙ্গের কাফ্ফারা নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

দুই. নতুন ক্ষমতার অধিকারী মুসলমানদেরকে ক্ষমতার অপব্যবহার না করে সুবিচার ও ইনসাফের উপর টিকে থাকার জন্যে উপদেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্র আনুগত্য এবং তাঁর আইন-কানুন মেনে চলার যে ওয়াদা তারা দিয়েছে তার উপর যেনো তারা মজবুত থাকে- ইয়াহুদী ও

খৃষ্টানদের মতো ওয়াদা ভঙ্গ করে তাদের পরিণতির অনুরূপ যেনো না হয় তার তাগাদা দেয়া হয়েছে। নিজেদের যে কোনো কাজ কামের সিদ্ধান্ত নেবার সময় যেনো তারা আল-কুরআনকে অনুসরণ করে এবং মুনাফেকী বর্জন করে চলে তার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

তিন. মুসলমানদের করতলগত ইহুদীদের ভ্রান্ত নীতি সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়েছে এবং তাদেরকে সত্যের পথ ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়েছে। হুদাইবিয়ার সন্ধির ফলে গোটা আরব এবং পার্শ্ববর্তী জাতি বা সম্প্রদায়ের কাছে ইসলামের দাওয়াত প্রচারের সুযোগ ঘটে। এই সুযোগে খৃষ্টানদেরকেও তাদের আকীদার ভুল-ত্রুটিগুলো জানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং শেষ নবীর প্রতি ঈমান আনার আহবান জানানো হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের বিষয়বস্তুঃ দারসের জন্যে তিলাওয়াতকৃত আয়াত তিনটিতে প্রকৃত মুমিনদের কতিপয় গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মুমিনদের পারস্পরিক ব্যবহার এবং কাফেরদের সাথে কেমন আচরণ করতে হবে তাও বলা হয়েছে। যেসব মুসলমানের সাথে বন্ধুত্ব রাখতে হবে তাদের কি কি বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলী থাকবে তাও উল্লেখ করা হয়েছে।

ব্যাখ্যাঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা, আপনাদের সামনে দারসের জন্যে প্রয়োজনীয় তথ্য দেবার পর এখন আয়াতগুলোর প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা পেশ করছিঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمٍ

হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি নিজের দ্বীন থেকে ফিরে যায়, (তবে যাক না।) তাহলে অচিরেই আল্লাহ্ অন্য এক জাতি পয়দা করবেন।

আলোচ্য আয়াতের পূর্বে ৫১-৫৩ নম্বর আয়াতে মুমিনদেরকে ইহুদী এবং খৃষ্টানদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব গড়া থেকে নিষেধ করার যে কারণ ছিলো, তা হলোঃ মদীনার ইহুদী ও খৃষ্টানেরা রাসূল (সাঃ) এর সাথে

চুক্তিবদ্ধ ছিলো যে, তারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করবে না, বরং মুসলমানদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মদীনা হেফাজত করবে। কিন্তু **বানু কুরায়জার** ইহুদীরা তাদের চুক্তি ভঙ্গ করে মক্কার কাফেরদেরকে গোপনে সাহায্য করতে থাকে। তারা এক দিকে কাফেরদের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে, অপরদিকে মুসলমানদের অনেকের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক রেখে গুপ্তচরের ভূমিকায় লিপ্ত থাকে। আল্লাহ্ পাক আয়াত নাযিল করে মুসলমানদেরকে ইহুদী ও খৃষ্টানদের সাথে সকল বন্ধুত্ব ছিন্ন করতে নির্দেশ দেন, যাতে তারা মুসলমানদের বিশেষ সংবাদ সংগ্রহ করতে না পারে। এ নির্দেশ মতো খাঁটি মুসলমানেরা প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। কিন্তু মুনাফেকরা এবং দুর্বলচেতা মুসলমানেরা ভবিষ্যতে কি হয়; যদি ইহুদী-খৃষ্টানদের চক্রান্ত সফল হয়ে যায়, তবে তো আমরা প্রাণে রক্ষা পাবনা, এ ভয়ে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলো না। কিন্তু পরবর্তীতে আল্লাহ্ তাআলা মক্কা বিজয়ের পূর্বেই মুনাফেকদের আসল চেহারা উন্মোচন করে তাদেরকে লাঞ্ছিত করেন।

অত্র আয়াতে মুসলমানদের বৃহত্তর স্বার্থেই তাদেরকে ইহুদী, খৃষ্টানদের সাথে গভীর বন্ধুত্ব ও মেলামেশা করতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু যদি এটা কেউ না করে, তবে সত্য দ্বীন ইসলামের হেফাজতের দায়িত্ব আল্লাহ্ স্বয়ং নিজেই গ্রহণ করবেন। কোনো ব্যক্তি কিংবা দলের বক্রতা ও অবাধ্যতা দূরের কথা, স্বয়ং মুসলমানদের কোনো ব্যক্তি কিংবা দল যদি সত্য সত্যই দ্বীন ইসলাম ত্যাগ করে বসে এবং সম্পূর্ণ ধর্মত্যাগী হয়ে কুফরীর সাথে হাত মেলায়, তবে এতেও দ্বীন ইসলামের কোনই ক্ষতি হবে না। তার কারণ হলো, এর হেফাজতের দায়িত্ব আল্লাহ্র নিজের। তিনি তৎক্ষণাৎ অন্য কোনো জাতি বা সম্প্রদায়কে দ্বীনের হেফাজতের দায়িত্বে নিয়োজিত করবেন।

আল্লাহ্ তাবারাক ওয়া তাআলার কাজ কোনো ব্যক্তি, দল অথবা প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল নয়। দ্বীন ইসলাম থেকে যদি কেউ বের হয়ে

যায়, তবে এতে সে ব্যক্তি বা দলই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আল্লাহ্ এবং তাঁর দ্বীনের এক চুল পরিমাণও ক্ষতি হবে না। লাভ-লস মানুষের।

ধর্ম ত্যাগীদের পরিবর্তে তাঁর দ্বীন ইসলাম হেফাজতের জন্যে যে জাতিকে তিনি কাজে নিয়োজিত করবেন, তাদের কতিপয় বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

প্রথম গুণঃ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ **যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালোবাসবে।** অর্থাৎ দ্বীনের হেফাজতকারী নতুন দলের লোকদের প্রথম গুণ হবে, আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তারাও আল্লাহ্‌কে ভালোবাসবে। এ গুণের দু'টি অংশঃ

প্রথম অংশঃ আল্লাহ্‌র সাথে তাদের ভালোবাসা এটা মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। কারণ কারো সাথে কারো ভালোবাসা স্বভাবগত ভালোবাসা না হলেও কমপক্ষে যৌক্তিক ভালোবাসাকে ইচ্ছাধীন রাখা যায়। তাছাড়া স্বভাবগত ভালোবাসা যদিও ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়, কিন্তু এর উপায় উপকরণগুলো ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। যেমনঃ আল্লাহ্‌র মাহাত্ম, প্রতাপ-প্রতিপত্তি, শক্তি-সামর্থ এবং মানুষের প্রতি তাঁর অসীম ক্ষমতা ও অফুরন্ত নেয়ামত এবং অনুগ্রহের কথা চিন্তা করলে স্বাভাবিক ভাবেই মানুষের মনে আল্লাহর ভালোবাসা পয়দা হয়ে যায়।

দ্বিতীয় অংশঃ অপর পক্ষে তাদের সাথে আল্লাহর ভালোবাসার ক্ষেত্রে মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের কোনো ভূমিকা নেই। এ বিষয়টি মানুষের ইচ্ছা ও সামর্থের বাইরে। তবে কুরআনের অন্যান্য আয়াতের পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে, এ ভালোবাসার উপায় উপকরণগুলো মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। মানুষ যদি এসব উপায়কে কাজে লাগায় তবে তাদের সাথে আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা অবশ্যম্ভাবী। এসব উপায় নিচের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

হে রাসূল! আপনি তাদেরকে বলে দিন: তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে

ভালোবাসতে চাও, তবে আমার আনুগত্য করো। এর ফলে আল্লাহ্ও তোমাদেরকে ভালোবাসবেন।

এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ভালোবাসা পেতে চায়, তার উচিত হবে জীবনের সর্বক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সুন্নতের অনুসরণ করা এবং তার উপর অবিচল থাকা। এ কাজ করলে আল্লাহ্ তাআলাও তাকে ভালোবাসবেন বলে ওয়াদা দিয়েছেন। এ আয়াত থেকে আরও জানা যায় যে, যে দল সুন্নতের অনুসরণ করে শরীয়তের নির্দেশ পালন করতে কোনো ক্রটি করে না এবং নিজেরা সুন্নত বিরোধী কোনো কাজ ও বিদআত প্রচার করে না। একমাত্র তারাই কুফর ও দ্বীন ত্যাগের মোকাবেলা করতে পারে।

দ্বিতীয় গুণঃ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ **তারা মুমিনদের প্রতি বিনয়-নম্র এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর-কঠিন। এই গুণেরও দু'টি অংশঃ**

প্রথম অংশ হলোঃ মুমিনদের প্রতি **নম্র ও বিনয়ী** হবার অর্থ হলো এই যে, ঈমানদার লোকদের সাথে ঝগড়া-বিবাদ করবে না। অস্ত্র এবং শক্তির বাহাদুরী দেখাবে না। নিজের মেধা, যোগ্যতা, ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি, অর্থ-সম্পদ ও দৈহিক বল কোনো একটি জিনিসকেও সে মুসলমানদেরকে দমন, নির্যাতন-নিষ্পেষণ এবং ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে ব্যয়-ব্যবহার করবে না। মুমিন মুসলমানরা সব সময়ই একে অপরের প্রতি বিনয়ী, দয়া-মায়া, সহানুভূতিশীল, ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু ব্যাক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। এ সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) মুমিনদেরকে একটি দেহের সাথে তুলনা করে বলেনঃ

تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ فِىْ تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ
كَمَثَلِ الْجَسَدِ اِذَا اشْتَكٰى عُضْوٌ تَدَعٰى لَهٗ سَائِرُ
الْجَسَدِ بِا لسَّهْرِ وَالْحُمّٰى

তুমি মুমিনদেরকে তাদের পরস্পরের প্রতি দয়া, ভালোবাসা এবং সহানুভূতি দেখানোর ব্যাপারে একই দেহের মতো দেখবে। যখন দেহের কোনো একটি অঙ্গ (আঘাত পেয়ে) কষ্ট পায় তখন দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার কষ্টে সাড়া দিয়ে অনিদ্রা এবং জ্বরে আক্রান্ত হয়ে যায়। (বুখারী মুসলিম)।

দ্বিতীয় অংশ হলোঃ তারা হবে কাফেরদের প্রতি কঠোর কঠিন। দ্বিতীয় অংশে أَعِزَّةٍ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এটি عَزِيْزٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ হলো প্রবল, শক্তিশালী ও কঠোর। অর্থাৎ তারা আল্লাহ্ এবং তাঁর দ্বীনের দুষমনদের মোকাবেলায় কঠোর ও পরাক্রান্ত। দুষমনেরা তাদেরকে সহজে কাবু করতে পারে না। ঈমানদারদের ঈমানের মজবুতি, দ্বীনদারীর নিষ্ঠা, নিয়ম-নীতি পালনে দৃঢ়তা, চরিত্রের বলিষ্ঠ ভূমিকা এবং বুদ্ধিমত্তার কারণে ইসলামের দুষমনদের সামনে ইস্পাতের মতো কঠিন ও পাথরের ন্যায় দুর্ভেদ্য হয়ে দাঁড়ায়। কোনো অবস্থাতেই নিজের ন্যায় নীতি ও পথ হতে বিচ্যুত করতে পারে না। কাফেরেরা কখনো কোনো সময়ই দুর্বল ও 'নরম কচি ঘাস' বলে মনে করবে না। বরং তারা মুমিনদেরকে বাঘের মতো ভয় করবে। কাফেরদের সামনে দিয়ে যাবার সময় ঈমান এবং চারিত্রিক বলিষ্ঠতার কারণে তারা তাকে যমের মতো ভয় করবে।

এখন এই গুণের উভয় অংশ একত্রিত করলে সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, তারা হবে এমন এক জাতি, যাদের ভালোবাসা ও শত্রুতা নিজ স্বার্থের পরিবর্তে কেবল আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং দ্বীনের খাতিরে নিবেদিত হবে। এ কারণেই তাদের বন্দুকের নল আল্লাহ্ ও রাসূলের অনুগত বান্দাদের দিকে তাক করা থাকবে না, বরং তাঁর দুষমন ও অবাধ্যদের দিকে তাক করা থাকবে। 'সূরা ফাতাহ্'তে আল্লাহ্পাক এই মর্মে উল্লেখ করে বলেনঃ

أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. **(মুমিনেরা) কাফেরদের উপর হবে খরগো হস্ত, আর নিজেরা একে অপরের প্রতি হবে রহম-দেল।**

তৃতীয় গুণঃ يُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ তারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে। অর্থাৎ তারা দ্বীনের প্রচার; প্রসার ও প্রতিষ্ঠার জন্যে জিহাদে জড়িত থাকে। এই বাক্যটির প্রকৃত তাৎপর্য হলো এই যে, কুফর ও দ্বীন ত্যাগের মোকাবেলা করার জন্যে শুধু কতকগুলো প্রচলিত এবাদত এবং নম্র-কঠোর হওয়াই যথেষ্ট নয়,বরং দ্বীন ইসলাম কায়েম করার উদ্দীপনা ও প্রচেষ্টাও থাকতে হবে। কেননা, প্রকৃত মুমিনের জিন্দেগী হবে জেহাদী জিন্দেগী। এ কারণে আল্লাহ্ পাক যেখানে মুমিনদের গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন সেখানেই সরাসরি হোক কিংবা ইশারা ইঙ্গিতে হোক জেহাদের কথা উল্লেখ করেছেন। কেননা, আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠা এবং সংরক্ষণের জন্য জেহাদ বা আন্দোলনের প্রয়োজন। আর এ'কাজটি আনজাম দেবে মুমিন -মুসলমানেরা।

চতুর্থ গুণঃ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَائِمٍ এবং তারা কোনো বিদ্রু বা উপহাসকারীর বিদ্রুপ বা উপহাসকে পরওয়া করে না। একজন মুসলমানের দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার যে উদ্দীপনা থাকার কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, সেই উদ্দীপনাকে পূর্ণতা দানকারী হলো এই চতুর্থ গুণটি। অর্থাৎ দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও সমুন্নত রাখার চেষ্টায় তারা কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে পরওয়া করে না। একটু চিন্তা করলে বোঝা যায়, যে কোনো আন্দোলন পরিচালনার পথে দু'টি বিষয় বাধা হয়ে থাকে। একটি হলো বিরোধী দল বা শক্তির বাধা এবং অপরটি হলো আপন লোকদের ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও তিরস্কার। দেখা যায় যারাই দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়ে আন্দোলনে অগ্রসর হয়, তারা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বিরোধী শক্তির কাছে নতি স্বীকার করে না। জেল-যুলুম, আহত-নিহত ইত্যাদি সব কিছুই অম্লানবদনে সহ্য করে নেয়। কিন্তু নিজের লোকদের ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও নিন্দাবাদের মুখে বড় বড় কর্মীদেরও পদস্খলন ঘটে যায়। সম্ভবতঃ এ কারণেই আল্লাহপাক এর গুরুত্ব ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশে বলেছেন যে, তারা কারও ঠাট্টা-বিদ্রুপ, ভর্ৎসনা ও তিরস্কারের পরওয়া না করে তাদের আন্দোলন-সংগ্রাম চালিয়ে যায়।

প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এই বাক্যটি সামনে রেখে বর্তমান বিশ্বে ইসলামের দুষমনদের ভূমিকার দিকে আমরা একটু লক্ষ্য করলে তাই দেখবো। ইসলাম এবং ইসলামী আন্দোলনকে 'টেরেরিজম' (সন্ত্রাসবাদ) ও আন্দোলনের কর্মীদেরকে 'টেরোরিষ্ট' (সন্ত্রাসী) বলে আখ্যায়িত করছে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মিডিয়ার মাধ্যমে গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিচ্ছে। মুসলমান নামধারী ইসলামের দুষমনেরা দ্বীন কায়েমের আন্দোলনের কর্মীদেরকে সন্ত্রাসী, ক্যাডার, মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক, প্রগতিবিরোধী বলে তিরস্কার ও ভর্ৎসনার মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলমান দেশ বাংলাদেশেও উপরোক্ত কটুক্তি ছাড়া আরও কতকগুলো শব্দ সংযোগ করে যারাই ইসলাম বা ইসলামী আন্দোলনের কথা বলে তাদেরকেই স্বাধীনতা বিরোধী, রাজাকার, আলবদর আখ্যায়িত করছে। তাদের এসব বলার আসল উদ্দেশ্য হলো, যাতে করে ইসলাম এবং ইসলামী আন্দোলনের উপর বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হয়ে ইসলামী আন্দোলন থেকে দূরে সরে যায় অথবা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। আর অন্যরা যাতে এই আন্দোলনে যোগ না দেয়। এটা নতুন কিছু নয়, যুগে যুগে নবী রাসূল ও তাঁর সংগী সাথীদেরকে এবং পরবর্তী কালেও একই ভাবে ঠাট্টা-বিদ্রুপ ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করা হয়েছে। এটা ইসলামী আন্দোলনের চিরাচরিত সুন্নত। যারাই দ্বীন ইসলাম কায়েমের আন্দোলন করবে তাদেরকেই বিভিন্নভাবে ঠাট্টা-বিদ্রুপ, তিরস্কার এবং ভর্ৎসনা করা হবে। ধর্ম নিরপেক্ষ নামধারী মুসলমানেরা কুফর শক্তির সহযোগীতা নিয়ে অথবা সহযোগীতা দিয়ে ইসলামী আন্দোলনকে বানচাল করার জন্য যুগে যুগে কেয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত তাদের এই ভূমিকা অব্যাহত রাখছে এবং রাখবে। সুতরাং ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের বৈশিষ্টই হবে, তারা কোনো তিরস্কার, ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনাকে পরওঁয়া না করে মজবুত কদমে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। ডানে বামে কে থাকলো আর কে থাকলো না সে দিকেও সে ভ্রুক্ষেপ করবে না। অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন ঃ

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ ۭ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

এটি আল্লাহর অনুগ্রহ বা দয়া তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ বিশাল প্রাচুর্যের মালিক, মহাজ্ঞানী।

অত্র আয়াতের শেষ অংশে বলা হয়েছে, এসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য আল্লাহ পাকেরই অনুগ্রহ এবং দান। তিনিই যাকে ইচ্ছা এসব গুণে গুণান্বিত করেন। সৎ গুণ অর্জন এবং প্রতিটি উত্তম কাজ আঞ্জাম দেবার জন্যে আল্লাহর অনুগ্রহের প্রয়োজন। কোনো মানুষই আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া এককভাবে নিজের চেষ্টাদ্ধচরিত্রের মাধ্যমে এসব গুণ বা বৈশিষ্ট্য হাসিল করতে পারে না। তার কারণ হলো-মানুষের ক্ষমতা, এবং উপায়-উপাদান অত্যন্ত সীমিত। আর আল্লাহ হচ্ছেন বিশাল উপায়-উপাদান এবং প্রাচুর্যের মালিক। আর তিনি অশেষ জ্ঞানেরও অধিকারী।

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

প্রকৃত পক্ষে তোমাদের বন্ধু ও অভিভাবক তো কেবলমাত্র আল্লাহ, তাঁর, রাসূল এবং ঈমানদার লোকেরা।

সূরার ৫১ এবং ৫২ নম্বর আয়াতে মুসলমানদেরকে ইহুদী নাসারাদের সাথে গভীর বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেছেন। এখন এই আয়াতে মুসলমানদের গভীর ও বিশেষ বন্ধুত্ব কাদের সাথে হবে তা উল্লেখ করেছেন। তাদের প্রকৃত বন্ধু এবং অভিভাবক হবে সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলা অতঃপর তাঁর রাসূল (সাঃ)। কেননা, মুসলমানদের বন্ধু ও অভিভাবক সব সময় এবং সর্ব অবস্থায় আল্লাহ তাআলাই আছেন এবং তিনিই হতে পারেন। তাঁর সম্পর্ক ছাড়া যতো সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব আছে, সবই ক্ষণস্থায়ী এবং ধ্বংসশীল। আর রাসূল (সাঃ) এর সাথে সম্পর্ক ও বন্ধুত্বও প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ তাআলারই সাথে সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব, আলাদা কিছু নয়। তৃতীয় পর্যায়ে ঈমানদারদের সংগী-সাথী ও আন্তরিক বন্ধু ঐসব মুসলমান, যারা শুধু নামে নয়, সত্যিকার খাঁটি মুসলমান। সত্যিকার ও খাঁটি ইমানদার মুসলমানদের গুণ বা লক্ষণের কথা উল্লেখ করে

আল্লাহ্ পাক নিম্নে পরপর তিনটি লক্ষণের কথা বর্ণনা করে বলেনঃ

প্রথম লক্ষণঃ اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ **তারা নামায কায়েম করে।** নামায কায়েম বলতে অধিকাংশ মুফাস্‌সিরীনগণ বলেনঃ নামাযের পূর্ণ হেফাজত। আর তা হলো, নামাযের বাইরের এবং ভেতরের প্রতিটি শর্ত ও হুকুম সঠিক ভাবে আদায় করা। অর্থাৎ যথাযথভাবে পবিত্রতা হাসিল করা। সময়মত আওয়াল ওয়াক্তে জামায়াতের সাথে নামায আদায় করা। বিনয়ী ও খুশু-খজুর সাথে নামায আদায় করা। সুন্নতি তরিকায় ধীরস্থিরভাবে রুকু, সেজদাহ্, কিয়াম এবং বৈঠক ইত্যাদি আদায় করা। নামাযের আদব রক্ষা করা। নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী নামায না পড়া। আর নামায কায়েমের বাস্তব দিক হলো-ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ভাবে নামায প্রতিষ্ঠা করা। সুতরাং খাঁটি ঈমানদারের প্রথম লক্ষণই হলো, নিজেও যেমন ব্যক্তিগতভাবে নামায কায়েম করবে, তেমনি রাষ্ট্রীয়ভাবেও নামায কায়েম বা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

দ্বিতীয় লক্ষণঃ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ **তারা যাকাত আদায় করে। খাঁটি** ঈমানদার মুসলমানদের দ্বিতীয় লক্ষণ হলো, তাদের অর্থ-সম্পদ থেকে শরীয়তের বিধি অনুযায়ী যাকাত আদায় করে। বছরান্তে সঠিকভাবে হিসাব-নিকাশ করে হিসাব মত নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ বের করে। কৃপণতা এবং খামখেয়ালীপনা করে না।

তৃতীয় লক্ষণঃ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ **এবং তারা আল্লাহ্‌র সামনে অত্যন্ত বিনয়ী** অর্থাৎ তাদের তৃতীয় লক্ষণ হলো, তারা নিজের সৎ এবং ভালো আমল বা কাজের জন্য গর্ব-অহংকার করে না। বরং তারা বিনয়ের সাথে আল্লাহ্‌র সামনে মাথা নতো করে দেয়।

তাফসীরে মাযহারীতে رَاكِعٌ শব্দের পারিভাষিক অর্থ গ্রহণ করে নামাযের রুকুকে বুঝিয়েছেন। وَهُمْ رَاكِعُوْنَ বাক্যটি ব্যবহার করার উদ্দেশ্য হলো মুসলমানদের নামায অন্যান্য সম্প্রদায়ের নামায থেকে

পৃথক করা। কেননা, ইহুদী এবং খৃষ্টানরাও নামায পড়ে, কিন্তু তাদের নামাযে রুকু নেই। রুকুসহ নামায একমাত্র মুসলমানদেরই বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

অতঃপর আল্লাহ্পাক কারা আল্লাহ্র দলের লোক তা উল্লেখ করে বলেনঃ

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ

আর যারা আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং ঈমানদারকে বন্ধু বা অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে, তারাই আল্লাহ্র দল এবং তারাই হবে বিজয়ী।

কুরআনের নির্দেশ মতো যারা বিজাতির সাথে গভীর বন্ধুত্ব করা থেকে বিরত থেকে কেবলমাত্র আল্লাহ্ তাঁর রাসূল এবং খাঁটি মুসলমানদেরকে বন্ধু এবং অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে, তারাই হচ্ছে আল্লাহ্র দল। আর তারাই যুগ যুগ ধরে বিজয়ী হয়ে আসছে এবং হবে।

অতীতের ঘটনাবলী লক্ষ্য করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) সবার উপর জয়ী হয়েছেন। যে শক্তিই শীষা ঢালা এই প্রাচীরে আঘাত হেনেছে, সে শক্তিই ধাক্কা খেয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রাঃ) এর বিরুদ্ধে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠলে আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে সবার উপর বিজয়ী করেন। দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রাঃ) এর মোকাবেলায় তৎকালীন বিশ্বের শক্তিধর দু'টি দেশ কায়সার ও কেসরা (রোম ও পারস্য) এগিয়ে আসলে আল্লাহ্ তাআলা তাদের নাম-নিশানা পর্যন্ত মিটিয়ে দেন। তাঁদের পরবর্তী খলিফা এবং যেসব মুসলমান যতদিন আল্লাহ্র এসব নির্দেশ পালন করেছে এবং মুসলমানেরা বিজাতির সাথে মেলামেশা ও গভীর বন্ধুত্ব থেকে দূরে থেকেছে, ততোদিন তাদেরকেই বিজয়ী বেশে দেখা গেছে। আর যখনই মুসলমানেরা আল্লাহ্র সেই নির্দেশ

বে-মালুম ভুলে গিয়ে বিজাতির সাথে বন্ধুত্বের হাত মিলিয়েছে, তখনই তারা চরমভাবে মার খেয়েছে। সুতরাং মুসলমানদের সব সময়ের জন্যই বিজাতি অমুসলিমদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে এবং আল্লাহ্র এই নির্দেশকে সব সময় মনে রাখতে হবে।

শিক্ষাঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! সূরা মায়েদার তিনটি আয়াতের দারস থেকে যেসব শিক্ষা আমরা লাভ করলাম তা হলোঃ

❑ দ্বীন ইসলামে টিকে থাকার জন্য সার্বক্ষণিক আল্লাহ্র নির্দেশ মতো চলতে হবে। নিজের পছন্দ-অপছন্দের ধার ধারা যাবে না। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দ্বীন ইসলামের উপর টিকে থাকার জন্য আল্লাহ্ তাআলার রহমত এবং সাহায্য কামনা করতে হবে।

❑ আল্লাহ্র ভালোবাসা লাভের জন্যে আল্লাহ্কেই ভালোবাসতে হবে। তাঁর ভালোবাসা পেতে হলে রাসূল (সাঃ) এর আনুগত্য করতে হবে।

❑ এক মুসলমান আর এক মুসলমানের প্রতি দয়া-মায়া এবং সহানুভূতি দেখাবে। নম্র-ভদ্র আচরণ করবে, যুলুম করবে না।

❑ খোদাদ্রোহী শক্তির ব্যাপারে কঠোর মনোভাব রাখতে হবে। তাদের সাথে দ্বীনের ব্যাপারে কোনো আপোশ করা যাবে না। এমন ঈমান এবং চরিত্র সৃষ্টি করতে হবে, যাতে করে ঈমানী এবং চারিত্রিক বলিষ্ঠতা দেখে বাতিল শক্তির অন্তরে ভীতি সৃষ্টি হয়ে যায় এবং ষড়যন্ত্র করার কোনো সাহস না পায়।

❑ আল-কুরআনের শাসন কায়েমের আন্দোলনে জড়িত থাকার ফলে মুস-লমান নামধারী ধর্মনীরপেক্ষবাদীদের কাছ থেকে যে ধরণের ঠাট্টা-বিদ্রুপ, তিরস্কার এবং ভর্ৎসনা করা হোক না কেনো, এসব কিছুর পরওয়া না করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। আন্দোলন থেকে নিস্ক্রীয় বা ছিটকে পড়া যাবে না। আমাদের দেশে যারাই ইসলামী আন্দোলন করে

তাদেরকেই সাম্প্রদায়ীক, মৌলবাদী, রাজাকার, আলবদর বলে ঠাট্টা বিদ্রুপ এবং তিরস্কার করে। এসব বলার মূল উদ্দেশ্যই হলো আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া। এটি একটি শয়তানি হাতিয়ার। এজন্য মন খারাপ করা বা ঘাবড়ানো যাবে না। এটা ইসলামী আন্দোলনের চিরাচরিত মনস্তাত্ত্বিক বাধা মনে করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

❑ সদাসর্বদা আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং যারা নামাযী, যাকাত আদায়কারী, নীরহংকারী, আল্লাহ্র শোকরিয়া আদায়কারী ঈমানদার মুসলমানদেরকে আন্তরিক বন্ধু এবং অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

❑ আল্লাহ্র দলভুক্ত হবার জন্যে আল্লাহ্ তাঁর রাসূল এবং মুমিনদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। আর আল্লাহ্র দলভুক্ত হতে পারলেই বাতিল শক্তির উপর বিজয়ী হওয়া যাবে।

আহ্বানঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! আপনাদের সামনে এতক্ষণ পর্যন্ত সূরা মায়েদা থেকে যে দারস পেশ করলাম, এতে যদি আমার অজান্তে কোনা ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যায়, তার জন্য আল্লাহ্র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর এই দারস থেকে যেসব শিক্ষা আমরা লাভ করলাম, তা যেনো বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারি সেই তৌফিক কামনা করে দারস শেষ করছি। আল্লাহ্ আমাদের সকলের নেক আমলগুলো কবুল করুন। আমিন।

অয়া আখেরু দাওয়ানা আনিল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

সাত

আল্লাহ্র কতিপয় কুদরাত ও নেয়ামত

সূরা-আল্-নাবা-১-১৬-আয়াত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ- عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ- الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ
مُخْتَلِفُوْنَ- كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ- ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ-اَلَمْ
نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا-وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا- وَّخَلَقْنٰكُمْ
اَزْوَاجًا- وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا- وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ
لِبَاسًا- وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا- وَّبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا
شِدَادًا- وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا- وَّاَنْزَلْنَا مِنَ
الْمُعْصِرٰتِ مَاۤءً ثَجَّاجًا- لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا-
وَّجَنّٰتٍ اَلْفَافًا

সরল অনুবাদঃ ইরশাদ হচ্ছে-(১) তারা একে অপরে কোন্ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে ? (২) সেই মহা খবর(কেয়ামত) সম্পর্কে, (৩) যে বিষয়ে তারা বিভিন্ন উক্তি করে ? (৪) কক্ষনও নয়, অতি শীঘ্রই তারা জানতে পারবে। (৫) হ্যাঁ কক্ষন-ই নয়, অতি শীঘ্রই তারা জানতে পারবে। (৬) এটা কি সত্য নয় যে, আমিই যমীনকে বিছানা স্বরূপ বানিয়েছি (৭) এবং পাহাড় পর্বতকে পেরেকের মতো গেড়ে দিয়েছি ? (৮) আমি তোমাদেরকে (নারী-পুরুষে) জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছি।

(৯) তোমাদের জন্যে ঘুমকে করেছি ক্লান্তি দূরকারী। (১০) আর রাতকে আবরণ (১১) এবং দিনকে জীবিকা অর্জনের সময় বানিয়ে দিয়েছি। (১২) আর তোমাদের মাথার উপর মজবুত সাতটি আকাশ নির্মাণ করেছি (১৩) এবং একটি অতি উজ্জ্বল প্রদীপ (সূর্য) সৃষ্টি করেছি। (১৪) আমি মেঘমালা থেকে প্রচুর বৃষ্টিবর্ষন করি, (১৫) যাতে তার দ্বারা শস্য, শাক-সব্জি (১৬) ও ঘন পাতা বিশিষ্ট বাগ-বাগিচা উৎপাদন করতে পারি।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থঃ عَمَّ-কি সম্পর্কে? يَتَسَاءَلُوْنَ-তারা (পরস্পরে) জিজ্ঞাসাবাদ করে। عَنْ-সম্পর্কে। النَّبَاءِ-খবর বা সংবাদ। الْعَظِيْمِ-বড়। الَّذِىْ-যে,তা। هُمْ-তারা। فِيْهِ -উহা (কেয়ামত) সম্পর্কে। مُخْتَلِفُوْنَ -(নিজেরাই) মতানৈক্যকারী। كَلَّا কক্ষনও নয়। سَيَعْلَمُوْنَ -শীঘ্র তারা জানতে পারবে। ثُمَّ -আবার (বলি)। اَلَمْ نَجْعَلْ-আমি কি করিনি। اَلْاَرْضَ-পৃথিবী বা ভূমি। مِهٰدًا-বিছানা। وَ-এবং اَلْجِبَالَ-পাহাড়-পর্বত সমূহ। اَوْتَادًا -পেরেক। وَخَلَقْنَاكُمْ -আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি। اَزْوَاجًا -জোড়া জোড়া (নারী-পুরুষ)। وَجَعَلْنَا -আমি করেছি। نَوْمَكُمْ -তোমাদের নিদ্রা বা ঘুম। سُبَاتًا-ক্লান্ত দুর করা, আরাম বিশ্রাম.করা। اَلَّيْلَ-রাত। لِبَاسًا-পোষাক, আবরণ। اَلنَّهَارَ -দিন সমূহ। مَعَاشًا-(জীবিকা অর্জনের) সময়। بَنَيْنَا-আমি নির্মাণ করেছি। فَوْقَكُمْ-তোমাদের (মাথার) উপর। سَبْعًا-সপ্ত বা সাত। شِدَادًا-মজবুত (আকাশ)। سِرَاجًا-প্রদীপ (সূর্য)। وَهَّاجًا -অতি উজ্জ্বল। وَاَنْزَلْنَا-আমি বর্ষন করি।

مِنَ-থেকে বা হতে। مُعْصِرَٰتِ-জলে পরিপূর্ণ মেঘমালা। مَآءً ثَجَّاجًا-প্রচুর বৃষ্টি বা অবিরাম বৃষ্টি। لِنُخْرِجَ-যাতে উৎপন্ন করি। بِهِۦ -তার দ্বারা। حَبًّا-শস্য। وَنَبَاتًا-শাক-সজি বা তরিতরকারি বা উদ্ভিদ। وَجَنَّٰتٍ أَلْفَافًا ঘন পাতা বিশিষ্ট বাগান বা সুনিবিড় বাগ-বাগিচা।

সম্বোধনঃ সম্মানিত ইসলাম প্রিয় দ্বীনদার/ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ভায়েরা/বোনেরা! আস্সালামু আলাইকুম অরাহমাতুল্লাহি অবারাকাতুহ্। আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কালামে হাকীম এর তিরিশ পারা অর্থাৎ আমপারার প্রথম সূরা আন্নাবা এর ১-১৬ নম্বর আয়াত পর্যন্ত তিলাওয়াত এবং সরল অনুবাদ/তরজমা পেশ করেছি। আল্লাহ্ পাক যেনো আমাকে শেষ পর্যন্ত সঠিক ভাবে দারস পেশ করার তাওফীক দান করেন। **ওমা তাওফীকি ইল্লাবিল্লাহ্**

সূরাটির নামকরণঃ অত্র সূরার ২য় আয়াত عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ-এর النَّبَإِ শব্দটিকে এই সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। نَبَإِ শব্দের অর্থ সংবাদ বা খবর। অর্থাৎ কেয়ামত ও পরকালের মহা খবরকে বোঝানো হয়েছে। অন্যান্য সূরার মতো এই সূরার নামকরণ কেবলমাত্র পরিচিতি বা চেনার জন্যই নয় বরং এই সূরার আলোচ্য বিষয়ের শিরোনামও বটে। কেননা এই সূরার সমস্ত আলোচনাই কেয়ামত ও পরকাল সম্পর্কিত।

সূরাটি নাযিল হবার সময়কালঃ সূরা **কেয়ামাহ্** থেকে সূরা **নাযিয়াত** পর্যন্ত সব কয়টি সূরার বিষয়বস্তু প্রায় একই রকমের। আর এই সব কয়টি সূরা-ই রাসূলে করীম (সাঃ) এর মক্কী জীবনের প্রথম দিকে নাযিল হয়েছে বলে মনে হয়। সুতরাং এই সূরাটিও নবুয়াত লাভের প্রথম দিকের 'মাক্কী সূরা'।

সূরাটির মূল বিষয়বস্তুঃ আলোচ্য সূরাটির মূল বিষয়বস্তু হলো কেয়ামত ও পরকালের প্রমাণ এবং তা মানা না মানার পরিণতি সম্পর্কে লোকদেরকে অবহিত করা।

শানে নূযুলঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, আল-কুরআন নাযিল শুরু হলে মক্কার কাফেরেরা তাদের বৈঠকে বসে এ বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করতো যে, কুরআনে কেয়ামত অর্থাৎ আখেরাতের আলোচনাকে খুব বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। অথচ এটা তাদের মতে একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। তাই এ সম্পর্কে খুব বেশী বেশী আলোচনা-পর্যালোচনা চলতো। কেউ কেউ একে সত্য মনে করতো আবার কেউ কেউ একে অস্বীকার করতো। তাই আল্লাহ্ পাক কাফেরদের কেয়ামত ও পরকাল সম্পর্কে মতানৈক্য, অবিশ্বাস, খট্‌কা ও আপত্তির জবাব দিয়ে আলোচ্য আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেন।

ব্যাখ্যাঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! আপনাদের সামনে সূরা নাবা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা প্রদানের পর এখন আমি তেলাওয়াত ও অনুবাদকৃত আয়াতগুলোর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা পেশ করছি।

عَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ–**তারা কি বিষয়ে পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করছে?** অত্র আয়াতে কোন্ জিনিস সম্পর্কে তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসা করছে এবং কোন্ বিষয়ে তারা কথা-বার্তা বলছে? এর পরের আয়াতেই তার জবাব দেয়া হয়েছে। অবশ্য সূরার শুরুতেই তাদের থেকে জবাব পাবার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করা হয়েছে এমন নয়, বরং তাদের (কাফেরদের) অবস্থার উপর বিস্ময় প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের বৈচিত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে, যাতে করে ওদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের মধ্য দিয়ে বাস্তব বিষয়টি প্রকাশ পেয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ্ নিজেই উত্তর দিয়ে বলেনঃ

عَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ **সেই মহা সংবাদ (কেয়ামত) সম্পর্কে।**

نَبَاءِ الْعَظِيْمِ শব্দের অর্থ বড় সংবাদ বা মহা খবর। এখানে

মহাখবর বলে কেয়ামত ও পরকালকে বোঝানো হয়েছে। মাক্কী যুগের সূরা এবং আয়াতের বিষয়বস্তু ছিলো মূলতঃ তাওহীদ রেসালাত এবং আখেরাত সম্পর্কে। মহানবী (সাঃ) এই তিনটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে দাওয়াতী কাজ শুরু করেছিলেন। মক্কাবাসীদের জন্য প্রথম দুটি বিষয়ে আপত্তি থাকলেও শেষের বিষয়টির ব্যাপারে তাদের ঘোর আপত্তি ছিলো। কেয়ামত এবং আখেরাতের বিষয়টি তারা কোনো যুক্তিতেই মেনে নিতে পারতো না। বরং তারা প্রতিটি মজলিশে ও সভা সমিতিতে এ সম্পর্কে নানা রকম উক্তি ও মন্তব্য করতো। তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতো - তাই মানুষ মরে যাবার পরও কি আবার জিন্দা হবে এটা কি কখনও হতে পারে? মানুষের হাড় মাংস পচে গলে যাবার পর তাতে আবার প্রাণের সঞ্চার হবে এমন কথা কি কোনো ভাবেই বিশ্বাস করা যায়? আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সব মানুষ আবার একত্রিত হবে একথা কি বোধগম্য হবার মতো? চন্দ্র-সূর্য পাহাড়-পর্বত আকাশ সবকিছু চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে এরকমের বক্তব্য কি করে সম্ভব হতে পারে? আবার নাকি জান্নাত-জাহান্নামও আছে ? মোট কথা মক্কার কোরাইশ কাফেরেরা কেয়ামত এবং আখেরাতের কোনো বিষয়কে একেবারেই মেনে নিতে পারছিলো না। বরং তারা এ বিষয় নিয়ে হাঁসি-ঠাট্টা এবং বিদ্রুপ পর্যন্ত করতো। তাই আল্লাহ্ পাক অত্র সূরাটি জিজ্ঞাসার সূর দিয়েই আরম্ভ করেছেন এবং সাথে সাথে তাদের জিজ্ঞাসাবাদের বিষয় কেয়ামতের কথাটি সরাসরি উল্লেখ না করে মহা বা বড় খবর বলে তাদেরকে হতচকিত করে তুলেছেন। অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ যে বিষয়ে তারা মতানৈক্য করতো। এই আয়াতের দু'টি অর্থ হতে পারে- প্রথম অর্থ হতে পারে, তারা এ বিষয়ে অর্থাৎ কেয়ামতের বিষয়ে বিভিন্ন রকমের কথা-বার্তা এবং উক্তি করছে। দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে, বিশ্বজগতের পরিণতি সম্পর্কে তারা নিজেরাও একমত হতে পারে না। বিভিন্ন জন বিভিন্ন মন্তব্য করে থাকে।

মক্কার বেঈমান কুরাইশদের মধ্যে কেয়ামত এবং পরকাল সম্পর্কে

কয়েকটি মতামত ছিলো, যেমনঃ

এক. এই শ্রেণীর লোকেরা মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হতে হবে এটা বিশ্বাস করতো। কিন্তু তারা এই জীবনকে দৈহিক জীবন হবে না, হবে আত্মীক বা আধ্যাত্মিক জীবন বলে মনে করতো। তারা পরকালকে একেবারেই অবিশ্বাস করতো না, কিন্তু সেটা সম্ভব কি না এই নিয়ে তাদের মনে প্রবল সন্দেহ- সংশয় ছিলো। তাদের এই ধারণাকে সূরা জাসিয়ার ৩২ নম্বর আয়াতে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছেঃ

إِنْ نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَّمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ–

আমরা (পরকালের) বিষয়ে কেবল ধারণা রাখি, তবে এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই।

দুই. আর এক শ্রেণীর লোক ছিলো, যারা দুনিয়ার জীবন ছাড়া পরকালের জীবনকে মোটেই বিশ্বাস করতো না। সূরা-'আনআম'-এর ২৯ নম্বর আয়াতে তাদের বক্তব্য তুলে ধরে বলেন ঃ

إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ–

এই দুনিয়ার জীবনটাই একমাত্র জীবন। আমাদেরকে পুনরায় জীবিত হতে হবে না।

তিন. এদের মধ্যে কিছু লোক ছিলো প্রকৃতিবাদী। যারা আল্লাহ্কে বিশ্বাস করতো না। তাদের বক্তব্য আল্লাহ্ পাক 'সূরা-জাসিয়ার' ২৪ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করেন।

مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ–

আমাদের দুনিয়ার জীবনটাইতো শেষ জীবন। এখানেই আমাদের জীবন, এখানেই আমাদের মরণ। কালের আবর্তন ছাড়া কোনো কিছুই (শক্তি) আমাদেরকে ধ্বংস করতে পারবে না।

চার. আবার এমন কিছু লোকও ছিলো, যারা কালবাদী ছিলো না বটে, তবে পরকালের জীবনকে তারা অসম্ভব মনে করতো। তাদের মত ছিলো মরে যাওয়া লোকদেরকে আবার জিন্দা করা আল্লাহ্‌র ক্ষমতার বাইরে! তিনি একাজ করতে সক্ষম নন। আল্লাহ্‌পাক তাদের মন্তব্য সূরা 'ইয়াসীন' এর-৭৮ নম্বর আয়াতে এভাবে উল্লেখ করেনঃ

مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ−

পচা-গলা অস্থিমজ্জাকে পুনরায় জীবিত করবে এমন কে আছে ?

কাফের বেঈমানদের কেয়ামত এবং পরকাল সম্পর্কে উপরোক্ত মতামত দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, তাদের এই বিষয়ে কোনো স্থির জ্ঞান ছিলো না। তারা কেবল ধারণা এবং অনুমানের ভিত্তিতে মন্তব্য করতো। তাদের যদি এ বিষয়ে স্পষ্ট জ্ঞান থাকতো, তা হলে তারা একই বিশ্বাসে বিশ্বাসী হতো। পরকাল সম্পর্কে তাদের এই মতানৈক্য এবং উক্তির প্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌পাক এবার অত্যন্ত তাগিদের সাথে দু'দুবার প্রতিউত্তর দিয়ে বলেনঃ

كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ− ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ **কক্ষনও নয়। আবার বলছি (শোন,) কক্ষন-ই নয়।** অর্থাৎ কিয়ামত ও আখেরাত সম্পর্কে তারা যতই সওয়াল জওয়াব আলোচনা পর্যালোচনা, তর্ক-বিতর্ক, মতানৈক্য অথবা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করুক না কেনো, তাদের সবকিছুই ভুল ও ভিত্তিহীন। আখেরাতের ব্যাপারে তারা যা কিছু মনে করে তা আদৌ সত্য নয়। তাদের এই অসারতা অতিসত্তর তাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে। তখনই তারা জানতে ও বোঝতে পারবে,রাসূল (সাঃ) আখেরাত সম্পর্কে আগাম যে খবর দিয়েছিলেন, তাই সত্য ও সঠিক ছিলো। আর নিছক ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে তারা যা কিছু বলতো বা উক্তি করতো, তার পেছনে আদৌ কোনো সত্যতা নেই। অতি সত্ত্বর অর্থাৎ মৃত্যুর পর পরজগতের সবকিছু তাদের সামনে ভেসে উঠবে এবং সেখানকার ভয়াবহ দৃশ্য তারা স্বচক্ষে দেখতে পাবে।

প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! কেয়ামত ও পরকাল সম্পর্কে তৎকালীন মক্কার কাফের লোকদের যেসব ধারণা ছিলো- সকল যুগে অনুরূপ লোকদের সন্ধান পাওয়া যায়। বর্তমান যুগেও অমুসলমান তো দুরে থাক, মুসলমান নামধারী কমিউনিষ্ট নাস্তিকরাও অনুরূপ ধারণা পোষণ এবং মন্তব্য করে থাকে। সুতরাং পৈত্রিক সূত্রে নামধারী মুসলমান হলেও তারা বেঈমান কাফের। আল্লাহ্ এবং রাসূলের চরম দুষমন। অতএব তাদের ব্যাপারে ঈমানদার মুসলমানদের সতর্ক থাকা উচিত।

অতঃপর আল্লাহ্পাক কেয়ামতের বিষয়টি সাময়িক ভাবে এড়িয়ে গিয়ে তাঁর অপারশক্তি, কুদরাত, হেকমাত ও কারিগরীর কর্মকৌশলের কয়েকটি দৃশ্য তুলে ধরেছেন। যা মানব জাতির জন্য অপরিসীম বৈষয়িক নেয়ামত।

প্রথম কুদরাত ও নেয়ামত ঃ اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا। **আমি কি যমীনকে তোমাদের জন্য বিছানা স্বরূপ বানাইনি ?** অত্র আয়াতে মানব জাতির জন্য বৈষয়িক প্রথম নেয়ামতের কথা স্মরণ করে দিয়ে মহান আল্লাহ্ বলেনঃ আমি তো তোমাদের জন্য যমীন বা ভূমিকে বিছানার মতো শান্তিতে বসবাসের উপযুক্ত করে তেরী করেছি।

'মেহাদ' (বিছানা) বলতে ভ্রমণ ও চলাফেরার জন্য সমভূমি, আবার দোলনার মতো নরম বিছানা- এ দু'টি অর্থই বোঝায় এবং এখানে এ দু'টি অর্থের মধ্যে চমৎকার মিল রয়েছে। আল্লাহ্পাক সাধারণ মানুষদের বোঝানোর জন্য একেবারে অতি পরিচিত শব্দ ব্যবহার করে মানুষকে তার সৃষ্টির কুদরাত ও কর্মকুশলতার কথা তুলে ধরেছেন। যমীনকে মানুষের জন্য বিছানা অর্থাৎ শান্তিতে বসবাসের কুদরাত ও কর্মকুশলতার যে প্রকৃত রূপ নিহিত রয়েছে তা হলোঃ

১. মানুষের জন্য শান্তিতে এবং নিরাপদে বসবাসের জন্য যমীনকে বিছানো স্বরূপ বানানো হয়েছে। যেখানে পানি, আলো, বাতাস এবং তাপের সমন্বয় করা হয়েছে। জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যমীনেই করা হয়েছে।

২. জীব-জন্তুকে নিরাপদে এবং শান্তিতে বসবাসের জন্য ভূমিকে তৈরী করা হয়েছে। প্রাণী জগতের জীবন যাপন এবং চলাফেরার জন্য যা যা দরকার তা আল্লাহ্ পাক যমীনেই পয়দা করেছেন।

৩. উদ্ভিদ জগতের লালন পালনের জন্য যমীনকে পয়দা করা হয়েছে। উদ্ভিদ জগতের লালন-পালনের জন্য পানি, বাতাস, তাপ ও আলো অনুপাত এবং সহযোগীতাকে কার্যকর করা হয়েছে।

এই যমীনের উপর জীব-জন্তুর লক্ষ লক্ষ প্রজাতি এবং উদ্ভিদেরও লক্ষ লক্ষ প্রজাতি রয়েছে। আবার প্রতিটি প্রজাতির কোটি কোটি ব্যক্তি সত্ত্বাও রয়েছে। প্রত্যেকটির খাদ্য খাবারের প্রয়োজন বিভিন্ন ধরনের ও পরিমাণের। আল্লাহ্ পাক দুনিয়ার এই যমীনে প্রত্যেকটি প্রজাতির খাদ্য-খাবার এত বেশী পরিমাণ এবং এত কাছাকাছি ও আওতাধীন করে সৃষ্টি করে দিয়েছেন যে,এখানে কোনো প্রজাতিই তাদের প্রয়োজনীয়এবং জরুরী খাদ্য-খাবার হতে মাহরূম হয় না। যদি তাপ, আলো, বাতাস, পানি এবং পৃথিবীর বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে যথাযতভাবে সামঞ্জস্য ও সহযোগীতা না থাকতো, তা হলে এক কণাও খাদ্য-খাবারের অস্তিত্ব লাভ করতে পারতো না। ফলে কোনো মানুষ, জীব-জন্তু এবং গাছ-পালা বাঁচতে পারতো না। সুতরাং আল্লাহ্ পাক যমীনকে মানুষ সহ অন্যান্য জীব-জন্তু এবং গাছ-পালার জন্য নিরাপদ এবং শান্তিতে বসবাস ও লালন পালনের এক বিশেষ ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

দ্বিতীয় কুদরাত ও নেয়ামতঃ অতঃপর আল্লাহ্ পাক তার দ্বিতীয় কুদরাত এবং মানুষের জন্য নেয়ামতের কথা তুলে ধরে বলেনঃ

وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا **পাহাড়-পর্বতকে পেরেকের মতো গেড়ে দিয়েছি।**

অত্র আয়াতে পাহাড়-পর্বতকে পেরেকের সাথে তুলনা করা হয়েছে। সূরা নহলের ১৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্পাক পাহাড়কে নংগরের সাথে তুলনা করে বলেনঃ

وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ

তিনি যমীনে পর্বতের নংগর সমূহ্ গভীরভাবে গেড়ে দিয়েছেন, যাতে যমীন তোমাদেরকে নিয়ে হেলা-দোলা করতে না পারে।

সূরা মুরসালাতের ২৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্পাক বলেনঃ

وَجَعَلْنَا فِيْهَا رَوَاسِىَ شٰمِخٰتٍ

আমি তাতে (যমীনে) উঁচু উঁচু পর্বতমালা মজবুত ভাবে গেড়ে দিয়েছি। আল্লাহ্ পাকের যমীনের উপর এবং সমূদ্রের তলে অসংখ্য পাহাড়-পর্বত সৃষ্টির পেছনে অসংখ্য ফায়দার মধ্যে মৌলিক দুটি ফায়দা নিহিত রয়েছে।

প্রথম ফায়দা হলোঃ পানির উপর ভাসমান এই যমীন যাতে টলমল করে ভারসাম্য হারিয়ে না দেয়। পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষা করার জন্যই আল্লাহ্ পাক পাহাড় পর্বতগুলোকে পেরেকের মতো যমীনের উপর গেড়ে দিয়েছেন। এই পাহাড়-পর্বত সমুদ্রের পানির নীচে এবং যমীনের উপর স্থাপিত। এর কারণ হলো এর দ্বারা পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগের এবং উপরিভাগের সংকোচনকে নিয়ন্ত্রণ করা।

দ্বিতীয় ফায়দা হলোঃ এই যমীনের বুককে শুধু শূন্য সমতল মাঠ বানিয়ে রাখা হয়নি। এখানে স্থানে স্থানে ছোট বড় অসংখ্য পাহাড়-পর্বত উঁচু উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর এর পেছনে ফায়দা হলোঃ মৌসুমের পরিবর্তন, বৃষ্টি বর্ষণ, ঝর্ণা, খাল-নদী সৃষ্টি, ফল-ফসল উৎপাদনের জন্য উর্বর জমি সৃষ্টি, বড় বড় গাছপালা সৃষ্টি, নানা ধরনের খনিজ সম্পদ এবং নানা প্রকার পাথর সংগ্রহ ইত্যাদি কাজে পাহাড়-পর্বতই অবদান রাখে।

তৃতীয় কুদরাত ও নেয়ামতঃ وَخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا**–আমি তোমাদেরকে জোড়া জোড়া (নারী-পুরুষ) করে সৃষ্টি করেছি।**

অত্র আয়াতে মানুষের বিশেষ নেয়ামত তার অস্তিত্বের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। মানুষকে নারী-পুরুষ হিসেবে জোড়া জোড়া সৃষ্টির পেছনে আল্লাহ্ পাকের যে মহান উদ্দেশ্য ও সৃষ্টি কৌশল লুক্কায়িত আছে

তা হলো ঃ

এক. মানব বংশ বৃদ্ধি। আল্লাহ্‌পাক যদি আদম (আঃ)-কে সৃষ্টির পর বিবি হাওয়াকে সৃষ্টি না করতেন তাহলে হয়তো আজ পৃথিবীর বুকে আদম (আঃ) ছাড়া আর কেউ থাকতো না। পৃথিবী আবাদ হতো না। আল্লাহ্‌পাকের অসংখ্য নেয়ামতের ভোগ-ব্যবহারের সুযোগ হতো না। মানুষ সৃষ্টির পেছনে আল্লাহ্ পাকের যে মহান উদ্দেশ্য-তাঁর বন্দেগী এবং দুনিয়ায় খেলাফতের দায়িত্ব পালন করা তা ব্যর্থ হয়ে যেতো।

দুই. জোড়া জোড়া সৃষ্টির দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ্ পাক পুরুষ এবং নারীর মধ্যে পৃথক পৃথক যেসব আবেগ, প্রেম, ভালবাসা, দয়া-মায়া, সহানুভুতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তা প্রয়োগের সুযোগ থাকতো না। সবকিছু নিস্প্রাণ ও নির্জীব হয়ে যেতো।

জানার বিষয় হলোঃ আয়াতে জুড়ি বা জোড়া বলতে কেবলমাত্র মানব জাতির স্ত্রী-পুরুষকেই বোঝায় না। বরং সকল প্রকার জীব-জন্তু ও উদ্ভিদ জগতের স্ত্রী-পুরুষ বোঝায়। এছাড়া আরো অনেক জিনিস এমন আছে যাকে আল্লাহ্‌পাক স্ত্রী-পুরুষের মত করে বানিয়েছেন। এদের একে অপরের সংমিশ্রণ ও মিলনের ফলেই নতুন নতুন জিনিসের উদ্ভব হয়। যেমন উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বিদ্যুতেও স্ত্রী-পুরুষ রয়েছে যাকে নেগেটিভ-পজেটিভ বলা হয়। এরা পরস্পরে জোড়া। এদের পরস্পরের সংমিশ্রণের ফলে গোটা দুনিয়ায় বিস্ময়কর সৃষ্টি ধারা অব্যাহত রয়েছে। এভাবে আল্লাহ্‌পাক তাঁর সৃষ্টি জুড়ি বানিয়ে গোটা দুনিয়াকে চলমান, উদ্ভাসিত এবং কার্যকর করে দিয়েছেন।

চতুর্থ কুদরাত ও নেয়ামতঃ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا

আমি তোমাদের ঘুমকে ক্লান্তি দুরকারী শান্তির বাহন বানিয়ে দিয়েছি।

سُبَاتًا শব্দটি سَبْتٌ– থেকে উদ্ভব হয়েছে। এর অর্থ কমানো, কর্তন করা। ঘুম মানুষের চিন্তা-ভাবনাকে কর্তন করে বা কমিয়ে তার অন্তর ও মস্তিষ্ককে এমন স্বস্তি ও শান্তি দান করে, যার বিকল্প দুনিয়ার কোনো শান্তি

হতে পারে না।

মানুষ দুনিয়ায় দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাকে যেমন দৈহিক পরিশ্রম করতে হয়, তেমনি তাকে অমানসিক চিন্তাও করতে হয়। আল্লাহ্পাক যদি ঘুমের মাধ্যমে এ দু'টি জিনিস থেকে অবসাদ গ্রহণের সুযোগ করে না দিতেন, তাহলে এক সময় মানুষ দৈহিক শক্তি হারিয়ে ফেলতো এবং মানসিক চাপে মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটতো। ঘুম মানুষের জন্য এমন এক বড় নেয়ামত যে, মানুষ যখন জীবন যুদ্ধে এবং সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে শারিরীক এবং মানসিক ভাবে ক্লান্ত-শ্রান্ত,ভীত সন্ত্রস্ত এবং চরম চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়ে, তখন ঘুম তাকে এমনভাবে প্রশান্তি দেয় যে, ঘুমের পূর্বে কি ঘটেছিলো তা সে সহজে মনে করতে পারে না। ঘুমের মাধ্যমে মানুষ যেমন দৈহিক শক্তি ফিরিয়ে পায়, তেমনি মানসিক প্রশান্তিও লাভ করে নতুন উদ্দোমে দায়িত্ব পালনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। যেমন ভাবে বদর ও উহুদ যুদ্ধে আল্লাহ্ তাআলা সাহাবায়ে কেরামকে ঘুমের দ্বারা মানসিক অস্থিরতা দুর করে দিয়েছিলেন।

পঞ্চম কুদরাত ও নেয়ামতঃ وَجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا**- আর রাতকে করেছি আবরণ।** অর্থাৎ আমি রাতকে করেছি পোষাকের মতো আবরণ। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, স্বাভাবিকভাবে মানুষের ঘুম তখনই আসে, যখন আলোর ঝলকানি না থাকে। চারদিক নীরব থাকে এবং হট্টগোল না থাকে। আল্লাহ্ তাআলা রাতকে আবরণ বলে এ কথাই বোঝাতে চান যে, তিনি তোমাদেরকে কেবল ঘুমই দেননি; বরং সারা দুনিয়ায় ঘুমের পরিবেশও তৈরী করে দিয়েছেন। যা মানুষের জন্যে এক বিশেষ নেয়ামত।

ষষ্ঠ কুদরাত ও নেয়ামতঃ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا **দিনকে করেছি আয়-রোজগারের সময়।**

মানুষের সুখ ও শান্তির জন্য. প্রয়োজনীয় রুজি তালাশ করা অত্যন্ত জরুরী। যদি সারাক্ষণ রাতই থাকতো এবং মানুষ কেবল ঘুমই পড়তো

তা হলে এসব আয় রোজগার কিভাবে হতো ? তাই আল্লাহ্‌পাক আলো উজ্জ্বল দিন সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষকে জীবিকা অর্জনের সুযোগ করে দিয়েছেন। এভাবে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর সৃষ্টির ভারসাম্য রক্ষা করেছেন এবং এ বিশ্ব জগতকে বসবাসের উপযোগী করে দিয়েছেন। এটাও মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মস্ত বড় নেয়ামত।

সপ্তম কুদরাত ও নেয়ামতঃ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا **আমি তোমাদের মাথার উপর সাতটি মজবুত আকাশ তৈরী করেছি।** পৃথিবীবাসীর মাথার উপর সাতটি মজবুত জিনিস বলতে, আল্লাহ্ তাআলা থরে থরে সাজানো সাতটি আকাশকে বুঝিয়েছেন। কুরআনের অন্য যায়গায় সাতটি কক্ষপথ বলা হয়েছে। এসব সৃষ্টির পেছনে কোন্ মহান উদ্দেশ্য ও কৌশল নিহিত রয়েছে একমাত্র তা আল্লাহ্ পাকই জানেন। এটা মানুষের বোধগম্য নয়। তবে মানুষ গবেষণার মাধ্যমে বিভিন্ন মত প্রকাশ করে থাকে। যা কেবল অনুমান ভিত্তিক।

شِدَادًا সুদৃঢ় বা মজবুত শব্দ দ্বারা এই ইঙ্গিত দেয় যে, এ সাতটি জিনিসের গঠন-প্রকৃতি অত্যন্ত মজবুত। তাদের কাঠামো খুব শক্ত এবং একটি অপরটির সাথে এমনভাবে আবদ্ধ যে, কোনোটিকে কোনোটি থেকে পৃথক করা যায় না।

আধুনিক বিজ্ঞানীরা আকাশ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন যে, আকাশ বলতে এমন শক্ত কোনো বস্তু নয়। মানুষ যখন মাথার উপর শূণ্যের দিকে তাকায় তখন তার দৃষ্টি সীমার বাইরে চলে যাবার কারণে নীল দেখায়। এখানে স্তরে স্তরে সাজানো ছাদের মতো সাতটি আকাশ বলে কিছু নেই। কিন্তু কোরআন এবং হাদীসে আকাশকে ছাদের মতো শক্ত বস্তু বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন মহানবী (সাঃ)-এর মে'রাজের ঘটনায় উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, মহানবী (সাঃ) বায়তুলমাকদেশ থেকে উর্দ্ধাকাশে (মেরাজ) সিঁড়ি জাতীয় জিনিস দিয়ে উঠতে থাকলেন এবং প্রথম আসমানে গেলেন। সেখানে দরজায়

মোতায়েন ফেরেশতারা তাঁকে সালাম এবং শুভেচ্ছা জানালেন। এভাবে সাতটি আকাশ একইভাবে অতিক্রম করলেন। আর সাতটি আকাশে সাতজন বিশিষ্ট নবীর সাথেও স্বাক্ষাৎ করলেন। এই হাদীস থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, সাতটি আসমানই শক্ত বস্তুর মতো মজবুত জিনিস যার দরজা আছে।

অষ্টম কুদরাত ও নেয়ামতঃ অতঃপর আকাশের সাথে সম্পৃক্ত কয়েকটি উপকরণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যা মানুষের জন্য অত্যন্ত উপকারী এবং সুখের। তার মধ্যে সব চেয়ে বড় উপকারী উপকরণ হচ্ছে সূর্যের আলো। তাই বলা হয়েছেঃ وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا

আমি একটি অতি উজ্জ্বল প্রদীপ (সূর্য) সৃষ্টি করেছি।

وَّهَّاجًا শব্দের অর্থ (একসাথে) অত্যন্ত উত্তপ্ত ও অতি উজ্জ্বল। অনুবাদে এ দু'টি দিককে শামিল করা হয়েছে। এর মধ্যে আল্লাহ্ তাআলার অসীম কুদরাত এবং সৃষ্টি কৌশলের এক বিরাট নিদর্শনের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই সূর্যের ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের চেয়ে ১০৯ গুণ এবং আয়তনে ৩ লক্ষ ৩৩ হাজার গুণ বড়। তার তাপমাত্রা ১ কোটি ৪০ লক্ষ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেট। তার অবস্থান পৃথিবী থেকে ৯ কোটি ৩০লক্ষ মাইল দূরে হওয়া সত্ত্বেও তার আলো এতই তেজস্বী যে, খালি চোখে একনিষ্ঠভাবে তাকিয়ে থাকলে অবশ্যই চোখ ঝলসে যাবে এবং দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে যাবে। তার তাপ এতই প্রচন্ড যে, পৃথিবীর কোনো কোনো অংশে তাপমাত্রা ১৪০ ডিগ্রী ফারেনহাইট পর্যন্ত পৌঁছিয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ্‌র কি অসীম মেহেরবাণী যে, তিনি তার সৃষ্টি কৌশলের মাধ্যমে পৃথিবীকে সূর্য থেকে একটা বিশেষ দূরত্বে স্থাপন করেছেন। খুব কাছে নয় বলে পৃথিবী বেশী উত্তপ্ত হয় না এবং খুব বেশী দূরেও নয় বলে পৃথিবী একেবারে ঠান্ডাও হয়ে যায় না। আর এ কারণেই এখানে মানুষ, জীবজন্তু এবং গাছপালার জীবন সম্ভব হয়েছে। যদি সূর্যের আলো প্রয়োজনের তুলনায়

বেশী অথবা কম হতো তা হলে মানুষ, জীব-জন্তু এবং গাছ-পালা কিছুই বাঁচতে পারতো না। মানুষ সহ সকল সৃষ্টি জীবনের জন্য এ এক বড় নেয়ামত। এই সূর্যের কারণে আমাদের ফসল পাকে। আল্লাহ্‌র সৃষ্টি জীব তার কারণেই খাবার পাচ্ছে। তার তাপেই সমুদ্রের পানি উত্তপ্ত হয়। তার ফলেই তা থেকে যে বাষ্প তৈরী হয়, তাই মেঘের আকারে বাতাসের সাহায্যে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে এবং বৃষ্টি বর্ষিত হয়। এই সূর্যে আল্লাহ্ পাক এমন এক বিরাট-বিশাল অগ্নিকুন্ড জ্বালিয়ে রেখেছেন, যা কোটি বছর থেকে আলো, তাপ ও বিভিন্ন প্রকারের রশ্মি গোটা সৌরজগতে প্রতিনিয়ত নিক্ষেপ করে যাচ্ছে। আল্লাহ্‌র এই অফুরন্ত নেয়ামতের শোকরিয়া আদায় করে শেষ করা যাবে না।

নবম কুদরাত ও নেয়ামতঃ মানষের অত্যন্ত উপকারী এবং সুখের জিনিস আকাশের নীচে সৃষ্ট জিনিসের মধ্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস মেঘমালার কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্‌পাক বলেনঃ

وَّاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاۤءً ثَجَّاجًا

আমি জলধর মেঘমালা থেকে প্রচুর বৃষ্টিপাত করি। পূর্বের আয়াতে যে উজ্জ্বল সূর্যের কথা বলা হয়েছে। তারই প্রভাবে মহাসাগরে বাষ্প তৈরী হয়ে আকাশে মেঘের সৃষ্টি করে ও বৃষ্টি আকারে নেমে আসে।

অত্র আয়াতে পানি ভরা মেঘ থেকে প্রচুর পানিবর্ষণ করার কথা বলা হয়েছে। মেঘ ঘনীভুত হয়ে যখন ভারী হয়ে যায়, তখনই পানি আকারে মশুল ধারে বৃষ্টি হয়।

দশম কুদরাত ও নেয়ামতঃ অতঃপর আল্লাহ্‌পাক মেঘ থেকে বৃষ্টিপাতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেনঃ لِنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا– وَجَنّٰتٍ اَلْفَافًا

যাতে করে তা থেকে উৎপন্ন করি (নানা রকমের) ফল-ফসল, শাক-সব্জি এবং ঘন পাতা বিশিস্ট বাগান।

আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মানুষেরই কল্যাণ এবং সুখের জন্য ধারাবাহীক ভাবে যেসব কুদরাত এবং নেয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তারই সূত্র ধরে সর্বশেষ নেয়ামত হলো, সূর্যের তাপ থেকে সমুদ্রে বাষ্প হয়, সেই বাষ্প আকাশে গিয়ে মেঘের সৃষ্টি করে। সেই মেঘমালা যখন জলীয় পাম্পের আধিক্যের কারণে ভারি হয়ে যায়, তখনই যমীনে মশুলধারে বৃষ্টি হয়। আর সেই বৃষ্টি থেকেই মানুষের জীবন ধারণ এবং আরাম আয়েশের জন্য নানা রকমের ফল-ফসল, শাক-সব্জি, তরি-তরকারী এবং আনন্দদায়ক বাগ-বাগিচা উৎপাদিত হয়।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আল্লাহ্পাক তাঁর সৃষ্টির কুদরাত এবং কৌশলের কথাগুলো মানুষের সামনে এই জন্যই উপস্থাপন করলেন, যাতে করে তারা কেয়ামত এবং পরকাল সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক, বাক-বিতন্ডা, ঠাট্টা-বিদ্রুপ এবং সংশয়-সন্ধেয় না করে। তারা যেনো মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাদের প্রতি সকল অনুগ্রহ এবং নেয়ামতের কথা স্মরণ করে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন দান করে হেসাব-নেকাশের মাধ্যমে তাদের স্থায়ী ঠিকানা জান্নাত অথবা জাহান্নামে যেতে হবে, তার উপর ঈমান বা প্রত্যয় সৃষ্টি হয়।

শিক্ষাঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! সূরা 'নাবা' এর ১-১৬ নম্বর আয়াত পর্যন্ত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমাদের জন্য যে, সব শিক্ষা রয়েছে তা হলো, দুনিয়ার এই ক্ষণস্থায়ী জীবনকে কিয়ামতের মাধ্যমে ধ্বংস করে পুনরায় আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সকল মানুষকে জীবন দান করে হাশরের ময়দানে আল্লাহ্র সামনে বিচারের সম্মুখীন হতে হবে সেই বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস এবং প্রত্যয় রাখতে হবে। সে ক্ষেত্রে তর্ক-বিতর্ক তো দূরের কথা নূন্যতম সন্দেহ-সংশয় এমনকি মনের খটকাও যেনো আমাদের দেলে সৃষ্টি

না হয়। বরং সে ব্যাপারে দৃঢ় ঈমান রাখা এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মানুষেরই কল্যাণ, আরাম-আয়েশ, উপকার ও প্রয়োজনে যেসব নেয়ামতের কথা বর্ণনা করা হয়েছে তার শোকরানা স্বরূপ একমাত্র তারই সামনে মস্তক অবনত করে একমাত্র তারই বন্দেগী করা।

আহ্বানঃ সম্মানিত ভায়েরা·/ বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা **নাবা** থেকে যে দারস পেশ করলাম তাতে যদি আমার অজান্তে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে যায় তার জন্য আল্লাহ্ পাকের দরবারেই ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর এই দারস থেকে যে শিক্ষা আমারা লাভ করলাম, তা যেনো বাস্তব জীবনে আমল করতে পারি সেই তৌফিক কামনা করে শেষ করছি।

মুনাফিকদের আচরণ

সূরা বাকারা ৮-১৬ আয়াত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا
هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ- يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَمَا
يَخْدَعُوْنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ- فِىْ قُلُوْبِهِمْ
مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ بِمَا كَانُوْ
يَكْذِبُوْنَ- وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ قَالُوْٓا
اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ- اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا
يَشْعُرُوْنَ- وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْا
اَنُؤْمِنُ كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ
لَّا يَعْلَمُوْنَ- وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَاِذَا
خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ - قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ
مُسْتَهْزِءُوْنَ- اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِىْ
طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ- اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِا

لْهُدٰى فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ–

সরল অনুবাদঃ ইরশাদ হচ্ছে–(৮) মানুষের মাঝে এমন কিছু লোক আছে যারা (মুখে) বলে, আমরা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরা ঈমানদার নয়। (৯) এরা (মুখে মুখে ঈমানের দাবী করে) আল্লাহ্ ও ঈমানদারদেরকে ধোঁকা দিতে চায়। অথচ তারা নিজেরা নিজেদেরকেই ধোঁকা দেয়, কিন্তু তারা তা অনুভব করতে পারে না। (১০) আসল কথা হলো এদের মনের মধ্যে আছে এক ধরনের মারাত্মক রোগ। (ক্রমাগতভাবে এই প্রতারণার পথে চলার কারণে) আল্লাহ্ তাদের এই (মনের) রোগকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর তাদের এই মিথ্যাচারিতার জন্য ভয়াবহ আযাব অপেক্ষা করছে। (১১) তাদের যখন বলা হয়, দুনিয়াতে তোমরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না, তখন তারা (প্রতিউত্তরে) বলে, আমরাই তো সংশোধনকারী। (১২) অথচ এরাই আল্লাহ্র এই যমীনে ফেৎনা-ফাসাদ সৃষ্টিকারী, কিন্তু তাদের এ ব্যাপারে কোনো চেতনা নেই। (১৩) আর তাদেরকে যখন বলা হয়, অন্যান্য লোকেরা (অর্থাৎ সাহাবীরা) যেভাবে ঈমান এনেছে তোমরাও সেভাবে ঈমান আনো। তখন তারা বলে, (তুমি কি চাও যে,) আমরাও সে সব বোকা লোকদের মতো ঈমান আনি ? (সত্যি কথা হচ্ছে) এরা নিজেরাই বোকা, কিন্তু তারা তা অনুভব করে না। (১৪) (এ ধরনের মুনাফিক লোকদের চরিত্র এই যে) এরা যখন ঈমানদার লোকদের সাথে মিশে তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আবার যখন তারা নিরিবিলি নিজেদের শয়তানী চক্র (ইহুদী নেতাদের) সাথে মিলিত হয়, তখন বলে, আমরা তো তোমাদের সাথেই আছি, আমরা কেবল (মুসলমানদের সাথে) ঠাট্টা-বিদ্রুপ করছিলাম মাত্র। (১৫) আসলে আল্লাহ্ই তাদের সাথে উপহাস করেন। আর তিনি তাদের বিদ্রোহের রশিকে লম্বা করে দিয়েছেন, যেনো তারা অন্ধের মতো গোমরাহীর মধ্যে হাবুডুবু খায়। (১৬) এরা (জেনে-শুনে) হেদায়েতের বিনিময়ে গোমরাহীর পথকে খরিদ করে নিয়েছে।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থঃ وَ-এবং। مِنَ-হতে। اَلنَّاسِ-মানবমন্ডলী। -مَنْ-যে, যারা। يَقُوْلُ-তারা বলে। اٰمَنَّا-আমরা ঈমান এনেছি। بِ-প্রতি। اَلْيَوْمَ-দিবস। اَلْاٰخِرِ-শেষ, পরকাল مَا-নহে। هُمْ-তারা। بِمُؤْمِنِيْنَ-বিশ্বাসী। يُخٰدِعُوْنَ-তারা ধোকা দেয়। اَلَّذِيْنَ-যারা। اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছে। مَا-না। اَنْفُسَهُمْ-তাদের জীবনসমূহ। يَشْعُرُوْنَ-তারা বোঝে। فِى-মধ্যে। قُلُوْبِهِمْ-তাদের অন্তরসমূহ। مَرَضٌ-ব্যাধি, রোগ। فَزَادَهُمُ-অতঃপর বৃদ্ধি করে দিয়েছে। لَهُمْ-তাদের জন্য। عَذَابٌ-শাস্তি। اَلِيْمٌ-যন্ত্রণাদায়ক। بِمَا-কারণ। كَانُوْا-তারা হলো। يَكْذِبُوْنَ-মিথ্যাবাদী। اِذَا-যখন। قِيْلَ-বলা হয়। لَاتُفْسِدُوْا- তোমরা অশান্তি/বিশৃংখলা সৃষ্টি করো না। اَلْاَرْضِ-পৃথিবীতে। قَالُوْا-তারা বলে। اِنَّمَا-নিশ্চয় আমরা। مُصْلِحُوْنَ-সংশোধনকারী বা শান্তি স্থাপনকারী। اَلَّا-সাবধান বা জেনে রাখো। انهم-নিশ্চয় তারা। وَلٰكِن-এবং কিন্তু। لَايَشْعُرُوْنَ-তারা বোঝে না। اٰمَنُوْا-ঈমান আনো। كَمَا-যেমন, যেরূপ। اَ-কি। انؤمن-আমরা ঈমান আনবো। اَلسُّفَهَاءُ-নির্বোধ বা বোকাদের। لَا يَعْلَمُوْنَ- তারা জানে না। لَقُوْا-তারা মিলিত হয়। خَلَوْا- নির্জন বা নিরিবিলি اِلٰى-দিকে, সংগে। شَيٰطِيْنِهِم-তাদের শয়তানী নেতৃবৃন্দ। اِنَّا-নিশ্চয় আমরা। مَعَكُمْ-তোমাদের সংগে। مُسْتَهْزِءُوْنَ -

উপহাসকারী বা বিদ্রুপকারী। اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ-আল্লাহ তাদের সাথে উপহাস করেন। وَيَمُدُّهُمْ-এবং তাদেরকে অবকাশ বা ঢিল দিচ্ছে। طُغْيَانِهِمْ-তাদের অবাধ্যতা। يَعْمَهُوْنَ-তারা উদভ্রান্ত হয়ে বেড়ায়। اُولٰئِكَ-ওরা-ই। اِشْتَرَوُا-খরিদ করেছে। اَلضَّلٰلَةَ-গোমরাহী, ভ্রষ্টতা। بِالْهُدٰى- হেদায়েতের পরিবর্তে বা বদলে। مَا رَبِحَتْ- লাভজনক হয়নি। تِجَارَتُهُمْ- তাদের ব্যবসা। وَمَا كَانُوا مُهْتَدِيْنَ-এবং তারা হেদায়েত লাভ করেনি।

সম্বোধনঃ দারসে কুরআন মাহফিলে/ প্রোগ্রামে উপস্থিত প্রিয়/সম্মানিত দ্বীনদার ভায়েরা/বোনেরা / ভাই ও বোনেরা! আস্‌সালামু আলাইকুম অয়া রাহ্‌মাতুল্লাহি অয়া বারাকাতুহ্। আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কালামে হাকীম আল-কুরআনের সবচেয়ে বড় সূরা সূরাতুল বাকারার ৮ থেকে ১৬ মোট ৯টি আয়াত তিলাওয়াত ও সরল অনুবাদ পেশ করেছি। আল্লাহ্ তাআলা যেনো আমাকে আপনাদের সামনে সঠিকভাবে দারস পেশ করার তৌফিক দান করেন। **অমা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ্।**

সূরার নাম করণঃ এ সূরাটির নাম **সূরাতুল বাকারা**। "বাকারাতুন" শব্দের অর্থ গাভী বা গরু। এ সূরার ৮ম রুকুর ৬৭-৭১ নম্বর আয়াত পর্যন্ত বনী-ইসরাঈলদের প্রতি গরু কুরবাণীর নির্দেশ দিতে গিয়ে "বাকারা" শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এই সূরার নাম **সূরাতুল বাকারা** রাখা হয়েছে। বাকারা নাম করণের ফলে এটা মনে করা যাবে না যে, এতে শুধু গরু সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে। কুরআনের প্রায় প্রতিটি সূরাতেই এতো বেশী বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যে, বিষয়বস্তুর দিক থেকে কোনো সূরার নামকরণ শিরোনাম হিসেবে নির্ধারণ করা খুব কঠিন ব্যাপার। এজন্য নবী করীম (সাঃ) আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশ মতো শিরোনামের পরিবর্তে সূরার মধ্য থেকে কোনো একটি শব্দকে বেছে নিয়ে

সূরার পরিচিতি হিসেবে নামকরণ করেছেন। সুতরাং **বাকারা** নামটি এই সূরার পরিচিতি হিসেবে নেয়া হয়েছে।

সূরাটি নাযিল হবার সময়কালঃ এই সূরার অধিকাংশ আয়াতই হিজরতের পর মাদানী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়। অবশ্য এর কিছু আয়াত মাদানী জীবনের প্রায় শেষের দিকে যেমন সূদ হারাম সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হয়। কিন্তু বিষয়বস্তুর সাথে মিল থাকার কারণে এ সূরার সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। আবার এই সূরার শেষের আয়াতগুলো হিজরতের আগে মক্কায় নাযিল হয়েছিলো। কিন্তু বিষয়বস্তুর সাথে মিল থাকার কারণে এই সূরার সাথে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। তবে সবকিছুই করা হয়েছে ওহীর মাধ্যমে। এই সুরার অধিকাংশ আয়াত হিজরতের পরে মদীনায় নাযিল হয়েছে বিধায় এ সূরাকে মাদানী সূরা বলা হয়। এটা কুরআন শরীফের সবচেয়ে বড় সূরা। এতে ৪০টি রুকু ও ২৮৬টি আয়াত রয়েছে।

সূরার বিষয়বস্তুঃ এই দীর্ঘতম সূরায় ইসলামের অধিকাংশ মূল নীতিগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। এতে নামায, রোজা, যাকাত, হজ্ব, বিবাহ-তালাক, হালাল-হারাম, ব্যবসা-বাণিজ্য, জিহাদ, যুদ্ধনীতি এবং বিভিন্ন বিষয়ের নীতি-নিয়ম বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। মুত্তাকীনদের বৈশিষ্ট্য, মুনাফিকদের আচরণ, কাফিরদের পরিনতি, আদম ও হাওয়া (আঃ)-এর সৃষ্টির ইতিহাস, বনী ইসরাঈলদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ এবং তাদের নাফারমানীর কথাও বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশ এবং সবশেষে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ কামনার জন্য আল্লাহ্ পাক তাঁর বান্দাদের এক হৃদয়গ্রাহী মুনাজাত শিখিয়ে দিয়েছেন।

আলোচ্য আয়াতগুলোর বিষয়বস্তুঃ তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোতে কপট বিশ্বাসী মুনাফিকদের আচরণ বা বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করে তাদের প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

পটভূমিঃ মাক্কী সূরাগুলোতে আল্লাহ্ তাআলা সাধারণতঃ মক্কার কাফের ও মুসলমানদেরকে সম্বোধন করেই বিভিন্ন আয়াত ও সূরা নাযিল করেন।

তার কারণ, মক্কাতে এ দু'টি দলই ছিলো। মুসলমানেরা মুহাম্মদ (সাঃ) কে আল্লাহ্‌র রাসুল এবং কুরআনকে আল্লাহ্‌র কালাম হিসেবে মানতো এবং কাফেররা রাসূলের বিরোধীতা করতো ও কুরআনকে আল্লাহ্‌র কালাম বলে স্বীকার করতো না। এজন্য এই দু'দলের উপলক্ষ্যেই কুরআনের আয়াত নাযিল হতো। কিন্তু মদীনায় হিজরতের পর আরো দু'টি দল **ইহুদী ও মুনাফিক** এদের মোকাবেলা করতে হলো। ইহুদীরা আহলে কিতাব (কিতাব ধারী) হবার কারণে তারা নবী, রাসূল, বেহেশত, দোযখ, কেয়ামত, আখেরাত ও আসমানী কিতাব–ইত্যাদি সম্পর্কে জানতো এবং সেগুলো বিশ্বাস করতো। অতীতের আসমানী কিতাব, তাওরাত, যাবুর এবং ইঞ্জিলে রাসূলের পরিচয় ও তাঁর উপর নাযিল করা কুরআন আল্লাহ্ তাআলার নিজস্ব কালাম হবার সত্যতা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইহুদীরা খালি খালি হিংসা এবং অহংকারের বশবর্তী হয়ে তার সত্যতা সম্পর্কে জানা-শোনার পরও রাসূলের বিরোধিতা করতো। আর মুনাফিকরা ইসলামী রাষ্ট্রের আর্থিক সুযোগ-সুবিধা এবং নেতৃত্বের লোভে মুখে মুখে নিজেকে মুসলমান হিসেবে জাহির করলেও অন্তরে কুফরী রেখে আল্লাহ্‌র রাসূল ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে সব সময় শত্রুতা করতো। এমনকি তারা এতো মারাত্মক ছিলো যে, কিভাবে মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর দলকে ধ্বংস করা যায় তার ষড়যন্ত্রে সদাসর্বদা ব্যস্ত থাকতো এবং সুযোগ পেলেই কাজে লাগাতো। এ জাতীয় লোকদের মধ্যে অন্যতম ছিলো আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুল। মদীনায় রাসূলের আগমনের পূর্বে তার গোত্রের লোকেরা তাকে রাজা বানিয়ে বরণ করে নেয়ার জন্য মালা তৈরী করে রেখেছিলো।

সূরা বাকারার শুরুতেই মুমিন মুত্তাকীনদের গুনাবলী, কাফেরদের অবস্থান ও পরিণতি এবং মুনাফিকদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সূরার ২য় রুকুতে অর্থাৎ যা দারসের জন্য পেশ করা হয়েছে সেখানে মুনাফিকদের পরিচয় স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

ব্যাখ্যাঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত সূরা বাকারা এবং আলোচ্য আয়াতগুলো সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেয়ার পর এখন আমি আপনাদের

সামনে তেলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা পেশ করছিঃ

আল্লাহ্ পাক মানব জাতিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন প্রথম শ্রেণীভুক্ত হলো-মুমিন মুত্তাকী লোক। তাদের পরিচয় অত্র সূরার ২ থেকে ৫ নম্বর আয়াতে তুলে ধরেছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হলো-কাফের-গোষ্ঠী। অত্র সূরার ৬ এবং ৭ নম্বর আয়াতে তাদের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। আর তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হলো-মুনাফিকদের দল। তাদের পরিচিতি ৮ থেকে ১৬ নম্বর আয়াতে বিস্তারিত ভাবে বিবরণ দেয়া হয়েছে। যা আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করা হয়েছে। আর তা হলোঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ–

মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা (মুখে) বলে আমরা আল্লাহ্ এবং পরকালে ঈমান এনছি। (আল্লাহ্ বলেন) অথচ তারা আদৌ ঈমান আনেনি। আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওবাই ইবনে সলুল এর নেতৃত্বে যে মুনাফিক দলটি মদিনার ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করতো, দলের এই লোকেরা প্রকাশ্যে কাফেরদের দলভুক্ত না হলেও মনের দিক থেকে তারা ছিলো কাফের। মুসলমানদের দলভুক্ত থেকে পার্থিব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার জন্যই নিজেদেরকে ঈমানদার বলে দাবী করতো। কিন্তু আসলে তারা তারা তা ছিলো না। আল্লাহ্ আ'লেমুল গায়েব বিধায় তাদের মনের খবর রাখতেন। তাই আল্লাহ্ তাদের এই দাবীকে প্রত্যাখ্যান করে দিয়ে বলেন, এরা মোটেই ঈমানদার নয়, বরং এরা কপট মোনাফিক। আল্লাহ্ তাদের এই মোনাফীকি আচরণ তুলে ধরে বলেনঃ

يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ–

তারা (এ মিথ্যা দাবী দ্বারা) আল্লাহ্ এবং ঈমানদারদেরকে ধোঁকা দিতে চায়। অথচ এতে তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে ধোঁকা

দেয় না। কিন্তু তারা তা বোঝতে পারে না।

যারা প্রকাশ্যে তাদের কুফরী চেহারা প্রকাশ করতে হিম্মত রাখে না, তারাই আবার নিজেদেরকে খুবই চতুর, চালাক ও ধুরন্ধর মনে করে এবং সহজ সরল মুমিন মুসলমানদেরকে ধোকা দিতে সক্ষম বলে আত্মতৃপ্তি লাভ করে। আসলে তারা মুমিনদেরকে নয়, বরং আল্লাহ্কেই ধোকা দেয় বা দেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের এটা বোঝার বোধশক্তি নেই। মুনাফিকদের এই চালবাজির কারণে তারা নিজেরাই দুনিয়াতেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং পরকালেও ক্ষতির সম্মুখীন হবে। দুনিয়াতে একজন মুনাফিক হয়তো কিছুদিনের জন্য লোকদেরকে প্রতারিত করে রাখতে পারে। কিন্তু তা কখনও স্থায়ী হতে পারে না। একদিন না একদিন তাদের প্রতারণার জাল ছিন্ন হয়ে আসল চেহারা জাতির সামনে প্রকাশ পেয়ে যাবে। তখন তাদের সামাজিক সম্মান-মর্যাদা বলতে আর কিছুই থাকবে না। কেউ তাদের বিশ্বাস করতে পারবে না। আর পরকালের তো কোন কথাই নেই। কারণ সেখানে ঈমানদারীর মৌখিক দাবীর কোনো মূল্যই দেয়া হবে না।

তারা আল্লাহ্ এবং মুমিনদেরকে ধোকা দেয় এই উক্তির মধ্যে আমরা একটা সত্য বিষয়ের সন্ধান পাই। আর তা হলো-আল্লাহ্ ও মুমিনদের মাঝে ঘনিষ্ট সম্পর্ক। এই সম্পর্কের কারণে তিনি মুমিনদের পরিস্থিতিকে নিজের পরিস্থিতি হিসেবে অবিহিত করেন। তিনি তাদেরকে নিজের কাছে টেনে নেন। তাদের সব দায়-দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন। তাদের দুশমনকে নিজের দুশন মনে করেন। তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তকে নিজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং চক্রান্ত বলে মনে করেন। এটা মুমিনদের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বিরাট নেয়ামত। এর দ্বারা তিনি মুমিনদের মর্যাদা এবং সম্মানকে বাড়িয়ে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে মুমিনদের ধোঁকা ও প্রতারণাকারী মুনাফিকদের বিরুদ্ধে কঠোর হুমকি প্রদান করেন। কেননা আল্লাহ্র বন্ধুদের সাথে লড়াই করতে হলে তাদেরকে খোদ্ আল্লাহ্র সাথে লড়াই করতে হবে। এই জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলে তাদেরকে খোদ্ আল্লাহ্র শত্রুতা ও প্রতিরোধের ঝুঁকি কাঁধে নিতে হবে।

প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এরকম আচরণের লোকদের বিচরণ সকল সময় সকল যুগে লক্ষ্য করা যায়। সারা দুনিয়ায় মুসলমানদের মধ্যে এক শ্রেণীর কপোট মুনাফিক মুসলমানের অবস্থান দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশও মুসলমান নামধারী- যারা বাম রাজনীতির সাথে জড়িত ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী এবং তথাকথিত কমিউনিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এ আচরণ দেখা যায়। যা তৎকালীন সুবিধাবাদী মুসলমান মুনাফিকদের আচরণের সাথে মিল পাওয়া যায়। তারা ইসলাম এবং মুসলমানদের তাহজীব ও তামাদ্দুনের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে প্রকৃত মুসলমানদের বোকা বানিয়ে বিভিন্ন সময় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকে। কিন্তু এতে তাদের দুনিয়া এবং আখেরাতের পরিণতি যে অত্যন্ত ভয়াবহ তা তাদের অনুভূতিতে ধরা পড়ে না।

মুনাফিকরা কি কারণে এই ব্যর্থ অপচেষ্টা এবং নিস্ফল প্রতারণায় লিপ্ত হয় তার জবাব হচ্ছেঃ

فِى قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ- بِمَا كَانُوْ يَكْذِبُوْنَ-

(আসল কথা হচ্ছে) **এদের মনের মধ্যে আছে মারাত্মক রোগ, অতঃপর আল্লাহ্ তাদের এই মনের রোগকে আরো বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে পীড়াদায়ক আযাব। কেননা তারা ছিলো মিথ্যাবাদী।**

তাদের মনে রয়েছে রোগ এখানে রোগ বলতে মুনাফিকীর ব্যাধি বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ নিজের মনের কথাকে প্রকাশ করার হিম্মত না করা। এটা হচ্ছে মনের বড় রকমের রোগ।

আল্লাহ্ সেই রোগ আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। এর অর্থ হলো-আল্লাহ্ মুনাফিকদের শাস্তি সংগে সংগে দেন না। বরং তিনি তাদেরকে যথেষ্ট সুযোগ ও স্বাধীনতা দেন। এর ফলে মুনাফিকরা তাদের চালবাজি, কূটকৌশল ও প্রতারণা বাহ্যিক ভাবে সফল হতে দেখে তারা আরও বেশী

বেশী মুনাফিকীতে জড়িয়ে পড়ে। রোগ যেমন রোগকে বৃদ্ধি করে, তেমনি তাদের এই মানসিক রোগ মুনাফিকী তৎপরতা আরও বৃদ্ধি করে দেয়। আল্লাহ্ তাআলা তাদের পরিণতি সম্পর্কে বলেনঃ **তাদের এই মিথ্যাচারিতার জন্য রয়েছে পীড়াদায়ক শাস্তি। মনে এক আর মুখে আর এক** এটা হলো বড় ধরনের মিথ্যাচার। যেহেতু তারা মনের মধ্যে কুফরী রেখে দুনিয়ার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার জন্য বাহ্যিকভাবে ঈম-ানের দাবী করতো। এর দ্বারা মুসলমানদেরকে ধোঁকা দিতো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা কাফের। তাদের মৌখিক এই দাবী এবং আচরণ এক ধরনের বড় প্রতারণা ও মিথ্যাচার। তাই আল্লাহ্ তাআলা তাদের এই মিথ্যাচারিতার জন্য পরকালে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি দেবেন, যা হবে মুনাফিকদের জন্য অত্যন্ত পীড়াদায়ক। আল্লাহ্ তাআলা সূরা নিসা এর ১৪৫ নম্বর আয়াতে মুনাফিকদের শাস্তির কথা উল্লেখ করে বলেনঃ

إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে। অর্থাৎ জাহান্নামের যে ৭টি স্তর আছে তার মধ্যে সবচেয়ে নিম্ন এবং নিকৃষ্ট স্তরে মুনাফিকদের অবস্থান হবে। অর্থাৎ কাফেরদের চেয়েও মুনাফিকদেরকে কঠিন শাস্তি আল্লাহ্ পাক দেবেন।

এর পর তাদের আচরণ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ قَالُوْا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ-اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ-

তাদেরকে যখন বলা হয়, তোমরা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না। তখন তারা বলে, 'আমরাই তো শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী। সাবধান! তারাই হলো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী। কিন্তু তারা তা বোঝেনা।

ঈমানের দাবীর নামে ভন্ডামি ও দ্বিমুখী আচরণে লিপ্ত এই মুনাফিক গোষ্ঠী বিশেষ করে তাদের মধ্যে যারা নেতৃস্থানীয় এবং মহানবী (সাঃ)-এর

হিজরতের পূর্বে যারা মদীনায় নিজের গোত্রের উপর প্রভাব রাখতো ও নেতৃত্ব দিতো, যেমন, আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই। তাদের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিলো গোয়ার্তুমি করা, নিজেদের আকাম-কুকামের পক্ষে সাফাই গাওয়া এবং কোনো জবাবদিহির আশংকা না থাকায় আত্মতৃপ্তি ও আত্মতুষ্টি বোধ করা। তারা যে শুধু মিথ্যাচার ও ধোকাবাজীতে লিপ্ত হয়েই ক্ষান্ত থাকতো তা নয়, বরং নির্বুদ্ধিতা ও অহমিকার বসবতী হয়ে বড় বড় দাবীও করে বসতো। যখন তাদেরকে বলা হতো, তোমরা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না। তখন তারা শুধু নিজেদেরকে নির্দোশ দাবী করেই ক্ষান্ত থাকতো না, বরং আত্মতৃপ্তির সাথে নিজেদের অপকর্মের সাফাই গেয়ে বলে বসতো, আমরাই তো দুনিয়াতে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে জড়িত আছি।

সন্ত্রাস, অপকর্ম, অনাচার এবং দুর্নীতিতে জড়িত থেকে নিজেদেরকে সংস্কারবাদী এবং সন্ত্রাস নির্মূলকারী বলে দাবীদার মানুষের সংখ্যা কোন যুগেই কম নয়। বর্তমানে আমাদের দেশেও এধরনের দলের নেতা এবং কর্মী বাহিনী পাওয়া যায়, যারা দুর্নীতি, সন্ত্রাস, বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টির কাজে পরাঙ্গম হবার পরও নিজেদেরকে সন্ত্রাস নির্মূলকারী, সংস্কারবাদী এবং দেশ ও জাতির হিতাকাঙ্খী বলে দাবী করে থাকে।

মুনাফিকদের এই অযৌক্তিক এবং মিথ্যা দাবীকে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ্ পাক বলেনঃ **মনে রেখ, তারাই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী। কিন্তু তা তাদের অনুভূতিতে ধরা পড়ে না।**

অতঃপর আল্লাহ্পাক মুনাফিকদের আরও একটি আচরণের কথা উল্লেখ করে বলেনঃ

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ–

আবার যখন তাদেরকে বলা হয়, অন্য লোকেরা যেমনভাবে খাটি

ঈমান এনেছে, তোমরাও সেভাবে ঈমান আনো। তখন তারা উত্তর দেয়, আমরা কি বোকা লোকদের মতো ঈমান আনবো ? তোমরা জেনে রাখো, আসলে কিন্তু তারাই বোকা। তবে তারা তা জানে না।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ

অন্যান্য লোকেরা যেভাবে ঈমান এনেছে সেভাবে তোমরাও ঈমান আন। এখানে তাদের মতো ঈমান আনো বলতে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে যারা তৎকালে মদীনায় রাসূলের উপস্থিতিতে একনিষ্ঠ এবং খালেসভাবে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের উপর ঈমান এনেছিলো। যাদের মধ্যে ছিলো না সামান্য পরিমাণ দুনিয়ার খেয়াল। যাদের ঈমানের পেছনে ছিলো একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং আখেরাতের নাযাত। এরাই ছিলেন রাসূলের সংগী সাথী। যাদেরকে সাহাবী বলা হয়। এখানে মুনাফিকদেরকে সেই সব আন্তরিক এবং নিষ্ঠাপূর্ণ ঈমানদার সাহাবীদের মতো ঈমান আনার জন্য বলা হয়েছে। একথা জেনে রাখা দরকার যে, সারা দুনিয়ার এবং সকল যুগের ঈমানদার মুসলমানদের জন্য 'মডেল' হলেন রাসূলের সাহাবীরা। যাদের প্রতি আল্লাহ্ রাজি-খুশী ছিলেন।

قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَاۤءُ

তখন তারা বলে, আমরা কি নির্বোধ বোকা লোকদের মতো ঈমান আনবো ?

মদীনার মুসলমানেরা যে ভাবে রাসূল (সাঃ)-এর নিকট আত্মসমর্পণ করেছিলো এটা মুনাফিকদের কাছে মনোপুত ছিলো না। এটাকে তারা গরীব, নাখাওয়া লোকদের জন্য উপযোগী এবং তাদের মতো ধনী, নেতৃস্থানীয় মর্যাদাবান লোকদের জন্য অনুপযোগী মনে করতো। এজন্যই তারা বলতে পেরেছিলো, আমরা কি ঐসব নির্বোধ বোকা লোকদের মতো ঈমান আনবো ?

তাদের এই কথা এবং মনোভাবের কারণে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নিষ্ঠুর জবাব ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত শুনতে হয়েছিলো। আল্লাহ্ বলেন ঃ

أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ-

শুনে রাখ, তারাই আসলে নির্বোধ, বোকা। কিন্তু তাদের তা বুঝে আসে না।

প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! বর্তমান সময়েও আমরা অনুরূপ এক শ্রেণীর লোকদের অবস্থান দেখতে পাই। আল্লাহ্‌র বিধান কুরআনকে নিজেদের জীবন বিধান হিসেবে যারা মানতে চায়, তার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করে, তাদের সহজ-সরল জীবন এবং সততাকে দেখে তারা বোকামী মনে করে। যখন তাদেরকে পুরোপুরি ইসলামকে জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ করার জন্য আহবান জানানো হয়, তখন তারা নিজেদেরকে দুনিয়ার জন্য উপযোগী, চতুর-চালাক, বুদ্ধিমান এবং প্রগতিবাদী বলে মনে করে। আর প্রকৃত ঈমানদারদেরকে দুনিয়ার জন্য অচল, বোকা, পশ্চাদপদ, মৌলবাদী এবং সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়ে নিজেদেরকে দূরে রাখতে চায়।

আসলে নির্বোধ কবেই বা নিজেকে নির্বোধ মনে করে? এর পরই আসছে আলোচ্য আয়াতের মধ্যে মুনাফিকদের সর্বশেষ আচরণের বিবরণ। আর তা হলোঃ

وَإِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ قَالُوْا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ

তারা যখন ঈমানদার লোকদের সাথে মিশে তখন বলে আমরা ঈমান এনেছি। আর যখন তারা নিরিবিলিতে তাদের শয়তানদের (ইহুদী নেতৃবৃন্দের) সাথে মিলিত হয়, তখন তারা বলে, আসলে আমরা তো তোমাদের সংগেই আছি। আমরা তাদের (মুসলমানদের) সাথে কেবল উপহাস করিমাত্র।

কেউ কেউ শঠতাকে বাহাদুরী এবং ধোকাবাজিকে চালাকি ও দক্ষতা মনে করে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা দুর্বলতা ও নোংরামী ছাড়া আর কিছুই নয়। বাহাদুর ও ক্ষমতাশীল ব্যক্তি কখনো প্রতারক, নীচ, নোংরা,

বিশ্বাসঘাতক ও কুচক্রী হতে পারে না। মুনাফিকরা মুসলমানদের সামনে নিজেদের–কাফেরদের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করতে ভয় পেতো এবং তাদের সাথে দেখা-স্বাক্ষাৎ হলে মুসলমান সুলভ আচরণ করতো। এ আচরণ দ্বারা তারা দু'টো সুবিধা ভোগ করতো। একদিকে তারা মুসলমানদের রূঢ় ও কষ্টদায়ক আচরণ থেকে রক্ষা পেতো। অপরদিকে এই ভন্ডামীপূর্ণ ঈমানের প্রদর্শনীকে মুসলমানদের ক্ষতি করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতো।

এখানে তাদের **শয়তান** বলতে মানুষরূপী শয়তান **ইহুদী সর্দারদেরকে** বোঝানো হয়েছে। কেননা এরা ছিলো ইসলামের বিরোধিতায় সবার আগে। আর এই সুযোগে মুনাফিকরা এদেরকে নিজেদের বন্ধু, আশ্রয়দাতা এবং.পৃষ্ঠপোষক মনে করতো। তাই এই কুচক্রী ইহুদী শয়তানদের সাথে দেখা হলে মুনাফিক নামধারী ভন্ড মুসলমানেরা এই বলে আস্বস্ত করতো যে, আমরা তো আসলে তোমাদেরই সংগী-সাথী। মুমিনদেরকে যে হাব-ভাব দেখায় ওটা তাদের সাথে আমাদের তামাশা এবং ঠাট্টা বিদ্রুপ মাত্র।

মুনাফিকদের এ ধরনের নোংরামী আচরণের প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তায়ালা বলেনঃ

اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ

আল্লাহ্ই তাদের সাথে তামাশা করছেন এবং তাদেরকে অবাধ্যতার মধ্যে উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ দিচ্ছেন।

মুনাফিকদের এই জঘন্য কথাবার্তা এবং আচরণের জন্য তাদেরকে কঠিন হুমকি প্রদান করে বলেনঃ আল্লাহ্ই তাদের সাথে তামাশা করছেন। আকাশ ও পৃথিবীর মালিক আল্লাহ্ যার সাথে তামাশা করেন তার থেকে হতভাগা আর কে আছে? এ এমন এক ভীতিকর এবং আতংকজনক দৃশ্য যা দেলকে কাঁপিয়ে তোলে।

وَيَمُدُّهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ–

এবং তাদেরকে অবাধ্যতার মধ্যে উদভ্রান্ত অবস্থায় ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ দিচ্ছেন।

এ কথার মানে হলো এই যে, আল্লাহ্ তাদেরকে লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্যহীন ও নির্দেশনাহীন ভাবে ঘুরে বেড়ানোর জন্য ছেড়ে দেন। পরিশেষে আল্লাহ্‌র হাতেই তারা ধরা খেয়ে যায়। যেমন একদল হাড় জিরজিরে ইঁদুর খাঁচার ভেতর লাফালাফি করে, আর খাঁচার মালিক সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা ও খেয়াল থাকেনা। এটা হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার ভয়াবহ তামাশা। মুমিনদের সাথে মুনাফিকদের তুচ্ছ এবং দুর্বল তামাশার মতো নয়। এতে বোঝা যায় যে, মুনাফিকরা আসলে কাফেরদের দোশর। এরা বক ধার্মিক, বর্ণচোরা, ইসলাম এবং মুসলমানদের চরম দুষমন। এরা ইসলাম এবং মুসলমানদের ক্ষতি করার জন্যই কেবলমাত্র মুসলমানদের তালিকাভুক্তি থেকে উঠাবসা করে।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ-

তারাই হেদায়েতের বিনিময়ে গোমরাহী খরিদ করে নিয়েছে। কিন্তু তাদের এই বেচা-কেনা লাভজনক হয়নি এবং তারা সঠিক পথেও পরিচালিত হয়নি।

আল্লাহ্ তাআলা নবী (সাঃ)-এর মদীনায় হিজরতের দ্বারা তাদেরকে হেদায়েতের মুক্ষম সুযোগ করে দিয়েছিলেন। তারা যদি চাইতো, তবে হেদায়েত পেতো। কিন্তু তারা হেদায়েতের পরিবর্তে গোমরাহী খরিদ করেছে। ফলে তা লাভজনক হয়নি এবং তারা সৎপথও পায়নি।

মুনাফিকদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক আল-কুরআনের অন্যান্য বেশকিছু স্থানে উল্লেখ করেছেন, যেমনঃ সূরা বাকারার ৭৫-৭৬ এবং ২০৪-২০৬, সূরা নিসা- এর ৬০-৬২, ৭২-৭৩, ৮১,৮৮-৮৯, এবং ১৩৮-১৪৫, সূরা তাওবা- এর ৬৭, সূরা আনকাবুতের ১০-১১, সূরা আহযাবের ১২-১৩, এবং ১৮-২০, সূরা হাশরের ১১-১৭, সূরা

মুনাফিকুনের-১-৮, সূরা হজ্ব এর-১১, এবং সূরা তাহরীমের ৯ নম্বর আয়াত সমূহে। কুরআনের আয়াত ছাড়াও হাদীসে মুনাফিকদের চারটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আবু হুরাইরা বর্ণিত হাদীসে তিনটি এবং হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমরের বর্ণিত হাদীসে আলামত হিসেবে চারটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে। যেমনঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍ وَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَرْبَعٌ مَّنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا *وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا، اِذَا ئُتُمِنَ خَانَ وَاِذَا حَدَّثَ كَذَّبَ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ-রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তির মধ্যে (নিম্নের) চারটি দোষ থাকবে সে খাঁটি মুনাফিক। আর যার মধ্যে যে কোনো একটি দোষ থাকবে, তার মধ্যে মুনাফিক হবার স্বভাব বিদ্যমান; যতক্ষণ না সে সেই দোষ হতে মুক্ত হয়। তা হলো- (১) আমানত রাখা হলে তা সে খেয়ানত করে, (২) কথা বললে মিথ্যা বলে, (৩) ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে এবং (৪) ঝগড়া-বিবাদ করলে অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে। (বুখারী-মুসলিম)

প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! দারসের আলোচ্য আয়াতগুলোর মধ্যে মুনাফিকদের যেসব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে তা ছিলো মদীনার মুনাফিকদের বাস্তব চিত্র। কিন্তু যদি আমরা স্থান ও কালের গন্ডি পার হয় তাহলে দেখবো, সকল যুগের সকল মানব বংশের মধ্যে এই শ্রেণীর মুনাফিক লোকদের অবস্থান। আমরা এই শ্রেণীর মুনাফিক লোকদের অবস্থান বেশীর ভাগ সমাজের উচ্চ শ্রেণীর লোকদের মধ্যে দেখতে পাই। সত্যকে সত্য হিসেবে মেনে নেবার মতো সৎ সাহস তাদের নেই। আবার খোলাখুলি ভাবে তাকে অস্বীকার করার দুঃসাহসও

তাদের নেই। আবার সাধারণ মানুষের উপর তাদের একটা পজিশান থাকা চাই। তাই কুরআনের এ জাতীয় বক্তব্যগুলোকে কোনো এক নির্দিষ্ট সময় বা যুগের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা ঠিক হবে না। কেননা কুরআনের কোনো বিধান বা উপদেশ কোনো একটা নির্দিষ্ট সময় বা যুগের জন্য নাযিল হয়নি। কুরআনের প্রতিটি আদশে-নিষেধ এবং উদাহরণ সকল যুগের সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য। এটা কেয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত বলবত থাকবে। তাই কুরআনের এই আয়াতে বর্ণিত তৎকালীন মুনাফিকদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যদি বর্তমান বিশ্বে বিশেষ করে আমাদের এই দেশের মুসলমানদের মধ্যে মিলিয়ে দেখি তাহলে আমরা তাই দেখতে পাই।

শিক্ষাঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত মুনাফিকদের চরিত্র বা আচরণ কেমন হবে তা আমরা অত্র দারস থেকে জানতে পারলাম। এখন দারস থেকে আমাদের জন্য কি কি শিক্ষনীয় রয়েছে তা উল্লেখ করছিঃ

❒ মুখে মুখে ঈমানের দাবী করলেই প্রকৃত ঈমানদার হওয়া যায় না। ঈমানদার হতে হলে ইসলামের যাবতীয় বিষয়ের উপর আন্তরিক বিশ্বাস, বিশ্বাস অনুযায়ী মুখে স্বীকার এবং সে অনুযায়ী কাজ করতে হবে।

❒ মুনাফিকরা মুসলমান নয় বরং জঘন্য কাফের। সুতরাং তা থেকে এবং তাদের থেকে সদাসর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। আর মুনাফিকী ত্যাগ করে খাঁটি মুসলমান হতে হবে।

❒ মুনাফিকী বা কপোটতা মারাত্মক মানসিক রোগ। যা মানসিক প্রশান্তি নষ্ট করে এবং শারিরীক দিক দিয়েও ক্ষতি সাধন করে। মুনাফিকী কুফরীর চেয়েও ধ্বংসাত্মক। সুতরাং এই আচরণ থেকে দূরে থাকতে হবে।

❒ মিথ্যাচারিতা হলো জঘন্য অপরাধ এবং নিকৃষ্ট কাজ। বিধায় তা থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা মিথ্যাচারীতা মুনাাফিকদের চরিত্র।

❒ মুনাফিকদের কার্যকলাপ প্রকৃত পক্ষে দুনিয়াতে ফেৎনা–ফাসাদ এবং বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে, তা অনুধাবন করে এ ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টিকারী আচরণ থেকে দূরে থাকতে হবে।

❒ সাহাবাগণই ঈমানের কষ্টি পাথর। সুতরাং নিজেদের ঈমানকে তাদের ঈমানের অনুরূপ করতে হবে।

❒ খাঁটি মুসলমানদের চাল-চলন এবং উঠা-বসা দেখে তাদেরকে নীচ্ বোকা বা দুনিয়ার জন্য অচল মনে করে নিজেকে বেশী উঁচু দরের লোক, পন্ডিত এবং বুদ্ধিমান মনে করে অহমিকা প্রদর্শন করা থেকে দূরে থাকতে হবে। কেননা এটা ঈমানের লক্ষণ নয় বরং মুনাফিকীর লক্ষণ।

❒ দ্বিমুখী নীতি পরিহার করে প্রকৃত মুসলমানদের দলভুক্ত হতে হবে।

❒ যারা দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করে মুসলমানদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে এবং ক্ষতি করতে চায়, আল্লাহ্ তাদেরকে হেদায়েত দেন না বরং তাদেরকে দুনিয়া এবং আখেরাতে লাঞ্ছিত করে থাকেন।

❒ ব্যবসা মানুষ লাভের জন্য করে থাকে। কিন্তু মুনাফিকীর এই ব্যবসা লাভজনক বা কল্যাণকর নয়, বরং ক্ষতিকর। কেননা তারা হেদায়েতের বিনিময়ে গোমরাহী বা পথভ্রষ্টতাকে খরিদ করে। এটা দুনিয়া এবং আখে-রাতের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক। সুতরাং আমাদেরকে মুনাফিকী পরিহার করে সঠিকভাবে ইমান এনে ইসলামের যাবতীয় কার্যক্রম আঞ্জাম দিয়ে খাঁটি মুসলমান হতে হবে।

আহ্বানঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে আলোচ্য আয়াতের যে আলোচনা পেশ করলাম, এতে যদি আমার অজান্তে কোনো ত্রুটি হয়ে যায়, তার জন্য আমি আল্লাহ্পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর এ আয়াতগুলো থেকে আল্লাহ্পাক মুনাফিকদের মুনাফিকীরি যেসব পরিচয় তুলে ধরেছেন তা থেকে আমরা সবাই যেন মুক্ত হয়ে খাঁটি মুমিন-মুত্তাকী মুসলমান হতে পারি সে তৌফিক কামনা করে শেষ করছি। **অয়া আখেরু দাওয়ানা আনিল হামদু লিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন।**

রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়। - আল হাদীস

লেখকের অন্যান্য বই

দারসে হাদীস-১ম খন্ড
দারসে হাদীস-২য় খন্ড
দারসে কুরআন-১ম খন্ড
দারসে কুরআন-২য় খন্ড
দারসে কুরআন-৩য় খন্ড
দারসে কুরআন-৪র্থ খন্ড
ইসলামী সংগঠন ও প্রশিক্ষণ
বিষয়ভিত্তিক নির্বাচিত হাদীস
আল কুরআনে মানব সৃষ্টি তত্ত্ব
রাসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) রূহানী নামায
বিষয়ভিত্তিক কুরআন হাদীস সংকলন
বাংলা উচ্চারণসহ ১০০ মাসনুন দোয়া
কুরআন হাদীসের আলোকে ৫দফা কর্মসূচী
ফাযায়েলে ইক্বামাতে দ্বীন বা দ্বীন প্রতিষ্ঠার (চেষ্টার) মর্যাদা

সাহাল প্রকাশনী

সাহাল প্রকাশনী

দারসে কুরআন

৩

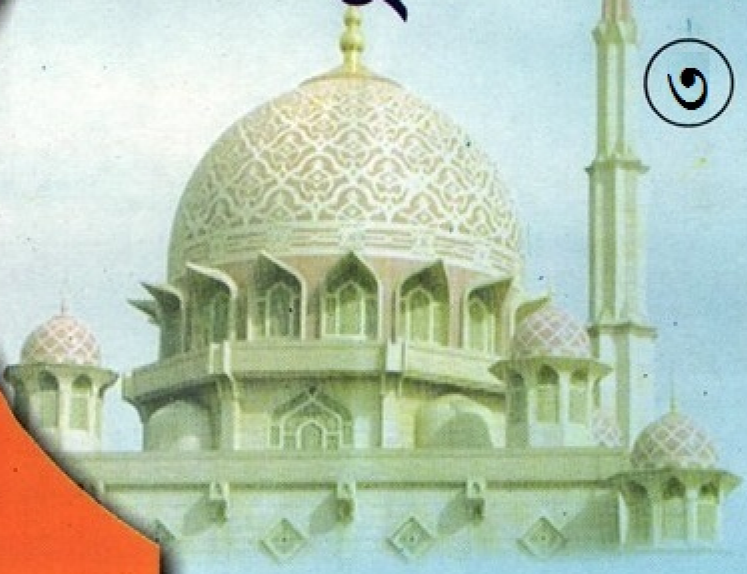

অধ্যাপক আবদুল মতিন

দারসে

কুরআন

৩য় খন্ড

অধ্যাপক আবদুল মতিন

দারসে কুরআন-৩য় খন্ড

প্রকাশনায় ঃ
সাহাল প্রকাশনী
৩০৮, খানজাহান আলী রোড,
(তারের পুকুর), খুলনা।

প্রকাশকাল ঃ
প্রথম প্রকাশঃ মে-২০০৪ ইং
১০ম মুদ্রণ ঃ ফেব্রুয়ারী-২০১২ ইং
রবিউস সানি-১৪৩৩ হিজরী
ফাল্গুন-১৪১৮ সন

সত্ত্ব ঃ লেখক কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত।

প্রচ্ছদ ঃ কৃষ্টি কম্পিউটার,
৩০৮, খানজাহান আলী রোড, খুলনা।

অক্ষর বিন্যাস ঃ সাহাল বিন মতিন
৩০, খানজাহান আলী রোড, খুলনা।

মুদ্রণে ঃ ঈগল অফসেট প্রেস
শামসুর রহমান রোড, খুলনা।

নির্ধারিত মুল্য ঃ ৬০ টাকা

পরিবেশনায় ঃ সাহাল বুক কর্ণার
৩০৮, খানজাহান আলী রোড,
(তারের পুকুর), খুলনা।
মোবাইল ঃ ০১৭১১-৩৮৯০৭৬ (লেখক)
ঃ ০১১৯১-৭৮২২৮৬ (দোকান)

প্রাপ্তিস্থান

কুরআন মহল, সিলেট।	কাটাবন বুক কর্ণার, ঢাকা।
ইসলামিয়া লাইব্রেরী, বরিশাল।	ঢাকা বুক কর্ণার, পুরানাপল্টন, ঢাকা।
আল-হেলাল লাইব্রেরী, যশোর।	তাসনিয়া বই বিতান, মগবাজার, ঢাকা।
আল-আমীন লাইব্রেরী, সিলেট।	খন্দকার প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা।
আল-আমীন লাইব্রেরী, সাতক্ষীরা।	প্রফেসরস বুক কর্ণার, মগবাজার, ঢাকা।
একাডেমী লাইব্রেরী, দেওয়ান বাজার,চট্টগ্রাম।	প্রফেসরস পাবলিকেশন, মগবাজার, ঢাকা।

এ ছাড়াও জেলা শহরের বিভিন্ন লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

আল-কুরআন সর্বশেষ আসমানী কিতাব যা মানব জাতির পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর উপর অবতীর্ণ হয়।

মানুষের ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে যাবতীয় সমাধান আল কুরআনে রয়েছে। এজন্য প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর উচিত আল কুরআন নিজের ভাষায় বুঝে তার শিক্ষানুযায়ী বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা। কিন্তু সমস্যা হলো আমাদের দেশের সামাজিক ও শিক্ষা ব্যবস্থায় আল-কুরআনের সঠিক শিক্ষাকে তুলে ধরার তেমন কোন বাস্তব মাধ্যম নেই। যতটুকু আছে তাও আবার সিলেবাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং কুরআনকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল কুরআনের বিধি-বিধান মানতে হলে কুরআনের আসল বুঝ থাকা প্রয়োজন। প্রকৃত বুঝ দেবার জন্যই আমি কুরআনের বাছাইকৃত অংশ থেকে 'দারসে কুরআন' খন্ড আকারে প্রকাশ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। তারই অংশ হিসেবে তৃতীয় খন্ড প্রকাশ করা হলো। যার সহযোগিতা নিয়ে কুরআনের সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের নেতা-কর্মীরা দারস প্রদানের মাধ্যমে কুরআনের সঠিক শিক্ষা সহজে সাধারণ মানুষের কাছে পৌছে দিতে পারেন।

আমি 'দারসে কুরআন' বইটি ইসলামী আন্দোলনের আধুনিক ও সাধারন শিক্ষিত কর্মী ভাই-বোনদের দারস পেশ করার উপযোগী করে লেখার চেষ্টা করেছি। তাছাড়া দারসে কুরআনের প্রথম খন্ডের প্রথম দিকে কুরআনকে সহজে বুঝানোর জন্য ধারাবাহিক ভাবে দারস দানের পদ্ধতি ও দারসের সময় বন্টনের নমুনা হিসেবে চারটি ছক উল্লেখ করেছি এবং সাধারন মানুষের উপর যাতে দারসের প্রভাব পড়ে সেই জন্য দারস দানকারীর কতিপয় করণীয় উল্লেখ করেছি। বইটি লেখার বিশেষ বৈশিষ্ট হলো শ্রোতার সামনে যেন আপনি নিজেই দারস পেশ করছেন।

দারসে কুরআন তৃতীয় খন্ড লেখা এবং প্রকাশের ক্ষেত্রে যেসব গুণগ্রাহী ব্যক্তি পরামর্শ, সময় ও উৎসাহ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদের শুকরিয়া আদায় করছি এবং মহান আল্লাহ্‌র কাছে তাদের জন্য উত্তম প্রতিদান কামনা করছি।

লেখা ও ছাপার ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। অতএব কোন সুহৃদয় ব্যক্তির কাছে যদি কোন ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে কিম্বা কোন পরামর্শ থাকে তাহলে আমাকে সরাসরি জানালে আমি চির কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তিতে সংশোধন করে পূনঃমুদ্রণ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে মহান আল্লাহ তাবারাক ওয়া তায়ালার কাছে আমার আরজ, হে আল্লাহ্‌ ! তোমার এই মহাগ্রন্থ আল কুরআনের ব্যখ্যা ও শিক্ষা পেশ করতে যেয়ে যদি আমার অজানতে কোন ভুল-ত্রুটি কিম্বা বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, তাহলে তুমি মেহেরবানি করে আমাকে ক্ষমা করে দিও। আর আমার সীমিত জ্ঞানের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করে আখিরাতে আদালতে নাজাতের অসিলা বানিয়ে দিও। আমীন।।

মুহাম্মদ আবদুল মতিন
সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক ইস্টাডিজ বিভাগ
দৌলতপুর কলেজ, খুলনা।

মে- ২০০৪ ইং

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্টা নং
o জিহাদ বা ইসলামী আন্দোলনের গুরুত্ব। (সূরা তাওবাহ-১৯-২৪)	০৭
o কতিপয় সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ, ওয়াদা এবং কসম রক্ষা করার গুরুত্ব। (সূরা নহল-৯০-৯৭)	২৭
o অতীতের নবীদের দ্বীনের ন্যায় একই দ্বীনের দাওয়াত দান এবং প্রতিষ্ঠার নির্দেশ। (সূরা শু'রা-১৩-১৬)	৫২
o ঈমানের পরীক্ষা দিয়েই জান্নাতে যেতে হবে। (সূরা আনকাবুত-১-৭)	৭৬
o আল্লাহর উপর অবিচল ঈমান। সর্বোত্তম পন্থায় দাওয়াত দান ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন। (হা-মীম-আস-সাজদাহ-৩০-৩৬)	৯৭
o দাওয়াতে দ্বীনের কাজে অধৈর্য হলে চলবে না। (সূরা আনয়াম-৩৩-৩৬)	১১৭
o স্ত্রী-সন্তান এবং ধন-সম্পদ মানুষের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। (সূরা তাগাবুন-১৪-১৮)	১৩২
o আখিরাতে অবিশ্বাসীদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ও কার্যকলাপ। (সূরা মাউন)	১৫০

১ম খন্ডে যা আছে

o দারসে কুরআন এর বক্তৃতা দান পদ্ধতি।

o দারসের সময় বন্টন।

o দারস দানকারীর করণীয়।

o দারসের কতিপয় পরিভাষার সংজ্ঞা।

o এক নজরে আল-কুরআনের পরিচয়।

o মুত্তাকীনদের গুণাবলী। (সূরা বাকারা-১-৫)

o মু'মিনদের গুণাবলী। (সূরা মু'মেনুন-১-১১)

o বাড়ীতে ঢোকার শিষ্টাচার। (সূরা নূর-২৭-২৯)

o ধ্বংস ও ক্ষতি থেকে মানুষের বাঁচার উপায়। (সূরা আল আসর)

o কঠিন আযাব থেকে বাঁচার উপায়। (সূরা সফ্ -১০-১৩)

o মানবতার মুক্তির জন্য জিহাদ। (সূরা নিসা-৭৫-৭৬)

o ঈমানের পরীক্ষা। (আলে ঈমরান-১৩৯-১৪১)

০ সবরের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য কামনা ও শহীদের মর্যাদা।
(সূরা বাকারা-১৫৩-১৫৬)
০ মরণের আগেই আল্লাহর পথে অর্থ খরচ। (সূরা মুনাফিকুন-৯-১১)
০ কিয়ামতের দৃশ্য। (সূরা হজ্ব-১-২)

২য় খন্ডে যা আছে

০ জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব। (সূরা আলাক-১-৫)
০ মুমিনের জিন্দেগী হবে তাকওয়া, আন্দোলন ও দাওয়াতী জিন্দেগী।
(সূরা আলে-ঈমরান-১০২-১০৪)
০ মুমিন জীবনের লক্ষৎ-উদ্দেশ্য ও তাদের বৈশিষ্ট্য
(সূরা তাওবা-১১১-১১২)
০ মুমিনদের ছয়টি বর্জনীয় আচরণ। (সূরা হুজুরাত-১১-১২)
০ দুনিয়াদারদের প্রতি সতর্কবাণী। (সূরা তাকাছুর-১-৮)
০ ইসলামী আন্দোলনঃ কর্মীদের গুণাবলী (সূরা মায়িদাহ-৫৪-৫৬)
০ আল্লাহর কতিপয় কুদরত ও নি'য়ামত। (সূরা আন নাবা-১-১৬)
০ মুনাফিকদের আচরণ। (সূরা বাকারা-৮-১৬)

৪র্থ খন্ডে যা আছে

০ জিহাদ-সংগ্রাম এবং ধৈর্যের পরীক্ষার মাধ্যমেই
জান্নাত পাওয়া যাবে। (সূরা ঈমরান-১৪২-১৪৭)
০ জান্নাতের সুখ আর জাহান্নামের দুঃখ। (সূরা যুখরুফ-৬৭-৭৮)
০ চূড়ান্ত আন্দোলনের পরই আল্লাহর সাহায্য
ও বিজয় আসে। (সূরা নসর)
০ ঝুঁকিপূর্ণ আন্দোলন থেকে এড়িয়ে থাকার বাহানা
তালাশ না করা। (সূরা তাওবাহ-৩৮-৪১)
০ অসার ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার ধন-সম্পদ, বিত্ত-বৈভব, প্রাচুর্য
গড়ার কাজে প্রতিযোগিতা না করা। (সূরা হাদীদ-২০-২৩)
০ মানুষের কতিপয় নৈতিক দোষ ও ত্রুটি এবং তার
পরিণতি। (সূরা হুমাজাহ)
০ আল্লাহর বাছাইকৃত মুমিনদের প্রকৃত জিহাদ-আন্দোলন
করা কর্তব্য। (সূরা হজ্জ-৭৮)
০ শেষ রাতের নামায এবং কুরআন তিলাওয়াত তাকওয়ার
জন্য খুব বেশী কার্যকর। (সূরা মুয্যাম্মিল-১-১৩)

এক

জিহাদ বা ইসলামী আন্দোলনের গুরুত্ব

(সূরা আত্ তাওবাহ্ - ১৯-২৪)

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاۤجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللهِ وَ
الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَجٰهَدَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ ط لَا يَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللهِ ط
وَاللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ o اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا
فِىْ سَبِيْلِ اللهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللهِ ط
وَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْفَاۤئِزُوْنَ o يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَ
رِضْوَانٍ وَّ جَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ o خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ط
اِنَّ اللهَ عِنْدَهٗۤ اَجْرٌ عَظِيْمٌ o يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْۤا اٰبَاۤءَكُمْ
وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَاۤءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ ط وَمَنْ يَّتَوَ
لَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰۤئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ o قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاۤؤُكُمْ وَاَبْنَاۤؤُكُمْ
وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ ن
اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَاۤ

أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ ط وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِينَ ٥

সরল অনুবাদঃ ইরশাদ হচ্ছে- (১৯) (হে মুমিনগণ!) তোমরা কি হাজিদের পানি পান করানো এবং 'মসজিদে হারাম' এর সেবা ও রক্ষণাবেক্ষণ করাকে সেই লোকের কাজের সমান মনে করে নিয়েছো, যে ঈমান রাখে আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি এবং যুদ্ধ-জিহাদ করে আল্লাহ্র পথে ? আল্লাহ্র কাছে তো এই দুই শ্রেণীর লোক এক ও সমান নয়। আর আল্লাহ্ যালেম লোকদের হেদায়াত করেন না। (২০) আল্লাহ্র কাছে তো সেই সব লোকদেরই বেশী মর্যাদা রয়েছে, যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে বা নিজেদের ঘর-বাড়ী ছেড়েছে এবং আল্লাহ্র পথে নিজেদের জান-মাল দিয়ে জিহাদ (আন্দোলন) করেছে, তারাই সফলকাম। (২১) (এদের জন্যে) তাদের পরওয়ারদেগার নিজের রহমত ও সন্তোষ এবং এমন জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন, যেখানে আছে তাদের জন্য চিরস্থায়ী শান্তি। (২২) সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র কাছে আছে মহা পুরস্কার। (২৩) হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের বাপ-ভাইদের বন্ধু বা অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে বেশী ভালবাসে। তোমাদের মধ্যে যেসব লোক এ ধরনের লোকদেরকে বন্ধু বা অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করবে তারাই হবে সীমালংঘণকারী। (২৪) (হে নবী!) তাদেরকে বলে দিন, যদি তোমাদের কাছে তোমাদের বাপ, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী ও তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের কামাই করা ধন-মাল, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যা মন্দা বা বন্ধ হয়ে যাবার তোমরা ভয় করো, আর তোমাদের সেই ঘর-বাড়ী যাকে তোমরা খুব পছন্দ করো- আল্লাহ্, তার রাসূল ও তার পথে জিহাদ (আন্দোলন) করা থেকে প্রিয় ও ভালবাসার হয়, তাহলে তোমরা অপেক্ষা করো আল্লাহ্র চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ্ তো ফাসেক লোকদেরকে কখনই হেদায়েত করেন না।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ اَجَعَلْتُمْ -তোমরা মনে করে নিয়েছো কি ? سِقَايَةَ - পানি পান করানো। اَلْحَاجِّ -হাজিদের। وَ -এবং/ ও। عِمَارَةَ -সেবা করা, রক্ষণাবেক্ষণ করা, আবাদ করা। كَمَنْ -তার সমান যে। اٰمَنَ -ঈমান এনেছে। يَوْمِ الْاٰخِرِ -আখেরাতের দিনের বা পরকালের। جٰهَدَ - প্রাণান্তকর চেষ্টা করে, জিহাদ বা আন্দোলন করে। فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -আল্লাহ্‌র পথে। لَا يَسْتَوٗنَ - তার সমান নয়। عِنْدَ اللّٰهِ -আল্লাহ্‌র কাছে বা দৃষ্টিতে। لَا يَهْدِى -হেদায়েত দেন না বা সঠিক পথ দেখান না। قَوْمَ -জাতি বা লোকদের। اَلَّذِيْنَ -যারা। هَاجَرُوْا - হিজরত করেছে বা ত্যাগ করেছে। بِاَمْوَالِهِمْ -তাদের সম্পদ দিয়ে। وَاَنْفُسِهِمْ -এবং তাদের জানসমূহ দিয়ে। اعظم -অতি উচ্চ বা অতি বড়। دَرَجَةً -মর্যাদা বা সম্মান। وَاُولٰٓئِكَ -এবং ওরাই বা ঐসব লোকেরাই। الْفَآئِزُوْنَ -সফলকাম বা কৃতকার্য। يُبَشِّرُهُمْ -তাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছেন। رَبُّهُمْ -তাদের রব বা পরওয়ারদেগার। بِرَحْمَةٍ -রহমতের বা দয়ার। مِنْهُ -তাঁর পক্ষ হতে। رِضْوَانٍ -সন্তুষ্টির। لَهُمْ -তাদের জন্য। فِيْهَا -উহাতে বা তার মধ্যে। نعيم -নিয়া'মত বা সুখ-শান্তি। مُقِيْمٌ -স্থায়ী। خٰلِدِيْنَ فِيْهَا -উহাতে চিরদিন থকবে। اَبَدًا -অনাগত কাল। اِنَّ -নিশ্চয়ই। عِنْدَهٗ -তাঁর কাছে। اَجْرٌ -পুরস্কার বা প্রতিদান। عَظِيْمٌ -মহান, বড়। يٰاَيُّهَا -ওহে। لَاتَتَّخِذُوْا -তোমরা গ্রহণ করো না। اٰبَآءَكُمْ -তোমাদের বাপ-দাদাদের। اخوانكم -তোমাদের ভাইদের। اَوْلِيَآءَ -বন্ধু হিসেবে। اِنْ -যদি। اِسْتَحَبُّوْا -তারা বেশী মহব্বত করে বা ভালবাসে। اَلْكُفْرَ -কুফরীকে। عَلٰى -উপরে, এখানে অপেক্ষা। وَمَنْ -এবং যে। يَتَوَلَّهُمْ -তাদেরকে ভালবাসবে। مِنْكُمْ -তোমাদের মধ্য হতে। هُمْ -তারাই। ظٰلِمُوْنَ -অত্যাচারী। قُلْ -বল।

كَانَ -হয়। اٰبَآؤُكُمْ -তোমাদের বাপ-দাদারা। اَبْنَآؤُكُمْ -তোমাদের সন্তানেরা। اِخْوَانُكُمْ -তোমাদের ভায়েরা। اَزْوَاجُكُمْ -তোমাদের স্বামী-স্ত্রীরা। عَشِيْرَتُكُمْ -তোমাদের জ্ঞাতী বা আত্মীয়-স্বজনেরা। اَمْوَالٌ -মালসমূহ। اِقْتَرَفْتُمُوْهَا -যা তোমরা অর্জন বা কামাই করেছো। تِجَارَةٌ -ব্যবসা-বাণিজ্য। تَخْشَوْنَ -তোমরা ভয় করো। كَسَادَهَا -যার মন্দা পড়ার বা বন্ধ হয়ে যাওয়ার। مَسٰكِنُ -বাসগৃহ বা ঘর-বাড়ী সমূহ। تَرْضَوْنَهَا -যা তোমরা পছন্দ করো। اَحَبَّ -বেশী প্রিয় হয়। اِلَيْكُمْ -তোমাদের কাছে। مِنْ -থেকে বা হতে। جِهَادٍفِىْ سَبِيْلِهٖ - তার পথে জিহাদ বা আন্দোলন বা চেষ্টা সাধনা থেকে। فَتَرَبَّصُوْا - তবে তোমরা অপেক্ষা করো। حَتّٰى -যতক্ষণ না। يَاْتِىَ -আসে বা দেন। بِاَمْرِهٖ -তার নির্দেশ বা ফায়সালাকে। اَلْقَوْمَ -জাতি বা লোকদেরকে। اَلْفٰسِقِيْنَ -দুষকার্যকারী বা সত্যত্যাগী।

সম্বোধনঃ দারসে কুরআন মাহফিলে/প্রোগ্রামে উপস্থিত ইসলাম প্রিয় দ্বীনদার/ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ভায়েরা/বোনেরা/ভাই ও বোনের! আস্‌সালামু আলাইকুম অয়ারাহমাতুল্লাহ। আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কালামে হাকীম আল-কুরআনের সূরা তাওবার ১৯ থেকে ২৪ মোট ৬টি আয়াত তিলাওয়াত এবং সরল অনুবাদ পেশ করেছি। আল্লাহ্ পাক যেন আমাকে আপনাদের সামনে দারসে কুরআন সঠিকভাবে পেশ করার তাওফীক দান করেন। "অমা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ্।"

সূরার নামকরণ ঃ এই সূরাটি দুই নামে পরিচিত। একটি 'তাওবাহ্', অপরটি 'বারাআত'।

তাওবাহ্ নামকরণ ঃ এই সূরাটি 'তাওবাহ্' নামকরণের কারণ এই যে, এই সূরার একস্থানে কতিপয় ঈমানদার লোকদের তাওবাহ্ কবুল এবং গোনাহ্-খাতা মাফ করে দেবার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

বারাআত নামকরণ ঃ 'বারাআত' নামকরণের কারণ হলো, সূরার শুরুতে মুমিনদেরকে মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

'বারাআত' অর্থ সম্পর্কচ্ছেদ। তবে যে নামই হোক না কেন তা প্রতীকী বা চিহ্ন হিসেবেই করা হয়েছে। শিরোনাম হিসেবে নামকরণ করা হয়নি। তবে যা করা হয়েছে তা ওহীর নির্দেশেই করা হয়েছে। (নামকরণ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য দারসে কুরআনের প্রথম খন্ডে দেখুন)।

সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ্ না লেখার কারণ ঃ সূরাটির শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রহ্মানির রহীম' লেখা হয়নি। এর কারণ হিসেবে তাফসীরকারকগণ বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করেছেন। কেউ বলেছেন, আল্লাহ্ পাক মুশরীকদের আচারণে ক্ষুব্ধ হয়ে সূরাটি নাযিল করেন, তার জন্য তিনি বিস্‌মিল্লাহ্ বলেননি। আবার কেউ বলেছেন যে, পূর্বের সূরা 'আনফালের' জের, তাই আর বিস্‌মিল্লাহ্‌র প্রয়োজন হয় না। ইমাম রাযী (রঃ) যে কারণটি উল্লেখ করেছেন, সেটিই হলো সবচেয়ে বেশী সঠিক এবং গ্রহণযোগ্য। আর তা হলো- রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) নিজেই সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ্ লেখেননি। তাই পরবর্তীতে সবাই তাঁর অনুকরণ করেছেন।

জানার বিষয় ঃ সূরার প্রথম থেকে তিলাওয়াত আরম্ভ করলে 'বিসমিল্লাহ্' পড়া যাবে না। তবে যদি সূরার মাঝ পথ থেকে তিলাওয়াত আরম্ভ করা হয় তাহলে 'বিসমিল্লাহ্' দিয়েই শুরু করতে হবে।

সূরাটি নাযিল হওয়ার সময়কাল ঃ সূরা তাওবাহ্ একই ভাষণে একই সময় নাযিল হয়নি, বিভিন্ন ঘটণার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে। সূরাটি তিনটি ভাষণে সমাপ্ত হয়েছে।

প্রথম ভাষণ ঃ সূরার শুরু থেকে ৫ম রুকু পর্যন্ত চলেছে। এটি অবতীর্ণ হওয়ার সময়টা হলো ৯ম হিজরীর যিলক্বদ মাস বা তার কাছাকাছি সময়। এ বছর নবী করীম (সঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ) কে 'আমীরুল হজ্জ' বা হজ্জ যাত্রীদের নেতা করে মক্কায় পাঠিয়েছিলেন, সেই সময় এই ভাষণ অবতীর্ণ হয়। আর তাই নবী করীম (সঃ) হযরত আলী (রাঃ) কে এ ভাষণটি হাজিদের পাঠ করে শোনানোর জন্য মক্কায় পাঠিয়েছিলেন। এ ভাষণে মুশরীকদের সাথে স্থায়ী ভাবে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা রয়েছে।

দ্বিতীয় ভাষণ ঃ ৬ষ্ঠ রুকুর শুরু থেকে ৯ম রুকুর শেষ পর্যন্ত ভাষণটি চলেছে। এটি ৯ম হিজরীর রজব মাস বা তার কিছু আগে অবতীর্ণ হয়। যখন নবী করীম (সঃ) তৎকালীণ পরাশক্তি রোমান সম্রাটের বিরুদ্ধে তাবুক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এখানে প্রকৃত ঈমানদারদের যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং দূর্বল মুমিন ও মুনাফিকদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে।

তৃতীয় ভাষণ ঃ সর্বশেষ এই ভাষণটি দশম রুকু থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত চলেছে। এটা তাবুক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে অবতীর্ণ হয়। এই অংশে এমন কতিপয় আয়াত রয়েছে যা বিভিন্ন সময় অবতীর্ণ হয়। বিভিন্নি বিষয় একই হবার কারণে ওহীর নির্দেশে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) এই ভাষণের সাথে সংযোগ করে দেন। এতে মুনাফিকদেরকে তাম্বীহ করা হয়েছে এবং তাবুক যুদ্ধে না যেয়ে যারা পেছনে রয়ে গিয়েছিলো তাদেরকে ভর্ৎসনা করা হয়েছে। আর যেসব লোক ঈমানদার হওয়া সত্ত্বেও জিহাদে অংশ গ্রহণ থেকে বিরত ছিলো তাদেরকে ক্ষমা ঘোষণা করা হয়েছে।

সূরার বিশেষ দিক ঃ তিনটি ভাষণ নাযিল হওয়ার ধারাবাহিকতার দৃষ্টিতে প্রথম ভাষণটি সূরার সব শেষে হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বিষয়বস্তুর গুরুত্বের দৃষ্টিতে উহার স্থান সর্বপ্রথম হওয়ার কারণে নবী করীম (সঃ) সূরাতে সংযোজনকালে উহাকে প্রথমে রেখেছেন। তবে যা কিছু করা হয়েছে ওহীর নিদের্শেই করা হয়েছে।

সূরার বিষয়বস্তু ঃ সূরাটিতে অনেকগুলো বিষয়ের সন্নিবেশ ঘটেছে যেমনঃ

০ সূরার প্রথম অংশে আর্থাৎ ২৮ নম্বর আয়াত পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্রের মুসলমানদেরকে মুশরীকদের সাথে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

০ সূরার দ্বিতীয় অংশে অর্থাৎ ২৯ থেকে ৩৫ নম্বর আয়াত পর্যন্ত 'আহলে কিতাব' তথা ইয়াহুদী-নাসারাদের সাথে ইসলামের সম্পর্কচ্ছেদের কথা বলা হয়েছে।

০ তৃতীয় অংশে অর্থাৎ ৩৮ থেকে ৪১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে তাবুক যুদ্ধে যাবার জন্য সাধারণ নির্দেশ আসার পরেও যারা দূর্বলতা ও অলসতার কারণে পেছনে থেকে গেছে এবং যুদ্ধে যাইনি তাদের সমালোচনা করা হয়েছে।

০ চর্তুথ অংশ এটি সবচেয়ে দীর্ঘ এবং সূরাটির অর্ধেকেরও বেশী অংশ জুড়ে বিস্তৃত। এ অংশে মুনাফিকদের সমালোচনা ও ভর্ৎসনা, মুসলিম সমাজে তাদের অপঃতৎপরতার নিন্দা ও তিরস্কার করা হয়েছে। তাদের মানসিক এবং বাস্তব বিবরণ পেশ ও জিহাদ থেকে পিছু হটার ছল-ছূতো,ওজর-বাহানা এবং দুরভিসন্ধির স্বরূপ উৎঘাটন করা হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ, ভুল বুঝাবুঝি ও কাপুরুষতার বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা এবং রাসূল (সঃ) ও নিষ্ঠাবান মুমিনদের নানাভাবে কষ্ট দেয়া ও উত্যক্ত করার বিবরণ দেয়া

হয়েছে। সেই সাথে মুনাফিকদের চক্রান্ত থেকে নিষ্ঠাবান মুসলমানদেরকে সর্তক করা হয়েছে। মুসলমান ও মুনাফিকদের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ এবং তাদের কার্যকলাপ ও চরিত্র বৈশিষ্ট্য দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে।

০ পঞ্চম অংশে মদীনার ইসলামী সমাজের সবচেয়ে শক্তিশালি জনবল আনসার ও মোহাজের ছাড়াও তাদের চারপাশে কিছু দল ও শ্রেণী ছিলো যেমন বেদুঈনরা। তাদের ভেতর নিষ্ঠাবান মুমিন, মুনাফিক ও দূর্বল মুমিনও ছিলো। সাথে মদীনার মুনাফিকরাও ছিলো। অনুরূপ আরও একটি দল এমন ছিলো, যাদের মধ্যে সৎকাজ ও অসৎকাজের মিশ্রণ ঘটেছিলো এবং তাদের চরিত্রে ইসলামী প্রভাব মজবুত ছিলো, তবে তাদের ইসলামের প্রতি তেমন গভীর আকর্ষণ ছিলো না। আর একটি দল ছিলো, যাদের প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানতো না। তাদের পরিণাম কি হবে তা আল্লাহ্ই জানেন। আরও একটি দল ছিলো, যারা ইসলামের নামে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকতো। অত্র সূরায় এসব দল ও শ্রেণী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। মুসলিম সমাজে এদের সাথে কি রকম আচারণ করতে হবে, তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং রাসূল (সঃ) ও একনিষ্ঠ মুসলমানদেরকে এদের সাথে আচরণের পদ্ধতি কি হবে তাও শিখিয়ে দেয়া হয়েছে। এই অংশ ৯৭ থেকে ১১০ নম্বর আয়াত পর্যন্ত চলেছে।

০ ষষ্ঠ অংশে আল্লাহ্র সাথে মুমিনদের ওয়াদা, জিহাদের ধরণ এবং মদীনাবাসী ও তার আশপাশের বেদুঈনদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে আরো বলা হয়েছে, মদীনাবাসীদের এটা বৈধ নয় যে, তারা আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্ছন্ন থাকবে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর জীবন রক্ষার ব্যাপারে উদাসীন হয়ে কেবল নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। তাছাড়া মুশরিকদের সাথে মুমিনদের সম্পর্কচ্ছেদের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ অংশে এক পর্যায়ে এমন কয়েকজন মুমিনের যুদ্ধে অনুপস্থিতির ঘটনা ও তাদের শাস্তির বিধান বর্ণনা করা হয়েছে যারা খাঁটি মুমিন ছিলেন। এই অংশ ১১১ থেকে ১১৭ নম্বর আয়াত পর্যন্ত চলেছে।

০ সূরার সর্বশেষে উপসংহারে রাসূল (সঃ) এর গুণাবলীর বর্ণনা দেয়া হয়েছে এবং তাঁকে একমাত্র আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীল হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এটা ১২৮ থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত চলেছে।

দারসের জন্য তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর বিষয়বস্তু ঃ মসজিদ-মাদ্রাসা

এবং সাধারণ দ্বীনি খেদমতের চেয়ে আল্লাহ্র কাছে বেশী গ্রহণযোগ্য এবং মর্যাদাপূর্ণ আ'মল হলো, মজবুত ঈমান ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে প্রাণান্ত কর চেষ্টা-সাধনা করা। এছাড়া আয়াতে বলা হয়েছে নিজের বাপ-দাদা এবং ভায়েরা যদি কুফরিকে অগ্রাধিকার দেয় তাহলে তাদেরকেও বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। এছাড়া আয়াতে আরো বলা হয়েছে, যদি কেউ নিজের আত্মীয়-স্বজন এবং দুনিয়ার বস্তু-সামগ্রীকে দ্বীন কায়েমের জন্য জিহাদ করা থেকে বেশী গুরুত্ব দেয় ও মহব্বতে ডুবে যায়, তবে তাদের জন্য আল্লাহ্র ভয়াবহ শাস্তির সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।

শানে নুযুল ঃ ১৯ থেকে ২২ পর্যন্ত চারটি আয়াত নাযিলের পেছনে বেশ কয়েকটি ঘটনা বর্ণিত আছে। যেমন-

প্রথম ঘটনা ঃ মক্কার অনেক মুশরিক মুসলমানদেরকে গর্ব করে বলতো, 'মসজিদুল-হারাম'-এর রক্ষণাবেক্ষণ এবং হাজিদের পানি পান আমরাই করে থাকি। সুতরাং এর উপর আর কারোর কোন আ'মল শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার হতে পারে না। ইসলাম গ্রহণের আগে হযরত আব্বাস (রাঃ) যখন বদর যুদ্ধে বন্দি হন এবং তার মুসলিম আত্মীয়-স্বজন তাকে বাতিল ধর্মের উপর বহাল থাকায় বিদ্রুপের সাথে বলেন, আপনি এখনো ঈমানের দৌলত থেকে বঞ্চীত রয়েছেন। উত্তরে তিনি বলেন, তোমরা ঈমান ও হিজরতকে বড় শ্রেষ্ঠ কাজ মনে করে আছো, কিন্তু আমরাও তো মসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজিদের পানি সরববাহের ব্যবস্থা করে থাকি। তাই আমাদের সমান আর কারোর আ'মল হতে পারে না। এ ঘটনার পরিপেক্ষিতে উপরোক্ত আয়াত সমূহ নাযিল হয়। (তাফসিরে ইবনে কাসির)

দ্বিতীয় ঘটনা ঃ আব্দুর রাজ্জাক বণনা করেন, হয়রত আব্বাস (রাঃ)- এর ইসলাম গ্রহণের পর তালহা বিন শায়বা, হযরত আব্বাস ও হযরত আলী (রাঃ) এর মধ্যে আলোচনা চলছিল। হযরত তালহা বলেন, আমার যে মর্যাদা তা তোমাদের নেই। বায়তুল্লাহ্ শরীফের চাবি আমার দখলে। আমি ইচ্ছা করলে বায়তুল্লাহ্র ভিতরেও রাত্রিযাপন করতে পারি। এবার হযরত আব্বাস বললেন, হাজিদের পানি সরবরাহের ব্যবস্থাপনা আমার হাতে, মসজিদুল-হারামের শাসন ক্ষমতা আমার নিয়ন্ত্রণে। অতঃপর হযরত আলী (রাঃ) বললেন, বুঝতে পারি না এগুলোর উপর তোমাদের এতো গর্ব কেন? আমার কৃতিত্ব হলো, আমি সবার থেকে ৬ মাস আগে 'বায়তুল্লাহ শরীফ' কাবার দিকে মুখ করে নামায আদায় করছি এবং রাসূলুল্লাহ্র সাথে যুদ্ধেও অংশ নিয়েছি। তাঁদের এ

আলোচনার পরিপেক্ষিতে উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়। (মুসনাদে আহমদ)
তৃতীয় ঘটনা ঃ হযরত নোমান বিন বসির (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসে ঘটনাটি ভিন্নভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি একবার এক জুমুয়ার দিন কতিপয় সাহাবার সাথে মসজীদে নববীর মিম্বরের পাশে বসা ছিলেন। উপস্থিত একজন বলেন, ইসলাম ও ঈমানের পর আমার দৃষ্টিতে হাজিদের পানি পান করানোর মতো মর্যাদাপূর্ণ আর কোন আ'মল নেই এবং এর মোকাবেলায় আর কোন আ'মলের ধার আমি ধারি না। তার এই দাবি খন্ডন করে অপরজন বললেন, আল্লাহ্র পথে জিহাদ করার চেয়ে উত্তম আ'মল আর নেই। এভাবে দু'জনের মধ্যে বাদানুবাদ চলতে থাকে। তখন হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) তাদের ধমক দিয়ে বললেন, রাসূলুল্লাহ্র মিম্বরের কাছে পন্ডগোল বন্ধ করো এবং জুমুয়ার নামাযের পর স্বয়ং হযরতের কাছে বিষয়টি পেশ করো। তার কথামতো বিষয়টি রাসূল (সঃ) এর কাছে পেশ কর হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয় এবং এতে মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের পানি পানের উপরে জেহাদকে প্রাধাণ্য দেয় হয়। (সহীহ্ মুসলিম)

ঘটনা যাই হোক না কেন, আয়াতগুলো নাযিল হয়েছিলো মুলতঃ মুশরিকদের অহংকার নিবারণের উদ্দেশ্যে। অতঃপর মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে যেসব ঘটনা ঘটে তার সম্পর্কে প্রমাণ উপস্থাপিত হয় এসব আয়াত থেকে। যার ফলে শ্রোতারা ধরে নিয়েছে যে, এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে।

ব্যাখ্যাঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আমি দারসের জন্য তিলাওয়াতকৃত সূরার নামকরণ, নাযিল হবার সময়কাল, বিষয়বস্তু ও আয়াতগুলোর শানে নূযুল হিসেবে কয়েকটি ঘটনা পেশ করলাম। এখন আমি আপনাদের সামনে আয়াতগুলোর প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা পেশ করছি।
সূরা তাওবার ১৯ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ط لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ ط

তোমরা কি হাজিদের পানি পান করানো এবং মসজিদুল হারাম এর রক্ষণাবেক্ষণকে সেই লোকের সমান মনে করো, যে ঈমান রাখে আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি এবং যুদ্ধ করে আল্লাহ্র পথে, এরা আল্লাহ্র দৃষ্টিতে সমান নয়।

আলোচ্য আয়াতে মুশরিকদের দাবি খন্ডন করে যে সত্যটি তুলে ধরা হয়েছে তা হলো, শিরক মিশ্রত আ'মল তা যতো বড় আ'মলই হোক না কেন, তা আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য নয় এবং তার কাছে এর কোন মূল্যও নেই। সে কারণে যেমন কোন মুশরিক মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজিদের পানি সরবরাহ দ্বারা মুসলমানদের মোকাবেলায় সম্মান ও মর্যাদা লাভ করতে পারে না, তেমনি ইসলাম গ্রহণের পর ঈমান ও জিহাদের মর্যাদা 'মসজিদুল হারাম' এর রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজিদের পানি সরবরাহ ও খেদমতের তুলনায় অনেক বেশী। আর যে মুসলমান ঈমান ও জিহাদের দিক দিয়ে অগ্রগামী, সে জিহাদে অনুপস্থিত মুসলমানের চেয়ে আল্লাহ্র কাছে অনেক বেশী মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আরব যুগে ঈমান না আনার পরেও কাবা ঘরের মুতাওয়াল্লী বা রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং হজ্জের সময় হাজিদের পানি পান করানো ও খেদমত করাকে তারা বিরাট মর্যাদা ও সম্মানের কাজ মনে করতো এবং এ জন্যে তারা মুসলমানদের সামনে গর্ববোধ করতো। এমনকি মুসলমান হওয়ার পরেও কারো কারো মধ্যে এ ধারণা বদ্ধমূল ছিলো। বর্তমান যুগেও আমরা দেখি মসজিদের মুতাওয়াল্লী হওয়া, দরগা ও খানকার গদ্দীনশীল হওয়া, উহার সেবায়েত ও খাদেম হওয়া এবং এই ধরণের প্রদর্শণীমূলক কতিপয় ধর্মীয় কাজকর্ম ও অনুষ্ঠান পালন করাকে তারা বিরাট মর্যাদা, সম্মান ও সওয়াবের কাজ মনে করে থাকে। অথচ আল্লাহর কাছে এসব কাজের কোনই মূল্য বা মর্যাদা নেই। আল্লাহ্র কাছে প্রকৃত মূল্য ও মর্যাদা আছে তাদেরই এবং সেই কাজে যারা প্রকৃত ঈমানদার এবং আল্লাহ্র যমীনে আল্লাহ্র দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য জান মাল দিয়ে জিহাদ করে, আন্দোলন-সংগ্রাম করে। সূরা আলে ঈমরানে মহান আল্লাহ্ বলেন-

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ۝

তোমরা কি মনে করে নিয়েছো যে, এমনি এমনি জান্নাতে চলে যাবে? অথচ এখনো আল্লাহ্ দেখেননি তোমাদের মধ্যে কে কে তার পথে (দ্বীন কায়েমের জন্য) জিহাদ (আন্দোলন)করেছে এবং কে কে তাঁর জন্য সবরকারী ।

(আলে ঈমরান-১৪২)

সুতরাং আল্লাহ্র কাছে বেশী মর্যাদাবান ও সম্মানের লোক তারাই যারা মজবুত

ঈমানের অধিকারী এবং নিজের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদকারী। যদিও তারা কোন পীরের গদ্দীনশীল নয়, কোন মসজিদের মুতাওয়াল্লী নয়। কোন খানকা বা মাজারের সেবায়েত বা খাদেম নয় এবং যদিও তাদের তেমন কোন বংশীয় পরিচয় ও মর্যাদা নেই।

অত্র আয়াতের শেষে মহান আল্লাহ্ বলেন–

وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ

আর আল্লাহ্ যালেম লোকদের হেদায়াত করেন না। অর্থাৎ ঈমান যে সব আমল বা কাজের মূল ও সব এবাদত-বন্দেগী থেকে উত্তম এবং জিহাদ যে মসজিদ আবাদ ও হাজীদের পানি পান করান এবং খেদমত থেকে উত্তম, তা কোন সুক্ষ্ম তত্ত্ব বা দুর্বোধ্য বিষয় নয়, বরং অত্যন্ত পরিস্কার ও স্পষ্ট কথা। কিন্তু আল্লাহ্ যালেম লোকদের হেদায়াত ও উপলব্ধি শক্তি দান করেন না, বিধায় তারা একটি সাদা-সিধে সোজা কথাকে নিয়েও কু-তর্কে জড়িয়ে পড়ে। ফলে তাদের ভাগ্যে হেদায়াত জুটে না।

পরবর্তী আয়াতে মহান আল্লাহ্পাক বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ط وَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ-

যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহ্র পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে জেহাদ করেছে। তাদের বড় মর্যাদা রয়েছে আল্লাহ্র কাছে। আর তারাই সফলকাম।

এই আয়াতটিতে উপরের আয়াতে উল্লেখিত শব্দ لَا يَسْتَوِىْ 'সমান নয়' এর ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহ্র পথে মাল ও জান দিয়ে জেহাদ করেছে, আল্লাহ্র কাছে রয়েছে তাদের বড় মর্যাদা-সম্মান এবং তারাই সফলকাম।

মুশরিকদের মধ্যে যারা কাবা ঘরের খেদমত এবং হাজীদের পানি পান করানকে মর্যাদার দাবীদার এবং সফলকামী মনে করতো। আসলে ঈমান না আনার কারণে ঐসব প্রদর্শনীমূলক বা লোক দেখানো খেদমত ও কাজের আল্লাহ্র কাছে কোন মর্যাদা নেই ও প্রতিদানও নেই। আর ঈমান আনার পর পূর্বের

ঐসব খেদমত ও কাজকে মুসলমানদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে গর্ববোধ করা অমূলক ছাড়া আর কিছুই নয়। বরং মর্যাদা ও প্রতিদান লাভের আমলই হলো আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি মজবুত ঈমান আনা এবং ঈমান আনার পর আল্লাহ্র যমীনে আল্লাহ্র দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের মাল-সম্পদ ও জান-প্রাণ দিয়ে জিহাদ করা, আন্দোলন করা। প্রয়োজনে নিজের ঘর-বাড়ি ও দেশের মহব্বত ত্যাগ করে হিজরত করা।

অতঃপর পরবর্তী দু'টি আয়াত অর্থাৎ ২১ ও ২২ নম্বর আয়াতে খাঁটি মুমিন, জিহাদ ও হিজরত কারীদের পারলৌকিক সফলতা ও পুরস্কারের কথা উল্লেখ করে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَّجَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ- خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ط اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ اَجْرٌ عَظِيْمٌ-

তাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছেন তাদের পরওয়ারদেগার তাঁর রহমত তথা দয়া ও সন্তুষ্টির এবং জান্নাতের। সেখানে আছে তাদের জন্য স্থায়ী শান্তি। তথায় তারা থাকবে চিরদিন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র কাছে আছে বড় পুরস্কার।

উপরোক্ত দুটি আয়াতে জিহাদ ও হিজরতের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। কেননা, এর জন্য প্রিয় মাতৃভূমি নিজের দেশ, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের মহব্বতকে বিদায় জানাতে হয় এবং আত্মত্যাগ করতে হয়। আর এসব স্বভাবধর্মী মহব্বত ও আত্মত্যাগ করা মানুষের জন্য বড়ই কঠিন কাজ। আর যারাই এই কঠিন কাজটি আনজাম দিতে পারে তাদেরকেই আল্লাহ্পাক পরকালে বিশেষ মর্যাদা এবং পুরস্কার দান করেন।

পরবর্তী আয়াতে মানুষের বৈষয়িক জিনিসকে মাত্রাতিরিক্ত ভালবাসার নিন্দা করে হিজরাত ও জিহাদের জন্য মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করে বলা হয়েছে ঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْۤا اٰبَآءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ ط وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ-

হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের বাপ-ভাইদের বন্ধু বা অভিভাবক হিসেবে

গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরীকে বেশী ভালবাসে। তোমাদের মধ্যে যেসব লোক এ ধরনের লোকদেরকে বন্ধু বা অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করবে তারাই হবে সীমালংঘনকারী।

মাতা-পিতা, ভাই-বোন এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক রক্ষার তাগাদা কোরআন ও হাদীসে বহু জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য এই আয়াতে সম্পর্কের একটি সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, তোমাদের বাপ-ভাইসহ অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন যদি ঈমানের চেয়ে কুফরীকে বেশী অগ্রাধিকার দেয়, আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসূলের চেয়ে তাগুত তথা কুফরী শক্তিকে বেশী ভালবাসে তাহলে তাদের বন্ধু, হিতাকাংখী বা অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। তাদের ভালবাসা ও মহব্বতকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। কেননা, আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের সকল সম্পর্কের উপর আল্লাহ্ ও রাসূলের সম্পর্ক অগ্রগণ্য। এই দু'ই সম্পর্কের মধ্যে সংঘাত দেখা দিলে মহব্বত ও আত্মীয়তার সম্পর্ককে জলাঞ্জলি দিতে হবে। এটাকে প্রকৃত ঈমানের কাজ বলে মহানবী (সাঃ) নিম্নের হাদীসে উল্লেখ করে বলেন ঃ

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُ كُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَ
وَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ–

তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তোমাদের কাছে তোমাদের পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এবং অন্যান্য সকল মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় হবো। (বুখারী মুস-লিম)

শুধু এটা ঈমানের কাজই নয় বরং পরিপূর্ণ ঈমানের কাজ উল্লেখ করে মহানবী (সাঃ) অন্য হাদীসে বলেন ঃ

مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ وَاَعْطٰى لِلّٰهِ وَ مَنَعَ لِلّٰهِ
فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَان

যে ব্যক্তি কারো সাথে বন্ধুত্ব রেখেছে শুধু আল্লাহ্র জন্যে, শত্রুতা রেখেছে তাও আল্লাহ্র জন্যে, অর্থ খরচ করেছে আল্লাহ্র জন্যে এবং অর্থ খরচ থেকে বিরত রয়েছে তাও আল্লাহ্র জন্যে, সে যেন নিজের ঈমানকে পরিপূর্ণ করেছে। (বুখারী)

উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ জামায়াত হিসেবে সাহাবায়ে কেরাম যে মর্যাদা লাভ করেছেন, তার মূলে রয়েছে তাঁদের এ ত্যাগ ও কুরবানী। তাঁরা সর্বক্ষেত্রে এবং সকল অবস্থায় আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) এর সম্পর্ককেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তাই আফ্রিকার হযরত বেলাল (রাঃ), রোমের সোয়াইব (রাঃ), পারস্যের হযরত সালমান ফারসী (রাঃ), মক্কার কোরাইস ও মদীনার আনসারগণ গভীর ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন এবং বদর ও ওহুদ যুদ্ধে বাপ ও ছেলে এবং ভাই ও ভাইয়ের মধ্যে প্রচন্ড অস্ত্রের মোকাবেলায় অবতীর্ণ হয়ে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন।

তবে হ্যাঁ কোরআন এবং হাদীসে বাপ-ভাই, ছেলে-মেয়ে ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা ছিন্ন করার যে ঘোষণা দেয়া হয়েছে তা হলো আদর্শের ভালবাসা। দুনিয়ার ক্ষেত্রে তাদের সাথে স্বাভাবিক ব্যবহার করতে হবে এবং মানুষের যে অধিকার আছে তা আদায় করতে হবে।

সূরা লোকমানে এ সম্পর্কে একটি নীতিমালা উল্লেখ করে মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا-

আর তারা (বাপ-মা) যদি তোমাকে আমার সাথে শিরক করতে চাপ দেয়-যে ব্যাপারে তোমার কিছু জানা নেই, তাহলে তুমি তাদের সেই নির্দেশ মানবে না। তবে দুনিয়ার জীবনে তাদের সাথে অবশ্যই ভাল ব্যবহার করবে। (সূরা লোকমান-১৫)

হাদীসেও রাসূল (সাঃ) আদর্শের ভালবাসার কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِّمَا جِئْتُ بِهٖ-

তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ তার মন ও প্রবৃত্তি আমার উপস্থাপিত আদর্শের অনুগত ও অনুসারী না হবে। (সরহে সুন্নাহ)

সুতরাং আদর্শের ব্যাপারে কারো সাথে আপোষ করা যাবে না। ঈমানের বিষয়ে কাকেও ছাড় দেয়া যাবে না।

অতঃপর পরবর্তী আয়াতে মহান আল্লাহ্ মুমিনদেরকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ نِاقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ط وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ–

(হে নবী! মোমিনদের) বলো, তোমাদের কাছে যদি তোমাদের বাপ-দাদা, তোমাদের ছেলে-মেয়ে, তোমাদের ভাই-বোন, তোমাদের স্ত্রীরা ও তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দা হয়ে যাওয়ার ভয় করো, আর তোমাদের সেই ঘর-দোর যাকে তোমরা খুবই পছন্দ করো– আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় বা ভালবাসার হয়, তাহলে অপেক্ষা করো আল্লাহ্র চূড়ান্ত ফায়সালা আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ্ ফাসেক লোকদের কখন-ই পছন্দ করেন না।

সূরা তাওবার এই ২৪ নম্বর আয়াতটি নাযিল হয় মূলতঃ ওদের ব্যাপারে যারা হিজরাত ফরয হওয়াকালে মক্কা থেকে হিজরাত করেনি। বাপ-মা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্তুতি, স্ত্রী-পরিজন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও ধন-সম্পদ ও বাড়ী-ঘরের মায়ায় হিজরাতের ফরজিয়াত থেকে এদেরকে বিরত রেখেছিল।

আল্লাহ্ তাআলা এই আয়াতে মানুষের কাছে খুবই প্রিয় ও আকর্ষণীয় মোট ৮টি বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে ৫টি হলো পাত্রগত। আর ৩টি হলো বস্তুগত। ৫টি পাত্রগত বাপ-মা, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন স্ত্রী পরিজন এবং অন্যান্য আত্মীয়। বস্তুগত ৩টি জিনিস হলো– ধন-সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বাসগৃহ। আল্লাহ্ তাআলা মানুষের কাছে দুনিয়াবি এসব পাত্রগত ও বস্তুগত জিনিসকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও লোভাতুর করে তৈরী করেছেন। আর এসব লোভাতুর, আকর্ষণীয় ও প্রিয় জিনিসকেই আল্লাহ্ মানুষের জন্য পরীক্ষার বস্তু বানিয়ে দিয়েছেন। যেভাবে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে প্রিয় পাত্র ইসমাইলকে কুরবানীর মাধ্যমে পরীক্ষা করেছিলেন। মহানবী (সাঃ)কে নিজের প্রিয় মাতৃভূমি

মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় হিজরাত করিয়েছিলেন। আর হিজরাত করতে হলে তো উপরে উল্লেখিত ৮টি পাত্রগত ও বস্তুগত সকল কিছুই ত্যাগ করতে হয়। যেমন- প্রয়োজনে বাপ-মা, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী-পরিজন, আত্মীয়-স্বজনের মায়া ত্যাগ করতে হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বাড়ী-ঘর ছাড়তে হয়। দুনিয়ার ধন-সম্পদ মোহযুক্ত ও ভালবাসার বস্তুর চেয়ে যদি আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসূলকে বেশী মহব্বত করতে হয়, তা হলে তার পথে জিহাদ করতে হয়। আর জিহাদ করলে প্রয়োজনে হিজরাত করতে হয়। আর হিজরাত করলে উপরে উল্লেখিত সকল জিনিসের ত্যাগ-কুরবানী করতে হয়। আর যারাই এই ত্যাগ ও কুরবানী করতে পারে না তাদের দ্বারাই দুনিয়ার ঐসব লোভাতুর ও আকর্ষণীয় জিনিসের মহব্বতে ডুবে গিয়ে আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসূলের মহব্বত উপেক্ষিত হয়। আর যারা জিহাদ ও হিজরাত থেকে দূরে সরে যায়, তাদেরই পরিণতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে মহান আল্লাহ্ পাক সতর্ক বানী উচ্চারণ করে বলেন-

فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ

তাহলে তোমরা অপেক্ষা কারো আল্লাহর সিদ্ধান্ত বা ফয়সালা আসা পর্যন্ত।

এই আয়াতে আল্লাহ্ তাআলার বিধান আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করার যে কথা বলা হয়েছে এ ব্যাপারে কয়েকটি মতামত রয়েছে। যেমন-

এক. হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, এখানে 'বিধান' অর্থ যুদ্ধ-বিগ্রহ ও মক্কা বিজয়ের আদেশ। তার দৃষ্টিতে বাক্যের সারমর্ম হলো এই, যারা দুনিয়াবী সম্পর্কের জন্যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সম্পর্ককে জলাঞ্জলি দিচ্ছে, তাদের করুণ পরিণতির দিন সমাগত। মক্কা যখন বিজয় হবে আর এসব নাফরমানেরা লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হবে, তখন দুনিয়াবী সম্পর্ক তাদের কোন কাজে আসবে না।

দুই. হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, এখানে 'বিধান' অর্থ আল্লাহ্র আযাবের বিধান। অর্থাৎ আখেরাতের সম্পর্কের উপর যারা দুনিয়ার সম্পর্ককে প্রাধান্য দিয়ে হিজরাত থেকে বিরত রয়েছে, আল্লাহ্র আযাব অতি শীঘ্রই তাদেরকে গ্রাস করবে। দুনিয়াতেই এই আযাব আসতে পারে। না হলে আখেরাতের আযাব তো আছেই। এখানে হুঁশিয়ারী উচ্চারণটি মূলতঃ হিজরাত না করার প্রেক্ষিতে। কিন্তু আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে জেহাদের। যা নাকি হিজরাতের পরবর্তী পদক্ষেপ। এই বর্ণনা ভঙ্গীর মাধ্যমে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, সবেমাত্র হিজরাতের নির্দেশ দেয়া হলো, এতেই অনেকের হাঁপ ছেড়ে বসার অবস্থা।

কিন্তু অচিরেই আসছে জিহাদের নির্দেশ, যে নির্দেশ পালন করত যেয়ে আল্লাহ্ ও রাসূলের জন্যে সকল জিনিসের মায়া-মহব্বত, এমনকি নিজের জীবনের মায়া পর্যন্ত ত্যাগ করতে হতে পারে।

তিন. মাওঃ মওদুদী (রঃ) বলেন, এখানে বিধান বা ফয়সালা অর্থ- পদচ্যুতি। অর্থাৎ তোমাদের এই ব্যর্থতার জন্য তোমাদেরকে পদচ্যুত করে সত্যিকারে দ্বীনদার এবং দ্বীনের ব্যাপারে নেতৃত্বের অধিকারী, হেদায়াতের মর্যাদার অধিকারী অপর কোন দল বা লোকের হাতে আল্লাহ্ তাআলা দায়িত্ব অর্পণ করবেন।

মোট কথা উপরের মতামত থেকে আল্লাহ্র চূড়ান্ত ফায়সালা বা বিধান আসার অর্থ এটা বোঝা যায় যে, যারা দুনিয়ার এই পাত্রগত ও বস্তুগত জিনিসের লোভে ও মহব্বতে ডুবে গিয়ে আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসূলের ভালবাসা ও মহব্বতকে উপেক্ষা করে এবং জিহাদ ও হিজরাত থেকে বিরত থাকে, তাদের জন্যে দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় জীবনে কঠিন লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও ভয়াবহ আযাব নিহিত রয়েছে। যার পাকড়াও হতে তারা কেউই রেহাই পাবে না এবং তা থেকে দোআ করেও উদ্ধার পাওয়া যাবে না। এ সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) বলেন ঃ

لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْ لَيُوْشَكَنَّ اللّٰهُ اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ عِنْدِهٖ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهٗ وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ-

অবশ্য অবশ্যই তোমরা সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বারণ করবে। নচেৎ তোমাদের উপর শ্রীঘ্রই আল্লাহ্র আযাব নাযিল হবে। অতঃপর তোমরা (আল্লাহ্র এই আযাব থেকে বাঁচার জন্য) দোআ করতে থাকবে। কিন্তু তোমাদের দোআ কবুল করা হবে না। (তিরমিজী)

আয়াতের শেষাংসে বলা হয়েছে-

وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ **আর আল্লাহ্ ফাসেক লোকদের হেদায়াত করেন না।**

এখানে বলা হয়েছে যে, যারা হিজরাতের নির্দেশ আসার পরেও দুনিয়াবী সম্পর্ককে প্রাধান্য দিয়ে আত্মীয়-স্বজন এবং ধন-সম্পদকে বুকে জড়িয়ে বসে

আছে, তাদের এই আচরণ দুনিয়াতে কোন ফল দেবে না এবং আত্মীয়-স্বজন দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় নিজ ঘরে আরাম-আয়েশ ও ভোগের যে আশা পোষণ করে আছে, তাও পূরণ হবে না; বরং জেহাদের দামামা বেজে উঠার পর সকল সহায়-সম্পত্তি তাদের জন্যে অভিষাপ হয়ে দাঁড়াবে। কারণ আল্লাহ্র নিয়ম হলো, তিনি কোন নাফরমান লোকদের অসৎ উদ্দেশ্য পূরণ করেন না।

প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! আমরা যদি আমাদের সমাজের লোকদের দিকে একটু চোখ বুলিয়ে দেখি, তাহলে তো আমরা তাই দেখতে পাই। বর্তমানে আমাদের এই সমাজে আল্লাহ্র বিধান প্রতিষ্ঠিত নেই, যার ফলে গোটা সমাজ আজ অন্যায়, অপরাধ ও পাপাচারে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে! চারিদিকে অশান্তি আর অশান্তি। আর এই অবস্থায় মুসলমান নামধারীরা গুটি কয়েক নেক আমল করে নিজেকে পাক্কা মুসলমান হিসেবে দাবী করছে। অথচ তারা আল্লাহ্ ও রাসূলের মহব্বত ও ভালবাসাকে উপেক্ষা করে দুনিয়ার মহব্বতে ডুবে আছে। সমাজ পরিবর্তনের জন্য আল্লাহ্র বিধান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে। তারা অন্ধ-বধির। এতটুকুও তাদের অন্তরের অনুভূতিতে ধরা পড়ে না। তাদের চোখে যেন কিছুই দেখে না। মানুষ আজ বেখেয়াল উদাসীন। সস্তা আমলের প্রতিযোগীতায় অবতীর্ণ। আর এসব দুনিয়া প্রীতি, আত্মভোলা উদাসীন মুসলমানের দাবীদারদের জন্যই আল্লাহ্ তায়ালা দুনিয়া এবং আখেরাতের চরম লাঞ্ছনা ও শাস্তির সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়ে হুশিয়ার করে দিয়েছেন।

শিক্ষা ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনাদের সামনে সূরা তাওবার ১৯-২৪ আয়াতের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা পেশ করলাম। এখন উক্ত আয়াত থেকে আমাদের জন্যে যেসব শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

● ঈমান বিহীন আমল, বিশেষ করে শিরক মিশ্রিত আমল আল্লাহ্র কাছে কোন মূল্য নেই। সেসব আমল দেখতে যতই নেক ও উত্তম মনে হোক না কেন।

● কোন বেঈমান কাফের, মুশরিক যদি কোন ভাল, কল্যাণকর আমল বা কাজ করে তাহলে আল্লাহ্ তাআলা দুনিয়াতেই তার বিনিময় দিয়ে আখেরাতের শাস্তির পথকে পরিস্কার করে দেন।

● ঈমানদারদের মধ্যে যারা শুধু ঈমান এনে দ্বীনের খেদমত করে, আর যারা ঈমান আনার পর আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করে তারা উভয়ে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সমান নয়। আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য ও মর্যাদাবান ব্যক্তি হলো তারাই যারা ঈমান আনার পর আল্লাহ্‌ ও আল্লাহ্‌র রাসূলের মহব্বতের জন্য দ্বীন-প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরীক থেকে নিজের জান-মাল দিয়ে জিহাদ করে।

● যারা দ্বীন-প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরীক না হয়ে শুধু কিছু দ্বীনি খেদমত এবং কতিপয় ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করে নিজেকে পাক্কা মুসলমান দাবী করে কু-তর্কে লিপ্ত হয়ে পড়ে, আল্লাহ্‌ পাক তাদেরকে যালেম বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর এদেরকেই আল্লাহ্‌পাক সঠিক পথ দেখান না।

● প্রকৃত পক্ষে দুনিয়া ও আখেরাতে তারাই সফলকাম এবং আল্লাহ্‌র কাছে তাদেরই মর্যাদা রয়েছে, যারা ঈমান আনার পর নিজের জান-মাল দিয়ে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করে, আন্দোলন করে এবং প্রয়োজনে দ্বীনের খাতিরে বাড়ী-ঘর ও প্রিয়জনদের মহব্বত ত্যাগ করে হিজরাত (দেশ ত্যাগ) করে।

● জিহাদ এবং হিজরাতকারী খাঁটি ঈমানদারদের মহা পুরুস্কার হিসেবে আল্লাহ্‌ তাবারাকওয়া তায়ালা যেসব প্রতিদান দেবেন, তা হলো– ক) আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বা দয়া। খ) তাঁর সন্তুষ্টি। গ) চির প্রশান্তিময় জান্নাত ঘ) এবং স্থায়ী ভাবে বসবাসের জন্য বালাখানা।

● জিহাদকারী মুমিন লোকেরা কখনই কুফরকারী অথবা কুফুরি শক্তির অনুসারী বাপ-দাদা, ভাই-বোন ও অন্যান্য নিকট স্বজনদের বন্ধু বা অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে না। যদি কেউ তা করে তবে তারা হবে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে ফাসেক বা সীমালংঘনকারী।

● আল্লাহ্‌, আল্লাহ্‌র রাসূল এবং জিহাদের মোকাবেলায় যদি নিজের পিতা-মাতা, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে, স্বামী-স্ত্রী এবং অন্যান্য নিকটাত্মীয় প্রতিদ্বন্দ্বি হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে আল্লাহ্‌ ও আল্লাহ্‌র রাসূলের পক্ষ অবলম্বন করতে হবে এবং সমস্ত আপন জনের মহব্বত ত্যাগ করে প্রয়োজনে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে হবে। যেভাবে বদরের যুদ্ধে হযরত আবুবকর তার কাফের ছেলের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিলেন।

● নিজের পিতা-মাতা, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে, স্বামী-স্ত্রী, অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন, ধন-সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বাড়ী-ঘরকে প্রিয় ও মহব্বতের জিনিস বানানো যাবে না। বরং প্রিয় ও মহব্বতের জিনিস বানাতে হবে– আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং তাঁরপথে জান-মাল দিয়ে জিহাদ বা আন্দোলন করাকে। আর যদি এটা করতে কেউ ব্যর্থ হয়, তাহলে তাদেরকে দুনিয়া এবং আখেরাতে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে লাঞ্ছনা ও কঠিন শাস্তির জন্য অপেক্ষা করতে হবে। আর যখন এ শাস্তি এসে হাজির হয়ে যাবে তখন সবাই মিলে দোআ করলেও তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে না।

আহবান ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা তাওবার ১৯-২৪ আয়াত পর্যন্ত যে দারস এবং শিক্ষা পেশ করলাম এতে যদি আমার অজান্তে কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে যায়, সেজন্য মহান আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর উক্ত দারস থেকে আমরা যেসব গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা লাভ করলাম তা যেন বাস্তব জীবনে আমল করতে পারি সেই তৌফিক কামনা করে দারস শেষ করছি। মাআসসালাম।

দুই

কতিপয় সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ। ওয়াদা এবং কসম রক্ষা করার গুরুত্ব।

(সূরা নহল-৯০-৯৭ আয়াত)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى
الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْىِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ- وَاَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عٰهَدْ
تُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ
اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا ط اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ- وَلَا
تَكُوْنُوْا كَالَّتِىْ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ م بَعْدِ قُوَّةٍ
اَنْكَاثًا ط تَتَّخِذُوْنَ اَيْمَانَكُمْ دَخَلًا م بَيْنَكُمْ اَنْ تَكُوْنَ
اُمَّةٌ هِىَ اَرْبٰى مِنْ اُمَّةٍ اِنَّمَا يَبْلُوْكُمُ اللّٰهُ بِهٖ ط
وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ-
وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّضِلُّ مَنْ
يَّشَآءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ط وَلَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ
تَعْمَلُوْنَ- وَلَا تَتَّخِذُوْا اَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ
قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوْتِهَا وَتَذُوْقُوا السُّوْٓءَ بِمَا صَدَدْتُّمْ عَنْ

سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ لَكُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ- وَلاَ تَشْتَرُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًاط اِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ- مَا عِنْدَ كُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍط وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا اَجْرَهُمْ بِاَ حْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ- مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍاَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَا نُوْا يَعْمَلُوْنَ-

সরল অনুবাদ ঃ ইরশাদ হচ্ছে– (৯) আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে সুবিচার, ইনসাফ, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বনজকে দান করার নির্দেশ দেন। আর অশ্লীলতা, পাপ কাজ এবং অবাধ্যতা করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদেরকে নসীহ্ত করছেন যাতে তোমরা শিক্ষা লাভ করতে পারো। (৯১) তোমরা আল্লাহ্র ওয়াদা পূরণ করো, যখন তোমরা তাঁর নিকট কোন ওয়াদা করো এবং পাকাপাকি কসম করার পর তা ভংগ করো না। অথচ তোমরা আল্লাহ্কে জামিনদার বানিয়ে নিয়েছ। তোমরা যে কাজ-কাম করো আল্লাহ্ তা সবকিছুই জানেন। (৯২) তোমাদের অবস্থা যেন সেই মহিলার মতো না হয়, যে নিজেই খাটা-খাটুনি করে সুতা কাটে এবং পরে নিজেই ওকে টুকরা টুকরা করে ছিঁড়ে ফেলে। তোমরা নিজেদের কসমগুলোকে পারস্পরিক ব্যাপারে ধোকা ও প্রতারণার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছো এজন্য যে, যাতে একদল অপর দল অপেক্ষা বেশী ফায়দা লাভ করতে পারে। অথচ আল্লাহ্ এই ওয়াদা- প্রতিশ্রুতির দ্বারা তো তোমাদেরকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। আর অবশ্যই তিনি কিয়ামতের দিন তোমাদের পারস্পরিক কলহের মূল তত্ত্ব তোমাদের সামনে প্রকাশ করে দেবেন। (৯৩) আল্লাহ্ যদি এটাই চাইতেন (যে, তোমাদের মধ্যে কোন মতবিরোধ হবে না) তবে তিনি তোমাদেরকে একই জাতিতে পরিণত করে দিতেন। কিন্তু তিনি যাকে চান বিপথগামী করেন এবং যাকে চান সত্য-সঠিক পথ দেখান। আর তোমরা যা করো সে বিষয়ে তোমাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা

হবে। (৯৪) (হে মুমিনেরা!) তোমরা নিজেদের কসমগুলোকে পরস্পরের মধ্যে একে অপরকে ধোকা দেবার উপায় বানিয়ে নিও না। তা হলে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পা ফসকে যাবে এবং তোমরা খারাপ পরিণতি দেখতে পাবে এই কারণে যে, তোমরা আমার পথ হতে ফিরিয়ে রেখেছ এবং তোমাদের কঠোর শাস্তি হবে। (৯৫) তোমরা আল্লাহ্র ওয়াদা-প্রতিশ্রুতিকে সামান্য ফায়দার বিনিময়ে বিক্রয় করে দিও না। নিশ্চয় আল্লাহ্র কাছে যা আছে, তা তোমাদের জন্যে অতি উত্তম– যদি তোমরা জানতে ও বুঝতে। (৯৬) তোমাদের কাছে যা কিছু আছে, তা সবই নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর আল্লাহ্র কাছে যা আছে, তাই চিরদিন থাকবে। আমি অবশ্যই ধৈর্য ধারণকারীদেরকে তাদের উত্তম-ভাল কাজের অনুপাতে প্রতিফল দান করবো। (৯৭) যে ব্যক্তিই নেক আমল করবে– সে পুরুষ হোক কিংবা নারী– যদি সে মুমিন হয়, তাকে দুনিয়ায় পবিত্র জীবন যাপন করাব। আর (পরকালে) এ ধরণের ব্যক্তিদের তাদের আমল অনুপাতে প্রতিফল দান করবো।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ إِنَّ –নিশ্চয়। يَأْمُرُ –নির্দেশ দেন। بِالْعَدْلِ –ইনসাফ বা ন্যায় বিচারের। إِحْسَانِ –সদাচারণ, সহানুভূতি। إِيْتَائِ –দান করার। ذِى الْقُرْبٰى–আত্মীয়-স্বজন। يَنْهٰى –নিষেধ করেন। عَنْ–থেকে বা হতে। اَلْفَحْشَاءِ–অশ্লীলতার। اَلْمُنْكَرِ –অপছন্দনীয় বা পাপ কাজের। اَلْبَغْىِ–অবাধ্যতার। يَعِظُكُمْ–তোমাদেরকে নসিহত করেন। لَعَلَّكُمْ –সম্ভবত তোমরা। تَذَكَّرُوْنَ –স্মরণ করবে বা শিক্ষা লাভ করবে। اَوْفُوْا –তোমরা পূর্ণ করো। بِعَهْدِ اللّٰهِ– আল্লাহ্র ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি। اِذَا–যখন। عٰهَدْتُّمْ–তোমরা ওয়াদা- প্রতিশ্রুতি করো। لَا تَنْقُضُوْا– –তোমরা ভঙ্গ করো না। اِيْمَانَ –কসম সমূহ। بَعْدَ –পরে। تَوْكِيْدِهَا–পাকা-পাকি করা। جَعَلْتُمُ اللّٰهَ–আল্লাহ্কে

করেছ। عَلَيْكُمْ- –তোমাদের উপর। كَفِيْلًا –জামিনদার। يَعْلَمُ –জানেন। تَفْعَلُوْنَ- مَا- –যা তোমরা করো। لَا تَكُوْنُوْا –তোমরা হয়ে যেও না। كَالَّتِىْ –ঐ মহিলার মতো। نَقَضَتْ–যে সূতা কেটেছে। غَزْلَهَا–তার সূতা। بَعْدِ–পরে। قُوَّةٍ–মজবুত করার تَتَّخِذُوْنَ –তোমরা গ্রহণ করো। اَنْكَاثًا -টুকরো টুকরো। بَيْنَكُمْ–তোমাদের পরস্পরের মধ্যে। اُمَّةٌ–একদল। هِىَ -তা। اَرْبٰى- বেশী লাভবান يَبْلُوْكُمْ তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন। بِهٖ–তা দ্বারা। لَيُبَيِّنَنَّ –অবশ্যই প্রকাশ করবেন। لَكُمْ –তোমাদের জন্য। يَوْمَ الْقِيٰمَةِ –কিয়ামতের দিন বা পরকালে। مَا –যা। كُنْتُمْ - তোমরা করেছিলে। فِيْهِ– উহাতে। تَخْتَلِفُوْنَ –তোমরা মতানৈক্য করতে। لَوْ –যদি। - شَاءَ চাইতেন বা ইচ্ছা করতেন। لَجَعَلَكُمْ –তোমাদের করে দিতেন। اُمَّةً وَّاحِدَةً –একই দলভুক্ত। لٰكِنْ –কিন্তু, বরং। يُضِلُّ–তিনি পথভ্রষ্ট করেন। مَنْ يَّشَاءُ–যাকে চান। وَيَهْدِىْ –এবং হেদায়াত দেন। لَتُسْئَلُنَّ –অবশ্যই জিজ্ঞাসা করবেন। عَمَّا -তা সম্পর্কে। لَا تَتَّخِذُوْا –তোমরা গ্রহণ করো না। اَيْمَانَكُمْ–তোমাদের কসম সমূহ। دَخَلًا –ধোকা। فَتَزِلَّ –অতঃপর ফসকে যাবে। قَدَمٌ–পা। بَعْدَ –পরে। ثُبُوْتِهَا–তা দৃঢ় মজবুত। تَذُوْقُوا-–তোমরা স্বাদ নেবে السُّوْءَ –খারাপ। صَدَدْتُّمْ–তোমরা বাধা দিতে। عَنْ–থেকে বা হতে। سَبِيْلِ اللّٰهِ–আল্লাহ্র পথ। لَكُمْ –তোমাদের জন্যে। عَذَابٌ –শাস্তি।

عَظِيْمٌ -বড়, মহাকঠিন। لَا تَشْتَرُوْا -তোমরা খরিদ বা বিক্রী করো না। بِعَهْدِ اللّٰهِ-আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার। ثَمَنًا- -মূল্যে। قَلِيْلًا-অল্প, সামান্য। هُوَ-উহা বা তাই। خَيْرٌ -উত্তম। اِنْ كُنْتُمْ-যদি তোমরা। تَعْلَمُوْنَ -জানতে বা বুঝতে। مَا عِنْدَكُمْ -তোমাদের কাছে যা আছে। يَنْفَدُ -নিঃশেষ হয়ে যাবে। بَاقٍ -অবশিষ্ট বা স্থায়ী। لَنَجْزِيَنَّ -অবশ্যই প্রতিদান দেয়া হবে। اَلَّذِيْنَ-যারা। صَبَرُوْا- -ধৈর্য ধারণ করেছে। اَجْرَهُمْ -তাদের প্রতিদান। بِاَحْسَنِ -অতি উত্তম। مَنْ عَمِلَ صَالِحًا-যে সৎ আমল করবে। ذَكَرٍ -পুরুষদের। اُنْثٰى-নারীদের। هُوَ مُؤْمِنٌ -তারা মুমিন। فَلَنُحْيِيَنَّهٗ -অতঃপর তাদেরকে জীবন দেব আমরা। حَيٰوةً طَيِّبَةً-পবিত্র জীবন। مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-যা তারা আমল বা কাজ করতো।

সম্বোধন ঃ দারসে কুরআন মাহফিলে/অনুষ্ঠানে উপস্থিত ইসলাম প্রিয় দ্বীনদার/ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ভায়েরা/বোনেরা! আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহ্‌মাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ। আমি আপনাদের সামনে দারস পেশ করার জন্য সূরা নহলের ৯০ থেকে ৯৭ আয়াত পর্যন্ত তিলাওয়াত ও তরজমা পেশ করেছি। আল্লাহ্‌ পাক যেন আমাকে আপনাদের সামনে সঠিক ভাবে দারস পেশ করার তাওফীক দান করেন। 'অমা তাওফীকি ইল্লাহ্‌ বিল্লাহ্‌'।

সূরার নামকরণ ঃ 'নাহ্‌ল' অর্থ মৌমাছি। সূরার ৬৮ নম্বর আয়াতে وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ- বাক্যাংশ থেকে এ নামকরণ করা হয়েছে। এই নামকরণ সূরার শিরোনাম হিসেবে করা হয়নি। বরং প্রতীকী বা চিহ্ন হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। তবে যা করা হয়েছে তা অহীর নির্দেশেই করা হয়েছে।

সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল ঃ সূরাটি মাক্কী এ বিষয়ে সবাই একমত। তবে মক্কী জীবনের কোন সময় অবতীর্ণ হয় এ বিষয়ে নির্দিষ্ট করে বলা না গেলেও সূরাতে উল্লেখিত কয়েকটি ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে সূরাটি মহানবী (সাঃ) এর মক্কী জীবনের শেষের দিকে নাযিল হয়। যেমন– সূরার ৪১ নম্বর আয়াত হতে বুঝা যায় যে, এসময় হাবশায় হিজরাত অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। তাছাড়া ১০৬ নম্বর আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, এসময় মুসলমানদের উপর কাফেরদের যুলুম-নির্যাতন চরম ভাবে বেড়ে গিয়েছিলো। তাছাড়া ১১২-১১৪ নম্বর আয়াতগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহানবী (সাঃ) এর নবুয়াত লাভের পর মক্কায় যে বড় ধরনের দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিলো এ সূরা নাযিলের সময় তা শেষ হয়ে গিয়েছিলো। সুতরাং এসব প্রমাণ থেকে এটাই প্রতিয়মান হয় যে সূরাটি মাক্কী জীবনের শেষের দিকে অবতীর্ণ হয়েছিল। তাছাড়া সূরাটির সাধারণ বর্ণনাভংগিও একথা সমর্থন করে।

সূরাটির মূল বিষয়বস্তু ঃ সূরাটির মূল বিষয়বস্তু হলো– শিরককে বাতিল করে তাওহীদ বা একত্ববাদকে প্রমাণ করা, নবীজির ডাকে সাড়া না দেবার অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা ও উপদেশ দেয়া এবং হকের বিরোধিতা ও তার পথে বাধা সৃষ্টি করার বিরুদ্ধে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করা।

তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর বিষয়বস্তু ঃ দারসের জন্য তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর মূল বিষয় হলো– আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কিছু ভালো কাজের আদেশ এবং খারাপ কাজে বাধা সৃষ্টি করা। তাছাড়া আল্লাহ্র সাথে অংগীকর ও কসম রক্ষা করার প্রতিদান এবং ভঙ্গ করার পরিণতি সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। সবরকারী এবং সৎ আমলকারী পুরুষ-নারীদের দুনিয়া ও আখেরাতে পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনাদের সামনে সূরাটির প্রাথমিক কিছু পরিচয় তুলে ধরলাম। এখন আমি উল্লেখিত আয়াতগুলোর ধারাবাহিক ভাবে ব্যাখ্যা পেশ করছি। মহান আল্লাহ্ পাক অত্র সূরার ৯০ আয়াতে বলেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاۤئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْىِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ–

নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা, ন্যায় বিচার, সদাচারণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার নির্দেশ দিচ্ছেন। আর বারণ করছেন অশ্লীলতা, পাপ কাজ ও অবাধ্যতা থেকে। তিনি তোমাদেরকে নসিহত করেন, যাতে তোমরা শিক্ষালাভ করতে পার।

আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এই আয়াত সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেনঃ এটি হচ্ছে আল কুরআনের ব্যাপক অর্থবোধক একটি আয়াত। (ইবনে কাসীর)

এই আয়াতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তিনটি বিষয়ের আদেশ এবং তিনটি কাজের নিষেধ করা হয়েছে যা নাকি একটি সমাজকে সুন্দর, সুশৃংখল এবং শান্তিময় করে গড়ে তোলে।

আদেশ সূচক তিনটি বিষয় ঃ আয়াতে আল্লাহ্ পাকের আদেশ সূচক তিনটি বিষয়ের **প্রথম আদেশ ঃ** عَدَل (আদল), عَدَل (আদল) শব্দের আভিধানিক অর্থ ন্যায় বিচার করা, ভারসাম্য রক্ষা করা ও কোন কিছু সোজা করা। আর ইসলামী পরিভাষায় এর অর্থ হলো, ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনের সকল ক্ষেত্রে শরীয়ত সম্মত জীবন বিধানে যার যা হক বা প্রাপ্য তা আদায়ের সুব্যবস্থা করা।

'আদল' দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। একটি হলো আল্লাহ্র প্রতি আদল এবং অপরটি হলো বান্দার প্রতি 'আদল'।

আল্লাহ্র প্রতি আদল ঃ আল্লাহ্র প্রতি আদল অর্থ حَقُّ اللّٰه অর্থাৎ আল্লাহ্র হক বা অধিকারকে সঠিকভাবে আদায় করা। আল্লাহ্র হককে নিজের ভোগবিলাসের উপর এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে নিজের কামনা-বাসনার উপর অগ্রাধিকার দেয়া, আল্লাহ্র বিধানগুলো যথাযথ ভাবে পালন করা এবং তাঁর নিষিদ্ধ বা হারাম বিষয় ও কাজ থেকে বেঁচে থাকা, দূরে থাকা এবং পরিহার করা।

বান্দার প্রতি আদল ঃ حَقُّ الْعِبَادْ বা বান্দার প্রতি আদলকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

(i) ব্যক্তির প্রতি আদল ঃ অর্থাৎ বান্দা নিজের প্রতি আদল করবে। নিজের প্রতি আদল হলো দৈহিক ও আত্মিক ধ্বংসের কারণাদি থেকে নিজেকে বাঁচানো, নিজের এমন কামনা বা চাহিদা পূর্ণ না করা যা পরিনামে ক্ষতির কারণ হয়।

সবর বা ধৈর্য অবলম্বন করা ও অল্পে তুষ্ট হওয়া। আর আল্লাহ্ পাক মানুষের দেহে যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়েছেন তার ধারণক্ষমতার বাইরে অহেতুক বোঝা না চাপানো।

(ii) সমাজের অন্যান্য মানুষের প্রতি আদল ঃ সমাজে বসবাসকারী অন্যান্য মানুষের প্রতি পারস্পরিক আদল। যার যা হক বা অধিকার তা বুঝিয়ে দেওয়া। আদলের প্রচলিত যে অর্থ 'ইনসাফ' আমরা করে থাকি তা প্রকৃত অর্থে ভুল। কেননা, اِنْصَافْ (ইনসাফ) শব্দটি نِصْفٌ (নেছফুন) শব্দ থেকে এসেছে। যার অর্থ-অর্ধ। অর্থাৎ, আধাআধির ভিত্তিতে অধিকার বন্টন করা। এ থেকেই আদল ও ইনসাফের অর্থ মনে করা হয়েছে সাম্য ও সমান সমান ভিত্তিতে অধিকার বন্টন। এটি সম্পূর্ণ প্রকৃতি বিরোধী। তাহলে তো একজন পিতার ছেলে-মেয়ে দুজন সন্তানের মধ্যে সম্পত্তি আধাআধি করে ভাগ করে দিতে হয়, এটা সঠিক নয়। এটা তো আল্লাহ্র দেয়া বিধানের বিপরীত। আস-লে 'আদল' সমতা বা সাম্য নয় বরং ভারসাম্য রক্ষা ও সমন্বয় সাধন করা। কোন কোন ক্ষেত্রে 'আদল' অবশ্যই সমাজের লোকদের মধ্যে 'সাম্য' চায়। যেমন নাগরিক অধিকারের ক্ষেত্রে সবাই সমান। বিচারকের সামনে বাদী-বিবাদী উভয়েই সমান, তা রাজা-প্রজার মধ্যে হোক না কেন। তবে আবার কোন কোন ক্ষেত্রে 'সাম্য' সম্পূর্ণভাবে 'আদল' বিরোধী। যেমন বাপ মা ও সন্তানদের মধ্যে সামাজিক ও নৈতিক সাম্য এবং উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও নিম্ন পর্যায়ের কর্মচারীদের মধ্যে বেতনের 'সাম্য'। অতএব আল্লাহ্ যে জিনিসের নির্দেশ দিয়েছেন তা অধিকারের মধ্যে 'সাম্য' নয় বরং ভারসাম্য রক্ষা করা ও সমন্বয় সাধন করা। এ হুকুমের দাবী হলো এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, আইনগত, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার পূর্ণ ঈমানদারীর সাথে আদায় করা।

দ্বিতীয় আদেশ ঃ اِحْسَانْ (ইহসান), اِحْسَانْ শব্দটি আরবী حُسْنٌ শব্দ থেকে এসেছে। যার আভিধানিক অর্থ সৌন্দর্য। কোনকিছু সুন্দর ও উত্তম রূপে সম্পন্ন করার নাম হলো ইহসান। সাধারণ অর্থে দান করা, সৎ ও কল্যাণকর কাজ করা, উপকার করা ও উত্তম ব্যবহার করাকে ইহসান বলা হয়। ইসলামী পরিভাষায় স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে মানুষের যে দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে তা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে উত্তমভাবে সম্পন্ন করাকে ইহসান বলে। কেউ কেউ

ইহসান সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এবং ইসলামী বিধানের প্রতি এমন গভীর ভালবাসা যা একজন মুসলমানকে ইসলামের জন্য সবকিছুই উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত করে তোলে।

ইহসানের ক্ষেত্র ঃ ইহসান দুটি ক্ষেত্রে আদায় করা যেতে পারে। যেমন স্রষ্টার প্রতি ইহসান এবং সৃষ্টির প্রতি ইহসান।

ক) স্রষ্টার প্রতি ইহসান ঃ স্রষ্টার প্রতি ইহসানের অর্থ যখন নেয়া হবে তখন তার অর্থ হবে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে তাঁর যাবতীয় ইবাদত-বন্দেগী করা। ইহসানের সঠিক মর্ম ও তাৎপর্য সাহাবাদেরকে অবহিত করার উদ্দেশ্যে একবার জিবরাইল (আঃ) মহানবী (সাঃ) এর দরবারে হাজির হয়ে অনেক প্রশ্নের মধ্যে ইহসান সম্পর্কে প্রশ্ন করলে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) প্রতি উত্তরে বলেছিলেন,

اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ

তুমি এমন ভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করবে যেন তুমি তাকে দেখতে পাচ্ছ। আর যদি তা সম্ভব না হয়, তবে তুমি এরূপ মনে করবে যে, নিশ্চয় তিনি তোমাকে দেখছেন। (মুসলিম)

উল্লেখ্য যে মুসলিম শরীফে বর্ণিত এই হাদীসটি "হাদীসে জিবরীল" নামে পরিচিত। সুতরাং এই হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্র প্রতি ইহসান অর্থই হলো তার ইবাদত বন্দেগী নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে যথাযথ ভাবে পালন করা। কেননা, আল্লাহ্ বান্দার সমস্ত কাজকে অবলোকন করছেন।

খ) সৃষ্টির প্রতি ইহসান ঃ সৃষ্টির প্রতি ইহসান বলতে শুধু মানুষের প্রতিই ইহসান নয় বরং মানুষসহ আল্লাহ্ পাকের যাবতীয় সৃষ্টি জীবের প্রতি ইহসান করা।

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ জীবন যাপন মানুষের জাতগত অভ্যাস। সুতরাং একটি সুন্দর সুশৃংখল ও শান্তিময় সমাজের জন্য ইহসানের প্রয়োজন। যেখানে থাকবে পরোপকার, সদাচারণ, ভাল ব্যবহার, সহানুভূতি, ভালবাসা, দয়া, ক্ষমা, অপরের অগ্রাধিকার, পরস্পরের সম্মান-মর্যাদা রক্ষা, অন্যকে তার প্রাপ্যের চেয়ে বেশী দেয়া এবং নিজের অধিকার আদায়ের বেলায় কম নেয়া। এটি 'আদলের' চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। 'আদল' যদি সমাজকে কটুতা ও তিক্ততা থেকে বাঁচায় তাহলে 'ইহসান' তার মধ্যে সমাবেশ ঘটায় মিষ্ট মধুর স্বাদের।

আর যদি সমাজের লোকেরা এই গুণের সমাবেশ ঘটায় তাহলে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এ সমাজের লোকদের উপর রহমত নাযিল হয়। মহানবী (সাঃ) হাদীসে উল্লেখ করেন ঃ

اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ

তোমরা পৃথিবীতে যা আছে তাদের প্রতি দয়া করো, তাহলে আসমানে যিনি আছেন তিনি তোমাদের প্রতি রহম করবেন। (তিরমিযী)

এই হাদীস থেকে এও জানা যায় যে, মানুষের প্রতিই শুধু ইহসান বা দয়া নয়। বরং অন্যান্য আল্লাহ্‌র সৃষ্টি জীবের প্রতিও ইহসান বা দয়ার কথা বলা হয়েছে। বুখারী এবং মুসলিম শরীফের হাদীসের বর্ণনায় পাওয়া যায় বনি ইসরাইলের একজন মহা পাপী পতিতা মহিলা একটি অসহায় পিপাসার্ত কুকুরের প্রতি সদয় হয়ে পানি পান করানোর কারণে আল্লাহ্ পাক খুশী হয়ে তার অপরাধ ক্ষমা করে জান্নাত দান করেছিলেন।

সুতরাং যদি স্রষ্টা এবং সৃষ্টির প্রতি ইহসান করা হয় তাহলে সমাজে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে যেমন প্রশান্তি বিরাজ করবে তেমনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেও ক্ষমা, দয়া এবং ভালবাসা প্রদর্শিত হবে। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ وَاَحْسِنُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ **তোমরা ইহসান করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ইহসানকারীদেরকে ভালবাসেন। (বাকারা-১৯৫)**

তৃতীয় আদেশ ঃ اِيْتَاءِذِي الْقُرْبٰى -আল্লাহ্‌র আদেশের মধ্যে এটি হলো তৃতীয় আদেশ। اِيْتَا শব্দের অর্থ কোন কিছু দেয়া এবং قُرْبٰى শব্দের অর্থ আত্মীয়তা। ذِى الْقُرْبٰى শব্দের অর্থ আত্মীয়-স্বজন। অতএব وَاِيْتَاءِ ذِى الْقُرْبٰى এর অর্থ হলো- 'আত্মীয়-স্বজনকে কিছু দেয়া'। কি দিতে হবে এখানে তা উল্লেখ করা হয়নি। তবে সূরা বনি ইসরাইলের ২৬নং আয়াতে উল্লেখ করে বলা হয়েছে- وَاٰتِ ذَاالْقُرْبٰى حَقَّهٗ "তুমি তোমার আত্মীয়কে তার হক বা প্রাপ্য দান করো।" এই আয়াতে হক বা প্রাপ্য কিংবা অধিকার শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। এখানে কোন প্রাপ্যের ব্যাপারে

নির্ধারিত করে দেয়া হয়নি। অবশ্য সূরা বাকারার ১৯৯ নম্বর আয়াতে নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করে বলা হয়েছে- وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى। এবং (তারাই প্রকৃত ধর্মপরায়ন) যারা আল্লাহ্‌র ভালবাসার খাতিরে আত্মীয়-স্বজনকে ধন-সম্পদ দান করে।

অবশ্য দারসের জন্য উল্লেখিত আয়াতে ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ 'হক' বা প্রাপ্যের কথায় বলা হয়েছে, যেখানে ধন-সম্পদও রয়েছে। যেমন আত্মীয়কে তার হক বা প্রাপ্য দিতে হবে। অর্থাৎ অভাবে পড়লে অর্থ-সম্পদ দিয়ে সাহায্য করা, দৈহিক সেবা করা, অসুস্থ হলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, বিপদে পড়লে শান্তনা দেয়া এবং সহানুভূতি প্রদর্শন করা ইত্যাদি সবই উপরোক্ত হক বা প্রাপ্যের অন্তর্ভুক্ত। ইহসান শব্দের মধ্যে আত্মীয়-স্বজনের প্রাপ্য দেওয়ার কথাও অন্তর্ভুক্ত ছিলো। কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের অধিকারের গুরুত্ব অধিক বুঝানোর জন্যে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে আত্মীয়-স্বজনের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে আবার নিকটাত্মীয়দেরকে বেশী অগ্রাধিকার দিতে হবে। অর্থাৎ আত্মীয়তার দিক থেকে যে যত বেশী নিকটতম তার প্রাপ্য ততো বেশী। উপরোক্ত এই তিনটি আদেশ ছিলো ইতিবাচক। অতঃপর তিনটি নিষিদ্ধ কাজ তথা নেতিবাচক নির্দেশে বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْىِ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তোমাদেরকে অশ্লীলতা, অসৎ কাজ ও সীমালংঘন করতে নিষেধ করেছেন। এই নেতিবাচক অসৎ কাজগুলো ব্যক্তি পর্যায়ে ব্যক্তিকে এবং সামষ্টিক পর্যায়ে সমগ্র সমাজ পরিবেশকে খারাপ করে দেয়।

প্রথম নিষিদ্ধ কাজ ঃ فَحْشَآءِ অর্থাৎ অশ্লীলতা-নির্লজ্জতা। এটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। সব রকমের অশালীন, নোংরা, ঘৃণ্য, কদর্য ও নির্লজ্জ কথা ও কাজ এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যেসব কথা ও কাজকে সবাই মন্দ ও খারাপ মনে করে। সমাজ যেসব কথা ও কাজকে স্বীকৃতি দেয় না। যার মাধ্যমে সমাজে অশ্লীলতা ও বেহায়া বেলাল্লাপনা বৃদ্ধি পায়। যার দ্বারা সমাজ কলুষিত হয়, তাকেই বলা হয় -فَحْشَآءِ বা অশ্লীলতা। যেমন কৃপণতা, ব্যভিচার, উলংগপনা, সমকামিতা, মুহাররাম আত্মীয়কে বিয়ে করা, চুরি-ডাকতি, মদ পান, জুয়া, ভিক্ষাবৃত্তি, গালাগালি করা ও কটু কথা বলা ইত্যাদি। এছাড়া সবার

সামনে বেহায়াপনা ও খারাপ কাজ করা এবং খারাপ কাজকে ছড়িয়ে দেয়াও অশ্লীলতা নির্লজ্জতার অন্তরভুক্ত। যেমন মিথ্যা তহমত, মিথ্যা প্রচারণা, গোপন অপরাধ মানুষের কাছে বলে দেয়া, অশ্লীল কাজে প্ররোচনা দেয় এমন গল্প, নাটক, কবিতা, গান, চলচ্চিত্র, উলংগ চিত্র, মেয়েদের সাজগোজ করে মানুষের সামনে আসা, নারী-পুরুষ প্রকাশ্যে মেলামেশা, নাইট ক্লাবে যাওয়া এবং মঞ্চে মেয়েদের নাচগান করা ও বিভিন্ন অংগভংগীর মাধ্যমে সুন্দরী প্রতিযোগীতা ও মডেল প্রদর্শনী করা ইত্যাদি সবই فَحْشَاءِ বা "অশ্লীলতা নির্লজ্জতার" মধ্যে গণ্য।

দ্বিতীয় নিষিদ্ধ কাজ ঃ اَلْمُنْكَرْ। অর্থাৎ 'অসৎ কাজ'। এর অর্থ হচ্ছে এমন সব অসৎ কথা ও কাজ যা মানুষ সাধারণ ভাবে খারাপ মনে করে, চিরকাল খারাপ বলে আসছে এবং আল্লাহ্‌র বিধানে যেসব কথা এবং কাজ বলতে ও করতে নিষেধ করা হয়েছে। যার মধ্যে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কর্মগত ও চরিত্রগত যাবতীয় গোনাহ্ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

তৃতীয় নিষিদ্ধ কাজ ঃ وَالْبَغْيِ অর্থাৎ "সীমালংঘন" করা। এর মানে হলো নিজের 'হদ' বা সীমা অতিক্রম করা এবং অন্যের অধিকার তা আল্লাহ্‌র হোক অথবা বান্দার হোক তা লংঘন করা ও তার উপর হস্তক্ষেপ করা। তবে এর অর্থ যুলুম ও উৎপীড়নও বোঝানো যায়। بَغْيِ এর অর্থ "সীমালংঘন" বা যুলুম-উৎপীড়ন যাই বুঝানো হোক না কেন এর প্রভাব অন্যান্য লোক পর্যন্ত সংক্রমিত হয়। মাঝে মাঝে এই সীমালংঘন পরস্পরের মধ্যে হানাহানি ও যুদ্ধ পর্যন্ত গড়িয়ে যায় অথবা আরও অধিক বৃদ্ধি হয়ে সারা বিশ্বেও অশান্তি সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

প্রিয় ভায়েরা বোনেরা! আলোচ্য আয়াতে যে ছয়টি ইতিবাচক ও নেতিবাচক নির্দেশ দেয়া হয়েছে, চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এগুলো মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের সাফল্যের অমোঘ প্রতিকার বটে।

পরবর্তী আয়াতে মহান আল্লাহ্ পাক ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি ও কসম সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন ঃ

وَاَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عٰهَدْتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ

بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا –

তোমরা আল্লাহ্র ওয়াদা বা অঙ্গীকার পূরণ করো, যখন তোমরা তাঁর নিকট কোন ওয়াদা করো এবং পাকাপাকি কসম করার পর তা ভংগ করো না, অথচ তোমরা আল্লাহ্কে জামিনদার বানিয়ে নিয়েছ।

এই আয়াতে তিন ধরনের ওয়াদা বা অংগীকারের কথা বলা হয়েছে। যা গুরুত্বের কারণে পৃথক পৃথক ভাবে বর্ণনা করে সেগুলোকে মেনে চলার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

প্রথম ধরনের অংগীকার ঃ মানুষ আল্লাহ্র সাথে যে অংগীকার করেছে। যেমন রুহ জগতে সমগ্র মানব জাতি আল্লাহ্র সাথে এভাবে অংগীকারাবদ্ধ হয়– মহান আল্লাহ্ প্রশ্ন করেন– اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ "আমি কি তোমাদের রব নই" ? প্রতিউত্তরে সমস্ত রুহ একই সাথে قَالُوا بَلٰى তারা বলে হ্যাঁ (অবশ্যই আপনি আমাদের রব)। তাছাড়া দুনিয়াতেও কালেমা পড়ে মুসলিম হওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্র সাথে অংগীকারাবদ্ধ হওয়া। বাইয়াতে আকাবা এবং হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় রাসূলের মাধ্যমে আল্লাহ্র নামে বাইয়াত গ্রহণ বা নিজের জান-মাল ত্যাগ করার অংগীকারে আবদ্ধ হওয়া। সূরা ফাতাহ্-য় মহান আল্লাহ্ বলেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ ط يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا

(হে নবী!) যারা আপনার (হাতে হাত রেখে) শপথ বা অংগীকার করে, তারা তো আল্লাহ্র কাছেই অংগীকার করে। আল্লাহ্র হাত তাদের হাতের উপর ছিলো। অতএব, যে শপথ ভংগ করে, অবশ্যই সে তা নিজের ক্ষতির জন্যই করে এবং যে আল্লাহ্র সাথে কৃত অংগীকার পূর্ণ করে, অতিসত্তর তাকে আল্লাহ্ মহা পুরস্কার দান করবেন। (সূরা ফাতাহ্-১০)।

অংগীকারের মধ্যে এ ধরনের অংগীকারের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী।

দ্বিতীয় ধরনের অংগীকার ঃ একজন বা এক দল মানুষ অন্য একজন বা একদল মানুষের সাথে যে অংগকিার করে। এই অংগীকার করার সময় আবার আল্লাহ্র কসম খায়। অথবা নিজের অংগীকারকে দৃঢ় করার জন্য কোন না কোন ভাবে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে। যেমন– একপক্ষ থেকে অপর পক্ষ একজন বা এক দলের সাথে অংগীকারাবদ্ধ হওয়া। এই ওয়াদা বা অংগীকারের সাথে আবার আল্লাহ্র কসমও সংযুক্ত আছে। এসব অংগীকার দ্বীনি কাজ তথা ইসলামী আন্দোলনের জন্য হতে পারে আবার মানুষের বৈষয়িক কাজের জন্যও হতে পারে। এই অংগীকার বা চুক্তির গুরুত্ব দ্বিতীয় পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ।

তৃতীয় ধরনের অংগীকার ঃ আল্লাহ্র নাম না নিয়ে যে অংগীকার করা হয়। যেমন বৈষয়িক কোন কাজ– ব্যবসা-বাণিজ্য, লেন-দেন, ইত্যাদি ক্ষেত্রে। তাছাড়া এক দেশ অন্য দেশের সাথে ভ্রাতৃসূলভ ও বন্ধুসুলভ সহঅবস্থান এবং উন্নয়নের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়ে থাকে। এর মধ্যে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি হতে পারে, আবার বন্দি বিনিময় চুক্তিও হতে পারে। কিম্বা ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়েও চুক্তি হতে পারে। এই চুক্তি বা অংগীকারের গুরুত্ব উপরের দু'প্রকার অংগীকারের গুরুত্বের পরবর্তী পর্যায়ে। তবে উল্লেখিত সব কয়টি অংগীকার বা চুক্তিই পালন করতে হবে। এর মধ্য থেকে কোনটিই ভেঙ্গে ফেলা বৈধ হবে না। তবে কোন দেশ যদি নিজেই আগে তাদের চুক্তি ভঙ্গ করে তা হলে নিজের দেশ রক্ষার জন্য পূর্বের অবস্থানে ফিরে যেতে পারবে। যেমন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মক্কার কাফের ও মদীনার ইহুদীদের সাথে কৃত চুক্তি তাদের পক্ষ থেকে ভঙ্গের পরেই তিনি শক্ত অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন।

অতঃপর আয়াতের শেষাংশে মহান আল্লাহ্ বলেন– إِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ **নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের সমস্ত কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগত**। অর্থাৎ আল্লাহ্কে জামিনদার বানিয়ে তোমরা যেসব ওয়াদা বা অংগীকার অথবা চুক্তি করছো এবং অংগীকার করার পরে তোমাদের অংগীকার অনুযায়ী সমস্ত কার্যকলাপ এমনকি তিনি তোমাদের নিয়তের বিষয়টিও অবগত আছেন।

মহান আল্লাহ্ পরবর্তী আয়াতে মানুষকে সহজে অংগীকার বুঝানোর জন্য উদাহরণ উল্লেখ করে বলেন ঃ

وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا

তোমাদের অবস্থা যেন সেই মহিলাটির মতো না হয়ে যায়, যে নিজে পরিশ্রম করে (চোরখীতে) সূতা কাটে এবং তারপর নিজেই তা ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলে।

অর্থাৎ একজন মহিলা যেমন নিজে কঠোর পরিশ্রম করে চোরখীতে সূতা কাটে। অতঃপর নিজেই সেই চোরখীতে কাটা সূতাগুলোকে নিজ হাতে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলে, যার ফলে তার পরিশ্রম পণ্ড হয়ে যায় এবং নিজেই আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। অনুরূপ ভাবে তোমরা আল্লাহ্, তাঁর রাসূল বা তোমাদের আমীর বা নেতার সাথে ওয়াদাবদ্ধ বা অংগীকারাবদ্ধ হচ্ছো কল্যাণের জন্য, আবার নিজেরাই সেই দৃঢ় অঙ্গীকারকে চোরখীর সূতাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করার মতো ভঙ্গ করে নিজেরাই বড় ক্ষতির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হচ্ছো। সুতরাং তোমাদের এই কৃত দৃঢ় ওয়াদা বা অংগীকার নিজেরাই ভঙ্গ করে দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় জগতকে ধ্বংস করে দিচ্ছো।

অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা পরবর্তী আয়াতে বলেন-

تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ ط إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ط

তোমরা নিজেদের কসমগুলোকে পারস্পরিক ব্যাপারে ধোকা ও প্রতারণার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতেছো এই জন্য যে, একদল অন্যদল অপেক্ষা বেশী ফায়দা লাভ করতে পারবে। অথচ আল্লাহ্ এই ওয়াদা-প্রতিশ্রুতির দ্বারা তো তোমাদেরকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে চান।

এই আয়াতে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ধরনের অংগীকার ভঙ্গের নিন্দা করা হয়েছে এবং মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, কোন দল, দেশ বা জাতির সাথে তোমাদের চুক্তি হয়ে গেলে পার্থিব সাময়িক স্বার্থ ও উপকারের জন্যে সে চুক্তি ভঙ্গ করবে না। কেননা, এ ধরনের চুক্তি ভঙ্গ দুনিয়ায় বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময় দেখা যায় যে, দল বা পার্টি অথবা দেশ বা জাতির সাথে চুক্তি হয়েছে, যারা দুর্বল ও সংখ্যায় কম কিম্বা আর্থিক দিক দিয়ে নিঃস্ব, তাদের

বিপরীতে অপর দল জাতি বা দেশ শক্তিশালী বা ধনী অথবা প্রযুক্তিগত দিক থেকে উন্নত, এমতাবস্থায় শুধু এসব শক্তিশালী ও ধণাঢ্য দল বা দেশের প্রথম পক্ষের সাথে চুক্তি ভঙ্গ বা বাতিল করে দ্বিতীয় পক্ষের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়াকে এই আয়াতে অন্যায় এবং ধুর্তামি বলা হয়েছে। এটা যদিও দল, দেশ বা জাতির স্বার্থের কথা ভেবে করা হোক না কেন। আল্লাহ্ তাআলা এ ধরনের ঠগবাজী ও ধুর্তমি বা ডিপ্লোমেসীকে অপছন্দ করেন এবং এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, প্রতিটি চুক্তি বা অংগীকার আসলে অংগীকারকারী ব্যক্তি, দল এবং জাতি ও রাষ্ট্রের চরিত্র ও বিশ্বস্ততার জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। আর যারা পরীক্ষায় ব্যর্থ হবে তারা আল্লাহ্র আদালতে জবাবদিহির হাত থেকে কোন ভাবেই বাঁচতে পারবে না। অতঃপর আয়াতের শেষাংশে মহান আল্লাহ্ তায়ালা শেষ বিচারের দিন সমস্ত রহস্য উন্মোচন করে দেয়ার হুমকি দিয়ে বলেন-

وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ-

আর কিয়ামতের দিন অবশ্যই তিনি তোমাদের মতবিরোধের রহস্য উন্মোচন করে দেবেন।

অর্থাৎ যেসব মতবিরোধের কারণে তোমাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত চলছে সেগুলোর ব্যাপারে কে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যাবাদী তার ফায়সালা তো হবে। কিন্তু যে কোন অবস্থাতেই কেউ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও এবং তার প্রতিপক্ষ পুরোপুরি পথভ্রষ্ট ও মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকলেও তার জন্য কখনো কোন ভাবেই তাকে আলাদা করে অংগীকার ভঙ্গ, মিথ্যাচারিতা ও প্রতারণার আশ্রয় নেয়া যাবে না। যদি কেউ এ পথ অবলম্বন করে তাহলে কেয়ামতের দিন আল্লাহ্র পরীক্ষায় সে অকৃতকার্য প্রমাণিত হবে। কারণ সততা, বিশ্বাস পরায়ণতা ও ন্যায়-নিষ্ঠতা কেবলমাত্র চরিত্র, আদর্শ ও উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নহে বরং বাস্তব প্রয়োগ, পদ্ধতি ও উপায় উপকরণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, কিছু কিছু ধর্মীয় গোষ্ঠী প্রায়ই এ ধরনের অহমিকা পোষণ করে থাকে যে, যেহেতু তারা আল্লাহ্র পক্ষের লোক এবং তাদের প্রতিপক্ষ আল্লাহ্ বিরোধী। তাই যে কোন ভাবে বা পদ্ধতিতেই হোক না কেন প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার অধিকার তাদের রয়েছে। তাই তারা মনে করে আল্লাহ্র অবাধ্য লোক বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করার সময় সততা ও বিশ্বাস্ততার পথ অবলম্বন করা এবং অংগীকার চুক্তি

পালনের কোন প্রয়োজন পড়ে না, এটা তাদের অধিকার। আরবের ইহুদীরাও ঠিক একথাই বলতো। তারা বলাতো لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْاُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ **অর্থাৎ আরবের মুশরিকদের ব্যাপারে আমাদের হাত পা কোন বিধি-নিষেধের শৃংখলে বাঁধা নেই।** তাদের সাথে সব ধরনের বিশ্বাস ঘাতকতা করা যেতে পারে। যে ধরনের কৌশল অবলম্বন করে আল্লাহ্র প্রিয় পাত্রদের স্বার্থ উদ্ধার এবং কাফেরদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করা যায়, তা অবলম্বন করা সম্পূর্ণ বৈধ। এজন্য তাদের কোন জিজ্ঞাসাবাদ ও জবাবদিহির সামনা-সামনি হতে হবে না বলে তারা মনে করতো। অতঃপর মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً-

যদি তোমাদের মধ্যে কোন মতবিরোধ না হোক এটাই আল্লাহ্র ইচ্ছা হতো তাহলে তিনি তোমাদের সবাইকে একই উম্মতে পরিণত করে দিতেন।

এই আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা উপরোক্ত আয়াতে উল্লেখিত বক্তব্যের একটু বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন- যদি কেউ নিজেকে আল্লাহ্র দলের লোক মনে করে ভাল-মন্দ এবং সততা-অসততা উভয় পদ্ধতিতেই নিজের ধর্মের প্রসার ও অন্যের ধর্মকে ধ্বংস করার হীন চেষ্টা চালায়, তাহলে তার এ প্রচেষ্টা হবে সরাসরি আল্লাহ্র ইচ্ছা বিরোধী। কারণ মানুষের ধর্মীয় মতবিরোধের ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে যদি সমস্ত মানুষকে ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক একটি ধর্মের অনুসারী বানানোই আল্লাহ্র উদ্দেশ্য হতো তাহলে এজন্য আল্লাহ্ তাআলা তার নিজের তথাকথিত পক্ষের লোকদেরকে প্রতিপক্ষের উপর লেলিয়ে দেয়ার এবং তাদের অস্ত্রের সাহায্য নেওয়ার কোন প্রয়োজনই ছিল না। এ কাজ তো তিনি নিজেই তার ক্ষমতার দ্বারা করতে পারতেন। তিনি সবাইকে মুমিন ও অনুগত বান্দা হিসেবে এক জাতি করে সৃষ্টি করতেন এবং তাদের থেকে কুফরী ও গোনাহ্ করার ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতেন। এরপর ঈমান ও আনুগত্যের পথ থেকে একচুল পরিমাণ সরে আসার ক্ষমতা আর কারো থাকতো না।

অতঃপর আল্লাহ্ তাঁর ক্ষমতা সম্পর্কে বলেন ঃ

وَلٰكِنْ يُّضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ **আর তিনি যাকে চান বিপথগামী করেন এবং যাকে চান সঠিক পথ দেখান।**

অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টি করার পর ভাল-মন্দ

বিচার করার ক্ষমতাও তাদেরকে দান করেছেন। সাথে সাথে মানুষকে ভাল-মন্দ গ্রহণ ও বর্জন করার স্বাধীনতাও দিয়েছেন। তাই দুনিয়াতে মানুষের পথ বিভিন্ন। কেউ গোমরাহী বা খারাপ পথে যেতে চাইলে তার জন্য সমস্ত উপকরণও তৈরী করে দিয়েছেন। সুতরাং যদি কেউ গোমরাহীর পথে যেতে চায় আল্লাহ্ তাকে বাধা দেন না বরং তার জন্য সুযোগ করে দেন। আবার যদি কেউ সঠিক পথ পেতে চায়, তারও আল্লাহ্ ব্যবস্থা করে রেখেছেন। আল্লাহ্ তাকে সঠিক পথ অবলম্বন করার সুযোগ করে দেন। এ জন্যই আল্লাহ্ পাক একথা বলেছেন যে, যাকে চান অর্থাৎ যে চায়, আল্লাহ্ তাকে পথভ্রষ্ট বা বিপথগামী করে দেন এবং যাকে চান অর্থাৎ যে চায়, আল্লাহ্ তাকে হেদায়াত বা সুপথগামী করেন। এক্ষেত্রে অনেকে আল্লাহ্কে দায়ী করে থাকে এটা তাদের অজ্ঞতা। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ এই জন্য দায়ী নন। কেননা, আল্লাহ্ মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন, আবার স্বাধীনতাও দিয়েছেন। অতএব দুনিয়ার এই স্বাধীন, জ্ঞান পাপী, অকৃতজ্ঞ মানুষেরাই দায়ী।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক আয়াতের শেষাংশে বলেন ঃ

وَلَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ **আর অবশ্যই তোমরা তোমাদের সমস্ত কার্য-কলাপ সম্পর্কে (কিয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসিত হবে।**

অর্থাৎ মানুষ যে যাই করুক না কেন, সকলকেই কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ্র দরবারে হাজির হয়ে সব বিষয়ে এবং প্রতিটি কথা ও কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হতে হবে। কেহই জবাবদিহিতার হাত থেকে রেহায় পাবে না।

পরবর্তী আয়াতে মহান আল্লাহ্ পাক আরও একটি নির্দেশ দিয়ে বলেন ঃ

وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اَيْمَانَكُمْ دَخَلًاۢ بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌۢ بَعْدَ ثُبُوْتِهَا-

(হে মুসলমানেরা!) তোমরা নিজেদের কসমগুলোকে পরস্পরের মধ্যে একে অপরকে ধোকা দেবার বাহানা বা মাধ্যম বানিয়ে নিও না। তা হলে দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পা ফসকে যাবে।

এই আয়াতে আরও একটি বড় ধরনের শাস্তি ও অপরাধ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অপরাধটি হলো এই যে, যখন কেউ কসম বা চুক্তি করে এবং কসমের সময় তা ভঙ্গ করার ইচ্ছা রাখে এবং প্রতিপক্ষকে ধোকা দেবার

জন্য কসম খায, তাহলে এটা সাধারণ কসম ভঙ্গ করার চাইতেও বেশী বিপদজনক এবং অপরাধমূলক। এদেরকে প্রতারক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এর পরিণতি এতো ভয়াবহ যে ঈমান থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। فَتَزِلَّ قَدَمٌۢ بَعْدَ ثُبُوْتِهَا **অর্থাৎ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পা ফসকে যাবে** বাক্যের উদ্দেশ্যই তাই।

অতঃপর মহান আল্লাহ্ আয়াতের শেষাংশে বলেন ঃ

وَتَذُوْقُوا السُّوْٓءَ بِمَا صَدَدْتُّمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ-

আর তোমরা খারাপ পরিণতি দেখতে পাবে এই কারণে যে, তোমরা আমার পথ থেকে ফিরিয়ে রেখেছ এবং তোমাদের কঠোর শাস্তি হবে।

অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি একবার ইসলামের সত্যতা মেনে নিয়ে ইসলামে প্রবেশের পর তোমাদের অসৎ আচরণের কারণে আল্লাহ্র দ্বীন থেকে সরে যায় এবং মুমিনদের দলভুক্ত হতে শুধুমাত্র এই কারণে দূরে থাকে যে, যাদের সাথে তার উঠা-বসা হয়েছে তাদের আচার-আচরণ ও লেন-দেন কাফেরদের চেয়ে ভালো কিছু দেখতে পায়নি। আর মুমিনদের এই আচার রণের বৈপরিত্ত থাকার কারণে তাদের কঠিন শাস্তি দেয়া হবে।

وَلَا تَشْتَرُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًاؕ اِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

আর তোমরা আল্লাহ্র অঙ্গীকারকে সামান্য লাভের বিনিময়ে বিক্রয় করে দিও না। নিশ্চয় আল্লাহ্র কাছে যা আছে তা তোমাদের জন্য অতি উত্তম, যদি তোমরা তা জান।

এখানে অঙ্গীকার বলতে আল্লাহ্ বলেন, তোমরা যে অঙ্গীকার আমার সাথে বা আমার দ্বীনের প্রতিনিধি হিসেবে করেছো।

আয়াতে "সামান্য লাভের বিনিময়ে" অর্থ এই নয় যে, বেশী লাভ বা বড় স্বার্থের বিনিময়ে তা বিক্রি করা যাবে। আর "সামান্য লাভ বা মূল্য" বলে দুনিয়ার লাভ বা মুনাফাকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং দুনিয়ার যে কোন লাভ বা স্বার্থ আল্লাহ্র সাথে কৃত অঙ্গীকারের তুলনায় সামান্যই মূল্য। আল্লাহ্র সাথে

অঙ্গীকার রক্ষা করলে পরকালে যে মহা এবং চিরস্থায়ী মূল্য পাওয়া যাবে তা দুনিয়ার এই সামান্য এবং ক্ষণস্থায়ী মূল্য ও স্বার্থের তুলনায় অনেক অনেকগুণ বেশী। অতএব যে ব্যক্তি বা যারা আল্লাহ্র সাথে দুনিয়ার এই সামান্য এবং ক্ষণস্থায়ী মূল্যের বিনিময়ে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, তারা বড় লোকসানের কারবার করে। সুতরাং কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি অনন্তকালের স্থায়ী এবং উৎকৃষ্ট নিয়ামত ও ধন-সম্পদকে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার এই অস্থায়ী ও সামান্য বস্তুর বিনিময়ে বিক্রি করতে পারে না। এটা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়। অতঃপর মহান আল্লাহ্ পরবর্তী আয়াতে বলেন ঃ

مَا عِنْدَ كُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ ط

তোমাদের কাছে যা কিছু আছে, তা সবই ধ্বংস হয়ে যাবে। আর আল্লাহ্র কাছে যা আছে, তাই চিরদিন থাকবে। আয়াতে "যা কিছু তোমাদের কাছে আছে" বলে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী মুনাফাকে বুঝানো হয়েছে। আর এসব মুনাফা বা লাভ স্থায়ী নয়, ধ্বংসশীল। পক্ষান্তরে 'আল্লাহ্র কাছে যা বাকী আছে" এই বলে পরকালের স্থায়ী নিয়ামত এবং আযাব উভয়ই বুঝানো হয়েছে। পরকালের নিয়ামত চিরস্থায়ী এবং আযাবও অনন্তকালের। তাই যারা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী লাভ বা স্বার্থের জন্য অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে তাদেরকে পরকালে অনন্তকালের আযাব ভোগ করতে হবে। আবার যারা দুনিয়ার এই সামান্য এবং ক্ষণস্থায়ী লাভ ও স্বার্থকে উপেক্ষা করে আল্লাহ্র সাথে অঙ্গীকার বা চুক্তিকে রক্ষা করবে তাদেরকে পরকালে চিরস্থায়ী নিয়ামতে ভরা জান্নাত দান করা হবে।

مَا عِنْدَ كُمْ **তোমাদের কাছে যা আছে** বাক্যটির অর্থ ব্যাপক অর্থ বোধক।

এর দ্বারা মানুষের স্বাভাবিক খেয়ালী শুধু ধন-সম্পদই নয়। বরং এতে দুনিয়ার আনন্দ-নিরানন্দ, সুখ-দুঃখ, সুস্থতা-অসুস্থতা, আরাম-কষ্ট, লাভ-লোকসান, বন্ধুত্ব-শত্রুতা ইত্যাদি রয়েছে। এগুলো সবই ক্ষণস্থায়ী এবং ধ্বংসশীল।

আয়াতের শেষাংশে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْٓا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-

আমি অবশ্যই ধৈর্য ধারনকারীদের তাদের উত্তম-কাজের বিনিময়ে আনুপাতিক হারে প্রতিফল দান করবো।

অত্র আয়াতে ধৈর্যের সাথে অঙ্গীকার রক্ষা এবং সৎ আমলকারীদের প্রতিদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সবর অবলম্বনকারী এমন সব লোক যারা দুনিয়ার সকল প্রকার লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা ও স্বার্থের মোকাবেলায় সত্য ও সততার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ্‌র সাথে অঙ্গীকার রক্ষা করতে এবং সত্য ও ন্যায়ের পথে চলতে গেলে যেসব বাধা ও ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়, তা তারা সবই বরদাশত করে নেয়। দুনিয়ার লাভ ও স্বার্থকে তারা দূরে নিক্ষেপ করে। পরকালের সফলতা লাভের জন্য দুনিয়ার জীবনের স্বার্থকে উপেক্ষা করে ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করতে থাকে। আর তাদের এই ধৈর্য, সততা ও নেক আমলের জন্যই তাদেরকে আনুপাতিক হারে আখেরাতে প্রতিদান দেয়া হবে।

অতঃপর মহান আল্লাহ্ সৎকর্মী পুরুষ-নারী সকলের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের মর্যাদা ও প্রতিদানের কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-

যে ব্যক্তিই নেক আমল করবে – সে পুরুষ হোক কিম্বা নারী-যদি সে মুমিন হয়, তবে তাকে দুনিয়ায় পবিত্র জীবন-যাপন করাব। আর (পরকালে) এ ধরনের ব্যক্তিদের তাদের আমল অনুপাতে প্রতিফল দান করবো।

দারসের জন্য তেলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর সর্বশেষ এই আয়াতে মুমিন সৎ কর্মশীল পুরুষ এবং নারী-উভয়ের সৎ কাজের উত্তম প্রতিদানের কথা বলা হয়েছে। এসব মুমিন–মুমিনা পুরুষ এবং নারীকে তাদের সৎ কাজের আনুপাতিক হারে দু'টি প্রতিদানের কথা বলা হয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো দুনিয়ায় এবং অপরটি হলো আখেরাতে।

(i) দুনিয়ার জীবনে প্রতিদান ঃ حَيٰوةً طَيِّبَةً **অর্থাৎ পবিত্র জীবন যাপন।"** অধিকাংশ তাফসীরকারকদের মতে "হায়াতে তাইয়্যেবা বলে দুনিয়ার পবিত্র ও আনন্দময় জীবন যাপনকে বোঝানো হয়েছে। অবশ্য কেউ কেউ 'পারলৌকিক জীবন' বলেছেন।

এই আয়াতে মুমিন ও কাফের উভয় দলের এমনসব সংক্রীর্ণচেতা ও অধৈর্য

লোকদের ভুল ধরে দেয়া হয়েছে, যারা মনে করে, দুনিয়ার জীবনে যারা সৎ, ন্যায় পরায়ন, বিশ্বস্ত ও পরিচ্ছন্ন জীবন-যাপন করে তারা পারলৌকিক সফলতা লাভ করলেও দুনিয়ার জীবন তাদের বিফল হয়ে যায়, ধ্বংস হয়ে যায়। প্রতি উত্তরে মহান আল্লাহ্ বলেন, তোমাদের এই ধারণা ভুল। তাদের এই সততা ও ন্যায় পরায়নতা এবং সৎ আমলের জন্য আল্লাহ্ তাদেরকে দুনিয়াতে দু'টি প্রতিদান দেন। যেমন-

ক) মর্যাদা বা সম্মান, খ) প্রশান্তি। এ দু'টি হলো ধৈর্যশীল মুমিনদের পবিত্র জীবন যাপন। যদিও কোন মুমিন ব্যক্তি কোন সময় পার্থিব অভাব-অনটন কিম্বা কষ্টে পড়ে তবে তাকে দু'টি বিষয় উদ্বিগ্ন হতে দেয় না। ক) অল্পে তুষ্টি এবং অনাড়ম্বর জীবন-যাপনের অভ্যাস, যা দরিদ্রতার মাঝেও কেটে যায়। খ) তার এ বিশ্বাস যে, এ অভাব-অনটন ও অসুস্থতার বিনিময়ে পরকালে বড় মর্যাদা ও চিরস্থায়ী নিয়ামত পাওয়া যাবে। কিন্তু কাফের ও পাপাচারীদের অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সে অভাব-অনটন ও অসুখ-বিসুখের সম্মুখীন হলে তার জন্য শান্তনার কোন ব্যবস্থা নেই, ফলে সে কান্ড-জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। মানুসিক অশান্তিতে ছটফট করে। কান্ড-জ্ঞান হারিয়ে এক পর্যায়ে সে আত্মহত্যাও করে বসে। আর যদি সে সচ্ছল জীবনের অধিকারী হয়, তবে আরো বেশী পাবার লোভে তাকে শান্তিতে থাকতে দেয় না। সে কোটিপতি হয়ে গেলেও সে ধনকুপ হওয়ার চিন্তায় জীবনকে বিড়ম্বনাময় করে তোলে।

(ii) আখেরাতের জীবনে প্রতিদান ঃ

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

আর (পরকালে) তাদের (দুনিয়ার) আমল অনুপাতে প্রতিফল দান করবো।

সৎ আমলকারী মুমিন-মুমিনাদের আখেরাতের যে প্রতিদান তা এখানে বলা হয়েছে। দুনিয়ার জীবনে মানুষ ভাল আমলই হোক আর খারাপ আমলই হোক একই রকম করে থাকে না, কম বেশী হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তো ন্যায় বিচারক। সুতরাং মানুষের আমলের ভিন্নতার জন্য আখেরাতেও তিনি শাস্তির জন্য জাহান্নামের স্তর বা শ্রেণী বিন্যাস করে রেখেছেন। আবার পুরস্কার বা প্রতিদানের জন্যও জান্নাতের স্তর বা শ্রেণী বিন্যাস করে রেখেছেন। তাই আয়াতাংশে বলা হয়েছে সৎ আমলকারী, বিশ্বস্ত ও ন্যায় পরায়ন পুরুষ-নারীর আখেরাতের যে প্রতিদান বা পুরস্কার তা তার দুনিয়ার জীবনের সৎ আমলের অনুপাতেই দান করবেন। যে যেই স্তর বা শ্রেণী উপযোগী আ'মল করবে

আল্লাহ্ তাকে সেই শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত মর্যাদা এবং জান্নাত দান করবেন। নেককারদের জন্য পারলৌকিক জীবনের সর্বউত্তম মর্যাদা ও প্রতিদান হলো আল্লাহ্র দিদার বা স্বাক্ষাৎ লাভ। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে সেই ধরনের আমল করার তাওফীক দান করুন। আমিন।

শিক্ষা ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনাদের সামনে 'সূরা নাহল' থেকে যে দারস পেশ করলাম, সেই দারস থেকে আমাদের জন্য যেসব শিক্ষনীয় রয়েছে তাহলো ঃ

✪ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় এবং বিচার ব্যবস্থায় ও নেতৃত্ব কর্তৃত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে আদাল বা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যার যা হক বা অধিকার নিরপেক্ষভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে।

✪ স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রতি ইহ্সান করতে হবে। স্রষ্টা তথা আল্লাহ্ তাআলার এবাদত বন্দেগী আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে পালনের মাধ্যমে ইহ্সান করতে হবে। আর সৃষ্টি তথা মানুষ সহ অন্যান্য যাবতীয় সৃষ্টি জীবের প্রতি দয়া ও সহানুভূতি প্রদর্শনের মাধ্যমে ইহ্সান করতে হবে।

✪ আত্মীয়-স্বজনদের হক বা অধিকার আদায় করতে হবে। বিশেষ করে মৌলিক অধিকার বা চাহিদা যেমন, খাদ্য-খাবার, পোষাক-আসাক, চিকিৎসা, সেবা-শুশ্রুসা, থাকার ঠাঁই এবং জ্ঞান অর্জনের ব্যবস্থা করতে হবে। দূরত্ব অনুযায়ী আত্মীয়-স্বজনদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অধিকার আদায় করতে হবে এবং যার যা সম্মান বা মর্যাদা তা দিতে হবে।

✪ সকল সময় ও সকল অবস্থায় অশ্লীল কথা, কাজ, চিন্তা ও আচরণ থেকে দূরে থাকতে হবে এবং ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ মনে করে লজ্জা অবলম্বন করতে হবে।

✪ সকল প্রকার 'মুনকার' বা আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূলের নিষিদ্ধ ও অপছন্দনীয় কাজ হতে দূরে থাকতে হবে। কেননা, সকল প্রকার 'মুনকার' কাজই হলো পাপাচার বা গোনাহ্র কাজ।

✪ অহঙ্কার-আত্মম্ভরিতা, যুলুম-নির্যাতন ও বাড়াবাড়ি থেকে দূরে থাকতে হবে। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা আয়াতে এগুলো করতে নিষেধ করেছেন।

✪ সব ধরনের শপথ বা অঙ্গীকার, ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি, বাইয়াত বা চুক্তি এবং আল্লাহ্র নামে কসম অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। তা আল্লাহ্র সাথেই হোক বা আল্লাহ্র দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকারী সংগঠনের কাছে হোক অথবা বৈষয়িক

কোন কাজ-কাম বা ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য পরস্পর-পরস্পরের মধ্যে হোক, কিম্বা রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় স্বার্থেই হোক না কেন।

✪ নিজের পক্ষ থেকে আগে কোন চুক্তি বা শপথ ভঙ্গ করা যাবে না। তবে প্রতিপক্ষ ভঙ্গ করলে নিজের বা দেশ ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য আত্মরক্ষা করা যাবে।

✪ বেশী লাভ বা স্বার্থ উদ্ধারের জন্য পরস্পরকে ধোকা দেবার উদ্দেশ্যে চুক্তিবদ্ধ বা অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া যাবে না। কেননা, এটা এক প্রকার বড় ধরনের মিথ্যাচারিতা এবং প্রতারণা।

✪ সকল প্রকার চুক্তি, বাইয়াত বা অঙ্গীকার এবং কসম আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এক প্রকারের বড় ধরনের পরীক্ষা। তিনি পরীক্ষা করে দেখতে চান কারা কারা সকল প্রকার বাধা-বিপত্তি, লোভ-লালসা এবং স্বার্থকে উপেক্ষা করে তাদের কসম, চুক্তি এবং বাইয়াতের উপর টিকে থাকতে পারে।

✪ আল্লাহ্ তাআলা পরস্পরের মধ্যে চুক্তি বা অঙ্গীকার সম্পর্কে যতো প্রকারের বাহানা বা মতানৈক্য আছে তা কিয়ামতের দিন প্রকাশ করে দেবেন।

✪ দুনিয়াতে মানুষের মধ্যে যেসব মতানৈক্য রয়েছে তা দূর করার দায়িত্ব মানুষের। সঠিক বিষয় উৎঘাটন করে সঠিক পথে চলার জন্যই তো আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে জ্ঞান-বুদ্ধি ও হেকমত দিয়ে তৈরী করেছেন।

✪ সঠিক পথে কিংবা গোমরাহীর পথে চলা না চলার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাআলার কোন ভূমিকা নেই। বরং জ্ঞান-বুদ্ধিতে পরিপূর্ণ স্বাধীন মানুষেরই প্রকৃত ভূমিকা রয়েছে। তবে আল্লাহ্‌র ভূমিকা রয়েছে এটাই যে, যে যা চায় বা যে যেই পথে চলতে চায় তাকে তিনি বাধা না দিয়ে সহযোগীতা করেন মাত্র।

✪ প্রতিটি মানুষের আত্মউপলব্ধি থাকতে হবে যে, আমরা যে যাই করিনা কেন, অথবা আমাদের ভূমিকা যাই হোক না কেন, কিয়ামতের দিন অবশ্যই আল্লাহ্‌র দরবারে হাজির হয়ে প্রশ্নের সম্মুখীন হতেই হবে।

✪ নিজেদের মধ্যে কলহ-দ্বন্দ্ব সৃষ্টির জন্য কসম করা যাবে না। যদি এটা করা হয় তাহলে এটা হবে তার জন্য মারাত্মক ক্ষতি এবং ধ্বংসের কারণ।

✪ নিজে যেমন আল্লাহ্‌র পথে চলবে তেমনি অন্যকেও আল্লাহ্‌র পথে চলতে সাহায্য করবে। কোন প্রকার বাধা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাবে না। কেননা, এর পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ।

✪ দুনিয়ার সামান্য লাভে কিংবা ক্ষুদ্র স্বার্থে আল্লাহ্‌র সাথে কৃত ওয়াদা এবং আল্লাহ্‌র নামে করা অঙ্গীকার কোন ভাবেই বিক্রয় বা ভঙ্গ করা যাবে না। কেননা, অঙ্গীকার বা ওয়াদা রক্ষার বিনিময়ে আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে কিংবা যা পাওয়া যাবে তা দুনিয়ার তুলনায় অতি উত্তম এবং অতীব মূল্যবান।

✪ দুনিয়াতে মানুষের যে লাভ-লোকসান তা ক্ষণস্থায়ী এবং ধ্বংসশীল। কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে পরকালে যে পুরস্কার এবং আযাব আছে তা চিরস্থায়ী, শেষ হবার নয় এবং কোন দিনই ধ্বংস হবে না।

✪ দুনিয়ার কৃত আমল বা কাজ– তা সৎ কাজই হোক আর অসৎ কাজই হোক কিয়ামতের দিন তাকে আনুপাতিক হারে পুরস্কার এবং আযাব দেয়া হবে। তার প্রতি কোন ভাবেই বেইনসাফী করা হবে না।

✪ সৎ আমলকারী নেক্কার মুমিন পুরুষ-নারী সকলকেই আল্লাহ্‌আআলা উভয় জগতে প্রতিদান দেবেন। দুনিয়াতে পুরস্কার বা প্রতিদান হিসেবে তিনি "হায়াতে তাইয়্যেবা' বা পবিত্র জীবন তথা সম্মান এবং শান্তিময় জীবন দান করবেন। আর আখেরাতে তিনি সর্বউত্তম জান্নাত দান করবেন এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও দিদার বা স্বাক্ষাৎ লাভ করাবেন।

আহবান ঃ প্রিয় ভায়েরা/ বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা নহলের ৯০-৯৭ পর্যন্ত আয়াতগুলোর দারস পেশ করতে যেয়ে যেসব তথ্য, তত্ত্ব, ব্যাখ্যা এবং শিক্ষা পেশ করলাম এতে যদি আমার পক্ষ থেকে কোন ভুল-ভ্রান্তি এবং বাড়াবাড়ি হয়ে যায় তার জন্য মহান আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর এই দারস থেকে আমরা যেসব গুরুত্বপূর্ণ ইহলৌকিক ও পারলে-ৗকিক কল্যাণকামী শিক্ষা লাভ করলাম তা যেন বাস্তব জীবনে আমল করে আ-খেরাতের চিরস্থায়ী কল্যাণ লাভ করতে পারি সেই তাওফিক কামনা করে আমি আমার দারস শেষ করছি। 'মাআস সালাম'।

তিন

অতীতের নবীদের দ্বীনের ন্যায় একই দ্বীনের দাওয়াত দান এবং প্রতিষ্ঠার নির্দেশ

(সূরা শুরা-১৩-১৬)

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْ
حَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى
وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ط كَبُرَ
عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ط اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ
اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ- وَمَا
تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْ م بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا ۢ بَيْنَهُمْ ط
وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى
لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ ط وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ مِنْ م بَعْدِ
هِمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ- فَلِذٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ
كَمَآ اُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ
اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ط اَللّٰهُ
رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ط لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ط لَا حُجَّةَ
بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ط اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَاِلَيْهِ

الْمَصِيْرُ- وَالَّذِيْنَ يُحَاجُّوْنَ فِى اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا اسْتُجِيْبَ لَهٗ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ-

সরল অনুবাদ ঃ ইরশাদ হচ্ছে- (১৩) তিনি (আল্লাহ্) তোমাদের জন্যে দ্বীনের সেই বিধি-বিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যার নির্দেশ তিনি নূহকে দিয়েছিলেন। আর যা এখন তোমার কাছে (হে মুহাম্মদ) অহীর মাধ্যমে পাঠিয়েছি এবং যার আদেশ ইতিপূর্বে আমি দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মুসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করো এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না। এ কথা-ই এই মুশরিকদের পক্ষে বড় কঠিন ও দুঃসহ, যার দিকে (হে মুহাম্মাদ) তুমি এই লোকদেরকে দাওয়াত দিচ্ছো। আল্লাহ্ যাকে চান আপন করে নেন এবং যে তাঁর দিকে রুজু বা অভিমুখী হতে চায় তিনি তাকে পথ দেখিয়ে থাকেন। (১৪) মানুষের মধ্যে যে বিরোধ-বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে তা তাদের কাছে ইলম বা জ্ঞান এসে পৌঁছার পর হয়েছে। আর তা হয়েছে এই কারণে যে, তারা পরস্পর একে অপরের উপর অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করতে চেয়েছিলো। তোমার রব আগে থেকেই যদি একথা বলে না দিতেন যে, একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, তা হলে এতদিনে তার ফায়সালা করে দেয়া হতো। প্রকৃত কথা এই যে, আগের লোকদের পরে যাদেরকে কিতাবের ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী বানানো হয়েছে তারা সেই ব্যাপারে বড় অস্বস্তিকর সন্দেহে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে। (১৫) সুতরাং (হে মুহাম্মদ) তুমি এখন এই দ্বীনের দিকেই দাওয়াত দাও। আর তোমাকে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার উপর অবিচল থাকো, আর এই লোকদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। তাদেরকে বলো, আল্লাহ্ যে কিতাবই নাযিল করেছেন, আমি তার উপর ঈমান এনেছি। আমি তোমাদের মাঝে ন্যায় বিচার করতে আদিষ্ট হয়েছি। আল্লাহ্ আমাদেরও রব এবং তোমাদেরও রব। আমাদের জন্য আমাদের কর্ম এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোন ঝগড়া-বিবাদ নেই। আল্লাহ্ আমাদের সকলকেই একদিন একত্রিত করবেন এবং তাঁর কাছেই আমাদের সকলকে ফিরে যেতে হবে। (১৬) আল্লাহ্র দ্বীন মেনে নেয়ার পর যারা সে সম্পর্কে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে, তাদের বিতর্ক ও দলীল-প্রমাণ

আল্লাহ্র কাছে বাতিল বা অগ্রহণযোগ্য। তাদের উপর (দুনিয়াতে) তাঁর গযব এবং (পরকালে) কঠিন আযাব রয়েছে।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ شَرَعَ –তিনি বিধি-বিধান দিয়েছেন। لَكُمْ–তোমাদের জন্য। مِنَ الدِّيْنِ –দ্বীন বা জীবন বিধান এরই। مَا –যা। وَصّٰى –নির্দেশ দিয়েছিলেন। بِهٖ –সে সম্পর্কে। وَ –এবং। اَوْحَيْنَا –আমি ওহী বা প্রত্যাদেশ করেছি। اِلَيْكَ –তোমার কাছেও। وَمَا –এবং যা। وَصَّيْنَا–এবং আমি নির্দেশ করেছি। اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ– তোমরা দ্বীন কায়েম বা প্রতিষ্ঠা করো। لَا تَتَفَرَّقُوْا –তোমরা অনৈক্য বা মতোবিরোধ করো না। فِيْهِ–তার মধ্যে। كَبُرَ –বড় কঠিন বা দুঃসহ হয়েছে। عَلَى– উপর। مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ–তাদেরকে তুমি যার দিকে ডাকো। يَجْتَبِىْ –আপন করে নেন বা মনোনীত করেন। مَنْ يَّشَاءُ –যাকে ইচ্ছা করেন। وَيَهْدِىْ –এবং হেদায়াত দেন বা পথ দেখান। مَنْ يُّنِيْبُ–যে রুজু বা অভিমুখী হয়। مَا تَفَرَّقُوْا –তোমরা মতানৈক্য করো নাই। اِلَّا –এ ব্যাতীত বা ছাড়া। مِنْ بَعْدِ- –পরে। مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ–যা তাদের কাছে এসেছে জ্ঞান। بَغْيًا–বাড়াবাড়ি। بَيْنَهُمْ–তাদের মাঝে। لَوْلَا –যদি না। كَلِمَةٌ سَبَقَتْ –পূর্ব কথা বা সিদ্ধান্ত। مِنْ رَّبِّكَ –তোমার রবের পক্ষ থেকে। اِلَى –দিকে এখনো পর্যন্ত। اَجَلٍ –সময়। مُّسَمًّى –নির্দিষ্ট। لَقُضِىَ –অবশ্যই ফায়সালা হয়ে যেত। بَيْنَهُمْ–তাদের মধ্যে। اِنَّ الَّذِيْنَ –নিশ্চয় যারা। اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ

–কেতাবের ওয়ারেশ বা উত্তরাধিকারী করা হয়েছিলো। بَعْدِ هِمْ –তাদের পরে। لَفِىْ –অবশ্যই মধ্যে আছে। شَكٍّ–সন্দেহ। مِنْهُ–তা থেকে। -مُرِيْبٍ –অস্বস্তিকর, বিভ্রান্তকর। فَلِذٰلِكَ –অতএব, এ জন্যে। فَادْعُ –দাওয়াত দাও বা ডাকো। وَاسْتَقِمْ –এবং অবিচল থাকো। كَمَا أُمِرْتَ–যেভাবে তুমি আদিষ্ট হয়েছো। لَا تَتَّبِعْ –অনুসরণ করো না। -أَهْوَاءَهُمْ–তাদের খেয়াল-খুশীর। اٰمَنْتُ –আমি ঈমান এনেছি। أُمِرْتُ –আমি আদিষ্ট হয়েছি।لِاَعْدِلَ –আমি যেন ন্যায় বিচার করি। -بَيْنَكُمْ –তোমাদের মধ্যে। رَبُّنَا –আমাদের প্রতিপালক। رَبُّكُمْ –তোমাদের প্রতিপালক। لَنَا–আমাদের জন্য। أَعْمَالُنَا–আমাদের কর্মস-মূহ। لَكُمْ–তোমাদের জন্যে।أَعْمَالُكُمْ –তোমাদের কাজ সমূহ। لَا حُجَّةَ –কোন ঝগড়া নেই। بَيْنَنَا –আমাদের মাঝে। يَجْمَعُ–একত্রিত করবেন। إِلَيْهِ–তারই দিকে। الْمَصِيْرُ- প্রত্যাবর্তন। -يُحَاجُّوْنَ তারা বিতর্ক করে। بَعْدِ –পরে। اُسْتُجِيْبَ–সাড়া দেয়া হয়েছে। حُجَّتُهُمْ –তাদের যুক্তি বা দলিল। دَاحِضَةٌ –বাতিল। عِنْدَ-–কাছে। رَبِّهِمْ –তাদের প্রতিপালকের। عَلَيْهِمْ –তাদের উপর। غَضَبٌ –গযব অভিসম্পাত। عَذَابٌ –শাস্তি। شَدِيْدٌ–শক্ত, কঠিন।

সম্বোধন ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে/প্রোগ্রামে উপস্থিত দ্বিনী/ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ভায়েরা/বোনেরা! আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আমি আপনাদের সামনে আল-কুরআনের দারস পেশ করার জন্যে সূরা শু'রার ১৩-১৬ পর্যন্ত চারটি আয়াত তিলাওয়াত ও তরজমা পেশ

করেছি। আল্লাহ্‌পাক যেন আমাকে আপনাদের সামনে সঠিক ভাবে দারস পেশ করার তাওফীক দান করেন। 'ওমা তাওফীকি ইল্লাহ্ বিল্লাহ্'।

সূরার নামকরণ ঃ এই সূরার নামকরণ করা হয়েছে অত্র সূরার ৩৮ নং আয়াতে উল্লেখিত وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ অর্থাৎ "তাদের যাবতীয় বিষয় পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়"। شُوْرٰى অর্থ 'পরামর্শ'। অন্যান্য সূরার মতো এই সূরাটিরও নামকরণ 'প্রীতকী' বা 'চিহ্ন' হিসেবে করা হয়েছে, 'শিরোনাম' হিসেবে নয়। তবে যা করা হয়েছে, তা ওহীর মাধ্যমে করা হয়েছে। সূরাটির মোট আয়াত সংখ্যা ৫৩।

সূরাটি নাযিল হওয়ার সময়কাল ঃ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। যাকে মাক্কী সূরা বলা হয়। তবে মক্কায় কোন্ সময় অবতীর্ণ হয়েছে এ ব্যাপারে কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে সূরাটির বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ্য করলে স্পষ্ট মনে হয় যে, এই সূরাটির পূর্ববর্তী সূরা 'হা-মীম-আস-সিজদাহ্‌র' পর পরই নাযিল হয়ে থাকতে পারে। কেননা, এই সূরাটি পূর্ববর্তী সূরার এক প্রকারের "উপসংহার" বা 'পরিশিষ্ট' বলে মনে হয়। পূর্ববর্তী সূরা 'হা-মীম আস সিজদাহ্' যে কেউ গভীর ভাবে পড়বে এবং চিন্তা-গবেষণা করবে এবং অতঃপর এই সূরাটি পড়বে সে-ই এ ব্যাপারটি বুঝতে পারবে। আর সূরা 'হা-মীম আস সিজদাহ অবতীর্ণ হয় হযরত হামযা (রাঃ) এর ইমান আনার পর এবং হযরত ওমর (রাঃ) এর ঈমান আনার পূর্বে। অতএব ধরে নেওয়া যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নবুয়তের ৪র্থ/৫ম বছর অর্থাৎ মাক্কী জীবনের প্রথম দিকে সূরাটি নাযিল হয়ে থাকতে পারে। তবে এ ব্যাপারে আল্লাহ পাকই বেশী জানেন।

সূরাটির সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু ঃ সুরাটিতে মক্কার মুশরিকদেরকে দ্বীনের যে দাওয়াত তথা তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের প্রতি ঈমান আনার জন্য মহানবী (সাঃ) দাওয়াত দিচ্ছেন তা বিনা যুক্তি এবং প্রতিবাদে মেনে নেওয়ার আহবান জানানো হয়েছে।

দারসের জন্য তিলাওয়াতকৃত আয়াতের বিষয়বস্তু ঃ সকল নবীকে একই দ্বীন কায়েম বা প্রতিষ্ঠর জন্য নির্দেশ দান এবং দ্বীনের ব্যাপারে মতানৈক্য বা মতপার্থক্য করে ছিন্ন-ভিন্ন না হয়ে যাওয়ার আহবান। দ্বীনের দাওয়াত অন্যদেরকে দেওয়া এবং নিজেও তার উপর মজবুতির সাথে দাঁড়িয়ে থাকা এবং একবার দ্বীন কবুল করে নেওয়ার পর সে ব্যাপারে ঝগড়া-বিবাদে জড়িয়ে না

পড়া। আর যারা একাজ করবে তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়াতে গযব এবং আখেরাতে রয়েছে কঠিন আযাব।

ব্যাখ্যা ঃ উপস্থিত প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে দারসের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক তথ্য প্রদান করা হলো। এখন আমি তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর গুরুত্বপূর্ণ শব্দ ও বাক্যের ব্যাখ্যা পেশ করছি।

সূরার ১৩ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ط

তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের সেই বিধি-বিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যার নির্দেশ তিনি নূহকে দিয়েছিলেন। আর এখন যা (হে মুহাম্মাদ) আমি তোমার প্রতি ওহীর সাহায্যে পাঠিয়েছি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মুসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করো এবং এতে মতানৈক্য করে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেও না।

সূরার প্রথম আয়াতে যে কথাটি বলা হয়েছে, এখানে সেই কথাটিই আরো স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, হে কাফের মুশরিক দলের লোকেরা মুহাম্মদ (সাঃ) যে দ্বীন নিয়ে আগমন করেছেন এটা তাঁর নিজস্ব বানোয়াট কোন নতুন দ্বীন নয়। আর ইতিপূর্বে যেসব নবী-রাসুলগণ দ্বীন নিয়ে আগমন করেছিলেন তাও তাদের নিজস্ব কোন রচিত দ্বীন ছিলো না। বরং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পাওয়া একই দ্বীন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ হযরত আদম (আঃ) থেকে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত সকল নবী-রাসূলগণই তাদের আপন আপন জাতির কাছে পেশ করেছেন।

আয়াতে পাঁচজন নবী-রাসূলের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বপ্রথম নূহ (আঃ)-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। নূহ (আঃ)-এর প্লাবনের পর পরবর্তী মানব জাতির জন্য তিনিই ছিলেন সর্বপ্রথম নবী। তার পরই হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আর তিনি হলেন সর্বশেষ নবী। তাঁর পর হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তার কারণ আরবের লোকেরা তাঁকে নিজেদের পথ প্রদর্শক নেতা হিসেবে মনে করতো। অতঃপর হযরত মুসা

ও ঈসা (আঃ)-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, ইয়াহুদী ও ঈসায়ীরা (খৃষ্টানেরা) নিজেদের ধর্ম তাদের নিকট হতে পেয়েছে বলে দাবী করতো। তবে এই পাঁচজন নবীর নাম উল্লেখ হয়েছে বলে এই নয় যে, এই পাঁচজন নবীকেই বুঝি আল্লাহ্‌র দ্বীনের হেদায়াত দেওয়া হয়েছিলো-আর কাকেও নয়। আসলে কিন্তু তা নয়, বরং এর মূল উদ্দেশ্য হলো একথা জানিয়ে দেয়া যে, এঁরা এবং এঁদের মতো যতো নবী-রাসূলই দুনিয়ায় আগমন করেছেন, তাঁরা সকলেই একই দ্বীন নিয়েই এসেছেন। শুধু দৃষ্টান্ত হিসেবে এই পাঁচজন বিশিষ্ট নবীর নাম এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আহযাবেও আগ-পিছ করে উক্ত পাঁচজন নবীর নাম অঙ্গীকারের প্রশ্নে উল্লেখিত হয়েছে। বলা হয়েছে-

وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ وَّاِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ -

আর যখন আমি নবীদের কাছ থেকে, তোমাদের কাছ থেকে এবং নূহ ইবরাহীম, মূসা ও মরিয়ম তনয় ঈসার কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম। (সূরা আহযাব-৭)

তবে এখানে একটা প্রশ্ন থেকে যায় যে, হযরত আদম (আঃ) সর্বপ্রথম নবী। তাঁর নাম উল্লেখের মাধ্যমে নবীদের আলোচনা শুরু হলো না কেন ? উত্তর হলো এই যে, দুনিয়াতে আগমনকারী সর্বপ্রথম নবী ছিলেন আদম (আঃ)। দ্বীনের বিষয়ে তিনিও ছিলেন একমত। কিন্তু তাঁর আমলে মানুষের মধ্যে কুফর ও শিরক ছিলো না। কুফর ও শিরকের সাথে দ্বন্দ্ব হযরত নূহ (আঃ)-এর আমল থেকেই শুরু হয়েছে। কাজেই এ ধরনের গুরুতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন সর্বপ্রথম হযরত নূহ (আঃ)। তাই, তাঁর নামের মাধ্যমেই নবীদের আলোচনা শুরু করা হয়েছে। তার পরেও আল্লাহ্ পাকই ভালো জানেন।

এই আয়াতটি দ্বীন-ইসলাম এবং উহার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য খুব গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। এজন্য এ সম্পর্কে গভীর চিন্তা-ভাবনা করা এবং ব্যাপক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বুঝে নেয়া প্রয়োজন।

আলোচ্য আয়াতটির একেবারে শুরুর কথাটি হলো ঃ شَرَعَ لَكُمْ অর্থাৎ তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। شَرَعَ শব্দের আভিধানিক অর্থ

হলো- 'পথ বেঁধে দেয়া'; আর পারিভার্ষিক অর্থ হলো 'নিয়ম-বিধান'', পদ্ধতি ও 'প্রণালী' নির্দিষ্ট করে দেয়া। আরবী ভাষায় تَشْرِيْعُ শব্দটি আইন প্রণয়ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর شَرَعُ বা شَرِيْعَتْ অর্থ 'আইন'। আইনদাতা বা আইন প্রনেতাকে বলা হয় شَارِعُ

যেহেতু আল্লাহ্ তাআলাই বিশ্ব জাহানের সবকিছুরই একচ্ছত্র মালিক। আর মানুষের প্রকৃত অলী বা অভিভাবকও তিনি। সুতরাং মানুষের মধ্যে যে সব বিষয়ে মতবিরোধ হবে, তার চূড়ান্ত ফায়সালাকারী তিনিই হতে পারেন। যেহেতু নীতিগত ভাবে আল্লাহ্ই মানুষের মালিক-মনীব, অভিভাবক ও আইনদাতা। অতএব এই অনিবার্য অধিকারের কারণে তিনিই মানুষের জন্য আইন ও নিয়ম-বিধান তৈরী করবেন এবং এই আইন-কানুন ও বিধি-বিধান মানুষকে দান করা তাঁরই দায়িত্ব। আর তাই তিনি তাঁর এই দায়িত্ব পালন করেছেন।

গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য ঃ আল্লাহ যেহেতু মানুষের সৃষ্টিকর্তা, সুতরাং তিনিই বেশী ভালো জানেন মানুষের লাভ-ক্ষতি। আল্লাহ্র কোন পক্ষ নেই। অতএব তার কোন স্বার্থও নেই। সুতরাং তাঁর রচিত আইনটিও হবে নিরপেক্ষ এবং ইনসাফ ভিত্তিক। অপরপক্ষে মানুষ যেহেতু সৃষ্ট। তাদেরই জন্য আইন-কানুন ও নিয়ম পদ্ধতি। সুতরাং মানব রচিত কোন আইন বা নিয়ম-নীতি নিরপক্ষ হতে পারে না। কেননা, মানুষ নিরপেক্ষ নয়। আইনের সাথে তার স্বার্থ জড়িত থাকে। সুতরাং মানুষের জন্য মানব রচিত কোন আইন বা নিয়ম-নীতি ইনসাফ ভিত্তিক ও কল্যাণকর হতে পারে না। আর এই কারণেই মানুষের মধ্যে হানাহানি এবং অশান্তি সৃষ্টি হয়।

প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! বর্তমান বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা না হওয়ার পেছনে মূল কারণই হলো গোটা বিশ্ব চলছে এখন মানব রচিত স্বার্থপর আইন দ্বারা। আর এই কারণে মানুষের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা হতে পারছে না। মানুষ নিরপেক্ষভাবে ন্যায় বিচার পাচ্ছে না। এই জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকেও মানুষের প্রতি রহমত নাযিল হচ্ছেনা। যদি আজ পৃথিবী আল্লাহ্র রচিত নিরপেক্ষ আইন দ্বারা পরিচালিত হতো, তাহলে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রহমত ও দয়া পাওয়া যেত। সূরা আ'রাফে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ

যখন কোন দেশের জনগণ ঈমান এবং তাক্ওয়ার ভিত্তিতে (আল্লাহ্র আইন দ্বারা) সমাজ পরিচালনা করে, তখন আল্লাহ্ পাক সেই সমাজের জন্য আসমান এবং যমীনের সমস্ত রহমতের দরজাসমূহ খুলে দেন। (আ'রাফ-৯৬)

এরপর আয়াতে বলা হয়েছে- مِنَ الدِّيْنِ -দ্বীন বিষয়ে।

دِيْنٌ শব্দের অর্থ ঃ আরবী ভাষায় 'দ্বীন' শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন- **প্রথম অর্থ**-প্রভূত্ব ও প্রাধান্য, শক্তি ও আধিপত্য। **দ্বিতীয় অর্থ**-আনুগত্য ও দাসত্ব। **তৃতীয় অর্থ**-প্রতিফল ও কর্মফল এবং **চতুর্থ অর্থ**-পথ, পন্থা, ব্যবস্থা, আইন।

উল্লেখিত আয়াতে দ্বীন (دِيْنٌ) শব্দটি শেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ 'দ্বীন' শব্দের অর্থ জীবন যাপনের পথ বা পন্থা, কিংবা কাজের পদ্ধতি। এমন পন্থা বা পদ্ধতি যা মানুষের জীবনে অনুসরণ করা যেতে পারে।

কিন্তু মনে রাখার বিষয় হলো এই যে, কুরআনের এই আয়াতে কেবল دِيْنٌ-(দ্বীন)-ই বলা হয়নি। বরং কুরআনে বলা হয়েছে اَلدِّيْنُ (আ-দ্বীন)। ইংরেজী ভাষায় This is a way (এই একটি পথ)-এর পরিবর্তে This the way (এই একটিমাত্র পথ) বলায় অর্থের দিক দিয়ে যতখানি পার্থক্য হয় دِيْنٌ- (দ্বীন) এবং اَلدِّيْنُ (আ-দ্বীন) শব্দের মধ্যেও অর্থের দিক দিয়ে ততখানি পার্থক্য হয়ে থাকে। অর্থাৎ কুরআন এই কথা বলছেনা যে, "ইসলাম আল্লাহ্র নিকট একটি (মনোনীত) ধর্ম"। বরং এর দাবী হলো- "আল্লাহ্র নিকট ইসলাম-ই একমাত্র বিশুদ্ধ ও নির্ভুল জীবন ব্যবস্থা বা চিন্তা ও কাজের প্রণালী।" মহান আল্লাহ্ অন্য আয়াতে বলেন,

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ **একমাত্র ইসলামই হলো আল্লাহ্র নিকট মনোনীত দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা।**

সুতরাং দ্বীন প্রচলিত সংকীর্ণ অর্থে কোন ধর্ম নয়। বরং জীবন ব্যবস্থা। শুধু জীবন ব্যবস্থাই নয়, একমাত্র জীবন ব্যবস্থা। দ্বীনের প্রচলিত সংকীর্ণ অর্থ 'ধর্ম' কতিপয় ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু 'জীবন ব্যবস্থায়' কোন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। এর অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। জীবন ব্যবস্থা বলতে জীবনের বিশেষ কোন দিক বা বিশেষ কোন বিভাগের ব্যবস্থা বুঝায় না। এর অর্থ গোটা জীবনের পরিপূর্ণ ব্যবস্থা, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক ভাবে জীবন পরিচালনার ব্যবস্থা। অর্থাৎ সকল কালের এবং সকল মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে সমগ্র সমাজের কথাই এখানে বলা হয়েছে। পাশ্চাত্য বাদিদের দেওয়া কোন সংকীর্ণ অর্থ ও বিশেষ এলাকা এবং দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে আমাদের দেশের মুসলিম নামধারী ধর্ম নিরপেক্ষবাদীরা দ্বীনকে তথা ইসলামকে ধর্মীয় গোন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং সমাজ, রাষ্ট্র ও রাজনীতিকে পৃথক করে ফেলেছে। আর তাদেরই পেছনে মুসলিম নামধারী লোকেরা বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে। এই জন্য আমাদেরকে কুরআন এবং হাদীস নিজের ভাষায় ভাল ভাবে বুঝে পড়তে হবে। তা না হলে চিরদিন গোমরাহীর মধ্যে থেকেই ঘুরপাক খেতে হবে। আয়াতের পরবর্তী বাক্যগুলো থেকে কয়েকটি কথা আমাদের জেনে নেওয়া প্রয়োজন ঃ

প্রথম কথা হলো– সকল নবীর দ্বীন একই ঃ আয়াতে দ্বীনের এই বিধান শুধু নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কেই দেয়া হয়নি বরং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে ইতিপূর্বে একই দ্বীনের হেদায়াত দেওয়া হয়েছিলো নুহ, ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসা (আঃ)কে। আর এর দ্বারা এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর এই বিধান সরাসরি প্রত্যেক মানুষের উপর পাঠান না। বরং সময় সময় যখনই তিনি প্রয়োজন মনে করেছেন তখনই তিনি সেই জাতির মধ্য থেকেই একজন ব্যক্তিকে নবী-রাসূল নির্দিষ্টও নিয়োগ করে তিনি তাঁরই উপর এই বিধান অর্পণ করে মানুষকে সেই পথে পরচালিত করেছেন।

দ্বিতীয় কথা হলো– প্রতিটি নবীর জন্য পৃথক পৃথক দ্বীন নয় ঃ আয়াতে আরও একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তিনি দ্বীনের এই বিধান শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একই জিনিস এবং একই রকম পাঠিয়েছেন। এক এক সময় এক এক জাতির জন্য এক এক ধরনের দ্বীন এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতির জন্য বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী দ্বীন পাঠান নাই।

তৃতীয় কথা হলো ঃ আল্লাহ্‌র প্রাধান্য ও সার্বভৌমত্ব মেনে নেবার সংগে সংগে যাদের মাধ্যমে এই বিধান পাঠানো হয়েছে, তাঁদের রেসালাত মেনে নেয়া এবং যে ওহীর সাহায্যে এটা নাযিল হয়েছে তা বিশ্বাস করা এবং মেনে নেয়া দ্বীনেরই একটি অংশ। কেননা, এই বিধান মেনে চলতে হলে এটা যে আল্লাহ্‌র তরফ হতে নাযিল হয়েছে তার অকাট্যতা মেনে নেওয়া এবং সেই বিষয়ে মনের মধ্যে নিশ্চিন্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

অতঃপর সকল নবীদের নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ্ তায়ালা আয়াতের পরবর্তী অংশে বলেন ঃ اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ তোমরা **দ্বীন (জীবন বিধান) প্রতিষ্ঠা করো এবং উহাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না।** বাক্যের এই প্রথমাংশের অর্থ– শাহ্ ওলী উল্লাহ্ দেহলবী (রহঃ) করেছেন 'দ্বীনকে কায়েম করো'। আর শাহ রফীউদ্দীন এবং শাহ্ আব্দুল কাদের (রঃ) করেছেন 'দ্বীনকে কায়েম রাখো'। এই দু'টি তরজমাই ঠিক। কেননা - শব্দের অর্থ 'কায়েম করাও' হতে পারে, আবার 'কায়েম রাখাও' হতে পারে। নবী-রাসূলগণ এই দুই ধরনের কাজের জন্যই আদিষ্ঠ ও নিয়োজিত ছিলেন। তাঁদের প্রথম কাজ ছিলো, যেখানে দ্বীন কায়েম নেই সেখানে তা কায়েম করা। আর দ্বিতীয় কাজ ছিলো, যেখানে পূর্ব থেকেই দ্বীন কায়েম আছে সেখানে তা কায়েম রাখা। প্রকৃত পক্ষে কায়েম রাখার প্রশ্ন হয় তখনই, যখন একটা জিনিস যথারীতি কায়েম হয়ে আছে। না হলে প্রথমে উহাকে কায়েম করতে হবে, অতঃপর তা কায়েম রাখার জন্য ক্রমাগত ভাবে চেষ্টা-যত্ন চালিয়ে যেতে হবে।

দ্বীন কায়েম বা প্রতিষ্ঠা বলতে কি বুঝায় তা আমাদের অনুধাবন করা প্রয়োজন। কায়েম করার অর্থ যখন কোন বস্তু বা দেহ সম্পন্ন সম্পর্কে বলা হবে, তখন উহার অর্থ হবে যা বসে আছে তাকে উঠানো বা দাঁড় করানো। যেমন কোন মানুষ বা জীব-জন্তুকে উঠোনো। কিংবা কোন পড়ে থাকা জিনিসকে দাঁড় করানো, যেমন বাঁশ বা খুঁটিকে দাঁড় করা। অথবা কোন পড়ে থাকা বিক্ষিপ্ত জিনিসকে একত্রিত করে উপরে তুলে ধরা। যেমন খালি জমিতে ইমারত নির্মাণ। কিন্তু যেসব জিনিস বস্তুগত বা দেহ বিশিষ্ট নহে, তাত্বিক বা আত্মিক ভাবধারার জিনিস, উহার জন্য 'কায়েম করো' শব্দটি ব্যবহৃত হলে এর অর্থ শুধু 'প্রচার করা' হবে না, বরং সেই অনুযায়ী পুরোপুরি আমল করা, তাকে চালু করা, এবং তাকে কার্যত জারী ও বাস্তবায়িত করাই হবে উহার সঠিক অর্থ। যেমন আমরা বলি দেশে আদালত কায়েম আছে। তখন এর অর্থ এটাই হয় যে,

দেশে ইনসাফ কায়েমের জন্য বিচারক প্রকৃত ঘটনা জানার পর সঠিক ফায়সালা দিচ্ছে।

প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! বর্তমানে আমাদের দেশে দ্বীন তথা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েম বা প্রতিষ্ঠা নেই। সুতরাং এখন দ্বীন প্রতিষ্ঠা করাই হবে أَقِيمُوا الدِّينَ এর সঠিক অর্থ। যদি কেউ দ্বীনের তাবলীগ বা প্রচার করে কিন্তু প্রতিষ্ঠার কাজ না করে তাহলে, أَقِيمُو الدِّينَ এর অর্থের সঠিক হক আদায় হয় না। অতএব এই অবস্থায় বর্তমানে দাওয়াত ও তাবলীগ এবং জিহাদ একই সাথে পরিচালিত হবে। দ্বীন কায়েমের জন্য দাওয়াত ও তাবলীগ এবং জিহাদ একে অপরের পরিপূরক।

-وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ **এবং উহাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না।** আয়াতে বলা হয়েছে সকল নবীর দ্বীন একই ছিলো সুতরাং তোমরা পরস্পরে দ্বীনের ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মত দিয়ে তোমরা নিজেরা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যেও না। তোমরা দ্বীন কায়েমের ক্ষেত্রে একমত পোষণ করলেও শরীয়তের যে ভিন্নতা ছিলো তা নিয়ে মতানৈক্য করছো, আর তোমরা সূরা মায়েদার আল্লাহ্‌র এই আয়াত لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَا جًا **তোমাদের প্রত্যেকের জন্য এক একটা শরীয়াত ও চলার পথ বানিয়ে দিয়েছি।** দলীল হিসেবে নিয়ে এই মতামত দিচ্ছো যে, এই 'দ্বীন' অর্থ শরীয়তের হুকুম-আহকাম ও নিয়ম-প্রণালী নহে। বরং তাওহীদ, আখেরাত এবং কিতাব ও নবুয়াত মেনে নেয়া এবং ইবাদত করাই এর অর্থ। কিংবা খুব বেশী হলে তা কতকগুলো বড় বড় মৌলনীতি হবে, যা সব শরীয়াতে সমান।

আসলে এটা 'একই দ্বীনের' সঠিক ধারণা নয়। শরীয়ত বিহীন দ্বীনের এই খন্ড ধারণার জন্যই খৃষ্টানেরা বিভ্রান্ত হয়েছে। আর যদি মুসলমানেরাও 'দ্বীন, এবং 'শরীয়তকে' পৃথক করে দেয়, তা হলে তারাও বিভ্রান্ত হবে। তখন তারা মনে করবে, আল্লাহ্ দ্বীন কায়েমের নির্দেশ দিয়েছেন– শরীয়াত কায়েমের কথাতো বলেননি। আসলে দ্বীন কায়েম বলতে শুধু কতিপয় ঈমানী বিষয় নয় এবং কয়েকটি নৈতিক বিধানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং শরীয়াতেরও বিধি-বিধান উহার মধ্যে শামিল রয়েছে। অর্থাৎ সকল যুগে এবং সকল নবীর আমলে একই

দ্বীন এবং শরীয়াত ছিলো, তবে ব্যবহারীক দিক থেকে কিছু পার্থক্য ছিলো। কোরআন এবং হাদীসে এর যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়

প্রকৃত পক্ষে সূরা মায়েদায় উল্লেখিত আয়াতের পূর্বাবার (৪১–৫০) আয়াতগুলোর অর্থ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে বুঝা যায় যে, উহার অর্থ হবে, যে নবীর উম্মতকে যে শরীয়াতই আল্লাহ্ তায়ালা দিয়েছিলেন, তাই তাদের জন্য দ্বীন ছিলো এবং তাঁর নবুয়তের যুগে তাই কায়েম করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। আর যেহেতু এখন মুহাম্মদ (সাঃ) এর নবুয়তের যুগ চলছে, তাই একই কারণে উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য আল্লাহ্র দেয়া শরীয়াতই হলো পূর্ণ দ্বীন। মহান আল্লাহ্ বিদায় হজ্জের ভাষণের সময় মহানবী (সাঃ) এর উপর اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ- **আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণতা দান করলাম**। নাযিল করে এর পূর্ণতা দান করেছেন। সুতরাং এই পরিপূর্ণ দ্বীন তথা আল ইসলাম কায়েম করাই হলো উম্মতে মুহাম্মদীর দায়িত্ব। পূর্বের নবীদের থেকে শরীয়াতের যেসব কিছু পার্থক্য রয়েছে এটা পরস্পর বিরোধী নয়। বরং শরীয়াত সমূহের খুটিনাটি ব্যাপারে অবস্থার দৃষ্টিতে কিছুটা পার্থক্য মাত্র। তাছাড়া وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ "দ্বীনের মধ্যে বিচ্ছেদ **বিচ্ছিন্নতা করিও না**।" বলে এই অর্থও নেওয়া যায় যে, দ্বীনের ব্যাপারে নিজের পক্ষ থেকে অসামঞ্জস্যপূর্ণ কথা বের করা। যেমন– দ্বীন ইসলামে যা নেই তা শামিল করে দেয়া, অথবা দ্বীন ইসলামে যা আছে তা বের করে দেয়া। দ্বীনের বিধি-ব্যবস্থায় কোনরূপ রদ-বদল করা, কিংবা উহাকে বিকৃত করা। দ্বীনের অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজকে কম গুরুত্বপূর্ণ বানিয়ে দেয়া এবং কম গুরুত্বপূর্ণ খুব জোর মোবাহ্ কাজকে ফরজ ওয়াজিব বা তার চেয়েও বেশী ইসলামের রুকন বানিয়ে নেয়া। আর এ ধরনের কাজের জন্যেই অতীতের নবীদের উম্মতেরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলো। পরে ধীরে ধীরে তাদের এই বিচ্ছিন্নতা ও ভিন্নতা এক পর্যায়ে একএকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ দ্বীন হয়ে গেল।

প্রিয় ভায়েরা/ বোনেরা! বর্তমান যুগেও বিভিন্ন দেশে দেশে বিশেষ করে আমাদের দেশও দ্বীনের খন্ডিত অর্থ করে দ্বীন ও শরীয়াত তথা ধর্ম ও রাজনীতিকে পৃথক করে দেয়া হয়েছে এবং রাষ্ট্রীয় ভাবে দ্বীন ইসলামকে কায়েমের ব্যাপারেই খোদ নামধারী মুসলমানেরা বিভ্রান্ত সৃষ্টি করে দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে দ্বীন ও শরীয়াত সম্পর্কে তাদের এই অনৈক্য মানুষকে সঠিক দ্বীন

কায়েমের পথ থেকে দূরে সরে রাখারই এক গভীর ষড়যন্ত্র। তাছাড়া এও দেখা যায় ইসলাম পালনকারী মুসলমানেরাও দ্বীনের মূল জিনিসগুলোকে হালকা করে নিয়েছে এবং অনেক বিষয় এমন আছে যা দ্বীন ইসলামের মধ্যে গণ্য নয়, তা দ্বীন ইসলামের মূল বানিয়ে নিয়েছে। এমনকি অনেক 'বিদআত' জিনিসকেও ইসলামের মূল ইবাদত মনে করে অত্যন্ত ভক্তি ও মহব্বতের সাথে পালন করে যাচ্ছে। এতে আয়াতে উল্লেখিত দ্বীন কায়েমের যে গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে তা এ সমস্ত চিন্তা মনোভাব এবং আমলের কারণে– দ্বীন কায়েমের স্পীরিটকে নষ্ট করে দেয়া হচ্ছে। দ্বীনের মূল স্রোত ধারা থেকে দৃষ্টিকে ভিন্য দিকে প্রবাহীত করা হচ্ছে।

অতঃপর মহান আল্লাহ্ পাক পরবর্তী আয়াতে উল্লেখ করেনঃ

كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ط

(হে মুহাম্মদ সাঃ) তুমি মুশরিকদেরকে যেই কথার দিকে দাওয়াত দিচ্ছো তা তাদের কাছে বড় কঠিন ও দুঃসহ বলে মনে হয়।

যেহেতু আয়াতগুলো মক্কার মুশরিকদের সামনে অবতীর্ণ হয়েছিলো। আর নবী (সাঃ) ও আল্লাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী তাদেরকে পূর্বের সমস্ত মুশরিকী ধর্মকে ত্যাগ করে তাওহীদ তথা একত্ববাদ এবং পরিপূর্ণ দ্বীনের প্রতি দাওয়াত দিচ্ছিলেন। কিন্তু তাদের কাছে এই দু'টি দাওয়াত– 'আল্লাহ্কে এক হিসেবে মেনে নেওয়া' এবং 'মুহাম্মদ (সাঃ) এর আনীত দ্বীন ইসলামের এর মধ্যে শামিল হওয়া' তাদের জন্য খুবই কঠিন এবং দুঃসহ মনে হচ্ছিল, তারা এটাকে কোন ভাবেই মেনে নিতে পারছিলো না। তাই আল্লাহ্ তায়ালা আয়াতের শেষাংশে উল্লেখ করেন

اَللّٰهُ يَجْتَبِىْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ-

আল্লাহ্ যাকে চান আপন করে নেন এবং তিনি তাকেই হেদায়াত দান করেন যে তার দিকে রুজু হয় বা যেতে চায়।

অত্র সূরার পূর্বের ৮ ও ৯ আয়াতে যে কথা বলা হয়েছে এখানে তাই আবার উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে একথা বলার উদ্দেশ্য হলো এই যে, হে নবী! তুমি তো এই লোকদের সামনে দ্বীনের এই রাজপথ তুলে ধরছো, আর এই নাদান

লোকেরা এই অপূর্ব নেয়ামতের কদোর করার পরিবর্তে তারা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে। কিন্তু তাদেরই মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা আল্লাহ্‌র দিকে রুজু অর্থাৎ মনোনিবেশ করতে চায়– আর আল্লাহ্‌ও তাদেরকে টেনে টেনে নিজের দিকে ফিরিয়ে নিচ্ছেন। নিজের দলভুক্ত করে নিজের লোক হিসেবে মনোনীত করেছেন। এখন কেউ এই নিয়ামত পাচ্ছে আর কেউ না পেয়ে মন খারাপ করছে এটা প্রত্যেকেরই নিজস্ব ভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু তাই বলে আল্লাহ্‌র ভান্ডার ছোট নয়। যে লোক তার দিকে রুজু হতে চায়, কেবল তাকেই তিনি নিজের দিকে টেনে নেন। আর যারা তার নিকট থেকে দূরে সরে যেতে চায় বা চেষ্টা করে তাদের পেছন পেছন ধাওয়া করে দলে ভেড়ানো এটা আল্লাহ্‌র রীতি বা নিয়ম নয়। এটা একান্ত তাদেরই নিজস্ব ব্যাপার। কেননা আল্লাহ্ মানুষকে জ্ঞান-বুদ্ধি বিবেক দিয়ে তৈরী করেছেন। আবার তাদের স্বাধীনতাও দিয়েছেন। আর আল্লাহ্ তাআলা কারো স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে চান না। এটা আল্লাহ্ তাআলার সুন্নতের খেলাপ। পরবর্তী আয়াতে মহান আল্লাহ্ তাদের বিরোধ বৈষম্যের কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ

وَمَا تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ ط

মানুষের মধ্যে যে বিরোধ-বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে তা তাদের নিকট ইলম বা জ্ঞান এসে পৌঁছার পর হয়েছে। আর তা হয়েছে এই কারণে যে তারা পরস্পরে একে অপরের উপর অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করতে চেয়েছিলো।

আয়াতের এই অংশের ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন,এখানে মক্কার কোরাইশ কাফেরদের অবস্থান সম্পর্কে উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, সত্যদ্বীন ও সঠিক পথের প্রতি তাদের বিমুখতা আগে থেকেই এমনিতে তো ছিলো, তার পরেও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ইলম বা জ্ঞান এসে যাওয়ার পরই তারা এরূপ বিতর্ক করেছে। আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) 'জ্ঞান এসে যাওয়ার' অর্থ বলতে তিনি যাবতীয় জ্ঞানের উৎস রাসূলে করীম (সাঃ) এর আগমনকে বুঝিয়েছেন। আবার কেউ কেউ এর অর্থ করেন যে, পূর্ববর্তী উম্মতরা নিজেদের নবীদের ধর্ম থেকে পৃথক রয়েছে, অথচ তাদের কাছে নবীর মাধ্যমে সঠিক পথের জ্ঞানএসে গিয়েছিলো। মোটকথা এই যে, তারা যে দ্বীনের নিয়ম-নীতির বিষয়ে বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত হয়ে

পড়েছিলো তাদের কাছে কোন নবী বা কিতাব না আসার কারণে প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তা নয়, বরং তারা দ্বীনের ব্যাপারে বিভিন্ন মত পার্থক্য করেছে তাদের কাছে নবী রাসূলের উপর কিতাব নাযিলের মাধ্যমে ইলম বা জ্ঞান আসার পরেই। সুতরাং এ কারণে আল্লাহ্ তাআলা সেই জন্য দায়ী নন, সেই দায়-দায়িত্ব আল্লাহ্র উপর পড়ে না। বরং সে জন্য সেই লোকেরা নিজেরাই দায়ী। দ্বীনের সুস্পষ্ট নিয়ম-নীতি ও বিধি-বিধান পরিহার করে তারা নিজেরা নিজের মতো করে নিয়ম-নীতি ও ধর্মমত রচনাকরে নিয়েছিলো বলে এর সমস্ত দায়-দায়িত্ব তাদেরই ভোগ করতে হবে। بَغْيًا بَيْنَهُمْ অর্থাৎ তা হয়েছে এ কারণে যে, তারা একে অপরের উপর অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করতে চেয়েছিলো। তারা যে জ্ঞান আসার পরও বিরোধীতা করেছিলো তা কোনো নেক উদ্দেশ্যে নয় বরং তারা যদি সবাই মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আনীত দ্বীনের মধ্যে শামিল হয়ে যায়, তা হলে তো তাদের আর কোন নেতৃত্ব কর্তৃত্ব থাকবে না। তাই তারা এই দ্বীনের মধ্যে মত-পার্থক্য সৃষ্টি করে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করেছিলো। এভাবে তারা ধর্মীয়, সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনে যুদ্ধ-কলহ সৃষ্টি করে হিংসা-বিদ্বেষ ছড়িয়ে দিয়েছিলো।

আয়াতের পরবর্তী অংশে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ ط

তোমার রব আগে থেকেই যদি একথা বলে না দিতেন যে, একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, তা হলে এত দিনে তার ফায়সালা করে দেয়া হতো। অর্থাৎ যেসব লোক নিজেরা গোমরাহ্ ছিলো এবং গোমরাহীর পথ তৈরী করেছিলো এবং জেনে-বুঝে তা অনুসরণ করার অপরাধে তারা অপরাধী ছিলো, তাদের এই অপরাধের কারণে যদি দুনিয়াতেই তাদের সকলকে ধ্বংস করে ফেলা হতো এবং হেদায়াতের সঠিক পথে যারা চলে যদি কেবলমাত্র তাদেরকেই বাঁচিয়ে রাখা হতো। তাহলে এর ফলে কে হক পন্থী আর কে বাতিলপন্থী তা পরিস্কার হয়ে যেত। কিন্তু এই চূড়ান্ত ফায়সালা করার কাজকে আল্লাহ্ তাআলা কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থগিত করে রেখেছেন। কেননা, দুনিয়ায় যদি এই চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেয়া হতো তাহলে মানব জাতির পরীক্ষাই

অর্থহীন হয়ে যেত। এই জন্য মহান আল্লাহ্ তাআলা কাফের,মুশরিক এবং বাতিল পন্থীদের দুনিয়ায় গযব-আযাব দিয়ে সমূলে ধ্বংস না করে কিয়ামত পর্যন্ত পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা করেন। আয়াতের পরবর্তী অংশে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ إِنَّ الَّذِيْنَ أُوْرِثُوا الْكِتٰبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ-

প্রকৃত কথা এই যে,পূর্বের লোকদের পরে যাদেরকে কিতাবের ওয়ারিশ (উত্তরাধিকারী) বানানো হয়েছে, তারা সেই ব্যাপারে বড়ই অস্বস্তিকর সন্দেহে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে।

আয়াতের এই অংশের তাৎপর্য এই যে, প্রত্যেক নবী এবং তাঁর নিকটবর্তী অনুসারীদের সময় অতিবাহিত হবার পর পরবর্তী লোকদের কাছে যখন আল্লাহ্র আসমানি কিতাব নাযিল হলো,তখন তারা তা পূর্ণ আস্থা এবং দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে তা গ্রহণ করলো না। বরং তার ব্যাপারে তাদের মনের মধ্যে নানা রকমের ভুল ধারণা, সন্দেহ-সংশয় ও মানসিক জটিলতা সৃষ্টি হলো। ফলে তারা খুব গভীর ও কঠিন সমস্যার মধ্যে পড়ে গেল। এটা এ কারণে হয়েছিলো যে, আসমানি কিতাব বিশেষ করে তাওরাত এবং ইঞ্জিল কিতাবের প্রকৃত বক্তব্যকে যেভাবে স্বার্থবাদী ধর্মীয় পন্ডিতেরা নিজেদের সুবিধা মতো কথাকে উক্ত কিতাবের মধ্যে সংযোজন করে দিয়ে বিকৃত করেছিলো। যেমন- সূরা বাকারায় মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَا تَلْبِسُوْا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوْا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

তোমরা সত্য এবং মিথ্যার সংমিশ্রণ করো না এবং তোমরা জেনেশুনে সত্য গোপন করো না।

তাদের বিকৃতির কারণে কোনটা সঠিক আর কোনটা বেঠিক এটা সাধারণ মানুষের পক্ষে বিচার-বিবেচনা করা খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছিলো। যার ফলে তারা কিতাবের ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী হবার পরও তারা তার ব্যাপারে সোবাহ্ সন্দেহ এবং বিভ্রান্তিতে জড়িয়ে পড়েছিলো।

কাফের মুশরিকেরা নিজেরা পথভ্রষ্ট তো ছিলোই, বরং তারা তৎকালীন নবী

রাসূলদেরকে তাদের পথে চালানোর জন্য চেষ্টায় ছিলো। তাই মহান আল্লাহ্ তাআলা সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে মক্কার কাফের মুশরিকদের এসব অপতৎপরতায় বিচলিত না হয়ে বরং তাঁর দাওয়াতী কাজ অব্যাহত রাখার তাগাদা দিয়ে পরবর্তী আয়াতে কিছু নির্দেশিকা প্রদান করে বলেন ঃ

فَلِذٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ؕ اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ؕ لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ؕ اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ-

সুতরাং তুমি এই দ্বীনের দিকেই দাওয়াত দাও। আর তোমাকে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার উপর অবিচল থাকো, আর এই লোকদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। তাদেরকে বলো, আল্লাহ্ যে কিতাবই নাযিল করেছেন, আমি তার উপর ঈমান এনেছি। আমি তোমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করতে আদিষ্ট হয়েছি। আল্লাহ্ আমাদের রব এবং তোমাদের রব। আমাদের জন্য আমাদের কর্ম এবং তোমাদের জন্যে তোমাদের কর্ম। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোন ঝগড়া-বিবাদ নেই। আল্লাহ্ আমাদের সকলকেই একদিন একত্রিত করবেন এবং তাঁর কাছেই আমাদের সকলকে ফিরে যেতে হবে।

হাফেজ ইবনে কাসীর তার তাফসীরে বলেন, দশটি বাক্য বিশিষ্ট এই আয়াতে পৃথক পৃথক দশটি বিধান বা উপদেশ বর্ণিত হয়েছে। যা আয়াতুল কুরশী ছাড়া কুরআনের অন্য কোন আয়াতে এর নযীর পাওয়া যায় না। আয়াতুল কুরশীতেও দশটি বিধান বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য এই আয়াতের দশটি বিধান বা উপদেশ নবী করীম (সাঃ) সহ উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য বর্ণিত হলো ঃ

এক. -فَلِذٰلِكَ فَادْعُ অর্থাৎ যদি মুশরিকদের কাছে তোমার তাওহীদের এই দাওয়াত কঠিন মনে হয়, তথাপিও তুমি এ দাওয়াত দেয়া ছেড়ে দেবে না বরং উপর্যপুরি দাওয়াতের এই কাজ চালিয়ে যাবে।

দুই. وَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ 'তুমি এ দ্বীনের প্রতি নিজে অবিচল থাকো,যেমন তোমাকে আদেশ করা হয়েছে।' অর্থাৎ যাবতীয় বিশ্বাস, কর্ম,চরিত্র, অভ্যাস ও সামাজিকতার যথাযথ সমতা ও ভারসাম্য কায়েম রাখো। যেন কোন দিকেই কোনরূপ বাড়াবাড়ি না হয়। তবে এরূপ দৃঢ়তা খুব সহজ ব্যাপার নয়। এ কারণেই কোন কোন সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে চুলে পাক ধরে যাওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ شَيَّبَتْنِىْ هُوْدُ "সূরা হুদ আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে"। সূরা হুদেও এই আদেশ এ ভাষায়ই উল্লেখ হয়েছে।

তিন. وَلاَ تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ অর্থাৎ দ্বীনের প্রচারের দায়িত্ব পালনে তুমি কারও বিরোধিতার পরওয়া করবে না। কে কি বললো, আর না বললো, তা দেখার তোমার কোন বিষয় নয়। তুমি তোমার কাজ চালিয়ে যাবে।

চার. وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ অর্থাৎ 'তুমি ঘোষণা করে দাও যে, আল্লাহ্ তাআলা যতো কিতাব নাযিল করেছেন, সবগুলোর প্রতি আমি বিশ্বাস করি'। কোন কিতাবের উপরে আমার সামান্যতমও সন্দেহ-সংশয় নেই।

পাঁচ. وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ অর্থাৎ 'তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ন্যায় বিচার করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছে।' কেউ কেউ عَدْلٌ এর অর্থ করেছেন 'সাম্য'।

মাওলানা মওদূদী (রঃ) এই বাক্যের ব্যাখ্যায় তিনি কয়েকটি অর্থ করেছেন ঃ যেমন–

প্রথম অর্থ– এই যে, সকল প্রকারের দলাদলি ও কোন্দল-কোলাহল হতে সম্পূর্ণ আলাদা থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবে ইনসাফের নীতি অনুসরণ করার জন্যই আমি আদিষ্ট হয়েছি।

দ্বিতীয় অর্থ– এই যে, আমি যে সত্যকে তোমাদের সামনে পেশ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি, তাতে কারো জন্য-ই কোনরূপ বিশিষ্টতা বা পার্থক্য নেই, সকলেরই জন্য সম্পূর্ণভাবে সমান। এতে আপন-পর, ছোট-বড়, গরীব-ধনী,

ভদ্র ও উঁচু বংশ, অভদ্র ও নীচ বংশ এর জন্য আলাদা আলাদা অধিকার ঘোষিত হয়নি।

তৃতীয় অর্থ– এই যে, আমি দুনিয়ায় ইনসাফ কায়েম করার দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত হয়েছি। লোকদের মাঝে ইনসাফ করার জন্য আমাকে আদেশ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে সমাজে যেসব বৈষম্য ও বেইনসাফী রয়েছে, আর রয়েছে ভারসাম্যহীনতা, তা সব কিছু দূর করার দায়িত্বও আমার।

চতুর্থ অর্থ– এই যে, আমি আল্লাহ্র নিয়োজিত বিচারক, বিচারপতি। লোকদের মাঝে পরিপূর্ণ ইনসাফ করা আমার দায়িত্ব। চারটি অর্থের মধ্যে প্রথম তিনটি অর্থ মক্কার জন্য কার্যকরী এবং শেষের অর্থটি মক্কায় প্রকাশিত হয় নাই, হিজরাতের পর মদীনায় প্রকাশিত হয়েছে।

ছয়. اَللّٰهُ رَبُّنَا অর্থাৎ আল্লাহ্ আমাদের সকলের রব পালনকর্তা।

সাত. لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ অর্থাৎ আমাদের কর্ম আমাদের কাজে আসবে। তোমাদের তাতে কোন লাভ-লোকসান হবে না এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের কাজে আসবে। আমাদের তাতে কোন লাভ ও ক্ষতি নেই। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই নিজ নিজ আমলের জন্য নিজেরাই দায়ী থাকবো এবং নিজেদেরকে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবো। তোমরা যদি নেক আ'মল করো তবে তার ফল আমরা পাবো না, তোমরাই সেই ফল ভোগ করবে। আর আমরা যদি অন্যায় করি তবে তার প্রতিফল হিসেবে তোমাদেরকে শাস্তি ভোগ করতে হবে না, আমাদের নিজেদেরকেই তার পরিনাম ভোগ করতে হবে। অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى

অর্থাৎ (কিয়ামতের দিন) কেউ কারো ভার বহন করবে না। (আনআম-১৬৪)

আট. لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ অর্থাৎ সত্য স্পষ্ট ও প্রমাণিত হবার পরও যদি তোমরা শত্রুতাকেই কাজে লাগাও, তবে তর্ক-বিতর্কের কোন অর্থ নেই। কাজেই আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এমন কোন বিতর্ক নেই।

নয়. اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا অর্থাৎ কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআ'লা আমাদের সকলকে একত্রিত করবেন এবং প্রত্যেকের কাজের প্রতিদান দেবেন।

দশ. وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ অর্থাৎ আমরা সকলেই তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করবো অর্থাৎ তাঁর কাছেই ফিরে যাবো।

দারসের সর্বশেষ আয়াতে মহান আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يُحَاجُّوْنَ فِى اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا اسْتُجِيْبَ لَهٗ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ

আল্লাহ্র দ্বীন মেনে নেবার পর যারা সে সম্পর্কে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে তাদের বিতর্ক ও দলীল প্রমাণ আল্লাহ্র কাছে বাতিল বা অগ্রহণযোগ্য। তাদের উপর (দুনিয়াতে) তাঁর গযব এবং (পরকালে) কঠিন আযাব রয়েছে।

পূর্বের আয়াত সমূহে পয়গম্বরগণের সর্বসম্মত দ্বীনের প্রতি বিশ্ববাসীকে দাওয়াত প্রদান এবং তাতে প্রতিষ্ঠিত ও অবিচলিত থাকার উপদেশ দেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু যেসব কাফের শুনতে এবং মানতেই রাজী নয়, তারা এর পরেও মুসলমানদের সাথে বাক-বিতন্ডা শুরু করে দিতো। নব মুসলিমদের পেছনে আদা পানি খেয়ে লেগে যেতো, তাদেরকে নানা ভাবে জালা-যন্ত্রণা দিতো। শান্তিতে ঘরে থাকতে দিতো, না সমাজে থাকতে দিতো। তাদের উদ্দেশ্যেই ছিলো এই যে, মুহাম্মদ (সাঃ) থেকে তাদেরকে দূরে সরিয়ে দেয়া। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে তৎকালীন ইহুদী নাসারারা এই বলে দাবী করতো যে, আমাদের নবী তোমাদের নবীর আগে এসেছে এবং আমাদের কিতাব তোমাদের কেতাবের আগে অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং আমাদের ধর্ম তোমাদের ধর্ম হতে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। কেউ কেউ বলেছেন এই বিষয়টি কোরাইশ কাফেরদের উথাপিত বলে বর্ণিত হয়েছে। কেননা, তারা নিজেদেরকে প্রাচীন ধর্মের অনুসারী বলে মনে করতো।

আল কুরআনের উল্লেখিত আয়াত সমূহ বর্ণনা করছে যে, ইসলাম ও কুরআনের আবেদন মানুষের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছে এবং স্বয়ং তোমাদের জ্ঞানী-গুণী ও ন্যায়পন্থী লোকেরাও মুসলমান হয়ে গেছে। সুতরাং এখন তোমাদের দ্বীন-এর

ব্যাপারে বাক-বিতন্ডা করা অসার ও পথভ্রষ্টতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তোমাদের এই দাবী আল্লাহ্র কাছে বাতিল এবং অগ্রহণযোগ্য। তোমরা যদি এই দ্বীন না মান তাহলে তোমাদের উপর দুনিয়ায় গযব পড়বে এবং আখে-রাতেও তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে।

শিক্ষা ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা। এতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনাদের সামনে সূরা শু'রা-র ১৩-১৬ নম্বর আয়াত সমূহের বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেশ করলাম। এখন অত্র আয়াতগুলো থেকে আমদের জন্য যেসব শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে তা নিম্নে উল্লেখ করছি।

● দ্বীন ইসলামই হচ্ছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে একমাত্র মনোনীত জীবন বিধান একথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করা।

● সকল নবীর দ্বীন একই দ্বীন ছিলো। পৃথক পৃথক নবীর জন্য পৃথক পৃথক দ্বীন ছিলো না একথাটিও অকাট্যভাবে বিশ্বাস করা।

● দ্বীনের যেসব বিধি-বিধান, আইন-কানুন যাকে শরীয়াত বলা হয় তা সকল নবীর জন্য একই ছিলো। তবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছুটা তারতম্য ছিলো মাত্র।

● আয়াতে উল্লেখিত পাঁচজন বিশেষ নবী-রাসূলসহ সকল নবী-রাসূলগণকে একই দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য মহান আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই নির্দেশ মোতাবেক সকল নবী-রাসূলগণই দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। সুতরাং সর্বশেষ নবীর উম্মাত হিসেবে আমাদেরকেও আল্লাহ্র নবীর রেখে যাওয়া দ্বীন যা কুরআন এবং হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে তা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণ-পণ চেষ্টা চালাতে হবে।

● অতীতে যেমন কাফের,মুশরিক, ইহুদী এবং খৃষ্টানেরা দ্বীনের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি করে মানুষকে বিভ্রান্ত করে দ্বীন প্রতিষ্ঠা থেকে দূরে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলো। আমরাও যেন অনুরূপভাবে দ্বীনের ব্যাপারে মতপার্থক্য সৃষ্টি করে দ্বীন প্রতিষ্ঠা থেকে দূরে সরে না যায়। এই জন্য জেনে নেওয়া দরকার দ্বীন কি এবং দ্বীনের মধ্যে যে শরীয়াত আছে তাও বা কি ? কেননা, ইসলাম বিদ্বেষী পাশ্চত্যবাদীদের দ্বীনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী বর্তমানে আমাদের দেশ সহ সারা বিশ্বের নামধারী মুসলমানেরা ধর্ম এবং রাজনীতিকে পৃথক করে দিয়ে আল্লাহ্র মনোনীত পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা দ্বীন ইসলামকে খন্ডিত করে দিয়েছে।

● মক্কার মুশরিকদের জন্য যেমন পরিপূর্ণ দ্বীনের দাওয়াত গাত্রদাহ ও অসহনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। বর্তমানে এবং ভবিষ্যতেও এসব স্বার্থবাদী কাফের

মুশরিকদের মতো অনেকের জন্যই তা অসহনীয় এবং গাত্রদাহের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তাদের এই অসহনীয় এবং গাত্রদাহের কারণে দ্বীনের দাওয়াত বন্ধ করা যাবে না।

● আল্লাহ্‌র মনোনীত এবং বাছাইকৃত বান্দায় পরিণত হওয়ার জন্য প্রতিটি মুসলমানদের আল্লাহ্‌মুখী হয়ে যাওয়া প্রয়োজন। কেননা যে আল্লাহ্‌মুখী হতে চায় না বা হয় না, আল্লাহ্ তাকে জোর করে আল্লাহ্‌মুখী বানান না। এটা আল্লাহ্‌র চিরাচরিত সুন্নত।

● মক্কার কাফের মুশরিকেরা আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) এবং আসমানী কিতাব আল-কুরআন এর মাধ্যমে ইলম বা জ্ঞান আসার পরই দ্বীন সম্পর্কে যেমন তারা তর্ক-বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিলো এবং নব মুসলিমদেরকে ঘরে-বাইরে উত্যক্ত করছিলো এটা তাদের জন্য অত্যন্ত বাড়াবাড়ি ছিলো। বর্তমানে ওহীর জ্ঞান আল-কুরআন আমাদের সামনে উপস্থিত। সুতরাং অহীর এই নির্ভুল জ্ঞান পাবার পর দ্বীনের ব্যাপারে আর তর্ক-বিতর্ক সৃষ্টি করা সমীচীন নয় এবং ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে ঘরে-বাইরে জ্বালাতন করে বাড়াবাড়ি করাও সঠিক নয়।

● যারা আল্লাহ্‌র দ্বীনের ব্যাপারে বিতর্ক সৃষ্টি করে। দ্বীনের অনুসারীদের প্রতি যুলুম-নির্যাতন করে, আল্লাহ্ তাদের এই আচরণের জন্য তাৎক্ষণিক ভাবে শাস্তি দিতে পারতেন, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা পরীক্ষার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত এর ফায়সালা স্থগিত করে রেখেছেন।

● পূর্বের নবীর উপর অবতীর্ণ কিতাব সম্পর্কে যেমনভাবে পরবর্তী নবী এবং কিতাবের উত্তর সূরীরা সন্দেহ-সংশয় পোষণ করতো, অনুরূপ ভাবে আমরা যেন অতীতের আসমানী কিতাব সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয় পোষণ না করি।

● ১৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) কে আল্লাহ্ তাআলা যেভাবে দশটি বিধানের আদেশ বা উপদেশ দিয়েছেন, আমরাও যেন উক্ত আদেশ বা উপদেশ গুলোকে আমাদের জন্য উপদেশ মনে করে আমল করি। যেমন–

১. বিরোধী শক্তির কাছে তাওহীদের দাওয়াত কঠিন মনে হলেও দাওয়াতী কাজ ছেড়ে না দিয়ে উপর্যপুরি দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যাওয়া।

২. আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যেভাবে দ্বীনের প্রতি অবিচল থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেভাবে অবিচল এবং অটল থাকা।

৩. দ্বীনের প্রচার করতে যেয়ে কে কি বললো না বললো সেদিকে না খেয়াল করা, বরং দ্বীনের প্রচারের যে দায়িত্ব রয়েছে তা দুর্বার গতিতে চালিয়ে যাওয়া।

৪. আল্লাহ্‌র ঘোষণা অনুযায়ী সকল আসমানী কিতাবকে বিশ্বাস করা এবং কোন কিতাবের ব্যাপারে সংশয় সন্দেহ পোষণ না করা।

৫. সকল ব্যাপারে এবং সকল ক্ষেত্রে– তা দ্বীনের ব্যাপারে হোক, অথবা মানুষের পরস্পরের মধ্যে দন্দ্ব-কলহের ব্যাপারে হোক, কিংবা হক বা সততার ব্যাপারে হোক, অথবা মানুষের অধিকারের ব্যাপারে হোক, কিংবা বিচার-আচারের ক্ষেত্রে হোক, সকল ব্যাপারে যেন আমরা ন্যায় বিচার বা ইনসাফ কায়েম করতে পারি।

৬. একথা মনে করে নেওয়া যে আল্লাহ্ আমাদের সকলের রব, পালনকর্তা।

৭. আপন আপন কর্মের প্রতিফল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ভোগ করবে। একজনের কর্ম-ফল অন্যজন ভোগ করবে না। প্রত্যেককেই আপন আপন হিসাব দিতে হবে।

৮. স্পষ্টভাবে সত্য প্রমাণিত এবং প্রকাশিত হওয়ার পর অহেতুক তর্ক-বিতর্কে জড়িয়ে শত্রুতা সৃষ্টি না করা।

৯. একথা মনে রাখতে হবে যে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ আমাদের সকলকেই একত্রিত করবেন এবং প্রত্যেকের ভাল-মন্দ কাজের প্রতিদান-প্রতিফল দেবেন।

১০. একথাও স্মরণ রাখা যে, আমরা যে যাই করিনা কেন এবং যে যেখানেই থাকি না কেন, আমাদের সকলকেই একদিন তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।

একবার আল্লাহ্‌র দ্বীন যেনে বুঝে মেনে নেয়ার পর সে বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করা সমীচীন নয়। আর আল্লাহ্‌র কাছে এটা গ্রহণযোগ্যও নয়। যারা এ কাজ করবে আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে দুনিয়াতে দিবেন গযব এবং আখেরাতে দিবেন চরম শাস্তি।

আহ্বান ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত সূরা শু'রা-র ১৩-১৬ আয়াত সমূহের যে ব্যাপক ব্যাখ্যা এবং শিক্ষা পেশ করলাম এতে যদি আমার অজান্তে কোন বিষয়ে বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, তার জন্য মহান আল্লাহ্‌র কাছে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর এই আয়াতগুলোতে আমাদের জন্য যেসব শিক্ষা রয়েছে তা যেন বাস্তব জীবনে আম'ল করতে পারি সেই তাওফীক কামনা করে আমি আমার দারস শেষ করছি। অয়া আখেরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন।

চার

ঈমানের পরীক্ষা দিয়েই জান্নাতে যেতে হবে

(সূরা আনকাবুত-১-৭)

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْم
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِا للّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْم
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلٓمّٓ- اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ- وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ- اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّسْبِقُوْنَا ط سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ- مَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ ط وَهُوَا لسَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ- وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ ط اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ- وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِىْ كَا نُوْا يَعْمَلُوْنَ-

সরল অনুবাদ ঃ ইরশাদ হচ্ছে- (১) আলিফ-লা-ম মী-ম। (২) মানুষ কি মনে করে নিয়েছে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' একথা বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে ? আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না ? (৩) অথচ আমি তো ইতিপূর্বে যেসব লোক অতিক্রান্ত হয়ে গেছে তাদেরকেও পরীক্ষা করেছি। আল্লাহ্‌কে তো অবশ্যই জেনে নিতে হবে, কারা সত্যবাদী, আর কারা মিথ্যাবাদী। (৪) যারা মন্দ বা খারাপ কাজ করে তারা কি মনে করে যে, তারা আমার হাত থেকে রেহায় পেয়ে যাবে ? তারা খুব ভুল ও খারাপ ফায়সালাই করছে। (৫) যে কেউই আল্লাহ্‌র স্বাক্ষাৎ কামনা করে, (তাদের

জেনে রাখা উচিত) আল্লাহ্‌র সেই নির্ধারিত সময় অবশ্যই আসবে। আর আল্লাহ্ সবকিছু শুনেন এবং সবকিছু জানেন। (৬) যে যুদ্ধ সংগ্রাম করে সে নিজেরই কল্যাণের জন্য করে। আল্লাহ্ বিশ্ববাসী থেকে বে-পরওয়া। (৭) আর যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে, আমি অবশ্যই তাদের মন্দ কাজগুলো তাদের থেকে দূর করে দেব এবং তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের উৎকৃষ্টতম প্রতিদান দেব।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ اَحَسِبَ النَّاسُ -লোকেরা কি হিসাব বা মনে করে নিয়েছে ? اَنْ يُّتْرَكُوْٓا -তারা অব্যাহতি বা ছাড়া পেয়ে যাবে ? يَّقُوْلُوْٓا- -তারা বলে বা বলবে। اٰمَنَّا -আমরা বিশ্বাস করি। وَهُمْ-আর তাদেরকে। لَايُفْتَنُوْنَ -পরীক্ষা করা হবে না। وَلَقَدْ -অথচ নিশ্চয়ই। فَتَنَّا- -আমরা পরীক্ষা করেছি। اَلَّذِيْنَ -যারা। مِنْ-হতে বা থেকে। --قَبْلِهِمْ-তাদের পূর্বের (লোকদের)। فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ -আল্লাহ্ অবশ্যই জেনে বা দেখে নেবেন। صَدَقُوْا -সত্য বলেছে। اَلْكٰذِبِيْنَ -মিথ্যাবাদীদেরকে। اَمْ حَسِبَ -তারা কি হেসাব বা মনে করেছে ? يَعْمَلُوْنَ- -তারা কাজ করেছে। سَيِّاٰتِ -খারাপ বা মন্দ। يَّسْبِقُوْنَ -তারা আমাকে ছেড়ে বা অতিক্রম করে যাবে। سَآءَ -কত খারাপ বা মন্দ। -يَحْكُمُوْنَ مَا -যা তারা ফায়সালা করেছে। مَنْ كَانَ -যে কেউ। يَرْجُوْا -তারা কামনা করে। لِقَآءَ اللّٰهِ -আল্লাহ্‌র স্বাক্ষাতের। فان-অতঃপর নিশ্চয়ই। اجل الله -আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সময়। لَاٰتٍ- অবশ্যই আসবে। وَهُوَ -এবং তিনিই। السَّمِيْعُ -সবকিছু শুনেন। الْعَلِيْمُ- -সবকিছু জানেন। وَمَنْ এবং যে কেউ।

جَاهَدَ -জিহাদ বা চেষ্টা সংগ্রাম করে। فَإِنَّمَا -শুধুমাত্র। يُجَاهِدُ -সে জিহাদ বা চেষ্টা সংগ্রাম করে। لِنَفْسِهِ-সে তার নিজের (কল্যাণের) জন্য। إِنَّ-নিশ্চয়ই। لَغَنِيٌّ -অবশ্যই ধনী বা মুখাপেক্ষীহীন। الْعٰلَمِيْنَ-বিশ্ব জাহানের। وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا-এবং যারা বিশ্বাস করে। وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ -এবং যারা সৎ কর্ম করে। لَنُكَفِّرَنَّ -অবশ্যই আমি দূর করে বা মিটিয়ে দেব। عَنْهُمْ-তাদের থেকে। سَيِّاٰتِهِمْ-তাদের দোষ বা মন্দগুলো। لَنَجْزِيَنَّهُمْ -অবশ্যই তাদেরকে আমরা প্রতিদান দেব। اَحْسَنَ -অতি উত্তম। كَانُوْا-তারা করতেছিলো। يَعْمَلُوْنَ-তাদের আমল বা কাজের।

সম্বোধন ঃ দারসে কুরআন মাহফিলে/অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় দ্বীনদার/ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ভায়েরা/বোনেরা! আসসালামু আলাইকুম। আমি আপনাদের সামনে দারস পেশ করার জন্য পবিত্র কালামে হাকীম আল কুরআনের সূরা আনকাবুতের-১-৭ আয়াত পর্যন্ত তেলাওয়াত ও সরল অনুবাদ পেশ করেছি। আল্লাহ্ তাবারাক ওয়া তায়ালা যেন আমাকে আপনাদের সামনে সঠিকভাবে দারস পেশ করার তাওফীক দান করেন। 'অমা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ'।

সূরার নামকরণ ঃ অত্র সূরার চতুর্থ রুকুর ৪১ নম্বর আয়াতে উল্লেখিত الْعَنْكَبُوْتِ- (আনকাবুত) শব্দটিকে এই সূরার নাম হিসেবে বাছাই করা হয়েছে। الْعَنْكَبُوْتِ শব্দটির অর্থ ঃ "মাকড়সা"। তবে এই নামকরণ করা হয়েছে সূরার কোন শিরোনাম হিসেবে নয়। বরং আল কুরআনের অন্যান্য সূরার ন্যায় এটিও 'প্রতীকী' বা 'চিহ্ন' হিসেবেই করা হয়েছে। তবে যা কিছুই করা হয়েছে তা অহীর নির্দেশেই করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর নিজস্ব কোন মনগড়া হিসেবে নামকরণ করা হয়নি। আল কুরআনে সূরার নামকরণ সংক্রান্ত বিস্তারিত বর্ণনা দারসে কুরআন 'প্রথম খন্ডে' উল্লেখ করা হয়েছে।

সূরাটি নাযিল বা অবতীর্ণ হবার সময়কাল ঃ আলোচ্য সূরাটি মাক্কী সূরা।

তবে কোন কোন তাফসীরকারক সূরার প্রথমে মুনাফেকদের প্রসঙ্গ উল্লেখের কারণে সূরার প্রথম দশটি আয়াত মাদানী বলে মনে করেন। আর বাকী আয়াতগুলো মাক্কী। কেননা, মুনাফেকতো মক্কায় নয়, মদীনায় দেখা দিয়েছিলো। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এটা সঠিক নয়। তার কারণ, এ সূরায় যেসব মুনাফেক লোকদের কথা বলা হয়েছে তারা তো সেই মুনাফেক যারা মক্কায় কাফেরদের যুলুম-অত্যাচার এবং কঠিন শারিরীক নির্যাতনের ভয়ে মুনাফেকী আচরণ অবলম্বন করেছিলো। আর এ ধরনের মুনাফেকী মক্কাতেই হতে পারতো মদীনায় নয়। অপর কিছু তাফসীরকারক এ সূরায় মুসলমানদেরকে হিজরাত করতে বলা হয়েছে দেখে এ সূরাটি মাক্কী জীবনের সর্বশেষ সূরা বলে মনে করেন। অথচ মদীনায় হিজরাত করার আগে তো মুসলমানেরা হাবশায়ও হিজরাত করেছিলেন। এসব ধারণা বশতঃ বক্তব্যের মূলে কোন হাদীসের প্রমাণ নেই। আসলে সূরাটি উল্লেখিত বিষয় ও বক্তব্যের উপর ভিত্তি করেই এসব ধারণা প্রকাশ করা হয়েছে। যদি আমরা সূরাটির সম্পূর্ণ বিষয়াদি সম্পর্কে সামগ্রিক ভাবে চিন্তা বিবেচনা করি তাহলে বুঝা যায় যে, সূরাটি মাক্কী এবং মাক্কী জীবনের শেষে নয় বরং হাবশায় হিজরাতের আগে অবতীর্ণ বলেই প্রমাণিত হয়। কেননা, সূরার ৫৬-৬০ আয়াত হতে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, এ সূরাটি মুসলমানদের হাবসায় হিজরাত করার কিছু পূর্বে নাযিল হয়েছিলো। (তার পরও আল্লাহ্ পাকই বেশী ভাল জানেন)।

সূরাটির মূল বক্তব্য ও আলোচ্য বিষয় ঃ এ সূরাটি পড়লে মনে হবে যে, সূরাটি যে সময় নাযিল হয়েছিলো তখন মক্কায় মুসলমানদের উপর কঠোর নির্যাতন চালানো হচ্ছিল। কাফেরেরা পূর্ণ শক্তিতে ইসলামের বিরোধীতা করছিলো। নব মুসলিমদের উপর চরম যুলুম-নির্যাতন চালাতো। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তাআলা এ সূরাটি নাযিল করেন। এই সূরার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা একদিকে সত্যিকার নিষ্ঠাবান ঈমানদার লোকদের দৃঢ় সংকল্প, অনড় মনোবল, সাহস-হিম্মত ও অনমনীয় মনোবল সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। অপর দিকে দূর্বল ঈমানদার লোকদেরকে লজ্জা দিতে চেয়েছেন। সেই সংগে মক্কার কাফেরদেরকে কঠোর ভাষায় শাসন করা হয়েছে। মক্কায় কাফের লোকেরা ঈমানদার যুবকদের ও নব মুসলিমদেরকে যেসব প্রলোভন এবং ভয়-ভীতি দেখিয়ে দমন করতে চেয়েছিলো আর আখেরাতের সকল জবাবদেহীতার দায়-দায়িত্ব নিজের কাঁধে পেতে নিতে চেয়েছিলো এবং মুহাম্মদ (সঃ) এর দল ত্যাগের জন্য যেসব চেষ্টা-ফিকির করেছিলো তার জবাব দেয়া হয়েছে।

তাছাড়া এই সূরায় অতীতের নবীদের যেসব কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে তাতেও ফুটে উঠেছে যে, অতীতের নবী-রাসূলদের উপর কঠোর এবং কঠিন বিপদ-আপদ নেমে এসেছে এবং দীর্ঘদিন ধরে তাদের উপর যুলুম-নির্যাতন চলেছে, তারপরও তারা আল্লাহ্‌র উপর টিকে থেকেছে এবং এক পর্যায়ে তাদের উপর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সাহায্য নেমে এসেছে। অতএব আপদ-বিপদ এবং যলুম-নির্যাতনের জন্য ঘাবড়ানো এবং ভীত হওয়ার কোন কারণ নেই। আল্লাহ্‌র সাহায্য অবশ্যই আসবে। তবে কঠিন পরীক্ষার একটা পর্যায় অতীক্রম করার পরই আল্লাহ্‌র সাহায্য আসবে। এর দ্বারা মক্কার মুসলমানসহ যুগে যুগে সকল মুমিন মুসলমানদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এই সূরার শেষের দিকে মুসলমানদেরকে আরও হেদায়াত করা হয়েছে যে, যুলুম ও নির্যাতন যদি তোমাদের পক্ষে সহ্য করা একান্তই অসম্ভব হয়েই পড়ে, তবে ঈমান ত্যাগ করার পরিবর্তে ঘর-বাড়ী এবং দেশ ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাও। আল্লাহ্‌র রাজ্যতো বিশাল। যেখানেই আল্লাহ্‌র বন্দেগী বিনা বাধায় করতে পারবে সেখানে চলে যাবে। কিন্তু তোমাদের ঈমান ত্যাগ করার কোন সুযোগ নেই।

দারসের জন্য তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর মূল বক্তব্য ঃ ঈমানের দাবী করলেই ঈমানদার হওয়া যায় না। ঈমানের দাবী পূরণের জন্য অবশ্যই আল্লাহ্ পরীক্ষা করবেন। মক্কার এই মুসলমানদের পূর্বে অতীতের নবী রাসূল এবং ঈমানদারদেরকেও পরীক্ষা করা হয়েছে। কেননা, ঈমানের প্রকৃত দাবীদার কারা আর কারা নয়, তার সত্য-মিথ্যা যাচাই করার প্রয়োজন রয়েছে। মন্দ কাজ করে আল্লাহকে ছেড়ে পার পেয়ে যাবে এটাও মনে করা সঠিক নয়। একটা নির্ধারিত সময়ই আল্লাহ্‌র সাথে তাদেরস্বাক্ষাৎ ঘটবে। আর যারা যুদ্ধ-জিহাদ, লড়াই-সংগ্রাম করে তারা নিজেদের কল্যাণের জন্যেই করে। কেননা, এসব কিছুর আল্লাহ্‌র কোন প্রয়োজন নেই। আর ঈমানদারদের মধ্যে যারা ভাল–নেক কাজ করবে তাদেরকে আল্লাহ্ দুনিয়া এবং আখেরাতে উত্তম প্রতিদানও দেবেন। ১-৭ নম্বর আয়াতসমূহে এসব কথাই বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনাদের সামনে দারসের জন্য তিলাওয়াতকৃত সূরা এবং আয়াতগুলোর প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করলাম। এখন আমি আপনাদের সামনে আয়াতে উল্লেখিত গুরুত্বপূর্ণ বাক্য এবং শব্দের ব্যাখ্যা পেশ করছি। সূরার শুরুতে মহান আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

الٓمٓ- 'আলীফ, লা-ম, মী-ম,' সূরা বাকারার মত উল্লেখিত এই সূরার الٓمٓ

এই তিনটি অক্ষরকে 'হুরুফে মুকাত্তায়াত' বা 'বিচ্ছিন্ন অক্ষর' বলা হয়ে থাকে। পবিত্র কুরআনের সর্বমোট ২৯টি সূরার প্রথমে এ ধরনের 'বিচ্ছিন্ন অক্ষর' ব্যবহার করা হয়েছে। আল কুরআনে দু'ধরনের আয়াত বর্ণিত হয়েছে, তার একটি 'মুহকামাত' স্পষ্ট বা প্রকাশ্য অর্থবিশিষ্ট এবং অপরটি 'মুতাসাবিহাত' অস্পষ্ট বা অপ্রকাশ্য অর্থবিশিষ্ট। এই অক্ষরগুলো হলো 'মুতাসাবিহাত'। এসব বিচ্ছিন্ন এর্বং অস্পষ্ট অক্ষরের প্রকৃত অর্থ একমাত্র আল্লাহ্ পাকই ভাল জানেন। তবে কোন কোন তাফসীরকারক ا দিয়ে أَنَا (আমি) ل -দিয়ে اَللّٰهُ এবং م- দিয়ে -أَعْلَمُ (বেশী জানি) অর্থাৎ أَنَا اللّٰهُ أَعْلَمُ "আমি আল্লাহ্ সবচেয়ে বেশী জানি'। আবার কোন কোন তাফসীর কারকের মতে ا দিয়ে اَللّٰهُ (আল্লাহ্) ل-দিয়ে جِبْرَائِيلُ (জিবরাঈল) এবং م দিয়ে (মুহাম্মাদ সাঃ) কে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নিকট হতে জিবরাঈল (আঃ) এর মাধ্যমে মুহম্মদ (সাঃ) এর কাছে এই পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। এছাড়া আরো অনেক মনীষী ব্যক্তি এই অক্ষরগুলোর অর্থ সম্পর্কে বিভিন্ন মত পেশ করেছেন। তবে এসব অর্থের সবগুলোই অনুমান ভিত্তিক। ইসলামী শরীয়তে এগুলোর একটিও সঠিক ও নির্ভরযোগ্য বলে গৃহীত হয়নি। কেননা, এই অক্ষরগুলোর অর্থ হুযুর (সাঃ) উল্লেখ করে যাননি। সুতরাং এ অক্ষরগুলোর অর্থ জানার জন্য বাড়াবাড়ি না করাই ভাল। প্রকৃত ঈমানদারদের জন্য এটা শোভনীয় নয়। অতঃপর পরবর্তী আয়াতে মহান আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوْا أَنْ يَقُوْلُوْا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ-

লোকেরা কি এই মনে করে নিয়েছে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' একথা বল-লেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে ? আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না ?

সূরার এই দ্বিতীয় আয়াতটির ব্যাখ্যার সুবিধার্থে জেনে নেয়া ভাল যে, কোন প্রেক্ষাপটে আল্লাহ্ তাআলা এই কথাগুলি বলেছিলেন। তখন মক্কার অবস্থা এই ছিল যে, যেই ইসলাম কবুল করে রাসূলের দলে যোগদান করতো তার উপরই চরম বিপদ-আপদ ও যুলুম নির্যাতনের পাহাড় ভেঙ্গে পড়তো। নওমুসলিম যদি

গরীব কিংবা দাস-দাসী হতো, তা হলে তাকে অমানুষিক ভাবে মারপিট করা হতো এবং অসহনীয় জ্বালা-যন্ত্রণা দেয়া হতো। ছোট দোকানদার বা কারিগর কিংবা দিনমজুর ধরনের লোক হলে তার রুজি-রোজগারের সকল পথ বন্ধ করে দেয়া হতো। আর যদি কোন ধনাঢ্য বা প্রভাবশালী পরিবারের লোক হতো তাহলে তার নিজের বংশ বা পরিবারের লোকেরা তাকে নানা ভাবে কষ্ট-ক্লেশ দিত এমনকি তার গোটা পরিবারকে ধ্বংস করে দিত। এরূপ অবস্থায় মক্কা নগরীর গোটা পরিবেশই ভয় ও ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়েছিলো। এই কারণে অনেকে নবী করীম (সাঃ) এর নবুয়তের সত্যতার প্রতি বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও ঈমান আনতে ভয় পেত। এই অবস্থায়ও কিছু লোক যখন ঈমান আনতো তখন তাদের উপর অসহনীয় যুলুম-নির্যাতন নেমে আসতো, ফলে তারাও সাহস হিম্মত হারিয়ে ফেলে কাফেরদের সামনে নতি স্বীকার করে বসতো। এই অবস্থায় মযবুত ঈমানদার লোকদের মানবীয় প্রকৃতির স্বাভাবিক দাবীতে তাদেরও মধ্যে প্রায়ই কঠিনভাবে প্রাণ কেঁপে উঠতো, যদিও তারা ঈমানের দৃঢ় সংকল্প থেকে দূরে সরে যায় নাই।

উদাহরণ হিসেবে কর্মকার হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত এর বর্ণনা এখানে উল্লেখ করা যায় এবং সেই সময় পাক্কা মুমিনদের অবস্থা কেমন হয়ে পড়েছিলো তাও স্পষ্ট হয়ে উঠে। তিনি বলেন ঃ যে সময় কাফের মুশরীকদের যুলুম-অত্যাচার ও নির্যাতনে আমাদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলো, তখন একদিন আমি রাসূলে কারীম (সাঃ) এর সামনে উপস্থিত হলাম, তখন দেখি তিনি কাবা ঘরের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছেন। আমি তাঁর কাছে আরয করলাম 'হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনি কি আমাদের (এই যুলুম-অত্যাচার থেকে উদ্ধারের) জন্য দোআ করেন না' ? আমার এই কথা শুনা মাত্রই নবী করীম (সাঃ) এর মুখমন্ডল রক্তবর্ণ ধারণ করলো এবং দেয়ালে হেলান দেয়া থেকে সোজা হয়ে বসে বল-লেন ঃ শুনো! তোমাদের পূর্বে যেসব ঈমানদার লোকেরা চলে গেছে, তাদের উপর তো এর থেকেও অনেক বেশী কঠিন ও কঠোর যুলুম-নির্যাতন করা হয়েছে। তাদের মধ্যে কাউকে তো মাটিতে গর্ত খুঁড়ে কোমর পর্যন্ত পুঁতে মাথার উপর দিয়ে করাত চালিয়ে দ্বিখন্ডিত করে দেয়া হয়েছে। আবার কারও হাড়ের গোশত লোহার চিরুনী দিয়ে চেঁছে ফেলে দেয়া হয়েছে। আর এসবের মূলে একটাই কারণ ছিলো, তা হলো লোকদেরকে ঈমান থেকে ফিরে রাখা। (শুনো খাব্বাব!) আল্লাহ্‌র কসম এই কাজ– এই সাধনা (একদিন) পূর্ণ হবেই। এক সময় এমন হবে যে, এক ব্যক্তি একাই 'সানয়া' হতে 'হাজরা মউত' পর্যন্ত

(বাংলাদেশে যেমন ব্যাপক দুরত্বের জন্য বলা হয়ে থাকে 'টেকনাফ' থেকে 'তেঁতুলিয়া'। অর্থাৎ মক্কার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত) নির্বিঘ্নে ও নিশ্চিন্তে সফর করবে এবং এই সময় আল্লাহ্‌র ভয় ছাড়া আর কারও ভয় তাকে করতে হবে না। '(বুখারী, আবু দাউদ, নাসাঈ)

এই দৈহিক নির্যাতন, মানসিক অস্থিরতা এবং কাতর অবস্থাকে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পানি দিয়ে ঠান্ডা করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তাআলা তৎকালীন মক্কার ঈমানদার সহ যুগে যুগে সকল ঈমানদারকে বুঝাচ্ছেন এই বলে যে,

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ-

লোকেরা কি মনে করে নিয়েছে যে, ঈমান এনেছি বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে আর পরীক্ষা করা হবে না ?

অর্থাৎ দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা সম্পর্কে আমার যেসব ওয়াদা রয়েছে, তা কোনো ব্যক্তি ঈমানের মৌখিক দাবী করলেই পাবার অধিকারী হতে পারে না। বরং ঈমানের দাবীদার প্রত্যেককেই অবশ্যই কঠিন পরীক্ষায় পাশ করতে হবে এবং এভাবেই কঠিন পরীক্ষার মাধ্যমে নিজেদের ঈমানের সত্যতার প্রমাণ পেশ করতে হবে। আমার জান্নাত এতো সস্তা ও সহজলভ্য নয়, দুনিয়ায় আমার দান ও অনুগ্রহ লাভও এতো সহজে সম্ভব নয় যে, তোমরা মুখে ঈমানের কথা প্রকাশ করবে আর আমি অমনি সেইসব কিছুই তোমাদেরকে দান করে দেব। সেসব পেতে হলে পরীক্ষা অতি বড় শর্ত। সুতরাং এসব পেতে হলে তোমাদেরকে আমার জন্য কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, জান ও মালের ক্ষতি স্বীকার করতে হবে, নানা ধরনের যুলুম-নির্যাতন সহ্য করতে হবে। বিপদ-আপদ, বালা-মুসীবত, ঝামেলা-ঝুঁকি থেকে উদ্ধারের জন্য কঠোর এবং কঠিন ভাবে পাঞ্জা লড়তে হবে। তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে একদিকে ভয়-ভীতি দেখিয়ে আর অন্যদিকে দেখানো হবে লোভ-লালসা। আমার সন্তুষ্টির জন্যই তোমাদের অতি প্রিয় জিনিস কুরবান করতে হবে। যেসব কষ্ট তোমরা সহ্য করতে পারো না, তা আমারই জন্য তোমাদেরকে অকাতরে বরদাস্ত করতে হবে। এ সবের ভিতর দিয়েই আমার প্রতি ঈমানের যে দাবী তোমরা করছো তা সত্য না মিথ্যা, খাঁটি না কৃত্রিম তা প্রকাশ পেয়ে যাবে।

প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! বর্তমানে আমরা যারা ঈমানের দাবীদার আমরা কি মক্কার সেইসব খাঁটি মুমিনদের মতো পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছি ? আমরা কি

কঠিন যুলুম ও নির্যাতনের স্বীকার হয়েছি ? আমরা কি মানুসিক ও দৈহিক যন্ত্রণা ও নির্যাতনের মুখোমুখি হয়েছি ? আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, আমাদের চাকরী, আমাদের আয়-রোজগারের কি পথ বন্ধ হয়ে গেছে ? আমাদের পরিবার এবং বংশের লোকেরা কি আমাদেরকে পরিবার ও বংশ থেকে বয়কট করেছে ? আমরা কি আল্লাহ্‌র জন্য সবকিছু ত্যাগ করতে পেরেছি ? আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য কি দুনিয়ায় আমাদের প্রিয় জিনিসগুলো কুরবান করতে পেরেছি ? আমরা ঈমানের যে দাবী করি তৎকালীন মক্কার ঈমানদারদের ঈমান ও জীবনের সাথে আমাদের মিলিয়ে দেখা উচিত। আমাদের দাবী সত্য না মিথ্যা তা যাচাই-বাচাই এর জন্য একটু আত্মসমালোচনা করে দেখা বাঞ্ছনীয়। অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি অসংখ্য ঈমানের দাবীদার পরীক্ষা তো দূরের কথা বরং বাতিল শক্তির সাথে হাত মিলিয়ে মুসলমানদের ক্ষতি করার জন্য খড়গহস্ত। আল্লাহ্‌র মহব্বত ভুলে গিয়ে দুনিয়ার মহব্বতে আমরা হাবুডুবু খাচ্ছি। আমরা মুনাফেকদের ঈমানের দাবীর মতো কেবল আমরা ইমানের দাবীই করে থাকি। কিন্তু আমাদের ঈমান যাচায়ের জন্য কোন পরীক্ষা দিতে আমরা রাজী নয়। সস্তা ঈমানের দাবী করে ঝুঁকি মুক্ত কিছু সস্তা আমল করে আমরা জান্নাত যেতে চাই। আয়াতের এই দাবী অনুযায়ী আমাদের এই দাবী মিথ্যা। আমরা সব ভন্ড ঈমানের দাবীদার। অথচ আল-কুরআনে আমরা দেখতে পায় যেখানেই ঈমানের কথা বলা হয়েছে সেখানেই পরীক্ষার কথা বলা হয়েছে।

ঈমানের এই পরীক্ষায় যখনই তাদের উপর বালা-মুসিবত ও দুঃখ-কষ্টের প্রচন্ড আঘাত এসেছে এবং মুসলমানেরা ভয়ে প্রকম্পিত হয়েছে, ভীত-সন্ত্রস্ত ও কাতর হয়ে পড়েছে, সেইসব ক্ষেত্রে আল-কুরআনে এসব পরীক্ষার কথা বলে দেয়া হয়েছে। মক্কা থেকে হিজরতের পর মদীনায় প্রাথমিক জীবনকালে যখন মুসলমানেরা আর্থিক সংকট, বাইরের শত্রুদের আক্রমণ এবং মদীনার ভিতরে ইহুদী ও মুনাফিকদের শয়তানী, দুষ্টামী ও দুস্কৃতির কারণে খুব বেশী কাতর হয়ে পড়েছিলো, তখন আল্লাহ্ তাআলা সূরা বাকারার ২১৪ নম্বর আয়াতে তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ

مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ۭ اَلَآ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ-

(হে মুমিনেরা!) তোমরা কি মনে করে নিয়েছ যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে অথচ তোমাদের সেই অবস্থা এখনও হয়নি যা তোমাদের পূর্ববর্তী ঈমানদার লোকদের হয়েছিলো। তাদের উপর এমন কঠোরতা করা হয়েছে এবং কষ্ট, নির্যাতন ও দুঃখ এসেছে যে তাদেরকে কাঁপিয়ে দেয়া হয়েছে। শেষ পর্যন্ত (বাধ্য হয়ে) তৎকালীন রাসূল এবং তাঁর সংগী-সাথীরা ফরিয়াদ করে উঠেছে, 'আল্লাহ্‌র সাহায্য কবে কখন আসবে!' (তখন তাদেরকে শান্তনা দিয়ে বলা হয়েছে যে) জেনে রাখ, আল্লাহ্‌র সাহায্য খুবই নিকটে।

অনুরূপভাবে ওহুদ যুদ্ধের পর মুসলমানদের উপর যখন আবার এক কঠিন বিপদ মুসীবতের সময় আসলো, তখন বলা হলো ঃ

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ-

তোমরা কি মনে করে নিয়েছো যে, তোমরা এমনিতেই বেহেশতে চলে যাবে? অথচ তোমাদের মধ্যে কে কে জিহাদে বীরত্ব ও সাহসের সাথে লড়াইকারী এবং কে কে ধৈর্য ধারণকারী; তা তো আল্লাহ্ এখনও (পরীক্ষা করে) দেখে নেননি। (আলে ঈমরান-১৪২)

এ সব অসংখ্য কুরআনের বাণীর মাধ্যমে যুগে যুগে সকল মুসলমানদের সামনে আল্লাহ্ তাআলা একটা মৌলিক সত্য বিষয় স্পষ্ট করে তুলতে চেয়েছেন যে, পরীক্ষা এমন একটা মানদন্ড, যাতে যাচাই করলে খাঁটি-অখাঁটি বা কৃত্রিম নিঃসন্দেহে প্রমাণ করা যায়। যা কৃত্রিম-অখাঁটি তা আপনা-আপনি আল্লাহ্‌র পথ হতে সরে দাঁড়ায়। আর খাঁটি ও আসলটাকে ছেঁটে ও বেছে নেওয়া যায়। সুতরাং আল্লাহ্ তাআলা প্রকৃত ও সত্যিকার ঈমানদার লোকদের জন্য যেসব নিয়ামত ও পুরস্কার ঠিক করে রেখেছেন, তা ঈমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ লোকেরাই পেতে পারবে। অতএব প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আমাদেরকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওয়াদাকৃত নিয়ামত ও জান্নাত লাভের জন্যে সদা-সর্বদা দুনিয়ার জীবনে ঈমানকে যাচাই-বাচাই-এর পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

অতঃপর পরবর্তী আয়াতের প্রথম অংশে মহান আল্লাহ্ তাআলা ঈমানদারদেরকে আশ্বাস দিয়ে বলছেন ঃ

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

অথচ আমি তো এদের পূর্বেকার সকল লোককেই পরীক্ষা করেছি।
অর্থাৎ মক্কার হে নির্যাতিত ঈমানদার লোকেরা! এটা কোন নতুন বিষয় নয় যে, কেবল তোমাদের প্রতিই এরূপ নতুন নীতি অবলম্বন করে পরীক্ষা করা হচ্ছে। আসলে এটা সঠিক নয়। ইতিহাসে এটা নতুন কোন সংযোজন নয়। চিরদিনই এরূপ করা হয়েছে। যে বা যারাই ঈমানের দাবী করেছে তাদেরকেই কঠিন অগ্নি পরীক্ষা দিতে হয়েছে। এমনকি নবীদেরকেও ছেড়ে দেওয়া হয়নি। হযরত নূহ নবীকে তাঁর নিজের সন্তান ও জাতির লোকেরা নবুয়ত মেনে না নিয়ে কঠিন জ্বালাতন করেছে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে দফায় দফায় পরীক্ষা করা হয়েছে। এমনকি টগবগে জলন্ত আগুনে তাকে নিক্ষেপ করা হয়েছে। হযরত ইউসুফ (আঃ) কে মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে জেলে-পুরে পরীক্ষা করা হয়েছে। হযরত মূসা (আঃ) কে ফেরাউনের দ্বারা চরম ভাবে নির্যাতিত হতে হয়েছে এবং নিজের দেশ থেকে বিতাড়িত হতে হয়েছে। হযরত লূত (আঃ)কেও তার নিজের পরিবার এবং জাতির লোকেরা মানসিক ভাবে নির্যাতন করেছে। হযরত আইয়ুব (আঃ)কে দীর্ঘ ১৮ বছর বালা-মুসিবত দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে। হযরত ঈসা (আঃ)কে তার জাতির লোকেরা হত্যার জন্য শুলে চড়িয়েছে। এমনি ভাবে বনী ঈসরাঈলের শত শত নবীকে যুলুম নির্যাতন করা হয়েছে। এমনকি হত্যা পর্যন্ত করা হয়েছে। কিন্তু কোন নবী বা পয়গম্বর এসব পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন নাই। প্রত্যেকেই আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা হিসেবে ধৈর্যের সাথে সবকিছু মোকাবেলা করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হাসিল করেছেন। সুতরাং হে মুমিনেরা, জেনে রাখ অতীতের ঈমানদার লোক এমনকি নবীদেরকেও যেহেতু ঈমানের পরীক্ষা থেকে ছাড় দেওয়া হয়নি এবং পরীক্ষার মাধ্যমেই তাদেরকে আল্লাহ্র নিয়ামত এবং জান্নাত দেয়া হয়েছে। অতএব তোমাদের আর কিইবা বিশেষত্ব রয়েছে যে, তোমাদের শুধু ঈমানের মৌখিক দাবীর দরুন কোনরূপ পরীক্ষা ছাড়াই সাহায্য ও বিজয় দান করবো এবং জান্নাত দিয়ে দেব ? আয়াতের পরবর্তী অংশে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ-

আল্লাহ্কে তো অবশ্যই জেনে বা দেখে নিতে হবে যে, কে ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী, আর কে মিথ্যাবাদী।

فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ - এর শাব্দিক তরজমা হলো ঃ 'অবশ্যই আল্লাহ্ জেনে নিবেন।' এ কথার দ্বারা কেউ প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে যে, কে খাঁটি ও সাচ্চা আর কে অখাঁটি, কৃত্রিম ও মিথ্যাবাদী তা তো আল্লাহ্ নিজেই জানেন। তাহলে আবার আল্লাহ্র জেনে নেয়ারই বা কি প্রয়োজন হতে পারে ? এর উত্তর এই যে, কোন লোকের মধ্যে হয়ত কোন কাজ করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা আছে, কিন্তু তা যতক্ষণ পর্যন্ত কার্যত প্রকাশিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ইনসাফ ও সুবিচারের দাবী অনুযায়ী সে কোন প্রকারের প্রতিদান হিসাবে পুরুস্কারও পেতে পারে না, শাস্তিও পেতে পারে না।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ধরুন ঃ এক ব্যক্তির মধ্যে আমানতদার হবার যোগ্যতা আছে, আর এক জনের মধ্যে রয়েছে খেয়ানতকারী হবার যোগ্যতা। এখন এই দুইজনের উপর পরীক্ষা না আসা পর্যন্ত একজনের আমানতদারী ও অপরজনের খিয়ানতকারী হিসেবে বিশ্বাস ভংগের 'গুনের' বাস্তব প্রকাশ ঘটা না পর্যন্ত আল্লাহ্ তাঁর গায়েবী ইলমের ভিত্তিতে একজনকে আমানত দারীর পুরস্কার এবং অপরজনকে খিয়ানতকারী হিসেবে শাস্তি দিয়ে দেবেন এটা আল্লাহ্র নীতির সম্পূর্ণ খেলাফ। সুতরাং আল্লাহ্ তায়ালা কারো ভাল গুন আছে জানার পরও বাস্তবে পরীক্ষার মাধ্যমে প্রকাশ না করে যেমন পুরস্কার দেন না। তেমনি কারও মধ্যে যে খারাপ গুন আছে জানার পরও তা কার্যত সংঘটিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি তাকে শাস্তিও দেন না। তাছাড়া এটাও একটা বিষয় তাহলো এই যে, সাধারণ মানুষ বাস্তব পরীক্ষার মাধ্যমেই কিন্তু ভাল-মন্দ জেনে থাকে। সুতরাং আল্লাহ্ জেনে থাকলেও সাধারণ মানুষের মাঝে তা প্রকাশের জন্যও সত্য-মিথ্যা যাচায়ের জন্য পরীক্ষা করে থাকেন। فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ এর শাব্দিক অর্থ 'আল্লাহ্ জেনে নিবেন' এর পরিবর্তে করা হয়েছে 'আল্লাহ্ দেখে নেবেন।' অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা মানুষের ভাল-মন্দ গুন জানার পরও ইনসাফ এবং নীতির দাবী অনুযায়ী বাস্তবে দেখে নেবেন বা যাচাই করে নেবেন।

অতঃপর মহান আল্লাহ্ তাআলা পরবর্তী আয়াতে বলেন ঃ

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّسْبِقُوْنَا ط سَاۤءَ مَا يَحْكُمُوْنَ

যে সব লোক মন্দ ও খারাপ কাজ করছে তারা কি একথা মনে করে নিয়েছে

যে, তারা আমার হাত থেকে রেহায় পেয়ে যাবে ? আসলে তারা খুব ভুল ও খারাপ ফয়সালাই করছে।

আয়াতের প্রথমাংশ اَلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ যারা বা যেসব লোক খারাপ বা মন্দ কাজ করছে। অর্থাৎ যারাই আল্লাহ্‌র নাফরমানী করে। কিন্তু এখানে বিশেষ ভাবে মক্কার কুরাইশ বংশের অত্যাচারী নেতাদের প্রতি লক্ষ্য করেই কথাটি বলা হয়েছে, যারা ইসলামের বিরোধীতায় এবং ইসলাম কবুলকারী মুসলমানদের উপর যুলুম অত্যাচার চালানোর ব্যাপারে খুবই অগ্রগামী ছিলো। যেমন– অলীদ ইবনে মুগীরা, আবু জেহেল, উৎবা, শাইবা, উকবা, হানযালা ইবনে মগীরা এর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই কথার পূর্বাপর বক্তব্যের প্রতি লক্ষ্য করলে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, মুসলমানদের কঠিন পরীক্ষায় ধৈর্য-সহ্য ও দৃঢ়তা দেখাবার উপদেশ দেবার পর যারা এই সত্য পথ যাত্রীদের উপর যুলুম-নির্যাতন চালাচ্ছে তাদেরকে সম্বোধন করে এখানে কঠোর ভাষায় প্রয়োজনীয় দু'একটি কথা বলে দেয়া হয়েছে।

اَنْ يَّسْبِقُوْنَا শব্দের মূল অর্থ হলো ঃ 'আমাকে ছাড়িয়ে যাবে' আবার এই অর্থও করা যেতে পারে যে, 'আমার পাকড়াও হতে বেঁচে কোথাও পালিয়ে যেতে পারবে।'

يَسْبِقُوْنَا "আমাকে ছেড়ে যাবে।" এটি দু'টি অর্থে ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রথম অর্থটি হলো ঃ আমি যা করতে চাই, রাসূলের আন্দোলনের সাফল্য ঘটাতে চাই– তা তো হতে পারবে না, আর যা এই লোকেরা আমার রাসূলকে পরাজিত করতে চায়, তা সফল হবে। আর দ্বিতীয় অর্থ হলো ঃ তারা যে (ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে) বাড়াবাড়ি করছে, আমি বুঝি তাদেরকে পাকড়াও করতে পারবো না। তারা পালিয়ে আমার হাতের নাগালের বাইরে চলে যাবে।

سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ "তারা বড়ই ভুল ও খারাপ ফায়সালাই করতেছে।" অর্থাৎ তারা তথা কাফের মুশরিকেরা মুসলমানদের উপর যুলুম-নির্যাতন করবে অথচ আমার হাতে ধরা পড়বে না, আমার ক্ষমতার বাইরে অবস্থান করবে এটা মনে করা বোকামীর পরিচয়। তাদের এই ধরনের মানসিকতার ফায়সালাটা আসলে বড়ই ভুল ও অন্যায়।

অতঃপর মহান আল্লাহ্ পরবর্তী আয়াতে উল্লেখ করে বলেন ঃ

مَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ اللّٰهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ–

যে কেউই আল্লাহ্র সাথে স্বাক্ষাৎ লাভের কামনা করে, (তাদের জেনে রাখা উচিত) আল্লাহ্র সেই নির্ধারিত সময় অবশ্যই আসবে। আর আল্লাহ্ সবকিছু শুনেন ও সবকিছু জানেন।

অর্থাৎ যে সব লোক পরকালীন জীবন আছে বলে বিশ্বাসই করে না, নিজেদের কৃতকর্মের জন্যে কারও কাছে জবাবদিহি করতে হবে বলে আদৌ বিশ্বাস করে না এবং নিজেদের কাজ-কাম সম্পর্কে তাদের কাছ থেকে কেউ কৈফিয়ত বা হিসাব-নিকাশ নিতে পারে এমন কোন শক্তি আছে বলেই মনে করে না, তাদের ব্যাপার তো সম্পূর্ণ আলাদা। সে নিজের গাফলতিতে পড়ে হাবুডুবু খেতে থাক এবং নিশ্চিন্তে যা ইচ্ছা তাই করতে থাকুক। সে তার নিজের চিন্তা ও কাজের ফল নিজেই পরিনামে ভোগ করবে। কিন্তু কথা হলো, যারা একদিন আল্লাহ্র সামনে হাজির হতে হবে এবং নিজেদের আমলের অনুপাতে পুরস্কার বা শাস্তি ভোগ করতে হবে বলে আশা পোষণ করে, তাদের এটা মনে করা উচিত নয় যে, মৃত্যু বুঝি অনেক দূরে। বরং মৃত্যুকে তো খুবই নিকটে উপস্থিত বলে মনে করা উচিত।

তাদের তো মনে করা উচিত যে, দুনিয়ার এই জীবন, কাজের সময় ও সুযোগ খুব বেশী দীর্ঘ নয়। অতএব পরকালের উপকারের জন্য যা কিছু করা দরকার তা অতি শীঘ্রই করে নেয়া উচিত। দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার ভিত্তিহীন কল্পনা করে বসে থেকে নিজের সংশোধন না করা কিছুতেই উচিত হতে পারে না। কখন কোন সময় মৃত্যু আসে এটা আল্লাহ্ তায়ালাই ভাল জানেন। সুতরাং আল্লাহ্র সাথে স্বাক্ষাতের জন্য যে নির্ধারিত সময় আছে সেটার কোন পরিবর্তন হবে না, যা আমাদের অজানা। সুতরাং মৃত্যুকে সব সময় সামনে নিয়ে দুনিয়াতে চলা উচিত এবং পারলৌকিক সফলতার জন্য প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য আমল করা উচিত।

وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ **আর তিনি সবকিছুই শুনেন এবং সবকিছুই জানেন।** অর্থাৎ তাদের এই ভুল ধারণায় পড়ে থাকা উচিত নয় যে, তাদের ব্যাপার বুঝি কোন বে-খবর রাজা-বাদশাহর সংগে। আসলে, যে আল্লাহ্র

সামনে তাদেরকে হাজির হতে হবে এবং জবাবদিহি করতে হবে তিনি কোন বে-খবর আল্লাহ্ নন। তিনি তো সবকিছু শুনেন, সবকিছু জানেন, তাদের কোন কথাই আল্লাহ্র নিকট গোপন থাকে না। অতঃপর পরবর্তী আয়াতের প্রথমাংশে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ

এবং যে কেউ জিহাদ করে সে তার নিজের কল্যাণের জন্যই জিহাদ করে।

مُجَاهَدَةٌ শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। مُجَاهَدَةٌ বলা হয়- কোন বিপরীত শক্তির সাথে দ্বন্দ্ব-সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া, চেষ্টা-সাধনা করা, অবিরাম চেষ্টা-সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়াকে। আল-কুরআনে যদি কোন বিশেষ শক্তির কথা না উল্লেখ করেই এ শব্দটির ব্যবহার করা হয়, তখন এর অর্থ হয়, এটা এক সাধারণ, সর্বাত্মক, সর্বদিক ব্যাপী চেষ্টা, সাধনা ও সংগ্রাম। মু'মিন লোকদেরকে এই দুনিয়ায় যে দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম করতে হয়, তাও ঠিক এমনি ব্যাপার। তাকে অসংখ্য ভিতর এবং বাইরের শত্রুর সাথে মোকাবেলা করতে হয়। যেমন ঃ

(i) মানুষের চির প্রতিদ্বন্দ্বি শত্রু শয়তানের সাথে সংগ্রাম করতে হয়। কেননা, সে প্রতি মুহূর্ত নেক ও কল্যাণকর আমলের ক্ষতিকর পরিনামের কথাই বলে বেড়ায়। আর বদ বা খারাপ আমল বা কাজের সব ধরনের ফয়দা ও সুযোগের লোভ দেখায়।

(ii) মুমিনকে তার নিজের নাফসের বা কুপ্রবৃত্তির সাথেও লড়াই সংগ্রাম করতে হয়। কেননা, এই নফসই সদাসর্বদা তাকে তার লালসা-বাসনা, ভোগ-বিলাস ও খাহেশের দাস বানিয়ে দেবার চেষ্টা চালায়।

(iii নিজের ঘর থেকে সমাজের বহু মানুষের সাথে তাকে লড়াই-সংগ্রাম করতে হয়। কেননা, এরাই দুনিয়ার মোহে খোদা বিমুখ করে ছাড়ে।

(iv) পূর্ব পুরুষের রেশম-রেওয়াজের বিরুদ্ধেও তাকে লড়াই করতে হয়। যে রেশম-রেওয়াজ তাকে খোদা বিমুখ করে দেয়।

(v) তাকে লড়াই করতে হয়, প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থা, মতাদর্শ, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও দ্বীন ইসলামের বিপরীত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে।

(vi) তাকে লড়াই করতে হয়, খোদা বিমুখ রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং শাসকদের বিরুদ্ধে। আর এই সংগ্রাম সাধনা এক দুই দিনের জন্য নয়। এই সংগ্রাম সারা জীবনের জন্য। এই সংগ্রাম প্রতি রাত-দিনের প্রতিটি সেকেন্ড, প্রতিটি মিনিট এবং প্রতিটি ঘন্টার জন্যে। এই সংগ্রাম অবিরাম সংগ্রাম। এই সংগ্রাম বিশেষ

কোন একটি ময়দানে নয়। জীবনের প্রতি দিকে ও প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই সংগ্রাম চালাতে হয়। হযরত হাসান বসরী (রঃ) এই কথায় বলেছেন যে,

إِنَّ الرَّجُلَ لَيُجَاهِدُ مَا ضَرَبَ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ بِسَيْفٍ

মানুষ অবিরাম জিহাদ করতেই থাকে- হয়তবা সে একবারও তরবারী ব্যবহার করেনি।

জিহাদ তো ততক্ষণ চলবে : وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ **তোমরা তাদের (খোদাদ্রোহীদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ তথা সংগ্রাম করতে থাকো, যতক্ষণ পর্যন্ত না ফেৎনা-ফাসাদ ও সন্ত্রাস নির্মূল হয়ে যায় এবং পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ্র দ্বীন কায়েম হয়ে যায়। (সূরা আনফাল-৩৯)**

এরূপ সার্বক্ষণিক ও সর্বাত্মক জিহাদ চালাবার জন্য আল্লাহ্ তাআলা যে উপদেশ দিচ্ছেন, এটা তার নিজের কর্তৃত্ব ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মনে হয় তোমাদের সাহায্যের প্রয়োজন। এতে বুঝি আল্লাহ্র কোন কল্যাণ আছে। বরং এই জিহাদে যা কল্যাণ আছে তা জিহাদকারীর জন্যেই আছে। জিহাদ করার জন্য যেমন সে দুনিয়াতে কল্যাণ লাভ করবে, তেমনি সে আখেরাতেও চিরকল্যাণ লাভ করে জান্নাতবাসি হবে। সুতরাং যে আল্লাহ্র পথে জিহাদ-সংগ্রাম করে সে তার নিজের জীবনের কল্যাণের জন্যেই করে। এতে তার নিজেরই কল্যাণ রয়েছে। জিহাদ করা না করাতে আল্লাহ্র কোন লাভও নেই ক্ষতিও নেই। যা লাভ ক্ষতি তা মানুষেরই।

إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَلَمِينَ **নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বিশ্ববাসীর মুখাপেক্ষী নন।**

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, মহান আল্লাহ্ দুনিয়া-জাহানের কারও কোন বিষয়ের ব্যাপারে মুখাপেক্ষী নন। তিনি গানী, ধনী, মুখাপেক্ষীহীন। মানুষ যদি দুনিয়ায় জান-প্রাণ সব কিছু দিয়ে সার্বক্ষণিক ও সর্বাত্মক জিহাদ না করে তাহলে আল্লাহ্র কোন ক্ষতি হবে না। কেননা, আল্লাহ্ কোন কিছুর কাঙ্গাল নন। বরং মানুষেরাই কাঙ্গাল। মানুষেরই কল্যাণের প্রয়োজন। মানুষেরা যদি আল্লাহ্র

নির্দেশ অনুযায়ী সব কিছু আমল করে তাহলে মানুষেরাই দুনিয়াতে যেমন উপকৃত হবে, তেমনি আখেরাতেও আল্লাহ্র ভয়াবহ 'আযাব থেকে নিস্তার পেয়ে নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাত লাভ করবে। আর যদি জিহাদ না করে তাহলে দুনিয়ায় যেমন গযব-আযাব এবং অশান্তি ভোগ করবে, তেমনি আখেরাতেও জাহান্নামের কঠিন আযাবে নিক্ষিপ্ত হয়ে চরম ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সুতরাং মানুষ যদি সবাই মিলে আল্লাহ্র নির্দেশ মতো চলে, তাহলে আল্লাহ্র যেমন চুল পরিমাণও লাভ নেই। তেমনিভাবে সকল মানুষও যদি কুফরী করে গোমরাহ হয়ে যায়, তাতেও আল্লাহ্র এক চুল পরিমাণ ক্ষতি নেই। আল্লাহ্ সবকিছু থেকে বেপরোয়া।

অতঃপর দারসের সর্বশেষ আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِىْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-

আর যারা ঈমান আনবে এবং সৎ কাজ করবে, (এর কারণে) আমি তাদের ত্রুটিগুলো দূর করে দেব এবং তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের প্রতিফল দান করবো।

আয়াতে 'ঈমান আনা' বলতে, আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) এবং তাঁর কিতাব আল-কুরআনে যেসব জিনিস মেনে নেওয়ার আহবান জানানো হয়েছে সেই সব কিছুকেই আন্তরিক ভাবে মেনে নেয়া।' আর عَمَلٌ صَالِحٌ (আমলে সলেহ) বা নেক বা সৎ কাজ বলতে বুঝায়, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের পেশ করা বিধান ও সুন্নত অনুযায়ী আমল বা কাজ করা।

নেক বা সৎ কাজের মাধ্যম ঃ

(i) মন ও মগযের নেক বা সৎ আমল হলো ঃ ব্যক্তির চিন্তা-বিশ্বাস, মনোভাব আদর্শ ও লক্ষ্য এবং ইচ্ছা ও বাসনা নির্ভুল, সততাপূর্ণ, পরিচ্ছন্ন ও পুতপবিত্র হওয়া।

(ii) মুখের বা কথার নেক আমল হলো ঃ অসৎ, কুৎসিত, অশ্লীল ও সত্যের বিপরীত কোন কথা মুখে উচ্চারণ না করা। যে কথাই বলবে, তা সত্য, ইনসাফ, শালীন ও ন্যায় কথাই বলবে।

(iii) দেহের অংগ-প্রত্যংগের নেক আমল হলো ঃ ব্যক্তি সমগ্র জীবনটাকে আল্লাহ্র ইবাদত-বন্দেগী ও আনুগত্যের অধীনে পরিচালিত করবে এবং তাঁর

আইন-কানুন ও বিধি-বিধানের বিপরীত কোন কাজ করবে না।

যেসব ব্যক্তি এই তিনটি মাধ্যম যেমন- চিন্তা-চেতনা, কথা এবং বাস্তব কর্মের দ্বারা নেক বা সৎ আমল করবে তাদের জন্যে দু'টি প্রতিদান দেয়া হবে বলে আয়াতের পরবর্তী অংশে বলা হয়েছে। আর তা হলো-

প্রথম প্রতিদান হলো ঃ মানুষের ভিতরে ও চরিত্রে যেসব দোষ-ত্রুটি আছে, তা দূর করে দেওয়া হবে। দোষ-ত্রুটি দূর করে দেয়ার কয়েকটি অর্থ হতে পারে। একটি হলো, ঈমান আনার আগে সে যে রকমই গুনাহ করে থাকুক না কেন, ঈমান আনার সংগে সংগে তা সবই মাফ হয়ে যাবে।

অপরটি হলো, ঈমান আনার পর বিদ্রোহী মনোভাব নিয়ে নয় বরং মানবীয় দুর্বলতার কারণে যেসব পাপ বা অপরাধ করেছে, তা তার নেক আমলের প্রতি খেয়াল করে ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর তৃতীয়টি হলো, ঈমান ও সৎ আমলের মাধ্যমে জীবন পরিচালনা করায়, ব্যক্তির নফসের সংশোধন আপনা-আপনি হয়ে যাবে এবং এর ফলে তার অনেক প্রকারের দুর্বলতা এমনি এমনি দূর হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় প্রতিদান হলো ঃ তার দুনিয়ার উত্তম আমল বা কর্মের প্রতিফল দেয়া হবে এবং সেই উত্তম প্রতিফল হবে তার সেই উত্তম আমলের অপেক্ষাও অনেক অনেক গুণ উত্তম ও উন্নত মানের।

ঈমান ও নেক আমলের প্রতিফল দেওয়া সম্পর্কে যে কথাটুকু বলা হয়েছে, তা হলো ঃ لَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِىْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ এই বাক্যাংশের দুটি অর্থ হতে পারে। একটি এই যে, ব্যক্তির নেক আমলের মধ্যে যেসব আমল সবচেয়ে বেশী ভাল ও উত্তম হবে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে তার জন্য প্রতিফল নির্ধারণ করা হবে। আর দ্বিতীয় অর্থ হলো, ব্যক্তি নিজের আমলের অনুপাতে যতটুকু প্রতিদান পাবার যোগ্য হবে তার থেকেও বেশী উত্তম প্রতিফল তাকে দেয়া হবে। এর স্বপক্ষে কুরআনের অন্যান্য আয়াতেও তা উল্লেখ রয়েছে। যেমন সূরা আনয়ামের ১৬০ আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا -যে ব্যক্তি নেক আমল নিয়ে আসবে, তাকে তার চেয়ে দশগুণ প্রতিফল দেওয়া হবে।

অনুরূপ সূরা কাসাসের ৮৪ আয়াতে বলা হয়েছে-

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا

যে ব্যক্তি নেক আমল নিয়ে আসবে তাকে তার থেকেও উত্তম প্রতিদান দেওয়া হবে।

সূরা নিসার ৪০ আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا

নিশ্চয় আল্লাহ্ একবিন্দু পরিমাণও যুলুম করেন না। যদি নেক আমল হয়, তবে তিনি তাকে কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে (প্রতিদান) দেন।

মোট কথা বান্দার আমলের প্রতিদানের বৃদ্ধিটা সৎ কাজ এবং নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার উপর নির্ভর করে। আর নেক বান্দার জন্য আখেরাতের সর্বোচ্চ প্রতিদান হলো, নিয়ামতে পরিপূর্ণ চির সুখময় জান্নাত এবং মহান আল্লাহ্র দিদার।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে দুনিয়ার এই জীবনে আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য (চিন্তার দিক থেকে, কথার মাধ্যমে এবং বাস্তবে) উত্তম আমল করার তৌফিক দান করুন এবং আখেরাতে আদালতে অতি উত্তম প্রতিদান জান্নাতুল ফেরদাউস ও আল্লাহ্র দিদার লাভের সুযোগ করে দিন। আমিন।

শিক্ষা ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা আনকাবুতের ১-৭ আয়াত পর্যন্ত ব্যাখ্যা পেশ করলাম। এর মধ্যে আমাদের জন্য যেসব শিক্ষা রয়েছে তা হলো ঃ

● الٓمٓ এর মতো হুরুফে 'মুকাত্তাআত' বা বিচ্ছিন্ন শব্দের অর্থ জানার জন্য পেরেশান হওয়ার প্রয়োজন নেই এবং আঁতি পাঁতি করে খোজা-খুজিরও কোন দরকার নেই।

● ঈমানের দাবী করাটাই যথেষ্ট নয়। বরং জান-মালসহ বৈষয়িক সকল কিছুকে কুরবানীর মাধ্যমে ঈমানকে পরীক্ষা করা হবে এটা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে সদা-সর্বদা পরীক্ষা দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকা।

● স্বর্ণকার যেমন খাঁটি স্বর্ণ বের করার জন্য সোনার খন্ডকে জ্বলন্ত আগুনে পুড়িয়ে খাদ বের করে ফেলে, অনুরূপ ভাবে আল্লাহ্ তাআলাও দুনিয়াতে বিভিন্ন

অগ্নি পরীক্ষার মাধ্যমে ঈমানের দাবীদারদের মধ্যে থেকে খাঁটি ঈমানদারদের বাছাই করেন। এটাই আল্লাহ্র চিরাচরিত নিয়ম ও বৈশিষ্ট। এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

● শুধু যে রাসূলের সঙ্গী সাথী এবং উম্মতে মুহাম্মদীকে ঈমানের পরীক্ষা দিতে হয়েছে বা হবে তা নয়। বরং ইতিপূর্বে যতো নবী এসেছেন সকলকেই এবং আপন আপন নবীর জাতির লোকদেরকেও পরীক্ষা করা হয়েছে। এটা এই জন্যই করা হয়েছে যে, ঈমানের দাবীতে কারা সত্যবাদী এবং কারা মিথ্যাবাদী তা যাচাই-বাচাই করা। সুতরাং যুগে যুগে সকল ঈমানের দাবীদারদের সত্য-মিথ্যা যাচায়ের জন্য আল্লাহ্ পরীক্ষা করে নিজে যেমন দেখে নিবেন তেমনি মানুষের কাছেও প্রকাশ করে ছাড়বেন। কেননা, আল্লাহ্কে যেমন দেখে নিতে হবে তেমনি মানুষের কাছেও প্রকাশ পেতে হবে।

● ঈমানদারদের এটাও ভালভাবে জেনে নেওয়া দরকার যে, সত্য-মিথ্যা যাচাই এবং খাঁটি-অখাঁটি যাচায়ের মাধ্যমই হলো আল্লাহ্র পথে জিহাদ-যথা ইসলামী আন্দোলন। কোন খানকায় বসে বা মসজিদে মসজিদে ঘুরে-ফিরে নিরাপদ দূরত্বে থেকে ঈমানের পরীক্ষা দেয়া সম্ভব নয়।

● ইসলামী আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য যেসব শয়তানী ও কুফর শক্তি যুলুম-নির্যাতন করে, তারা মনে করে যে, আল্লাহ্কে ফাঁকি দিয়ে তারা পার পেয়ে যাবে। আসলে এটা তাদের অমূলক ও ভুল ধারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। বরং তাদেরকে দুনিয়ার এই আচরণের জন্য আল্লাহ্র কাছে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। তারা কোন ভাবেই পার পাবে না।

● আল্লাহ্র স্বাক্ষাতের জন্য তাড়াহুড়ো করাও যেমন ঠিক নয়, তেমনি মৃত্যু কখন আসবে এই বলে সবকিছু ছেড়ে দিয়ে বসে থাকাও ঠিক নয়। বরং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্ধারিত সময়েই মৃত্যু হবে, যার জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্রই আছে। এজন্য সময় ক্ষেপন না করে প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহ্র ইবাদত-বন্দেগীতে নিজেকে নিয়োজিত রাখা। কেননা, মহান আল্লাহ্ পাক আমাদের সবকিছুই শুনে থাকেন এবং সব কিছুই পরখ করে থাকেন।

● যে সার্বক্ষণিক এবং সর্বাত্মক জিহাদ করে তা আল্লাহ্র কোন উপকার বা

স্বার্থের জন্য করেনা। বরং সে নিজের জীবনের স্বার্থ ও কল্যাণের জন্যই করে থাকে। জিহাদ করলে ব্যক্তির নিজেরই লাভ না করলে নিজেরই ক্ষতি। এতে আল্লাহ্‌র কোন লাভও নেই ক্ষতিও নেই। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা সব কিছু থেকেই অভাবমুক্ত।

● প্রতিটি মুমিনের চিন্তা-চেতনা, কথা-বার্তা, এবং কাজ-কাম নেক এবং সৎ হতে হবে, তাহলে আল্লাহ্ তাআলা মুমিনদের ঈমান এবং সৎ কাজের বিনিময়ে মানবীয় কারণে যেসব দোষ-ত্রুটি হয়ে যায়, তা দূর করে দেবেন। আর দুনিয়ায় উত্তম কাজের বিনিময়ে আল্লাহ্ তাআলা আরও অতি উত্তম প্রতিফল দেবেন। আর তা হলো আল্লাহ্‌র দিদার এবং অতি উত্তম জান্নাত।

আহ্বান ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনাদের সামনে সূরা আনকাবুতের প্রথম সাতটি আয়াত থেকে যে দারস পেশ করলাম, এতে যদি আমার অজান্তে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে যায় সেই জন্য মহান আল্লাহ্‌র দরবারে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর এই দারস থেকে আমাদের জন্য যেসব শিক্ষনীয় বিষয় আমরা লাভ করলাম তা যেন বাস্তব জীবনে আমল করতে পারি সেই তাওফীক কামনা করে আমি আমার দারস শেষ করছি। মাআসসালাম।

পাঁচ

আল্লাহ্‌র উপর অবিচল ঈমান।

সর্বোত্তম পন্থায় দাওয়াত দান ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন

(সূরা হা-মীম আস সিজদা-৩০-৩৬)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلاَمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِا للّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلاَّ تَخَافُوْا وَلاَ تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِا لْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ - نَحْنُ اَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الاٰخِرَةِ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِىٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ- نُزُلاً مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ- وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ- وَلاَ تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ- وَمَا يُلَقّٰهَآ اِلاَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَمَا يُلَقّٰهَآ اِلاَّ ذُوْحَظٍّ عَظِيْمٍ-

সরল অনুবাদ ঃ ইরশাদ হচ্ছে- (৩০) নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের রব (পালনকর্তা) আল্লাহ্‌, অতঃপর তাতেই অটল-অবিচল থাকে। তাদের কাছে ফিরেশ্‌তা অবতীর্ণ হয় এবং তাদেরকে বলে, তোমরা ভয় পেও না, চিন্তাও

করো না। আর সেই জান্নাতের সুসংবাদ পেয়ে সন্তুষ্ট হও, যার ওয়াদা তোমাদের কাছে করা হয়েছিলো। (৩১) ইহকালে ও পরকালে আমরা তোমাদের বন্ধু। সেখানে (জান্নাতে) তোমাদের জন্যে আছে যা তোমাদের মনে চায় এবং সেখানে তাও আছে যা তোমরা দাবী করো। (৩২) এটা হলো ক্ষমাশীল ও দয়াময় আল্লাহ্‌র তরফ হতে মেহমানদারীর সামগ্রী। (৩৩) আর সেই ব্যক্তির কথা অপেক্ষা অতি উত্তম কথা আর কার হতে পারে, যে আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দেয়, নিজে সৎ কাজ করে, এবং বলে, 'আমি মুসলমান' ? (৩৪) (আর হে নবী!) ভাল ও মন্দ সমান নয়। তুমি অন্যায় ও মন্দকে দূর করো সেই ভালো দ্বারা যা অতি উত্তম। তাহলে দেখবে যে, তোমার সাথে যার শত্রুতা ছিলো সে হয়ে গেছে অন্তরঙ্গ বন্ধু। (৩৫) এ গুণ কেবল তাদেরই আছে, যারা ধৈর্য ধারণ করে। আর এই মর্যাদা লাভ করতে পারে কেবল তারাই যারা বড়-ই ভাগ্যবান।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ إِنَّ –নিশ্চয়। اَلَّذِيْنَ –যারা। قَالُوْا–তারা বলে। رَبُّنَا–আমাদের রব বা প্রতিপালক। ثُمَّ –অতঃপর। اِسْتَقَامُوْا –তারা অটল অবিচল থাকে। تَتَنَزَّلُ –অবতীর্ণ হয়। عليهم –তাদের উপর। اَلْمَلٰئِكَةُ–ফেরেশতামন্ডলী। اَلَّا تَخَفُوْا –তোমরা ভয় পেওনা। ولا تحزنو– –এবং চিন্তা করিও না। اَبْشِرُوْا –তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো। بِالْجَنَّةِ – জান্নাতের। اَلَّتِىْ –যার। كُنْتُمْ –তোমাদের নিকট। تُوْعَدُوْنَ –ওয়াদা করা হয়েছে। نحن –আমরা। اَوْلِيٰؤُكُمْ –তোমাদের বন্ধু। فِى– –মধ্যে। اَلْحَيٰوةِ الدُّنْيَا –দুনিয়ার জীবন। و –এবং। اٰخِرَةِ– –পরকালের। لَكُمْ –তোমাদের জন্য। فِيْهَا–উহাতে রয়েছে। مَا تَشْتَهِىْ– –যা কিছু চাও। اَنْفُسَكُمْ –তোমাদের জীবন। مَا تَدَّعُوْ –যার ইচ্ছা তোমরা করবে। نُزُلًا– – আপ্যায়ন সামগ্রী। مِنْ–হতে। غَفُوْرٌ– –ক্ষমাশীল। رَحِيْمٌ -দয়ালু।

সম্বোধন ঃ দারসে কুরআন মাহফিলে/প্রোগ্রামে উপস্থিত ইসলাম প্রিয়/ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ভায়েরা/বোনেরা! আস্‌সালামু আলাইকুম। আমি আপনাদের সামনে আল-কুরআনের বিশিষ্ট সূরা হা-মীম আস সাজদাহ্ এর ৩০–৩৫ আয়াত পর্যন্ত তেলাওয়াত ও সরল তরজমা পেশ করেছি। আল্লাহ্ পাক যেন আমাকে আপনাদের সামনে কুরআনের এই দারস সঠিকভাবে পেশ করার তাওফীক দান করেন। "অমা তাওফীকি ইল্লাবিল্লাহ্।"

সূরার নামকরণ ঃ এই সুরাটির নাম দুটি শব্দে গঠিত। একটি হলো 'হা-মীম' আর অপরটি হলো 'সিজদাহ'। অর্থাৎ এটা সেই সূরা যার শুরু হয়েছে হা-মীম' শব্দ দ্বারা এবং যাতে একটি সিজদাহর আয়াত রয়েছে। তবে এটিও অন্যান্য সূরার ন্যায় 'প্রতীকী' বা 'চিহ্ন' হিসেবে করা হয়েছে। কোন 'শিরোনাম' হিসেবে নামকরণ করা হয়নি।

সূরাটি নাযিল হওয়ার সময়কাল ঃ সূরাটি মাক্কী। নির্ভরযোগ্য বর্ণনার ভিত্তিতে বলা যায়, এর নাযিল হওয়ার সময়টা হলো হযরত আমীর হামযা (রাঃ) এর ঈমান আনার পর এবং হযরত উমর (রাঃ) এর ঈমান আনার পূর্বে। এতে ধরে নেয়া যায় এটি মাক্কী জীবনে নবুয়াতের ৪/৫ সনে অবতীর্ণ হতে পারে।

সূরাটির বিষয়বস্তু ঃ সূরাটির আলোচ্য বিষয়বস্তু হলো- মক্কার কাফের সরদারদের বিশেষ করে রাসূলের কাছে তাঁর দাওয়াতী কাজ এবং মিশন থেকে সরিয়ে রাখার জন্য কাফের সর্দার উৎবার কতিপয় বৈষয়িক প্রস্তাব, যেমন– ধন-সম্পদ, নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব ও রোগ চিকিৎসার প্রস্তাবের সমুচিত প্রতিউত্তর। কেননা, কাফেরেরা মনে করতো যে, মুহাম্মদ (সাঃ) এর নবী হওয়া এবং কুরআনের এই ওহীর কথা প্রকৃতপক্ষে সঠিক কোন বিষয় নয়। বরং এর মূলে হলো, ধন-মালের লোভ, রাষ্ট্র ক্ষমতা ও শাসন ক্ষমতা লাভই মূখ্য।

এই সূরায় উৎবার কথাগুলোর প্রতি কোনরূপ ভ্রুক্ষেপ না করেই মক্কার কাফেরদের মূল বিরোধীতাকেই আলোচ্য বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। কেননা, কাফেরেরা তখন কুরআন মজীদের দাওয়াতকে রুদ্ধ ও ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য অত্যন্ত হঠকারীতা ও অনৈতিকতার সাথে চেষ্টা করতে ছিলো। তারা নবী করীম (সাঃ) কে বলতেছিলো, তুমি যাই করো না কেন, আমরা তোমার কোন কথা-ই শুনবো না। আমরা আমাদের দেলের উপর গেলাফ ফেলে রেখেছি, আমাদের ও তোমার মাঝে একটা প্রাচীর দাঁড়িয়ে আছে, যা তোমাকে ও আমাদেরকে কখনই একত্রিত হতে দেবে না। তারা নবী করীম (সাঃ) কে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলো যে, তুমি তোমার এই দাওয়াতী কাজ

চালিয়ে যাও, আর আমরা আমাদের সাধ্যানুযায়ী তোমার বিরোধীতা করে যাবো- করতেই থাকবো।

আলোচ্য আয়াতগুলোর বিষয়বস্তু ঃ যারা আল্লাহ্ তাআলাকে একমাত্র রব বা পালনকর্তা হিসেবে মেনে নেয় এবং তার উপরই অটল অবিচল থাকে তাদের জন্য নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নতের সুসংবাদ। আয়াতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে মুসলিম দাবীদারদের সর্বউত্তম কথা হলো আল্লাহ্র দিকে মানুষকে দাওয়াত দান করা। আর দাওয়াত দানকারী ধৈর্যশীলদের একটা মহা গুণ হলো চরম শত্রুর কটু কথাকেও অতি উত্তম কথা ও আচারণ দিয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানিয়ে নেয়া। আর এই মর্যাদা কেবল সৌভাগ্যবানদেরই কপালে জোটে।

ব্যাখ্যা ঃ দারসে কুরআন প্রোগ্রামে উপস্থিত প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনাদের সামনে দারসের জন্য কতিপয় প্রাথমিক ধারণা প্রদান করলাম। এখন আমি আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা পেশ করছি। মহান আল্লাহ্ পাক তাঁর উপর অটল বিশ্বাসীদের কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ-

নিশ্চয় যারা বলে, আল্লাহ্ই আমাদের রব-পালনকর্তা। অতঃপর একথার উপরই অটল-অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং তাদেরকে বলে, তোমরা ভয় পেও না, চিন্তাও করো না। আর সেই জান্নাতের সুসংবাদ পেয়ে সন্তুষ্ট হও, যার ওয়াদা তোমাদের কাছে করা হয়েছিলো।

ইতিপূর্বে কাফেরদেরকে তাদের হঠকারিতা ও সত্য বিরোধীতার পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে। এখন এই আয়াত থেকে ঈমানদার লোক এবং নবী করীম (সাঃ) কে লক্ষ্য করে কথা বলা শুরু হয়েছে। আয়াতের প্রথমাংশে বলা হয়েছে-

إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا-

নিশ্চয় যারা বলে আল্লাহ্ই আমাদের রব, অতঃপর এই কথার উপরই অটল-অবিচল থাকে। এখানে দু'টি কথা বলা হয়েছে।

এক. قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ তারা বলে আল্লাহ্ আমাদের রব। অর্থাৎ তারা আল্লাহ্কে পালনকর্তা হিসেবে বিশ্বাস করে এবং তা স্বীকারও করে, এটা হলো মূল ঈমান।

দুই. ثُمَّ اسْتَقَامُوْا অতঃপর তাতে অবিচলও থাকে। এটা হলো সৎকর্ম। এক কথায় তারা এভাবে 'ঈমান' ও 'সৎকর্ম' উভয় গুণে গুনান্বিত হয়ে যায়।

اِسْتَقَامَتْ শব্দের অর্থ– ঈমান ও তাওহীদে কায়েম থাকা, তা পরিত্যাগ না করা।' অর্থাৎ কোন এক সময় আকস্মিক ও সাময়িক ভাবে আল্লাহ্কে নিজেদের রব বলেই তারা ক্ষান্ত হয় না এবং এমন ভ্রান্ত নীতিও তারা গ্রহণ করে না যে, একদিকে আল্লাহ্কে নিজেদের রবও বলবে, আর সংগে সংগে অপরাপর শক্তিকেও খোদা হিসেবে মান্য করতে থাকবে। বরং তারা একবার এই আকীদা গ্রহণ করার পর সারা জীবন তার উপরই অটল-অবিচল থাকে। এর বিপরীত কোন আকীদাই তারা গ্রহণ করেনা, এর সাথে কোন বাতিল আকীদার সংমিশ্রণও ঘটাই না এবং তারা কর্মজীবনেও তাওহীদের এই আকীদারই বাস্তব অনুসরণ করে চলে।

তাওহীদ বা আল্লাহ্র একত্ববাদে অটল-অবিচল হয়ে থাকার প্রকৃত তাৎপর্য মহানবী (সাঃ) নিজে এবং বড় বড় সাহাবাগণও এর ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন হযরত আনাস (রাঃ) এর বর্ণনায় পাওয়া যায়- মহানবী (সাঃ) اِسْتَقَامَةٌ বা 'অটল-অবিচল' থাকার ব্যাপারে বলেছেন–

قد قالها الناس ثم كفر اكثرهم فمن مات عليها فهو ممن استقام–

অনেক লোকই আল্লাহ্কে নিজের রব বা প্রতিপালক বলে মেনে নিয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই কাফের হয়ে গেছে। কেবল দৃঢ়ভাবে তারাই দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছে, যারা মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এই আকীদার উপর অটল হয়ে থাকতে পেরেছে। (ইবনে জরীর, নাসায়ী, ইবনে আবু হাশেম)।

প্রথম খলিফা এবং নবী করীম (সাঃ) এর বিশ্বস্ত সহচর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) اِسْتَقَامَةٌ এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ

لَمْ يُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا لَمْ يَلْتَفِتُوْا اِلٰى اِلٰهٍ غَيْرِهٖ

(আল্লাহ্র একত্ববাদে ঈমান আনার পর তারা) আল্লাহ্র সাথে কাকেও শরীকও বানায় না এবং তিনি ছাড়া অপর কোন মাবুদের দিকে ফিরেও তাকায় না। (তাফসীরে ইবনে জরীর)

একবার হযরত উমরে ফারুক (রাঃ) মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে اِسْتَقَامَتْ এর এই আয়াত পাঠ করলেন এবং বললেন ঃ 'আল্লাহ্র কসম! 'ইসতিকামাত' বা দৃঢ়তা অবলম্বনকারী হলো সেই লোক, যারা আল্লাহ্র আনুগত্যের উপর অটল-অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এবং খেক শিয়ালের মতো এদিক থেকে ওদিক পালানোর পথ বের করার জন্য দৌড়া-দৌড়ি করে না'। (তাফসীরে ইবনে জরীর)

اِسْتَقَامَتْ'-এর ব্যাখ্যায় হযরত উসমান (রাঃ) বলেন ঃ নিজের আমল আল্লাহ্র জন্য খালেস করলো। (তাফসীরে কাশ্‌শাফ)। অনুরূপভাবে اِسْتَقَامَتْ-এর ব্যাখ্যায় হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ 'যে আল্লাহ্র নির্ধারিত ফরয সমূহ পূর্ণ আনুগত্যের সাথে আদায় করে।' (তাফসীরে কাশশাফ)।

اِسْتَقَامَتْ এর উপরোক্ত ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে যা পাওয়া যায় তা হলো, খালেশ দিলে আল্লাহ্কে নিজের রব হিসেবে মেনে নেওয়া এবং এ ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ-সংশয় পোষণ না করা। তার দেওয়া শরীয়তের যাবতীয় বিধিবিধান মেনে চলা, হালাল জিনিস গ্রহণ করা এবং যাবতীয় হারাম থেকে বেঁচে থাকা।

তাফসীরে কাশশাফে বলা হয়েছে ঃ رَبُّنَا اللّٰهُ 'আল্লাহ্ আমাদের রব বা পালনকর্তা'- একথাটি বলা তখনই শুদ্ধ হতে পারে, যখন অন্তরে বিশ্বাস করা হয় যে, আমি প্রত্যেক অবস্থায় প্রত্যেক পদক্ষেপেই আল্লাহ্ তাআলার প্রশিক্ষণাধীন। তাঁর রহমত ছাড়া আমি একটি শ্বাসও ছাড়তে পারি না। এর দাবী এই যে, মানুষ আল্লাহ্র এবাদতে অটল-অবিচল থাকবে এবং তার আত্মা ও দেহ চুল পরিমাণও আল্লাহ্র দাসত্ব থেকে বিচ্যুত হবে না।

হযরত সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ্ সাকাফী (রাঃ) একবার রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর

কাছে আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র নবী, আমাকে এমন এক পূর্ণাঙ্গ বিষয় বলে দিন যা শোনার পর আর কারও কাছে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হবে না, তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বললেন, قُلْ اٰمَنْتُ بِا للّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ 'বলো, **আমি আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনলাম অতঃপর তাতে অবিচল থাকলাম'।** (মুসলিম শরীফ)। এই কথাটির বাহ্যিক অর্থ এই যে, ঈমান ও তার দাবী অনুযায়ী সৎ কর্মের প্রতিও অবিচল থাকা।

যারা আল্লাহ্‌কে রব বলে স্বীকার করে এবং তার উপরই অটল-অবিচল থাকে তাদের প্রতিদান হিসেবে আয়াতের পরবর্তী অংশে মহান আল্লাহ্‌ বলেন ঃ

تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِا لْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْ عَدُوْنَ–

(এই গুণের জন্য) তাদের নিকট ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং তাদেরকে বলে, তোমরা ভয় পেও না, চিন্তাও করো না। আর সেই জান্নাতের সুসংবাদ পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যাও যার ওয়াদা তোমাদের কাছে করা হয়েছে।

যারা আল্লাহ্‌কে নিজের রব বলে মনে-প্রাণে মেনে নেয় এবং তার উপরই অটল-অবিচল থাকে তাদের প্রতিদান হিসেবে তাদের কাছে 'ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়' একথাটির ব্যাখ্যায় মুফাসসেরীনগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। যেমন–

(i) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর উক্তি অনুযায়ী ফেরশতাগণের এই অব-তরণ ও সম্বোধন মৃত্যুর সময় হবে।

(ii) কাতাদাহ বলেন হাশরের দিন কবর থেকে বের হবার সময় ফেরেশতা নাযিল হবে।

(iii) নেকী ইবনে জাররাহ বলেন ঃ ফেরেশতাদের অবতরণ তিন সময় হবে, প্রথম হবে মৃত্যুর সময়, দ্বিতীয়বার হবে কবরের ভিতর এবং তৃতীয়বার হবে হাশরের দিন কবর থেকে উঠার সময়।

(iv) বাহরে মুহীতে আবু হাইয়্যান বলেন ঃ আমি তো বলি, মুমিনদের কাছে ফেরেশতাদের অবতরণ সবসময় হয় এবং এর প্রতিক্রিয়া ও বরকত তাদের কাজ-কামে পাওয়া যায়। তবে চাক্ষুষ দেখা ও শোনা উপরোক্ত সময়েই হবে।

(v) তাফসীরে মাযহারীতে হযরত সাবেত বেনানী (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি সূরা 'হা-মীম সিজদা' তেলাওয়াত করতঃ আলোচ্য আয়াত পর্যন্ত পৌঁছে বললেন, আমি হাদীস থেকে জেনেছি যে, মুমিন ব্যক্তি যখন কবর থেকে উঠবে,

তখন দুনিয়াতে যেসব ফেরেশতা তার সাথে থাকতো, তারা এসে বলবে, তুমি ভীত ও চিন্তিত হয়ো না; বরং ওয়াদাকৃত জান্নাতের সুসংবাদ শোন। তাদের এই কথা শুনে মুমিন ব্যক্তি নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে।

(vi) মাওলানা মওদুদী (রহঃ) তাঁর তাফহীমুল কুরআনে উল্লেখ করেন, ফেরেশতা নাযিল হওয়ার এই ব্যাপারটি বাহ্যিক অনুভূতিযোগ্য রূপে হবে এবং ঈমানদার লোকেরা তাদেরকে নিজেদের চোখে দেখতে পাবে কিংবা তাদের আওয়াজ কানে শুনবে এমন ভাবে হওয়াটা জরুরী নয়। যদিও আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে কারো জন্য ফেরেশতাদেরকে পাঠাতেও পারেন- পাঠিয়েও দেন; কিন্তু সাধারণ ভাবে মুমিন ব্যক্তির প্রতি বিশেষ করে কঠিন সময়ে যখন তারা সত্যের দুষমনদের হাতে নির্মমভাবে নিপীড়িত ও নির্যাতিত হতে থাকে, তখন ফেরেশতাদের আগমন হয়ে থাকে অপ্রকাশ্য ভাবে এবং তাদের কথা কানের পর্দায় ধ্বনিত হওয়ার পরিবর্তে দেলের গভীরে উত্তীর্ণ হয়ে শান্তি ও স্বস্থি অনুভব করতে থাকে। যেসব মুফাসসীর বলেছেন ফেরেশতা নাযিলের এই ঘটনা ঘটবে মৃত্যুর সময় কিংবা কবরের ভিতর অথবা হাশরের ময়দানে। আসলে কোন্ অবস্থা ও পরিবেশ পরিস্থিতিতে এই আয়াত নাযিল হয়েছিলো তা বিবেচনা করলে এ ব্যাপারে কোনই সন্দেহ থাকে না যে, এই ব্যাপারটি এখানে বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হলো এই জীবনে দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করার জন্য চেষ্টাকারীদের উপর ফেরেশতা নাযিল হওয়ার কথা বলা, যেন তারা শান্তি ও স্বস্থি লাভ করতে পারে, তাদের মনে সাহস হিম্মত জাগে, তাদের মনে যেন এই অনুভূতি জাগে যে, তারা অসহায় নিরাশ্রয় নয়, আল্লাহ্র ফেরেশতা তাদের সাথে রয়েছে। যদিও আল্লাহ্র ফেরেশতা মৃত্যুর সময়ও মুমিন ব্যক্তিকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য আসে এবং কবরেও তাদেরকে সম্মান জানায়। আর কিয়ামতের দিনও হাশরের শুরু হতে জান্নাতে পৌঁছা পর্যন্ত তারা সব সময় তাদের সংগে লেগেই থাকে। তবে ফেরেশতাদের এই সংগী হওয়াটা কেবল মাত্র সেই জগতের জন্যই নির্দিষ্ট নয়, বরং এই দুনিয়াতেও তা যথারীতি হয়ে থাকে।

প্রিয় ভায়েরা/ বোনেরা! আয়াতের বর্ণনার ধারাবাহিকতা হতে স্পষ্ট ভাবে বোঝা যায় যে, শয়তান ও দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্বে ও সংগ্রামে যেমন ভাবে বাতিল পন্থীদের সংগে থাকে, তেমনিভাবে হক পন্থী মুমিন লোকদের সংগী হয়ে থাকে আল্লাহ্র ফেরেশতারা।

বাতিল পন্থীদেরকে তাদের সংগী শয়তান এবং দুষ্ট লোকেরা যেমন ভাবে দ্বীনের

ব্যাপারে যুলুম নির্যাতন সফলতা লাভের একমাত্র পথ হিসেবে গণ্য করায় এবং তাদেরকে উৎসাহ-উদ্দীপনা দিতে থাকে। তেমনি ভাবে সত্যপন্থী মুমিন লোকদের নিকট ফেরেশতা আগমন করে সেই নির্ভয় ও সুসংবাদই দিতে থাকে যা পরবর্তী বাক্যে উল্লেখ করে বলা হয়েছে-

اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ- نَحْنُ اَوْلِيَؤُكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِىْٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ- نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ-

(তারা বলেঃ) তোমরা ভয় পেও না, চিন্তাও করো না। আর সেই জান্নাতের সুসংবাদ পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যাও যার ওয়াদা তোমাদের নিকট করা হয়েছিলো! আমরা এই দুনিয়ার জীবনেও তোমাদের সংগী-সাথী, আর পরকালেও। সেখানে তোমরা যা কিছু চাও, তোমরা তা পাবে। আর যে যে জিনিসের তোমরা ইচ্ছা করবে, তাও তোমরা পাবে। এ সবই হলো মেহমানদারীর সামগ্রী সেই মহান আল্লাহ্‌র তরফ হতে যিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

এই দু'টি আয়াতে সত্য পন্থী মুমিন ব্যক্তিদের জন্য কয়েকটি নির্ভয়ের বাণী ও সুসংবাদ জানানো হয়েছে। মুমিন ব্যক্তির কাছে ফেরেশতা নাযিল হয়ে বলবে-

এক. اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا **তোমরা ভয় পেও না, চিন্তিত হয়ো না।** অর্থাৎ তোমরা যারা মক্কার কাফেরদের দ্বারা নির্যাতিত নিষ্পেষিত হচ্ছো এতে তোমরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ো না এবং ঈমানের উপর টিকে থাকতে পারবে কিনা এবং তোমাদের বংশধরদের অবস্থা কি হবে এজন্য চিন্তাগ্রস্তও হয়ে পড়ো না। কেননা, তোমাদের সাথে আল্লাহ্ ও তার ফেরশেতারা রয়েছে। তোমাদের নির্ভয় দেওয়ার জন্য এবং তোমাদের মনোবল বৃদ্ধি ও তোমাদের বংশধরদের জন্য আমরা সদা-সর্বদা নিয়োজিত রয়েছি।

দুই. -وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ- **"আর তোমরা সেই জান্নাতের সুসংবাদ পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যাও, যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে।**

সত্যপন্থী মুমিনদের জন্য দ্বিতীয় যেই সুসংবাদ তা হলো নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাত। নির্যাতিত মুমিনদের কঠোর নির্যাতন, ত্যাগ ও কোরবানীর জন্য যে সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিদান রয়েছে ফেরেশতারা তার খোশখবর দিয়ে বলছেন, হে মুমিনেরা, তোমরা তোমাদের ঈমানের উপর টিকে থেকে তোমাদের মহান দায়িত্ব পালনের জন্য তোমরা জান-মাল দিয়ে যে সংগ্রাম করছো এর বিনিময় তো তোমাদের আল্লাহ্‌র কাছেই রয়েছে, যার ওয়াদা তিনি করেছেন, আর তা হলো জান্নাত। যারা জান-মাল দিয়ে আল্লাহ্‌র রাস্তায় সংগ্রাম করে তাদের পাওনা তো জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়। আল্লাহ্ তো এদের জান-মালকে জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন। সূরা তওবায় মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা মুমিনদের জান-মালকে জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন। (তাওবা-১১১)

তিন. نَحْنُ أَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِى الْاٰخِرَةِ

আমরা (ফেরেশতারা) এই দুনিয়ার জীবনেও তোমাদের সংগী-সাথী এবং পরকালের জীবনেও।

সত্যপন্থী মুমিন ব্যক্তিদের জন্য তৃতীয় যে সুসংবাদ তা হলো উভয় জগতে ফেরেশতারা সংগী-সাথী। উভয় জগতেই তারা সাহায্যকারী। এটা অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। দুনিয়া হতে পরকাল পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে ফেরেশতারা মুমিন ব্যক্তিদের জন্য অভিভাবক।

এই দুনিয়ায় তোমাদের সংগী-সাথী ফেরেশতাদের এই কথার তাৎপর্য হলো, এই যে, বাতিলের শক্তি ও দাপট যতো বড় এবং যতো সাংঘাতিকই হোক না কেন, যতই অত্যাচারী ও নিপীড়ক হোক না কেন, তার জন্য বিন্দুমাত্র ভীত ও সন্ত্রস্ত হবার প্রয়োজন নেই। সত্যনীতি মেনে চলার জন্য তোমাদেরকে যে দুঃখ-কষ্ট ও বঞ্চনা বরদাশত করতে হয়, সেজন্য তোমরা মনে কোন প্রকার দুঃখ বা অনুতাপ রেখ না। কেননা, ভবিষ্যতে তোমাদের জন্যে যা কিছু আছে তা দুনিয়ার যে কোন নিয়ামত এর তুলনায় অনেক বেশী উন্নত ও মর্যাদাপূর্ণ। যখন ফেরেশতারা ঠিক মৃত্যুর সময় মুমিন ব্যক্তিদের একথাটি অর্থাৎ "আমরা তোমাদের সংগী-সাথী" বলেন, তখন এর তাৎপর্য হলো এই যে, এখন তোমরা

যে মনযিলের দিকে যাচ্ছো, সেখানে তোমাদের চিন্তার কোনই কারণ নেই। কেননা, সেখানে জান্নাত তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আর দুনিয়ায় যাদেরকে রেখে যাচ্ছো তাদের জন্যও চিন্তিত হবার কোনই কারণ নেই। কেননা, এখানেও আমরা তাদের জন্য বন্ধু ও সাহায্যকারী।

'কবর' তথা 'বরযখের' জগতে ও হাশরের ময়দানে ফেরেশতা যখন এই কথা অর্থাৎ আমরা তোমাদের সাথী বলবেন, তখন এর অর্থ হবে, এখানে তোমাদের পরম নিশ্চিন্ততা। ভাবনা-চিন্তার কোনই কারণ নেই। দুনিয়ার জীবনে তোমাদের যা কিছু ঘটবে সেই জন্য বিন্দুমাত্র ভয় পেও না। কেননা, আমরা তোমাদেরকে সেই নিয়ামতে ভরা জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছি, যার ওয়াদা আল্লাহ্ তাআলা বার বার তোমাদের কাছে করেছেন।

চার. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ তোমরা সেখানে (জান্নাতে) যা কিছু চাবে, তাই পাবে। আর যে যে জিনিসের ইচ্ছা তোমরা করবে তাই তোমাদের হবে।

সত্যনিষ্ঠ দল মুমিন ব্যক্তিদের জন্য ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে সুসংবাদের আরো একটি বিষয় হলো এই যে, তোমরা তো জান্নাত পাবেই কিন্তু জান্নাতে যেয়ে তোমরা কোন কিছু থেকে অভাব অনুভব করবে না। তোমরা কোন কিছু থেকে বঞ্চিত হবে না। তোমরা যখন যা চাইবে তৎক্ষণাত তাই পাবে, এমনকি তোমাদের মনের মধ্যে যা ইচ্ছা করবে তাই পেয়ে যাবে। মোট কথা তোমাদের প্রতিটি বাসনা পূর্ণ করা হবে- তোমরা চাও বা না চাও।

পাঁচ. نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ এটা হলো ক্ষমাশীল দয়ালু আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মেহমানদারীর সামগ্রী।

নির্যাতিত মুমিন ব্যক্তিদের জন্য ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে পয়গামের পঞ্চম যে প্রতিদান তা হলো- ক্ষমাশীল, দয়ালু দাতা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মেহমানদারী। এটা যে কত বড় পাওয়া এবং কত বড় নিয়ামত তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। দুনিয়া এবং পরকালের জীবনে এর চেয়ে বড় পাওনা আর হতে পারে না। এর চেয়ে বড় মেহমানদারী আর কোন মেহমানদারী হতে পারে না।

نُزُلٌ তথা 'আপ্যায়ন' বা 'মেহমানদারীর' কথা বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এমন অনেক নিয়ামতও পাবে, যার আকাংখাও তোমাদের অন্তরে সৃষ্টি হবে না।

যেমন, মেহমানের সামনে এমন অনেক আইটেমও আসে যার কল্পনাও পূর্বে করা হয় না, বিশেষ করে যখন কোন বড় লোকের ঘরে মেহমানদারী হয়। (তাফসীরে মাযহারী)

মেহমানদারী সম্পর্কে হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, জান্নাতে কোন পাখী উড়তে দেখে তোমাদের মনে তার গোশত খাবার বাসনা সৃষ্টি হবে। আর অমনি তা ভাজা করা অবস্থায় তোমাদের সামনে এসে যাবে। কতক বর্ণনায় আছে, তাকে আগুন ও ধোঁয়া কিছুই স্পর্শ করবে না। আপনা-আপনি রান্না হয়ে সামনে এসে যাবে। (তাফসীরে মাযহারী)

অন্য এক হাদীসে মহানবী (সাঃ) বলেন, যদি জান্নাতি ব্যক্তি নিজ ঘরে সন্তান জন্মের বাসনা করে, তবে গর্ভধারণ, প্রসব, শিশুর দুধ ছাড়ানো এবং যৌবনে পদার্পণ সব এক মুহূর্তের মধ্যেই হয়ে যাবে। (তাফসীরে মাযহারী)

অর্থাৎ জান্নাতি মুমিন ব্যক্তির জন্য আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাশ, খানা-পিনা, আনন্দ-ফুর্তি সবকিছুই জান্নাতে মওজুদ রয়েছে। যেভাবে দুনিয়ায় কোন ভি. ভি.আই পি-র জন্য মওজুদ থাকে। তার থেকেও অনেক অনেক গুণ বেশী মওজুদ রয়েছে যা আমরা দুনিয়ার জীবনে চিন্তাও করতে পারি না।

ঈমানদার লোকদেরকে শান্তনা দান এবং তাদের সাহস বৃদ্ধির পর তাদেরকে তাদের আসল দায়িত্বের কথা উল্লেখ করে পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে-

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ-

আর সেই ব্যক্তির কথা অপেক্ষা অতি উত্তম কথা আর কার হতে পারে, যে মানুষকে আল্লাহ্র দিকে ডাকে, নিজে সৎ কাজ করে এবং বলে আমি একজন মুসলমান? মুমিন লোকদেরকে শান্তনা প্রদান ও তাদের সাহস-হিম্মত বৃদ্ধির পর এখন তাদেরকে তাদের আসল দায়িত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ এবং উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে।

পূর্বের আয়াতে তাদেরকে বলা হয়েছিলো যে, আল্লাহ্কে রব মেনে নিয়ে তাঁর ইবাদত-বন্দেগীর উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং এই পথ গ্রহণের পর তা থেকে বিভ্রান্ত না হওয়াটা এমন এক নেক এবং মহৎ কাজ যা মানুষকে ফেরেশতাদের বন্ধু ও জান্নাত পাবার অধিকারী বানিয়ে দেয়। এখন এই আয়াতে তাদেরকে বলা হচ্ছে যে, তোমরা নিজেরা সৎ কাজ করবে এবং অন্য লোকদেরকেও আল্লাহ্র দাসত্ব করার জন্য দাওয়াত দেবে। আর এই দাওয়াতী কথা ও কাজ

এমন এক অতি উচ্চ ও উন্নত কথা এবং কাজ যা পৃথিবীতে অপর কোন কথা ও কাজ হতে পারে না। তাছাড়া এই আয়াতে মুমিনদেরকে আরও বলা হয়েছে যে, তোমরা শুধু নিজেরা নেক কাজ এবং মানুষকে আল্লাহ্‌র দাসত্বের দিকে দাওয়াত দিয়েই ক্ষান্ত হবে না বরং মক্কার এই কঠিন পরিবেশও যেখানে মুসলমানিত্বটুকু প্রকাশ করার পরিবেশ নেই, এমন প্রতিকূল পরিবেশও ঈমানের দাবী অনুযায়ী বাতিল শক্তির সামনে বুক ফুলে ঘোষণা করে দাও যে, 'আমি একজন মুসলমান'।

আল্লাহ্ পাকের এই কথার গুরুত্ব অনুধাবন করার জন্য যে পরিবেশে এই কথাগুলো বলা হয়েছে তা চোখের সামনে রাখলে সহজেই অনুধাবন করা যাবে। তখন মক্কার অবস্থা ছিলো এই যে, যে ব্যক্তিই মুসলমান হওয়ার কথা প্রকাশ করতো, সে সহসাই মনে করতো, যেন সে হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের জংগলে পা দিয়েছে, যেখানে প্রত্যেকেই তাকে ছিন্ন-ভিন্ন করে খেয়ে ফেলার জন্য ধেয়ে আসছে। এর পরও যে লোক সেখানে ইসলাম প্রচারের জন্য মুখ খুলতো, সেতো যেন হিংস্র জানোয়ারগুলোকে এই বলে দাওয়াত দিতো, আসো তোমরা আমাকে ছিন্ন-ভিন্ন করে খেয়ে ফেল। এই ছিলো তৎকালীন আরব ভূমি মক্কার অবস্থা। এই অবস্থাই বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ্‌কে নিজের রব মেনে নিয়ে তার উপর অবিচল থাকা এবং তা থেকে হটে না যাওয়াটা নিঃসন্দেহে অতি বড় নেকীর কাজ– মৌলিক নেকীর কাজও বটে। কিন্তু তার চেয়েও বেশী এবং পূর্ণ মাত্রার নেকীর কাজ হলো এই যে, সেই ব্যক্তি মাথা উঁচু করে বুক ফুলিয়ে বলবে, 'আমি একজন মুসলমান'। আর পরিনামের চিন্তা না করে দুনিয়ার মানুষকে আল্লাহ্‌র দাসত্বের দিকে দাওয়াত দেবে এবং এই কাজ করতে করতে নিজের আমলকে এতখানি পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করে রাখবে যে, ইসলাম ও তার প্রতিষ্ঠাকারী মুমিন লোকদের কোন দোষ বের করা সম্ভব হবে না।

অতঃপর পরবর্তী আয়াতে এই কঠিন পরিবেশও তাদেরকে আরও উদাহ্‌রতা প্রদানের কথা উল্লেখ করে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ –

ভালো ও মন্দ সমান নয়। তোমরা অন্যায় ও মন্দকে দূর করো সেই ভালো দিয়ে যা অতি উত্তম।

এই আয়াতাংশে আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দানকারীদের বিশেষ পথনির্দেশ দেয়া

হয়েছে। অর্থাৎ তারা মন্দের জবাব ভালো দ্বারা দেবে।

এই কথাটির পূর্ণ তাৎপর্য ও ভাবধারা বুঝবার জন্য ঠিক যেরূপ অবস্থায় নবী করীম (সাঃ) এবং তাঁর মাধ্যমে তাঁর অনুসারীদেহকে এই উপদেশ দেয়া হচ্ছিল তা চোখের সামনে রাখা দরকার। তখন অবস্থা এই ছিল যে, সত্য দ্বীন ইসলামের দাওয়াতের বিরোধীতা করা হচ্ছিল চরম হঠকারীতা ও শক্ত, কঠিন-নির্মম আক্রমনাত্মক ভূমিকা দ্বারা। তাতে মানুষের নীতি-নৈতিকতা মানবতা-মনুষ্যত্ববোধ ও ভদ্রতা এবং সৌজন্যতার সকল সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। রাসূল (সাঃ) এবং তাঁর সংগী-সাথীদের বিরুদ্ধে যতো প্রকারের মিথ্যা হোক তারা বলতো। তাঁর বদনাম করা এবং লোকদেরকে তাঁর সম্পর্কে খারাপ ধারণা দেওয়ার যতো প্রকারের হাতিয়ার ছিলো তারা তা ব্যবহার করতো। তাঁর উপর নানা ধরনের মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগ একের পর এক উত্থাপন করা হতো। তাঁকে এবং তাঁর সংগী-সাথীদেরকে নানা ভাবে যুলুম-নিপীড়ন করা হতো, জ্বালা-যন্ত্রণা দেয়া হতো। এতে অতিষ্ঠ হয়ে বেশকিছু মুসলমান মক্কা ত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলো। রাসূলের দ্বীনের প্রচারের কাজে বাধা দেওয়ার জন্য এমনই এক কর্মসূচী নেয়া হয়েছিলো যে, তার জন্য একদল উচ্ছৃংখল যুবককে নিয়োগ করা হয়েছিলো। যখনই নবী করীম (সাঃ) মানুষের কাছে দাওয়াতী কথা বলতেন তখনই তারা এমন হট্টগোল ও চিৎকার করতো যে, তাঁর কোন কথাই শোনা যেত না। আসলে এটা ছিল খুবই মন খারাপকারী অবস্থা। প্রকৃতপক্ষে দ্বীন প্রচারের সকল পথই বন্ধ মনে হচ্ছিল। ঠিক এরূপ কঠিন অবস্থা ও পরিবেশে তাদের এ ধরনের বিরুদ্ধতার দাঁত চূর্ণ-বিচূর্ণ করার উদ্দেশ্যে রাসূলে কারীম (সাঃ) ও তাঁর সংগী-সাথী মুসলমানদের উদ্দেশ্যে দুটি কথা বলা হয়েছে।

প্রথম কথা হলো ঃ وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ

ভালো ও মন্দ সমান নয়। অর্থাৎ নেকী ও পাপ, ভালো ও মন্দ কখনো একরূপ নহে, সমান হতে পারে না। অর্থাৎ দ্বীনের দাওয়াতের বিরোধীতাকারী কাফের মুশরিকরা অন্যায় ও পাপের যতো বড় তুফানেরই সৃষ্টি করুক না কেন, তার থেকে মোকাবেলায় নেকী ও পূণ্য যতই দুর্বল অসহায় ও অক্ষমই মনে হোক না কেন; আসলে কিন্তু পাপ ও বদ কাজ নিজে খুবই দুর্বল। আর এই জন্যই শেষ পর্যন্ত মন্দ ও খারাপ নেকী ও ভালোর কাছে পরাভূত হবেই। কেননা, মানুষ যতদিন মানুষ, তার প্রকৃতি পাপ ও অন্যায়কে ঘৃণা না করে পারে না। যারা

পাপ এবং অন্যায় করে শুধু তারাই নয় বরং তাদের নেতারাও পর্যন্ত মনে মনে এই কথা অনুভব করে যে, তারা আসলে নিজেরা মিথ্যুক। যুলুম ও নির্যাতন তারা করছে, তারা তাদের হীন স্বার্থ উদ্ধারের জন্যই করছে। এজন্য তারা নিজেদেরকে অপরাধী মনে করে এবং অন্যরাও যে তাদের সম্মান করে না তাও তারা অনুভব করে। তারা নিজেদেরকে চোর চোর ভাবে। কেননা, আল্লাহ্ পাক মানুষকে বিবেক নামের একটি অনুভূতি ক্ষমতা দান করেছেন।

সুতরাং এই পাপ ও অন্যায়ের মোকাবেলায় যদি নেকী ও ভালো একেবারে অসহায়, অক্ষম, দুর্বল মনে হয়, তা যদি ক্রমাগত ও নিরবচ্ছিন্ন ভাবে কাজ করতে থাকে, তা হলে শেষ পর্যন্ত তা জয়ী হবেই। কেননা, নেকীর মধ্যে এমন এক শক্তি নিহিত থাকে যে তা কঠিন দেলকেও প্রভাবিত করে দখল করতে পারে। মানুষ যতই খারাপ হোক না কেন, তার দেলে নেকীর মূল্য ও মর্যাদা অনুভব না করে কিছুতেই পারে না। আর নেকী ও ভালো এবং মন্দ ও খারাপ যখন পরস্পরের সামনা-সামনি হয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং উভয়ই পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করে, তখন এরূপ অবস্থায় দীর্ঘ সময় দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের পর এমন লোক খুব কমই বাকী থাকে যারা বদী ও খারাপের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে নেকী ও ভালোর জন্য আত্মত্যাগ না করে পারে!

দ্বিতীয় কথা হলো ঃ অতঃপর আল্লাহ্ পাক মুমিনদের জন্য দ্বিতীয় যে কথাটি বলেছেন তা হলো-

اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ

তোমরা অন্যায় ও মন্দকে দূর করো সেই ভালো দ্বারা যা অতি উত্তম। এখ-ানে বলা হয়েছে বদী বা অন্যায়ের মোকাবেলা কেবল নেকী বা ভালো দ্বারা করলে চলবে না। করতে হবে এমন নেকী ও ভালো দ্বারা যা অতি উত্তম এবং উচ্চমানের। অর্থাৎ কেউ তোমাদের সাথে অন্যায় করলে তোমরা যদি তা মাফ করে দাও, তা হলে এটা শুধু নেক কাজ হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু অতি উচ্চমানের নেকী হলো এই যে, তোমাদের সাথে যে খারাপ কথা বলবে, তুমি তাকে ভালো কথায় জবাব দেবে। কেউ খারাপ ব্যবহার করলে, সুযোগ পেলে তুমি তার সাথে ভালো ব্যবহার করবে। (তাফহীমুল কুরআন)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই আয়াতের নির্দেশের ব্যাখ্যায় বলেন, যে ব্যক্তি তোমার প্রতি রাগ দেখায়, তার মোকাবেলায় তুমি সবর করো, যে তোমার প্রতি মূর্খতা প্রকাশ করে, তুমি তার প্রতি সহনশীলতা দেখাও এবং যে তোমাকে

জ্বালাতন করে, তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও। (মাযহারী)
অন্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, এই আয়াতের শিক্ষা হলো এই যে, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) কে জনৈক ব্যক্তি গালি দিল অথবা মন্দ বললো। তিনি জবাবে বললেন যদি তুমি সত্যবাদী হও এবং আমি অপরাধী ও মন্দ হই, তা হলে যেন আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করেন। আর যদি তুমি মিথ্যা বলে থাক, তবে আল্লাহ্ যেন তোমাকে ক্ষমা করেন। (কুরতুবী)
দাওয়াত দানকারীর করণীয় সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ পাক অন্য জায়গায় বলেন ঃ

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

(হে রাসূল,) তুমি তোমার রবের দিকে মানুষকে দাওয়াত দাও হিকমত তথা বুদ্ধিমতার সাথে অতি উত্তম কথার দ্বারা এবং তাদের সাথে বিতর্ক করো অতি উত্তম ভাবে। (সূরা নহল-১২৫)

এই আয়াতে আল্লাহ্ পাক দাওয়াত দানকারীকে তিনটি করণীয় সম্পর্কে বলা হয়েছে। এক. দাওয়াত দিতে হবে বুদ্ধিমত্তার সাথে যা গ্রহণযোগ্য হয়। দুই. দাওয়াত দিতে হবে অতি উত্তম কথার দ্বারা। তিন. দাওয়াতী কাজে যদি বিরোধীদের সাথে বিতর্ক হয় তবে অতি উত্তম ভাষায় বিতর্ক করতে হবে, যাতে তারা এক পর্যায়ে স্যালেন্ডার করে।
মন্দ ও খারাপের উত্তর যদি ভালো ও অতি উত্তম কথার দ্বারা দেওয়া হয়, তা হলে তার পরিণতিতে কি হবে, এই কথা বলতে গিয়ে মহান আল্লাহ্ আয়াতের পরবর্তী অংশে বলেন ঃ

فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ-

তাহলে তোমরা দেখবে যে, তোমাদের সাথে যাদের শত্রুতা ছিলো তারা তোমাদের প্রাণের বন্ধু হয়ে গেছে।

মন্দের জবাব অতি উত্তম দ্বারা দিলে তার পরিনাম কি হবে, সেই সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে যে, নিকৃষ্টতম দুশমনও শেষ পর্যন্ত প্রাণের বন্ধু হয়ে যাবে। কেননা, এরূপ হওয়াই মানুষের স্বভাব, এটাই মানুষের প্রকৃতি।
গালাগালির জবাবে যদি কেউ চুপ করে থাকে, তবে এটা যে নেকীর কাজ এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু গালাগালির মুখ তাতে বন্ধ হবে না। গালাগালির জবাবে যদি কেউ তার জন্য উল্টো কল্যাণের দোআ করে, তাহলে যত বড়

বেহায়া দুশমনই হোক না কেন সে অবশ্যই লজ্জিত হবে, তার গালাগালির মুখ বন্ধ হয়ে যাবে। আবার যদি কেউ ক্ষতি করার জন্য চেষ্টা করে, আর যদি কেউ তার এই বাড়াবাড়িকে অহরহ হজম করে যায়, তাহলে সে তার এই অপকর্মের কাজে আরো সাহসী হবে। কিন্তু যদি কেউ কোন সময় দুশমনের ক্ষতি হতে দেখে এবং আগে বেড়ে তার সেই ক্ষতি থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে, তাহলে সে এক সময় দেখা যাবে তার বাড়াবাড়ি তো দূরের কথা সে তার পায়ের উপর এসে পড়ে যাবে। সে বসে এসে যাবে। কেননা, এই উদার ভালো আচারণের মোকাবেলায় কোন খারাবিই টিকে থাকতে পারে না। তার পরেও এটা সাধারণ ও স্থায়ী নিয়ম নাও হতে পারে। এরূপ উচ্চমানের নেকী ও ভালো আচরণ দ্বারা সব দুশমনই যে প্রাণের বন্ধু হয়ে যাবে এমন কথা বলা যায় না। দুনিয়ায় এমন অনেক খবিস আত্মার লোকও আছে, যাদের বাড়াবাড়ি, অত্যাচার-নিপীড়ন ক্ষমা করে এবং তাদের ক্ষতির জবাবে দোয়া ও কল্যাণ করার জন্য যতো প্রকারের উদারতা ও আন্তরিকতা দেখানো হোক না কেন তাদের সেই দুষমনির ছোবল বন্ধ হয় না। যেমন বন্ধ হয়নি আবু জেহেল, আবু লাহাব, উৎবা এবং উতাইবাদের। আল্লাহ্ পাক এ ধরনের অন্তরকে পাথরের চেয়েও কঠিন বলে উল্লেখ করে অন্য আয়াতে বলেন ঃ

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْاَشَدُّ قَسْوَةًؕ وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهٰرُؕ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءُؕ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ

(বনি ঈসরাঈলের লোকদেরকে অসংখ্য ঘটনা এবং নিদর্শন দেখানোর পরও যখন তাদের অন্তর আল্লাহ্ মুখী হলো না, তখন তাদেরকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্ বলেন,) **অতঃপর এ ঘটনার পরে তোমাদের অন্তর আরো কঠিন হয়ে গেল। এতো কঠিন যে তা পাথরের মতো অথবা তার চেয়েও কঠিন। পাথরের মধ্যে তো এমনও আছে, যা থেকে ঝরণা প্রবাহিত হয়, এমনও পাথর আছে যা ফেটে যায়, অতঃপর তা থেকে পানি বের হয় এবং এমনও (পাথর) আছে, যা আল্লাহ্র ভয়ে খসে খসে পড়তে থাকে। (বাকারা-৭৪)**

আর এই সব খবিশ অন্তরের লোকদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ সূরা বাকারার প্রথম দিকে বলেছেন–

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ ؕ وَعَلٰٓى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

আল্লাহ্ তাদের অন্তর এবং কানসমূহে মোহর মেরে দিয়েছেন। আর তাদের চোখ সমূহ পর্দায় ঢেকে দিয়েছেন। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। (বাকারা-৭) তবে এরূপ পরিপূর্ণ শয়তান মানুষ খুব কম সংখ্যক পাওয়া যায়। অতঃপর আল্লাহ্ পাক পরবর্তী আয়াতে কারা মন্দের জবাব ভালো দ্বারা দিতে পারে এই সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন ঃ

وَمَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَمَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ–

এই গুণ কেবল তাদের মধ্যেই আছে, যারা ধৈর্যশীল। আর এই মর্যাদা কেবল তারাই লাভ করতে পারে যারা বড় ভাগ্যবান।

অত্র আয়াতে দাওয়াত দানকারীর দুটি গুণের কথা বলা হয়েছে। একটি হলো– ধৈর্যশীল এবং অপরটি হলো সৌভাগ্যবান।

দাওয়াত দানের ক্ষেত্রে যেসব প্রেসক্রিপশান বা ব্যবস্থা পত্রের কথা বলা হয়েছে তা যদিও খুবই কার্যকর। কিন্তু উহার প্রয়োগ কোন হাসি-মাতাশার ও খেলার বস্তু নয়। এর জন্য বড় মনোবল ও বলিষ্ঠ আত্মার প্রয়োজন। উচ্চ মানসিকতা, দৃঢ় সংকল্প, সহ্যশক্তি এবং অতি বড় আত্মসংযমের প্রয়োজন। হয়তোবা সাময়িক ভাবে কেউ কোন অন্যায়ের মোকাবেলায় বড় কোন নেক কাজ করেদিল, এটা কোন অস্বাভাবিক কাজ নয়, যে কেউ এটা করতে পারে। কিন্তু যেখানে একেক জনকে বছরের পর বছর ধরে এমন সব বাতিল পন্থী ও দুস্কৃতিকারীদের মোকাবেলায় সত্য দ্বীনের জন্য অব্যাহত ভাবে লড়াই সংগ্রাম করতে হয়, যারা কোন নীতি নৈতিকতার ধার ধারে না। যারা নীতি লংঘন করতে একটুও দ্বিধা করে না। তাছাড়া বাহুশক্তি ও ক্ষমতার নেশায়ও থাকে মত্ত। সেখানে নেকী-উচ্চমানের নেকীর ব্যবহার করে যাওয়া এবং একবারও সংযম ও সহনশীলতার রশি টুটে না যাওয়া সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। এই কঠিন কাজ তো সেই আঞ্জাম দিতে পারে, যে ব্যক্তি প্রশান্ত চিত্তে দ্বীনের উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা করার পাকা পোখ্ত সিদ্ধান্ত ও সংকল্প গ্রহণ করে নিয়েছে। যে ব্যক্তি নিজের নফস বা প্রবৃত্তিকে পুরোপুরি ভাবে জ্ঞান-বিবেক-

বুদ্ধির অধীন বানিয়ে নিয়েছে এবং যার মনে-মগযে- প্রকৃতিতে নেকী ও সততা এমন গভীর ভাবে শিকড় গেড়ে বসেছে যে, বিরোধীদের কোন অপকর্ম এবং কোন নিকৃষ্ট আচারণই তাকে তার উচ্চ মর্যাদার স্থান হতে টেনে নীচে নামাতে পারে না।

অতঃপর দ্বিতীয় যে গুণের কথাটি মহান আল্লাহ্ বলেছেন তা হলো-

وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ এই মর্যাদা লাভ করতে পারে কেবল তারাই যারা বড়ই ভাগ্যবান।

যারা আল্লাহ্র দিকে মানুষকে দাওয়াত দেয়, নিজেরা নেক কাজ করে এবং সকল বাধা-বিপত্তিকে উপেক্ষা করে নিজের মুসলমানিত্ব জাহির করতে পারে এবং শত্রুদের গালাগালি ও কটু কথার প্রতিউত্তরে অতি উত্তম কথা বলে,খারাপ আচরণের মোকাবেলায় অতি উত্তম আচরণ কেবল তারাই দেখাতে পারে যারা ধৈর্যশীল, ভাগ্যবান। অতি উচ্চমানের লোকেরাই এসব গুনে গুনান্বিত হতে পারে। আর যেসব লোকের মধ্যে এসব গুন থাকবে, তাকে সফলতার মঞ্জিল হতে কোন ব্যক্তিই বঞ্চিত করতে পারবে না। নীচু প্রকৃতির লোকেরা নিজেদের চক্রান্ত ও জঘন্য ষড়যন্ত্র ও অমানুসিক আচরণ দ্বারা তাকে পরাজিত করবে তা কোন ভাবেই সম্ভবপর নয়।

শিক্ষা ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনাদের সামনে আলোচ্য আয়াতগুলোর দীর্ঘ ব্যাখ্যা পেশা করলাম। এখন অত্র আয়াতগুলোতে আমাদের জন্য যেসব শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো -

● আল্লাহ্ তাআলাকে একমাত্র রব বা প্রতিপালক হিসেবে মেনে নিয়ে ঘোষণা দিতে হবে এবং সকল কিছুর লোভ-লালসা ও বাধাকে উপেক্ষা করে তার উপরই অটল-অবিচল থাকতে হবে।

● যদি কেউ আল্লাহ্ তাআলাকে একমাত্র রব বা প্রতিপালক হিসেবে মেনে নিয়ে তার উপরই অটল-অবিচল থাকে, তাহলে তার সাহায্যের জন্য আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়। তা অবতীর্ণ হয় দুনিয়ার জীবনে, কবরে এবং কিয়ামতের সময়েও।

● আল্লাহ্র উপর অটল-অবিচলরূপে যারা থাকে তাদের উপর ফেরেশতা নাযিল হয় এবং সকল কিছু থেকে অভয় দান করে চিন্তামুক্ত থাকার জন্য উৎসাহ-উদ্দীপনা দান করে।

● ফেরেশতারা এতো সুসংবাদ দান করে যে, তোমাদের এই আমলের জন্য বার বার ওয়াদাকৃত আল্লাহ্র জান্নাত রয়েছে।

● মুমিন লোকদেরকে অভয় দিয়ে ফেরেশতারা বলে আমরা দুনিয়ার জীবনেও তোমাদের সংগী-সাথী এবং আখেরাতের জীবনেও তোমাদের অভিভাবক বা বন্ধু।

● আল্লাহ্কে রব হিসেবে যারা গ্রহণ করবে এবং তার উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকবে তাদেরকে এমন জান্নাত দেয়া হবে যা নিয়ামতে পরিপূর্ণ। মনে যা চাইবে তাতো পাবেই এমন কি যা না চাইবে তাও এনে হাজির করা হবে। যেমন বড় মাপের মেহমানদের সামনে মেহমানদারীর সামগ্রী আনা হয়।

● জান্নাতে অতি উত্তম পাওনা হলো স্বয়ং দয়ালু,ক্ষমাশীল মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মেহমানদারী, যা দুনিয়া এবং আখেরাতের জীবনে এর চেয়ে উত্তম মেহমানদারী হতে পারে না।

● কঠিন প্রতিকুল পরিবেশও মানুষকে আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দেয়া, নিজে সৎ ও নেক আমল করা এবং নিজেকে মুসলিম হিসেবে ঘোষণা দেওয়া।

● ভাল বা নেক এবং মন্দ বা খারাপ সমান হতে পারে না। ভাল ভালই এবং মন্দ মন্দই। সুতরাং দাওয়াতী কাজ করতে যেয়ে যদি কেউ মন্দ বা কটু কথা বলে তাহলে তার জবাবে নেক ও অতি উত্তম কথা দ্বারা জবাব দেওয়া। আর যদি খারাপ আরচণ করে বা ক্ষতি করে তা হলে তার বিনিময়ে ক্ষতি না করে বরং কোন উপকার করে দেওয়া, বিপদের সময়ে এগিয়ে যাওয়া।

● যদি কঠোর দুষমনদের সাথে এ ধরনের অতি উত্তম কথা, কাজ এবং আরচণ আমরা দেখাতে পারি, তাহলে সেই কঠিন দুষমনও পরম অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হয়ে যেতে পারে।

● অবশ্য কঠিন প্রতিকুল পরিবেশ এবং বাধার মুখেও অতি উত্তম কথা কাজ ও আচারণ দেখানোর জন্য অতি উদার, ধৈর্যশীল এবং সহনশীল হতে হবে।

আহবান ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! সূরা হা-মীম-আস সাজদাহ থেকে যে দারস পেশ করলাম এতে যদি আমার অজান্তে কোন ভুল অথবা বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, তার জন্য মহান আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর দারস থেকে আমরা যেসব মহামূল্যবান শিক্ষা লাভ করলাম তা যেন বাস্তব জীবনে আমল করতে পারি সেই তাওফীক কামনা করে দারস শেষ করছি। মাআসমালাম।

ছয়

দাওয়াতে দ্বীনের কাজে অধৈর্য হলে চলবে না

(সূরা আনয়াম-৩৩-৩৬)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ الصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ- اَعُوْذُ بِا للّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهٗ لَيَحْزُنُكَ الَّذِىْ يَقُوْلُوْنَ فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ- وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَاُوْذُوْا حَتّٰى اَتٰهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ وَلَقَدْ جَائَكَ مِنْ نَّبَاِئ الْمُرْسَلِيْنَ- وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِىَ نَفَقًا فِى الْاَرْضِ اَوْ سُلَّمًا فِى السَّمَاءِ فَتَاْتِيَهُمْ بِاٰيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ- اِنَّمَا يَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ وَالْمَوْتٰى يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ ثُمَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ-

সরল অনুবাদ ঃ ইরশাদ হচ্ছে– (৩৩) হে মুহাম্মাদ! আমি জানি, এরা যেসব কথাবার্তা বলে থাকে তাতে তোমার বড়ই মনে কষ্ট হয়, কিন্তু এরা কেবল তোমাকেই অমান্য করছে না, প্রকৃতপক্ষে এই যালেমরা আল্লাহ্‌র বাণী ও নিদর্শনসমূহকেই মানতে অস্বীকার করছে। (৩৪) তোমার পূর্বেও বহু সংখ্যক রসূলকে মিথ্যারোপ করা হয়েছে; কিন্তু এই মিথ্যারোপ ও কষ্ট নির্যাতন তাঁরা বরদাস্ত করে নিয়েছে। ফলে শেষ পর্যন্ত আমার সাহায্য তাঁদের কাছে এসে পৌঁছেছে। আল্লাহ্‌র বাণী বা কথা পরিবর্তন করার

ক্ষমতা কারো নেই, (হে নবী) পূর্ববর্তী নবীদের সম্পর্কে খবরা-খবর তো তোমার কাছে পৌঁছেছে। (৩৫) এর পরেও যদি তাদের অনাগ্রহ্ ও উপেক্ষা সহ্য করা তোমার পক্ষে কঠিন হয় তাহলে তোমার শক্তি থাকলে যমীনে কোন সুড়ংগ তালাশ করো, অথবা আকাশে সিঁড়ি লাগিয়ে নাও এবং তাদের সামনে কোন নিদর্শন পেশ করার চেষ্টা করো। আল্লাহ্ চাইলে তো এসব লোককে তিনি একত্রিত করে হেদায়াত করতে পারতেন। অতএব তুমি অজ্ঞ-মুর্খ লোকদের মতো হয়ো না। (৩৬) আসলে তোমার দাওয়াত পেয়ে তারাই সাড়া দেয় যারা শুনতে পায়; আর যারা মুর্দা তাদেরকে তো আল্লাহ কবর হতেই জিন্দা করে উঠাবেন। তখন আল্লাহ্র সামনে বিচারের জন্য তাদেরকে আনা হবে।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ قَدْ -নিশ্চয় বা অবশ্য অবশ্যই। نَعْلَمُ -আমরা জানি। اِنَّهُ -নিশ্চয় তা। لَيَحْزُنُكَ-তোমাকে অবশ্যই বিষন্ন করে বা মনোকষ্ট দেয়। يَقُوْلُوْنَ-তারা বলে। فَاِنَّهُمْ -তবে নিশ্চয় তারা। لَا -না। يُكَذِّبُوْنَكَ -তোমাকে মিথ্যারোপ করে। لٰكِنَّ -কিন্তু। بِاٰيٰتِ اللّٰهِ-আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহ। يَجْحَدُوْنَ-মানতে অস্বীকার করে। لَقَدْ- -নিশ্চয়ই। كُذِّبَتْ-মিথ্যারোপ করা হয়েছে। قَبْلِكَ-তোমার পূর্বে। فَصَبَرُوْا -অতঃপর তারা ধৈর্য ধারণ করেছে। عَلٰى -এর উপর। مَا - যা কিছু। كُذِّبُوْا -তাদের মিথ্যারোপ করা হয়েছে। اُوْذُوْا -তাদের কষ্ট দেয়া হয়েছে। حَتّٰى-যতক্ষণ না। اَتٰهُمْ-তাদের কাছে এসেছে। نَصْرُنَا- -আমাদের সাহায্য। مُبَدِّلَ-কোন পরিবর্তনকারী। لِكَلِمٰتِ-বাণী সমূহের। جَاءَكَ-তোমার কাছে এসেছে। نَبَاِى -খবর। مُرْسَلِيْنَ- -প্রেরিত পুরুষদের। اِنْ -যদি। كَانَ -হয়। كَبُرَ -কষ্টকর। عَلَيْكَ-তোমার উপর। اِعْرَاضُهُمْ -তাদের উপেক্ষা করা বা এড়িয়ে যাওয়া। اِسْتَطَعْتَ -তুমি সমর্থ হও। تَبْتَغِىَ -তুমি সন্ধান করো। نَفَقًا-কোন সুড়ঙ্গ। اَوْ-অথবা। -

سُلَّمًا –সিঁড়ি। فَتَأْتِيَهُمْ –অতঃপর তাদেরকে এনে দাও। بِاٰيَةٍ–কোন নিদর্শন। لَوْ –যদি। شَاءَ اللّٰهُ –আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন। لَجَمَعَهُمْ–তাদের অবশ্যই একত্রিত করতেন। عَلَى الْهُدٰى –হেদায়াতের উপর। فَلَا–অতএব না। تَكُوْنَنَّ –তুমি হয়ো। اِنَّمَا –প্রকৃতপক্ষে। يَسْتَجِيْبُ–ডাকে সাড়া দেয়। يَسْمَعُوْنَ –তারা শুনে। اَلْمَوْتٰى–মৃত্যু বা মুর্দা। يَبْعَثُهُمْ–তাদের পুনর্জীবিত করবেন বা উঠাবেন। ثُمَّ–অতঃপর বা এরপর। اِلَيْهِ–তারই দিকে। يُرْجَعُوْنَ–তাদের ফিরিয়ে আনা হবে। قَالُوْا –তারা বলে। لَوْ –কেন বা যদি। نُزِّلَ–নাযিল করা হয়। عَلَيْهِ–তার উপর। -اٰيَةٌ– কোন নিদর্শন। رَبِّهٖ –তার রবের। قَادِرٌ –সক্ষম। يُنَزِّلَ- –নাযিল করবেন। اَكْثَرَهُمْ –তাদের অধিকাংশই।

সম্বোধন ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! আস্সালামু আলাইকুম অয়ারাহমাতুল্লাহি অয়াবারাকাতুহ্। আমি আপনাদের সামনে দারসে কুরআন পেশ করার জন্য সূরা আনযাম এর ৩৩-৩৬ আয়াত পর্যন্ত মোট ৪টি আয়াত তেলাওয়াত ও তরজমা পেশ করেছি। আল্লাহ্ পাক যেন আমাকে আপনাদের সামনে সঠিক ভাবে দারস পেশ করার তাওফীক দান করেন। আমিন।

সূরার নামকরণ ঃ এই সূরার ১৬তম রুকুর ১৩৬ নম্বর আয়াতে উল্লেখিত

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا-

(অর্থাৎ ‘লোকেরা আল্লাহ্র জন্য নিজেরই পয়দা করা ক্ষেত-খামারের ফসল ও গৃহপালিত পশু হতে একটি অংশ নির্দিষ্ট করেছে’)। اَلْاَنْعَام (গৃহপালিত পশু) শব্দটিকেই সূরার নামকরণ হিসেবে বাছাই করা হয়েছে। যদিও সূরার ১৬ ও ১৭ রুকুতে কোন গৃহপালিত পশু হালাল ও কোনটি হারাম হওয়া সম্পর্কে আরবদের অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধারণা প্রতিবাদ করা হয়েছে, তথাপিও সূরাটির নামকরণ কোন ‘শিরোনাম’ হিসেবে করা হয়নি। বরং অন্যান্য সূরার

ন্যায় 'প্রতীকী' বা 'চিহ্ন' হিসেবে করা হয়েছে। তবে যা করা হয়েছে তা ওহীর নির্দেশেই করা হয়েছে।

সূরাটি নাযিল হবার সময়কাল ঃ সূরাটি সর্বসম্মতিক্রমে মাক্কী। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, এই সূরাটি মক্কা শরীফে একই সংগে নাযিল হয়েছে। হযরত মাআ'য ইবনে জাবালের চাচাতো বোন আসমা বিনতে ইয়াজীদ (রাঃ) বলেন ঃ এই সূরা যখন নবী করীম (সাঃ) এর উপর নাযিল হচ্ছিল, তখন তিনি এক উটের উপর চড়া ছিলেন, আর আমি তার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ওহীর চাপে উটের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে গিয়েছিলো। মনে হচ্ছিল, তার মেরুদন্ড বুঝি এক্ষুণি ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। হাদীসে একথাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, যে রাতে এই সূরাটি নাযিল হয়, সেই রাতেই নবী করীম (সাঃ) এটা লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন।

এই সূরার বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করলে স্পষ্টভাবে মনে হয় যে সূরাটি সম্ভবত মাক্কী জীবনের শেষ দিকে নাযিল হয়েছে। আসমা বিনতে ইয়াজীদের উপরোক্ত হাদীসও এর সত্যতা প্রমাণ করে। কেননা, তিনি ছিলেন আনসার গোত্রের মাহিলা। হিজরাতের পরে তিনি ইসলাম কবুল করার পূর্বে শুধু ভক্তি-শ্রদ্ধার কারণেই যদি তিনি রাসূলে করীম (সাঃ) এর নিকট মক্কায় হাজির হয়ে থাকেন, তবে তা অবশ্যই মক্কী জীবনের শেষ বৎসরই সম্ভব হয়ে থাকবে। কেননা, এর আগে ইয়াসরাববাসীদের (মদীনা) সাথে নবী করীম (সাঃ) এর সম্পর্ক খুব গভীর ও নিকটতম ছিলনা এবং সেই কারণেই সেখানকার কোন মহিলার পক্ষে তাঁর দরবারে হাজির হওয়াও সম্ভপর হতে পারে না।

সূরাটি নাযিল হওয়ার উপলক্ষ ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! সূরাটি নাযিল হওয়ার সময়কাল নির্ধারিত হওয়ার পর আমরা অতি সহজেই এর নাযিল হওয়ার উপলক্ষ সম্পর্কে ধারণা করতে পারি। ইসলামে দাওয়াত ও প্রচারের কাজ করতে করতে আল্লাহ্‌র রাসূলের ১২টি বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। কুরাইশদের শত্রুতা, বিরুদ্ধতা ও যুলুম-নির্যাতনের মাত্রা চরম সীমায় পৌঁছেছে। ইসলাম কবুলকারীদের মধ্যে এক বিরাট সংখ্যক নব মুসলিম তাদের যুলুম-নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে আবিসিনিয়ায় হিজরাত করতে বাধ্য হয়েছে। রাসূলের সাহায্য ও সহযোগীতা করার জন্য না চাচা আবু তালিব জীবিত ছিলেন, আর না ছিলেন প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজাতুল কুবরা। এইজন্য সকল প্রকার বৈষয়িক আশ্রয়-প্রশ্রয় হতে বঞ্চিত হয়ে তিনি কঠিন বাধা ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যে ইসলাম প্রচার ও রিসালাতের দায়িত্ব পালন করছিলেন। তাঁর প্রচার ও প্রভাবে মক্কা এবং তার

আশপাশের গোত্রগুলোর মধ্যেও বহু সৎ লোক পরপর ইসলাম কবুল করে যাচ্ছিল। কিন্তু গোটা আরব জাতি সামগ্রিকভাবে তা প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকার করার জন্যই দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়েছিল। যেখানেই কোন লোক ইসলামের দিকে সামান্য আগ্রহ ও উৎসাহ প্রকাশ করতো- তাকেই ঠাট্টা-বিদ্রুপ, তিরস্কার, দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বয়কট, সম্পর্কচ্ছেদ প্রভৃতি আঘাতে জর্জরিত ও পর্যদুস্ত করে ছাড়তো। এমনি এক অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশে কেবলমাত্র ইয়াসরীব বাসিরাই 'বায়আতে আকাবার' মাধ্যমে ইসলাম কবুল করেছিলো এবং কোন প্রকার বাধা ছাড়াই ইসলামের প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

মদীনায় ইসলামের এই সামান্য প্রচার ও প্রসার ভবিষ্যতে যে বিপুল সম্ভাবনা নিহিত ছিলো তা কোন স্থূলবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ দেখতে পেত না। বাহ্যিক দৃষ্টিতে মানুষ শুধু এতটুকুই দেখতে পেত যে, ইসলাম একটি দুর্বলতম আন্দোলন। তার পেছনে কোন শক্তির সাহায্য সহযোগীতা বর্তমানে নেই। তার নেতা নিজ বংশের দুর্বলচেতা কয়েকজন লোকের সাহায্য ছাড়া আর কোন শক্তিরই অধিকারী নয়। মুষ্টিমেয় কয়েকজন অসহায় আশ্রয়হীন বিচ্ছিন্ন লোক নিজেদের বাপ-দাদার প্রথা ও আদর্শকে পরিত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছে মাত্র। আর এর ফলে তাদেরকে সমাজ থেকে দূরে ঠেলে দেয়া হয়েছে। উপরে বর্ণিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই সূরাটি নাযিল হয়। এর আলোচ্য বিষয় সমূহকে সাতটি বড় বড় ভাগে ভাগ করা যায়। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো-

এক. শিরককে বাতিল করে তৌহীদে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য আহবান।

দুই. এই দুনিয়ার জীবনই একমাত্র জীবন, এর পরবর্তী জীবন বলে কিছুই নেই এই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বিশ্বাস বা ধারণার প্রতিবাদ।

তিন. জাহেলী যুগের লোকদের মনে বদ্ধমূল অমূলক ধারণা-খেয়ালের প্রতিবাদ।

চার. সুস্থ সমাজ গঠনের জন্য ইসলামের উত্থাপিত নৈতিক মূলনীতি শিক্ষাদান।

পাঁচ. রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁর আন্দোলন সংগ্রামের বিরুদ্ধে লোকদের উত্থাপিত প্রশ্ন ও আপত্তি সমূহের জবাব।

ছয়. দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন সংগ্রাম করার পরেও আন্দোলন ফলপ্রসু না হওয়ার ফলে নবী করীম (সাঃ) ও সাধারণ মুসলমানদের মনে যে ব্যাকুলতা, অস্থিরতা ও মনভাব অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছিল সে সম্পর্কে শান্তনা প্রদান।

সাত. ইসলামে অবিশ্বাসী ও বিরোধী লোকদের উপেক্ষা, অবহেলা, অজ্ঞতা ও

উদাসীনতার কারণে আত্মহত্যামূলক নীতি অবলম্বনের দরুন তাদেরকে নসীহত করা, সাবধান করা, সতর্ক এবং ভীতি প্রদান করা।

আলোচ্য আয়াত সমূহের বিষয়বস্তু ঃ দাওয়াতী কাজে বিরোধীদের বিমুখতা, ঠাট্টা-বিদ্রুপ এবং অসৌজন্যমূলক আচরণে মনে কষ্ট না পাওয়া। তাছাড়া দাওয়াতী কাজে তাড়াতাড়ি এবং আশানুরূপ ফল লাভ না করার কারণে অধৈর্য না হওয়া।

ব্যাখ্যা ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনাদের সামনে দারসের জন্য প্রাথমিক ও প্রয়োজনীয় ধারণা প্রদান করলাম। এখন আমি আপনাদের সামনে আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা পেশ করছি।

আল্লাহ্ তাআলা মোহাম্মদ (সাঃ)কে সম্বোধন করে গোটা মুসলিম উম্মাহকে অবহিত করে বলেন ঃ

قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهٗ لَيَحْزُنُكَ الَّذِىْ يَقُوْلُوْنَ فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ.

হে মুহাম্মদ (সঃ)! আমি জানি; এরা যেসব কথাবার্তা বলে থাকে তাতে তোমার বড়ই মনোকষ্ট হয়, কিন্তু এরা কেবল তোমাকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে না, বরং এই জালেমরা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকেই অস্বীকার করছে।

নবী করীম (সাঃ) যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ্‌র বাণী শুনাবার কাজ শুরু করেননি, ততদিন পর্যন্ত তাঁর জাতি মক্কার লোকেরা তাঁকে 'আল আমীন' বা 'সত্যবাদী' হিসেবে মনে করতো এবং তাঁর সততা ও বিশ্বস্ততার প্রতি পূর্ণ আস্থাবান ছিলো। কিন্তু যখন তিনি তাদের সামনে আল্লাহ্‌র পয়গাম পেশ করা শুরু করলেন তখন থেকে তারা তাকে অমান্য ও অস্বীকার করতে লাগলো। এর ফলে রাসূল (সাঃ) মনে খুব কষ্ট পেতে লাগলেন এবং মনো ভাঙ্গা হয়ে পড়লেন। তখন আল্লাহ্ তাকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ.

কাফেরেরা প্রকৃতপক্ষে তোমার প্রতি মিথ্যারোপ করে না বরং তারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর প্রতিই মিথ্যারোপ করে।

মক্কার কাফেরদের মধ্যে এমন কোন বাপের বেটা ছিলো না যে রাসূলে কারীম (সাঃ)কে মিথ্যাবাদী বলার দুঃসাহস রাখে। তাঁর কোন প্রাণের শত্রুও কখনো তাঁর বিরুদ্ধে এ অভিযোগ করেনি যে মুহাম্মদ (সাঃ) দুনিয়ায় কোন ব্যাপারে

কখনো কোন মিথ্যা বলেছে। তারা তাঁর যা কিছু বিরোধীতা করেছে তা তাঁর নবী হওয়ার দিক দিয়েই করেছে। এ ব্যাপারে রাসূলের সবচেয়ে বড় দুষমন আবু জেহেলের মনোভাব সংক্রান্ত দু'টি ঘটনাও উল্লেখ রয়েছে।

প্রথম ঘটনা হলো ঃ একবার কাফের সর্দার আখলাস ইবনে শরীক ও আবু জাহলের মধ্যে স্বাক্ষাৎ হলে আখলাস আবু জাহলকে জিজ্ঞেস করলো ঃ হে আবুল হিকাম [আরবে আবু জাহল আবুল হিকাম (পন্ডিতের বাপ বা জ্ঞানাধর) নামে খ্যাত ছিলো। ইসলামের যুগে কুফরী এবং দ্বীনের অজ্ঞতার কারণে তাকে 'আবু জাহল' মুর্খতার বাপ বা মুর্খতাধর উপাধি দেয়া হয়।] আমরা এখন দু'জন একান্তে আছি। আমাদের কথাবার্তা কেউ শুনবে না, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ সম্পর্কে তোমার প্রকৃত ধারণা কি আমাকে সত্যি করে বলো তো ? তাকে সত্যবাদী মনে করো না মিথাবাদী ? আবু জাহল আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বললোঃ নিঃসন্দেহে মুহাম্মদ সত্যবাদী। তিনি সারা জীবন মিথ্যা বলেননি। কিন্তু ব্যাপার হলো এই যে, কোরাইশ গোত্রের একটা শাখা 'বনী কুসাই' এসব গৌরব ও মর্যাদার অধিকারী হবে, আর অন্যান্য কোরাইশরা মাহরুম হবে- এটা আমরা কিভাবে সহ্য করতে পারি ? পতাকা বনী কুসাই-এর হাতে রয়েছে। হারাম শরীফে হাজীদেরকে পানি পান করানোর গৌরবজনক কাজটিও তারাই করে। কাবা ঘরের পাহারাদারী ও চাবি তাদেরই অধিকারে। এখন যদি আমরা নবুওয়াতও তাদেরই ছেড়ে দেই, তাহলে অন্যান্য কোরাইশদের হাতে কি থাকবে ?

দ্বিতীয় ঘটনা হলো ঃ হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার আবু জাহল নিজে নবী করীম (সাঃ)এর সাথে কথা প্রসংগে বলে, হে মুহাম্মদ আমরা তো আপনাকে মিথ্যাবাদী বলিনা, কিন্তু আপনি যা কিছু প্রচার করছেন আমরা তাকেই মিথ্যা বলছি।

কাফেরদের উপরোক্ত মনোভাব এবং তাদের ভূমিকার কারণেই আল্লাহ্‌পাক তাঁর নবীকে এই বলে শান্তনা দিচ্ছেন যে, এখানে মূলতঃ তোমাকে কেউ মিথ্যাবাদী বলছে না বা অস্বীকার করছে না। বরং মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে আমার বাণীকে এবং অস্বীকার করছে আমাকে। এসব কিছুর পরও যখন আমি সব কিছুকে উপেক্ষা করছি এবং ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে সবকিছুকে বরদাশত করে যাচ্ছি। তখন তোমার চিন্তিত হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে এবং খামাখা মনে কষ্ট নেয়ারই বা কি প্রয়োজন আছে ?

প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! নবী (সাঃ) থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত যারাই দাওয়াতে দ্বীনের কাজ করেছে, আল্লাহ্‌র দ্বীনকে যমীনে প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা-সংগ্রাম করেছে তখনই তাদেরকে বাধা দেয়া হয়েছে, ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হয়েছে, যুলুম-নির্যাতন করা হয়েছে, মানসিক, দৈহিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে কষ্ট দেয়া হয়েছে। আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে কাফের মুশরেকরা বা খোদাদ্রোহীরা যারাই একাজ করেছে তারা 'দায়ী' বা আল্লাহ্‌র দিকে আহবান কারীদের বিরুদ্ধে এসব কিছু করে নাই বরং এসব করেছে আল্লাহ্‌র দ্বীনের বিরুদ্ধে, আল্লাহ্‌র বাণীর বিরুদ্ধে। তাদের দুনিয়ার স্বার্থ সংরক্ষণের পক্ষে।

আল্লাহ্ তাআলা মুহাম্মদ (সাঃ)কে দাওয়াতে দ্বীনের কাজে আরো আগ্রহ ও উৎসাহ প্রদানের জন্য পূর্ববর্তী নবীদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন ঃ

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَاُوْذُوْا حَتّٰى اَتٰهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَّبَاِئ الْمُرْسَلِيْنَ-

(হে নবী!) তোমার পরেও বহু নবী রাসূলকে মিথ্যাবাদী সাইবস্ত করা হয়েছে। কিন্তু এই মিথ্যাবাদীতা ও তাঁদের উপর জ্বালাতন-নির্যাতনে তাঁরা ধৈর্য ধারণ করেছে এবং বরদাস্ত করে নিয়েছে। শেষ পর্যন্ত আমার সাহায্য তাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। আল্লাহ্‌র বাণী কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। তোমার কাছে তো পূর্বের নবীদের কিছু কাহিনী বা খবরা-খবর পৌঁছেছে।

অত্র আয়াতে মহান আল্লাহ্ পাক দ্বীনের 'দায়ী' ও আন্দোলন-সংগ্রামে নেতৃত্বদানকারী ও এর বিরোধীদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত এটা চিরাচরিত নিয়ম। এটা রদ করার ক্ষমতা কেউ রাখে না। এসব আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে চালুকৃত নিয়ম-বিধান। এটা ঈমানের দাবীদার ও সত্যপন্থীদের যাচাই-বাচাই-এর স্থায়ী মানদন্ড। সুতরাং আদম (আঃ) থেকে শুরু করে অতীতে যতো নবী রাসূল এসেছে তাদেরকে এবং তাঁদের সংগী-সাথীদেরকে এক দীর্ঘ মেয়াদী যাচাই-বাচাই-এর পরীক্ষার আগুনে উত্তপ্ত হতে হয়েছে। তাদেরকে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতে হয়েছে। আত্মত্যাগ, আত্মোৎসর্গ ও কুরবাণীর মাধ্যমে নিজেদের ঈমানের মজবুতি, পরিপক্কতা এবং পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র উপর

নির্ভরতার কঠিন পরীক্ষা দিতে হয়েছে। তাদেরকে কঠিন বিপদ-মুসিবতের পর্যায় অতিক্রম করতে হয়েছে। কেননা, জাহেলিয়াতের উপর বিজয় লাভের জন্য পরীক্ষিত মজবুত ঈমান, উন্নত চরিত্র, মহান নৈতিকতা এবং আল্লাহ্র উপর অগাধ-আস্থার প্রয়োজন। আর যখনই তাঁরা এসব কিছুর প্রমাণ দেখাতে পেরেছে তখনই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বিজয়ের জন্য বাকী সাহায্যটুকু এসে হাজির হয়ে গেছে। এই চিরাচরিত নিয়ম এবং এক নির্দিষ্ট সময়ের আগে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সাহায্য লাভ করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং হে নবী (সাঃ) শুধু তোমাকেই নয়, বরং তোমার আগের নবী রাসূলদেরকে একই কারণে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে, তাদেরকে অমান্য করেছে। তাদের আনীত দ্বীনকে মিথ্যা সাইবস্ত করেছে এবং অস্বীকার করেছে। তাদেরকে মানসিক, দৈহিক ও আর্থিক ভাবে কষ্ট-যন্ত্রণা দেয়া হয়েছে। অথচ তাঁরা এসব কিছুকে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পরীক্ষা মনে করে ধৈর্য ধারণ করেছে এবং সব কিছুকে বরদাস্ত করেছে। আর তখনই আল্লাহ্র পক্ষ হতে তাদের কাছে সাহায্য এসে পৌঁছেছে। যেমন, মহান আল্লাহ্ পাক সূরা বাকারার ২১৪ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করে বলেন-

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ؕ مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ-

তোমরা কি মনে করে নিয়েছো যে, তোমরা অতি সহজেই জান্নাতে চলে যাবে ? অথচ এখনও তোমাদের পূর্বের লোকদের মতো বিপদ-আপদ আসেনি। তাদের উপর তো এসেছিলো বহু বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্ট। তাদেরকে (বাতিলদের) অত্যাচার-নির্যাতনে এমন ভাবে জর্জরিত করে দেয়া হয়েছিলো যে, শেষ পর্যন্ত তৎকালীন রাসূল এবং তাঁর সংগী-সাথীরা আর্ত চিৎকার করে বলে উঠেছিলো কখন আল্লাহ্র সাহায্য আসবে ? তখন তাদেরকে শান্তনা দিয়ে বলা হয়েছিলো যে, আল্লাহ্র সাহায্য অতি নিকটে। কোরআনের এই আয়াতেও প্রমাণিত হয় যে, অতীতের নবী রাসূল এবং তাদের সংগী-সাথীদেরকে তৎকালীন খোদাদ্রোহীদের যুলুম-নির্যাতন দ্বারা তাদের

পরীক্ষা করেছিলেন এবং এই পরীক্ষা থেকে উদ্ধারের জন্য তারা আল্লাহ্র সাহায্যই কামনা করেছিলো এবং এক পর্যায়ে আল্লাহ্র সাহায্য এসে পৌঁছেছিলো। অতীতের নবী এবং ঈমানদার লোকদের কঠিন এবং লোমহর্সক নির্যাতনের চিত্র হযরত খাব্বারের বর্ণিত হাদীসে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) নিজে তুলে ধরে বলেনঃ

عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْاَرَتِّ قَالَ شَكَوْنَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهٗ فِى ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَقُلْنَا اَلَا تَسْتَنْصِرُ اَلَا تَدْعُوْ لَنَا ؟ فَقَالَ قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُلَهٗ فِى الْاَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيْهَا فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوْضَعُ عَلٰى رَأْسِهٖ فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ وَيُمْشَطُ بِاَمْشَاطِ الْحَدِيْدِ مَا دُوْنَ لَحْمِهٖ وَعَظْمِهٖ فَمَا يَصُدُّهٗ ذٰلِكَ عَنْ دِيْنِهٖ وَاللّٰهِ لَيَتِمَّنَّ هٰذَا الْاَمْرُ حَتّٰى يَسِيْرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ اِلٰى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ اِلَّا اللّٰهَ وَالذِّئْبَ عَلٰى غَنَمِهٖ وَلٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُوْنَ-

হযরত খাব্বাব ইবনুল আরাত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এমন এক সময় অভিযোগ করলাম যখন তিনি কাবা ঘরের ছায়ায় চাদর দিয়ে বালিশ করে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আমরা অভিযোগ করলাম, (কাফেরদের যুলুম-নির্যাতন থেকে রক্ষার জন্য। হে রাসূল!) আমাদের জন্য কি আপনি সাহায্য প্রার্থনা করবেন না ? আমাদের জন্য কি দোআ করবেন না ? তিনি প্রতিউত্তরে বললেন ঃ (যেনে নাও) তোমাদের পূর্বেকার ঈমানদার লোকদের ধরে এনে মাটিতে গর্ত করে তাতে পুঁতে দেয়া হতো। তারপর তাদের মাথা বরাবর করাত চালিয়ে দ্বিখন্ডিত করে দেয়া হতো। কাকেও কাকেও লোহার আঁচড়া দিয়ে দেহের গোশত্ ও হাড়কে আলাদা করে দেয়া হতো। কিন্তু এ নির্মম অত্যাচারেও তাদেরকে তাদের দ্বীন থেকে বিরত রাখতে পারেনি। আল্লাহ্র কসম! এ দ্বীন পরিপূর্ণ ভাবে বিজয়ী হবেই। তখন এমন এক দিন

আসবে যখন কোন ভ্রমণকারী নির্বিঘ্নে 'সানআ' থেকে 'হাযরা মাউত' পর্যন্ত ভ্রমণ করতে পারবে। তখন আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে ভয় করতে হবে না। আর মেষ পালের জন্য শুধু বাঘের ভয় ছাড়া আর কোন ভয় থাকবে না। কিন্তু তোমরা খুব তাড়াহুড়ো করছো। (বুখারী)।

এই হাদীস থেকে অতীতের ঈমানদার লোকদের দ্বীন পালন, দ্বীনের দাওয়াত এবং দ্বীনের আন্দোলনের জন্য কি ধরনেরই না নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে একবার চিন্তা করলে লোম শিহরিয়া উঠে।

অতএব হে নবী (সাঃ) তুমি মক্কার অত্যাচারী কাফেরদের পক্ষ থেকে এসব যুলুম-নির্যাতন এবং রূঢ় আচরণের জন্য মনে কষ্ট নিও না, বরং ধৈর্য ধারণ করো এবং এসবকে বরদাস্ত করে চলো। আর এতো কিছু পরিবত দেয়ার পরও যদি তোমার কাছে এসব সহ্য ও বরদাস্ত করা সম্ভব না হয়, তাহলে তুমি ভিন্ন পথ অবলম্বন করো। আর তাহলো-

وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِىْ نَفَقًا فِى الْاَرْضِ اَوْسُلَّمًا فِى السَّمَاءِ فَتَاْتِيَهُمْ بِاٰيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ

(হে মুহাম্মদ) আর যদি তাদের অনাগ্রহ ও উপেক্ষা তোমার পক্ষে সহ্য করা কঠিন হয়, তাহলে তোমার শক্তি থাকলে যমীনে কোন সুড়ংগ তালাশ করো। অথবা আকাশে সিঁড়ি লাগিয়ে নাও এবং তাদের সামনে কোন মোযেজা বা নিদর্শন পেশ করার চেষ্টা করো। আল্লাহ্ চাইলে তো এসব লোককে তিনি একত্রিত করে হেদায়াত করতে পারতেন। অতএব তুমি অজ্ঞ মূর্খের মতো হয়ো না।

হযরত নবী করীম (সাঃ) যখন দেখতেন যে, এই জাতির লোকদেরকে দ্বীনের দাওয়াত এবং ইসলামের কথা বুঝাতে বুঝাতে অনেক সময় অতিবাহিত হয়ে গেল, কিন্তু এরা কিছুতেই সঠিক পথে ফিরে আসছে না, তখন অনেক সময় তাঁর মনে এই খেয়াল জাগত যে, যদি আল্লাহ্র তরফ থেকে এমন কোন মোজেযা বা নিদর্শন যাহির হতো যা দেখে এরা কুফরী ত্যাগ করে আমার নবুওয়াত মেনে নিত তা হলে কতই না ভাল হতো। আলোচ্য এই আয়াতে

রাসূলের এই মনের বাসনারই জবাব দেওয়া হয়েছে। কথার মর্ম হলো এই যে, হে নবী ধৈর্য হারা হইও না। যে ধারায় এবং পদ্ধতিতে আল্লাহ্ তাআলা এই দাওয়াতী আন্দোলনের কাজ পরীক্ষার মাধ্যমে চালাতে চান, ধৈর্যের সাথে তা মেনে চলো। অধৈর্য হয়ো না এবং চিরাচরিত পদ্ধতির বাইরে অন্য কিছু চিন্তা বা কল্পনা করো না। যদি কোন অলৌকিক পদ্ধতিতে কাজ উদ্ধার করতে প্রয়োজন হতো তাহলে তিনি কি নিজেই এসব করতে পারতেন না ? প্রকৃতপক্ষে চিন্তা, বিশ্বাস ও নীতি-নৈতিকতার ক্ষেত্রে যে বিপ্লব এবং যে সুন্দর সুষ্ঠ ও কল্যাণকর সমাজ গঠনের কঠিন কাজে তোমাকে নিয়োজিত করা হয়েছে, উহাকে সাফল্যের চূড়ান্ত মনযিলে পৌঁছানোর জন্য এই সব অঘটন মোজেযা বা নিদর্শন ঘটানোর পদ্ধতি কখনই সুষ্ঠ ও কার্যকর হতে পারে না। এর পরেও যদি তুমি লোকদের জড়তা ও বিমুখোতা এবং তাদের কঠোরতা সহ্য করতে না পার এবং তাদের জড়তা দূর করার জন্য এমন কিছু অলৌকিক মোজেযা দেখানো একান্তই জরুরী বলে মনে করো, তা হলে নিজেই তার চেষ্টা করে দেখ। তোমার যতো শক্তি আছে তাও নিয়োগ করো এবং তোমার ক্ষমতা থাকলে যমীনের তলায় সুড়ঙ্গ দিয়ে ঢুকে অথবা আকাশে সিঁড়ি লাগিয়ে উঠে এমন কোন মু'জিযা তালাশ করো যা দিয়ে বর্তমানে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তা দূর করা যায়। হে নবী আমি আমার চিরাচরিত নিয়ম ভঙ্গ করে তোমার এই মনের বাসনা পূর্ণ করবো এ ধরনের আশা করা বৃথা ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা, দ্বীন প্রতিষ্ঠায় আমার পরিকল্পনায় এধরনের পথ বা পদ্ধতি গ্রহণের কোন সুযোগ নেই। ধৈর্য হারা হয়ে অন্য কোন উপায় কামনা করা বা খোজাখুজি করা মুর্খ লোকদের কাজ। অতএব তুমি এসব মুর্খ লোকদের মতো হয়ে যেও না।

প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! আমরা দ্বীনের দাওয়াত এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম আন্দোলন করতে গিয়ে মানুষের বিরোধীতা, বিমুখতা ও দীর্ঘ সময়কাল অতিবাহিত হয়ে যাবার কারণে অস্থির হয়ে পড়ি এবং বলি আর কতদিন লাগবে! এতো দিনও যখন কিছু হলো না তখন আর কিছুই হবে না! অথবা এও বলে থাকি এ যুগে দ্বীন কায়েম করা সম্ভব নয়! এসব কিছুই অদ্ভুত মুর্খ এবং অধৈর্য লোকদের বুলি এবং ধারণা। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা পরবর্তী আয়াতে সত্যের পথে সাড়া দানকারীদের কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۘ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ-

আসলে সত্যের দাওয়াত পেয়ে তারাই সাড়া দেয় যারা শুনতে পায়; আর যারা মুর্দা তাদেরকে তো আল্লাহ্ কবর হতেই জিন্দা করে উঠাবেন। তখন আল্লাহ্র বিচারালয়ে উপস্থিত হবার জন্যে তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে। অত্র আয়াতে বলা হয়েছে সত্য দ্বীনের দাওয়াত পেয়ে কেবলমাত্র তারাই সাড়া দেয় যারা শুনে বা শুনতে পায়। এখানে يَسْمَعُوْنَ শুনতে পায় বলতে বুঝায় সেই সব লোককে- যাদের দিল জীবন্ত, প্রাণবন্ত, যারা নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি, বিবেক ও চিন্তাকে অকেজো করে দেয় নাই এবং যারা নিজেদের অন্তরের দরজার উপর হিংসা-বিদ্বেশ ও জড়তার তালা ঝুলিয়ে দেয় নাই। অর্থাৎ তারা তাদের দিল বা অন্তরকে সত্য দ্বীনের জন্য উন্মুক্ত রেখেছে। সত্যকে তারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে এবং চিরদিনের জন্য বরণ করে নেয়। আর অপর দিকে وَالْمَوْتٰى মৃত্যু বা মুর্দা বলতে সেসব লোককে বুঝানো হয়েছে যারা চরম অন্ধত্ব ও মুর্খতার মধ্যে জীবন যাপন করে। যাদের কান আছে কিন্তু সত্য দ্বীনের কথা শুনে না, যাদের দেল আছে কিন্তু সত্য দ্বীনকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে পারে না, তারা শুধু অন্ধের মতো হাতড়িয়ে মরে। যারা একটা নির্দিষ্ট, গতানুগতিক ও ধরাবাধা পথে চলতেই অভ্যস্ত। সেখান থেকে সরে গিয়ে তারা নতুন কোন কথা গ্রহণ করার জন্য সম্মত হয় না। তা যতই সুস্পষ্ট ও মহা সত্যই হোক না কেন। অত্র আয়াতের শেষে মহান আল্লাহ্ বলেন-

يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ ثُمَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ **আল্লাহ্ তাদের বিচারের জন্য উঠাবেন অতঃপর তার কাছেই ফিরে যেতে হবে।** অর্থাৎ যারা সত্য দ্বীন শুনেও শুনেনা এবং মান্য করে না এসব মুর্দাদেরকে আল্লাহ্ পাক কিয়ামতের দিন বিচারের জন্য উঠাবেন এবং তাদের দুনিয়ায় জীবনের এই ভূমিকার জবাব দিহির জন্য আল্লাহ্র কাছে ফিরে যেতে হবে। আল্লাহ্র দরবারে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।

শিক্ষা ঃ প্রিয় ভায়ের/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা আনয়াম থেকে যে দরস পেশ করলাম এ থেকে যেসব শিক্ষা আমাদের জন্য রয়েছে তা নিম্নে উল্লেখ করছি।

● আয়াতে সরাসরি মহানবী (সাঃ)কে উদ্দেশ্য করে উপদেশমূলক কথা বলা হলেও গোটা উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য একই শিক্ষা রয়েছে।

● মহানবী (সাঃ) এর মাধ্যমে গোটা উম্মতে মহাম্মদীকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে যে, দাওয়াতে দ্বীনের কাজ করতে গিয়ে কাফের মুশরীক এবং বিরুদ্ধবাদীর পক্ষ থেকে যে মানসিক, দৈহিক এবং আর্থিক যুলুম নিপীড়ন ও মানতে অস্বীকার করার কারণে মনোকষ্ট নেয়া যাবে না।

● বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে যুলুম-নিপীড়ন এবং মানতে অস্বীকৃতি যা করা হয় তা নবীকে নয় বরং নবী যে বাণী বা হেদায়াত নিয়ে এসেছে তাকে করা হয়। কেননা, তা মানলে এ সমস্ত বিরুদ্ধ বাদীদের নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব এবং বৈষয়িক স্বার্থ খতম হয়ে যাবে।

● নবী মুহাম্মদ (সাঃ)সহ সকল উম্মতে মহাম্মদীকে শান্তনা এবং ধৈর্য ধারনের অনুপ্রেরণা দানের জন্য আল্লাহ্ পাক বলেন যে, অতীতের নবীদেরকে এবং তাদের গোষ্ঠীদেরকে একই কারণে একই ভাবে যুলুম-নিপীড়ন করা হয়েছে। এমনকি তার চেয়েও বেশী করা হয়েছে, কিন্তু তারা তা ধৈর্যের সাথে বরদাস্ত করে নিয়েছে।

● দাওয়াতে দ্বীন এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ করতে যেয়ে অতীতের নবী এবং তাদের সংগী-সাথীদের উপর যুলুম-নীপিড়ন করা হয়েছে, তাদেরকে মানতে অস্বীকার করা হয়েছে, এমনকি উল্টো মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয়েছে তখন তারা এসব কিছু অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে উপেক্ষা করার কারণে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সাহায্য এসে পৌঁছে গেছে।

● সবকিছুকে বরদাস্ত এবং ধৈর্য ধারণের উপদেশ এবং অতীতের নবী রাসূলদের উদাহরণ পেশ করার পরও যদি হে নবী তোমার মনে শান্তনা না আসে তাহলে তুমি নিজেই যমীনের মধ্যে ঢুকে কিংবা আকাশে উঠে কোন অ-লৌকিক মোজেযা তালাশ করে এনে এদেরকে সবাইকে হেদায়াত করে ফেল। কেননা, এতো অধৈর্য হলে তো চলবে না। কেননা, দ্বীন মানা এবং প্রতিষ্ঠার যে নিয়ম পদ্ধতি আমার পক্ষ থেকে করে দেয়া হয়েছে তার কোন ব্যতিক্রম হবে না। অতীতেও হয়নি, এখনও হে নবী তোমার বেলায় হবে না এবং ভবিষ্যতেও তোমার উম্মতদের জন্য হবে না।

● আল্লাহ্ তাআলা তার দ্বীনের প্রচার, প্রসার এবং প্রতিষ্ঠা পরীক্ষার মাধ্যমেই করবেন। কেননা, এটা প্রকৃত ঈমান যাচাই-এর বড় মাধ্যম। যদি বিনা বাধায় বিনা নির্যাতন নিপীড়নে সবাই দ্বীনের প্রতি বিশ্বাস করে মেনে নিত তাহলে নবী

রাসূল পাঠানোরই বা কি প্রয়োজন ছিল। এতো দ্বন্দ্ব-ফাসাদেরই বা কি প্রয়োজন ছিলো। যুগ যুগ ধরে যুদ্ধ-বিগ্রোহের বা কি কারণ ছিলো। আল্লাহ্ নিজেই তো একাজ করতে পারতেন। তিনি তো মায়ের পেট থেকেই সকলকে মুমিন করে পয়দা করতে পারতেন। অথবা, সকলকে এক জায়গায় একত্রিত করে হেদায়াত করে দিতে পারতেন। কেননা, আল্লাহ্ 'হও' বললেই তো সবকিছু হয়ে যায়।

● আসলে তো দাওয়াত তারাই কবুল করবে যারা সত্য ও হক কথা শুনে, এবং মানে। আর যারা তাদের চোখ থাকতেও দেখে না, কান থাকতেও শুনে না, অন্তর থাকতেও অনুভব করে না এরা তো মুর্দা এরা তো মেনে নিবে না এদেরকেতো কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র সামনে জিন্দা করে হাজির করা হবে এবং তাদের এই আচরণের বিচার করা হবে।

● উপরোক্ত শিক্ষাগুলো থেকে বর্তমানে আমরা যারা উম্মতে মুহাম্মদী, আমাদের কাজ হবে আল্লাহ্র দ্বীন, প্রচার-প্রসার এবং প্রতিষ্ঠার জন্য ধৈর্যের সাথে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া। দৈহিক, মানসিক এবং আর্থিক ক্ষতি এবং যুলুম নীপিড়নের জন্য মনে কষ্ট নিয়ে কাজ বন্দ করে না দেয়া। বরং সব কিছুকে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে বরদাস্ত করে নেয়া। কোন অলৌকিক উপায়ে আল্লাহ্র দ্বীন প্রতিষ্ঠার চিন্তা না করা। আর এটা সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যে, আল্লাহ্র দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য পরীক্ষা অপরিহার্য, সেই জন্য মানসিক ভাবে পূর্ব থেকেই প্রস্তুত থাকা, আর পরীক্ষা আসলে তা ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করা এবং আল্লাহ্র সাহায্যের প্রত্যাশি হওয়া। পরীক্ষার এক পর্যায়ে আল্লাহ্র সাহায্য অবশ্যই আসবে। এই জন্য তাড়াহুড়ো না করা।

আহ্বান ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষন পর্যন্ত সূরা তাওবার ১৯-২৪ পর্যন্ত আয়াতের যে দারস পেশ করলাম এতে যদি আমার অজান্তে কোন ভুলক্রটি এবং বাড়াবাড়ি হয়ে যায় তার জন্য মহান আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর দারস থেকে আমরা যেসব শিক্ষা লাভ করলাম তা যেন বাস্তব জীবনে আমল করতে পারি সেই তাওফীক কামনা করে আমি আমার দারস শেষ করছি।

সাত

স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি এবং ধন-সম্পদ মানুষের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ
(সূরা তাগাবুন-১৪-১৮)

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ
اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ- اِنَّمَاۤ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ؕ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗۤ اَجْرٌ عَظِيْمٌ- فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ ؕ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ- اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ- عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

সরল অনুবাদ ঃ ইরশাদ হচ্ছে - (১৪) হে মুমিনগণ, তোমাদের কোন কোন স্ত্রী ও সন্তান-সন্তুতি তোমাদের দুষমন। অতএব তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকো। আর যদি মার্জনা করো, উপেক্ষা করো এবং ক্ষমা করো, তবে যেন রাখ আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও করুণাময়। (১৫) নিশ্চয় তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি তো একটা পরীক্ষাস্বরূপ। আর আল্লাহ্র কাছে রয়েছে মহা পুরস্কার। (১৬) অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহ্কে ভয় করো, (তাঁর কথা) শোন, আনুগত্য করো এবং ব্যয় করো। এটাই তোমাদের জন্য

কল্যাণকর। আর যারা মনের কৃপণতা থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম। (১৭)যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ দাও, তাহলে তিনি তোমাদের জন্যে তা বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ গুণগ্রাহী, সহনশীল। (১৮) তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের সবকিছু জানেন, তিনি পরাক্রমশীল ও প্রজ্ঞাময়।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ يَاَيُّهَا-ওহে বা হে। اَلَّذِيْنَ-যারা। اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছ। اِنَّ-নিশ্চয়। مِنْ-মধ্যে। اَزْوَاجِكُمْ-তোমাদের স্ত্রীদের। وَاَوْلَادِكُمْ-তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের। عَدُوًّا -দুষমন বা শত্রু। لَكُمْ-তোমাদের জন্যে। فَاحْذَرُوْهُمْ-অতএব তাদের থেকে সতর্ক হও। اِنْ-যদি। تَعْفُوْا-তোমরা মার্জনা করো। تَصْفَحُوْا-তোমরা উপেক্ষা করো। تَغْفِرُوْا-তোমরা মাফ করো। فَاِنَّ-তবে নিশ্চয়। غَفُوْرٌ-ক্ষমাশীল। رَحِيْمٌ-দয়াশীল, মেহেরবান। اَمْوَالُكُمْ-তোমাদের ধন-সম্পদ। فِتْنَةٌ-পরীক্ষা। عِنْدَهٗ-তাঁর কাছে। اَجْرٌ-প্রতিফল। عَظِيْمٌ- -বড়। فَاتَّقُوْا -অতএব তোমরা ভয় করো। مَا -যতটা। استطعتم -তোমরা পার। اَسْمَعُوْا -তোমরা শোন। اَطِيْعُوْا-তোমরা আনুগত্য করো। اَنْفِقُوْا-তোমরা খরচ করো। خير -উত্তম। لا نفسكم-তোমাদের নিজেদের জন্যে। مَنْ-যে। يُوْقَ-রক্ষা পেল। شُحَّ-সংকীর্ণতা। نَفْسِهٖ -তার মন। فَاُولٰئِكَ-তবে ঐসব লোক। هُمْ-তারাই। اَلْمُفْلِحُوْنَ-সফলকাম। تُقْرِضُوْا-তোমরা কর্জ বা ধার দাও। حَسَنًا -উত্তম। يُضٰعِفْهُ-তা বহুগুণ করবেন। لكم- -তোমাদের জন্যে। يَغْفِرْ-মাফ করবেন। شَكُوْرٌ-গুণগ্রাহী। حَلِيْمٌ

-সহনশীল। عَالِمُ -পরিজ্ঞাতা বা জ্ঞান রাখেন। -الْغَيْبِ।-অদৃশ্যের। -الشَّهَادَةِ -দৃশ্যের। الْعَزِيْزُ।-মহাপরাক্রমশালী। الْحَكِيْمُ।-প্রজ্ঞাময়।

সম্বোধন ঃ দারসে কুরআন মাহফিলে/অনুষ্ঠানে উপস্থিত ইসলাম প্রীয়/ ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ভায়েরা/বোনেরা! আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি অয়াবারাকাতুহ। আমি আপনাদের সামনে সূরা তাগাবুন এর ১৪-১৮ পর্যন্ত মোট পাঁচটি আয়াত তেলাওয়াত ও সরল অনুবাদ পেশ করেছি। আল্লাহ্ পাক যেন আমাকে আপনাদের সামনে সঠিক ভাবে দারস পেশ করার তাওফীক দান করেন। আমিন।

সূরাটির নামকরণ ঃ অত্র সূরার ৯ নম্বর আয়াতে উল্লেখিত ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ। বাক্যের تَغَابُنْ শব্দটিকে এ সূরার নাম হিসেবে বাছাই করা হয়েছে। تَغَابُنْ শব্দের অর্থ হলো- 'হার-জিত'। আল-কুরআনের অন্যান্য সূরার মতই এর নামকরণ প্রতীকী বা চিহ্ন হিসেবে করা হয়েছে। কোন শিরোনাম হিসেবে করা হয়নি। তবে যা কিছু করা হয়েছে তা ওহীর নির্দেশের মাধ্যমেই করা হয়েছে।

সূরাটি নাযিল হবার সময়কাল ঃ সূরাটি নাযিলের সময়ের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ কোন মতামত পাওয়া যায়নি। মুকাতিল ও কলবী বলেন, এ সূরাটির কিছু অংশ মক্কায় অবতীর্ণ, আর কিছু অংশ মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ও আতা ইবনে ইয়াসার বলেন, সূরার শুরু হতে ১৩ নম্বর আয়াত পর্যন্ত অংশটুকু মাক্কী। আর ১৪ নম্বর আয়াত থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত মাদানী। কিন্তু অধিকাংশ তাফসীরকারকদের মতে সম্পূর্ণ সূরাটি-ই মাদানী। মদীনায় হিজরাতের পর এটা নাযিল হয়েছে। যদিও এ সূরায় এমন কোন ইশারা-ইংগিত পাওয়া যায় না যার উপর ভিত্তি করে এর নাযিল হবার সময়কাল সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট ও নিশ্চিত কথা বলা যেতে পারে। তবে সূরাটির মূল বিষয়বস্তু নিয়ে যদি বিচার-বিশ্লেষণ করা যায়, তাহলে একটা ধারণা পাওয়া যায় যে, সম্ভবত সূরাটি হিজরাতের পর মাদানী জীবনের প্রথম দিকে নাযিল হয়ে থাকতে পারে। এ কারণেই হয়তো এতে কিছুটা মাক্কী সূরার ভাবধারা আর কিছুটা মাদানী সূরার ভাবধারা পাওয়া যায়। এর পরও আল্লাহ্ পাকই বেশী ভাল জানেন।

সূরাটির মূল বিষয়বস্তু ঃ এ সূরার মূল বিষয়বস্তু হলো ঈমান গ্রহণ ও আনুগত্য প্রকাশের আহ্বান এবং উত্তম চরিত্রের শিক্ষাদান। আয়াতগুলোর পরস্পর বক্তব্যের ধারা এই যে, প্রথম চারটি আয়াতে সকল মানুষকে সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছে। ৫ম আয়াত হতে ১০ম আয়াত পর্যন্ত সে সব লোককে সম্বোধন করা হয়েছে যারা কুরআনের আহ্বানকে অগ্রাহ্য করেছে। এর পর ১১ নম্বর আয়াত হতে সূরার শেষ পর্যন্ত আয়াত সমূহে কুরআনের আহ্বান যারা মেনে নিয়েছে তাদের লক্ষ্য করে কথা বলা হয়েছে।

তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর বিষয়বস্তু ঃ মুমিনদের পরিবারের মধ্যে কোন কোন স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়েকে শত্রু বলে উল্লেখ করে সতর্ক করা হয়েছে। দুনিয়ার ধন-সম্পদ এবং ছেলে-মেয়েকে আয়াতে মুমিনদের পরীক্ষা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া মুমিনদেরকে আল্লাহ্কে যথাসাধ্য ভয় করতে এবং তাঁর আনুগত্য এবং ধন-মাল খরচ করার উপদেশ দেয়া হয়েছে। আখেরাতে সফলতার জন্য দুনিয়াতে আল্লাহ্র দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ হিসেনে ধন-মাল ব্যয় করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনাদের সামনে দারস সংক্রান্ত প্রাথমিক ধারণা প্রদান করলাম। এখন আমি আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা পেশ করছি। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ–

হে মুমিনগণ! তোমাদের কোন কোন স্ত্রী ও সন্তান-সন্তুতি তোমাদের শত্রু। অতএব তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাক।

শানে নুযুল ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, এই আয়াতটি সেইসব মুসলমানদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা হিজরাতের পর মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে হিজরাত করে চলে যেতে মনস্থ করে। কিন্তু তাদের পরিবার-পরিজনেরা অর্থাৎ স্ত্রী-সন্তানেরা বাধা দেয়। (তিরমিযী, হাকেম)

আয়াতে সকল স্ত্রী এবং সকল সন্তান-সন্ততির কথা বলা হয়নি। একাধিক স্ত্রীদের মধ্যে কোন কোন স্ত্রী এবং একাধিক সন্তানদের মধ্যে কোন কোন সন্তান-সন্তুতি কে শত্রু হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

আয়াতটির দুটি অর্থ বা তাৎপর্য রয়েছে। প্রথম অর্থ বা তাৎপর্য হলোঃ মক্কা

থেকে হিজরাত করার পর যারা পরে ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় হিজরাত করে চলে যেতে চেয়েছিলো, কিন্তু তাদের কুফর স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়েরা তাতে বাধা সৃষ্টি করেছিলো। তারা যে তাকে মদীনায় হিজরাত করতে বাধা সৃষ্টি করেছিলো শুধু তাই নয়, বরং তারা তাকে ইসলাম ত্যাগ করে পুনরায় কুফরীতে ফিরে আসার জন্য চাপ প্রয়োগ করছিলো। এমনটি যে শুধু স্ত্রী বা সন্তান-সন্তুতিদের পক্ষ থেকে হচ্ছিল তা নয় বরং কাফের স্বামীদের পক্ষ থেকে নবমুসলিম স্ত্রীকে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছিল এবং কাফের পিতার পক্ষ থেকে নবমুসলিম ছেলে-মেয়েদের একই ভাবে বরং আরো জোরাল ভাবে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছিল। এরূপ অবস্থা যে শুধু তৎকালীন আরব সমাজেই হয়েছিলো তা নয় বরং এখনও যদি কেউ অমুসলিম পরিবার থেকে ইসলাম গ্রহণ করে তখন তার পরিবারের পক্ষ থেকে একই ধরনের আচরণ করে থাকে। এটাকে কেউ মেনে নিতে চায় না। পুনরায় নিজ ধর্মে ফিরে আসার জন্য চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। যদি এতে সম্ভব না হয় তা হলে তাকে দৈহিক নির্যাতন করে বাড়ী থেকে বের করে দেয়। এমনকি মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলখানায়ও নিক্ষেপ করে।

দ্বিতীয় অর্থ বা তাৎপর্য হলো ঃ আল্লাহ্‌র পথে চলার ব্যাপারে অথবা ইসলামী আন্দোলন করার ব্যাপারে বহু ঈমানদার পুরুষকে নিজের স্ত্রীর পক্ষ থেকে ও বহু স্ত্রীলোককে নিজের স্বামীর পক্ষ থেকে এবং অনেক পিতা-মাতাকে তাদের ছেলে-মেয়েদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রকারের দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ, অসুবিধা ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। এমন কোন পরিবার নেই যে, পরিবারের সকলেই আল্লাহ্‌র পথে অথবা ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িত থেকে নিজের আমল-আখলাক-চরিত্র, নীতি-নৈতিকতা মেনে চলে। সাধারণতঃ দেখা যায় স্বামী ঈমানদার চরিত্রবান হলে স্ত্রী ও ছেলে-মেয়ে এমন হয় যারা তার ঈমানদারী, সততা, বিশ্বস্ততাকে নিজেদের দুর্ভাগ্যের কারণ মনে করে। তারা চায় স্বামী বা পিতা তাদের জন্য এমন কাজ করুক, যার ফলে তাদের সুখ-শান্তি বৃদ্ধি পাই- এতে যদি তাকে জাহান্নামে যেতে হলেও তাদের কোন আপত্তি নেই। আবার এর বিপরীতে অনেক নেক চরিত্রবান স্ত্রীলোক এমন স্বামীর পাল্লায় পড়ে যে, তার ইসলামী আন্দোলন করা এবং ইসলাম ও শরীয়াত মেনে চলা স্বামীর মোটেই সহ্য হয় না। তার সাথে সাথে ছেলে-মেয়েরাও ইসলাম, ও ইসলামী আন্দোলন বিরোধী অসাদাচারী পিতার পথ ধরে এবং অসৎ কাজে জড়িয়ে পড়ে মায়ের জীবনকে দুঃসহ করে তোলে। এই অবস্থায় কুফর ও ঈমানের দ্বন্দ্বে ঈমানদার ব্যক্তির দায়িত্ব হলো, আল্লাহ্ ও তার দ্বীনের খাতিরে

সকল প্রকার ক্ষতি ও দুঃখ-বিপদ সহ্য করার জন্য প্রস্তুত থাকা। জেল-যুলুম কিম্বা হিজরাত করে দেশ ত্যাগ করে চলে যেতে হলেও অথবা জিহাদে শরীক হয়ে নিজেদের জীবনকে সমূহ বিপদের মুখে ঠেলে দিতে হলেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত না হওয়া। প্রকৃত ঈমানের এটাই দাবী। কিন্তু এসব ক্ষেত্রেই একজন ঈমানদার স্বামীর পথে তার কোন কোন স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েরাই বড় বাধা ও প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি ইসলামী সমাজেও ঈমানদার লোকদের জীবনেও এরূপ দেখা যায়।

উপরের আলোচিত এই উভয় অবস্থার সম্মুখীন ঈমানদার লোকদের সম্বোধন করে আলোচ্য আয়াতে তিনটি সতর্কবাণী ও উপদেশ দেয়া হয়েছে।

এক. عَدُوًّا لَّكُمْ 'তারা তোমাদের শত্রু'। প্রথমতঃ আয়াতে তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, বৈষয়িক সম্পর্ক ও আত্মীয়তার দিক দিয়ে এই লোকেরা যদিও সর্বাধিক প্রিয়জন; কিন্তু দ্বীন ও ঈমানের দৃষ্টিতে এরা তোমাদের চরম শত্রু। অবশ্য সেই শত্রুতা কয়েকভাবে হতে পারে। যেমন– তারা তোমাদেরকে নেক কাজ থেকে বিরত রাখতে ও ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করতে পারে। কিংবা তারা তোমাদেরকে ঈমান থেকে ফিরিয়ে কুফরির দিকে টানতে পারে। অথবা ইসলামী অনুশাসন মানা হতে অসহযোগীতা করতে পারে। কিংবা ইসলামী আন্দোলন করতে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। অথবা তাদের মনের টান কুফরীর দিকে থাকার কারণে তোমাদের কাছ থেকে ইসলামী আন্দোলনের কোন পরিকল্পনা কিংবা যুদ্ধ সংক্রান্ত কোন গোপন তথ্য জেনে তারা ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনের দুশমনদের কাছে পাচার করতে পারে। এধরনের কাজে শত্রুতার ধরণ বা মাত্রা কিছুটা পার্থক্য হতে পারে। কিন্তু আসলে এটা তো শত্রুতাই। সুতরাং এই অবস্থায় ঈমান, ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলন যদি তোমাদের কাছে বেশী প্রিয় হয়ে থাকে, তা হলে এ দিক দিয়ে তাদেরকে শত্রু মনে করাই তোমাদের কর্তব্য। তাদের প্রেম ও মহব্বতে পড়ে তোমাদের ও তাদের মধ্যে ঈমান ও কুফরের, কিংবা আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও নাফারমানীর দিক দিয়ে যে বিরাট প্রতিবন্ধকতার প্রাচীর দাঁড়িয়ে রয়েছে'তা তোমাদের কখনই ভুলে যাওয়া উচিত হবে না।

দুই. فَاحْذَرُوْهُمْ 'তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে'। আয়াতে দ্বিতীয় যে উপদেশ দেয়া হয়েছে তা হলো তোমরা তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। অর্থাৎ নিজের স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের বৈষয়িক সুখ-সুবিধা বিধান করতে গিয়ে নিজের

পরকালকে বরবাদ করে দিও না। তাদের প্রতি দয়া-মায়া-স্নেহ-ভালোবাসা এতটা বেশী দেখাতে যেও না যার ফলে আল্লাহ্ ও রাসূলের সাথে তোমার ভালোবাসা ও সম্পর্ক রক্ষা এবং ইসলাম মানার ক্ষেত্রে তারা বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। তাদের প্রতি এতো বেশী দুর্বলতা দেখাইও না ও ভরসা রেখ না। যার ফলে তারা তোমার অসতর্কতার সুযোগে ইসলামী আন্দোলন বা মুসলিম সমাজের গোপন তথ্য জানতে পেরে শত্রু পক্ষকে জানিয়ে দিতে না পারে। রাসূলে করীম (সাঃ)ও তাঁর একটি কথায় মুসলমানদেরকে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়ে বলেন ঃ

يُؤْتَى بِرَجُلٍ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَيُقَالُ اَكَلَ عَيَالُهُ حَسَنَاتَهُ

কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে হাজির করা হবে, অতঃপর বলা হবে, এর সন্তান-সন্তুতিরা তার সব নেক আমল খেয়ে ফেলেছে।

তিন. وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

আর যদি তোমরা মার্জনা করো, উপেক্ষা করো এবং ক্ষমা করে দাও, তবে জেনে রাখ আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

আয়াতে তৃতীয় যে নসিহত করা হয়েছে তা হলো মার্জনা, সহনশীলতা প্রদর্শন ও ক্ষমা করার। এর অর্থ হলো এই যে, তোমাদের স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করা হচ্ছে শুধু তোমাদেরকে সাবধান সতর্ক করার উদ্দেশ্যে, যেন তোমরা এই ব্যাপারে সাবধান সতর্ক থাকো এবং দ্বীন ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনকে তাদের ক্ষতি হতে রক্ষা করার চিন্তা করো, এছাড়া এর পেছনে অন্যকোন উদ্দেশ্য নেই। ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলন বিরোধী কার্যকলাপ ও ভূমিকার কারণে তোমরা তোমাদের স্ত্রী-পুত্রকে মারপিট করবে কিংবা তাদের সাথে রুঢ় আচরণ ও দুর্ব্যবহার করবে অথবা তাদের সাথে সম্পর্ক এতটা তিক্ততার সৃষ্টি করবে যার কারণে তোমাদের পারিবারিক জীবনটাই দুঃসহ হয়ে উঠবে- এটা কখনও হতে পারে না বা উদ্দেশ্যও তা নয়। যদি এটা করা হয় তাহলে দু'টি বিরাট ক্ষতি হবার আশংকা রয়েছে। একটি ক্ষতি হলো এই যে, এর ফলে স্ত্রী, ছেলে-মেয়েকে সংশোধন করার পথ চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয় ক্ষতি হলো এই যে, এর দরুণ সমাজে ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে একটা বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হতে পারে। আশপাশের লোকেরা মুসলমান ও ইসলামী আন্দোলনের লোকদের চরিত্র ও আচরণ সম্পর্কে এরূপ ধারণা করতে পারে যে, ইসলাম গ্রহণ করলে কিংবা

ইসলামী আন্দোলন করলেই বুঝি নিজের ঘরেও স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের প্রতি কঠোর ও রুঢ় আচরণকারী হয়ে যেতে হয়।

জরুরী জ্ঞাতব্য ঃ এই বিষয়ে একথা জানা জরুরী যে, মক্কার জীবনে ইসলামের শুরুতে লোকেরা যখন প্রথম প্রথম ইসলাম কবুল করতেছিল, তখন তাদের একটা অসুবিধা দেখা দিচ্ছিল তা হলো যদি তাদের পিতা-মাতা কাফের থেকে যেত তা হলে তারা তাদের উপর দ্বীন-ইসলাম ত্যাগ করার জন্য চাপ দিত এবং তাদের মতই কাফের থেকে যাবার জন্য বাধ্য করতে চাইত। আর একটা অসুবিধা হতো যদি তাদের ছেলে-মেয়ে কিংবা স্ত্রী মুসলমান হতো তাহলে তাদের স্বামী ও সন্তানেরা কুফরি অবস্থায় থাকতো এবং দ্বীন-ইসলাম থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাত। এই উভয় অবস্থায় প্রথমোক্ত অবস্থা সম্পর্কে সূরা আনকাবুত এবং সূরা লোকমানে বিধান জানিয়ে দেওয়া হয়েছে–

সূরা আনকাবুতের ৮ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ط وَاِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا

অর্থাৎ আমি মানুষকে তাদের পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার জন্য জোর নির্দেশ দিয়েছি। আর যদি তারা তোমাকে আমার সাথে এমন কিছুর সাথে শরীক করার জন্য চাপ সৃষ্টি করে যার সম্পর্কে তোমার জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের (এই কথার) আনুগত্য করবে না।

অনুরূপ ভাবে সূরা লোকমানেও ১৪-১৫ আয়াতে বলা হয়েছে।

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِىْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ ط اِلَىَّ الْمَصِيْرُ– وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَىَّ–

আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার জন্য জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে। আর তার দুধ ছাড়াতে দু'বছর লেগেছে। তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার ও তোমার পিতা-মাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। অবশেষে আমারই কাছে তোমাদের ফিরে আসতে হবে। পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়কে শরীক করার জন্য পীড়াপীড়ি করে, যার সম্পর্কে তোমার জানা নেই, তাহলে তুমি তাদের কথা মানবে না, তবে দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে সহঅবস্থান করবে। আর যে আমার অভিমুখী হয়, তার পথ অনুসরণ করবে।

উল্লেখিত দুটি সূরার বিধান মতে দ্বীনের বিপরীত পিতা-মাতার কোন কথাই মেনে নেয়া যাবে না। তবে দুনিয়ায় তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে এবং সদ্ভাবে সহঅবস্থান করতে হবে।

আর দ্বিতীয় অবস্থার বিধান দারসের এই আয়াতেই দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, নিজেদের দ্বীনকে নিজেদের সন্তান-সন্তুতির ক্ষতি হতে রক্ষা করার চিন্তা অবশ্যই করতে হবে। কিন্তু তাই বলে তাদের সাথে কোনরূপ কঠোরতা ও রুঢ় আচরণ করা যাবে না। বরং নম্রতা ও ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে হবে। আর তাদেরকেও দ্বীনের পথে আনার জন্য বুদ্ধিমত্তা ও ধৈর্যের সাথে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে এবং আল্লাহ্‌র কাছে এই বলে দোআ করতে হবে–

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا–

হে আমাদের পরওয়ারদেগার। আমাদের স্ত্রীদের ও ছেলে-মেয়েদেরকে আমাদের চোখ জুড়ানো বানিয়ে দাও এবং আমাদের সবাইকে মুত্তাকীদের নেতা বা অগ্রণী বানিয়ে দাও। (সূরা ফুরকান-৭৪)

অতঃপর পরবর্তী আয়াতে মহান আল্লাহ্ পাক দুনিয়ার দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে বলেন ঃ

اِنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ–

নিশ্চয়ই তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতিতো একটা পরীক্ষাস্বরূপ।

আর আল্লাহ্‌র কাছেই রয়েছে মহা পুরস্কার।

فِتْنَةٌ (ফিতনা) শব্দের অর্থ 'পরীক্ষা'। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতির মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে পরীক্ষা করে দেখেন যে, এসবের মহব্বতে লিপ্ত হয়ে সে আল্লাহ্‌র বিধি-বিধানকে উপেক্ষা করে, না মহব্বতকে দমিয়ে রেখে স্বীয় কর্তব্য পালনে সচেষ্ট হয়।

সূরা আনফাল এর ২৮ নং আয়াতেও মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاعْلَمُوْا اِنَّمَا اَمْوٰلُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

তোমরা জেনে রেখ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্তুতি প্রকৃত পক্ষে পরীক্ষার সামগ্রী মাত্র।

মানুষের ঈমানের নিষ্ঠা ও সততায় সাধারণত যে জিনিস দোষ-ক্রুটির সৃষ্টি করে, আর যে কারণে প্রায়ই মানুষ মুনাফেকী, বিশ্বাস ঘাতকতা ও খিয়ানতে জড়িয়ে পড়ে, তা হলো অর্থনৈতিক স্বার্থ ও সন্তান-সন্তুতির স্বার্থের প্রতি সর্বাধিক ও সীমাতিরিক্ত আগ্রহ উদ্দীপনা।এই কারণে এখানে বলা হয়েছে যে, এই মাল-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি যার ভালোবাসায় ডুবে গিয়ে তোমরা সত্য ও সততার পথ হতে গোমরাহ হয়ে যাও, তা আসলে এই দুনিয়ার পরীক্ষাগারে তোমাদের পরীক্ষার সমাগ্রী মাত্র। তোমরা যাকে পুত্র বা কন্যা বলো, আসলে তা পরীক্ষার একটা কাগজ মাত্র। আর যাকে তোমরা জমি-জায়গা, ব্যবসার সম্পত্তি মনে করো, তাও আসলে পরীক্ষার আর একটি কাগজ বিশেষ। এসব জিনিস তোমাদের হাতে এই উদ্দেশ্যেই দেয়া হয়েছে যে, এসব দিয়ে তোমাদেরকে যাচাই-বাচাই ও পরীক্ষা করা হবে। দেখা হবে, তোমরা হক ও সত্যের পথে কতটুকু সীমা রক্ষা করে কাজ করো, দুনিয়ার দায়-দায়িত্বের বোঝা মাথায় নিয়ে কতটুকু ন্যায় পথে চলতে পার, আর দুনিয়ার লোভাতুর দ্রব্য-সামগ্রীর প্রেমে বন্দী মন ও নফসকে কতখানি কাবু করে রাখো, আর এসবকে উপেক্ষা ও কাবু করে আল্লাহ্‌র পূর্ণ ও খাঁটি বান্দাহ হয়ে থাকতে পারো কি না। এসব জিনিসের হক বা অধিকার আল্লাহ্‌র নির্ধারিত মাত্রা অনুযায়ী ঠিক ঠিক ভাবে আদায় করছো কিনা।

'সন্তান-সন্তুতি ও ধন-সম্পদ পরীক্ষার সামগ্রী মাত্র,' এই ক্ষেত্রে রাসূলে করীম (সাঃ) এর একটা হাদীস খুবই স্মরণীয়। রাসূলে পাক (সাঃ) বলেন ঃ **তোমার আসল শত্রু সে নয় যাকে হত্যা করলে তোমার সাফল্য হবে, আর সে তোমাকে হত্যা করলে তোমার জন্য জান্নাত নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। বরং হতে**

পারে যে, তোমার আসল শত্রু তোমার সেই সন্তান যে তোমার ঔরসে জন্মলাভ করেছে। এরপর তোমার বড় শত্রু হচ্ছে তোমার সেই ধন-মাল যার তুমি মালিক হয়ে আছ। (তাবারানী, হযরত আবু মালেক আশআরী) এই কারণে আল্লাহ্ তাআলাও এই আয়াতে এবং সূরা আনফালে বলেছেন যে, তোমরা যদি ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতির বিপদ হতে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে পার ও তাদের মহব্বতের উপর আল্লাহ্‌র মহব্বতকে বিজয়ী রাখতে সক্ষম হও, তা হলে আল্লাহ্‌র কাছে অতি মূল্যবান এবং উত্তম প্রতিফল লাভ করবে।

অতঃপর পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্‌কে ভয় করা সংক্রান্ত বিষয়ে বলতে গিয়ে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ–

কাজেই তোমাদের পক্ষে যতটা সম্ভব হয় আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাকো। আর (তার কথা) শোন ও আনুগত্য করো এবং নিজের ধন-মাল ব্যয় করো, এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর।

এই আয়াতের প্রথমাংশে কয়েকটি উপদেশ দেয়া হয়েছে যেমন-

প্রথম উপদেশ ঃ فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ **অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে সাধ্যমত ভয় করো।** এ সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা হয়েছে। যেমন-

সূরা আলে ঈমরানে ১০২ নং আয়াতে বলা হয়েছে اِتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ

তোমরা আল্লাহকে এমন ভাবে ভয় করো, যেমন ভাবে তাঁকে ভয় করা উচিত।

আবার সূরা বাকারার ২৮৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا

আল্লাহ্ তাআলা কারো উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত কোন কাজ চাপিয়ে দেন না। আর এখানে বলা হয়েছে, فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

তোমাদের সাধ্যে যতটা কুলায় আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাকে। এই তিনটি

আয়াত একত্রিত করে পাঠ ও বিবেচনা করলে মনে হয়, প্রথম আয়াতটিতে আল্লাহ্‌কে ভয় করার এমন একটা মানদন্ড আমাদের সামনে পেশ করা হয়েছে যে পর্যন্ত পৌঁছার জন্য প্রত্যেক মু'মিনের চেষ্টা করা উচিত। আর দ্বিতীয় আয়াতটি আমাদেরকে এই নীতিগত কথা বলা হয়েছে যে, কারও প্রতি তার সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ করার নির্দেশ বা দাবী করা হয়নি। বরং আল্লাহ্‌র দ্বীনে মানুষ শুধু ততটুকুর জন্যই দায়ী যতটুকু করার সাধ্য তার আছে। আর দারসের অর্থাৎ সূরা তাগাবুনের আলোচ্য আয়াতটি প্রত্যেক মুমিনকে এই বলে উপদেশ দেয়া হচ্ছে যে, সে যেন নিজের সাধ্যানুযায়ী তাক্‌ওয়া অর্জনের চেষ্টা চালিয়ে যায়, যার মধ্যে কোন ত্রুটি না থাকে। তার পক্ষে যতদুর সম্ভব হয় আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান মেনে চলা তার কর্তব্য এবং তাঁর নাফরমানি হতে বিরত থাকা উচিত। এ ব্যাপারে যদি সে অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করে, তা হলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র পাকড়াও হতে সে রেহাই পাবে না। তবে যা তার সাধ্যের বাইরে- অবশ্য কোন কাজ তার সাধ্যের বাইরে তার মাফকাঠি আল্লাহ্ তাআলার কাছেই রয়েছে-সে ব্যাপারে তাকে দায়ী করা হবে না। আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্যপূর্ণ তাক্‌ওয়া অর্জনের তাওফীক দান করুন। আমিন।

দ্বিতীয় উপদেশ ঃ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا এবং (তাঁর কথা) শোন ও আনুগত্য করো। আল্লাহ্ তাআলা এখানে মুমিনদেরকে দ্বিতীয় যে উপদেশটি দিচ্ছেন তা হলো তোমরা আল্লাহ্ এবং রাসূলের কথা মন দিয়ে শ্রবণ করবে এবং সে অনুযায়ী আনুগত্য করবে, সেই কাজ অনুসরণ করে চলবে।

তৃতীয় উপদেশ ঃ وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ এবং নিজের ধন-মাল ব্যয় করো, এটা তোমাদের জন্যই কল্যাণকর। আর যে লোক নিজের মনের সংকীর্ণতা হতে রক্ষা পেয়ে গেছে, শুধু সেই কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করবে। মহান আল্লাহ্ তাআলা এখানে তৃতীয় যে উপদেশ দিয়েছেন তা হলো-নিজের ধন-সম্পদ থেকে আল্লাহ্‌র পথে খরচ করার। ধন-মাল ব্যায়ের ক্ষেত্রে সংকীর্ণতার উর্ধে উঠে উদারতার পরিচয় দেয়া। তা হলে এটাই হবে তার জন্য দুনিয়া এবং আখেরাতের জীবনে কল্যাণকর এবং সফলতা। এই সম্পর্কে সূরা হাশরে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

বস্তুত যেসব লোককে তাদের অন্তরের সংকীর্ণতা হতে রক্ষা করা হয়েছে তারাই কল্যাণ লাভ করবে। এখানে 'যেসব লোক রক্ষা পেয়ে গিয়েছে' বলা হয়নি, বলা হয়েছে 'যেসব লোককে রক্ষা করা হয়েছে'। এর কারণ হলো এই যে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সুযোগ এবং সাহায্য ছাড়া কোন লোকই কেবলমাত্র নিজের শক্তির জোরে অন্তরের উদারতা ও বড়ত্ব অর্জন করতে পারে না। মূলতঃ এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এক প্রকারের বড় অবদান। একটা অতুলনীয় নিয়ামত। شُحَّ শব্দটি আরবী ভাষায় কার্পণ্য ও বখীলী বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু যখন এই শব্দটিকে 'নফস' শব্দের সাথে সম্পর্কিত করে شُحَّ النَّفْسِ বলা হবে, তখন এটা দৃষ্টিসংকীর্ণতা, সংকীর্ণ মানসিকতা ও ছোট অন্তরের অর্থে ব্যক্ত করে। আর এই অর্থ কৃপণতা বা কার্পণ্য হতেও অনেক ব্যাপক। বরং সকল প্রকার কার্পণ্যের মূল উৎস এগুলিই। এই সংকীর্ণ মানসিকতার কারণে মানুষ অন্য লোকের অধিকার স্বীকার করা ও আদায় করা তো দূরের কথা তার যৌক্তিকতাও স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত হয় না। নিজে অন্যকে দেবে সে তো দূরের কথা, অন্য কেউ যদি কাকেও কিছু দেয়, তাতেও সে মনে কষ্ট পায়। তার লোভ একটা তীব্র যে, কেবল নিজের পাওনা পেয়েই ক্ষান্ত হয় না বরং অন্যদের পাওনাটার উপরও হস্তক্ষেপ করাটা সে জরুরী বলে মনে করে। সে চায় চারদিকে যা কিছু ভালো জিনিস আছে, তা সবই সে নিজে একাই ভোগ করবে, অপরের জন্য কিছু রেখে দেবে না। আর এই কারণেই আল কুরআনে এই খারাপ ও নোংরা মানসিকতা হতে রক্ষা পেয়ে যাওয়াকে কল্যাণকর ও সফলতা বলে অভিহিত করা হয়েছে। আর রাসূল (সাঃ) ও সংকীর্ণ মানসিকতাকে অতি খারাপ ও নিকৃষ্টতম মানসিকতার মধ্যে গণ্য করেছেন। আর এটাই হলো সব কিছুর বিপর্যের মূল উৎস। হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ

اِتَّقُوا الشُّحَّ فَاِنَّ الشُّحَّ اَهْلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلٰى اَنْ سَفَكُوْا دِمَاءَ هُمْ وَاسْتَحَلُّوْا مَحَارِمَهُمْ–

তোমরা সকলে লোভপূর্ণ কৃপণতা থেকে বেঁচে থাক। কেননা, লোভপূর্ণ

কৃপণতাই তোমাদের পূর্বের লোকদের ধ্বংস করে দিয়েছে। তাদেরকে নিজেদের রক্তপাতে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং তারই প্ররোচনায় তাদের জন্য নিষিদ্ধ ও হারাম জিনিসগুলোকে হালাল বা বৈধ করে নিয়েছে। (মুসলিম, আহমদ, বায়হাকী, বুখারী)

মনের সংকীর্ণতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে আবদুল্লাহ্ ইবনে আমরের বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আরও বলেন ঃ

اَمَـرَهُمْ بِالظُّلْمِ فَظَلَمُوْا وَاَمَـرَهُمْ بِالْفُجُوْرِ فَفَجَرُوْا- وَاَمَرَهُمْ بِالْقَطِيْعَةِ فَقَطَعُوْا-

উহাই (সংকীর্ণতায়) তাদেরকে যুলুম করতে উদ্বুদ্ধ করেছে, ফলে তারা যুলুম করেছে। সীমালংঘনমূলক পাপ কাজের উস্কানী দিয়েছে, তারা তাই করেছে। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতে বলেছে, ফলে তারা তাই করেছে। (আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ)

হযরত আবু হুরাইরা বর্ণিত অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ **ঈমান ও লোভপূর্ণ কার্পণ্য কারও অন্তরে একত্রিত হতে পারে না। (নাসাঈ, বায়হাকী শোয়াবুল ঈমান ও হাকেম)।**

প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! ইসলামের এই সুমহান আদর্শ শিক্ষার ফলেই কিছু কিছু লোকের কথা বাদ দিয়ে মুসলমানেরা একটা জাতি হিসেবে দুনিয়ার বুকে আজও অন্যদের তুলনায় বেশী দানশীল এবং উদার মনের। যেসব জাতি গোটা দুনিয়ায় সংকীর্ণ মানসিকতা ও কৃপণতার দিক দিয়ে অতুলনীয়, স্বয়ং তাদের মধ্যে হতে বের হয়ে আসা লক্ষ কোটি মুসলমান নিজেদের বংশের অমুসলিমদের পাশাপাশি বসবাস করে আসতেছে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে অন্তরের উদারতা ও সংকীর্ণতার মাফকাঠিতে যে স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে, তার এই একটিমাত্র ব্যাখ্যাই দেয়া চলে এবং এছাড়া অন্য কোনো ব্যাখ্যা দেয়াও সম্ভব নহে। আর তা হলো একমাত্র ইসলামের নৈতিক শিক্ষাই মুসলমানদের অন্তরকে উদার, বড় ও প্রশস্ত করে দিয়েছে।

পরবর্তী আয়াতে মহান আল্লাহ্ করযে হাসানার গুরুত্ব ও ফজিলাত উল্লেখ করে বলেন ঃ

اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ-

তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ দাও, তাহলে তিনিও তোমাদেরকে উহা কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে দেবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ মাফ করে দেবেন। আর আল্লাহ্ বড়ই মূল্য দানকারী এবং ধৈর্যশীল।

অত্র আয়াতে উদার দেলের ঈমানদার লোকদের ডেকে মহান আল্লাহ্ বলছেন যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে করযে হাসান বা উত্তম ঋণ-দাও তাহলে তোমাদের এর বিনিময়ে দু'টি প্রতিদান দেব। যে প্রতিদানের কোনো তুলনা হয় না। আর তা হলো

এক. তোমরা যা দেবে পরকালে তার বিনিময়ে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেব।

দুই. আর দুনিয়ার কৃত অপরাধগুলো ক্ষমা করে দিয়ে আখেরাতের নাজাতের পথকে তোমাদের জন্য সহজ করে দেব।

قَرْضًا حَسَنًا (করযে হাসানা) এর শাব্দিক অর্থ 'উত্তম ঋণ'। এই ঋণের কতকগুলো শর্ত থাকে যেমন-এর দ্বারা এমন ঋণ বুঝানো হয়েছে যা খালেস নিয়াতে কোন প্রকার স্বার্থ ছাড়াই আল্লাহ্‌র জন্য তথা আল্লাহ্‌র দ্বীনের কাজে তাঁরই দেখিয়ে দেয়া পথে অর্থ-সম্পদ ব্যয় বা খরচ করা হয়। যাতে কোন প্রকার রিয়া বা লোক দেখানো মানসিকতা থাকবে না। সুনাম-সুখ্যাতি অর্জন করার উদ্দেশ্যও শামিল থাকতে পারবে না। তা দিয়ে কারও প্রতি অনুগ্রহ দেখানো হবেনা বা যাবে না। দাতা কেবলমাত্র আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই ব্যয় করবে। তাকে ছাড়া অন্য কারও নিকট থেকে কোন প্রকার প্রতিদান পাবার বা অন্য কাকেও সন্তোষ লাভ করার কোন ইচ্ছাই তার থাকবে না। এমনকি সেই দিকে একবিন্দু খেয়ালও থাকবে না। আর যদি কেউ এভাবে শর্তগুলো পালন করে খরচ করে তবে আল্লাহ্ এটাকে নিজের জন্য ঋণ হিসেবে গ্রহণ করেন। আর একেই বলা হয় 'করযে হাসানা' বা 'উত্তম ঋণ'। আর এই ঋণ পরিশোধ করার দায়িত্ব আল্লাহ্ নিজেই গ্রহণ করেছেন। সেই ঋণ পরিশোধ সম্পর্কে বলতে গিয়ে আল্লাহ্ তাআলা এখানে দু'টি বিষয় উল্লেখ করেছেন। তার একটি হলো- يُضٰعِفْهُ لَكُمْ **তিনি তা তোমাদের জন্য কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেবেন।** অর্থাৎ আল্লাহ্ এই ঋণ গ্রহণ করে শুধু আসলটায় ফেরৎ দেবেন না বরং তা কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেবেন। এখানে গুণের কোন সংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি। এটা দাতার নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার উপর নির্ভর করে। আল্লাহ্ যার উপর যেমন সন্তুষ্ট হবেন তিনি তাকে সেই ভাবে বৃদ্ধি করে দেবেন। এই বৃদ্ধিটা টাকা বা ধন-সম্পদের বদলে টাকা বা সম্পদ নয় বরং কিয়ামতের দিন বিচারের

সময় তার মূল্য হিসেবে উত্তম প্রতিদান জান্নাত দান করবেন। যেমন-সূরা হাদীদে মহান আল্লাহ্ বলেন -

فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ وَلَهٗٓ اَجْرٌ كَرِيْمٌ

অতঃপর আল্লাহ্ তা (দাতার জন্য) কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে দিতে পারেন এবং তার জন্য অতি উত্তম প্রতিদান রয়েছে। (সূরা হাদীদ-১০)

আর দ্বিতীয় যে প্রতিদান দেবেন তা হলো- وَيَغْفِرْ لَكُمْ এবং তোমাদের অপরাধ সমূহ মাফ করে দেবেন। অর্থাৎ সৎ উদ্দেশ্যে, নিস্বার্থ এবং খালেশ ভাবে একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য যখন সে দ্বীনের পথে দান বা খরচ করবে তখন আল্লাহ্ তাআলা তার এই 'উত্তম ঋণের' প্রতিদান হিসেবে দুনিয়ার ফেরেবে পড়ে শয়তানের ওয়াসওয়াসায় দাতা যেসব গুনাহ্ করেছে আল্লাহ্ তা মাফ করে দেবেন। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী এবং ধৈর্যশীল। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা মানুষের মতো অকৃতজ্ঞ নন। যেমন মানুষ মানুষের নুন খেয়ে তার স্বীকারটুকু পর্যন্ত করতে পারে না। বরং আল্লাহ্ তাআলা তার দানকারী বান্দার যে পাওনা তা তিনি কৃতজ্ঞতার সাথে পাওনাটুকু শুধু নয় বরং তার চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশী আদায় করে থাকেন। তাই তিনি দাতার প্রতিদান হিসেবে আখেরাতের স্থায়ী জীবনের কল্যাণের জন্য কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে দিয়ে এবং অপরাধগুলো মাফ করে দিয়ে চির শান্তির জায়গা জান্নাত যাবার ব্যবস্থা করে দেন। এর চেয়ে 'উত্তম ঋণদাতার' আর কিইবা প্রতিদান হতে পারে ? আর দাতার দানের উত্তম কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী আল্লাহ ছাড়া আর কেইবা হতে পারে ?

সর্বশেষে আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ অদৃশ্য ও দৃশ্য সব কিছুই তিনি জানেন, তিনি প্রবল; পরাক্রান্ত, সর্বজয়ী, মহাবিজ্ঞানী। 'অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালা উপস্থিত-অনুপস্থিত, দৃশ্য-অদৃশ্য সবকিছু বিষয় সম্পর্কে জানেন যা অন্য কোন সৃষ্টি জীবের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। তিনি এমন শক্তিধর প্রবল যা অন্যের কারো মধ্যে তা নেই। তিনি সর্বজয়ী পরাক্রমশালী শক্তিধর এবং মহাজ্ঞানী যার তুলনা আর কারো হয় না।

শিক্ষা ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা তাগাবুনের ১৪-১৮ নং আয়াতের যেসব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পেশ করা হলো তা হতে আমাদের জন্য যেসব শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে তা হলো ঃ

● মুমিনদের জন্য স্ত্রীদের মধ্যে কোন কোন স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়েদের মধ্যে কোন কোন ছেলে-মেয়ে দুষমনের মতো। যেমন দুষমন মানুষের ক্ষতি করে, তেমনি খোদাবিমুখ স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়ে নিজেরা যেমন চরম ক্ষতির জায়গা জাহান্নামে চলে যায় তেমনি স্বামী এবং পিতাকেও তারা জাহান্নামে নিয়ে চরম ক্ষতির মধ্যে ফেলে দেয়।

● শুধু স্ত্রী বা ছেলে-মেয়ে নয় বরং কোন কোন স্বামী এবং কোন কোন পিতাও স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়ের জন্য শত্রু। কেননা, মুমিন স্ত্রী এবং নেককার ছেলে-মেয়ে খোদা বিমুখ অসৎ স্বামী এবং পিতার জন্য তাদেরকেও জাহান্নামে যেতে হয়।

● স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়ে যদি অসৎ খোদাবিমুখ হয় তাহলে স্বামী এবং পিতা যেমন তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে তেমনি সৎ ও খোদাভীরু স্ত্রী অর্থাৎ ছেলে-মেয়েরাও অসৎ খোদাবিমুখ স্বামী এবং পিতা থেকে সতর্ক থাকবে। তারা কোন ভাবেই দুনিয়ার মহব্বতের টানে আল্লাহ্ দ্রোহী কাজ করবে না, অথবা কাফের হয়ে যাবে না, কিংবা ইসলামী আন্দোলন থেকে বিরত থাকবে না। ইসলাম এবং ইসলামী আন্দোলনের কোন গোপন পরিকল্পনা বা তথ্যও তাদের সামনে অজান্তে এবং অগোচরে প্রকাশ করবে না।

● স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়েদের শাসনের ক্ষেত্রে এমন কোন আচরণ বা কঠোরতা আরোপ করা যাবে না। যাতে মানুষের মধ্যে ইসলাম তথা ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে কোন খারাপ ধারণা সৃষ্টি হয়। বরং তাদের অপরাধকে (নিজে ঠিক থেকে) মার্জনা করে যেতে হবে। অনেক বিষয়কে উপেক্ষা করতে হবে এবং ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখতে হবে। তাদেরকে দ্বীন তথা ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনে আনার জন্য বুদ্ধিমতা ও ধৈর্য্যের সাথে চেষ্টা চালাতে হবে এবং সাথে সাথে আল্লাহ্র কাছে তাদের জন্য দোয়া করতে হবে।

● মানুষের জন্য দুনিয়ার দু'টি প্রিয় জিনিস ধন-সম্পদ ও ছেলে-মেয়ে পরীক্ষা স্বরূপ। মুমিনেরা দুনিয়ার এই প্রিয় জিনিসের মহব্বতে ডুবে গিয়ে আল্লাহ্র মহব্বতকে জলাঞ্জলি দেবে না। আল্লাহ্ ও রাসূল এবং দুনিয়ার এই ধন-সম্পদ ও ছেলে-মেয়েদের মধ্যে মহব্বতের ব্যাপারে যদি সাংঘর্ষিক হয় তা হলে দুনিয়ার এই ক্ষনস্থায়ী ধন-সম্পদ, ছেলে-মেয়ের ভালোবাসা এবং মহব্বতকে প্রত্যাখান করে আল্লাহ্ ও রাসূলের ভালোবাসা এবং মহব্বতকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কেননা, আল্লাহ্র কাছেই মানুষের চূড়ান্ত প্রতিদান রয়েছে।

● আল্লাহ্কে সাধ্য মতো ভয় করে চলতে হবে যেভাবে ভয় করলে আল্লাহ্ খুশী হন।

● আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসূলের নির্দেশ ভালভাবে আন্তরিকতার সাথে শোনতে হবে এবং সে অনুযায়ী পুরোপুরি আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে আনুগত্য ও অনুসরণ করতে হবে।

● দুনিয়া এবং আখেরাতের সফলতার জন্য অন্তরের সংকীর্ণতা ও কার্পণ্যতা থেকে মুক্ত হয়ে সব দিক থেকে অন্তরকে আরো বড় ও উদার করতে হবে।

● দুনিয়ার সমস্ত ঝোঁক, প্রবণতা, ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য থেকে মুক্ত হয়ে একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাকে রাজি খুশি করার জন্য তার দ্বীনের পথে তথা ইসলামী আন্দোলনের জন্য নিজের অর্থ-সম্পদ খরচ করতে হবে।

● যখন নিছক আল্লাহ্র জন্য এবং আল্লাহ্র পথে ধন-সম্পদ খরচ করা হবে তখন তা আল্লাহ্র কাছে করযে হাসানা বা 'উত্তম ঋণ' হিসেবে গণ্য হবে।

● যখনই আল্লাহ্কে করযে হাসানা বা উত্তম ঋণ দেয়া হবে তখন তার বিনিময়ে পরকালে কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে তার প্রতিদান দেবেন। দুনিয়ার সমস্ত গোনাহ্ খাতাকে মাফ করে দেবেন এবং তিনি এর বিনিময়ে উত্তম প্রতিদান হিসেবে জান্নাত দান করবেন।

● প্রতিদানের, ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে হবে এই জন্য যে আল্লাহ্ হচ্ছেন সবচেয়ে বেশী কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী বা দানের বিনিময় দানকারী এবং ধৈর্যশীল।

● তাছাড়া একথাও আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ উপস্থিত-অনুপস্থিত, দৃশ্য-অদৃশ্য সব কিছুর জ্ঞান রাখেন এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।

আহ্বান ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা তাগাবুনের শেষ আয়াতগুলো থেকে যে দারস পেশ করলাম এতে যদি আমার অজান্তে কোন ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যায় তার জন্য আমি মহান আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর এই দারস থেকে আমরা যেসব গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা লাভ করলাম তা যেন বাস্তব জীবনে আমল করতে পারি সেই তৌফিক কামনা করে আমি আমার দারস শেষ করছি। মাআসসালাম।

আট

আখেরাতে অবিশ্বাসীদের চরিত্র বৈশিষ্ট্য ও কার্যকলাপ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ-

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ- فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ-

وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ- فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ-

الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ- الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ-

وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ-

সরল অনুবাদ ঃ ইরশাদ হচ্ছে- (১) তুমি কি দেখেছ তাকে, যে (আখেরাতের) বদলাকে মিথ্যা সাব্যস্থ করে ? (২) ঐ ব্যক্তিই তো ইয়াতীমকে ধাক্কা দিয়ে (তাড়ায়) (৩) এবং মিসকীনের খাবার দিতে উৎসাহ দেয় না। (৪) অতঃপর ঐ নামাযীদের জন্য ধ্বংস, (৫) যারা তাদের নামাযের ব্যাপারে অবহেলা করে, (৬) যারা তা লোক দেখানোর জন্য করে (৭) এবং নিত্য ব্যবহারের জিনিসও অন্যকে দেয় না।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ اَرَءَيْتَ -তুমি কি দেখেছ ? اَلَّذِىْ -যে বা যারা يُكَذِّبُ -মিথ্যা সাব্যস্থ করে। بِالدِّيْنِ - দ্বীন সম্পর্কে এখানে দ্বীন অর্থ বিচারের দিন। فَذٰلِكَ -অতঃপর ঐ ব্যক্তিই। يَدُعُّ-ধাক্কা দেয়। اَلْيَتِيْمَ -এতীমকে। لَا يَحُضُّ-উৎসাহ দেয় না। عَلٰى-উপর এখানে ব্যাপারে। طَعَامِ-খাদ্য-খাবার। الْمِسْكِيْنِ-মিসকীন। فَوَيْلٌ-অতঃপর দূর্ভোগ বা ধ্বংস। لِّلْمُصَلِّيْنَ -নামাযীদের জন্য। هُمْ-তাদের। صَلَاتِهِمْ-তাদের নামাযে (ব্যাপারে)। سَاهُوْنَ-বে-খেয়াল, বে-খবর, উদাসীন। يُرَاءُوْنَ-দেখানো কাজ। يَمْنَعُوْنَ-অন্যকে দেয় না اَلْمَاعُوْنَ -সাধারণ ব্যবহার্য জিনিস বা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস।

সূরাটির নামকরণ ঃ অন্যান্য সূরার মতই এই সূরাও উল্লেখিত একটি শব্দবে নামকরণ হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে। এই সূরার সর্বশেষ আয়াতে উল্লেখিত

শব্দ اَلْمَاعُوْنَ (আল মাউন) শব্দটিকে কেন্দ্র করে এই সূরার নামকরণ 'মাউন' করা হয়েছে। اَلْمَاعُوْنَ অর্থ পরিবারের ব্যবহার্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস।

সূরাটি অবতীর্ণ হবার সময় ঃ সূরাটি মাক্কী না মাদানী এই বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে যুবাইর (রাঃ)-এর উক্তি অনুযায়ী সূরাটি মাক্কী। তাফসীরকারক আতা ও জাবির প্রমুখ এই মত দিয়েছেন। কিন্তু আবু হাইয়ান তাঁর "আল-বাহারুল মুহীত" গ্রন্থে ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ ও দহকের যে উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, তাতে একে মাদানী সূরা বলা হয়েছে। তাফসীরকারক মাওলানা মওদূদী (রহঃ) এর মতে এই সূরার ভিতরেই এমন এক সাক্ষ্য বর্তমান রয়েছে যা প্রমাণ করে যে, এই সূরাটি মক্কায় নয়, মদীনায় নাযিল হয়েছে।

তিনি বলেন, এই সূরার ৪ এবং ৫নং আয়াতে নামাযের প্রতি অবজ্ঞা অব-হেলাকারী এবং লোক দেখানো নামাযীদের সম্পর্কে এক তীব্র কঠিন অভিসম্পাত ও শাস্তির কথা উল্লেখ রয়েছে। আর এটাই এই সূরা মাদানী হবার একটা বড় ও অকাট্য প্রমাণ। কেননা, এই সূরার এই কথাটি মুনাফিকদের সম্পর্কে। আর এ ধরনের মুনাফিক মক্কায় দেখা যায়নি, কেবলমাত্র মদীনার সমাজেই তারা বর্তমান ছিলো। যেহেতু মক্কা থেকে হিজরাত করে মদীনায় যাবার পর রাসূল (সাঃ) এর নেতৃত্বে একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। আর সেই রাষ্ট্রের অধীনে থেকে সুযোগ-সুবিধা ভোগের জন্য এবং আত্ম রক্ষার জন্য অন্তরে ইসলাম না আনলেও বাহ্যিক ভাবে মুসলমানিত্ব জাহির করতো। তারা মসজিদে আসতো, জামায়াতে নামায পড়তো এবং নামাযের প্রদর্শনী করতো একমাত্র সমাজে নিজেকে মুসলমান হিসেবে জাহির করার জন্য। কিন্তু মক্কায় এ ধরনের অবস্থা মোটেই ছিলো না। সেখানে লোক দেখানো নামায আদায় করতে হতো না। জামায়াতে নামায আদায়ের কোন পরিবেশও ছিলো। সেখানে কেউ প্রকাশ্যভাবে নামায আদায় করলে তার জীবনই শেষ হয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিলো না। সেখানে যে মুনাফিক একেবারেই পাওয়া যেত না তা নয়-তবে লোক দেখানো ঈমান গ্রহণকারী ও প্রদর্শনীমূলক নামায আদায়কারী যে মুনাফিকী, তা সেখানে ছিলো না। সেখানে মুনাফিক ছিলো সেই সব লোক, যারা নবী করীম (সাঃ)কে সত্যপন্থী হিসেবে জানতো এবং মানতও বটে। কিন্তু নিজেদের সরদারী, সামাজিক প্রভাব প্রতিপত্তি ও প্রাধান্য কর্তৃত্ব বহাল রাখার উদ্দেশ্যে ইসলাম কবুল করতে প্রস্তুত হতো না। আবার কেউ কেউ ইসলাম কবুল করলেও নানা ভয়ে তা গোপন রাখতো। মক্কী পর্যায়ে এ ধরনের মুনাফিকদের অবস্থা সূরা আনকাবুত-এর ১০-১১আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে।

সূরাটির মূল বক্তব্যঃ পরকাল বা বিচার দিনের প্রতি ঈমান না আনলে মানুষের

কি রকমের নৈতিক চরিত্র গড়ে উঠে তা বিশ্লেষণ করাই এই সূরার মূল বক্তব্য ও বিষয়বস্তু।

ব্যাখ্যা ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনাদের সামনে দারসের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও তত্ত্ব পেশ করলাম। এখন আমি আপনাদের সামনে সূরা মাউনের গুরুত্বপূর্ণ শব্দ ও বাক্যের ব্যাখ্যা পেশ করছি।

আমরা গোটা সূরার বিষয়কে দু'টি ভাগে ভাগ করতে পারি। একটি হলো পরকালে বা বিচার দিবস সম্পর্কে যারা অবিশ্বাস করে এমন প্রকাশ্য কাফেরদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও কার্যকলাপ। আর অপরটি হলো মুনাফিকদের চরিত্র বৈশিষ্ট্য ও কার্যকলাপ। সূরার প্রথমে পরকালের প্রতি অবিশ্বাসী কাফেরদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও কার্যকলাপ সম্পর্কে বলতে গিয়ে মহান আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ

أَرَءَيْتَ الَّذِى يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ- فَذٰلِكَ الَّذِى يَدُعُّ الْيَتِيْمَ- وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ

তুমি কি দেখেছ তাকে, যে (আখেরাতের) বদলাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে ? ঐ ব্যক্তিই তো ইয়াতীমকে ধাক্কা দিয়ে (তাড়ায়) এবং মিসকীনের খাবার দিতে [illegible] না।

আয়াতের প্রথমেই বলা হয়েছে– أَرَءَيْتَ 'তুমি কি দেখেছ'? বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয়, এ কথাটি নবী করীম (সাঃ)–কে সম্মোধন করে বলা হয়েছে। কিন্তু কুরআনের বাচনভঙ্গী হলো, এ সব ক্ষেত্রে কুরআনে সাধারণতঃ প্রত্যেক জ্ঞান-বুদ্ধি বিবেক-সম্পন্ন ব্যক্তিকেই সম্মোধন করা হয়ে থাকে। সুতরাং যুগে যুগে সকল জ্ঞান-বুদ্ধি বিবেক-সম্পন্ন ব্যক্তিদেরকেই একথা বলা হয়েছে। আর এখানে 'দেখার' কথা যা বলা হয়েছে তা যে চোখে দেখার কথা বলা হয়েছে তা কিন্তু নয়। এখানে পরবর্তীতে লোকদের যে অবস্থার কথা বলা হয়েছে, তাতো প্রত্যেক চাক্ষুষ্মান ব্যক্তি নিজ চোখে দেখতে পায়। তাছাড়া চোখে দেখার সাথে সাথে কথার তাৎপর্য অনুধাবন, জানা, বুঝা ও চিন্তা করাও এই দেখার মধ্যে শামিল রয়েছে। প্রকৃত 'দেখা' বলতে এই শেষোক্ত অর্থই বুঝতে হবে– নিছক চোখে দেখা নয়। যেমন আমরা কোন বিশেষ ব্যাপারে বলে থাকি ঃ 'আমি দেখেছি' এর অর্থ হয়-আমি জানি, আমি এ বিষয়ে অবহিত বা ওয়াকিফহাল আছি। অথবা বলে থাকি ঃ 'আপনি ব্যাপারটি একটু দেখুন'। এর অর্থ হয়– আপনি বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য করুন বা স্মরণে রাখুন, কিংবা এর তত্ত্ব বুঝুন। সুতরাং এখানে أَرَءَيْتَ 'তুমি কি দেখেছ' কথাটি যদি এই দ্বিতীয় অর্থে গ্রহণ করা হয়, তা হলে বাক্যটির অর্থ হবে ঃ 'তুমি কি জান, পরকালের বিচার ও প্রতিফলের কথা যে লোক অস্বীকার করে সে কি রকমের লোক' ? অথবা এ অর্থ হতে পারে ঃ 'পরকালের কর্মফল দানের ব্যবস্থাকে যে লোক অসত্য মনে করে, তার অবস্থাটা কি, তা কি তুমি চিন্তা ও বিবেচনা করেছ'?

অতঃপর আয়াতের পরবর্তী বাক্যে বলা হয়েছে ঃ اَلَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ
অর্থাৎ যারা পরকালের বদলাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে। আল-কুরআনে - اَلدِّيْنُ শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- প্রথম অর্থ-প্রভূত্ব ও প্রাধান্য, শক্তি ও আধিপত্য। দ্বিতীয় অর্থ- আনুগত্য ও দাসত্ব। তৃতীয় অর্থ- পথ, পন্থা, ব্যবস্থা, আইন, এক কথায় দ্বীন ইসলাম। চতুর্থ অর্থ- প্রতিফল, কর্মফল, বিচার। সূরা মাউন এর এই اَلدِّيْنُ (দ্বীন) অর্থ-প্রতিফল, কর্মফল, বিচার। অবশ্য কেউ কেউ এখানে দ্বীন অর্থ- পথ, পন্থা বা দ্বীন ইসলামও গ্রহণ করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই অর্থটি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ মুফাস্‌সীর এখানে প্রতিফল দান বা বিচার, এক কথাই পরকাল অর্থটিকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কেননা, এখানে কর্মফল দান বা পরকাল অর্থটি সূরার বিষয়ের সাথে বেশী সামঞ্জস্যশীল।

অতঃপর পরবর্তীতে পরকালে অবিশ্বাসীদের চরিত্র স্বভাব ও কার্যকলাপ সম্পর্কে বলতে গিয়ে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ

ঐ ব্যক্তিই তো ইয়াতীমকে ধাক্কা দিয়ে তাড়ায়। فَذٰلِكَ الَّذِىْ বাক্যের শুরুতে লাগানো فَ (ফা) অক্ষরটি একটা পূর্ণ বাক্যের অর্থ জ্ঞাপন করে। এর অর্থ হলো- 'তুমি যদি না-ই জান, তা হলে তোমার জানা উচিত যে, 'এই সেই লোক'।

প্রথম চরিত্র বা কার্যকলাপ ঃ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ সে ইয়াতীমকে ধাক্কা দেয়। এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। (এক) সে ইয়াতীমের হক মেরে খায় এবং তার পিতার রেখে যাওয়া সহায়-সম্পত্তি হতে বে-দখল করে তাকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়। (দুই) ইয়াতীম তার কাছে সাহায্য চাইতে আসলে তার প্রতি দয়া পরবশ হবার পরিবর্তে তাকে ধিক্কার দেয়, রুঢ় ব্যবহার করে তাড়িয়ে দেয়। এর পরও যদি সে নিজের দুরবস্থার জন্য দয়ার আশায় দাঁড়িয়ে থাকে তা হলে তাকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। (তিন) সে ইয়াতীম-এর উপর যুলুম করে। তার নিজের ঘরে নিজেরই কোন আত্মীয় ইয়াতীম হলে সারা ঘরের দাস-দাসীর কাজ করায় এবং কথায় কথায় হুমকি ও ধমক খাওয়া ছাড়া তার কপালে আর কিছুই জোটে না। ইয়াতীমদের সাথে এ ধরনের আচরণ যে কেবল কোন কোন সময় সংঘটিত হয় তা নয়। বরং তাদের এই কাজ ও আচরণ স্থায়ী অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। সে এটাকে স্বাভাবিক কাজ মনে করে থাকে। ইয়াতীমদের সে মানুষই মনে করে না। তাদের প্রতি যুলুম-নির্যাতন, কোন কিছু চাইতে আসলে ধুর ধুর করে তাড়িয়ে দেয়া, প্রয়োজনে গলা ধাক্কা দেয়া বা ধাক্কাতে ধাক্কাতে বাড়ি থেকে বের করে দেয়া কোন অন্যায় কাজ বলে মনেই করে না। কাজী

আবুল হাসান আল-মা-আর্দি তাঁর أَعْلَامُ النُّبُوَّةِ নামক কিতাবে এই পর্যায়ে একটি বিস্ময়কর ঘটনার উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি হলো– আবু জেহেল ছিলো এক ইয়াতীম বালকের গার্জীয়ান। একদিন সেই বস্ত্রবিহীন ইয়াতীম বালকটি আবু জেহেলের কাছে তার বাপের রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে কিছু দেবার জন্য অনুরোধ করলো। কিন্তু আবু জেহেল সেই বালকটির কথার প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপই করলো না। সে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নিরাশ হয়ে চলে গেল। তখন কুরাইশ সর্দারেরা দুষ্টামি বশতঃ বালকটিকে বললো ঃ মুহাম্মদের কাছে গিয়ে নালিশ করো সে তোমার সম্পদ আবু জেহেলের কাছ থেকে আদায় করে দেবে। বালকটি তো জানতো না আবু জেহেল এবং মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথে সম্পর্ক কেমন। সে তাদের পরামর্শ সরল মনে বিশ্বাস করে সোজা মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে গিয়ে তার নিজের অবস্থা বর্ণনা করলো। নবী করীম (সাঃ) সব কথা শুনে তখনই উঠে বালকটিকে সাথে নিয়ে শত্রু আবু জেহেলের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন। আবু জেহেল তাঁকে দেখে সম্বর্ধনা জানালো। নবী করীম (সাঃ) যখন আবু জেহেলকে বললেন ঃ এই বালকের যা কিছু পাওনা আছে তা তাকে দিয়ে দাও; সে তখনই তা মেনে নিয়ে তার পাওনা গন্ডায় গন্ডায় তাকে বুঝিয়ে দিলো। এ দু'জনের মধ্যে শেষ পর্যন্ত কি ঘটে এবং ঘটনা পরম্পরা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় তা দেখার জন্য কুরাইশ সর্দারেরা ওঁৎ পেতে বসেছিলো। আসলে তারা কোন কৌতুককর ঘটনা ঘটে যাবার আশা করেছিলো। কিন্তু তারা যখন এরূপ বিস্ময়কর ঘটনা দেখতে পেল তখন তারা বিস্মিত হয়ে আবু জেহেলের নিকট গিয়ে সে তার পৈত্রিক ধর্ম ত্যাগ করেছে বলে তাকে ধিক্কার দিতে লাগলো। আবু জেহেল তাদেরকে কসম খেয়ে বললো ঃ খোদার কসম, আমি আমার ধর্ম ত্যাগ করিনি। কিন্তু মুহাম্মদ যখন আমার কাছে আসলো তখন আমার কাছে স্পষ্ট মনে হলো– তাঁর ডান ও বামে এক একটা বিশেষ ধরনের অস্ত্র তার দিকে তাক করে ধরে আছে। যদি আমি তাঁর মতের বিপরীত কাজ করি তা হলে মনে হয় অস্ত্রগুলো আমার পেটের ভিতর ঢুকে যাবে। এই ঘটনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, সেই জাহেলী যুগ আরবে ইয়াতীমদের সাথে কি ধরনেরই না আচরণ করা হতো। আর এটাও প্রমাণিত হয় যে, মক্কায় কাফের শত্রু সর্দারদের উপর মহানবী (সাঃ) এর নৈতিক চরিত্রের কত প্রভাব ছিলো।

দ্বিতীয় চরিত্র বা কার্যকলাপ ঃ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ **আর যারা মিসকীনের খাবার দিতে উৎসাহিত করে না।**

এখানে إِطْعَامُ الْمِسْكِيْنِ- 'মিসকীনকে খাবার খাওয়ানোর' কথা বলা হয় নাই। বলা হয়েছে طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ 'মিসকীনের খাবার'। প্রথম কথাটি বলা হলে এখানে অর্থ হতো– মিসকীনকে খাবার খাওয়াতে সে লোকদেরকে

উদ্বুদ্ধ করে না। এর পরিবর্তে দ্বিতীয় শব্দটি طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ 'মিসকীনের খাবার' দিতে লোকদেরকে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করে না। এই দৃষ্টিতে আয়াতের মূল বক্তব্য এই দাঁড়ায় যে, গরীব মিসকীনকে যে খাবার দেয়া হয় তা মূলতঃ দাতার নিজের খাবার জিনিস নয়। আসলে তা সেই মিসকীনেরই জিনিস। যা দাতার নিকট আমানত হিসেবে জমা আছে এবং তা দিচ্ছে মাত্র। অন্য কথায় এটা মিসকীনের অধিকারের অংশ। এটা দাতার কোন দান বা অনুগ্রহ নয়। বরং সে মিসকীনের ন্যায্য অধিকারের জিনিস-ই তাকে ফিরিয়ে দিচ্ছে মাত্র। যেমন আল কুরআনের অন্য এক আয়াতে এ কথাই বলা হয়েছে-

وَفِىْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

এবং তাদের (ধনীদের) ধন-সম্পদে সায়েল (দাবীদার) ও বঞ্চিতদের হক বা অধিকার রয়েছে। (সূরা জারিয়াত-১৯)

وَلَا يَحُضُّ এর অর্থ ব্যাপক অর্থবোধক। এর অর্থ এই যে, সেই ব্যক্তি নিজেকে এই কাজে উদ্বুদ্ধ করে না, আর নিজের পরিবারের লোকদেরকেও বলে না যে, মিসকীনের খাদ্য-খাবার যেন অবশ্যই দেয়া হয়। আর সমাজে অসহায় নিঃসম্বল ক্ষুধার্ত গরীব-মিসকীনদের যে অধিকার আছে তা আদায়ের উদ্দেশ্যে সামষ্টিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে অন্যান্য লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ ও কর্মতৎপর করে তুলবার জন্যও কোন চেষ্টা চালায় না।

পরকালে অবিশ্বাসীদের কি ধরনের চরিত্র হয় তার নমুনা হিসেবে এখানে দু'টি চরিত্র তুলে ধরা হয়েছে। তবে এটা মনে করা যাবে না যে, পরকালে অবিশ্বাসীদের চরিত্র বুঝি এ দু'টিই, আসলে তা নয়। এই চরিত্র ছাড়া আরও অসংখ্য চরিত্র রয়েছে পরকালে অবিশ্বাসীদের। এখানে মাত্র দু'টি মৌলিক চরিত্র তুলে ধরা হয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো- তারা ইয়াতীমদেরকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়, আর অপরটি হলো তারা মিসকীনদের খাবার দিতে উৎসাহ প্রদান করে না।

সূরার এই দ্বিতীয় অংশে মুনাফিকদের চরিত্র বৈশিষ্ট্য ও কার্যকলাপ সম্পর্কে বলতে গিয়ে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ- الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ-
الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ- وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ-

অতঃপর ঐসব নামাযীদের জন্য ধ্বংস, যারা তাদের নামাযের ব্যাপারে অবহেলা করে, যারা তা লোক দেখানোর জন্য করে এবং নিত্য ব্যবহারের জিনিসও অন্যকে দেয় না।

এই আয়াত কয়টিতে মুনাফিকদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ও কার্যকলাপ সম্পর্কে তিনটি চরিত্র উল্লেখ করা হয়েছে। চরিত্র তিনটি উল্লেখের পূর্বেই তাদের কঠিন পরিণতির কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে- فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ অতঃপর নামাযীদের জন্য ধ্বংস। এখানে فَ অক্ষরটির অর্থ হলো- প্রকাশ্যে পরকালে অবিশ্বাসীদের চারিত্রিক অবস্থার যে বিবরণ উপরে এইমাত্র দেয়া হলো এটা তো বুঝতে পারলে, এখন মুনাফিকদের অবস্থা কি তা শুনে নাও। এই মুনাফিকরা সমাজের মুসল্লীদের অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্যে গণ্য। কিন্তু এরা বাহ্যিক ভাবে মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু তারা পরকালকে সত্য মনে করে না-মিথ্যা মনে করে, এই কারণে তারা নিজেরা নিজেদেরকে ধ্বংসের আয়োজন কিভাবে করেছে তা একবার লক্ষ্য করে দেখ!

مُصَلِّيْنَ শব্দের অর্থ হলো- মুসল্লী লোক, যারা সালাত আদায় করে। অর্থাৎ নামাযী। কিন্তু কথার যে ধারাবাহিকতায় এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এবং পরে যে পরিচয় দেয়া হয়েছে, তাতে এই শব্দটির অর্থ মূলতঃ 'মুসল্লী হওয়া' বা 'নামাযী হওয়া' নয়, বরং এর অর্থ 'সালাত ওয়ালা' বা 'মুসলিম সমাজের মধ্যে গণ্য লোক।

মুনাফিকদের প্রথম চরিত্র ঃ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ **যারা তাদের নামাযের ব্যাপারে গাফেল বা অবজ্ঞা দেখায়।** এখানে فِى صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ 'নামাযের মধ্যে অবজ্ঞা দেখায় বলা হয়নি'। বরং বলা হয়েছে عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ- 'নামাযের ব্যাপারে অবজ্ঞা দেখায়' فِىْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ বলা হলে আয়াতটির অর্থ এরূপ হতো- তারা নিজেদের নামাযের মধ্যে ভুল করে। কিন্তু এই অর্থ সঠিক নয়। কেননা, নামায আদায় করার মধ্যে বা নামায আদায় করতে যেয়ে কিছু ভুল হতে পারে। এটা কোন অপরাধ নয়। এর মধ্যে কোন গুনাহ্ নেই। তার কারণ নবী করীম (সাঃ) এর নামাযের মধ্যেও ভুল হয়েছে যা তিনি 'সহুহ্ সিজদাহ' এর মাধ্যমে ঠিক করে নিয়েছেন এবং তা করার জন্য নিয়ম করে দিয়েছেন। কাজেই এই অর্থ বা কথা এখানে প্রযোজ্য নয়। মূলেতো বলা হয়েছে- عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ "তারা নিজেদের নামাযের ব্যাপারে অবজ্ঞা দেখায়'। এর ব্যাপক অর্থ। অর্থাৎ নামাযের প্রতি তাদের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। নামায আদায় করা হলো কি হলো না এই পার্থক্য তারা করে না। তারা কখনও নামায আদায় করে

আবার কখনও কখনও করে না। নামায আদায় করলেও তাদের কোন সময়জ্ঞান নেই। নামাযের ওয়াক্ত বিনা কারণে পার করে দিয়ে দুই ওয়াক্ত একই সময়ে কাযা হিসেবে আদায় করে নেই। ফরজ নামাযে জামায়াতের কোন ধার ধারে না। নিজের যখন সুযোগ হয় তখন সে বাড়িতেই হয়তো অতি তাড়াতাড়ি আদায় করে নেই। নামায তাদের জন্য এক মহা কষ্টের জিনিস। এটাকে তারা মস্তবড় বোঝা মনে করে, যে কোন ভাবে বোঝা সরাতে পারলেই হয়। এই শ্রেণীর নামাযীদের নামাযের মধ্যে মন বসে না। মন ছটফট করে বেড়ায়। নামায শুরু করলেই তাদের মনের মধ্যে দুনিয়ার কথা এসে হাজির হয়ে যায়। নামাযের মধ্যে এদিক ওদিক তাকায়। নামাযের মধ্যে নিজের শরীরের অঙ্গ-প্রতঙ্গ নিয়ে খেলায়। ঘন ঘন হাই হোলে। চোখে ঘুম এসে যায়। নামাযের মধ্যে কি পড়লো তার কোন খেয়াল করে না। রুকু-সিজদা ঠিকমত আদায় করে না। কাকের মতো কয়েকটি ঠোক্কর মারে মাত্র। আবার কেউ লোক চক্ষুর ভয়ে নামায আদায় করে। তাতে দেহ্ পাক থাক আর না থাক নামাযে দাঁড়িয়ে যায়। ফলে এই শ্রেণীর লোকদের নামায নিছক লোক দেখানো নামাযে পরিণত হয়ে যায়। আসলে তাদের পরকালে ঈমান না থাকার কারণেই তারা এরূপ করে।

মুসলমান দাবীদার এই মুনাফিকদের আখেরাতের শাস্তির প্রতি কোন ভয় নেই। এই কারণে হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) ও আতা ইবনে দীনার (রহঃ) বলেনঃ আল্লাহ্র শোকর যে তিনি- فِيْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ বলেন নাই। বলেছেন- عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ কেননা আমরা নামাযের মধ্যে ভুল করে থাকি বটে। কিন্তু নামাযের ব্যাপারে আমরা অবজ্ঞা দেখাই না। আমরা তার প্রতি গাফেল নই। এই কারণে আমরা মুনাফিকদের মধ্যে গণ্য হবো না। যদি প্রথম কথাটি বলা হতো তাহলে নামাযের মধ্যে অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটির জন্য আমরা মুনাফিকদের মধ্যে গণ্য হয়ে যেতাম। নামাযের ব্যাপারে অবজ্ঞা প্রদর্শন মুনাফিকীর একটা বড় লক্ষণ। এই অবস্থার কথা কুরআন মজীদের অপর আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে-

وَلَا يَأْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ-

অর্থাৎ তারা (মুনাফিকরা) নামাযের জন্য আসে না-আসে অবজ্ঞা ভরে অনিচ্ছা সত্বে। আর (আল্লাহ্র পথে অর্থ) খরচ করে না করে- অত্যন্ত অনাগ্রহে। (তাওবাহ-৫৪)।

নবী করীম (সাঃ) মুনাফিকদের নামায সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন ঃ এটা মুনাফিকের নামায, এটা মুনাফিকদের নামায, এটা মুনাফিকদের নামায। আসরের সময় বসে থেকে সূর্য দেখতে থাকে। যখন তা শয়তানের দুই শিং-এর মাঝখানে পৌঁছে যায় (অর্থাৎ সূর্য ডোবার সময় হয়ে যায়) তখন উঠে

চারটি ঠোকর মারে। এতে আল্লাহকে খুব কম-ই স্মরণ করা হয়। (বুখারী-মুসলিম, আহমদ)
অন্য হাদীসে হযরত মুসয়াব তার পিতা সায়াদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ যেসব লোক নামাযের ব্যাপারে অবজ্ঞা দেখায় তাদের সম্পর্কে আমি নবী করীম (সাঃ) এর কাছে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ এরা সেই লোক, যারা নামায তার নির্দিষ্ট সময় পার করার পর আদায় করে থাকে। (ইবনু জরীর, আবু ইয়ালা, ইবনুল মুনযির, ইবনে আবু হাতিম, তাবারানী, ইবনু মারদুইয়া, বায়হাকী)।
মুনাফিকদের প্রথম যে চরিত্র এবং কার্যকলাপ তা হলো- তারা নামাযের সার্বিক ব্যাপারে গাফেল, অমনোযোগী এবং অবজ্ঞা প্রদর্শনকারী।

দ্বিতীয় চরিত্র ও কার্যকলাপ ঃ اَلَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ আর যারা লোক দেখানো কাজ করে। এটা একটি স্বতন্ত্র বাক্যও হতে পারে। আবার প্রথম বাক্য নামাযের সাথে সম্পর্কিতও মনে করা যেতে পারে। যদি একে একটি স্বতন্ত্র বাক্য ধরা হয় তাহলে এর অর্থ বা তাৎপর্য হবে- এই লোকেরা কোন একটি নেক কাজও খালেশভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে করে না। যা কিছু করে, তা নিছক লোক দেখানোর জন্যই করে। এ কাজে তাদের উদ্দেশ্য থাকে লোক-জন এই নেক কাজের জন্য তাদের প্রশংসা করুক। তাদেরকে নেক্কার, পরহেজগার মনে করুক। তাদের এসব সৎ কাজে ঢাক-ঢোল পিটাক। আর এই কাজের ফলটা তারা কোন না কোন ভাবে এই দুনিয়ায়-ই লাভ করুক।
অপর পক্ষে যদি এই অর্থ বা তাৎপর্য পূর্বের বাক্য নামাযির সাথে সম্পর্কিত বাক্য মনে করা হয়, তা হলে এর তাৎপর্য হবে- তারা লোক দেখানো নামায আদায় করে। তাফসীরকারগণ এই দ্বিতীয় অর্থটিকেই বেশী অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কেননা, প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হয়, এই বাক্যাংশটি পূর্ববর্তী বাক্যের অংশ ও উহার সাথে সম্পর্কিত। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, "এই বাক্যে মুনাফিকদের কথাই বলা হয়েছে। কেননা, তারা লোক দেখানো নামায আদায় করে থাকে। অন্য কোন লোক থাকলে নামায আদায় করে। আর যদি কেহ দেখার না থাকে তাহলে আদায় করে না"। অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে- "একাকী থাকলে (নামায) আদায় করে না, আর প্রকাশ্য ভাবে আদায় করে"। (ইবনে জরীর, ইবনুল মুনযির, ইবনে আবু হাতিম, ইবনে মারদুইয়া, বায়হাকী)।

আল কুরআনের অন্য আয়াতে মুনাফিকদের এই অবস্থার বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে-

وَاِذَا قَامُوْٓا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى يُرَآءُوْنَ
النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا-

তারা যখন নামাযের জন্য উঠে, তখন তারা আলস্য ভরে উঠে। লোকদের দেখায়। আর আল্লাহকে তারা খুব কমই স্মরণ করে। (সূরা নিসা-১৪২)

মুনাফিকদের তৃতীয় চরিত্র বা কার্যকলাপ ঃ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ

আর তারা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসও অন্যকে দেয় না। সূরার সর্বশেষ এবং মুনাফিকদের সর্বশেষ চরিত্র হলো- তারা সংসারের নিত্য প্রয়োজনীয় ছোটখাট জিনিস অপরকে দিতে চায় না।

مَاعُوْنَ শব্দের অর্থে- হযরত আলী (রাঃ) এবং তাঁর মতের অনুসারী একদল তাফসীরকারক বলেছেন 'মাউন' শব্দ দ্বারা 'যাকাত' বোঝানো হয়েছে। অপর পক্ষে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং তাঁর মতের অনুসারী তাফসীরকারক বলেছেন যে, 'মাউন' শব্দের অর্থ সাধারণ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস। চুলা, ডুলি, দাও, কুড়াল, দাঁড়িপাল্লা, নুন, পানি, আগুন, ফায়ার লাইট বা দিয়াশলাই প্রভৃতি ক্ষুদ্র অথচ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস এই পর্যায়ে পড়ে।

মাউন শব্দের অর্থে রাসূল (সাঃ) নিজে এই আয়াতের তাফসীর করে বলেছেন যে, এর অর্থ কুড়াল, ডুলি ও এই ধরনের জিনিসপত্র। হযরত ইবনে আব্বাসও এই অর্থ গ্রহণ করেছেন।

আসল কথা হলো- 'মাউন' বলা হয় ক্ষুদ্র ও স্বল্প জিনিসকে। যার দ্বারা লোকেরা সামান্য কিছু উপকৃত হয়। এই অর্থের দৃষ্টিতে যাকাতও মাউনের মধ্যে গণ্য। কেননা, তা তো বিপুল সম্পদের একটা ক্ষুদ্র অংশমাত্র। আর এটা দরিদ্রদের সাহায্যের জন্যই দেয়া হয়। যেমন হযরত আলী (রাঃ) এবং তাঁর মতের লোকজন বলেছেন। এছাড়া অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসও মাউন এর মধ্যে গণ্য। যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং তাঁর মতের লোকজন বলেছেন। অধিকাংশ তাফসীরকারকদের মতে 'মাউন' বলতে সেই সব সাধারণ জিনিসকে বুঝায় যা লোকেরা সাধারণ ভাবে অভ্যাস বশত একে অপরের নিকট হতে চেয়ে নেয়। আর এসব জিনিস চাইতে লজ্জা-সংকোচবোধও করে না। কেননা, ধনী-গরীব, স্বচ্ছল-অস্বচ্ছল সব ধরনের লোকেরই এসব জিনিস কোন না কোন সময় প্রয়োজন দেখা দেয়। যা না চাইলে তার মোটেই চলে না। সুতরাং এসব নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস দিতে অস্বীকার করা বা কার্পণ্য করা নীতি নৈতিকতার দিক দিয়ে খুবই হীন আচরণ বলে বিবেচিত হয়।

এসব জিনিসের বিনিময় হয়ে থাকে সাধারণতঃ প্রতিবেশীদের মধ্যে। সুতরাং এসব ছোটখাট নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস না দেয়া প্রতিবেশী সুলভ আচরণের খেলাপ এবং প্রতিবেশীর যে হক বা অধিকার আছে তারও পরিপন্থী।

মোট কথা এই আয়াতটির বক্তব্য হলোঃ পরকালের প্রতি অবিশ্বাস মানুষকে এতই সংকীর্ণমনা ও নীচহীন বানাইয়া দেয় যে, সে অপরের জন্য সামান্য একটু কষ্ট বা ত্যাগ স্বীকার করতেও প্রস্তুত নয়।

প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! 'সূরা মাউন'-এ বর্ণিত যে পাঁচটি আচরণ-এর কথা উপরে দু'টি ভাগে ভাগ করে উল্লেখ করা হলো– আখেরাত বা পরকালের প্রতিদান সম্পর্কে অবিশ্বাসী হওয়ার কারণেই মুলতঃ তারা এসব আরচণ এবং মুনাফেকী কাজ করে থাকে। যদি তারা আখেরাতের প্রতিদান সম্পর্কে বিশ্বাসী হতো তাহলে তারা এ ধরনের আচরণ এবং কার্যকলাপ কখনই করতে পারতো না।

শিক্ষা ঃ আলোচ্য সূরা মাউনে যেসব শিক্ষা রয়েছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

● আমাদের প্রত্যেকেরই আখেরাত বা পরকালের বদলা বা প্রতিদান সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে।

● ইয়াতীমদের সাথে ভালো আচরণ করতে হবে। তাদের পিতার রেখে যাওয়া কোন স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ-সম্পত্তি আমানত হিসাবে জমা থাকলে বয়োপ্রাপ্ত হবার সাথে সাথে বুঝিয়ে দিতে হবে।

● ইয়াতমীদের সাথে খারাপ এবং রূঢ় আচরণ তো করা যাবেই না। বরং তাদের সাথে আগবেড়ে ভালো ব্যবহার এবং সহানুভূতি প্রদর্শন করতে হবে। এমন ব্যবহার করা যাবে না যাতে তারা মনে কষ্ট পায়।

● সমাজে যারা অসহায়-দরিদ্র রয়েছে তাদের মৌলিক চাহিদা যেমন খাদ্য-খাবার, পোষাক-আশাক, সেবা-শুশ্রুষা, চিকিৎসা, বসবাসের জায়গা এবং শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এটা যে করতে হবে তাদের অনুগ্রহের জন্য তা নয়। বরং ব্যক্তি ও সমাজের কাছে তাদের যে হক বা অধিকার রয়েছে তাই আদায় করতে হবে।

● মিসকীন তথা অসহায় দরিদ্রদের নিজে যেমন সাহায্য-সহযোগীতা করতে হবে তেমনি পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরকে এবং সমাজের অন্যান্য লোকদেরকে তাদের খাদ্য-খাবার দেওয়া এবং প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রদান করতে হবে।

● নামাযের (ভিতর-বাইরে) সকল হক আদায় করে নামায পড়তে হবে। নামাযের ব্যাপারে কোন ভাবেই উদাসীন এবং গাফেল হওয়া যাবে না। কেননা, নামাযের প্রতি উদাসীনতা হলো মুনাফিকীর লক্ষণ।

● নামায যেমন লোক দেখানোর জন্য আদায় করা যাবে না। তেমনি অন্যান্য নেক বা সৎ কাজও মানুষের সন্তুষ্টি এবং দুনিয়াতেই প্রশংসা লাভের আশায় করা যাবে না। নামায হোক বা অন্যান্য নেক কাজ হোক সকল আমলের পেছনে একমাত্র আল্লাহরই সন্তুষ্টি থাকতে হবে।

● পরিবারের নিত্য প্রয়োজনীয় সাধারণ জিনিস প্রতিবেশীদের সাথে লেন-দেন করতে হবে। যদি সম্ভাবনা থাকে এবং এমন প্রতিবেশী হয় যে, সে একবার কোন জিনিস পেলে আর ফেরত দেবে না বা আত্মসাত করার সম্ভাবনা থাকে তাহলে কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জিনিস দেয়া যাবে না।

রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়। - আল হাদীস

লেখকের অন্যান্য বই

দারসে হাদীস-১ম খন্ড
দারসে হাদীস-২য় খন্ড
দারসে কুরআন-১ম খন্ড
দারসে কুরআন-২য় খন্ড
দারসে কুরআন-৩য় খন্ড
দারসে কুরআন-৪র্থ খন্ড
ইসলামী সংগঠন ও প্রশিক্ষণ
বিষয়ভিত্তিক নির্বাচিত হাদীস
আল কুরআনে মানব সৃষ্টি তত্ত্ব
রাসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) রুহানী নামায
বিষয়ভিত্তিক কুরআন হাদীস সংকলন
বাংলা উচ্চারণসহ ১০০ মাসনুন দোয়া
কুরআন হাদীসের আলোকে ৫দফা কর্মসূচী
ফাযায়েলে ইক্বামাতে দ্বীন বা দ্বীন প্রতিষ্ঠার (চেষ্টার) মর্যাদা

সাহাল প্রকাশনী

সাহাল প্রকাশনী

দারসে কুরআন

৪

অধ্যাপক আবদুল মতিন

দারসে কুরআন

৪র্থ খন্ড

অধ্যাপক আবদুল মতিন

দারসে কুরআন-৪র্থ খন্ড
প্রকাশনায় ঃ সাহাল প্রকাশনী
৩০৮, খানজাহান আলী রোড,
(তারের পুকুর), খুলনা।

প্রকাশকাল ঃ
মে - ২০১১ সাল
বৈশাখ - ১৪১৮ সন
রবিউস সানি -১৪৩২ হিজরী

সত্ত্ব ঃ লেখক কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত।

প্রচ্ছদ ঃ কৃষ্টি কম্পিউটার,
৩০৮, খানজাহান আলী রোড, খুলনা।
অক্ষর বিন্যাস ঃ মুহ্তারীমা তাবাসসুম
৩০, খানজাহান আলী রোড, খুলনা।
মুদ্রণে ঃ ঈগল অফসেট প্রেস
৩০, খানজাহান আলী রোড,
শক্তিধাম মোড়,খুলনা।

নির্ধারিত মূল্য ঃ ৬০ টাকা

পরিবেশনায় ঃ সাহাল বুক কর্ণার
৩০৮, খানজাহান আলী রোড,
(তারের পুকুর), খুলনা।
মোবাইল ঃ ০১৭১১-৩৮৯০৭৬ (লেখক)
ঃ ০১১৯১-৭৮২২৮৬ (দোকান)

প্রাপ্তিস্থান

কুরআন মহল, সিলেট।	কাটাবন বুক কর্ণার, ঢাকা।
ইসলামিয়া লাইব্রেরী, বরিশাল।	ঢাকা বুক কর্ণার, পুরানাপল্টন, ঢাকা।
আল-হেলাল লাইব্রেরী, যশোর।	তাসনিয়া বই বিতান, মগবাজার, ঢাকা।
আল-আমীন লাইব্রেরী, সিলেট।	খন্দকার প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা।
আল-আমীন লাইব্রেরী, সাতক্ষীরা।	প্রফেসরস বুক কর্ণার, মগবাজার, ঢাকা।
একাডেমী লাইব্রেরী, দেওয়ান বাজার,চট্টগ্রাম।	আহসান পাবিলিকেশন, মগবাজার,ঢাকা।

এ ছাড়াও জেলা শহরের বিভিন্ন লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়।

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

আল-কুরআন সর্বশেষ আসমানী কিতাব যা মানব জাতির পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসাবে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর উপর অবতীর্ণ হয়।

মানুষের ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে, পারিবারীক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের যাবতীয় সমাধান আল-কুরআনে রয়েছে। এজন্য প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর উচিত আল-কুরআনকে নিজের ভাষায় বুঝে তার শিক্ষানুযায়ী বাস্তব জীবনে আমল করা। কিন্তু সমস্যা হলো আমাদের দেশের সামাজিক এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় আল-কুরআনের সঠিক শিক্ষাকে তুলে ধরার তেমন কোন বাস্তব মাধ্যম নেই। যতটুকু আছে তাও আবার সিলেবাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং ভিন্নভাবে কুরআনকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল-কুরআনের বিধি-বিধান মানতে হলে কুরআনের প্রকৃত বুঝ থাকা প্রয়োজন। আল-কুরআনের প্রকৃত বুঝ দেবার জন্যেই আমি আল কুরআনের বাছাই করা কতকগুলো অংশ থেকে 'দারসে কুরআন' খন্ড আকারে প্রকাশ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। তারই অংশ হিসেবে চতুর্থ খন্ড প্রকাশ করা হলো এবং আগামীতে আরও খন্ড প্রকাশ করার ইচ্ছা আছে-যদি আল্লাহ্ তাওফীক দান করেন।

আমি 'দারসে কুরআন' এর খন্ডগুলো ইসলামী আন্দোলনের আধুনিক ও সাধারন শিক্ষিত কর্মী ভাই-বোনদের দারস পেশ করার উপযোগী করে লিখার চেষ্টা করেছি। তাছাড়া দারসে কুরআন প্রথম খন্ডের প্রথম দিকে কুরআনকে সহজে বুঝানোর জন্য ধারাবাহিক ভাবে দারস দানের পদ্ধতি ও দারসের সময় বন্টনের নমুনা হিসেবে চারটি ছক উল্লেখ করেছি এবং সাধারণ মানুষের উপর যাতে দারসের প্রভাব পড়ে সেই জন্য দারস দানকারীর কতিপয় করণীয় উল্লেখ করেছি। বইটি লিখার বিশেষ বৈশিষ্ট হলো শ্রোতার সামনে যেন আপনি নিজেই দারস পেশ করছেন।

দারসে কুরআন চতুর্থ খন্ড লিখা এবং প্রকাশের ক্ষেত্রে যেসব গুণগ্রাহী ব্যক্তি ও পাঠক-পাঠীকা পরামর্শ, সময় ও উৎসাহ দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করেছেন তাদের শুকরিয়া আদায় করছি এবং মহান আল্লাহর কাছে তাদের জন্য উৎতম প্রতিদান কামনা করছি।

লিখা ও ছাপার ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। অতএব কোন সুহৃদয় ব্যক্তির দৃষ্টিতে যদি ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে কিংবা কোন পরামর্শ থাকে, তাহলে আমাকে সরাসরি জানালে আমি কৃতজ্ঞ থাকবো এবং ভবিষ্যতে সংশোধন করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ্।

পরিশেষে মহান আল্লাহর কাছে আমার আরজ, হে আল্লাহ! তোমার এই মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের ব্যাখ্যা এবং শিক্ষা পেশ করতে যেয়ে যদি আমার অজান্তে কোন ভুল-ত্রুটি কিংবা বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, তার জন্য তুমি আমাকে মেহেরবানী করে ক্ষমা করে দিও। আর সীমিত জ্ঞানের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করে আখিরাতে আদালতে নাজাতের জারিয়া বানিয়ে দিও। আমীন।

তারিখঃ ০১-০৫-২০১১

মুহাম্মদ আবদুল মতিন
সহকারী অধ্যাপক, ইসলামীক ষ্টাডিজ বিভাগ
দৌলতপুর কলেজ (দিবা-নৈশ)
দৌলতপুর, খুলনা।

উৎসর্গ

আল কুরআনের সমাজ প্রতিষ্ঠার
আন্দোলনে যাঁরা জীবন দান করেছেন
তাঁদের শাহাদাত কামনায়।

৪র্থ খন্ডের সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্টা নং
০ জিহাদ-সংগ্রাম এবং ধৈর্যের পরীক্ষার মাধ্যমেই জান্নাত পাওয়া যাবে। (সূরা ঈমরান-১৪২-১৪৭)	০৬
০ জান্নাতের সুখ আর জাহান্নামের দুঃখ। (সূরা যুখরুফ-৬৭-৭৮)	২৬
০ চূড়ান্ত আন্দোলনের পরই আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসে। (সূরা নসর)	৪৩
০ ঝুঁকিপূর্ণ আন্দোলন থেকে এড়িয়ে থাকার বাহানা তালাশ না করা। (সূরা তাওবাহ-৩৮-৪১)	৫৯
০ অসার ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার ধন-সম্পদ, বিত্ত-বৈভব, প্রাচুর্য গড়ার কাজে প্রতিযোগিতা না করা। (সূরা হাদীদ-২০-২৩)	৭৯
০ মানুষের কতিপয় নৈতিক দোষ ও ক্রটি এবং তার পরিণতি। (সূরা হুমাজাহ)	৯৪
০ আল্লাহর বাছাইকৃত মুমিনদের প্রকৃত জিহাদ-আন্দোলন করা কর্তব্য। (সূরা হজ্জ-৭৮)	১০৫
০ শেষ রাতের নামায এবং কুরআন তিলাওয়াত তাকওয়ার জন্য খুব বেশী কার্যকর। (সূরা মুয্যাম্মিল-১-১৩)	১২৪

১ম খন্ডে যা আছে

০ দারসে কুরআন এর বক্তৃতা দান পদ্ধতি।
০ দারসের সময় বন্টন।
০ দারস দানকারীর করণীয়।
০ দারসের কতিপয় পরিভাষার সংজ্ঞা।
০ এক নজরে আল-কুরআনের পরিচয়।
০ মুত্তাকীনদের গুণাবলী। (সূরা বাকারা-১-৫)
০ মু'মিনদের গুণাবলী। (সূরা মু'মেনুন-১-১১)
০ বাড়ীতে ঢোকার শিষ্টাচার। (সূরা নূর-২৭-২৯)
০ ধ্বংস ও ক্ষতি থেকে মানুষের বাঁচার উপায়। (সূরা আল আসর)
০ কঠিন আযাব থেকে বাঁচার উপায়। (সূরা সফ্‌ -১০-১৩)
০ মানবতার মুক্তির জন্য জিহাদ। (সূরা নিসা-৭৫-৭৬)
০ ঈমানের পরীক্ষা। (আলে ঈমরান-১৩৯-১৪১)

○ সবরের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য কামনা ও শাহীদের মর্যাদা।
(সূরা বাকারা-১৫৩-১৫৬)
○ মরণের আগেই আল্লাহর পথে অর্থ খরচ। (সূরা মুনাফিকুন-৯-১১)
○ কিয়ামতের দৃশ্য। (সূরা হজ্ব-১-২)

২য় খন্ডে যা আছে

○ জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব। (সূরা আলাক-১-৫)
○ মুমিনের জিন্দেগী হবে তাকওয়া, আন্দোলন ও দাওয়াতী জিন্দেগী।
(সূরা আলে-ঈমরান-১০২-১০৪)
○ মুমিন জীবনের লক্ষ-উদ্দেশ্য ও তাদের বৈশিষ্ট্য
(সূরা তাওবা-১১১-১১২)
○ মুমিনদের ছয়টি বর্জনীয় আচরণ। (সূরা হুজুরাত-১১-১২)
○ দুনিয়াদারদের প্রতি সতর্কবাণী। (সূরা তাকাছুর-১-৮)
○ ইসলামী আন্দোলনঃ কর্মীদের গুণাবলী (সূরা মায়িদাহ-৫৪-৫৬)
○ আল্লাহর কতিপয় কুদরত ও নি'য়ামত। (সূরা আন নাবা-১-১৬)
○ মুনাফিকদের আচরণ। (সূরা বাকারা-৮-১৬)

৩য় খন্ডে যা আছে

○ জিহাদ বা ইসলামী আন্দোলনের গুরুত্ব। (সূরা তাওবাহ-১৯-২৪)
○ কতিপয় সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ,
ওয়াদা এবং কসম রক্ষা করার গুরুত্ব। (সূরা নহল-৯০-৯৭)
○ অতীতের নবীদের দ্বীনের ন্যায় একই দ্বীনের
দাওয়াত দান এবং প্রতিষ্ঠার নির্দেশ। (সূরা শু'রা-১৩-১৬)
○ ঈমানের পরীক্ষা দিয়েই জান্নাতে যেতে হবে।(সূরা আনকাবুত-১-৭)
○ আল্লাহর উপর অবিচল ঈমান। সর্বোত্তম পন্থায়
দাওয়াত দান ওসহিষ্ণুতা প্রদর্শন।(হা-মীম-আস-সাজদাহ-৩০-৩৬)
○ দাওয়াতে দ্বীনের কাজে অধৈর্য হলে চলবে না।
(সূরা আনয়াম-৩৩-৩৬)
○ স্ত্রী-সন্তান এবং ধন-সম্পদ মানুষের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ।
(সূরা তাগাবুন-১৪-১৮)
○ আখিরাতে অবিশ্বাসীদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ও কার্যকলাপ। (সূরা মাউন)

এক

জিহাদ-সংগ্রাম এবং ধৈর্যের পরীক্ষার মাধ্যমেই জান্নাত পাওয়া যাবে।

সূরা-আলে ঈমরান ১৪২-১৪৭ আয়াত

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ
فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا
مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ ○ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ
قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ ص فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ○ وَمَا
مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ج قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ط اَفَا۟ئِنْ
مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ
فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا ط وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ ○ وَمَا
كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا ط وَمَنْ
يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ج وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ
نُؤْتِهٖ مِنْهَا ط وَسَنَجْزِى الشّٰكِرِيْنَ ○ وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ
مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ج فَمَا وَهَنُوْا لِمَا اَصَابَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ ○
وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا
وَاِسْرَافَنَا فِىْٓ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكٰفِرِيْنَ ○

অনুবাদঃ ইরশাদ হচ্ছে- (১৪২) (মুমিনেরা!) তোমরা কি মনে করে নিয়েছো যে, তোমরা এমনিতেই জান্নাতে চলে যাবে? অথচ আল্লাহ তা'য়ালা এখনও দেখেন নি যে, তোমাদের মধ্যে কারা কারা জিহাদ-সংগ্রাম করেছে এবং কারা কারা ধৈর্যশীল। (১৪৩) তোমরা তো (ইতোপূর্বে) মৃত্যু আসার আগেই মরণ কামনা করতে, কাজেই এখনতো তোমরা তা চোখের সামনেই উপস্থিত দেখতে পাচ্ছো। (১৪৪) আর মুহাম্মদ তো একজন রসূল ছাড়া কিছুই নন। তাঁর পূর্বেও তো বহু রসূল বিদায় হয়ে গেছেন। তাহলে কি যদি তিনি মৃত্যু বরণ করেন অথবা নিহত (শহীদ) হন, তবে কি তোমরা (দ্বীন থেকে) ফিরে যাবে? বস্তুতঃ কেউ যদি (দ্বীন থেকে) ফিরে যায়, তবে তাতে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ হয়, আল্লাহ তাদেরকে প্রতিদান দান করেন। (১৪৫) (যেন রেখ,) আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া কেউ মরতে পারে না-সেজন্য একটা সময় নির্দিষ্ট রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে যে দুনিয়াতে বিনিময় কামনা করবে, আমি তাকে তা দুনিয়াতেই দিয়ে দেব। অপরপক্ষে যে আখিরাতে বিনিময় কামনা করবে, আমি তাকে তা আখিরাতেই দেব এবং কৃতজ্ঞদেরকে আমি অবশ্যই প্রতিদান দেব। (১৪৬) (ইতোপূর্বে) আরও বহু নবী ছিলেন, যাঁদের সঙ্গী-সাথীরা তাঁদের অনুসারী হয়ে জিহাদ-সংগ্রাম করেছে। আল্লাহর পথে (টিকে থাকতে) তাদের কিছু ঝুঁকি-কষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু আল্লাহর পথে তারা হেরেও যায়নি, ক্লান্ত-শ্রান্তও হয়নি এবং দমেও যায়নি। আর যারা ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন। (১৪৭) তারা আর কিছুই বলেনি-শুধু বলেছে, হে আমাদের পরওয়ারদেগার ! আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দাও এবং (আন্দোলন-সংগ্রাম করতে যেয়ে) আমাদের কাজে যেসব বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে তাও মোচন করে দাও। আর (হে আল্লাহ! কাফিরদের মোকাবেলায়) আমাদেরকে দৃঢ় মজবুত রাখো এবং কাফিরদের উপর আমাদেরকে সাহায্য করো।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ أَمْ -কি। حَسِبْتُمْ -তোমরা হিসাব/ধারণা করেছো। أَنْ-যে। تَدْخُلُوا -তোমরা প্রবেশ করবে। الْجَنَّةَ -জান্নাতে। وَلَمَّا -অথচ না। يَعْلَمِ -জেনেছেন। الَّذِيْنَ -যারা। جٰهَدُوْا - জিহাদ/সংগ্রাম করেছো। مِنْكُمْ -তোমাদের মধ্যে। يَعْلَمَ -তিনি জানেন। الصّٰبِرِيْنَ - ধৈর্যশীলদেরকে। وَ -এবং। لَقَدْ -নিশ্চই/অবশ্যই। كُنْتُمْ -তোমরা। تَمَنَّوْنَ - কামনা করতেছিলে। الْمَوْتَ - মৃত্যুর। مِنْ قَبْلُ - ইতোপূবে।

تَلْقَوْهُ -তার সাক্ষাৎ পেতে। فَقَدْ -অতঃপর নিশ্চয়। رَاَيْتُمُوْهُ -তা তোমরা দেখছো। اَنْتُمْ -তোমরা। تَنْظُرُوْنَ - প্রত্যক্ষ করছো/দেখছো। مَا-নয়/কি। اِلَّا -ছাড়া/ব্যতিরেকে। قَدْ - নিশ্চয়। خَلَتْ -অতীত হয়েছে। قَبْلِهِ -তার পূর্বে। اَفَائِنْ -তবে যদি কি। مَاتَ -তিনি মারা যান। اَوْ - বা/ অথবা/কিম্বা। قُتِلَ -নিহত হন। اِنْقَلَبْتُمْ-তোমরা ফিরে যাবে। عَلٰى -উপর। اَعْقَابِكُمْ -তোমাদের গোড়ালীর অর্থাৎ পিছন দিকে (অর্থাৎ কুফরীতে)। مَنْ -যে। يَنْقَلِبْ -ফিরে যাবে। عَقِبَيْهِ -তার দুই গোড়ালীর। فَلَنْ -তাহলে কক্ষণো না। يَضُرَّ -ক্ষতি করতে পারবে। شَيْئًا -কিছুই। سَيَجْزِى -প্রতিফল দেবেন। اَلشّٰكِرِيْنَ - কৃতজ্ঞদেরকে। مَنْ -যে। يُرِدْ -চায়। ثَوَابَ -নেকী। مِنْهَا -তা হতে। نُؤْتِهٖ -আমরা তাকে দেব। سَنَجْزِى -আমরা শিগগীর প্রতিফল দেব। كَاَيِّنْ -কতো। قٰتَلَ -লড়াই করেছে। مَعَهٗ -তাঁর সাথে। رِبِّيُّوْنَ - আল্লাহওয়ালা লোকেরা। كَثِيْرٌ - অনেক/ অধিক। فَمَا - অতঃপর না। وَهَنُوْا-তারা হতাশ হয়েছে। لِمَا -তার জন্য যা। اَصَابَهُمْ -তাদের উপর নিপতিত হয়েছে। فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ-আল্লাহর পথে। وَمَا-এবং না। اِسْتَكَانُوْا -তারা মাথা নতো করেছে। يُحِبُّ-ভালবাসেন। اَلصّٰبِرِيْنَ -ধৈর্যশীলদেরকে। كَانَ -ছিলো। قَوْلَهُمْ - তাদের কথা । اِلَّا - এছাড়া। اَنْ -যে। قَالُوْا -তারা বলেছিলো। رَبَّنَا -হে আমাদের প্রতিপালক। اِغْفِرْ -মাফ করো। لَنَا -আমাদের জন্য। ذُنُوْبَنَا -আমাদের অপরাধসমূহ। اِسْرَافَنَا -আমাদের বাড়াবাড়িকে। اَمْرِنَا -আমাদের কাজের। ثَبِّتْ -দৃঢ় করো। اَقْدَامَنَا -আমাদের পদক্ষেপ। اُنْصُرْنَا - আমাদের সাহায্য করো। عَلٰى -উপর/বিরুদ্ধে। الْقَوْمِ -জাতি।

সম্বোধনঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ইসলাম প্রিয়/প্রিয় দ্বীনি ভাইয়েরা/ভাই ও বোনেরা! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি আপনাদের সামনে/খিদমতে দারস পেশ করার জন্য সূরা আলে ঈমরানের ১৪২ থেকে ১৪৭ নং পর্যন্ত মোট পাঁচটি আয়াত

তিলাওয়াত ও তরজমা পেশ করেছি। আল্লাহ্ পাক যেন আমাকে সঠিক ভাবে দারস পেশ করার তাওফীক দান করেন। আমীন।

সূরার নামকরণ ঃ এই সূরার ৩৩ নং আয়াতে উল্লেখিত- وَآلِ عِمْرَانَ "ঈমরানের বংশধর" বাক্যটিকেই পরিচিতির জন্য চিহ্ন হিসেবে এই সূরার নামকরণ "আলে ঈমরান" করা হয়েছে। কেননা, আল কুরআনে ১১৪ টি সূরার অধিকাংশ সূরাই শিরোনাম হিসেবে নয় বরং প্রতীকী বা চিহ্ন হিসেবেই নামকরণ করা হয়েছে। আর এই নামকরণ আল্লাহর নবী (সঃ) নিজে করেননি বরং আল্লাহই করেছেন যা অহীর মাধ্যমে জানিয়া দেয়া হয়েছে।

সূরাটি নাযিলের সময়কাল ঃ আলোচ্য সূরাটি সর্বসম্মত মতে মাদানী। তবে একই সময় সম্পূর্ণ সূরাটি অবতীর্ণ হয়নি। চারটি ভাষণে সূরাটি সমাপ্ত হয়েছে।

প্রথম ভাষণ ঃ প্রথম ভাষণটি সূরার প্রথম থেকে শুরু করে চতুর্থ রুকুর দ্বিতীয় আয়াত পর্যন্ত চলেছে। এই ভাষণটি সম্ভবত বদর যুদ্ধের সমসাময়িক সময় নাযিল হয়।

দ্বিতীয় ভাষণ ঃ এই ভাষণটি সূরার চতুর্থ রুকুর তৃতীয় আয়াত থেকে শুরু হয়ে ষষ্ঠ রুকুর শেষ পর্যন্ত চলেছে । নবম হিজরীতে আল্লাহর নবীর নিকট নাজরানের প্রতিনিধি দলের আগমনের সময় এটি নাযিল হয়।

তৃতীয় ভাষণ ঃ এই ভাষণটি সূরার সপ্তম থেকে শুরু করে দ্বাদশ রুকুর শেষ পর্যন্ত চলেছে । বিষয় অনুযায়ী প্রথম ভাষণের সাথে সাথেই এটি নাযিল হয় বলে মনে হয়।

চতুর্থ ভাষণ ঃ এই ভাষণটি সূরার ত্রৈদশ রুকু থেকে শুরু করে সূরার শেষ পর্যন্ত চলেছে। ওহুদ যুদ্ধের পর এটি নাযিল হয় বলে মনে হয়। (আল্লাহই বেশী ভাল জানেন)।

সূরাটির বিষয়বস্তু বা আলোচ্য বিষয় ঃ এই সূরায় দু'টি দলকে সম্বোধন করা হয়েছে । একটি দল হলো 'আহলি কিতাব' তথা ইহুদী ও নাসারা (খৃষ্টান) এবং অপর দলটি হলো স্বয়ং রাসূল (সাঃ) এর অনুসারী মুসলমান।সূরার প্রথমে 'আহলি কিতাব' তথা ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে জোরাল ভাষায় তাদের

আকীদাগত বিভ্রান্তি এবং চারিত্রীক দোষ-ক্রটি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে রাসূল (সঃ) এবং আল কুরআনকে মেনে নেয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

অপর পক্ষে দ্বিতীয় দল আর্থাৎ রাসূল (সঃ) এর অনুসারী মুসলমানদেরকে শ্রেষ্ঠতম দলের মর্যাদার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদের মহান দায়-দায়িত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

সত্যের পতাকা বহন এবং বিশ্ব মানবতার সংস্কার ও সংশোধনের জন্য পূর্ববর্তী উম্মতদের ধর্মীয় ও চারিত্রীক অধঃপতনের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরে তাদের পদাঙ্কনুসরণ না করে দূরে থাকার জন্য সতর্ক করা হয়েছে।

একটি সংস্কারবাদী দল হিসেবে তারা কিভাবে তাদের দায়-দায়িত্ব পালন করবে এবং যেসব আহলি কিতাব ও মুনাফিক নামধারী মুসলমানেরা আল্লাহর দ্বীনের পথে নানা প্রকারের বাধা সৃষ্টি করছে তাদের সাথে কি ধরণের আচরণ করতে হবে, তাদেরকে তা জানিয়ে দেয়া হয়েছে। ওহুদ যুদ্ধে মুসলমান দলটির মধ্যে যেসব দূর্বলতা দেখা দিয়েছিলো তার পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং তাদের মধ্যে বিরাজমান দূর্বলতাকে দূর করার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে ।

আলোচ্য আয়াতসমুহের মূল বক্তব্যঃ দারসের জন্য তিলাওয়াতকৃত আয়াত পাঁচটির মূল বক্তব্য হলো, আল্লাহ তা'য়ালা কেবল তাদেরকেই জান্নাত দিবেন যারা ধৈর্যের সাথে জিহাদ-সংগ্রাম করে টিকে থাকতে পারবে। আর আল্লাহ তা যাচাই করে নিবেন। অহেতুক আগে বেড়ে কোন যুদ্ধ-সংগ্রাম বা মৃত্যু কামনা না করা। বরং মৃত্যুর সময় আসলে তা হাসিমুখে বরণ করে নেয়া। দ্বীন কায়েমের আন্দোলনের নেতা মুহাম্মদ (সঃ) এর মৃত্যু কিম্বা শাহাদাতের কারণে হতাশ হয়ে আন্দোলন থেকে পিছপা না হওয়া। কেননা, সকল নবী রাসূলই মানুষ, তাঁদের শাহাদাত কিম্বা মৃত্যু হবেই। দ্বীন কায়েমের চেষ্টা করা আল্লাহর নির্দেশ সুতরাং তা পালনের জন্য অন্য এক যোগ্য ব্যক্তিকে নেতা বানিয়ে তার নেতৃত্বে জিহাদ-সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। আর কাফির-খোদাদ্রোহী শক্তির উপর বিজয়ের জন্য দৃঢ় মজবুতভাবে টিকে থাকার জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া এবং নিজের কাজের ক্রটির জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া।

ব্যাখ্যাঃ প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের খিদমতে দারসের জন্য প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় আলোচনা করা হলো। এখন তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা পেশ করছি। দারসের জন্য তিলাওয়াতকৃত প্রথম আয়াতে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন -

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ

(হে মুমিনগন!) তোমরা কি মনে করে নিয়েছো যে , তোমরা এমনিতেই জান্নাতে চলে যাবে? অথচ আল্লাহ্ এখনও যাচাই করে নেননি যে , তোমাদের মধ্যে কারা কারা জিহাদ-সংগ্রাম করেছে এবং কারা কারা ধৈর্যশীল।

আল্লাহ্ তা'য়ালা তার নি'য়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতে কেবল প্রকৃত মুমিনদেরকেই প্রবেশ করাবেন। আর প্রকৃত মুমিন যাচাই-বাছায়ের মাধ্যমই হলো নিজের জান-মাল দিয়ে জিহাদ-সংগ্রাম করা। কেননা, একমাত্র জান-মাল কুরবানীর বিনিময়েই আল্লাহ্ জান্নাত দেবেন- অন্য কোন কিছুর বিনিময়ে নয়। এ মর্মে সূরা তাওবার ১১১ নং আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন–

إِنَّ اللهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ط يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ

"নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'য়ালা মুমিনদের জান-মাল জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন। তারা যুদ্ধ-জিহাদ করে আল্লাহর পথে, অতঃপর তারা মারে এবং নিজেরাও মরে (শহীদ হয়ে যায়)।"

আয়াতের শেষাংসে আল্লাহ্ তা'য়ালা আরও বলেন যে, "তিনি দেখে নিতে চান কারা কারা ধৈর্যশীল"। আর্থাৎ কাফির, মুশরিক, মুনাফিক ও খোদাদ্রোহী শক্তির সকল ষড়যন্ত্র এবং সকল প্রকার বাধাকে ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করে কারা কারা দৃঢ় মজবুত থেকে যুদ্ধ-জিহাদ আন্দোলন-সংগ্রাম করে, এটাও আল্লাহ্ পরীক্ষা নীরীক্ষা করে নিবেন। এ মর্মে মহান আল্লাহ্ অন্য আয়াতে বলেন-

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ ۙ وَنَبْلُوَا اَخْبَارَكُمْ۔

"আমি তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করবো, যতক্ষণ না প্রমাণ হয় যে,কে কে তোমাদের মধ্যে জিহাদকারী ও কে কে ধৈর্যশীল এবং যতক্ষণ না আমি তোমাদের অবস্থানসমূহ যাচাই করি।" (সূরা মুহাম্মদ-৩১)

যুগে যুগে এমন কি আমাদের বর্তমান সমাজেও দেখা যায়, অধিকাংশ মুসলমানই দ্বীনের অত্যন্ত কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-এমনকি যা ইসলামের কোন অংশই নয় এমন সব সহজ, ঝুঁকিমুক্ত আ'মলের মাধ্যমে চোরা গোপ্তা পথে জান্নাতে যেতে চায়। দ্বীনের মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ এবং ঝুঁকিযুক্ত আ'মল করতে চায় না । এ ধরণের আ'মলের ধারে কাছেও ঘেঁষতে চায় না। এ পথে অর্থ-সম্পদ খরচ করতে রাজি হয় না। দ্বীন কায়েমের আন্দোলনকে তথাকথিত প্রচলিত রাজনীতির সাথে জড়িয়ে দিয়ে জিহাদ-সংগ্রাম থেকে এড়িয়ে থাকতে চায়। অথচ আল্লাহর নবী (সঃ) জিহাদ থেকে দূরে অবস্থানকারীর মৃত্যু মুনাফিকদের মৃত্যুর সাথে তুলনা করে বলেন -

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهٖ نَفْسَهُ مَاتَ عَلٰى شُعْبَةٍ مِّنَ النِّفَاقِ۔

"হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলো, অথচ সে (দ্বীনের জন্য) জীবনে যুদ্ধ জিহাদ করলো না, এমনকি অন্তরে একাজ করার চিন্তাও করলো না, তবে তার মৃত্যু মুনাফিকির অবস্থায় হলো।" (সহীহ মুসলিম)

অতএব জান্নাত পাবার এই ফর্মুলা অর্থাৎ জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ-সংগ্রাম করতেই হবে এবং কাফির, মুশরিক, মুনাফিক এবং খোদাদ্রোহী তাগুতী শক্তির বিরুদ্ধে ধৈর্যের সাথে দৃঢ়-মজবুত ভাবে টিকে থেকে আন্দোলন করলেই কেবলমাত্র জান্নাত পাওয়া যাবে। বিকল্প কোন পথেই জান্নাত পাওয়া যাবে না। যারা বিকল্প পথে অর্থাৎ সহজ এবং ঝুঁকিমুক্ত পথে জান্নাত পেতে চায়, তাদের এ ধারণা ভুল। জান্নাত পাবার এসব পথ সঠিক নয়।

অতঃপর পরবর্তী আয়াতে বদর যুদ্ধে কাফিরদের শোচনীয় পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য আরো শক্তি নিয়ে পরবর্তী বছর কাফির-মুশরিকদের সশস্ত্র দল মদীনায় নবীর নবগঠিত ছোট রাষ্ট্র আক্রমনের জন্য ধেয়ে আসলে নবীজী (সঃ) তাঁর সঙ্গী-সাথী সাহাবাদের নিয়ে পরামর্শ করতে বসেন। পরামর্শে যেসব সাহাবাদের শাহাদাত লাভের অত্যধিক চাপে নবী করীম (সঃ) মদিনার বাইরে গিয়ে কাফিরদের মোকাবেলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সেইসব শাহাদাতকামীদের উদ্দেশ্যে বলতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন –

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ -

আর তোমরা তো (ইতোপূর্বে) মৃত্যু আসার আগেই মরণ কামনা করতে, কাজেই এখন তো (ওহুদ যুদ্ধে) তোমরা তা চোখের সামনেই উপস্থিত দেখতে পাচ্ছ।

ওহুদ যুদ্ধের সাময়িক পরাজয়ের পর্যালোচনা করতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেছেন, আল্লাহর নবী (সঃ) তো চাচ্ছিলেন মদিনায় অবস্থান করেই কাফিরদের মোকাবেলা করতে। কিন্তু পরামর্শ সভায় তোমাদের অতি উৎসাহী শহাদাতের আকাংখী অধিকাংশের পরামর্শের ভিত্তিতেই মদিনার বাইরে গিয়ে কাফিরদের মোকাবেলা করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। অথচ তোমরা এখন কাফিরদের চতুর্মুখী আক্রমনে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আল্লাহর নবীকে রেখে জীবন রক্ষার জন্য পলায়নপর কেন? তোমরা তো এই মূহুর্তেরই কামনা করছিলে! নিজের জীবনকে বাজী রেখে হলেও কাফিরদের মোকাবেলা করে শাহাদাতের পেয়ালা পান করে জান্নাতে চলে যাবে। এখন তোমরা প্রাণ রক্ষার জন্য পালাচ্ছো কেন? এখন তো তোমরা শাহাদাতের মৃত্যু তোমাদের চোখের সামনেই উপস্থিত দেখতে পাচ্ছো। এটাতো আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য মহা পরীক্ষা। আর আল্লাহ তা'য়ালাও এ কঠিন বিপদের সম্মুখীন করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেই জান্নাত দিতে চান। এ ধরনের পরীক্ষা আল্লাহ অতীতেও করেছেন। যেমন সূরা আনকাবুতের ২ ও ৩ নং আয়াতে উল্লেখ করেছেন–

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ۝ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ -

"মানুষ কি মনে করে নিয়েছে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' একথা বললেই তারা ছাড়া পেয়ে যাবে এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? আমি তো তাদেরকে পরীক্ষা করেছি যারা তাদের পূর্বে অতিবাহিত হয়ে গেছে। আল্লাহ্ আবশ্যই জেনে নিবেন কারা কারা (তাদের কথায়) সত্যবাদী এবং কারা কারা মিথ্যাবাদী।"

এ আয়াতেও ঐ কথাই বলা হচ্ছে যে, যে পর্যন্ত ধৈর্যশীলদেরকে জানা না যায়। আর্থাৎ তারা দুনিয়ায় প্রকাশিত না হয়, সে পর্যন্ত তারা জান্নাত লাভ করতে পারবে না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, তোমরা তো এই মূহুর্ত আসার পূর্বে এরূপ সুযোগেরই আকাংখা করছিলে যে, নিজের ধৈর্য ও দৃঢ়তা মহান আল্লাহকে দেখাবে এবং তার পথে শাহাদাত বরণ করবে। কাজেই এসো, আমি তোমাদেরকে সেই সুযোগ করে দিলাম, এখন তোমরা তোমাদের সেই ধৈর্য এবং দৃঢ়তা প্রদর্শন করো।

হাদীস শরীফে মহানবী (সঃ) বলেন - "তোমরা শত্রুদের মুখোমুখি হওয়ার আকাংখা করো না, আল্লাহ্ তা'য়ালার নিকট নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করো এবং যখন যুদ্ধেক্ষেত্রে উপস্থিত হও তখন লৌহদন্ডের ন্যায় অটল ও অবিচল থাকো এবং জেনে রাখো যে, জান্নাত তরবাবীর ছায়ার নীচে।"

তাই আল্লাহ্ তা'য়ালা তোমাদের সেই কামনার দৃশ্য স্বচক্ষে দেখাচ্ছেন যে, তরবারী কচকচ-ঠনঠন শব্দ করছে, বর্শা তীব্র বেগে বের হচ্ছে, মূহর্মুহ তীর বর্ষিত হচ্ছে, ভয়াবহ যুদ্ধ চলছে এবং এদিক-ওদিক মৃত্যুদেহ পড়তে রয়েছে।

বর্তমান সময়েও দেখা যায়, ইসলামী আন্দোলনের কিছু অতিউৎসাহী এবং অতি আবেগী নেতা কর্মীদের কারণে অনেক সময় নেতৃত্ব ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু যখন জীবনের ঝুঁকি এসে হাজির হয়, মাল সম্পদের ক্ষতির সম্মুখীন হয়, পেশা এবং ব্যবসা বাণিজ্য ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যায়, তখন আবার এরাই আগে ময়দান ত্যাগ করে। নিজের প্রাণ রক্ষার জন্য তৎপর হয়ে যায়। ধন-সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং চাকুরীর ঝুঁকি এড়ানোর জন্য বিভিন্ন ওজর বাহানা তালাশ করে। জীবন দেয়ার সেই আবেগ এবং শাহাদাতের আকাংখার কথা বেমা'লুম ভুলে যায়। এ সমস্ত অতি আবেগী ও অতিউৎসাহী নেতা-কর্মীর কারণেই

একটি নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের বিজয় ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে দাঁড়াই। আন্দোলনকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেয়।

নবীজীর ইচ্ছার বাইরে পরামর্শকে গুরুত্ব দেয়ার কারণেই মদীনার বাইরে গিয়ে ওহুদ প্রান্তরে কাফিরদের চতুর্মুখী আক্রমণের ফলে নবীজীকে ফেলে রেখে নিজেদের জীবনকে রক্ষার জন্য পলায়নের দৃশ্য আমাদেরকে সেই শিক্ষায় দেয়।

অতঃপর পরবর্তী আয়াতে ওহুদ যুদ্ধে মহানবী (সঃ) এর শাহাদাতের সংবাদের পেক্ষিতে যুদ্ধে নিয়োজিত সাহাবাদের মনের অবস্থা এবং তাঁদের মন্তব্যের কারণে উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য এক মহা শিক্ষার কথা তুলে ধরে মহান আল্লাহ্ বলেন–

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ج قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ط اَفَا۟ئِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ ط وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا ط وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ-

মুহাম্মদ (সঃ) একজন রাসূল ছাড়া আর কিছুই নন। তাঁর পূর্বে আরো অনেক রাসূলও বিগত হয়ে গেছেন। অতএব তিনি যদি মারা যান কিম্বা নিহত (শহীদ) হন, তাহলে তোমরা কি (দ্বীন থেকে) ফিরে যাবে? আর যে কেউ (দ্বীন থেকে) ফিরে যায়, তাতে সে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি করতে পারে না। আল্লাহ্ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কারীদেরকে পুরস্কার প্রদান করবেন।

এই আয়াতের প্রেক্ষাপট বা অবতরণের কারণ সম্পর্কে আল্লামা ইবনে কাসির (রহঃ) বলেন, ওহুদ প্রান্তরে মুসলমানেরা পরাজিত হয়েছিলো এবং তাঁদের কিছু সংখ্যক লোক শহীদও হয়েছিলো। সেদিন শয়তান এও প্রচার করে দিয়েছিলো যে, মুহাম্মদও (সঃ) শহীদ হয়ে গেছেন। আর এদিকে 'ইবনে কামিয়া' নামক একজন কাফির মুশরীকদের মধ্যে প্রচার করে 'আমি মুহাম্মদ (সঃ) কে হত্যা করে এসেছি'। প্রকৃতপক্ষে শয়তানের কথা ছিলো সম্পূর্ণ মিথ্যা ও গুজব এবং কাফির ব্যক্তির ঐ উক্তিও ছিলো মিথ্যা। সে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) কে আক্রমণ করেছিলো বটে তবে তাতে তাঁর চেহারা মুবারক কিছুটা আহত হয়েছিলো, তাছাড়া আর কিছুই হয়নি। এ মিথ্যা রটনায় মুসলমানদের মন ভেঙ্গে যায় , তাঁদের পা টলে যায় এবং তাঁরা হতবুদ্ধি হয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালায়নে উদ্যৎ হন। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

এই আয়াত অবতীর্ণের আরও একটি বর্ণনা পাওয়া যায়, তা হলো- একজন মুহাজীর একজন আনসারীকে ওহুদের যুদ্ধের মাঠে দেখেন যে, তিনি আহত হয়ে মাটিতে পড়ে রয়েছেন এবং রক্তও মাটিতে প্রবাহিত হচ্ছে। তিনি উক্ত আহত আনসারীকে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যে শহীদ হয়েছেন তা কি আপনি জানেন? তিনি উত্তরে বলেন, যদি এ সংবাদ সত্য হয় তবে তিনি তাঁর কাজ করে গেছেন। এখন আপনারা সবাই তাঁর দ্বীনের উপর নিজেদের জীবন কুরবান করুন। ঐ সম্বন্ধেই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

নবী করীম (সঃ) এর শাহাদাতের সংবাদ ছড়িয়ে যাবার সাথে সাথে অধিকাংশ সাহাবী সাহস হারীয়ে ফেলেন, মনোবল ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় এবং পা টলটলায়মান হয়ে যায়। এ অবস্থার মধ্যে মুনাফিকরা বলতে থাকে, (উল্লেখ্য যে,ওহুদ যুদ্ধে আসার পথে মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে ওবাই এর নেতৃত্বে প্রায় তিনশোত জন কেটে পড়ে, তার পরও কিছু কিছু মুনাফিক মুসলমানদের সাথে সাথেই ছিলো।) চলো আমরা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের কাছে চলে যাই। সে আমাদের জন্য আবু সুফিয়ানের কাছ থেকে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে। আবার কেউ কেউ এমন কথাও বলে ফেলে, যদি মুহাম্মদ (সঃ) সত্যি সত্যিই আল্লাহর রাসূলই হতেন, তাহলে নিহত হলেন কেমন করে? চলো আমাদের বাপ-দাদাদের ধর্মে ফিরে যায়। এসব কথার জবাবে আল্লাহ পাক বলেন, মুহাম্মদ (সঃ) এর শাহাদাত বা মৃত্যু এমন কিছু নয় যে, তোমরা আল্লাহ পাকের দ্বীন থেকে ফিরে যাবে? তোমাদের প্রেম, ভালবাসা, আত্নত্যাগ যদি কেবল মুহাম্মদ (সঃ) এর ব্যক্তিত্বের সাথেই সম্পৃক্ত হয়ে থাকে যে, মুহাম্মদ (সঃ) এর দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার সাথে সাথেই তোমরা আবার সেই কুফরীর দিকে ফিরে যাবে, যা থেকে তোমরা বের হয়ে এসেছিলে, তাহলে আল্লাহর দ্বীন তোমাদের কোন প্রয়োজন অনুভব করে না। তোমরা যদি আল্লাহর দ্বীন থেকে ফিরে চলে যাও তাহলে তোমাদের এ ফিরে যাওয়াতে আল্লাহর দ্বীনের কোনই ক্ষতি হবে না।

আয়াতের শেষাংসে মহান আল্লাহ বলেন – وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ

আর আল্লাহ তা'য়ালা তার কৃতজ্ঞ বান্দাদের প্রতিদান দান করেন।

এখানে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, তিনি ঐসব লোকদেরকেই উত্তম প্রতিদান দিবেন যারা কোন ব্যক্তি পূজা না করে একমাত্র আল্লাহর আনুগত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং তাঁর দ্বীনের কাজে লেগে থাকে ও তাঁর রাসূলের অনুসরণে সুদৃঢ় থাকে, তাতে রাসূল (সঃ) জীবিত থাক বা না থাক। আর প্রকৃতপক্ষে এরাই হলো আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দাহ।

ওহুদ যুদ্ধে মহানবী (সঃ) এর শাহাদাতের খবরে যেমন মুসলমানেরা ভেঙ্গে পড়েছিলো, অনুরূপ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিলো মহানবী (সঃ) এর ওফাতের সংবাদে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, "রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর ইন্তিকালের খবর পেয়ে হযরত আবু বকর (রাঃ) ঘোড়ায় চড়ে আগমন করেন এবং মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে জনগণের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। অতঃপর কোন কিছু জিজ্ঞাসাবাদ না করে হযরত আয়িশা (রাঃ) এর ঘরে প্রবেশ করেন। এই ঘরেই রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে 'হিবরার' চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিলো। তিনি পবিত্র মুখমন্ডল হতে চাদর সরিয়ে চুমু দেন এবং কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, আমার পিতা মাতা তাঁর প্রতি কুরবান হোক। আল্লাহ তা'য়ালার কসম! তিনি রাসূল (সঃ) এর দু'বার মৃত্যু দিতে পারেন না। যে মৃত্যু তাঁর জন্যে নির্ধারিত ছিলো তা তাঁর উপর এসে গেছে। এরপর তিনি পুনরায় মসজিদে প্রবেশ করে দেখেন যে, হযরত উমর (রাঃ) ভাষণ দিচ্ছেন। তিনি তাঁকে বলেন যে, 'নীরবতা পালন করুন'। তাঁকে নিরব করে দিয়ে তিনি জনগণকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "যে ব্যক্তি হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর উপাশনা করতো সে যেন জেনে নেয় যে, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। আর যে আল্লাহ তা'য়ালার ইবাদত করতো, সে যেন সন্তুষ্ট থাকে যে, আল্লাহ পাক জীবিত আছেন। মৃত্যু তাঁর উপর পতিত হয় না।" অতঃপর তিনি উপরোক্ত আয়াতটি---وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ পাঠ করেন। তখন জনগণের মধ্যে এমনই অনুভূতি সৃষ্টি হলো যে, আয়াতটি যেন তখনই নাজিল হলো। সমস্বরে প্রত্যেকের মুখেই আয়াতটি উচ্চারিত হতে লাগলো এবং তাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিলো যে, মুহাম্মদ (সঃ) আর এ জগতে নেই। হযরত আবু বকর (রাঃ) এর মুখে এই আয়াতটি পাঠ শুনে হযরত ওমর (রাঃ) এর পা দু'টি যেন ভেজ্ঞে পড়লো। তাঁরও পূর্ণ বিশ্বাস হলো যে, প্রিয় নবী (সঃ) এ নশ্বর জগত থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন।"

(সহীহ আল বুখারী)

হযরত আলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর জীবদ্দশাতেই বলতেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) মৃত্যুবরণ করলে কিম্বা শহীদ হলে আমরা দ্বীন ত্যাগ করবো না। আল্লাহর শপথ! যদি রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিহত হন তবুও আমরা তাঁর দ্বীনের উপর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবো। আল্লাহর কসম! আমি তো তাঁর বন্ধু ও চাচাত ভাই এবং তাঁর ওয়ারীশ। তাঁর আমার চেয়ে বড় হকদার আর কে হবে?

এ থেকে আমাদের জন্য শিক্ষনীয় হলো যে- যেভাবে রাসূল (সঃ) এর সঙ্গী-সাথীরা, যারা ছিলেন 'আশেকানে রাসূল' (রাসূল-প্রেমিক)। যারা রাসূল (সঃ) কে নিজের জীবনের চেয়েও ভাল বাসতেন, যাঁর থুথুকে মাটিতে পড়তে দিতেন না চেটে চেটে খেতেন, তাঁদের সেই প্রীয় নেতা এবং সর্দার যাঁর দাওয়াতে তাঁরা দ্বীনের মধ্যে সামিল হয়েছেন, সত্যের পথ পেয়েছেন, জাহান্নামের পথ ত্যাগ করে জান্নাতের পথে ধাবিত হয়েছেন, নিজের জীবনকে কুরবান করেছেন, নিজের ধন-সম্পদ, ব্যবসা-বানিজ্য, স্ত্রী-সন্তান, আত্মীয়-স্বজন সব কিছুকেই ত্যাগ করে নবীর পথে টিকে ছিলেন, তাঁদের মাঝ থেকে নবীজীর বিদায় কতো যে ব্যাথার এবং মনোকষ্টের তা কেবল তাঁরাই অনুভব করতে পারেন যাঁরা তাঁর সাহচর্যে ছিলেন। তার পরেও আল্লাহ তা'য়ালা সাহাবাদেরকে কঠিন ভাবে শাসিয়ে বলছেন, যদি তোমরা মুহাম্মাদের মৃত্যুতে আমার দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে ব্যক্তি ভক্তির কারণে পুনরায় কুফরীর উপর ফিরে যাও, তাতে আল্লাহর দ্বীনের কোন ক্ষতি বা কমতি করতে পারবে না। বরং ক্ষতি যদি হয় তবে তাদেরই হবে যারা তার দ্বীন থেকে ফিরে যাবে।

সুতরাং যুগে যুগে যারাই ইসলামী আন্দোলন করবেন, আর সেই আন্দোলনের নেতা-তিনি যতই যোগ্য হোন না কেন, তিনি যতই প্রিয়ভাজন এবং শ্রদ্ধাভক্তির পাত্র হোন না কেন, তাঁর মৃত্যুতে কিম্বা দুশমনদের আঘাতে শাহাদাতের কারণে অথবা যালিম বাদশাহ বা সরকারের দ্বারা শুল-ফাঁসির জন্যে কিম্বা শয়তানের ওয়াসওয়াসায় পদস্খলনের কারণে তিনি যদি অনুপস্থিত হয়ে যান, তাহলে তাঁর অনুপস্থিতির কারণে আন্দোলন ত্যাগ করা যাবে না, কিম্বা দ্বীনী আন্দোলন থেকে মন ভাঙ্গা হয়ে দূরে সরেও থাকা যাবে না অথবা তাঁর পদস্খলনের কারণে তার সাথে সাথে দল থেকে বের হয়ে চলেও যাওয়া যাবে না।বরং

কোন কারণে নেতৃত্ব শূন্য হলে সেই স্থলে অন্য একজন যোগ্য ব্যক্তিকে নেতৃত্বে বসিয়ে আন্দোলন-সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

হাদীস শরীফে এসেছে কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে যে সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর আরশের ছায়াতলে আশ্রয় দান করবেন তাদের মধ্যে এক শ্রেণী হলো, ঐ দু'ব্যক্তি যারা আল্লাহরই (সন্তুষ্টির) জন্য পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসে। আবার আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্য তারা একত্রিত হয় এবং আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্য পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।
(সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

অতঃপর আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের মৃত্যু সম্পর্কে আরও স্পষ্ট করে পরবর্তী আয়াতে বলেন- وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا **আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া কেউ মরতে পারে না। সেজন্য একটা সময় নির্দিষ্ট রয়েছে।**

এ আয়াতে ওহুদ যুদ্ধ থেকে পলায়নপর মুসলমানদের লক্ষ্য করে বলা হয়েছে যে, মৃত্যুর ভয়ে তোমাদের পালিয়ে যাবার কোন অর্থ হয় না। মৃত্যুর জন্য আল্লাহ যে সময় নির্ধারণ করে রেখেছেন, তার একমুহূর্ত আগেও কেউ মরতে পারে না আবার তার একমুহূর্ত পরেও কেউ মরতে পারে না। অর্থাৎ নির্ধারিত সময়েই মৃত্যুবরণ করতে হবে। সুতরাং তোমাদের এতো ভয় কেন? যেমন আল্লাহ তা'য়ালা অন্য যায়গায় বলেছেন- "কারও বয়স বৃদ্ধি করা হয় না বা কারও বয়স কমও করা হয় না, বরং সবকিছুই আল্লাহর কিতাবে স্পষ্ট রয়েছে।"

অন্য আয়াতে আরও উল্লেখ রয়েছে - "তিনিই আল্লাহ! যিনি তোমাদেরকে মাটি দ্বারা তৈরী করেছেন, অতঃপর তিনি সময় পূর্ণ করেছেন এবং মৃত্যু নির্ধারণ করেছেন।"

উপরোক্ত আয়াতে কাপুরুষ লোকদেরকে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য উৎসাহ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ বীরত্ব প্রকাশের কারণে বয়সের যেমন কমতি হয় না, তেমনি কাপুরুষতা প্রদর্শন করে জিহাদ থেকে সরে পড়ার মাধ্যমে বয়স বৃদ্ধিও পায় না। মৃতুতো নির্ধারিত সময়ে আসবেই-তাতে মানুষ হয় বীরত্বের সাথে জিহাদ করুক বা ভীরুতা দেখিয়ে জিহাদ থেকে সরে থাকুক না কেন।

হযরত হাজার ইবনে উদ্দী (রাঃ) মুসলিম দুশমনদের মোকাবেলা করতে গিয়ে টাইগ্রীস নদীর সম্মুখীন হন। এমতাবস্থায় সেনাবাহিনী হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। সে সময় তিনি উপরোক্ত আয়াতটি-

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا

পাঠ করে বলেন- "নির্ধারিত সময়ের পূর্বে কেউই মারা যায় না। সুতরাং এসো, এই টাইগ্রীস নদীতেই ঘোড়া নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ো।" একথা বলেই তিনি টাইগ্রীস নদীর মধ্যে ঘোড়া নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁর দেখাদেখি অন্যরাও নিজ নিজ ঘোড়া নিয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এ দৃশ্য দেখে ভয়ে শত্রুদের রক্ত শুকিয়ে যায় এবং তাদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে। তারা পরস্পর বলাবলি করে, এরা তো পাগল। এরা সমুদ্রের তরঙ্গকেও ভয় করে না। কাজেই চলো আমরা পলায়ন করি। এই বলে তারা সবাই পালিয়ে যায়। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

সুতরাং মুসলমানেরা তথা ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা কোন সময়ের জন্যেই দুশমনদের রক্তচক্ষুকে ভয় করবে না, তাদের মামলা-হামলাকে পরোয়া করবে না। খোদাদ্রোহীদের চতুর্মুখী আক্রমনকে পরোয়া না করে মৃত্যু একবারই হয় এবং তা সময় মতই হয় একথা স্মরণ করে দৃঢ় পদে ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করবে। আর এভাবে দৃঢ়চিত্তে মোকাবেলা করলেই পর দুশমনদের মন দুর্বল হয়ে যাবে, অন্তরে ভীতি সৃষ্টি হবে এবং মুজাহীদদের চলার পথ থেকে সরে দাঁড়াবে।

অতঃপর আল্লাহ পাক আয়াতের শেষাংশে বলেন –

وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ج وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ مِنْهَا ط وَسَنَجْزِى الشّٰكِرِيْنَ ۔

প্রকৃতপ্রক্ষে যে দুনিয়াতে প্রতিদান কামনা করবে, আমি তাকে তা দুনিয়াতেই দিয়ে দেব। অপরপক্ষে যে আখিরাতে প্রতিদান কামনা করবে, আমি তাকে তা আখিরাতেই দেব। আর কৃতজ্ঞদেরকে আমি অবশ্যই প্রতিদান দান করবো।

আয়াতের এই অংশে আল্লাহ পাক বলেন, তোমরা মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার চিন্তা না করে বরং তোমাদের হায়াতের যে সময়টুকু পাচ্ছো সেই সময়ে তোমাদের যাবতীয় প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য দুনিয়া না আখিরাত কোনটি হবে সে বিষয়টিই চিন্তা ভাবনা করো।

তোমাদের কাজের বা কর্মতৎপরতার কেন্দ্রবিন্দু যদি দুনিয়ায় হয়, তাহলে তোমাদের দুনিয়াতেই প্রতিদান দিয়ে দেবো কিন্তু পরকালে একেবারে শুন্যহস্ত হয়ে যাবে। আর যদি পরকালের উদ্দেশ্য হয় তাহলে পরকালে তার প্রতিদানতো দেবই-বরং দুনিয়াতেও তার কিছু অংশ দান করবো। যেমন, অন্য আয়াতে বর্ণিত আছে-"ইহকালে প্রতিদান কামনাকারীদের আমি তা প্রদান করি বটে, কিন্তু পরকালে তার জন্যে কোনই অংশ থাকে না"।

আর এক জায়গায় বর্ণিত আছে – "যে ব্যক্তি শুধুমাত্র দুনিয়াই চায়, আমি তাদের মধ্যে যাকে চাই এবং যে পরিমান চাই দুনিয়াতে প্রদান করি, অতঃপর সে জাহান্নামী হয়ে যায় এবং লাঞ্ছনা ও অপমানের সাথে সেখানে সে প্রবেশ করে। আর যে পরকাল চায় এবং ঈমানদার হয় তাদের চেষ্টা আল্লাহর কাছে প্রশংসনীয় হবে।"

এজন্যেই এখানেও আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, আমি কৃতজ্ঞদেরকে উত্তম প্রতিদান দিয়ে থাকি। কৃতজ্ঞকারী বলতে এমন সব লোকদের কথা বলা হয়েছে, যারা আল্লাহর বিশেষ নিয়ামতের কদর করে। আর আল্লাহর এই বিশেষ নি'য়ামতটি হচ্ছে -"দ্বীনের সঠিক ও নির্ভুল শিক্ষা।" এ শিক্ষার মাধ্যমে তিনি মানুষকে এ দুনিয়ার সীমিত জীবনকাল থেকে অনেক বেশী ব্যাপক এবং সীমাহীন জগতের সন্ধান দিয়েছেন এবং তাকে এও সত্যটি জানিয়ে দিয়েছেন যে, মানুষের চেষ্টা-প্রচেষ্টা সংগ্রাম-সাধনা ও কাজের ফলাফল কেবলমাত্র এ দুনিয়ার কয়েক বছরের জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং এ জীবনের পর আর একটি অনন্ত অসীম জীবন রয়েছে। যারা এসব জ্ঞান-দূরদৃষ্টিতা অর্জনের পর দেখে যে, তাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টার ফল দুনিয়ার জীবনে প্রাথমিক ভাবে ফলপ্রসু হচ্ছে না কিম্বা তার বিপরীত ফলাফল দেখে, তারপরেও আল্লাহর উপর ভরসা রেখে তাদের কার্যক্রম এবং চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। কেননা, আল্লাহ তাকে নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, আখিরাতে সে অবশ্যই এর উত্তম প্রতিদান পাবে - এসব শ্রেণীর লোকেরাই হচ্ছে আল্লাহর কৃতজ্ঞ বা শুকরগুজারী বান্দাহ্।(তাফহীমুল কুরআন)

অতঃপর আল্লাহ্ তা'য়ালা ওহুদের যুদ্ধে নবীর শাহাদাতের খবরে হতাশ এবং হতোদ্দম মুজাহীদদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন –

وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ ۙ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ۚ فَمَا وَهَنُوْا لِمَآ اَصَابَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ ـ

(ইতোপূর্বে) আরও বহু নবী অতিবাহিত হয়ে গেছেন, যাঁদের সঙ্গী-সাথীরা তাঁদের অনুসারী হয়ে জিহাদ-সংগ্রাম করেছে। আল্লাহর পথে (টিকে থাকতে) তাদের উপর যেসব বিপদ ও ঝুঁকি এসেছে এতে তারা মনমরা ও হতাশ হয়নি, দমে যায়নি এবং দুশমনের সামনে মাথা নতোও করে দেয়নি। এইসব ধৈর্যশীলদেরকে আল্লাহ্ ভালো বাসেন।

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'য়ালা নবীজীর সঙ্গী-সাথীদের সম্বোধন করে বলেছেন, ইতোপূর্বেও তো বহু নবী তাঁদের দলবল নিয়ে খোদাদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ-সংগ্রাম করেছিলেন এবং তোমাদের মতই তাদেরকেও বহু বিপদ-আপদ এবং বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিলো, এমন কি এর চেয়েও অনেক অনেক বেশী। কিন্তু তারপরেও তো তাঁরা মনোভাঙ্গা হয়নি, দূর্বল হননি, খোদাদ্রোহীদের সামনে মাথা নতো করে দেননি বরং তাঁরা ধৈর্য এবং দৃঢ়তার সাথে মোকাবেলা করে কৃতজ্ঞ বান্দাহ্ হয়ে আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন করেছিলেন।

অন্য এক বর্ণনায় এর অর্থ এও করা হয়েছে যে, "হে ওহুদের যোদ্ধাগন! মুহাম্মদ (সঃ) শহীদ হয়েছেন, এই সংবাদ শুনে তোমরা সাহস-হিম্মতহারা হচ্ছো কেন? অথচ তোমাদের পূর্ববর্তী নবীর লোকেরা তাদের নবীগণের শাহাদাত প্রত্যক্ষ করেও তারা সাহস হারিয়ে ফেলেনি এবং তারা পিছপাও হয়নি, বরং তারা আরও ধৈর্য ও বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছে। এতো বড় বিপদেও তাদের পা টলটলাইমান হয়নি এবং তারা দুঃখের ভারে ভেঙ্গেও পড়েনি। অতএব রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর শাহাদাতের সংবাদ শুনে তোমাদের এতো মুষড়ে পড়া মোটেই উচিত হয়নি।"

এ থেকে আমাদের জন্য শিক্ষনীয় হলো, ইসলামী আন্দোলনের নেতার মৃত্যু বা শাহাদাতের কারণে যেমন হতোদ্দম হয়ে মুষড়ে পড়া যাবে না, তেমনি আন্দোলনের ময়দান থেকে কেটে পড়াও যাবে না। বরং নেতার শাহাদাতকে শক্তির আঁধার বানিয়ে আরও মনোবল সংগ্রহ করে দৃঢ় কদমে মজবুত থেকে শাহাদাতের তামান্না নিয়ে ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করে

ময়দানে টিকে থাকতে হবে। তাহলেই আল্লাহ্ দুনিয়াতে বিজয় দান করবেন এবং আখিরাতে মহা পুরুস্কার জান্নাত দান করবেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'য়ালা ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ প্রিয়ভাজন মুজাহীদদের প্রার্থনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে পরবর্তী আয়াতে বলেন-

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِيْ أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ-

তারা এছাড়া আর কিছুই প্রার্থনা করেনি, তারা কেবল প্রার্থনা করেছে, হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দাও এবং (আন্দোলন-সংগ্রাম করতে যেয়ে) আমাদের কাজে যে সব বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে তাও মোচন করে দাও। আর (হে আল্লাহ! কাফিরদের মোকাবেলায়) আমাদেরকে দৃঢ় মজবুত রাখো এবং কাফিরদের উপর আমাদেরকে সাহায্য করো।

যুগে যুগে সকল নবীর সংগী-সাথী মুজাহীদরা এমনই আল্লাহর প্রিয়ভাজন বান্দাহ্ ছিলেন যে, তারা তাদের আন্দোলন-সংগ্রাম করতে যেয়ে আল্লাহর কাছে দুনিয়ার কোন স্বার্থ হাসিল বা ভোগ বিলাসের জন্য প্রার্থনা করেনি বরং তারা প্রার্থনা করেছে নিজের জীবনের ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং অপরাধ ক্ষমা করার। আর আন্দোলন-সংগ্রাম করতে যেয়ে মানুষ হিসেবে যেসব কাজ এবং পরিকল্পনায় ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে তা মোচন করার প্রার্থনা করেছে। আর তারা প্রার্থনা করেছে- কাফির, মুশরিক এবং খোদাদ্রোহী শক্তির মোকাবেলায় দৃঢ়-মজবুত থাকার এবং প্রার্থনা করেছে কাফিরদের সকল ষড়যন্ত্রের মোকাবেলার জন্য সাহায্যের।

সুতরাং যুগে যুগে সকল ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের এছাড়া আর অন্য কিছুই কামনা বা প্রার্থনা করা বাঞ্ছনীয় নয়।

শিক্ষা ঃ প্রিয় ভাইয়েরা ও বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা আলে ঈমরানের ১৪৩ থেকে ১৪৭ নং আয়াত সমূহের যেসব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হলো তা থেকে আমাদের জন্য যেসব শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে, তা হলো-

○ জান্নাত লাভের পথই হলো জিহাদ বা আন্দোলন-সংগ্রামের পথ। অন্য কোন চোরা গোপ্তা পথে জান্নাত লাভ করা যায় না। সাধারণতঃ মুসলিম সমাজের অধিকাংশ মানুষই ঈমান এবং ধৈর্যের পরীক্ষা না দিয়েই সহজ

পথে জান্নাতে যেতে চায়। কিন্তু এটা ঈমান এবং ধৈর্য যাচাই এর পথ নয়। অথচ আল্লাহ্ যাচায় করে নিতে চান যে, কারা কারা জান মালের ঝুঁকি নিয়ে সংগ্রাম-আন্দোলন করে এবং সকল ঝুঁকি এবং বাধাকে ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করে অগ্রসর হতে পারে।

০ আগবেড়ে মৃত্যু কামনা করা ঠিক নয়। শত্রুর মোকাবেলা করার আকাংখাও প্রকাশ করা উচিত নয়। তবে হ্যাঁ, যদি আল্লাহর দ্বীনের কাজ করতে যেয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হয় তাহলে মৃত্যুকে উপেক্ষা করে হলেও তার মোকাবেলা করতে হবে। কেননা, যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা কুফরীর শামীল।

০ ইসলামী আন্দোলনের নেতার মৃত্যু কিম্বা শাহাদাতের কারণে অথবা যালিম শাসকের শুল-ফাঁসির কারণে আন্দোলন ত্যাগ করা যাবে না। কেননা, ইসলামী আন্দোলন করা হয় আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, কোন নেতার সন্তুষ্টির জন্য নয়। যেমন ওহুদ যুদ্ধে মুহাম্মদ (সঃ) এর শাহাদাতের সংবাদ শুনে সাহাবারা হতাশ হয়ে যুদ্ধের ময়দান ত্যাগের প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাদের শাসিয়ে বলেন, 'তোমরা কি নবীর মৃত্যু কিম্বা শাহাদাতের কারণে তোমরা তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরে কুফরীতে প্রত্যাবর্তন করতে চাও'?

০ যদি কেউ ব্যক্তি পূঁজা এবং অতি ভক্তির কারণে নেতার অনুপস্থিতির সাথে সাথে দ্বীনী আন্দোলন থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয়, এতে আল্লাহর বা তার দ্বীনের সামান্যতম ক্ষতি হবে না, বরং ক্ষতি হবে তার যে দ্বীন থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিবে।

০ কৃতজ্ঞ বান্দাহ্ তারাই যারা আন্দোলন-সংগ্রামের বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে। কোন্ নেতা থাকলো আর কোন্ নেতা থাকলো না তার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় দ্বীন কায়েমের প্রচেষ্টা ধৈর্যের সাথে অব্যাহত রাখে। আল্লাহ্ এসব কৃতজ্ঞ বান্দাদেরকেই দুনিয়া এবং আখিরাতে প্রতিদান দান করবেন।

০ প্রত্যেক মুমিনেরই এই বিশ্বাস থাকা উচিত যে, মানুষ তার নির্ধারিত সময়েই মৃত্যু বরণ করবে। এক মুহুর্ত আগে যেমন মরতে চাইলে মরতে পারবেনা, তেমনি এক মুহুর্ত পরেও মরতে চাইলেও মরার সুযোগ পাবেনা। নির্ধারিত সময়ে অবশ্যই তাকে মৃত্যুবরণ করতেই হবে। এজন্য মৃত্যুর ভয়ে দ্বীনি আন্দোলন থেকে পলায়ন না করে বরং জান-প্রাণ

দিয়ে সকল প্রকার ভয়-ভীতিকে উপেক্ষা করে দ্বীনি আন্দোলনের কাজ অব্যাহত রাখা।

○ আন্দোলন-সংগ্রাম করতে যেয়ে দুনিয়ায় প্রতিদান কামনা না করা। কেননা, দুনিয়ায় প্রতিদান কামনা করলে দুনিয়া পাওয়া যাবে কিন্তু পরকালের জীবন শূন্য থাকবে। সুতরাং পরকালে প্রতিদান কামনা করা। এতে যেমন পরকালের সফলতা আসবে তেমনি আখিরাতের বিনিময়ের সাথে সাথে দুনিয়ার জীবনেও প্রতিদান হিসেবে দেয়া হবে আল্লাহর সাহায্য, বিজয়, সুখ শান্তি এবং সম্মান।

○ শুধু নবীর অনুসারীদেরকেই আল্লাহ্ জিহাদ দ্বারা পরীক্ষা করেননি বরং এর পূর্বে যতো নবী-রাসূল এসেছেন তাঁদের প্রত্যেকের অনুসারীদেরকেই জিহাদের মাধ্যমে আল্লাহ্ পরীক্ষা করেছেন, তাদের এর চেয়েও বহু ঝুঁকি-কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু তারা হতাশ হয়নি, নিরাশ হয়নি বা মনোভাঙ্গা হয়নি, ভীত-সন্ত্রস্ত হয়নি, দমেও যায়নি এবং কাফিরদের জন্য পথ পরিস্কার করে দেয়নি। অনুরূপভাবে আমাদেরকেও দ্বীনি আন্দোলন করতে যেয়ে বাতিল, খোদাদ্রোহী শক্তির অত্যাচার নির্যাতনে ভীত সন্ত্রস্ত হওয়া যাবে না, নিরাশ-হতাশ এবং মনোভাঙ্গা হওয়া যাবে না কিম্বা বাতিল শক্তির নিকট মাথা নওয়ানোও যাবে না। বরং ধৈর্য এবং সাহসের সাথে সবকিছুকে মোকাবেলা করে টিকে থাকতে হবে। তাহলে অবশ্যই আল্লাহর সাহায্য এসে হাযির হবে এবং আল্লাহ বিজয় দান করবেন।

○ মুমিন মুজাহিদদের আল্লাহর কাছে শুধু নিজের জীবনের অপরাধ এবং ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। আন্দোলন-সংগ্রাম করতে যেয়ে মানুষ হিসেবে যেসব কাজে বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, তা থেকে মুক্তি পাবার জন্য প্রার্থনা করা। কাফির এবং খোদাদ্রোহী শক্তির মোকাবেলায় মজবুত কদমে টিকে থাকার জন্য দোয়া করা এবং কাফির এবং বাতিল শক্তির উপর বিজয়ের জন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা করা।

আহ্বানঃ সম্মানিত ভাইয়েরা/বোনেরা! সূরা আলে ঈমরানের ১৪৩ থেকে ১৪৭ নম্বর আয়াত পাঁচটির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং শিক্ষা আলোচনা করতে যেয়ে যদি আমার অজান্তে কোন ত্রুটি বা বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, তার জন্য মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর আয়াতগুলো থেকে আমরা যেসব শিক্ষা লাভ করলাম তা যেন বাস্তব জীবনে আ'মল করতে পারি সেই তৌফিক কামনা করে দারস শেষ করছি।

দুই

জান্নাতের মহা সুখ আর জাহান্নামের মহা দুঃখ

সূরা যুখরুফ- ৬৭-৭৮ আয়াত

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْاَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍۢ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ ○
يٰعِبَادِ لَاخَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَآ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ○ اَلَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ○ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ
وَاَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُوْنَ ○ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ
ذَهَبٍ وَّاَكْوَابٍ ج وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ ج
وَاَنْتُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْٓ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○ لَكُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ كَثِيْرَةٌ مِّنْهَا تَاْكُلُوْنَ ○
اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِيْ عَذَابِ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ ○ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ
وَهُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ ○ وَمَاظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا هُمُ الظّٰلِمِيْنَ ○
وَنَادَوْا يٰمٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ط قَالَ اِنَّكُمْ مّٰكِثُوْنَ ○
لَقَدْ جِئْنٰكُمْ بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ ○

অনুবাদঃ ইরশাদ হচ্ছে- (৬৭) বন্ধুরা! সেদিন (কিয়ামতের দিন) একে অপরের শত্রু হবে, তবে মুত্তাকীরা ছাড়া। (৬৮) হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের আজ কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না। (৬৯) তোমরা তো আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলে এবং তোমরা আত্মসমর্পণ করেছিলে। (৭০) তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীগণ আনন্দের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করো। (৭১) (জান্নাতে) তাদের নিকট পরিবেশন

করা হবে স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র এবং সেখানে রয়েছে মনে যা চায় ও চোখ যাতে জুড়ায়। আর তোমরা সেখানে চিরকাল থাকবে। (৭২) এই যে জান্নাতের ওয়ারিশ (উত্তরাধিকারী) তোমরা হয়েছো, এটা তোমাদের কাজের প্রতিদান। (৭৩) যেখানে রয়েছে তোমাদের জন্য প্রচুর ফলমূল, তা থেকে তোমরা আহার করবে। (৭৪) (পক্ষান্তরে) অবশ্যই অপরাধীরা জাহান্নামের আযাবে চিরকাল থাকবে। (৭৫) তাদের থেকে আযাব লাঘব করা হবে না এবং তারা তাতেই থাকবে হতাশ হয়ে। (৭৬) আমি তাদের প্রতি যুলুম করিনি; কিন্তু তারাই ছিলো যালিম। (৭৭) তারা (জাহান্নাম থেকে) ডেকে বলবে, হে (জাহান্নামের অধিকর্তা) মালেক, তোমার পালনকর্তা আমাদেরকে একেবারেই নিঃশেষ করে দিন। সে বলবে, অবশ্যই তোমরা চিরকাল এভাবেই থাকবে। (৭৮) আমি তোমাদের কাছে সত্যদ্বীন পৌঁছিয়েছি, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই ছিলো সত্যদ্বীন থেকে বিমুখ।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ اَلْاَخِلَّاءُ -বন্ধুবর্গ। يَوْمَئِذٍ- সেদিন। بَعْضُهُمْ - তাদের একে। لِبَعْضٍ-অপরের জন্য। عَدُوٌّ - শত্রু। اِلَّا -ছাড়া/ব্যতীত। اَلْمُتَّقِيْنَ-মুত্তাকীরা। يٰعِبَادِ- হে আমার বান্দারা। لَاخَوْفٌ- কোন ভয় নেই। عَلَيْكُمُ -তোমাদের উপর। اَلْيَوْمَ-আজ। لَا- না। اَنْتُمْ - তোমরা। تَحْزَنُوْنَ -চিন্তা করবে। اَلَّذِيْنَ - যারা। اٰمَنُوْا - ঈমান এনেছিলো। بِاٰيٰتِنَا -আমাদের আয়াত সমূহের উপর। وَكَانُوْا - এবং তারা ছিলো। مُسْلِمِيْنَ-আত্মসমর্পনকারী (মুসলমান)। اُدْخُلُوْا - প্রবেশ করো। اَنْتُمْ - তোমরা। وَ -ও/এবং। اَزْوَاجُكُمْ -তোমাদের স্ত্রীরা। تُحْبَرُوْنَ - তোমাদেরকে খুশী করে দেয়া হবে। يُطَافُ - আবর্তিত করা হবে। عَلَيْهِمْ - তাদের উপর/কাছে। بِصِحَافٍ - থালাসমূহ। مِّنْ - নির্মিত। ذَهَبٍ -স্বর্ণের। اَكْوَابٍ-পানপাত্রসমূহ। فِيْهَا-তার মধ্যে/উহাতে। مَا - যা কিছু। تَشْتَهِيْهِ-তা চাইবে। الْاَنْفُسُ -অন্তর সমূহ। تَلَذُّ-তৃপ্ত হবে। اَلْاَعْيُنُ-চোখ সমূহ। خٰلِدُوْنَ -চিরস্থায়ী হবে। تِلْكَ -এই যে। اَلَّتِيْ - যার। اُوْرِثْتُمُوْهَا -তোমরা উহার উত্তরাধিকার হয়েছো। بِمَا -যার সাথে। كُنْتُمْ -তোমরা ছিলে। تَعْمَلُوْنَ -তোমরা কাজ করেছো। لَكُمْ - তোমাদের জন্য। فِيْهَا -উহাতে। فَاكِهَةٌ - ফলমূল। كَثِيْرَةٌ - অধিকাংশ।

مِنْهَا-উহাতে। تَاْكُلُوْنَ -তোমরা ভক্ষণ করবে। اِنَّ -নিশ্চয়। الْمُجْرِمِيْنَ -অপরাধিরা। فِىْ -মধ্যে। عَذَابِ -শাস্তি। لَايُفَتَّرُ - লাঘব করা হবে না। عَنْهُمْ -তাদের থেকে। وَهُمْ -এবং তারা। فِيْهِ - উহাতে। مُبْلِسُوْنَ -হতাশ হয়ে। مَاظَلَمْنٰهُمْ -আমি তাদের উপর যুলুম করিনি। لٰكِنْ -বরং। كَانُوْا -তারাই ছিলো। نَادَوْا - আহ্বান/ডাকবে। يٰمٰلِكُ -হে (জাহান্নামের) অধিকর্তা। لِيَقْضِ - একেবারেই নিঃশেষ করে দিন। عَلَيْنَا -আমাদেরকে। رَبُّكَ -তোমার প্রতিপালক। قَالَ -বলবেন। اِنَّكُمْ -নিশ্চয় তোমরা। مّٰكِثُوْنَ -(এভাবে) চিরকাল থাকবে। لَقَدْ -নিশ্চয়/অবশ্যই। جِئْنٰكُمْ -তোমাদের কাছে আমরা এসেছিলাম। بِالْحَقِّ -সত্যসহকারে। لٰكِنَّ -কিন্তু। اَكْثَرَكُمْ-তোমাদের অধিকাংশ। لِلْحَقِّ-সত্যের প্রতি/জন্য। كٰرِهُوْنَ -বিমুখ/অসহনশীল।

সম্বোধন ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় দ্বীনদার ভায়েরা/বোনেরা/ভাই ও বোনেরা! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আমি আপনাদের সামনে দারস পেশ করার জন্য "সূরা যুখরুফ" এর ৬৯ থেকে ৭৮ নম্বর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত ও সরল অনুবাদ পেশ করেছি। আল্লাহ তা'য়ালা যেন আমাকে সঠিক ভাবে আপনাদের সামনে দারস পেশ করার তাওফীক দান করেন। আমীন।

সূরার নামকরণ ঃ এই সূরায় ৩৫ নং আয়াতে উল্লেখিত " وَزُخْرُفًا " শব্দটিকেই এই সূরার নাম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। 'যুখরুফ' অর্থ- 'স্বর্ণ নির্মিত'। উল্লেখ্য যে অন্যান্য সূরার ন্যায় এই সূরার নামকরণও করা হয়েছে প্রতীকী বা চিহ্ন হিসেবে। কোন শিরোনাম হিসেবে নামকরণ করা হয়নি।

নাযিল হবার সময়কাল ঃ সর্বসম্মতভাবে সূরাটি মাক্কী। তবে কোন্ অবস্থায় নাযিল হয়েছে তা কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনা বা ঘটনা থেকে জানা যায় না। কিন্তু এই সূরার বিষয়বস্তু থেকে চিন্তা-গবেষণা করলে স্পষ্ট মনে হয় যে, এই সূরাও সেই সময় নাযিল হয় যখন সূরা আল মু'মিন, সূরা হা-মীম আস্ সাজদাহ ও সূরা আস্ শুরা নাযিল হয়। এই সূরা কয়টি একই ধারাবাহিকতার বলে মনে হয়। আর মক্কার কাফিররা যখন নবী

করীম (সঃ) কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলো। দিন-রাত বৈঠক-সভা করে এই বিষয়ে শলা-পরামর্শ করতেছিলো তাঁকে এবং তাঁর আন্দোলনকে কিভাবে শেষ করা যায়। সেই সম্পর্কেও চিন্তা-ভাবনা করছিলো। এই সময় তাঁর উপর একটা মরণ আঘাতও পড়েছিলো। ঠিক এরূপ পরিস্থিতিতেই উল্লেখিত সূরাসমূহ নাযিল হয়েছিলো। উল্লেখিত এই সূরার ৭৯ ও ৮০ নং আয়াত দু'টি এই দিকেই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

সূরার আলোচ্য বিষয় বা মূল বিষয়বস্তু ঃ এই সূরায় অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে কুরাইশ ও আরববাসীদের জাহেলী আকীদা-বিশ্বাস, রেশম-রেওয়াজ ও কুসংস্কারের সমালোচনা করা হয়েছে। এসব আকিদা-বিশ্বাস এবং কুসংস্কারমূলক ধারণা-বিশ্বাসের উপর তারা এমন অটল ছিলো যে, তারা তা ত্যাগ করতে কিছুতেই প্রস্তুত হচ্ছিলো না। এই সূরায় তাদের এসব আকীদা-বিশ্বাস ও কুসংস্কারের অসারতা অত্যন্ত দৃঢ় ও মর্মস্পর্শী পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো এই যে, সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তি যার মধ্যে একবিন্দুও জ্ঞান রয়েছে সে যেন চিন্তা করতে বাধ্য হয় যে, জাতি আজ অত্যন্ত নীচ ধরণের মূর্খতায় ডুবে আছে। আর যে ব্যক্তি এসব মূর্খতা এবং অজ্ঞতার ফাঁদ থেকে উদ্ধার করতে চেষ্টা করছে, তাঁকে ধ্বংস করতে সকলে মিলে আদা-জল খেয়ে লেগে গিয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের বিষয়বস্তু ঃ দারসের জন্য তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর মূল বিষয়বস্তু হলো- কিয়ামতের দিন মুত্তাকী বন্ধু ছাড়া আর কেউ কাজে আসবে না। বরং অন্যান্য বন্ধু-বান্ধব বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কিয়ামতের দিন ঈমানদার এবং অনুগত বান্দাদের জন্য জান্নাতের নি'য়ামতের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা পাপী অপরাধী তাদের পরিণতি এবং জাহান্নামের ভয়াবহ আযাবের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। জাহান্নামীদের আর্তনাদের বিভৎস বর্ণনাও দেয়া হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা! তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা বুঝানোর সুবিধার্থে আপনাদের সামনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কতিপয় বিষয় তুলে ধরা হলো। এখন আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা পেশ করছি।

কিয়ামতের দিন দুনিয়ার বন্ধুদের অবস্থান সম্পর্কে বলতে গিয়ে মহান

আল্লাহ বলেন – اَلْاَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍۢ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ

বন্ধু-বান্ধব সেদিন (কিয়ামতের দিন) একে অপরের শত্রু হবে, তবে মুত্তাকীরা ছাড়া।

এই আয়াতে দুনিয়ার বন্ধুত্ব ও দোস্তালী যাদের নিয়ে মানুষ গর্ববোধ করে, হালাল-হারামের বাছ-বিচার করে না, এমন কি কোন কোন বন্ধুর জন্য জান-মাল পর্যন্ত উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়, কিয়ামতের দিন এসব প্রিয়ভাজন বন্ধুই শত্রুতে পরিণত হয়ে যাবে। কিয়ামতের দিন যখন মানুষ কঠিন বিপদের সম্মুখীন হবে, তখন দুনিয়ার এতো প্রিয় বন্ধুত্ব আরও বিপদের কারণ হবে,তবে উপকারী এবং প্রকৃত বন্ধু হয়ে দাঁড়াবে একমাত্র তারাই যারা দুনিয়াতে আল্লাহকে ভয় করে চলতো। যাদের সাথে বন্ধুত্ব করার পেছনে কোন দুনিয়ার স্বার্থ উদ্ধার করার উদ্দেশ্য ছিলো না বরং আল্লাহর সন্তুষ্টিই যাদের উদ্দেশ্য ছিলো, তারাই কেবলমাত্র কঠিন বিপদের সময় মুক্তির কান্ডারী হবে। যেমন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর জাতিকে বলেছিলেন –

وَقَالَ اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَّيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَّمَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ـ

“আর তিনি বললেন, (হে আমার জাতির লোকেরা!) তোমরা আল্লাহ ছাড়া প্রতিমাগুলোর সাথে যে বন্ধুত্ব স্থাপন করে রেখেছো তা শুধু দুনিয়ার জীবন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে। অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমাদের একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং একে অপরের উপর অভিশাপ দিবে এবং তোমাদের ঠাঁই হবে জাহান্নামে। আর তোমাদের জন্য কোন সাহায্যকারী হবে না।” (সূরা আনকাবুত-২৫)

আয়াতের তাফসীরে আল্লামা হাফেজ ইবনে কাসীর হযরত আলী (রাঃ) এর একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করে বলেন, দুই মু'মিন বন্ধু ছিলো এবং দুই কাফির বন্ধু। মুমিন বন্ধু দু'জনের মধ্যে একজনের মৃত্যু হলে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ শুনানো হলো। তখন তার আজীবন বন্ধুর কথা মনে পড়লে সে দোয়া করলো- হে আল্লাহ! অমুক ব্যক্তি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলো। সে তোমার ও তোমার রাসূলের অনুগত্য করার আদেশ দিতো।

আমাকে সে সৎ ও নেক কাজের উপদেশ দিতো এবং অসৎ ও পাপ কাজ হতে বারণ করতো এবং তোমার সাথে সাক্ষাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিতো। কাজেই হে আল্লাহ! আমার পরে তুমি তাকে পথভ্রষ্ট করবে না, যাতে সেও আমার মতো জান্নাতের দৃশ্য দেখতে পায়। তার উপর তুমি সেরূপই সন্তুষ্ট হয়ে যাও-যেরূপ সন্তুষ্ট আমার প্রতি তুমি হয়েছো। তার এই দোয়ার কারণে আল্লাহ তাকে জবাবে বলবে, তুমি সন্তুষ্ট চিত্তে (জান্নাতে) চলে যাও। আমি তার জন্য (জান্নাতে) যা কিছু প্রস্তুত করে রেখেছি তা যদি তুমি চোখে দেখতে তাহলে তুমি খুবই হাসতে এবং মোটেই দুঃখিত হতে না। অতঃপর যখন তার ঐ বন্ধু মারা যায় এবং দুই বন্ধুর রূহ মিলিত হয় তখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা তোমাদের পরস্পরের সম্পর্কের বর্ণনা দাও। তখন একজন অপরজনকে বলবে- তুমি আমার খুবই ভাল বন্ধু ছিলে, অত্যন্ত সৎ সংগী ছিলে ও ছিলে অতি উত্তম দোস্ত।

পক্ষান্তরে দু'জন কাফির বন্ধু ছিলো,যারা দুনিয়ায় পরস্পর বন্ধুত্ব করে। যখন তাদের একজন মারা যায় এবং তাকে জাহান্নামের দুঃসংবাদ শুনান হয়, তখন দুনিয়ার ঐ বন্ধুর কথা তার স্বরণ হয় এবং সে বলে, হে আল্লাহ! অমুক ব্যক্তি আমার খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলো। যে আমাকে তোমার ও তোমার নবীর অবাধ্যতার নির্দেশ দিতো। সে আমাকে মন্দ ও পাপ কাজে উৎসাহ দিতো এবং ভাল ও নেক কাজে বাধা দিতো। আর আমার অন্তরে সে এই বিশ্বাস দিতো যে, তোমার সাথে আমার সাক্ষাৎ ঘটবে না। সুতরাং তুমি তাকে আমার মতো সুপথ দেখাবে না, যাতে সেও জাহান্নামের দৃশ্য দেখে, যা তুমি আমাকে দেখিয়েছো। তুমি আমার প্রতি যেরূপ অসন্তুষ্ট, তার প্রতিও তুমি সেরূপ অসন্তুষ্ট থাকো। এরপর যখন তার অপর বন্ধু মারা যায় এবং উভয়ের রূহ একত্রিত হয়, তখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা একে অপরের গুণাগুণ বর্ণনা করো। তখন তারা একে অপরকে বলবে- তুমি আমার খুবই মন্দ ভাই ছিলে, খারাপ সঙ্গী ছিলে এবং নিকৃষ্ট বন্ধু ছিলে।"(তাফসীরে ইবনে কাসীর। রাবী-ইমাম ইবনে হাতিম রাঃ)

অপর এক বর্ণনায় হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হযরত মুজাহীদ (রাঃ) এবং হযরত কাতাদা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে,"কিয়ামতের দিন প্রত্যেক বন্ধুত্ব শত্রুতায় পরিবর্তিত হয়ে যাবে। তবে আল্লাহভীরুদের বন্ধুত্ব তা হবে না।"(তাফসীরে ইবনে কাসীর)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন,

যে দু'জন ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে একে অপরকে ভালবাসে যাদের একজন রয়েছে পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তেত এবং অপরজন রয়েছে পশ্চিম প্রান্তেত। কিয়ামতের দিন তাদের দু'জনকেই একত্রিত করে মহান আল্লাহ বলবেন, এ হলো ঐ ব্যক্তি যাকে তুমি আমারই জন্যে ভাল বাসতে।"(তাফসীরে ইবনে কাসীর। রাবী-হাফিজ ইবনে আসাকির রাঃ)

এসব কারণেই ইহকাল ও পরকাল উভয়ের জন্য উৎকৃষ্ট, উপকারী এবং কল্যাণকামী বন্ধুত্ব হলো তাই যা আল্লাহর ওয়াস্তে করা হয়।

যে দু'জন মুসলমানের বন্ধুত্ব আল্লাহর ওয়াস্তে হয় তাদের মর্যাদা সম্পর্কে বলতে গিয়ে মহানবী (সঃ) বলেন, হাশরের ময়দানে যখন আল্লাহর ছায়া ছাড়া কোন ছায়া থাকবে না সেদিন সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহর আরশের ছায়াতলে আশ্রয় দেয়া হবে। তাদের এক শ্রেণী হলো–

وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِى اللهِ اِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ -

"ঐ দু'জন ব্যক্তি যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পরস্পরকে ভালবাসে ও একত্রিত হয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই প্রয়োজনে পৃথক হয়ে যায়।"(সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

সুতরাং এসব বিষয় খেয়াল করেই দেখেশুনে দুনিয়াতে বন্ধুত্ব এবং দোস্তালী করা উচিত। এ সম্পর্কে মহানবী (সঃ) বলেন–

اَلْمَرْأُ عَلٰى دِيْنِ خَلِيْلِهٖ فَلْيَنْظُرْ اَحَدُكُمْ مَنْ يُّخَالِلُ -

"প্রত্যেক ব্যক্তি তার বন্ধুর ধর্মের অনুসারী হয়ে থাকে। সুতরাং তোমাদের দেখে নেয়া উচিত, তুমি কার সাথে বন্ধুত্ব করছো।"

(আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিজী। রাবী-আবু হুরাইরা রাঃ)

অতঃপর পরবর্তী আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন-

يٰعِبَادِ لاَخَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلاَ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ۝ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ۝ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُوْنَ -

(কিয়ামতের দিন মুত্তাকীদের বলা হবে,) হে আমার বান্দারা! আজ তোমাদের কোনো ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না। যারা আমার আয়াতে বিশ্বাস করেছিলে এবং আত্মসমর্পণ করেছিলে-তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীগণ সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ করো। এটা হলো তোমাদের

ঈমান ও ইসলামের প্রতিদান। অর্থাৎ অন্তরে বিশ্বাস ও পূর্ণ প্রত্যয়, আর বাইরে শরীয়তের উপর আ'মল।

দুনিয়াতে যারা আল্লাহকে ভয় করে চলতো। যাদের ভালবাসা এবং বন্ধুত্ব ছিলো আল্লাহর ওয়াস্তে, এই আয়াত তিনটিতে তাদেরই প্রতিদান সম্পর্কে বলা হয়েছে।

মু'তামার ইবনে সুলাইমান (রাঃ) তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন যখন মানুষ নিজ নিজ কবর থেকে উঠবে তখন সবাই দুঃশ্চিন্তায় এবং সন্ত্রস্ত থাকবে। সেসময় একজন ঘোষক (আল্লাহর বাণী) ঘোষণা করবেন ঃ "হে আমার বান্দারা! আজ তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না।" এ ঘোষণা শুনে সবাই খুশি হয়ে যাবে। কারণ তারা এটাকে সাধারণ ঘোষণা মনে করবে (অর্থাৎ তারা মনে করবে এটা সবার জন্যই ঘোষণা)। এরপর আবার ঘোষণা করা হবে, যারা আমার আয়াতে বিশ্বাস করেছিলে এবং আত্মসমর্পণ করেছিলে (কেবল তারাই)। এ ঘোষণা শুনে খাঁটি ও পাক্কা মুসলমান ছাড়া অন্যরা সবাই নিরাশ হয়ে যাবে। অতঃপর তাদেরকে বলা হবে, তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীরা আনন্দের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করো।"

اَزْوَاجٌ-শব্দটি দ্বারা স্ত্রীরাও হতে পারে আবার একমত সম্পন্ন সহকর্মী বন্ধুরাও হতে পারে। এই শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক। এর দ্বারা ঈমানদার স্ত্রীরা তো জান্নাতে যাবে তার সাথে ঈমানদার বন্ধুরাও জান্নাতে তাদের সঙ্গী হবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'য়ালা এসব জান্নাতীদের জান্নাতের ভোগ সামগ্রী এবং নি'য়ামতের কথা বলতে গিয়ে বলেন-

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّاَكْوَابٍ ج وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ ج وَاَنْتُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ-

(জান্নাতে) তাদের জন্য পরিবেশন করা হবে স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র এবং সেখানে রয়েছে মনে যা চায় এবং চোখ যাতে জুড়ায়। আর তোমরা সেখানে চিরকাল থাকবে।

আয়াতে জান্নাতে জান্নাতীদের এমন খাবার পাত্র এবং মনের মতো চোখ জুড়ানো খানা পরিবেশন করা হবে, যা দুনিয়ার জীবনে কল্পনাও করা যায়

না। আর সেখানে প্রতিদান হিসেবে নানা প্রকারের ফলমূলও পরিবেশন করা হবে।

"হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, সর্বাপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর জান্নাতী যে সবশেষে জান্নাতে যাবে, তার দৃষ্টি একশো বছরের দূরত্ব পর্যন্ত যাবে-আর ততো দূর পর্যন্ত সে শুধু তার নিজেরই ডেরা, তাঁবু এবং স্বর্ণ ও পান্না নির্মিত প্রাসাদ দেখতে পাবে। এগুলো সবই বিভিন্ন প্রকারের ও রঙ-বেরঙের আসবাবপত্রে পরিপূর্ণ থাকবে।

সকাল-সন্ধ্যায় বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যে পরিপূর্ণ সত্তর হাজার করে রেকাবী ও পেয়ালা তার সামনে পেশ করা হবে। ঐ গুলোর প্রত্যেকটি তার মনের চাহিদা মুতাবিক হবে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তার চাহিদা একই রকম থাকবে। যদি সে সারা দুনিয়ার লোককে দাওয়াত দেয় তবে তাদের সবারই জন্যে ঐ খাদ্যগুলো যথেষ্ট হবে। অথচ ওগুলোর কিছুই কমবে না।"(ইবনে কাসীর। রাবী- আবদুর রাযযাক রাঃ)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে মহানবী (সঃ) আরও বলেন, আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন; "আমি আমার নেককার বান্দাহদের জন্যে (জান্নাতে) এমন সব নি'য়ামত প্রস্তুত করে রেখেছি- যা কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শুনেনি এবং কোন অন্তর তা সম্পর্কে কোন ধারণা রাখে না। আর এর সত্যতার জন্য তোমরা ঐ আয়াতটি তিলাওয়াত করতে পার-"ফালা তা'লামু নাফসুন মা উখফিয়া লাহুম মিন কুর্‌রাতু আয়্যুনিন"। অর্থাৎ আল্লাহ চোখ জুড়ানো সেসব নি'য়ামত নেক বন্দাহদের জন্যে দৃষ্টির অন্তরাল করে রেখেছেন, যা সম্পর্কে কেউ কোন জ্ঞান রাখে না।" (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

হযরত আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) জান্নাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, যাঁর হাতে মুহাম্মদ (সঃ) এর প্রাণ রয়েছে তাঁর কসম! জান্নাতি খাবারের একটি গ্রাস উঠাবে এবং তার মনে খেয়াল জাগবে যে, অমুক প্রকারের খাবার হলে খুবই ভাল হতো। তখন ঐ গ্রাস তার মুখে ঐ জিনিসই হয়ে যাবে যার আকাঙ্খা সে মনে মনে করেছিলো। অতঃপর তিনি (সঃ) وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ এ আয়াতটি পাঠ করেন।" (ইবনে কাসীর। রাবী-ইমাম ইবনে হাতিম রাঃ)

মুত্তাকীদের জান্নাতের বালাখানাসহ্ অন্যান্য নি'য়ামতের কথা বলতে গিয়ে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে মহানবী (সঃ) বলেন, "সবচেয়ে নিম্ন শ্রেণীর জান্নাতীর জন্য সাত তলা প্রাসাদ হবে। সে ষষ্ঠ তলায় অবস্থান করবে এবং সপ্তম তলাটি তার উপর থাকবে। তার ত্রিশ জন খাদেম থাকবে যারা সকাল-সন্ধায় স্বর্ণ নির্মিত তিনশোটি পাত্রে তার জন্যে খাবার পরিবেশন করবে। প্রত্যেকটিতে আলাদা আলাদা খাদ্য-খাবার থাকবে এবং ওগুলো হবে খুবই সুন্দর ও সুস্বাদু। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তার খাবার চাহিদা এক রকমই থাকবে। অনুরূপভাবে তার জন্য তিনশোটি সোনার পেয়ালা, পানপাত্র ও গ্লাসে পানীয় জিনিস রাখা হবে। ওগুলোও আলাদা আলাদা জিনিস হবে। সে তখন বলবে, 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে অনুমতি দিলে আমি সমস্ত জান্নাতীদেরকে দাওয়াত দিতাম। সবাই যদি আমার এখানে আসে তবুও আমার খাবারের মোটেই ঘাটতি হবে না'। আয়তলোচন চোখ বিশিষ্ট হুরদের মধ্য হতে তার জন্য বাহাত্তর জন স্ত্রী থাকবে এবং তার সাথে

দুনিয়ার স্ত্রীরাও পৃথকভাবে থাকবে। তাদের এক একজন এক এক মাইল জায়গা জুড়ে বসে থাকবে। সাথে সাথে তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের নি'য়ামত চিরস্থায়ী থাকবে। আর তোমরাও এখানে চিরস্থায়ী হবে।" অর্থাৎ এখান থেকে কখনো বের হবে না এবং এখান থেকে অন্য স্থানে যাবার ইচ্ছাও পোষণ করবে না।"(ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল রহঃ)

"হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে মহানবী (সঃ) বলেন, যারা জান্নাতে যাবে তারা সর্বদা স্বচ্ছল অবস্থায় থাকবে, দারিদ্রতা ও অনাহারে কষ্ট পাবে না। তাদের পোষাক পুরাতন হবে না এবং তাদের যৌবন শেষ হবে না। জান্নাতে এমনসব নি'য়ামত আছে যা কোন চোখ কখনো দেখেনি এবং কোন কান কখনো শুনেনি এবং কোন মানুষের ধারণায় যা কখনো আসেনি।"(তারগীর ও তারহীব)

এতঃপর পরবর্তী আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা মুত্তাকীদের জন্য নিজের অনুগ্রহের বর্ণনা দিয়ে বলেন–

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِىْٓ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ -

এটাই জান্নাত, যার অধিকারী করা হয়েছে তোমাদের কাজের প্রতিদান হিসেবে।

অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে এটা দান করেছি আমার উদার রহমতের গুণের কারণে। তার কারণ, কোন ব্যক্তিই আল্লাহর রহমত ছাড়া জান্নাতে যেতে পারবে না। এমনকি রাসূল (সঃ)ও পারবেন না। একবার রাসূল (সঃ) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, হে আল্লাহর নবী (সঃ)! আপনিও কি (আল্লাহর রহমত ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেন না?) প্রতিউত্তরে তিনি (সঃ) বলেছিলেন, আমিও না।"অর্থাৎ আমিও আল্লাহর রহমত ছাড়া জান্নাতে যেতে পারবো না।

তবে হ্যাঁ, জান্নাতীদের যে শ্রেণীভেদ হবে তা তার দুনিয়ার সৎ আ'মলের ভিত্তিতেই হবে।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে মহানবী (সঃ) বলেন, জাহান্নামী তার জান্নাতের জায়গা জাহান্নামের মধ্যে দেখতে পাবে এবং দেখে দুঃখ ও আফসোস করে বলবে, 'যদি আল্লাহ তাকে হেদায়াত দান করতো তবে সেও মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হতো।' আর প্রত্যেক জান্নাতী তার জাহান্নামের জায়গা জান্নাতে দেখতে পাবে এবং তা দেখে সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে বলবে, 'আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে হেদায়াত দান না করলে আমি সুপথ পেতাম না।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) আরও বলেন, প্রত্যেক লোকেরই একটি স্থান জান্নাতে রয়েছে এবং একটি স্থান জাহান্নামে রয়েছে। সুতরাং কাফির মুমিনের জাহান্নামের জায়গার ওয়ারিশ হবে এবং মুমিন কাফিরের জান্নাতের জায়গার ওয়ারিশ হবে। "আল্লাহ তা'য়ালার এটাই জান্নাত, যার অধিকারী তোমাদেরকে করা হয়েছে তোমাদের কর্মের ফলসরূপ।" এই উক্তি দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে।

মুত্তাকী জান্নাতীদের জান্নাতের খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যের বর্ণনা দেয়ার পর মহান আল্লাহ জান্নাতের ফলমূল ও তরিতরকারীর বর্ণনা দিয়ে পরবর্তী আয়াতে বলেন- لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ

সেখানে রয়েছে তোমাদের জন্য প্রচুর ফলমূল, যেখান থেকে তোমরা আহার করবে।

সূরা বাকারার ২৫ নম্বর আয়াতে জান্নাতের ফলমূল সম্পর্কে বলতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, "আর হে নবী (সঃ)! যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে, আপনি তাদেরকে এমন জান্নাতের সুসংবাদ দিন ,যার নীচ

দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে। যখনই তারা খাবার হিসেবে কোন ফলমূল পাবে, তখনই তারা বলে উঠবে, এগুলোতো অবিকল সেই ফলমূল যা আমরা এর আগেও (দুনিয়াতে) লাভ করেছিলাম। বস্তুতঃ তাদেরকে একই প্রকৃতির ফলমূল প্রদান করা হবে। আর সেখানে তাদের জন্যে পুতঃপবিত্র সঙ্গিনী থাকবে। আর তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।"

মোট কথা জান্নাতীরা সেখানে পরিপূর্ণ নি'য়ামতরাজিসহ মহান আল্লাহর পছন্দনীয় ঘরে স্থায়ীভাবে বসবাস করবে। যা উপরে বর্ণিত কুরআন এবং হাদীস থেকে বর্ণনা করা হলো।

পক্ষান্তরে খোদাবিমুখ অপরাধীদের জাহান্নামের শাস্তির বর্ণনা দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন-

إِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِىْ عَذَابِ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ ٥ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ-

নিশ্চয়ই অপরাধীরা জাহান্নামের আযাবে চিরকাল থাকবে। তাদের থেকে আযাব লাঘব করা হবে না এবং তারা তাতেই হতাশ হয়ে পড়ে থাকবে।

উপরে আয়াতসমূহে যেমন সৎ, খোদাভীরু এবং অনুগত লোকদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে ও তাদের কর্মের প্রতিফল হিসেবে জান্নাত এবং জান্নাতের নি'য়ামতের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তেমনি এই আয়াতে অসৎ খোদাবিমুখ আনুগত্যহীন অপরাধীদের কর্মের প্রতিফল হিসেবে জাহান্নাম এবং জাহান্নামের শাস্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ পাপীরা স্থায়ীভাবে জাহান্নামের আযাব ভোগ করতে থাকবে। এক মূহুর্তের জন্যও তাদের ঐ শাস্তি হালকা করা হবে না। জাহান্নামে তারা হতাশ হয়ে পড়ে থাকবে। সকল প্রকারের কল্যাণ হতে তারা নিরাশ হয়ে যাবে।

জাহান্নামের অবস্থান বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে মহানবী (সঃ) বলেন, "তোমাদের দুনিয়ার এই আগুন (তাপের দিক দিয়ে) জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ। প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহর নবী (সঃ)! কেন এই আগুনই কি যথেষ্ট ছিলো না? আল্লাহর রাসূল বললেন, দুনিয়ার আগুন থেকে জাহান্নামের আগুনকে (দাহিকা শক্তির দিক দিয়ে) উনসত্তর অংশে বৃদ্ধি করা হয়েছে। এর প্রতিটি অংশই আলাদা-আলাদা ভাবে দুনিয়ার আগুনের সমতুল্য।" (সহীহ বুখারী-সহীহ মুসলিম)

একই রাবী থেকে বর্ণিত হাদীসে মহানবী (সঃ) জাহান্নামের আগুনের রঙ সম্পর্কে বলেন- "জাহান্নামের আগুনকে প্রথমে হাজার বছর ধরে তাপ দেয়া হয়েছিলো, ফলে তা রক্তবর্ণ ধারণ করেছিলো। তারপর তাকে আরও হাজার বছর ধরে তাপ দেয়া হয়েছিলো, ফলে তা সাদা বর্ণ ধারণ করেছিলো। পরবর্তীতে আরও হাজার বছর ধরে তাপ দেয়ার ফলে তা কালো বর্ণ ধারণ করেছিলো। ফলে তা নিবিড় ঘন কালো অন্ধকারে রূপান্তরিত হয়েছে।" (জামে' আত তিরমিজী)

অবাধ্য এবং আল্লাহকে অস্বীকারকারীদের জাহান্নামের শাস্তির বর্ণনা দিতে গিয়ে 'সূরা মূলক' এর ৬ থেকে ১১ নম্বর আয়াতসমূহে মহান আল্লাহ বলেন, "যারা তাদের রবকে অস্বীকার করে তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। আর সেটা কতইনা নিকৃষ্ট স্থান। যখন তারা সেখানে নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তার উৎক্ষিপ্ত গর্জণ শুনতে পাবে। ক্রোধে জাহান্নাম ফেটে পড়বে। যখনই তাতে কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে তখন তাদেরকে তার পাহারাদার সিপাহীরা জিজ্ঞেস করবে। তোমাদের কাছে কি কোন সতর্ককারী আগমন করেনি? তারা বলবে, হ্যাঁ, আমাদের কাছে সতর্ককারী এসেছিলো, কিন্তু আমরা তাতে মিথ্যারোপ করেছিলাম এবং বলেছিলাম, আল্লাহ তা'য়ালা কোন কিছু নাযিল করেনি,তোমরা তো মহা বিভ্রান্তিতে পড়ে আছো। তারা আরও বলবে, যদি আমরা শুনতাম অথবা বুদ্ধি খাটাতাম, তবে আমরা জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম না। অতঃপর তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। অতএব জাহান্নামীরা দূর হোক।"

জাহান্নামীদের আরও পরিণতির কথা উল্লেখ করে সূরা হাক্কাহ এর ৩০ থেকে ৩৭ নম্বর আয়াতসমূহে মহান আল্লাহ বলেন, "ফিরিশতাদের বলা হবে- ধরো একে, গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও, তারপর জাহান্নামে নিক্ষেপ করো। অতঃপর তাকে শৃংখলিত করো সত্তর গজ দীর্ঘ এক শিকলে। নিশ্চয় সে মহান আল্লাহতে বিশ্বাসী ছিলোনা এবং মিসকিনকে খাবার দিতে উৎসাহ দিতো না। অতএব, আজকে এখানে তার কোন সূহৃদয় নাই এবং কোন খাদ্য-খাবার নাই, ক্ষতনিঃসৃত পুঁজ ছাড়া। আর পাপীরা ছাড়া কেউ এটা খাবে না।"

জাহান্নামীদের এসব কঠিন শাস্তির কারণে তারা হয়তো মনে করতে পারে, আল্লাহ তাদের প্রতি যুলুম করছেন। আল্লাহ এর প্রতিউত্তরে

পরবর্তী আয়াতে বলেন- وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَ لٰكِنْ كَانُوْا هُمُ الظّٰلِمِيْنَ

আমি তাদের প্রতি যুলুম করিনি, বরং তারা নিজেরাই ছিলো যালিম।

অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়েছেন, অনেক নি'য়ামত দান করেছেন এবং তাদের সুপথ পাবার জন্য হেদায়াতের পথও দেখিয়েছেন, কিন্তু তারা তাদের জ্ঞান-বুদ্ধিকে সৎ পথে কাজে লাগায়নি,

আল্লাহর নি'য়ামত ভোগ-ব্যবহার করার পরও তারা তার প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে এবং হেদায়াতের পথ দেখানোর পরও তা মানতে অস্বীকার করার মাধ্যমে নিজেরা নিজেদের জীবনের উপর বাড়াবাড়ি করে নিজেদের উপর নিজেরাই যুলুম করেছে। তাই আল্লাহপাক এখানে বলছেন, আমি তাদের প্রতি যুলুম করিনি, বরং তারা নিজেরাই ছিলো যালিম। দুঃস্কর্মের মাধ্যমে তারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করেছে। আমি রাসূল পাঠিয়েছিলাম, কিতাব নাযিল করেছিলাম এবং যুক্তি প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। কিন্তু তারা তাদের হঠকারিতা, অবাধ্যতা এবং সীমালংঘন হতে বিরত হয়নি। ফলে আমি তাদেরকে এর প্রতিফল প্রত্যেকের পাওনামতো প্রদান করেছি। এটা আমার তাদের উপর যুলুম নয়। আর আমি তো আমার বান্দাহদের উপর মোটেই যুলুম করিনা।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,জাহান্নামীরা জাহান্নামের শাস্তির কারণে শেষ পর্যন্ত চিৎকার করে বলবে-

وَنَادَوْا يٰمٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ط قَالَ اِنَّكُمْ مّٰكِثُوْنَ -

তারা (কষ্টের কারণে) চিৎকার করে বলবে, হে মালিক (জাহান্নামের দারোগা)! তোমার প্রতিপালক আমাদেরকে একেবারেই নিঃশেষ করে দিন। সে বলবে, তোমরা তো এভাবেই (চিরকাল) থাকবে।

হযরত ইয়ালা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে মিম্বারের উপর এ আয়াতটি পড়তে শুনেন, অতঃপর তিনি বলেন যে, জাহান্নামীরা মৃত্যু কামনা করবে যাতে শাস্তি হতে নিস্তার পায়। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে এটা ফয়সালা হয়ে গেছে যে, না তাদের মৃত্যু হবে এবং না তাদের শাস্তি হালকা করা হবে।"(সহীহ বুখারী)

আল্লাহ তা'য়ালা সূরা ফাতির এর ৩৬ নম্বর আয়াতে আরও বলেন-

لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا-

"তাদের বিষয়ে এ সিদ্ধান্ত নেই যে, তারা মৃত্যু বরণ করবে। আর তাদের থেকে শাস্তি হালকা করা হবে না।"

আল্লাহ্ তা'য়ালা অন্য আর এক সূরাই এভাবে বলেন-

وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى ٥ الَّذِىْ يَصْلَى النَّارَالْكُبْرٰى ٥ ثُمَّ لَايَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى

"ওটা (উপদেশ) উপেক্ষা করবে, যে নিতান্ত হতভাগা। সে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। অতঃপর সেখানে সে মরবেও না এবং বাঁচবেও না।"

(সূরা আ'লা- ১১-১৩)

যখন জাহান্নামীরা জাহান্নামের মালিক অর্থাৎ জাহান্নামের দারোগার কাছে আবেদন-নিবেদন করবে এই বলে যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা যেন তাদের স্থায়ী ভাবে মৃত্যু ঘটিয়ে দেন, তখন অধিকর্তা প্রতিউত্তরে বলবে, হে জাহান্নামীরা! তোমরা এখানে এভাবেই থাকবে, তোমাদের আর মৃত্যু হবে না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, مَكْثٌ হলো এক হাজার বছর। অর্থাৎ তোমরা আর কোনদিন মরবে না, মুক্তিও পাবে না এবং এখান থেকে পালাতেও পারবে না।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদের দুস্কর্মের কথা তুলে ধরে সর্বশেষ আয়াতে বলেন- لَقَدْ جِئْنٰكُمْ بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ

আমি তো তোমাদের নিকট হক তথা সত্য পৌছিয়েছিলাম, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই ছিলে সত্যবিমুখ।

অর্থাৎ এসব জাহান্নামীদের দুস্কর্ম এমনই ছিলো যে, যখন তিনি তাদের সামনে সত্যকে স্পষ্ঠ ভাবে বর্ণনা করে দেন, তখন তারা তা মেনে নেয়া তো দূরের কথা, বরং তারা ওর প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ওসব তাদের মনে চাই না। তাই তারা হক তথা সত্যপন্থীদেরকে ঘৃণার চোখে দেখে। তারা অসত্য ও অন্যায়ের প্রতিই তাদের ঝোঁক এবং অসৎ পন্থীদের সাথেই খুব মিল-মহব্বত। সুতরাং সেদিন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা আজ নিজেদেরকেই তিরস্কার-ভর্ৎসনা করো এবং নিজেদের উপর নিজেরায় আফসোস করো। কিন্তু সেদিন তাদের আফসোসও না কোন কাজে আসবে, আর না আসবে কোন উপকারে।

শিক্ষাঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা! সূরা যুখরুফ এর ৬৯ থেকে ৭৮ নম্বর আয়াতগুলো ব্যখ্যা বিশ্লেষণ করে আমাদের জন্য যেসব শিক্ষনীয় বিষয় পাওয়া যায়, তা হলো–

০ দুনিয়াতে দেখে শুনে বন্ধুত্ব এবং দোস্তালী করা উচিত। কেননা, আখিরাতে অসৎ, খোদাবিমুখ বন্ধু বা দোস্ত বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে এবং তার সাথেই জাহান্নামে যেতে হবে। পক্ষান্তরে সৎ খোদাভীরু বন্ধু বা দোস্ত আখিরাতে নাজাতের কারণ হবে এবং তার সাথেই জান্নাতবাসী হওয়া যাবে। সুতরাং আখিরাতের কল্যাণের দিকে তাকিয়েই বন্ধুত্ব ও দোস্তালী করা উচিত।

০ আখিরাতে শাস্তির ভয় এবং দুঃখ বেদনা থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হলো আল্লাহর প্রতি দৃঢ় ঈমান এবং পরিপূর্ণরূপে আত্মসমার্পন করা।

০ স্বামী-স্ত্রী অথবা স্ত্রী-স্বামী উভয়ই যদি আল্লাহতে পূর্ণ ঈমান রাখে, সৎ, খোদাভীরু এবং পরিপূর্ণভাবে আনুগত্যশীল হয়, তাহলে তারা উভয়েই আনন্দ ও উৎফুল্লচিত্তে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

০ জান্নাতে এমন সব নি'য়ামত দেয়া হবে যাতে অন্তরে তৃপ্তিবোধ করবে এবং চোখ জুড়িয়ে যাবে। এছাড়াও মনে যা চাইবে এবং চোখ যাতে তৃপ্তি বোধ করবে তাও দেয়া হবে। আর এটা হবে চিরস্থায়ী।

০ দুনিয়ার আ'মল বা সৎ কর্মের প্রতিদান হিসেবেই জান্নাত এবং জান্নাতের যাবতীয় আহার-বিহার সহ অনাবিল সুখ-শান্তি এবং নি'য়ামত দেয়া হবে।

০ দুনিয়ার অসৎ কর্ম এবং পাপের প্রাশচিত্ত্ব হিসেবে অপরাধীদের এমন জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে যার শাস্তি হবে চিরস্থায়ী। আর এতে জাহান্নামীরা হতাশ এবং নিরাশ হয়ে পড়বে।

০ জাহান্নামের এই কঠিন এবং স্থায়ী শাস্তির জন্য আল্লাহকে যালিম (নাউযুবিল্লাহ) বানানো যাবে না। কেননা, এর জন্য যারা জাহান্নামী তারা নিজেরাই যালিম। তার কারণ হলো, যদি তারা দুনিয়াতে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতো, সৎ আ'মল করতো, আল্লাহকে ভয় করে চলতো এবং পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করতো, তাহলে তারা এসব কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতো না। সুতরাং তারা এসব আ'মল বা কর্ম না করে নিজেদের জীবনের উপর নিজেরাই যুলুম করেছে।

০ জাহান্নামের কঠিন আযাব সহ্য করতে না পেরে তা থেকে বাঁচার জন্য স্থায়ীভাবে মেরে ফেলার জন্য জাহান্নামের দারোগার কাছে আপিল করা হবে, কিন্তু তা প্রত্যাখাত হবে। কেননা, মানুষের মৃত্যু একবারই হয়-দ্বিতীয়বার মরার কোন সুযোগ নেই। সেহেতু জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচার জন্যই যা কিছু করতে হবে তা দুনিয়াতে মৃত্যুর আগেই করতে হবে। মৃত্যুর পর আর কোন কিছু করার সুযোগ থাকবে না।

০ আল্লাহর যে সত্য বাণী বা সত্য বিধান তথা আল কুরআন দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন, তা সত্য হিসেবে গ্রহণ করা এবং সে অনুযায়ী আ'মল করা ও কর্ম ঠিক করে নেয়া। যদি এর ব্যত্যায় ঘটে তাহলেই পরকালে কঠিন আযাবের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে চিরকাল যন্ত্রণায় ভুগতে হবে। আফসোস করে কোন লাভ হবে না।

আহ্বানঃ প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে যে দারস পেশ করা হলো, এতে যদি আমার অজান্তে কোন ভুল কিম্বা বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, তার জন্য আমি মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর দারস থেকে যেসব শিক্ষনীয় বিষয় জানতে পারলাম তা যেন দুনিয়ার জীবনে আ'মল করে মৃত্যু বরণ করতে পারি সেই তৌফিক কামনা করে আমি আমার দারস শেষ করছি।

তিন

চূড়ান্ত আন্দোলনের পরই আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসে। বিজয়ের কর্মসূচী হলো হামদ, তাসবীহ ও ইস্তিগফার

সূরা আন-নসর

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۝ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۝

সরল অনুবাদঃ ইরশাদ হচ্ছে- (১) যখন আল্লাহর সাহায্য আসবে ও বিজয় লাভ হবে। (২) (হে নবী সঃ!) তখন আপনি দেখবেন যে, লোকেরা দলে দলে আল্লাহর দ্বীন তথা ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করছে। (৩) তখন আপনি আপনার রবের প্রশংসা সহকারে তাঁর তাসবীহ করুন এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি বড়ই ক্ষমাশীল।

শব্দার্থ ঃ اِذَا -যখন। جَآءَ -আসবে। نَصْرُ اللّٰهِ -আল্লাহর সাহায্য। وَ -এবং/ও। اَلْفَتْحُ -বিজয়। وَرَاَيْتَ -এবং আপনি দেখবেন। النَّاسَ -মানুষদের/লোকদের। يَدْخُلُوْنَ -তারা প্রবেশ করছে। فِى - মধ্যে। دِيْنِ اللّٰهِ -আল্লাহর দ্বীনের। اَفْوَاجًا -দলে দলে। فَسَبِّحْ -অতএব আপনি তাসবীহ করুন। بِحَمْدِ -প্রশংসার সাথে। رَبِّكَ -আপনার রবের। اِسْتَغْفِرْهُ -তাঁর নিকট ক্ষমা চান। اِنَّهٗ -নিশ্চয় তিনি। كَانَ -হলেন। تَوَّابًا -ক্ষমাকারী/তওবা গ্রহণকারী।

সম্বোধনঃ দারসে কুরআন মাহফিলে/অনুষ্ঠানে উপস্থিত সম্মানিত দ্বীনি/ইসলাম প্রিয় ভাইয়েরা / বোনেরা / ভাইয়েরা ও বোনেরা! আসসালামু

আলাইকুম অয়া রহমাতুল্লাহি অয়া বারাকাতুহ্। আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কালামে হাকীম আল কুরআনের ছোট্ট এবং সংক্ষিপ্ত সূরার মধ্য থেকে একটি সূরা তিলাওয়াত ও সরল তরজমা পেশ করেছি। আল্লাহ পাক যেন আমাকে সহীহ সালামতে দারস পেশ করার তাওফীক দান করেন। আমীন।

সূরার নামকরণঃ সূরাটি সর্বসম্মতিক্রমে মাদানী। অন্যান্য সূরার ন্যায় এই সূরাটিরও নামকরণ করা হয়েছে প্রতীকী হিসেবে-اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ এর نَصْرُ শব্দটিকে কেন্দ্র করেই। نَصْرُ শব্দের অর্থ-সাহায্য। এর অপর নাম 'তাওদী'। 'তাওদী' শব্দের অর্থ বিদায় করা। এ সূরায় রাসূলে কারীম (সঃ) এর ওফাত (মৃত্যু) নিকটবর্তী হবার ইঙ্গিত আছে বিধায় এর নাম 'তাওদী' হয়েছে।

সূরাটি নাযিলের সময়কালঃ সকল তাফসীরকারকগণ একমত পোষণ করেছেন যে, এই সূরা পবিত্র আল কুরআনের ১১৪ টি সূরার মধ্যে সর্বশেষ নাযিলকৃত পূর্ণাঙ্গ সূরা। এই বিষয়ে কয়েকটি বর্ণনা থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন- "হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, এটা কুরআন মাজিদের সর্বশেষ সূরা। এরপর আর অন্য কোন পূর্ণাঙ্গ সূরা নবী করীম (সঃ) এর প্রতি নাযিল হয়নি।"
(সহীহ মুসলিম, নাসায়ী, তাবারানী, ইবনে আবু শাইবা, ইবনে মারদুইয়া)

সূরাটি নাযিলের সময়কাল হিসেবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীস থেকে যা জানা যায় তা হলো, তিনি বলেনঃ "এই সূরাটি বিদায় হজ্জ কালে আইয়্যামে তাশরীক (১১, ১২ ও ১৩-ই জিলহজ্জ) এর মাঝামাঝি সময়ে মিনাতে নাযিল হয়। এতে নবী করীম (সঃ) বুঝতে পারেন যে, এটা বিদায়ী সূরা। সুতরাং তখনই তিনি সওয়ারী তৈরী করার নির্দেশ দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) সওয়ারীতে আরোহন করে তার ঐতিহাসিক প্রখ্যাত (বিদায় হজ্জের) ভাষণ প্রদান করলেন।"
(তিরমিজী, বাজ্জার, বায়হাকী, ইবনে আবু শাইবা, আবদ ইবনে হুমাইদ, আবু ই'য়ালা, ইবনে মারদুইয়া)

উপরোক্ত এ দু'টো বর্ণনা মিলিয়ে পাঠ করলে এটা স্পষ্ট মনে হয় যে, 'সূরা নাসর' নাযিল হওয়া ও নবী করীম (সঃ) এর মৃত্যুর মাঝে তিন মাস

ও কয়েক দিনের ব্যবধান ছিলো। কেননা, ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বিদায় হজ্জ ও নবী করীম (সঃ) এর ওফাতের মাঝে ঠিক এতটা দিনেরই পার্থক্য ছিলো।

অন্য বর্ণনায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এই সূরাটি যখন নাযিল হয়, তখন নবী করীম (সঃ) বললেন, "আমাকে আমার মৃত্যুর সংবাদ দেয়া হয়েছে। আমার আয়ুস্কাল পূর্ণ হয়ে এসেছে।"
(মুসনাদে আহমাদ, ইবনে জারীর, তাবারানী, নাসায়ী, আবু হাতিম, ইবনে মারদুইয়া)

"উম্মুল মু'মিনীন, হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ) বর্ণনা করেন, এই সূরাটি যখন নাযিল হয়, তখন নবী করীম (সঃ) বললেন, 'এ বছর আমার ইন্তিকাল হবে'। এ কথা শুনে হযরত ফাতিমা (রাঃ) কেঁদে ফেললেন। তা দেখে নবী করীম (সঃ) বললেন, আমার বংশের মধ্যে তুমিই সর্বপ্রথম আমার সাথে মিলিত হবে। এই কথা শুনে তিনি (ফাতিমা) হেঁসে উঠলেন।" (ইবনে আবু হাতিম, ইবনে মারদুইয়া) ইমাম বায়হাকীতেও প্রায় অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন, বদরী সাহাবী অর্থাৎ বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বয়স্ক মুজাহীদদের সাথে হযরত উমর (রাঃ) আমাকেও সভায় ডাকতেন। এ কারণে কারো কারো মনে সম্ভবত অসন্তুষ্টির ভাব সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে। একবার তাঁদের মধ্য হতে একজন আমার সম্পর্কে মন্তব্য করলেন, সে যেন আমাদের সাথে না থাকে। তার সমান বয়সী ছেলেরাতো আমাদেরও আছে। তাঁর এ মন্তব্য শুনে হযরত উমর (রাঃ) তাঁকে বললেন, তোমরা তো তার সম্পর্কে খুব ভাল ভাবেই জান! একদিন তিনি সবাইকে ডাকলেন এবং তাদের সাথে আমাকেও ডাকলেন, এতে আমি বুঝতে পারলাম সম্ভবত তিনি আজ তাদেরকে কিছু দেখাতে চান। আমরা তাঁর দরবারে হাযির হলে তিনি সকলকে জিজ্ঞেস করলেন-"إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ" নাযিল সম্পর্কে আপনাদের অভিমত কি? তখন কেউ বললেন, এর অর্থ-"যখন আল্লাহর মদদ আসবে ও আমাদের বিজয় লাভ হবে তখন আমরা আল্লাহর প্রশংসা করবো ও তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবো।" অন্য একজন বললেন, এর অর্থ-"শহর, নগর ও দূর্গসমূহ জয় করা।" অন্যরা চুপচাপ থাকলেন।

অতঃপর হযরত উমর (রাঃ) আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস! তোমারও কি এই মত ? আমি বললাম, 'না'। তাহলে তোমার মতামত কি ? আমি বললাম যে, এর অর্থে নবী করীম (সঃ) এর মৃত্যুর ইঙ্গিত রয়েছে। তাঁকে এটা জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে,তাঁর ইহলৌকিক জীবন শেষ হয়ে এসেছে। সুতরাং তিনি যেন, তাঁর প্রতিপালকের প্রশংসার সাথে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করেন এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। একথা শুনে হযরত উমরা (রাঃ) বললেন, আমিও এটাই বুঝেছি।" (সহীহ বুখারী, মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে জরীর, ইবনে মারদুইয়া, বাগাভী, বায়হাকী ও ইবনু মুনযির।)

আল কুরআনের সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ সূরা এবং সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ আয়াত ঃ বিভিন্ন বর্ণনার ভিত্তিতে মুফাস্সিরগণ একমত পোষণ করেন যে, পবিত্র আল কুরআনের ১১৪ টি সূরার মধ্যে সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ সূরা হিসেবে 'সূরা আল ফাতিহা' অবতীর্ণ হয় এবং সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ সূরা হিসেবে 'সূরা আন নসর' অবতীর্ণ হয়।

তাছাড়া বিভিন্ন বর্ণনার ভিত্তিতে মুফাস্সিরিনে কিরাম একমত পোষণ করেন যে, সর্বপ্রথম আয়াত হিসেবে 'সূরা আ'লাক এর' প্রথম পাঁচটি আয়াত অবতীর্ণ হয়। তবে সর্বশেষ আয়াত হিসেবে কয়েকটি মতামত পাওয়া যায়। যেমন-হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনা হতে জানা যায় যে, সর্বশেষ সূরা 'আন নসর' এর পরেও কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ হয়। তবে কোন আয়াতটি সর্বশেষ আয়াত এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে।

হযরত ইবনে আযেব (রাঃ) বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, নবী করীম (সঃ) এর উপর সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াতটি হলো- "আয়াতে কালালা" অর্থাৎ সূরা নিসা এর ১৭৬ নং আয়াত-

يَسْتَفْتُوْنَكَ ط قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ط

(সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যে আয়াত দ্বারা সূদ হারাম করা হয়েছে, তাই ছিলো কুরআনের সর্বশেষ আয়াত। (সহীহ বুখারী) ইমাম আহমাদ, ইবনে মাজাহ ও ইবনে মারদুইয়াতে হযরত উমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীসেও এই আয়াতটিরই প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এসব

বর্ণনায় তাকে সর্বশেষ আয়াত বলা হয়নি। বলা হয়েছে সর্বশেষ আয়াত সমূহের মধ্যে একটি।

ইবনে আব্বাসের অপর এক বর্ণনায় পাওয়া যায়- তিনি বলেন যে, সূরা বাকারার ২৮১ নং আয়াত --- وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ আয়াতটি সর্বশেষ আয়াত। (নাসায়ী, ইবনে মারদুইয়া ও ইবনে জরীর)

হযরত উবাই ইবনে কায়াবের বর্ণনা মতে সূরা আত্ তাওবার ১২৮ ও ১২৯ নং আয়াত দু'টি সর্বশেষ আয়াত।

(মুসনাদে আহমাদ, হাকেম, আল মুসতাদারাক)

সর্বশেষ আয়াতসমূহের নাযিলের ধারাবাহিকতা ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, 'সূরা নাসর' বিদায় হজ্জে অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর (আরাফাতে সূরা মায়িদার ৩ নং) --- اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ আয়াত অবতীর্ণ হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) মাত্র ৮০ দিন বেঁচে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর জীবনের যখন মাত্র ৫০ দিন বাকী ছিলো তখন (সূরা নিসা এর ১৭৬ নং) 'কালালার' আয়াত-
يَسْتَفْتُوْنَكَ ط قُلِ اللهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ নাযিল হয়। অতঃপর ৩৫ দিন বাকী থাকার সময় (সূরা তাওবার ১২৮ ও ১২৯ নং আয়াত)
لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ ---
অবতীর্ণ হয় এবং ২১ দিন বাকী থাকার সময় (সূরা বাকারার ২৮৯ নম্বর আয়াত)---وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ অবতীর্ণ হয়।

(ইমাম কুরতবী)

অপর বর্ণনায় ইবনে আবু হাতিম এবং সাঈদ ইবনে যুবায়ের এর মতে নবীজীর মৃত্যু এবং এই আয়াতটির ব্যাবধান ছিলো মাত্র ৯ দিন।

(এরপরও আল্লাহ পাকই ভাল জানেন)

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য ঃ এই সূরার মূল বিষয়বস্তু হলো, যে জন্য নবী করীম (সঃ) কে দুনিয়াতে প্রেরণ করা হয়েছিলো তার পূর্ণতা লাভ করেছে। অর্থাৎ পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠার জন্যই আল্লাহর রাসূল (সঃ)কে পাঠানো হয়েছিলো, তা পূর্ণতা লাভ করেছে বলে এই সূরায় ইংগিত বহন করে। উপরে বর্ণিত হাদীস থেকে তারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

এও প্রমাণ পাওয়া যায়, যে দ্বীন পরিপূর্ণতা লাভের জন্য নবীজীকে পাঠানো হয়েছিলো সেই দ্বীন দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করতে বসেছে, এমতাবস্থায় চূড়ান্ত সাহায্য আসা শুরু হয়েছে এবং বিজয়ও সংঘটিত হয়েছে। ফলে এখন যুদ্ধ-সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে গেছে। লোকেরা এমনিতেই দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করছে। সুতরাং নবীজীর বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয়তাও শেষ হয়ে গেছে। অতএব দুনিয়া থেকে এখন বিদায়ের পালা। তাই নবীজীকে বলা হচ্ছে- আপনার আন্দোলন পরিপূর্ণতা লাভ করেছে, আল্লাহর সাহায্য এসে গেছে এবং লোকেরাও দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করছে, তাই নবীজী আপনি এসব কৃতিত্বের জন্য নিজে গর্ব না করে বিজয়ের কর্মসূচী হিসেবে আল্লাহর প্রশংসা করুন এবং তাঁরই পবিত্রতা এবং মহিমা ঘোষণা করুন। আর দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রাম করতে যেয়ে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে গেছে তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। কেননা, আল্লাহ তা'য়ালা মহা ক্ষমাকারী। বিভিন্ন হাদীস থেকে পাওয়া যায়, সূরা নসর নাযিলের পর তিনি (সঃ) আল্লাহর বেশী বেশী তাহ্‌মীদ, তাহ্‌লীল ও তাস্‌বীহ পাঠ করতে থাকেন এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন, যা পরবর্তীতে ব্যাখার সময় আলোচনা করা হবে ইনসাআল্লাহ।

ব্যাখ্যা ঃ প্রিয় ভাইয়েরা ও বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে মূল ব্যাখ্যা পেশ করার পূর্বে দারসের জন্য প্রয়োজনীয় কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা হলো। এখন আপনাদের সামনে সূরা নসরের আয়াতগুলোর ধারাবাহিকভাবে ব্যাখ্যা পেশ করছি।

সূরার প্রথমেই মহান আল্লাহ পাক বলেন- اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ

যখন আল্লাহর সাহায্য এবং বিজয় আসবে।

এই বাক্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ দু'টি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার একটি হলো- نَصْرُ اللّٰهِ 'আল্লাহর সাহায্য' আর অপরটি হলো- اَلْفَتْحُ 'বিজয়'। পুরো সূরাটির তাৎপর্য অনুসন্ধান করলে দেখা যায় এবং ইতোপূর্বে ভূমিকাতেও উল্লেখিত বিভিন্ন হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, কোন একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আন্দোলনের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং যে দু'টি জিনিসের প্রয়োজন হয় সে দু'টি বিষয়ই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন-

প্রথমটি হলো- نَصْرُ اللّٰهِ 'আল্লাহর সাহায্য'। আর এটিই সর্বপ্রথম প্রয়োজন হয়। কেননা, আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোন ব্যক্তি কেন কোন নবীর পক্ষেই তাঁর দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। এজন্যই নবীজী (সঃ) দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে বার বার আল্লাহর সাহায্য কামনা করেছেন। তাই নবুয়াতী জিন্দেগীর ২৩ বছর আল্লাহর সাহায্যের ফলে কাফির, মুশরিক এবং মুনাফিকদের বিভিন্ন আক্রমণ ও ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করে সফলতার দ্বার প্রান্তে পৌঁছে যান এবং আল্লাহর চূড়ান্ত সাহায্যও এসে হাজির হয়ে যায়। সুতরাং যুগে যুগে যারাই দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন-সংগ্রামে নিয়োজিত থাকবে- তাদের সকলেরই চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য আল্লাহর সাহায্যের প্রয়োজন হবে। কেননা, আল্লাহর সাহায্য ছাড়া নিজেদের বুদ্ধি-কৌশল, শক্তি-সামর্থ, লোকবল এমনকি আধুনিক মারণাস্ত্র দ্বারাও কাফির এবং খোদাদ্রোহী শক্তির উপর বিজয় লাভ করা কোনভাবেই সম্ভব নয়। যেমন সম্ভব হয়নি ওহী দ্বারা পরিচালিত নবী মুহাম্মদ (সঃ) এর পক্ষেও।

দ্বিতীয়টি হলো- 'اَلْفَتْحُ' 'বিজয়'। এই 'বিজয়' শব্দটি দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল (সঃ) কোন যুদ্ধ-সংগ্রাম করছিলেন তারই বিজয়। একথাটি এজন্যই উল্লেখ করা হলো যে, আমাদের সমাজে এবং আমাদের পূর্ববর্তীরাও মনে করে থাকেন যে, যুদ্ধ-বিগ্রহ, আন্দোলন-সংগ্রাম এসব বিষয় হলো দুনিয়াবী বিষয়। ফেৎনা-ফাসাদ সৃষ্টিকারী বিষয়। ইসলাম শান্তির ধর্ম এবং নবীজীও ছিলেন একজন শান্তিপ্রিয় মানুষ। তিনি তাস্‌বীহ-তাহ্‌লীল আর মসজিদে বসে বসে দ্বীনের সবক দেয়ার জন্যই দুনিয়াতে এসেছিলেন। তাদের এসব কাল্পনিক কথা এবং দায়িত্ব এড়ানো ও ঝুঁকি-ঝামেলা, ত্যাগ-কুরবানীকে এড়িয়ে চলার মানসিকতাকে খন্ডন করা হয়েছে।

সমাজ থেকে অন্যায় অশান্তি, খুন-খারাবী, পাপাচার, যুলুম-নির্যাতন নির্মূল করার পথই তো হলো যুদ্ধ-জিহাদ ও আন্দোলন-সংগ্রাম। এর বিকল্প কোন পথেই তা হতে পারে না। এজন্যই সকল নবী রাসূলগণই প্রতিষ্ঠিত সমাজপতি এবং খোদাদ্রোহী যালিম শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-সংগ্রাম করেছেন। আল্লাহ পাকও নবী প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সূরা তাওবা, সূরা সফ্ এবং সূরা ফাতাহ্‌তে তা উল্লেখ করে বলেন–

هُوَ الَّذِيْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ-

"তিনিই আল্লাহ! যিনি তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হুদা তথা জীবন ব্যবস্থা এবং সত্যদ্বীন তথা ইসলাম সহকারে, যাতে করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য মতবাদের উপর বিজয় লাভ করতে পারেন। যদিও তাতে মুশরিকদের গাত্রদাহ হোক না কেন।"

সুতরাং নবী করীম (সঃ) আল্লাহর দ্বীন আল্লাহর যমীনে প্রতিষ্ঠার জন্য নবুয়্যত প্রাপ্তির পর থেকে দীর্ঘ ২৩ বছর তৎকালীন সমাজে প্রতিষ্ঠিত শক্তি কাফির, মুশরিক এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে আন্দোলন-সংগ্রাম করেছেন। আর তখনই আল্লাহর চূড়ান্ত সাহায্য এসে হাজির হয়েছে এবং তিনি বিজয় লাভ করেছেন। এই বিজয় কিন্তু আল্লাহর নবী হওয়ার পরেও এমনি এমনি আসেনি। তাঁকে এবং তাঁর আন্দোলনের সঙ্গী-সাথীদেরকে দীর্ঘ সময় ধরে অর্থ-সম্পদ, আরাম-আয়েশ এবং জীবনের চূড়ান্ত কুরবানীর মাধ্যমেই বিজয় অর্জন করতে হয়েছে। এই বিজয় বলতে কোন একটি বিশেষ যুদ্ধে জয় লাভ নয়। প্রকৃতপক্ষে এই বিজয় বলতে সার্বিক এবং চূড়ান্ত বিজয়। একটি আন্দোলনের বিজয়, দ্বীনের পরিপূর্ণ বিজয়। এ এমন এক বিজয়, যার পরে গোটা দেশে ইসলামের প্রতিদ্বন্দী আর কোন শক্তির অস্তিত্বই থাকবে না এবং একথা স্পষ্ট ও অকাট্য হয়ে উঠবে যে, আরব জাহানে ইসলাম-ই বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকবে।

তাফহীমুল কুরআন ছাড়া অন্যান্য তাফসীর গ্রন্থ যেমন- ইবনে কাসীর, মা'য়ারিফুল কুরআন, ফীযিলালিল কুরআন ইত্যাদি তাফসীর গ্রন্থে বিভিন্ন হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে এ বিজয় বলতে মক্কার বিজয়কে বুঝিয়েছেন। মাওলানা মওদুদী (রহঃ) তাঁর তাফহীমূল কুরআনে এর বিশ্লেষণ করতে যেয়ে বলেন, মক্কা তো ৮ম হিজরী সনে বিজয় হয়। আর এই সূরাটি নাযিল হয় ১০ম হিজরী সনের শেষ ভাগে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ)ও হযরত সার্‌রা বিনতে নাবহানের বর্ণনা হতে এ কথা জানা গেছে তাছাড়া হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রাঃ) কথানুযায়ী এই সূরাটি যদি সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা হয়ে থাকে, তা হলেও এই বিজয় অর্থ মক্কা

বিজয় হতে পারে না। কেননা, সূরা তাওবা নাযিল হয়েছে মক্কা বিজয়ের পর। তাহলে 'সূরা নসর' সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা কিভাবে হতে পারে? অবশ্য মক্কা বিজয়ও যে এক চূড়ান্ত বিজয় ছিলো তাতে কোন সন্দেহ নেই। কেননা, এই বিজয়-ই আরবের কাফির-মুশরিকদের ইসলামের বিরোধিতা ও শত্রুতা করার বিষয়ে সম্পূর্ণ উদ্যোগহীন এবং হতাশ করে দিয়েছিলো। কিন্তু তার পরেও তাদের মধ্যে কিছুনা কিছু শক্তি অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছিলো, যার ফলে 'তায়িফ' এবং 'হুনাইনের' যুদ্ধ মক্কা বিজয়ের পরেই সংঘটিত হয়েছিলো এবং ইসলামের চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য মক্কা বিজয়ের পর আরও দু'টি বছর সময় লেগে গিয়েছিলো। অতএব এখানে শুধু মক্কা বিজয়কেই 'বিজয়' বলা হয়নি বরং আরব জাহানে ইসলামের চূড়ান্ত বিজয়ের কথাই এখানে বলা হয়েছে। (আল্লাহই বেশী ভাল জানেন)

অতঃপর আল্লাহ তা'য়ালা পরবর্তী আয়াতে বলেন-

وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا

(হে নবী।) তখন আপনি দেখবেন যে, দলে দলে লোকেরা আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করছে।

এই আয়াতে আল্লাহ পাক মহানবী (সঃ) কে উদ্দেশ্য করে বলেন, হে নবী (সঃ) যখন আল্লাহর সাহায্য এবং চূড়ান্ত বিজয় এসে যাবে, তখন আপনাকে দ্বীনের মধ্যে প্রবেশের জন্য মানুষকে আর কষ্ট করে বুঝানো লাগবে না। শত্রুদের মোকাবেলা করা লাগবে না। মানুষের একজন দুজন করে ইসলামে প্রবেশ করার যুগ পার হয়ে গিয়ে এমন যুগের সূচনা হবে, যখন একজন দু'জন নয়, বরং এক একটা গোত্র এবং এক একটা অঞ্চলের মানুষ কোন প্রকার যুদ্ধ-বিগ্রহ ও প্রতিবন্ধকতা ছাড়ায় নিজেদের আগ্রহেই ইসলামের পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণ করবে। ৯ম হিজরী সনের শুরুতেই এই অবস্থা শুরু হয়েছিলো। এ কারণেই ইতিহাসে এবছরকে "প্রতিনিধি দল আগমনের বছর" বলা হয়। এই বছর আরবের বিভিন্ন দিক থেকে প্রতিনিধির পর প্রতিনিধিদল নবী করীম (সঃ) এর খেদমতে এসে ভিড় জমাতে থাকে এবং নবী করীম (সঃ) এর মুবারকপূর্ণ হাতে হাত রেখে ইসলামের বাইয়াত গ্রহণ করে।

হযরত ইবনে আব্বাস(রাঃ) হতে বর্ণিত আছে।তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ(সঃ)

মদীনায় অবস্থান করছিলেন, এমতাবস্থায় একদিন তিনি বললেন- اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ 'আল্লাহ মহান' 'আল্লাহ মহান'! আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এসে গেছে। ইয়ামিনের অধিবাসীরা এসে গেছে। তখন একটি লোক তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর নবী (সঃ) ইয়ামিনবাসীরা কেমন লোক ? তিনি উত্তরে বললেন, তারা কোমল হৃদয়ের ও পরিচ্ছন্ন স্বভাবের লোক। ঈমান,বুদ্ধিমত্তা এবং কৌশল এ সবই ইয়ামিনবাসীদের রয়েছে।' (ইমাম ইবনে জরীর রহঃ)

তাফসীরে মা'য়ারিফুল কুরআনে উল্লেখ রয়েছে, মক্কা বিজয়ের পূর্বে এমন লোকদের সংখ্যা এমন প্রচুর ছিলো, যারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)এর রিসালাত ও ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছিয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু কুরাইশদের ভয়ে অথবা অন্য কোন কারণে তারা ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বিরত ছিলো। মক্কা বিজয় তাদের সেই বাধা দূর করে দেয়। সেমতে তারা ইসলামে দলে দলে প্রবেশ করে। ইয়ামিন থেকে সাতশো লোক ইসলাম কবুল করে পথে আজান দিতে দিতে এবং কুরআন পাঠ করতে করতে মদীনায় এসে উপস্থিত হয়। সাধারণ আরবেরাও এমনিভাবে দলে দলে ইসলামে দাখিল হয়।

তাফহীমূল কুরআনে উল্লেখ রয়েছে, নবী করীম (সঃ) যখন ১০ম হিজরী সনে বিদায় হজ্বে গমন করছিলেন, তখন সমগ্র আরব ইসলামের অধীনতা গ্রহণ করেছিলো এবং সারা দেশে একজন লোকও মুশরিক ছিলো না।

(আলহামদু লিল্লাহ!)

অতঃপর আল্লাহ তা'য়ালা মহানবী (সঃ) এর এই চূড়ান্ত ও মহা বিজয়ের কর্মসূচী হিসেবে উল্লেখ করে পরবর্তী আয়াতে বলেন-

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ط اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا

অতএব (হে নবী সঃ!) তখন আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে তাঁর তাসবীহ করুন এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি বড়ই ক্ষমাশীল।

এই আয়াতে আল্লাহর সাহায্য এসে গেলে এবং বিজয় সংঘটিত হলে বিজয়ের তিনটি কর্মসূচী দেয়া হয়েছে। প্রথম কর্মসূচী হলো- তাসবীহ করা, দ্বিতীয় কর্মসূচী হলো- প্রশংসা করা, এবং তৃতীয় কর্মসূচী হলো-

ইস্তিগফার করা বা ক্ষমা চাওয়া। বিজয়ের এই তিনটি কর্মসূচী অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং অর্থবহ। যেমন–

প্রথম কর্মসূচী ঃ حَمْدُ (হামদ) অর্থ হলো- আল্লাহ তা'য়ালার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করা, স্ততিবাদ করা। তার সাথে তাঁরই শুকরিয়া আদায় করা, আন্তরিক ও অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

দ্বিতীয় কর্মসূচী ঃ تَسْبِيْحٌ (তাস্‌বীহ্‌) অর্থ হলো- আল্লাহ তা'য়ালাকে সবদিক থেকে মহাপবিত্র ও দোষ-ত্রুটি এবং দূর্বলতা হতে মুক্ত বলে ঘোষণা করা। এ কথা উদাত্ত কণ্ঠে বলা যে, আল্লাহ্‌ তা'য়ালা সব রকমের দোষ-ত্রুটি, দূর্বলতা এবং শরিকানা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। তিনি এসব কিছুর অনেক উর্দ্ধে।

হে নবী (সঃ)! আপনার আন্দোলন-সংগ্রামের দ্বারপ্রান্তে এসে আপনার রব এর কুদরতের এই অসাধারণ কীর্তি যখন প্রত্যক্ষ করবেন, তখন তাঁর হামদ সহকারে তাঁর তাসবীহ্‌ করবেন। এখানে 'হামদ' করার অর্থ হলো- এই বিরাট সফলতা আপনার নিজস্ব যোগ্যতা-ক্ষমতার ফলে হয়েছে এমন সামান্য পরিমান ধারণাও যেন কখনো আপনার মনে স্থান না পায়। বরং মনে যেন এটাই স্থান পায় যে, একমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহ এবং দয়ার কারণেই এটা সম্ভব হয়েছে। আর এটাও স্বীকৃতি দেয়া যে, এই সাফল্যের গৌরব একমাত্র মহান আল্লাহ্‌ তা'য়ালার। তিনিই এজন্য সকল প্রকার প্রশংসা পাবার অধিকারী।

আর 'তাস্‌বীহ্‌' করার অর্থ হলো- আল্লাহর দ্বীনের বিজয় ও প্রতিষ্ঠা লাভ হে নবী (সঃ) আপনার নিজের চেষ্টা ও সাধনা বা তার উপর নির্ভরশীল এটা হতে আল্লাহ্‌ সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। বরং আপনার মনে-প্রাণে কেবল এই চিন্তাই রাখবেন যে, আপনার চেষ্টা-সাধনার সাফল্য আল্লাহর মদদ ও সাহায্যের উপরই নির্ভরশীল। তিনি ইচ্ছা করলে একাজ তাঁর যে কোন বান্দার দ্বারা করাতে পারতেন। এটাও আল্লাহর মেহেরবানী যে, আল্লাহ্‌ তা'য়ালা তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠার এই মহান কাজটি আপনাকে দিয়েই করিয়েছেন। আর হে নবী (সঃ)! এটাও মনে রাখবেন যে, মহান আল্লাহ্‌ সকল প্রকার ভুল, ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং দূর্বলতা থেকে মুক্ত। কাজেই আপনি কেবল তাঁরই কুদরতের তাস্‌বীহ্‌ করুন।

তৃতীয় কর্মসূচী ঃ إِسْتِغْفَارْ (ইস্তিগফার) এর অর্থ হলো-"ক্ষমা প্রার্থনা করা"। এই ক্ষমা চাওয়ার কর্মসূচীতে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবীর মাধ্যমে উম্মতে মুহাম্মদীকে এই শিক্ষাই দিচ্ছেন যে, হে নবী (সঃ)! আল্লাহর কাছে কাতর কণ্ঠে এই দোয়া করবেন, আপনাকে যে কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো তা সম্পূর্ণ করার বিষয়ে আপনার দ্বারা মানুষ হিসেবে যে ভুল ত্রুটি হয়ে গেছে, কিম্বা তাতে যে অসম্পূর্ণতা ও দূর্বলতা রয়ে গেছে তা যেন তিনি ক্ষমা করে দেন, সেই দিকে যেন তিনি ভ্রুক্ষেপ না করেন, তা যেন তিনি ধরে না বসেন এবং সেই জন্য যেন জবাবদিহির সম্মুখীন হতে না হয়।

প্রকৃত পক্ষে ইসলাম বান্দাকে এই বিনয় ও এই রীতি-নিয়মই শিক্ষা দিয়েছে যে, আল্লাহ কোনো বান্দাহর দ্বারা তার দ্বীনের যতো বড় কাজই করিয়ে নিক না কেন, এই ব্যাপারে আল্লাহর পথে যে যতো বড় ত্যাগ-কুরবানী করে থাক না কেন, তাঁর বন্দেগী করার জন্য যতো কষ্ট স্বীকার করে থাকুক না কেন, সে যেন এক মুহুর্তের জন্যও এই কথা না ভাবে যে, তার উপর আল্লাহর যে হক বা অধিকার ছিলো তা সে পুরোপুরি আদায় করে ফেলেছে। বরং সদা সর্বদা সে যেন মনে করে যে, আমার উপর যে দ্বায়িত্ব-কর্তব্য ছিলো, তা আমি কিছুই করতে পারিনি। বরং আল্লাহর নিকট এই দোয়াই করা উচিত যে, আল্লাহর হক আদায় করার ব্যাপারে আমার দ্বারা যে ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে গেছে, তিনি যেন তা ক্ষমা করে দিয়ে আমার সামান্যতম চেষ্টা এবং কাজটুকু কবুল করে নেন।

আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহর পথে চেষ্টা, শ্রম, কষ্ট ও ত্যাগ-কুরবানী স্বীকার করার ক্ষেত্রে নবী করীম (সঃ) এর চেয়ে অন্য কোন ব্যক্তিকে বেশী অগ্রসর মনে করার কোনই সুযোগ নেই। তা সত্যেও তাঁকেই যখন এই নম্রতা ও বিনয়তা শিখানো হয়েছে, তখন এমন কে আছে যে নিজের কাজকে বিরাট কিছু মনে করতে পারে এবং আল্লাহর প্রতি তার যে করণীয় ছিলো তা সে করে ফেলেছে বলে সামান্যতমও গর্ববোধ করতে পারে?

'ইস্তিগফার'-এর এই ফরমান দ্বারা মুসলমানদেরকে চিরস্থায়ী শিক্ষাই দেয়া হয়েছে যে, কোনো ইবাদত-বন্দেগী, ত্যাগ-তিতীক্ষা এবং কোনো খিদমতকে মোটেই বড় করে দেখা উচিত নয়। বরং নিজের ধন-সম্পদ, জীবন-প্রাণ আল্লাহর পথে উৎসর্গ করে দেবার পরেও মুমিন মুসলমানদের

মনে করা উচিত যে, যা তার কর্তব্য ছিলো তার তো কিছুই করতে পারলাম না।

অনুরূপভাবে মুসলমানদের যখন কোনো বিজয় লাভ হবে তখন তা নিজের ক্ষমতা-যোগ্যতার ফলে সংঘটিত হয়েছে এমন মনোভাব মনে স্থান না দিয়ে, আত্মতৃপ্তিবোধ না করে এবং আনন্দ-ফূর্তি না করে বরং যা কিছু হয়েছে তা আল্লাহর অনুগ্রহেই হয়েছে মনে করা এবং কোন প্রকার গর্ব-অহংকার মনে স্থান না দিয়ে আল্লাহর সামনে বিনয়ের মস্তক অবনত করে তারই প্রশংসা ও গুণ-কীর্তন করা। তারই তাস্‌বীহ্-তাহ্‌লীল করা এবং তারই নিকট তাওবা ইস্তিগফার করা একান্ত করণীয় কর্তব্য।

বিভিন্ন বর্ণনা থেকে পাওয়া যায়, মহানবী (সঃ) আল্লাহর পক্ষ থেকে এই নির্দেশ পাবার পর বেশী বেশী তাহমীদ, (প্রশংসা) তাসবীহ্ (পবিত্রতা) এবং ইস্তিগফার করা শুরু করে দেন।

হযরত আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নবী করীম (সঃ) তার ইন্তিকালের পূর্বে এই দোয়া খুব বেশী করে পড়তেন –

سُبْحٰنَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

অন্য বর্ণনা অনুযায়ী এ দোয়াটি এ রকম ছিলো -

سُبْحٰنَ اللهِ وَ بِحَمْدِهٖ اَسْتَغْفِرُ اللهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ

আমি জানতে চাইলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি এখন এ কিসব কথা পড়তে শুরু করেছেন? তখন তিনি বললেন, আমার জন্য একটি নিদর্শন ঠিক করে দেয়া হয়েছে, আমি যখন তা দেখবো, তখন যেন আমি এই কথাগুলি বলি এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর সে নিদর্শন হলো –

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ

(মুসনাদে আহমাদ, মুসলীম, ইবনে জরীর, ইবনুল মুনযীর, ইবনে মারদুইয়া)

হযরত আয়িশা (রাঃ) এর অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেন, নবী করীম (সঃ) রুকু ও সাজদায় খুব বেশী করে এই দোয়াটি পড়তেন –

سُبْحٰنَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ

আর এটাই ছিলো কুরআনের (সূরা নসর এর) ব্যাখ্যা। নবী করীম (সঃ) নিজেই এই ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন।

(সহীহ বুখারী-মুসলীম, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, ইবনে জরীর)

উম্মে সালমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, এই সূরা নাযিলের পর নবী করীম (সঃ) উঠতে-বসতে, চলতে ফিরতে সকল অবস্থায় এই দোয়া- سُبْحٰنَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ اَسْتَغْفِرُاللهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ পাঠ করতেন। আমি তাকে একদিন জিজ্ঞেস করলাম, হে নবী (সঃ) আপনি কেন এই কথাগুলি প্রায়ই বলতে থাকেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমাকে এটা করারই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অতঃপর তিনি এই সূরাটি (নসর) পাঠ করলেন। (ইবনে জরীর)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন, এই সূরা নাযিলের পর রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইবাদতে মশগুল হওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন। যার ফলে তাঁর পা দু'টি ফুলে যেত। (কুরতুবী)

শিক্ষা ঃ প্রিয় ভাইয়েরা ও বোনেরা! পবিত্র আল কুরআনের সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ সূরা নসর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা যেসব বিষয় শিক্ষা লাভ করলাম তা হলো –

০ বিজয় শব্দটির দ্বারা একথায় প্রমাণিত হলো যে, এই বিজয়ের পেছনে কোন একটি যুদ্ধ-সংগ্রাম জড়িত রয়েছে। সুতরাং নবীজীকে একটি মিশন নিয়ে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছিল। আর সেই মিশন ছিলো আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন পরিপূর্ণ ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা। নবীজীর উপর সেই অর্পিত মিশন আল্লাহর দ্বীন বিজয়ের জন্য দীর্ঘ যুদ্ধ-আন্দোলন-সংগ্রাম করতে হয়েছে। সুতরাং যুগে যুগে দ্বীন বিজয়ের জন্য সকল মুসলমানকে আন্দোলন-সংগ্রামের সাথে জড়িত থাকতে হবে। এই কঠিন পথ ছাড়া অন্য কোনো সহজ কিম্বা বাঁকা-চোরা পথে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব নয় এবং জান্নাত পাওয়াও সম্ভব নয়। যা আল্লাহর প্রিয় হাবীব শ্রেষ্ঠ মানব আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (সঃ) কে এই কঠিন পথেই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে হয়েছে। যাঁর কষ্ট, ত্যাগ-কুরবানীর বর্ণনা কুরআন ও হাদীসে বিদ্যমান।

০ আল্লাহর সাহায্য এবং বিজয় তখনই আসবে যখন আন্দোলন-সংগ্রাম চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছবে। এই জন্য ধৈর্য সহকারে আল্লাহর সাহায্য এবং চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য অবিরাম গতিতে প্রাণান্তকর চেষ্টা-সংগ্রাম চালিয়ে

যেতে হবে। যেমন নবী করীম (সঃ) কে দীর্ঘ তেইশটি বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিলো। আরও একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে দ্বীন যদি বিজয় নাও হয় তবুও তা ব্যর্থ হয়েছে বলে মনে করা যাবে না। যেমন অতীতের নবীরা ব্যর্থ হননি। কেননা, কোন কোন নবীতো নয়শো/হাজার বছর চেষ্টা করেও নিজের পরিবারেরই সকল সদস্যকে মুসলমান বানাতে পারেননি। এজন্য তো তাঁদের নবুয়্যাত ক্যানসিল হয়ে যায়নি। বরং তাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা-সংগ্রাম করে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে গেছেন। সুতরাং অতীতের নবী রাসূলের অনুসারী হিসেবে আমাদেরকেও চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে- এতে দ্বীন বিজয় হোক বা না হোক। হতাশ হয়ে আন্দোলন থেকে কেটে পড়া যাবে না। কেননা, দ্বীন কায়েম করার দ্বায়িত্ব আল্লাহ তা'লার। আর চেষ্টা-সাধনা করার দায়িত্ব বান্দাহর। দ্বীন কায়েম না হলেও এর প্রতিদান আল্লাহ তা'য়ালা সন্তুষ্ট হয়ে বান্দাহকে পরকালে পরিপূর্ণভাবে দান করবেন।

০ দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছিয়ে যদি আল্লাহর সাহায্য এসে যায়, আর দ্বীনের বিজয় হয়ে যায়, তাহলে সেই বিজয়ের জন্যে আত্ম হারা হওয়া যাবে না, আনান্দ-উল্লাসও করা যাবে না, হাততালি দিয়ে আর নাচানাচি করে শয়তানকে খুশি করা যাবে না, আত্ম অহংকার ও গর্ববোধ করাও যাবে না এবং আত্মতৃপ্তিবোধও করা যাবে না। বরং এই বিজয়ের জন্য আল্লাহর অনুগ্রহ, দয়া ও সাহায্যের কথা স্মরণ করে তারই প্রশংসা করতে হবে, তারই শুকরিয়া আদায়ের জন্য সাজদায় লুটিয়ে পড়তে হবে, তারই প্রশংসা করতে হবে, তারই কৃতিত্বের কথা স্মরণ করে তারই তাস্‌বীহ তাহ্‌লীল করতে হবে। আর আন্দোলন-সংগ্রাম করতে যেয়ে ব্যক্তিগত ও দলীয়ভাবে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি, ভুল-ভ্রান্তি এবং বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে তার জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। রুকুতে, সাজদাতে, নামাজের পরে এবং চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে সর্বাবস্থায় আল্লাহর তাহমীদ (প্রশংসা) তাস্‌বীহ (পবিত্রতা) বর্ণনা করতে হবে এবং তাঁরই কাছে তাওবা-ইস্তিগফার করতে হবে, যেভাবে এবং যে ভাষায় নবী করীম (সঃ) করেছিলেন। যা ব্যাখ্যায় বর্ণনা করা হয়েছে।

০ দ্বীন বিজয়ের পর দ্বীনকে সমাজে টিকিয়ে রাখার জন্য যেমন চেষ্টা-প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে তেমনি বাতিল এবং শয়তানি শক্তির ষড়যন্ত্রের স্বীকার হয়ে দ্বীন যেন আবার পরাভূত না হয়ে যায়, তার জন্য সার্বক্ষণিক

সাবধান-সতর্ক থাকতে হবে। সাথে সাথে বেশী বেশী ইবাদাত-বন্দেগীতে মনোনিবেশ করতে হবে।

আহ্বান ঃ প্রিয় ভাইয়েরা ও বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ছোট্ট একটি সূরার যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হলো, এতে যদি আমার অজান্তে এবং অজ্ঞাতে কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে যায়, কিম্বা বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, তার জন্য মহান আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। সাথে সাথে এই সূরায় যেসব শিক্ষানীয় বিষয় অবগত হলাম তা যেন বাস্তব জীবনে আমরা আ'মল করতে পারি সেই তাওফীক কামনা করে দারস শেষ করছি। অয়াআখিরু দাওয়ানা আনিল হামদু লিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন।

চার

ঝুঁকিপূর্ণ আন্দোলন থেকে এড়িয়ে থাকার বাহানা তালাশ না করা। আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার ভোগ-সামগ্রীর অগ্রাধীকার না দেয়া। সকল অবস্থায় আন্দোলনের নেতৃত্বকে সাহায্য করা এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী থাক বা না থাক জিহাদের ডাক আসলে ঝাঁপিয়ে পড়া।

সূরা আত্ তাওবাহ ৩৮-৪১ আয়াত

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ
فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ
اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ ط اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ ج
فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ ○ اِلَّا تَنْفِرُوْا
يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا لا وَّيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوْهُ
شَيْئًا ط وَاللهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○ اِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ
اللهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ
اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللهَ مَعَنَا ج فَاَنْزَلَ اللهُ سَكِيْنَتَهٗ
عَلَيْهِ وَاَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ
كَفَرُوا السُّفْلٰى ط وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا ط وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○
اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِيْ
سَبِيْلِ اللهِ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

অনুবাদ ঃ ইরশাদ হচ্ছে- (৩৮) হে মুমিনগণ! তোমাদের কি হলো, যখন তোমাদেরকে (জিহাদের জন্য) আল্লাহর পথে বের হতে বলা হয়, তখন

তোমরা মাটি আকড়ে ধরো (অর্থাৎ অলস ভাবে বসে থাকো)। তবে কি তোমরা আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের এসব ভোগ বিলাসের উপকরণ অতি নগণ্য। (৩৯) যদি তোমরা (যুদ্ধে) বের না হও, তাহলে আল্লাহ তোমাদের কঠোর শাস্তি দেবেন (অর্থাৎ ধ্বংস করে দেবেন) এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। আর তোমরা তাঁর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। (৪০) তোমরা যদি তাঁকে (রাসূলকে) সাহায্য না করো, তবে মনে রেখো, আল্লাহই (তাঁর সাহায্য করবেন, যেমন তিনি) তাঁর সাহায্য করেছিলেন সেই সময়, যখন কাফিররা তাঁকে দেশ ছাড়া করেছিলো- তখন তিনি ছিলেন মাত্র দু'জনের একজন। যখন তাঁরা দু'জন গুহার মধ্যে অবস্থান করছিলেন, তখন তিনি তাঁর সঙ্গী (আবু বকর রাঃ) কে বললেন, চিন্তিত হয়ো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর প্রতি গভীর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাঁকে সাহায্য করলেন এমন এক সৈন্যবাহিনী দিয়ে, যা তোমরা দেখতে পাওনি এবং আল্লাহ কাফিরদের কথাকে নীচু করে দিলেন, আর আল্লাহর কথাতো সর্বোচ্চই এবং আল্লাহ হলেন পরাক্রমশালী, মহাবিজ্ঞ। (৪১) তোমরা বের হয়ে পড়ো- হালকাভাবে (অর্থাৎ স্বল্প সরঞ্জামের সাথে) কিম্বা ভারী-ভারাক্রান্ত ভাবে (অর্থাৎ প্রচুর সাজ-সরঞ্জামের সাথে) আর জিহাদ করো আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-মাল ও জান-প্রাণ দিয়ে, এটাই তোমাদের জন্য অতি উত্তম, যদি তোমরা বোঝ।

শব্দার্থ ঃ يَاَيُّهَا -ওহে/হে। اَلَّذِيْنَ -যারা। مَالَكُمْ -তোমাদের কি হয়েছে/হলো। اِذَا -যখন। قِيْلَ -বলা হয়। لَكُمْ -তোমাদেরকে। اِنْفِرُوْا -তোমরা বের হও। فِىْ سَبِيْلِ اللهِ -আল্লাহর পথে। اثَّاقَلْتُمْ -তোমরা বোঝায় নূয়ে পড়ছো। اِلَى الْاَرْضِ -যমীনের দিকে/উপরে। اَرَضِيْتُمْ -তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়ে গেলে? بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا -দুনিয়ার জীবন নিয়ে। مِنَ الْاٰخِرَةِ -আখিরাতের পরিবর্তে/বিনিময়ে। فَمَا -অথচ নয়। مَتَاعُ -সামগ্রী। اِلَّا -ছাড়া/ব্যতীরেকে। قَلِيْلٌ -অতি নগণ্য/তুচ্ছ। اِلَّا -যদি না। تَنْفِرُوْا -তোমরা বের হও। يُعَذِّبْكُمْ -তিনি তোমাদের শাস্তি দেবেন। اَلِيْمًا - বড় কষ্ট/ যন্ত্রণা দায়ক। وَ - এবং/ও। يَسْتَبْدِلْ -

পরিবর্তন করবেন। قَوْمًا - অন্য জাতি/লোক। غَيْرَكُمْ - তোমাদের ছাড়া/স্থলে। لَاتَضُرُّوْهُ -তোমরা তার ক্ষতি করতে পারবে না। شَيْئًا - কিছুমাত্র। عَلٰى -উপর। كُلِّ -প্রত্যেক। شَيْءٍ -কিছুর। قَدِيْرٌ -ক্ষমতাবান। تَنْصُرُوْهُ -তোমরা তাকে সাহায্য করো। فَقَدْ -নিশ্চয়ই। نَصَرَهُ اللّٰهُ - আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন। اِذْ -যখন। اَخْرَجَهُ -তাকে বহিস্কার বা বের করে দিয়েছিলো। ثَانِيَ -দ্বিতীয়। اِثْنَيْنِ -দু'জনের। هُمَا -তারা দু'জন। فِيْ -মধ্যে। الْغَارِ -গুহায়। يَقُوْلُ -তিনি বলেছিলেন। لِصَاحِبِهٖ -তাঁর সঙ্গীকে। لَاتَحْزَنْ -চিন্তিত/বিষণ্ন হবেন না। اِنَّ -নিশ্চয়। مَعَنَا - আমাদের সাথে। فَاَنْزَلَ اللّٰهُ -অতঃপর আল্লাহ নাযিল করলেন। سَكِيْنَتَهٗ -তার প্রশান্তি। عَلَيْهِ -তাঁর উপর। اَيَّدَهٗ -সাহায্য দিলেন/করলেন। بِجُنُوْدٍ -সৈন্য দিয়ে। لَمْ تَرَوْهَا -যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি। جَعَلَ -করলেন। كَلِمَةَ -কথাকে। كَفَرُوْا -কুফরী করেছিলো। السُّفْلٰى - নীচু। هِيَ -তা। الْعُلْيَا -সমুন্নত/উঁচু। عَزِيْزٌ -মহাপরাক্রমশালী। حَكِيْمٌ - মহাবিজ্ঞ। اِنْفِرُوْا -তোমরা বের হও। خِفَافًا -হালকা অবস্থায়। ثِقَالًا - ভারী অবস্থায়। جَاهِدُوْا -তোমরা লড়াই করো। بِاَمْوَالِكُمْ -তোমাদের ধন-সম্পদ দিয়ে। اَنْفُسِكُمْ -তোমাদের জান-প্রাণ। ذٰلِكُمْ -তোমাদের ওটাই/এটাই। خَيْرٌ - উত্তম। لَكُمْ -তোমাদের জন্যে। اِنْ -যদি। كُنْتُمْ - তোমরা। تَعْلَمُوْنَ -জানতে/অবগত হতে।

সম্বোধন ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে/মাহফিলে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা ও বোনেরা! আসসালামু আ'লাইকুম। আমি আপনাদের খিদমতে সূরা তাওবার ৩৮ থেকে ৪১ নং পর্যন্ত মোট চারটি আয়াত তিলাওয়াত ও সরল অনুবাদ পেশ করেছি। আল্লাহ তা'য়ালা যেন আমাকে সহীহ সালামতে আপনাদের সামনে দারস পেশ করার তাওফীক দান করেন।

সূরার নামকরণ ঃ এই সূরাটি দু'টি নামে পরিচিত। একটি হলো 'তাওবাহ'। আর অপরটি হলো 'বারা'আত'।

তাওবাহ্ নামকরণ ঃ এই সূরাটি 'তাওবাহ্' নামকরণের কারণ হলো এই যে, এই সূরার এক স্থানে কতিপয় ঈমানদার লোকদের তাওবা কবুল করে তাদের অপরাধ মাফ করে দেয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

বারা'আত নামকরণ ঃ এই সূরাটি 'বারা'আত' নামকরণের কারণ হলো এই যে, সূরার শুরুতে মুমিনদেরকে মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। বার'আত অর্থ-সম্পর্ক ছেদ বা ছিন্ন। তবে যে নামই হোক না কেন তা প্রতীকী বা চিহ্ন হিসেবেই করা হয়েছে। কোন শিরোনাম হিসেবে নামকরণ করা হয়নি।

সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ্ না লিখার কারণ ঃ সূরাটির শুরুতে অন্যান্য সূরার ন্যায় 'বিসমিল্লাহির রহমানীর রাহীম' লিখা হয়নি। এর কারণ হিসেবে বিশেষজ্ঞ তাফসীরকারকগণ বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করেছেন। কেউ বলেছেন, আল্লাহ্ পাক মুশরিকদের আচারণে রাগান্বিত হয়ে সূরাটি নাযিল করেন, তার জন্য তিনি 'বিসমিল্লাহ' বলেননি। আবার কেউ বলেন যে, পূর্ব সূরা 'আনফালের' জের। তাই আর বিসমিল্লাহর প্রয়োজন হয় না।

ইমাম রাযী (রহঃ) যে কারণটি উল্লেখ করেছেন, সেটিই হলো সবচেয়ে বেশী সঠিক এবং গ্রহণযোগ্য। তা হলো, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) এই সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ্ লিখেননি। তাই পরবর্তীতে সকলেই তাঁর অনুকরণ করেছেন।

জ্ঞাতব্য ঃ তিলায়াতের সময় সূরার শুরু থেকে আরাম্ভ করলে 'বিসমিল্লাহ' পড়া যাবে না। তবে যদি সূরার মাঝপথ থেকে তিলাওয়াত আরাম্ভ করা হয় তবে 'বিসমিল্লাহ' দিয়েই যথারীতি তিলাওয়াত শুরু করতে হবে।

সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার সময় ঃ সূরাটি সর্বসম্মতিক্রমে 'মাদানী'। তবে একই ভাষণে একই সময় অবতীর্ণ হয়নি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঘটনার পরিপেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। সূরাটি তিনটি ভাষণে সমাপ্ত হয়েছে।

প্রথম ভাষণ ঃ সূরার শুরু থেকে ৫ম রুকু পর্যন্ত চলেছে। এই অংশটুকু নাযিল হওয়ার সময় হলো ৯ম হিজরীর যিলক্বদ মাস বা তার কাছাকাছি সময়। এ বছর নবী করীম (সঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ) কে 'আমীরুল হজ্জ' বা হজ্জ কাফিলার নেতা করে মক্কায় পাঠিয়েছিলেন। সেই সময় এই ভাষণটি অবতীর্ণ হয়। নবী করীম (সঃ) হযরত আলী (রাঃ) কে এই

ভাষণটি হাজীদের পাঠ করে শোনানোর জন্য মক্কায় পাঠিয়েছিলেন। এই ভাষণে মুশরিকদের সাথে মুমিনদের সম্পর্ক ছেদের ঘোষণা রয়েছে।

দ্বিতীয় ভাষণ ঃ এই ভাষণটি ৬ষ্ঠ রুকুর শুরু হতে ৯ম রুকুর শেষ পর্যন্ত চলেছে। এটা ৯ম হিজরীর রজব মাস বা তার কিছু আগে অবতীর্ণ হয়, যখন নবী করীম (সঃ) তৎকালীন পরাশক্তি রোমান সম্রাজের বিরুদ্ধে তাবুক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এখানে প্রকৃত ঈমানদারদের যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং দূর্বল মুমিন এবং মুনাফিকদের তিরস্কার করা হয়েছে।

তৃতীয় ভাষণ ঃ সর্বশেষ এই ভাষণটি ১০ম রুকু থেকে শুরু করে সূরার শেষ পর্যন্ত চলেছে। এটি তাবুক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে নাযিল হয়। এই অংশে এমন কতকগুলো আয়াত রয়েছে যা বিভিন্ন সময়ে নাযিল হয়। বিভিন্ন অংশের বিষয় একই হওয়ার কারণে অহীর নির্দেশে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এই ভাষণের সাথে সংযোগ করে দিয়েছেন। এতে মুনাফিকদের তাম্বীহ করা হয়েছে এবং তাবুক যুদ্ধে না যেয়ে যারা পিছনে রয়ে গিয়েছিলো তাদেরকে ভর্ৎসনা করা হয়েছে। আর যেসব লোক ঈমানদার হওয়া সত্ত্বেও জিহাদে অংশ গ্রহণ করেনি তাদের তাওবা কবুল করে ক্ষমার ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

সূরাটির বিশেষ দিক ঃ তিনটি ভাষণ নাযিল হওয়ার ধারাবাহিকতার দৃষ্টিতে প্রথম ভাষণটি স্থান সূরার সর্বশেষে হওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু বিষয়বস্তুর গুরুত্বের বিবেচনায় উহার স্থান সর্বপ্রথমে হওয়ার কারণে নবী করীম (সঃ) সূরাতে সংযোজনকালে উহাকেই প্রথমে স্থান দিয়েছেন। তবে যা কিছু করা হয়েছে তা ওহীর নির্দেশনায় করা হয়েছে। নিজের ইচ্ছায় তিনি কোন কিছু করেননি।

সূরার বিষয়বস্তু ঃ

○ সূরার প্রথম অংশে অর্থাৎ ২৮ নম্বর আয়াত পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্রের মুসলমানদেরকে মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা বলা হয়েছে।

○ দ্বিতীয় অংশে অর্থাৎ ২৯ নম্বর আয়াত থেকে ৩৫ নম্বর আয়াতে 'আহলি কিতাব' তথা ইহুদী নাসারাদের সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের সম্পর্ক ছেদের কথা বলা হয়েছে।

০ তৃতীয় অংশে অর্থাৎ ৩৮ থেকে ৪১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, তাবুক যুদ্ধে যাবার জন্য সাধারণ নির্দেশ আসার পরও যারা দূর্বলতা ও অলসতার কারণে পেছনে থেকে গেছে এবং যুদ্ধে যায়নি তাদের সমালোচনা করা হয়েছে।

০ চতুর্থ অংশে এটি সবচেয়ে দীর্ঘ এবং সূরার অর্ধেকেরও বেশী অংশ জুড়ে বিস্তৃত। এ অংশে মুনাফিকদের সমালোচনা, ভর্ৎসনা এবং মুসলিম সমাজে তাদের অপতৎপরতার নিন্দা ও তিরস্কার করা হয়েছে। তাদের মানসিক এবং বাস্তব বিবরণ পেশ ও জিহাদ থেকে তাদের পিছু হটার ছল-ছুঁতো, ওযর-বাহানা এবং দূরভিসন্ধির স্বরূপ উৎঘাটন করা হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ, ভুল বুঝাবুঝি ও কাপুরুষতার বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা এবং রাসূল (সঃ) ও নিষ্ঠাবান মুমিনদের নানাভাবে কষ্ট ও উত্ত্যক্ত করার বিবরণ দেয়া হয়েছে। সেই সাথে মুনাফিকদের চক্রান্ত থেকে নিষ্ঠাবান মুসলমানদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। মুসলমান ও মুনাফিকদের মধ্যে সম্পর্ক ছেদ এবং তাদের কার্যকলাপ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে।

০ সূরার পঞ্চম অংশে মদীনার ইসলামী সমাজের সবচেয়ে শক্তিশালী জনবল আনসার ও মুহাজির ছাড়াও তাদের চারপাশের আরও কিছু দল ও শ্রেণী ছিলো যেমন –বেদুঈনরা। তাদের ভিতর নিষ্ঠাবান মুমিন, মুনাফিক ও দূর্বল মুমিনও ছিলো। অনুরূপ আরও একটি দল এমন ছিলো, যাদের মধ্যে সৎকাজ ও অসৎ কাজের মিশ্রণ ঘটেছিলো এবং যাদের চরিত্রে ইসলামের মজবুত প্রভাব বিদ্যমান ছিলো, তবে ইসলামের প্রতি তাদের তেমন গভীর আকর্ষণ ছিলো না। আরো একটি দল ছিলো, যাদের প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানতো না। তাদের পরিনাম কি হবে তা আল্লাহই জানেন। আরো একটি দল ছিলো, যারা ইসলামের নামে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকতো।

অত্র সূরাতে এসব দল ও শ্রেণী সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। মুসলিম সমাজে তাদের সাথে কি ধরণের আচরণ করতে হবে, তা জানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং রাসূল (সঃ) ও একনিষ্ঠ মুসলমানদেরকে এদের সবার সাথে আচরণের কি পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে, তাও শিখিয়ে দেয়া হয়েছে। সূরার এই অংশ ৯৭ থেকে ১১০ নম্বর আয়াত পর্যন্ত চলেছে।

০ ষষ্ঠ অংশে আল্লাহর সাথে মুমিনদের ওয়াদা, জিহাদের ধরণ এবং মদীনাবাসী ও তার আশ-পাশের বেদুঈনদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এখানে আরও বলা হয়েছে, মদীনাবাসীদের জন্য এটা বৈধ নয় যে, তারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে এবং রাসূল (সঃ) এর জীবন রক্ষার ব্যাপারে উদাসীন থেকে কেবল নিজেদেরকে নিয়েই ব্যস্ত থাকবে। তাছাড়া মুশরিকদের সাথে মুমিনদের সম্পর্কচ্ছেদের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ অংশে এক পর্যায়ে এমন কয়েকজন মুমিনের যুদ্ধে অনুপস্থিতির ঘটনা ও তার শাস্তির বিধানের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, যারা খাঁটি মুমিন ছিলেন। এই অংশ ১১১ থেকে ১২৭ নম্বর আয়াত পর্যন্ত চলেছে।

০ সূরার সবশেষে উপসংহারে রাসূল (সঃ) এর গুণাবলীর বর্ণনা দেয়া হয়েছে এবং তাঁকে একমাত্র আল্লাহর উপরই নির্ভরশীল হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই অংশ ১২৮ নম্বর আয়াত থেকে শুরু করে সূরার শেষ পর্যন্ত চলেছে।

দারসের জন্য তিলাওয়াতকৃত আয়াতের বিষয়বস্তু ঃ তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর বিষয়বস্তু হলো শারীরিক কষ্ট এবং বৈষয়িক স্বার্থ রক্ষার জন্য যারা তাবুক যুদ্ধে যেতে পিছটান দিচ্ছিলো তাদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে- পরকালের তুলনায় দুনিয়ার এই সামগ্রী অতি নগণ্য। আর যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে না তাদের ভয়াবহ পরিণতির কথাও বলা হয়েছে। তাছাড়া আরো বলা হয়েছে- আল্লাহর দ্বীনের জন্য যদি এই সংকট মূহুর্তে আল্লাহর নবীকে কেউ সাহায্য না করে তবে তাঁর সাহায্যের জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট।

এই অংশে আরো বলা হয়েছে যখন যুদ্ধের জন্য সাধারণ ডাক এসে পড়বে, তখন যে অবস্থায় হোক না কেন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। যারা এ কাজ করবে তাদের পরম সফলতার কথাও বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ প্রিয় ভাইয়েরা ও বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত দারসের বিষয় অনুধাবনের জন্য দারসের সাথে সম্পর্কিত মূল্যবান কিছু বিষয় আপনাদের সামনে তুলে ধরা হলো। এখন আমি ধারাবাহিকভাবে তিলাওয়াতকৃত

আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা পেশ করছি। প্রথমেই মহান আল্লাহ্ বলেন –

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُم بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْءَاخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فِى ٱلْءَاخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ -

হে মুমিনগণ! তোমাদের কি হলো যে, তোমাদের যখন বলা হয় (জিহাদের জন্য) আল্লাহর পথে বের হয়ে পড়ো, তখন তোমরা মাটিকে আঁকড়ে ধরো। তবে তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার এসব ভোগ-বিলাসের উপকরণ অতি নগণ্য।

শানে নুযূল ঃ সূরার এখান থেকে তাবূক যুদ্ধের প্রস্তুতিকালে অবতীর্ণ ভাষণটি শুরু হচ্ছে। ঘটনা হলো এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) অনেক দূরের সফর তাবুকের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করার জন্য সাহাবাদেরকে এমন সময় নির্দেশ দেন, যখন একদিকে প্রচন্ড গরম পড়ছিলো, খেজুর গাছের ফল পেকে উঠেছিলো এবং গাছের ছায়া বেড়ে গিয়েছিলো। অপর দিকে রাস্তা ছিলো বন্ধুর, সওয়ারীও ছিলো কম। এসব ওজর দেখিয়ে কিছু লোক যুদ্ধে না যেয়ে রয়ে গিয়েছিলো। তাদেরকেই তিরস্কার করে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

এসব শ্রেণীর লোককে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে-যখন তোমাদেরকে আল্লাহর পথে যুদ্ধের জন্য ডাক দেয়া হচ্ছে, তখন তোমরা মাটি কামড়িয়ে বসে থাকছো কেন? তোমরা তো দুনিয়ার এই ক্ষণস্থায়ী ভোগ সামগ্রীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এবং কিছু কষ্ট-কাঠিন্যকে বাহানা বানিয়ে আখিরাতের চিরস্থায়ী নি'য়ামত এবং সুখ-শান্তিকে বিসর্জন দিচ্ছো? তোমরা এটা জেনে রাখো যে, পরকালের ভোগ-বিলাস এবং সুখ শান্তির তুলনায় দুনিয়ার এসব সামগ্রী ও ভোগ-বিলাস মূল্যহীন।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) দুনিয়া এবং আখিরাতকে তুলনা করতে যেয়ে তিনি তাঁর তর্জনীর দিকে ইশারা করে বলেন- "কেউ এ আঙ্গুলটি সমুদ্রে ডুবিয়ে উঠালে তাতে যতটুকু পানি উঠবে-এ পানিটুকু সমুদ্রের তুলনায় যেমন, আখিরাতের তুলনায় দুনিয়াও তেমন।" (ইবনে কাসীর)

সুতরাং (তৎকালীন পরাশক্তি রোমান সম্রাজ্যের বিরুদ্ধে) তাবুক যুদ্ধে

তোমাদেরকে যখন আল্লাহর নবী (সঃ) আল্লাহরই রাস্তায় বের হবার জন্যে ডাক দিচ্ছেন-তখন তোমরা দুনিয়ার মোহে তা থেকে দূরে থাকার জন্যে আখিরাতের পরম পাওনার কথা বেমা'লুম ভুলে গিয়ে দূর এবং দূর্গম পথের বাহানা দেখাচ্ছো। প্রচন্ড গরমের ওজর খায়ের করছো। খেজুর কাটার মৌসুমে পাকা খেজুর ঘরে তুলার লোভ সংবরণ করতে পারছো না, জানবাহনের স্বল্পতার কারণ দেখাচ্ছো। কিন্তু এসবের তুলনায় পরকালীন জীবনে যখন তোমরা সীমাহীন জীবন এবং সেখানকার সীমাহীন সাজ-সরঞ্জাম, ভোগ-বিলাস স্বচক্ষে দেখতে পাবে তখন আফসোস করে কোন লাভ হবে না। দুনিয়ার জীবনের এই দ্রব্য-সামগ্রী পরকালে কোন কাজেই আসবে না। দুনিয়ার এই জীবনে যতো দ্রব্য সামগ্রীই তোমরা সংগ্রহ করে নাও না কেন, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু থেকেই তোমরা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। পরকালে এর কোন কিছুই যাবে না। যদি তোমরা পরকালে দুনিয়ার কোন প্রতিদান পেতে চাও তবে তাই পাবে, যা তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ত্যাগ-কুরবানী করেছো এবং যেসব জিনিস ও দ্রব্য সামগ্রীকে দুনিয়ার তুলনায় আখিরাতকে অগ্রাধীকার দিয়েছো।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! যুদ্ধে না যাবার যেসব ওজর বাহানা ও অলসতার কারণ এবং তার প্রতিকারের উপায় এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, তা এক বিশেষ ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট হলেও চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, দ্বীনের ব্যাপারে সকল প্রকার আলসামী, নিস্ক্রীয়তা, ওজর-বাহানা ও সকল প্রকার অপরাধ এবং গোনাহর মূলে রয়েছে দুনিয়া প্রীতি ও আখিরাতের প্রতি উদাসীনতা।

হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে, মহানবী (সঃ) বলেন–

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ "দুনিয়ার মোহ সব গোনাহর মূল।"

সেজন্যই আয়াতে বলা হয়েছে–

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَالَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ ط اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ -

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কি হলো, যখন তোমাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদের জন্য) বের হতে বলা হয়, তখন তোমরা মাটিকে

জড়িয়ে ধরো (অর্থাৎ অলসভাবে বসে থাকো) তবে কি তোমরা আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে গেলে।"

মানুষের রোগ নির্ণয়ের পর আয়াতের পরবর্তী অংশে তার প্রতিকার উল্লেখ করে বলা হয়েছে –

فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ

জেনে রাখো, দুনিয়ার জীবনের ভোগের উপকরণ আখিরাতের তুলনায় অতি নগণ্য।

পরবর্তী আয়াতে যুদ্ধে না যাবার প্রতিফল সম্পর্কে বলতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন–

اِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ وَّيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوْهُ شَيْئًا ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

যদি তোমরা (যুদ্ধে) বের না হও, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন (অর্থাৎ ধবংস করে দেবেন) এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক জাতিকে পয়দা করবেন, আর তোমরা আল্লাহর (দ্বীনের) কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। জেনে রাখো, আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

এখানে আল্লাহ তা'য়ালা জিহাদ বা আন্দোলন–সংগ্রাম থেকে দূরে থাকার দু'টি ভয়াবহ শাস্তির কথা বলেছেন। একটি হলো- আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংশ করে দেবেন। আর দ্বিতীয়টি হলো- অন্য জাতিকে তাদের স্থানে বসিয়ে দেবেন।

তাফসীরে ইবনে কাসীরে উল্লেখ রয়েছে "একটি গোত্রকে আল্লাহর রাসূল (সঃ) জিহাদের জন্যে আহবান করেন। কিন্তু তারা তাঁর আহবানে সাড়া দেয়নি। তখন আল্লাহ শাস্তি হিসেবে তাদের থেকে বৃষ্টি বন্ধ করে দেন।"

একই সূরার ৮১ নম্বর আয়াতে তাদের শাস্তি সম্পর্কে বলতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন–

فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَكَرِهُوْٓا اَنْ

يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِى الْحَرِّ ط قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا ط لَوْكَانُوْا يَفْقَهُوْنَ -

"(তাবুক যুদ্ধে) পেছনে থেকে যাওয়া লোকেরা রাসূল (সঃ) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে থাকতে পেয়ে তারা আনন্দ লাভ করেছে। পক্ষান্তরে তারা জান-মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ-সংগ্রাম করতে অপছন্দ করেছে এবং (অন্যদেরকে) বলেছে, এই গরমের মধ্যে তোমরা যুদ্ধে বের হয়ো না। (হে রাসূল সঃ) তাদেরকে বলে দিন উত্তাপের দিক থেকে জাহান্নামের আগুনই প্রখর। যদি তাদের (এসব বোঝার) বিবেচনা শক্তি থাকতো!"

অর্থাৎ নবী করীম (সঃ) তাবুকের যুদ্ধে যাবার জন্য যে সাধারণ আহবান জানিয়েছেন, যারা তার এই আহবানে সাড়া না দিয়ে ঘরে বসে থাকবে তাদের আল্লাহ দুনিয়াতে পরাভূত করে ধ্বংস করে দিবেন এবং পরকালে জাহান্নামের কঠিন শাস্তির সম্মুখীন করবেন।

এখানে জানার বিষয় হলো, এই ডাক ছিলো আম বা সাধারণ ডাক। এই ডাকে সাড়া দেয়া সকলের জন্য ফরয। এই ফরয ত্যাগের ফলে তাদের ঈমানই বিনষ্ট হয়ে যাবে। যার কারণে তাদেরকে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। যদিও তারা সাহাবা ছিলেন। সুতরাং যুগে যুগে যখনই ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্বের পক্ষ থেকে খোদাদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য সাধারণ ডাক দেয়া হবে তখন সেই ডাকে সাড়া দেয়া সকলের জন্য অবশ্যই পালনীয় কর্তব্য হয়ে পড়বে।

বর্তমান যুগে আমাদের সমাজে দ্বীন কায়েম নেয়। সুতরাং দ্বীন কায়েমের আন্দোলনে পুরুষ-নারী সকলের শরীক থাকা ফরযে আইন-অবশ্যই পালনীয় কর্তব্য। যদি এই ফরযিয়াত পালন করা না হয়-আর তিনি যতো বড়ই আলিম, পীর-মাসায়েখ হোন না কেন, আল্লাহর কঠিন শাস্তি থেকে কেউই রেহায় পাবেন না।

তাবুক যুদ্ধের আহবানে যারা সাড়া দেয়নি, ওজর তালাশ করে পেছনে থেকে গেছেন, তাদেরকে দ্বিতীয় যে শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে তা হলো- তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক জাতি সৃষ্টি করে দেবেন। অর্থাৎ তোমরা এটা মনে করো না যে, আল্লাহ তোমাদের উপর একান্তভাবে

নির্ভরশীল এবং তোমরাই একমাত্র রাসূল (সঃ) এর সাহায্যকারী। তোমাদের প্রতি আল্লাহর এটা বিশেষ মেহেরবানী যে, আল্লাহ তোমাদেরকে এ মহান কাজের আঞ্জাম দেয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। তোমরা যদি এই মহাসুযোগ হাত ছাড়া করো, তা হলে আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের ধ্বংস করে দিয়ে অন্য কোন এক জাতি বা দলকে তাঁর সঙ্গী-সাথী এবং সাহায্যকারী বানিয়ে দেবেন যারা তোমাদের মতো বাহানা তালাশ করবে না। আর জেনে রাখো, তোমরা আল্লাহর দ্বীনের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না।

তোমরা এটা মোটেই মনে করো না যে, তোমরা জিহাদ-সংগ্রাম না করলে অন্য মুজাহিদরা জিহাদ করতেই পারবে না। আল্লাহ তো মহা ক্ষমতাবান, তোমাদের ছাড়াই আল্লাহ অন্য বান্দাহদের দিয়েই শত্রুদের উপর বিজয় দান করবেন। আর তোমরা ব্যর্থকাম হয়ে পড়ে থাকবে।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সাহায্যকারী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট বলে পরবর্তী আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন -

إِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِى الْغَارِ إِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا-

যদি তোমরা তাঁকে সাহায্য না করো, তবে আল্লাহই (তার সাহায্য করবেন যেমন তিনি) তাঁর সাহায্য করেছিলেন সেই সময়ে যখন কাফিররা তাঁকে বহিস্কার করেছিলো, তখন তিনি ছিলেন দু'জনের একজন। যখন তাঁরা (দু'জন) গুহায় অবস্থান করছিলেন তখন তিনি তাঁর সঙ্গী (আবু বকর রাঃ) কে বলেছিলেন, চিন্তিত হয়োনা, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।

এই আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা জিহাদ হতে দূরে থাকা লোকদেরকে লক্ষ্য করে বলছেন- তোমরা যদি আমার রাসূল (সঃ)কে সাহায্য সহযোগিতা না করো, তবে জেনে রাখো যে, আমি কারো মুখাপেক্ষী নই। আমি নিজেই তাঁর সাহায্য এবং পৃষ্টপোষকতা করবো। যেমন সাহায্য এবং পৃষ্টপোষকতা করেছিলাম সেই সময় যখন মক্কার কাফির-মুশরিকরা হিজরতের বছর আমার রাসূল (সঃ) কে হত্যা করা বা বন্দী করা কিম্বা দেশান্তর করার ষড়যন্ত্র করছিলো। তখন নবী (সঃ) তিনি তাঁর বিশ্বস্ত

সহচর ও প্রিয়বন্ধু হযরত আবু বকর (রাঃ) কে সাথে নিয়ে অতি সংগোপনে মক্কা থেকে মদীনার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। সে সময় তাঁর সাহায্যকারী কে ছিলো? তিন দিন পর্যন্ত "সাওর" পর্বতের গুহায় তাঁরা আশ্রয় নিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিলো এই যে, তাঁদের পেছনে ধাওয়াকারী কাফিররা তাঁদের না পেয়ে যখন নিরাশ হয়ে ফিরে যাবে তখন তাঁরা মদীনার পথ ধরবেন। সময় সময় আবু বকর (রাঃ) ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেন এই ভেবে যে, না জানি কেউ হয়তো জানতে পেরে রাসূল (সঃ)কে কষ্ট দেবে! রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর সঙ্গী আবু বকর (রাঃ) কে সান্তনা দিয়ে বললেন,"হে আবু বকর (রাঃ)! দু'জনের কথা চিন্তা করছো কেন? আমাদের সঙ্গে তো তৃতীয় জন আল্লাহ রয়েছেন।"

নবী করীম (সঃ) এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) গুহায় অবস্থান কালে যখন কাফিররা একেবারেই গুহার কাছে পৌছিয়ে গিয়েছিলো তখন আবু বকর (রাঃ) নবী করীম (সঃ) কে বললেন,"এই কাফিররা কেউ যদি পায়ের দিকে তাকায় তাহলেই তো তারা আমাদেরকে দেখে ফেলবে!" তখন তিনি (সঃ) বললেন, "হে আবু বকর! তুমি ঐ দু'জনকে কি মনে করো যাঁদের তৃতীয় জন আল্লাহ রয়েছেন।" (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

মোট কথা এই স্থানেও আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবী রাসূল (সঃ) কে সাহায্য করেছিলেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'য়ালা আয়াতের পরবর্তী অংশে বলেন-

فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ وَاَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا ـ

অতঃপর আল্লাহ তাঁর প্রতি গভীর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাকে সাহায্য করলেন এমন এক সৈন্যবাহিনী দিয়ে যা তোমরা দেখতে পাওনি।

আয়াতের এই অংশের ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেছেন যে, এর দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালা নিজের পক্ষ থেকে হযরত আবু বকর (রাঃ) এর উপর সান্তনা ও প্রশান্তি নাযিল করা বুঝানো হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং অন্যান্য তাফসীরকারদের এটাই মত। তাঁদের দলীল এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর মধ্যে প্রশান্তিতো ছিলোই। কিন্তু এই বিশেষ অবস্থায় প্রশান্তি নতুন ভাবে নাযিল করার মধ্যেও তো কোন বিপরীত কিছু পাওয়া যায় না। এই জন্যই আল্লাহ পাক একই সাথে বলেন- 'আমি আমার অদৃশ্য

সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছি'। (ইবনে কাসীর) এই অদৃশ্য সৈন্যবাহিনী বলতে ফিরিশতাও হতে পারে আবার দুনিয়ার কোন গোপন শক্তিও হতে পারে। কারণ, এগুলোই হলো আল্লাহর সেনাবাহিনী। (মা'য়ারিফুল কুরআন)

অতঃপর আয়াতের শেষ অংশে মহান আল্লাহ বলেন–

وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلٰى ط وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا ط وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

এবং কাফিরদের কথাকে নিচু করে দিলেন, আর আল্লাহর কথাতো সর্বোচ্চেই এবং আল্লাহ হলেন মহা পরাক্রমশালী ও প্রবল প্রজ্ঞাময়।

আল্লাহ তা'য়ালা নবীকে তাঁর সাহায্য এবং সেনা বাহিনী (ফিরিশতাদের) দ্বারা কাফিরদের কালিমা তথা কথাকে দাবিয়ে দিয়েছেন এবং নিজের কালিমাকে সমুন্নত করেছেন। অর্থাৎ শিরককে নীচু করেছেন এবং তাওহীদ বা আল্লাহর একাত্ববাদকে উপরে উঠিয়েছেন। (ইবনে কাসীর)

"হযরত মুসা আল আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে জিজ্ঞেস করা হয়, হে রাসূল (সঃ)! কেউ বীরত্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে, আর কেউ যুদ্ধ করে মানুষকে খুশি করতে, আবার কেউ যুদ্ধ করে জাতীয় মর্যাদা রক্ষার উদ্দেশ্যে-এ তিন শ্রেণীর মধ্যে আল্লাহর পথের মুজাহীদ কে? তিনি উত্তরে বললেন, যে লোক আল্লাহর কালিমাকে সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে সেই হচ্ছে আল্লাহর পথের মুজাহীদ।" (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

অতঃপর মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাবূক যুদ্ধে বের হবার জন্য পুনরায় তাগিদ দিয়ে বলেন–

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوٰلِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

তোমরা বের হয়ে পড়ো- হালকাভাবে (অর্থাৎ স্বল্প সরঞ্জামের সাথে) কিম্বা ভারাক্রান্ত ভাবে (অর্থাৎ প্রচুর সরঞ্জামের সাথে)। আর তোমরা জিহাদ করো আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জান-প্রাণ দিয়ে, এটাই তোমাদের জন্য অতি উত্তম, যদি তোমরা বুঝো।

خِفَافًا 'হালকা'ও ثِقَالًا 'ভারী' শব্দ দু'টি ব্যাপক অর্থবোধক। এর তাৎপর্য এই যে, যুদ্ধে বের হবার নির্দেশ যখন দেওয়াই হয়েছে, তখন সেজন্য

অবশ্যই বের হতেই হবে-তা স্বেচ্ছায়-আগ্রহের সাথেই হোক কিম্বা অরাজীতে- অসন্তোষের সাথেই হোক। তা স্বচ্ছল অবস্থায়ই হোক কিম্বা চরম অস্বচ্ছল-অভাব অনটনের মধ্যে হোক। প্রচুর সাজ-সরঞ্জামের সাথেই হোক কিম্বা কোন প্রকার সাজ-সরঞ্জাম ছাড়াই হোক। অনুকূল অবস্থা ও পরিবেশের মধ্যেই হোক কিম্বা মারাত্মক প্রতিকূল অবস্থায় হোক। যুবক ও সবল অবস্থায়ই হোক কিম্বা বৃদ্ধ ও দূর্বল অবস্থায় হোক।

(তাফহীমূল কুরআন)

সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) তাঁর পিতা হতে, তিনি আবুয যুহা মুসলিম ইবনে সাবীহ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, সূরা বারা'আতের (তাওবার) এই আয়াতটি সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়। এতে রয়েছে যে, তাবুক যুদ্ধের জন্যে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সাথে সকল মুসলমানের যাওয়া উচিত। আহলে কিতাবীদের (ইহুদী-খৃষ্টান) এবং কাফির রোমকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার উদ্দ্যেশ্যে যাত্রা শুরু করা অবশ্য কর্তব্য। তাতে তাদের মনের ইচ্ছা থাক বা না থাক এবং তাদের কাছে সহজ হোক কিম্বা কঠিনই মনে হোক। তখন বৃদ্ধ ও রুগ্ন ব্যক্তিরা বলেছিলো, আমরা এই যুদ্ধে যাত্রা না করলে পাপ হবে না। এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'য়ালা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন।

(তাফসীরে ইবনে কাসীর)

এ আয়াত নাযিলের পরিপ্রেক্ষিতে বৃদ্ধ ও যুবক সবারই জন্যে এ হুকুম সাধারণ হয়ে গেলো। কারো কোন ওজর আপত্তি চললো না। আবু তালহা (রাঃ) এ আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন এবং এই নির্দেশ পালনের জন্যে এই বৃদ্ধ সাহাবী সিরিয়ার মাটিতে চলে যান এবং খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আল্লাহর কাছে নিজের জীবন কুরবান করে দেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং তাকে সন্তুষ্ট রাখুন। (ইবনে কাসীর)

خِفَافًا وَثِقَالًا এর তাফসীরে অনেক তাফসীরকারকগণই এই ব্যাখ্যা করেছেন যে, এতে যুবক ও বৃদ্ধ অভয় বর্ণিত হয়েছে। মোট কথা এর অর্থ হলো- যুবক হোক কিম্বা বৃদ্ধ হোক, কর্ম থেকে অবসর প্রাপ্ত হোক কিম্বা কর্মের মধ্যে নিয়োজিত থাকুক, ধনী হোক কিম্বা গরীব হোক, ভারী হোক কিম্বা হালকা হোক, অভাবী হোক কিম্বা সাবলম্বী হোক, সুখী হোক কিম্বা দুঃখী হোক, পেশাদার হোক কিম্বা ব্যবসায়ী হোক, শক্তিশালী হোক কিম্বা দূর্বল হোক-যে যেঅবস্থাতেই থাকুক না কেন, কোন ওজর আপত্তি না

করেই প্রস্তুতি নিয়ে দাঁড়িয়ে যেতে হবে এবং জিহাদের জন্য যাত্রা শুরু করে দিতে হবে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আমরা নিজেরা নিজেদেরকে একজন খাঁটি মুমিন বা মুসলিম দাবী করি। কিন্তু আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন থেকে দূরে থাকার জন্য কতো ধরনেরইনা ঠুনকো বাহানা, ওজর-আপত্তি পেশ করে থাকি তার কোনো শেষ নেই।

তাফসীরে ইবনে কাসীরে উল্লেখ রয়েছে-"হযরত হাইয়ান ইবনে যায়েদ শারআবী (রহঃ) বলেন, আমি হিমসের শাসনকর্তা সাফওয়ান ইবনে আমরের সাথে জারাজিমা অভিমুখে জিহাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করি। আমি সেখানে দামেস্কের এক অতি বয়স্ক বুযুর্গকে দেখলাম, যিনি আক্রমনকারীদের সাথে নিজের উটের উপর চড়ে আসছেন। তাঁর ভ্রুগুলো চোখের উপর পড়ে রয়েছে। তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। আমি তাঁর পাশে যেয়ে বললাম, চাচাজান! আল্লাহর কাছেতো আপনার ওজর করার সুযোগ আছে। একথা শুনে তিনি চোখের উপর থেকে ভ্রুগুলো সরিয়ে বললেন, "দেখো মহান আল্লাহ আমাদের হালকা ও ভারী উভয় অবস্থাতেই জিহাদে বের হবার নির্দেশ দিয়েছেন। জেনে রেখো, আল্লাহ তা'য়ালা যাকে ভালবাসেন-তাকে তিনি পরীক্ষাও করে থাকেন। তারপর পরীক্ষায় পাশ করলে তিনি তার উপর রহমত বর্ষণ করেন। দেখো, আল্লাহর পরীক্ষা-তাঁর শুকর, সবর, যিকর এবং খাঁটি তাওহীদের মাধ্যমেই হয়ে থাকে।"

জিহাদের হুকুম দেওয়ার পর আল্লাহর পথে জান-মাল খরচ করার নির্দেশ দিয়ে আয়াতের শেষাংশে মহান আল্লাহ বলেন-

وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ -

নিজেদের ধন-সম্পদ ও জান-প্রাণ দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করো, এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম, যদি তোমরা বুঝো।

মহান আল্লাহ জিহাদের নির্দেশ দেয়ার পর আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর পথে মাল ও জান খরচ করার তাগাদা দিয়ে বলেন যে, এতেই তোমাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ রয়েছে।

দুনিয়ার কল্যাণ ও লাভ হলো- সামান্য কিছু খরচ করে বহু গণীমাতের মাল-সামান লাভ। আর আখিরাতের কল্যাণ ও লাভ হলো-আল্লাহর সন্তুষ্টি ও চিরসুখের মহামূল্যবান স্থায়ী জান্নাত, যার সাথে আর কোন কল্যাণ বা লাভকে তুলনা করা যায় না।

নবী করীম (সঃ) বলেন,"আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর পথে জিহাদকারীর জন্যে এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন যে, হয় তাকে শহীদ করে জান্নাতে পাঠাবেন, না হয় গাজী করে গনীমাতসহ নিরাপদে বাড়িতে ফিরিয়ে আনবেন।"

(তাফসীরে ইবনে কাসীর)

আল্লাহ তা'য়ালা এই সূরার-ই ২০ হতে ২২ নম্বর আয়াতে বলেন-

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ لا اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ط وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ○ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَّجَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ ○ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ط اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ○

"যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করেছে তাদের বড় মর্যাদা রয়েছে আল্লাহর কাছে, আর তারাই হলো সফলকামী। তাদের প্রতিপালক তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন- নিজের দয়া, সন্তুষ্টি এবং এমন জান্নাতের যেখানে আছে তাদের জন্যে স্থায়ী শান্তি। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহর কাছেই রয়েছে মহা পুরুস্কার।"

সূরা বাকারার ২১৬ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন-

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ج وَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ج وَعَسٰٓى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ○

"তোমাদের উপর জিহাদ ফরজ করা হয়েছে এমতাবস্থায় যে, ওটা তোমাদের কাছে অপছন্দীয়। আর তোমরা কোন কিছু হয়তো অপছন্দ করে থাকো অথচ ওটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। পক্ষান্তরে তোমরা হয়তো কোন জিনিস পছন্দ করে থাকো অথচ ওটাই তোমাদের জন্য ক্ষতিকর। আর (কোনটা ক্ষতিকর আর কোনটা কল্যাণকর তা) আল্লাহই ভালো জানেন- তোমরা জানো না।"

আর এজন্যই মনে চাক বা না চাক, পছন্দ হোক বা না হোক ভাল কাজ দ্রুত করা। এ সম্পর্কে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে যে, "রাসূলুল্লাহ (সঃ) কোন একজন লোককে বললেন, তুমি ইসলাম গ্রহণ করো। লোকটি বললো, আমার (ইসলাম গ্রহণ করতে) মন যে চাই না। তখন তিনি তাকে বললেন, মন না চাইলেও তুমি ইসলাম গ্রহণ করো।"

শিক্ষা ঃ প্রিয় ভাইয়েরা ও বোনেরা! সূরা তাওবার ৩৮ থেকে ৪১ নম্বর আয়াতগুলোর বিস্তারিত আলোচনা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের পর আমাদের জন্য যেসব শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে তা হলো –

০ যদিও এ আয়াতগুলো এখন থেকে প্রায় দেড় হাজার বছরেরও পূর্বে সাহাবাদের উদ্দেশ্যে নবী করীম (সঃ) এর উপর নাযিল হয়েছিলো। কিন্তু মনে করতে হবে আল্লাহ তা'য়ালা যেন আমাদেরকেই এসব লক্ষ্য করে নির্দেশ দিচ্ছেন। কেননা, কুরআন নবীর উপর নাযিল হয়েছে কিন্তু এর হুকুম কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত কার্যকরী থাকবে।

০ যেহেতু আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত নেই। সুতরাং দ্বীন প্রতিষ্ঠার জিহাদ বা আন্দোলনে নারী পুরুষ সকলেরই জড়িত থাকা ফরজ বা অপরিহার্য কর্তব্য।

০ কঠিন প্রতিকূল অবস্থা এবং জান-মালের ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও আন্দোলনের নেতার সাধারণ ডাকে সাড়া দিয়ে সকলকেই ঝাঁপিয়ে পড়া। বিভিন্ন ঠুনকো ওজর-বাহানা খাড়া করে নেতার সাধারণ ডাককে পাশ কাটিয়ে অলস ভাবে মাটি কামড়িয়ে ঘরে বসে না থাকা।

০ দুনিয়ার ভোগ সামগ্রীকে আখিরাতের তুলনায় একেবারেই নগণ্য মনে করে দুনিয়ার ভোগ্য সামগ্রীর প্রতি সন্তুষ্ট না থেকে আখিরাতের মহা মূল্যবান ভোগ্য সামগ্রীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। এজন্য দুনিয়ার ব্যবসা বাণিজ্য ও ক্ষেত-খামারের ফসলের ক্ষতি এবং চাকুরির ঝুঁকিকে মেনে নিয়ে সকল অবস্থায় দ্বীনি আন্দোলনের জানবাজ কর্মী হিসেবে কাজ করে যাওয়া।

০ যদি আমরা দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ত্যাগ করে বিভিন্ন বাহানা খাড়া করে নিজেকে ভাল মানুষ সেজে জিহাদ-সংগ্রাম থেকে দূরে থাকি, তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের মতো এই অকৃতজ্ঞ জাতিকে ধ্বংশ করে অন্য

এক জাতিকে দিয়ে তাঁর দ্বীনের কাজ করাবেন। তাতে আমরা নিজেদেরকে যতই আল্লাহওয়া'লা মনে করিনা কেন। কেননা, আল্লাহর দ্বীন কোন ব্যক্তি বা দল কিম্বা জাতির উপর নির্ভরশীল নয়।

o হিজরাতের সময় হযরত আবু বক্কর (রাঃ) আল্লাহর নবীকে যেভাবে চতুর কাফির বাহিনীর সশস্ত্র অবস্থান থেকে মদীনায় নিরাপদে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন। অনুরূপভাবে যদি আমরা আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের সাহায্য না করি, তাহলে আল্লাহ্ তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবেন এবং তাঁর অদৃশ্য শক্তি বা বাহিনী দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করে দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। কেননা, আল্লাহ্ সব বিষয়ে ক্ষমতা রাখেন।

o ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের বিশেষ শিক্ষা হলো, যে কোন প্রতিকূল অবস্থায় হোক না কেন, খোদাদ্রোহী শক্তির চরম হুমকীর মুখেও একমাত্র আল্লাহর উপরই তাওয়াক্কুল বা নির্ভর করা। কোন বৈষয়িক শক্তির উপর নির্ভর না করা। কেননা, যতই আল্লাহর উপর নির্ভশীল হওয়া যাবে ততই আল্লাহর সাহায্য এগিয়ে আসবে।

o যদি আল্লাহর উপর চরম আস্থাশীল হওয়া যায়, তাহলে আল্লাহ্ তা'য়ালা খোদাদ্রোহী এবং তাগুতি শক্তির কথা বা দাপটকে ধুলোই মিশিয়ে দেবেন আর আল্লাহর কথা বা বাণীকে উঁচুতে স্থান দেবেন।

o আল্লাহর দ্বীন যখন সমাজে প্রতিষ্ঠিত থাকবে না, তখন সকলের জন্যই দ্বীনি আন্দোলনে শরীক থাকা ফরজ। তা পুরুষ হোক কিম্বা নারী হোক, যুবক হোক কিম্বা বৃদ্ধ হোক, সুস্থ হোক কিম্বা অসুস্থ হোক, গরীব হোক কিম্বা ধনী হোক, শিক্ষিত হোক কিম্বা অশিক্ষিত হোক, মালিক হোক কিম্বা শ্রমিক হোক, কর্মকর্তা হোক কিম্বা কর্মচারী হোক, আলিম হোক কিম্বা গায়ের আলিম হোক, ফকীর হোক কিম্বা মিসকীন হোক, সাজ-সরঞ্জাম থাক বা না থাক, প্রস্তুতি থাক বা না থাক সকল অবস্থায় যার যার অবস্থান থেকেই জিহাদে অংশ গ্রহণ করা ফরজ। বর্তমান সময়ে,আমাদের সকলের উপর জিহাদ বা আন্দোলন-সংগ্রাম করা ফরজ।

o নিজেরই সম্পদ এবং জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ বা আন্দোলন-সংগ্রাম করতে হবে। দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হলে দুনিয়ার জীবনে সুখ শান্তি

পাওয়া যাবে এবং নিরাপদে বসবাস করা যাবে। আর আখিরাতে পাওয়া যাবে চিরস্থায়ী মহা মূল্যবান সুখময় জান্নাত এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও দিদার।

আহ্বান ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা ও বোনেরা! আমি আপনাদের খিদমতে যে দারস পেশ করলাম এতে যদি আমার অজান্তে কোন ভুল ত্রুটি কিম্বা বাড়াবাড়ি হয়ে যায় তার জন্যে মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর এই দারস থেকে আমরা যেসব শিক্ষা লাভ করলাম তা যেন বাস্তব জীবনে আ'মল করতে পারি সেই তাওফীক কামনা করে দারস শেষ করছি। অয়াআখিরু দাওয়ানা আনিল হামদু লিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন।

পাচঁ

অসার ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার ধন-সম্পদ, বিত্ত-বৈভব, প্রাচুর্য গড়ার কাজে প্রতিযোগিতা না করে বরং স্থায়ী জীবন পরকালে আল্লাহর ক্ষমা, সন্তুষ্টি এবং জান্নাত পাবার প্রতিযোগিতা করা।

সূরা হাদীদ ২০-২৩ আয়াত

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ
بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ؕ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ
الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ؕ
وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۙ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانٌ ؕ
وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ۝ سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ
مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۙ
اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللهِ وَرُسُلِهٖ ؕ ذٰلِكَ فَضْلُ اللهِ
يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝ مَآ اَصَابَ مِنْ
مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ
اَنْ نَّبْرَاَهَا ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرٌ ۝ لِّكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰى
مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰكُمْ ؕ وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ
مُخْتَالٍ فَخُوْرِ ۝

সরল অনুবাদ ঃ ইরশাদ হচ্ছে- (২০) তোমরা জেনে রেখো, দুনিয়ার জীবনতো ক্রীড়া-কৌতুক, বাহ্যিক চাকচিক্য, পারস্পরিক অহংকার প্রকাশ,

ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। ওর উদাহরণ এই রকমই যে, এক পশলা বৃষ্টি-যার দ্বারা উৎপাদিত সবুজ শ্যামল শাকসব্জী, গাছপালা দেখে কৃষক হয়ে যায় মহাখুশী। এরপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি ওটা পীতবর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তা খড়-কুটায় পরিণত হয়ে যায়। এর বিপরীত হচ্ছে পরকাল- যেখানে আছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। দুনিয়ার জীবনতো একটা ধোঁকা ও প্রতারণার বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়। (২১) তোমরা দৌড়াও এবং একে অপর হতে অগ্রসর হয়ে যেতে চেষ্টা করো তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে যার বিশালতা ও বিস্তৃতি আকাশ ও পৃথিবীর ন্যায়, যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি বিশ্বাসীদের জন্যে। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা এটা দান করেন। আর আল্লাহ হচ্ছেন মহা দয়াশীল। (২২) পৃথিবীতে বা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপদ বা বিপর্যয় আসে, সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই তা কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয় আল্লাহর পক্ষে এটা খুবই সহজ। (২৩) এটা এ জন্যে বলা যে, যা কিছু হারাও বা ক্ষতিগ্রস্থ হও তার জন্যে তোমরা হতাশ হয়ে না পড়ো এবং যা কিছু আল্লাহ তোমাদের দিয়েছেন তার জন্যে উল্লাসে ফেটে না পড়ো। আল্লাহ কোনো উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ : اِعْلَمُوْا -তোমরা জেনে রেখো। اِنَّمَا - নিশ্চয়ই/প্রকৃতপক্ষে। الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا -দুনিয়ার জীবন। لَعِبٌ -ক্রীড়া/ খেল-তামাশা। وَ -এবং। لَهْوٌ -কৌতুক। زِيْنَةٌ -চাকচিক্য। تَفَاخُرٌ - গর্ব-অহংকার। بَيْنَكُمْ -তোমাদের পরস্পরের। تَكَاثُرٌ -অধিক পাওয়া/অধিক অর্জনের। فِىْ -মধ্যে/ক্ষেত্রে। اَلْاَمْوَالِ - ধন-সম্পদের। اَلْاَوْلَادِ - সন্তান-সন্ততির। كَمَثَلِ -যেমন উদাহরণ। غَيْثٍ - একপশলা বৃষ্টি। اَعْجَبَ -চমত্কৃত করে। اَلْكُفَّارَ -কৃষককে। نَبَاتُهٗ - তার উদ্ভিদ সম্ভার। ثُمَّ -এরপর। يَهِيْجُ -শুষ্ক হয়ে যায়। فَتَرٰىهُ - অতঃপর তা তুমি দেখ। مُصْفَرًّا -হরিৎবর্ণ। يَكُوْنُ -হয়ে যায়। حُطَامًا -খড়কুটা। اَلْاٰخِرَةِ -পরকাল। عَذَابٌ -শাস্তি। شَدِيْدٌ - কঠিন/কঠোর। مَغْفِرَةٌ -ক্ষমা। رِضْوَانٌ -সন্তুষ্টি। اِلَّا -ব্যাতীত/ছাড়া। مَتَاعُ - সামগ্রী। اَلْغُرُوْرِ - ধোকা / প্রতারণা। سَابِقُوْا - তোমরা

আগেবাড়ো বা অগ্রণী হও। اِلٰى -দিকে। مَغْفِرَةٍ -ক্ষমা। مِنْ رَّبِّكُمْ - তোমার রবের পক্ষ থেকে। جَنَّةٍ -জান্নাত। عَرْضُهَا -উহার প্রশস্ততা। كَعَرْضِ -প্রশস্ততার ন্যায়। السَّمَاءِ -আকাশ সমুহের। وَالْاَرْضِ -এবং পৃথিবীর। اُعِدَّتْ -প্রস্তুত করা হয়েছে। لِلَّذِيْنَ -যারা। اٰمَنُوْا -ঈমান এনেছে। بِاللّٰهِ -আল্লাহর উপর। رُسُلِهٖ -তাঁর রাসূলদের। ذٰلِكَ -ওটা/এটা। فَضْلُ اللّٰهِ - আল্লাহর অনুগ্রহ। يُؤْتِيْهِ -তা দান করেন। مَنْ يَّشَاءُ -যাকে ইচ্ছা। ذُوالْفَضْلِ - অনুগ্রহশীল। الْعَظِيْمِ -বড়/মহান। مَا اَصَابَ -আসেনা। مِنْ -কোন। مُّصِيْبَةٍ -বিপদ-আপদ। فِى الْاَرْضِ -পৃথিবীতে। وَلَا -আর না। اَنْفُسِكُمْ - তোমাদের নিজেদের। فِىْ كِتٰبٍ - কিতাবে আছে। مِنْ قَبْلِ -এর পূর্বেই। نَبْرَاَهَا -তা আমরা সৃষ্টি করার। عَلَى اللّٰهِ -আল্লাহর উপর/আল্লাহর জন্যে। يَسِيْرٌ -সহজ। لِكَيْلَا -না এটা এজন্যে যে। تَاْسَوْا -তোমরা হতাশ হও। عَلٰى -উপর। مَا -যা। فَاتَكُمْ -তোমরা হারাও। وَلَا -এবং না। تَفْرَحُوْا - তোমরা উল্লসিত হও। بِمَا -ঐ বিষয়ে যা। اٰتٰكُمْ -তোমাদের দান করেন। لَا يُحِبُّ -পছন্দ করেন না/ভাল বাসেন না। كُلَّ -প্রত্যেক। مُخْتَالٍ -উদ্ধত। فَخُوْرٍ -অহংকারীকে।

সম্বোধন ঃ দারসে কুরআন মাহফিলে/অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা/ বোনেরা! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বরাকাতুহু। আমি আপনাদের সামনে সূরা হাদীদের ২০ থেকে ২৩ নম্বর পর্যন্ত মোট চারটি আয়াত তিলাওয়াত ও তরজমা পেশ করেছি। আল্লাহ্ পাক যেন আমাকে সহীহ্ সালামতে দারস পেশ করার তাওফীক দান করেন। আমীন। 'অমা তাওফীকি ইল্লাহ বিল্লাহ'।

সূরার নামকরণ ঃ অন্যান্য সূরার ন্যায় এই সূরার নামও প্রতীকী বা চিহ্ন হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। এই সূরার ২৫ নম্বর আয়াতের وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ এই ব্যাকাংশের اَلْحَدِيْدَ শব্দটিকে এই সূরার নামকরণ করা হয়েছে। الحديد এর আভিধানিক অর্থ- লোহা। আর রূপক অর্থে- রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা।

নাযিল হবার সময়কাল ঃ সর্বসম্মতি ক্রমে সূরাটি মাদানী। তবে এই সূরাটি কখন নাযিল হয়েছে এ সম্পর্কে কোন স্পষ্ট বর্ণনা না থাকলেও সূরার বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করলে মনে হয়, সূরাটি সম্ভবতঃ ওহুদ যুদ্ধ ও হুদায়বিয়ার সন্ধির মাঝামাঝি কোন এক সময়ে অবতীর্ণ হয়। কেননা, এই সময়ই মদীনা কেন্দ্রীক ক্ষুদ্র ইসলামী রাষ্ট্রটিকে কাফিররা সব দিক দিয়ে আয়ত্ত্বে নিয়ে নিয়েছিলো। আর অত্যন্ত সহায় সম্বলহীন অবস্থার মধ্য দিয়ে মুষ্টিমেয় ঈমানদার লোকদের দল সমগ্র আরব শক্তির মোকাবেলা করতেছিলো। এই সময় নবীর অনুসারীদের ইসলামের জন্য কেবল জানের কুরবানীই জরুরী ছিলো না বরং তার চেয়েও বেশী প্রয়োজন ছিলো আর্থিক কুরবানীর।

এই সূরাতে অর্থ দানের জন্য অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাবে আবেদন জানানো হয়েছে। ১০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ তা'য়ালা ঈমানদার লোকদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন যে, "মক্কা বিজয়ের পর যারা নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করবে ও আল্লাহর পথে লড়াই করবে, তারা সেই লোকদের সমমর্যাদার অধিকারী কখনও হতে পারে না, যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে জান ও মালের কুরবানী করবে।"

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। ইবনে মারদুইয়া হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। তিনি কুরআনের এই আয়াত

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ

(ঈমানদার লোকদের জন্য এখনও কি সেই সময় আসে নাই যে, তাদের অন্তর আল্লাহর যিকিরে বিগলিত হবে এবং তারা সত্যের সামনে মাথানত করবে) সম্পর্কে বলেছেন যে, কুরআন নাযিল হবার সূচনা থেকে ১৭ বছর পরে ঈমানদার লোকদেরকে কাঁপিয়ে তুলবার জন্য এই আয়াতটি নাযিল হয়েছে। এ হিসেবে আলোচ্য সূরাটি নাযিল হবার সময়কাল ৪র্থ ও ৫ম হিজরীর মধ্যবর্তী সময় বলে ধরে নেয়া যায়। (আল্লাহই ভাল জানেন)

সূরাটির মূল বিষয়বস্তু ঃ সূরাটির মূল বিষয়বস্তু হলো আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়ের আহবান। এই সূরাটি এমন এক সময় অবতীর্ণ হয় যখন মুসলমানদের চরম সংকটকাল অতিবাহিত হচ্ছিল। গোটা আরব বিশ্বের

কাফিররা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলো। জাহিলিয়াতের সাথে ইসলামের চূড়ান্ত ফয়সালা দানকারী যুদ্ধ চলছিলো। এই অবস্থায় আল্লাহ তা'য়ালা মুসলমানদেরকে আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়ের উপদেশ দেন- বিশেষভাবে মুসলিম নাগরিকদের আর্থিক কুরবানীতে উদ্বুদ্ধ করেন। সেই সংগে এই কথাটিও তাদের মনের মধ্যে বদ্ধমূল করে দেন যে, কেবলমাত্র মৌখিক স্বীকৃতি আর কতিপয় বাহ্যিক আ'মলই ঈমান নয়। বরং আল্লাহ এবং তাঁর দ্বীনের ব্যাপারে অকপট, অকৃত্রিম ও একনিষ্ঠ হওয়াই হলো প্রকৃত ঈমান। যে ব্যক্তি এই প্রাণ উৎসর্গকারী মূল ভাবধারার সাথে পরিচিত নয়, যাদের অন্তর এই ভাবধারা থেকে শূন্য এবং যারা আল্লাহ ও তাঁর দ্বীনের মোকাবেলায় জান-মাল ও স্বার্থটাকেই বেশী প্রিয় ও অধীক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে, তার ঈমানের স্বীকৃতি ও অঙ্গীকার একেবারেই অন্তঃসার শূন্য। আল্লাহর নিকট এই অন্তঃসার শূন্য ঈমানের একবিন্দুও মূল্য নেই।

দারসের জন্য তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর মূল বিষয়বস্তু ঃ

দুনিয়ার জীবনের ক্রীড়া-কৌতুক, ভোগ-বিলাস, চাকচিক্য, গর্ব-অহংকার, সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদের প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা চাকচিক্যময় ফল-ফসলের খড়কুটার ন্যায় অন্তঃসার শূন্য। আবার আখিরাতের জীবন, যা স্থায়ী-যেখানে আছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর দুনিয়ার জীবনতো হলো ধোকা ও প্রতারণার বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়। এই জন্য সকলকে দৌড়াতে হবে, প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে হবে জান্নাতের পথে, যেখানে আছে চিরস্থায়ী শান্তি এবং আল্লাহর দিদার ও সন্তুষ্টি।

আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্ব নির্ধারিত ছাড়া কোন বিপদ আপদ আসে না। এই জন্য কোন কিছু ক্ষতি হলে কিম্বা-কোন কিছু হতে মাহরূম হলে তার জন্য হাহুতাশ করা যাবে না। আবার বেশী কিছু পাওয়ার ফলে উল্লাসে ফেটে পড়াও যাবে না।

ব্যাখ্যা ঃ প্রিয় ভাইয়েরা ও বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে দারসের জন্য প্রাথমিক কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরা হলো, যা কুরআনের ব্যাখ্যা বুঝার জন্য অত্যন্ত সহায়ক হবে।

অতঃপর আপনাদের সামনে তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা ধারাবাহিকভাবে পেশ করছি। দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ط

তোমরা জেনে রেখো যে, দুনিয়ার জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, বাহ্যিক চাকচিক্য, পারস্পরিক অহংকার প্রকাশ, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

সূরা হাদীদের ২০ নং আয়াতের প্রথমাংশে দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে বলতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, দুনিয়ার এই জীবন মূলতঃ এক ক্ষণস্থায়ী জীবন। এখানকার গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, বসন্ত সব কালই অস্থায়ী। আর দুনিয়ার মন ভুলানো সামগ্রীর কোন অভাব নেই। কিন্তু সবকিছুই অতি নগণ্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এবং তুচ্ছ। অথচ মানুষ এই মন ভুলানো ক্ষণস্থায়ী অতি নগণ্য এবং তুচ্ছ জিনিসের জন্য প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে, গর্ব-অহংকার করে। এটা মানুষের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই এগুলোকে খুব একটা বড় এবং বিরাট কিছু মনে করে থাকে।

দুনিয়ার চাকচিক্যময় বস্তু-সামগ্রী সম্পর্কে বলতে গিয়ে সূরা আলে ঈমরানের ১৪ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন–

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَاۤءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ط ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ

"মানুষের জন্য চাকচিক্য ও আকর্ষণীয় করা হয়েছে- নারী, সন্তান-সন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত ঘোড়া, গৃহপালিত পশু এবং খেত-খামারের মতো আকর্ষণীয় বস্তু সামগ্রী। এ সবই হচ্ছে দুনিয়ার জীবনের ভোগ্য সামগ্রী। আর আল্লাহর নিকট রয়েছে উত্তম আশ্রয় স্থল।"

দুনিয়ার জীবনে এই চাকচিক্যময় বস্তুসামগ্রী এবং জীবনের উদাহরণ বর্ণনা করে মহান আল্লাহ আয়াতের পরবর্তী অংশে বলেন–

كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ط وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ ط وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ

ওর উদাহরণ হলো এরকমই যে, এক পশলা বৃষ্টি যার দ্বারা উৎপাদিত সবুজ শাকসব্জী, গাছপালা দেখে কৃষক হয়ে যায় মহা খুশী। এরপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি ওটা পীতবর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তা খড় কুটায় পরিণত হয়ে যায়। এর বিপরীত হলো পরকাল। যেখানে আছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। দুনিয়ার জীবনতো ধোকা ও প্রতারণার বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়।

আয়াতের এই অংশে পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত বা উদাহরণ বর্ণনা করা হয়েছে এই বলে যে, এর শ্যামল-সজীবতা ধ্বংসশীল, এখানকার নি'য়ামতরাজীও ক্ষণস্থায়ী। অনুরূপ উদাহরণ পেশ করা হয়েছে সূরা কাহাফ এর ৪৫ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন–

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ مُّقْتَدِرًا-

"(হে নবী সঃ!) তাদের কাছে দুনিয়ার জীবনের উপমা বর্ণনা করুন। তা পানির ন্যায়, যা আমি আকাশ থেকে বর্ষণ করি। অতঃপর তার দ্বারা ভূমি থেকে সবুজ-শ্যামল শাকসব্জী লতাপাতা উৎপন্ন হয়, অতঃপর তা এমন ভাবে শুকিয়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় যে, তা বাতাসে উড়ে যায়। আল্লাহ্ এসব কিছুর উপর শক্তিমান।"

غَيْثٍ বলা হয় ঐ বৃষ্টিকে যা মানুষের হতাশার পর বর্ষিত হয়। যেমন আল্লাহ্ অন্য জায়গায় বলেন–

وَهُوَالَّذِىْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْۢ بَعْدِ مَا قَنَطُوْا

"তিনিই সেই আল্লাহ যিনি মানুষের প্রতাশার পর বৃষ্টি বর্ষণ করে থাকেন।"

সুতরাং বৃষ্টির কারণে যেমন যমীনে ফসল উৎপন্ন হয়, ক্ষেতের ফসল দুলতে থাকে আর চাষীদের মনকে উৎফুল্ল করে দেয়, তেমনিভাবে দুনিয়ায় মানুষ দুনিয়ার ধন-মাল, পণ্য-দ্রব্য এবং মূল্যবান সামগ্রী লাভ করে গর্ব-অহংকারে ফুলে-ফেঁপে উঠে। কিন্তু পরিনাম এই দাঁড়ায় যে, যেমন ক্ষেতের ঐ চোখ জুড়ানো সবুজ শ্যামল ফসল শুকিয়ে শেষ পর্যন্ত খড়কুটায় পরিণত হয়ে যায়। ঠিক অনুরূপ দুনিয়ার এই চাকচিক্যময় ভোগ্যসামগ্রী সবই একদিন মাটির সাথে মিশে যাবে। দুনিয়ার জীবনও তাই প্রথমে আসে যৌবন,

এরপরে অর্ধবয়স এবং শেষে বার্ধক্যে পৌছে যায়। স্বয়ং মানুষের অবস্থায়ও ঠিক অনুরূপ। তার শিশুকাল, তার কিশোর কাল, তার যৌবন কাল, তার পৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্য। এসব অবস্থার কথা চিন্তা করলে বিস্মিত হতে হয়! কোথায় সেই যৌবনের রক্তের গরম এবং শক্তির দাপট। আর কোথায় বার্ধক্যের দূর্বলতা, কোমরের ব্যথা ও হাড়-হাড্ডীর শক্তিহীনতা! যেমন মহান আল্লাহ সূরা রূমের ৫৪ নম্বর আয়াতে বলেন–

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَّشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ-

"আল্লাহ তিনিই যিনি তোমাদেরকে দূর্বলতার অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন, তারপর ঐ দূর্বলতার পরে শক্তি দান করেছেন, আবার ঐ শক্তির পরে দিয়েছেন দূর্বলতা ও বার্ধ্যক্য, তিনি যা চান সৃষ্টি করে থাকেন। তিনি সর্বজ্ঞ ও ক্ষমতাবান।"

এই দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা দুনিয়ার অস্থায়ীত্ব ও নশ্বরতার বর্ণনা দিয়েছেন।

এবার আল্লাহ তা'য়ালা আয়াতের শেষ অংশে আখিরাতের দু'টি দৃশ্য প্রদর্শন করে একটি হতে ভয় দেখাচ্ছেন আর অপরটির প্রতি উৎসাহ প্রদান করছেন।

দুনিয়ার জীবনের সবকিছুই তুচ্ছ, নগণ্য এবং ক্ষণস্থায়ী। সবকিছুই নিমিষের মধ্যেই হারিয়ে যেতে পারে। কিন্তু পরকালের জীবন বিরাট, বিশাল, মহান ও চিরস্থায়ী জীবন। সেখানকার স্বার্থ, সুখ-সুবিধা সবই যেমন বিরাট, বিশাল ও স্থায়ী, তেমনি সেখানকার ক্ষতিও মারাত্মক এবং স্থায়ী। সুতরাং পরকালের আযাব বা শাস্তি যেমন ভয়াবহ, তেমনি আখিরাতে আল্লাহর ক্ষমা, সন্তুষ্টি এবং সুখ-শান্তিও অনাবীল ও চিরস্থায়ী।

দুনিয়ার জীবন একটা প্রতারণা ও ধোঁকার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়। আর যে বা যারাই দুনিয়ার এই মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, তারাই আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের প্রাধান্য দিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থায় পৌছে যায় যে, আখিরাতকে ভুলেই বসে। এমনকি অস্বীকার পর্যন্ত করে বসে।

পরবর্তী আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা দুনিয়ার জীবনের প্রতিযোগিতা না করে বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং জান্নাত পাবার প্রতিযোগিতার তাগাদা দিয়ে বলেন -

سَابِقُوٓا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ -

তোমরা দৌড়াও এবং একে অপর থেকে বেড়ে যাবার চেষ্টা করো তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে যার বিশালতা ও বিস্তৃতি আকাশ ও পৃথিবীর সমান-যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাসীদের জন্য। এটা আল্লাহর পক্ষ হতে বিশেষ অনুগ্রহ-তিনি যাকে ইচ্ছা এটা দান করেন। আর আল্লাহ হচ্ছেন মহা অনুগ্রহশীল।

এখানে তীব্র প্রতিযোগিতার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ পরস্পর তীব্র প্রতিযোগিতার মাধ্যমে একজনকে ছাড়িয়ে অপরজনের এগিয়ে যাবার কথা বুঝানো হয়েছে।

এখানে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন যে, তোমরা দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও স্বাদ-আস্বাদের সামগ্রী সংগ্রহ করার কাজে যে তীব্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছো, একে অপরকে ছাড়িয়ে নিজে সবার আগে চলে যেতে ও অন্যের তুলনায় খুব বেশী বেশী পাবার জন্যে যে অবিরাম চেষ্টা-সাধনা চালিয়ে যাচ্ছো, তা ছেড়ে দাও। বরং তার পরিবর্তে আল্লাহর বেশী বেশী ক্ষমা, সন্তুষ্টি এবং আসমান যমীন বরাবর জান্নাত পাবার আশায় দৌড়াও- প্রতিযোগিতা করো। সেই দিকে একে অপরকে ছেড়ে বেড়ে যাবার প্রতিযোগিতায় নিজেদেরকে আত্মনিয়োগ করো। দিন-রাত সেই চেষ্ঠা চরিত্রেই লেগে থাকো। যেমন আল্লাহর নবী (সঃ)-এর সঙ্গী-সাথীরা ভাল ভাল এবং নেকীর কাজে প্রতিযোগিতা করতেন।

বিশুদ্ধ হাদীসে এসেছে- একবার মুহাজির (হিজরতকারী) লোকদের মধ্য থেকে গরীব লোকেরা আরয করলো, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! ধনী লোকেরাতো জান্নাতের উচ্চ শ্রেণী ও চিরস্থায়ী নি'য়ামতের অধিকারী হয়ে গেলো। নবীজী (সঃ) প্রশ্ন করলেন ঃ এটা আবার কিভাবে ? উত্তরে তারা

বললো, নামায- রোযা তো তারা ও আমরা সবাই করি। কিন্তু ধন-সম্পদের কারণে তারা বেশী বেশী দান-খয়রাত ও গোলাম আযাদ করে থাকে। কিন্তু আমরা গরীব হবার কারণে একাজগুলো করতে পারিনা। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে বললেন, এসো, আমি তোমাদেরকে এমন একটি আ'মলের কথা শিখিয়ে দিচ্ছি, যদি তোমরা তা করো তাহলে তোমরা সবারই আগে বেড়ে যাবে। তবে তাদের উপর তোমরা প্রাধান্য লাভ করতে পারবে না যারা নিজেরাও এ আ'মল করতে শুরু করে দেবে। তা হলো এই যে, তোমরা প্রত্যেক ফরয নামাযের পর- ৩৩ বার "সুবহান আল্লাহ" ৩৩ বার "আলহামদুলিল্লাহ" এবং ৩৩ বার "আল্লাহু আকবার" পাঠ করবে। কিছু দিন পর ঐ মহান ব্যক্তিরা পুনরায় রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলো, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাদের এই অযীফার খবর আমাদের ধনী ভাইয়েরাও পেয়ে গেছে এবং তারাও এটা পড়তে শুরু করে দিয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা এটা দান করেন। (ইবনে কাসীর)

এজন্যই আল্লাহর অনুগ্রহ, ক্ষমা এবং জান্নাত পাবার আশায় দুনিয়াতে বেশী বেশী ভাল ভাল নেক আ'মল করা। এই কাজেরই প্রতিযোগিতা করা, একে অপরের চেয়ে আগে বেড়ে যাবার জন্য তীব্র ইচ্ছা-আকাংখা পোষণ করা এবং সেই অনুযায়ী আ'মল করা। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমরা এর উল্টোটায় করে থাকি। যেমন 'সূরা তাকাছুরে' এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন- اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ○ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ
"দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্য লাভের লোভ-লালসা তোমাদেরকে এমন ভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে, তোমরা কবরে পৌছে যাও।"(অর্থাৎ মৃত্যু এসে হাযির হয়ে যায়)

অতঃপর পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা দুনিয়ার বিপর্যয়ের কথা উল্লেখ করে বলেন-

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ

পৃথিবীতে কিম্বা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয় আসে, সংঘঠিত হবার পূর্বেই তা কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয়ই আল্লাহর পক্ষে এটা করা খুবই সহজ।

এখানে আল্লাহ তা'য়ালা যে নিজে ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী তার সংবাদ দিচ্ছেন। তিনি মাখলুকাতকে তথা সৃষ্টি জীবকে সৃষ্টি করার পূর্বেই তাদের ভাগ্য নির্ধারণ করে রেখেছেন। এখানে 'কিতাব' বলে ভাগ্যলিপিকে বুঝানো হয়েছে। তিনি বলেন, পৃথিবীর বুকে যে কোন অংশে বা স্থানে যে বিপর্যয় আসে কিম্বা ব্যক্তিগতভাবে কারো উপর কোন বিপদ আসে, তার এই বিশ্বাস রাখা উচিত যে, ওটাই তার জন্য ভাগ্যে বরাদ্ধ ছিলো। কেননা; মাখলুককে সৃষ্টি করার পূর্বেই তাদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়।

সহীহ মুসলিম শরীফে উল্লেখ রয়েছে, "আল্লাহ তা'য়ালা যমীন ও আসমান সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেই তকদীর নির্ধারণ করেন।"

বিপর্যয় সংক্রান্ত এ আয়াত সম্পর্কে ইমাম হাসান (রাঃ) কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, "সুবহান আল্লাহ! প্রত্যেক বিপদ ও বিপর্যয় যা আসমান ও যমীনে সংঘটিত হয়,তা সৃষ্টিজীবের সৃষ্টির বহু পূর্বেই মহান প্রতিপালকের কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। অতএব এতে সন্দেহের কি আছে?"

যমীনের বিপর্যয় হলো- অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, টর্নেডো, জলোচ্ছাস, সুনামী, দুর্ভীক্ষ, মহামারী, ভুমিকম্প ইত্যাদি এবং ব্যক্তিগত জীবনের বিপর্যয় হলো- অভাব-অনটন, দুঃখ-কষ্ট, রোগ-ব্যধি ইত্যাদি।

আয়াতের শেষাংসে মহান আল্লাহ বলেন–

إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ - **নিশ্চয় আল্লাহর পক্ষে এটা করা খুবই সহজ।**

অর্থাৎ কাজে পরিণত হবার পূর্বে এটা জেনে নেয়া, এটা হবার জ্ঞান লাভ করা এবং এটাকে লিখে দেয়া আল্লাহ তা'য়ালার কাছে মোটেই কঠিন নয়। তিনিইতো এসবের সৃষ্টিকর্তা। যা কিছু হয়ে গেছে এবং যা কিছু হবে, সব কিছুই তাঁর সীমাহীন জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।

অতঃপর দারসের তিলাওয়াতকৃত সব শেষ আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন-

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ط وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ-

এটা এইজন্য যে, যা কিছু হারাও বা ক্ষতিগ্রস্থ হও তার জন্য তোমরা হতাশ হয়ে না পড়ো এবং যা কিছু তোমাদের আল্লাহ দিয়েছেন তার জন্য উল্লাসে ফেটে না পড়ো। আল্লাহ কোন উদ্বত অহংকারীকে পছন্দ করেন না।

এই আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, এ খবর আমি তোমাদেরকে এজন্যই দিলাম যে, তোমাদের উপর যে বিপদ-আপদ, বালা-মুসিবত অথবা সুখ-শান্তি, আনন্দ যা কিছুই আসুক না কেন তা সবই কিতাবে তথা ভাগ্যলিপিতে মানুষের জন্মের পূর্বেই লিখে রাখা হয়েছে। এটা টলাবার বা নড়চড় করার কোনই সুযোগ নেই এই বিশ্বাস যেন তোমাদের অন্তরে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল থাকে। কঠিন বিপদ-আপদের সময়ও যেন তোমাদের মধ্যে ধৈর্য, সহনশীলতা, স্থীরতা এবং রূহানী শক্তি বিদ্যমান থাকে। তোমরা যেন এর জন্য হা-হুতাশ না করো এবং অধৈর্য হয়ে না পড়ো। তোমাদের মনে যেন এটাই বিদ্যমান থাকে যে, এ বিপদ আসারই ছিলো। অনুরূপভাবে যদি তোমরা ধন-সম্পদের অযাচিত ভাবে মালিক হয়ে যাও অথবা বিজয় লাভ করো তা হলে গর্ব-অহংকারে যেন তোমরা ফেটে না পড়ো। এমন যেন না হয় যে, ধন-সম্পদ এবং সুখ-শান্তি লাভের কারণে আল্লাহকে ভুলে বসো। আল্লাহর স্বরণ এবং পরকাল সম্পর্কে গাফিল বা অমনোযোগী হয়ে না যাও।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, প্রত্যেক মানুষ স্বভাবগতভাবে কোনো কোনো বিষয়ের কারণে আনন্দিত হয় এবং কোনো কোনো বিষয়ের কারণে দুঃখিত হয়। কিন্তু যা উচিত তা এই যে, বিপদের সম্মুখীন হলে ধৈর্য ধারণ করে আখিরাতের পুরস্কার ও সওয়াব অর্জন করা এবং সুখ ও আনন্দের সম্মুখীন হলে কৃতজ্ঞ হয়ে পুরস্কার ও সওয়াব অর্জন করা। (রুহুল মা'য়ানী)

আয়াতের শেষাংসে সুখ-শান্তি ও ধন-সম্পদের প্রাচুর্য এবং বিজয়ের কারণে উদ্ধত ও অহংকারকারীদের নিন্দা করে বলা হয়েছে-

وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ-

আর আল্লাহ তা'য়ালা কোন উদ্ধত গর্ব-অহংকারকারীকে পছন্দ করেন না।

অর্থাৎ দুনিয়াতে যারা আল্লাহর নি'য়ামত, সুখ-শান্তি ও বিজয় লাভ করে অহংকার করে, তারা আল্লাহর কাছে ঘৃণার পাত্র। আল্লাহ এদেরকে মোটেই পছন্দ করেন না।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে উদ্ধত অহংকারী হতে বাঁচিয়ে সর্বক্ষেত্রে সকল অবস্থায় তোমরাই কৃতজ্ঞ ও অনুগত বান্দাহ বানিয়ে দাও।আমীন!

শিক্ষাঃ সূরা হাদীদের ২০ থেকে ২৩ নম্বর আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে যেসব শিক্ষনীয় বিষয় পাওয়া যায়, তা হলো –

o দুনিয়ার জীবনের ক্রীড়া-কৌতুক, খেল-তামাশা, চাকচিক্য, সাজ-গোজ, গর্ব-অহংকার, অর্থ-সম্পদ, ছেলে-মেয়ে, ঐশ্বর্য-বৈভব এসব কিছুই একটা অসার প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং আমাদের উচিত হবে এসব অসার, ক্ষণস্থায়ী প্রতিযোগিতায় নেমে না পড়া এবং এসব প্রাচুর্যের কারণে গর্ববোধ না করা। বরং দুনিয়ার জীবনের পরবর্তী দু'টি জগত বরযখ বা কবরের জীবন এবং স্থায়ী জীবন আখিরাতের চিন্তা করা। কেননা, আখিরাতের জিবনই হলো আসল এবং স্থায়ী জীবন।

o দুনিয়ার জীবনটা এরকমই অসার, সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী যার উদাহরণ এমন-দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর এক পশলা বৃষ্টির কারণে মাঠে চোখ জুড়ানো সবুজ-শ্যামল ফসল, শাক-সবুজী, গাছ-পালা উৎপন্ন হয়, যা দেখে চাষীদের আনন্দে বুক ভরে যায়। কিন্তু পরিশেষে তা শুকিয়ে পীতবর্ণ হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত তা খড়-কুটোই পরিণত হয়ে যায়। অনুরূপ মানুষের জীবনও তাই, প্রথমে তরু-তাজা ও সুন্দর-শুশ্রী হয়। শিশুকাল থেকে যৌবন কাল পর্যন্ত এরকমই চলে। অবশেষে যখন বার্ধক্য আসে, তখন দেহের সজীবতা ও সৌন্দর্য সম্পূর্ণভাবে বিলীন হয়ে যায় এবং পরিশেষে মরে মাটি হয়ে যায়। অর্থাৎ সবুজ-শ্যামল ফসল যেমন শেষ পর্যন্ত মরে খড়-কুটোয় পরিণত হয়। তেমনি যৌবনের রূপ-সৌন্দর্যে ভরা মানুষের দেহও এক সময় মরে মাটি হয়ে যায়।

o দুনিয়ার অসার ও ক্ষণস্থায়ী জীবনের বিপরীত হলো, চিরস্থায়ী জীবন পরকাল। যেখানে আছে পাপী দুনিয়াদারদের জন্য কঠিন শাস্তি। আর আছে নেককার মুমিনদের জন্য আল্লাহর ক্ষমা, সন্তুষ্টি ও ভালবাসা। প্রকৃতপক্ষে চোখ জুড়ানো ও মন ভুলানো দুনিয়ার চাকচিক্য ধোঁকা ও প্রতারণার বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং মানুষের উচিত হবে দুনিয়ার সুখ ও আনন্দে মগ্ন না হয়ে পরকালীন জীবনের বেশী বেশী চিন্তা ফিকির করা।

o দুনিয়ার অসার ও ক্ষণস্থায়ী ধন-সম্পদ, বাড়ি-গাড়ি গড়ার কাজে প্রতিযোগিতায় আত্মনিয়োগ না করে বরং পরকালীন সুখ-শান্তি এবং

দুনিয়া বরাবর জান্নাত পাবার আসায় পরস্পর প্রতিযোগিতায় আত্মনিয়োগ করা। নেক ও সৎ কাজের জন্য প্রতিযোগিতা করা। সৎ কাজে একে অপরের চেয়ে বেড়ে যাবার চেষ্টা করা। যেমন- হযরত আলী (রাঃ) তাঁর উপদেশ বাণীতে বলেন- "তুমি মসজিদে সর্বপ্রথম আগমনকারী এবং সর্বশেষ নির্গমনকারী হও"। হযরত আব্দুলুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, "জিহাদে সর্বপ্রথম কাতারে থাকার জন্য অগ্রসর হও"। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, "জামায়াতে নামাযে প্রথম তাকবীরে উপস্থিত হওয়ার চেষ্টা করো"। এভাবে যতো নেক, ভাল ও সৎ কাজ আছে তাতে একে অপরের চেয়ে বেশী অগ্রসর হবার প্রতিযোগিতা করা একজন খাঁটি মুমিনের কাজ। কেননা, আল্লাহ ও রাসূলে বিশ্বাসী, সৎ ও নেক আ'মলের প্রতিযোগিদের জন্যেই এই নি'য়ামতে পরিপূর্ণ বিশাল জান্নাত প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে, যা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ও দান।

০ দুনিয়াতে এবং ব্যক্তিগতভাবে যেসব বিপর্যয় ও বিপদ-আপদ আসে তা হঠাৎ করে আসে না, তা সংঘটিত হবার বহু পুর্বেই ভাগ্যলিপিতে লিখা আছে। মানুষ যদি এই ভাগ্যলিপির বিষয়ে পূর্ণ ঈমান রাখে। তাহলেই বিপদ আপদের সময় বিচলিত হয়ে পড়বে না। যারা বিচলিত হয়ে পড়ে তারা প্রকৃতপক্ষে মুমিন নয়।

০ দুনিয়ার জীবনে যদি কোন ক্ষয়-ক্ষতি হয় কিম্বা কোন বিপদ-আপদ এসে পড়ে তাহলে তার জন্য যেমন হা-হুতাশ করা যাবে না, তেমনি সুখ-শান্তি ও বিজয়ের জন্য অতি আনন্দে উল্লোসিত হয়ে গর্ব অহংকার করাও যাবে না। কেননা, মুমিনদের এটা বৈশিষ্ট্য নয়। বরং মুমিনদের জন্য করণীয় হবে যখন দুনিয়ায় বিপর্যয় দেখবে কিম্বা ব্যক্তিগত জীবনে বিপদ-আপদে পড়বে তখন ধৈর্য ধারণ করবে এবং আল্লাহর সাহায্য কামনা করবে। আর যখন সুখ-শান্তি আসবে কিম্বা কোন বিজয় হবে তখন আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে এবং নিজের ক্রুটির জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে। সুখ-শান্তি, আনন্দ ও বিজয়ের জন্য আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে আত্মতৃপ্তি বোধ করাই হলো গর্ব-অহংকার। আর আল্লাহ গর্ব-অহংকারকারীদেরকে মোটেই ভালবাসেন না।

আহ্বানঃ দারসে কুরআন মাহফিলে/অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা ও বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা হাদীদের ২০ থেকে ২৩ নম্বর আয়াতের দারস পেশ করা হলো, এতে যদি আমার অজান্তে কোন ভুল-ত্রুটি কিম্বা বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, তার জন্য আমি মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর এই দারস থেকে আমরা যেসব শিক্ষা লাভ করলাম তা যেন বাস্তব জীবনে আ'মল করতে পারি সেই তাওফীক কামনা করে দারস শেষ করছি। অয়াআখিরু দাওয়ানা আনিল হামদু লিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন।

ছয়

মানুষের কতিপয় নৈতিক দোষ-ত্রুটি ও তার পরিণতি

সূরা - হুমাযাহ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ۙ ۝ الَّذِيْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۝
يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗٓ اَخْلَدَهٗ ۝ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ ۝
وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝ نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ۝ الَّتِيْ تَطَّلِعُ
عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ۝ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۝ فِيْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝

সরল অনুবাদ ঃ ইরশাদ হচ্ছে- (১) এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য নিশ্চিত ধ্বংস, যে সামনাসামনি লোকদের নিন্দা করে এবং অসাক্ষাতে দোষ-ত্রুটি প্রচার করে বেড়ায়। (২) আর যে অর্থ-সম্পদ জমা করে ও গুনে গুনে রাখে। (৩) সে মনে করে যে, তার এ অর্থ-সম্পদ তাকে অমর (চিরজীবী) করে রাখবে। (৪) কক্ষণও নয়, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায়। (৫) (হে নবী) আপনি কি জানেন, হুতামাহ কি? (৬) এটা হলো আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত আগুন, (৭) যা দিল পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। (৮) নিশ্চয় তা তাদের উপর ঢেকে বন্ধ করে দেয়া হবে (৯) এবং উঁচু উঁচু খুঁটি বা স্তম্ভে তাদেরকে বেঁধে দেয়া হবে।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ وَيْلٌ -ধ্বংস। لِكُلِّ -প্রত্যেকের জন্যে। هُمَزَةٍ - সামনাসমনি নিন্দাকারী। لُمَزَةٍ -অসাক্ষাতে দোষ-ত্রুটি প্রচারকারী। اَلَّذِىْ -যে বা যিনি। جَمَعَ -জমা করেছে। مَالًا -অর্থ-সম্পদ। وَعَدَّدَهٗ -এবং তা গুনে গুনে রাখে। يَحْسَبُ -সে মনে করে। اَنَّ -যে। مَالَهٗ - তার অর্থ-সম্পদ। اَخْلَدَهٗ -তাকে অমর বা চিরজীবী করে রাখবে। كَلَّا -

কক্ষণও নয়। لَيُنْبَذَنَّ -সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে। فِى -মধ্যে। الْحُطَمَةِ -চূর্ণ-বিচূর্ণকারী (জাহান্নামের একটি স্তরের নাম)। مَا -কি। أَدْرٰكَ -আপনি জানেন। مَا الْحُطَمَةُ -চূর্ণ-বিচূর্ণকারী স্থান কি? نَارُ اللهِ -আল্লাহর আগুন। الْمُوْقَدَةُ -প্রজ্জলিত বা উত্তপ্ত-উৎক্ষিপ্ত। الَّتِى -যা। تَطَّلِعُ -পৌছে যাবে। عَلَى -উপর। الْاَفْئِدَةِ -অন্তরসমূহে। اِنَّهَا -নিশ্চয়ই তা। عَلَيْهِمْ -তাদের উপর। مُؤْصَدَةٌ -ঢেকে দেয়া হবে। عَمَدٍ -স্তম্ভ বা খুঁটিসমূহ। مُمَدَّدَةٍ -উঁচু উঁচু বা লম্বা লম্বা।

সম্বোধন ঃ দারসে কুরআন মাহফিলে/অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় দ্বীনি ভাইয়েরা ও বোনেরা! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আমি আপনাদের সামনে দারস পেশ করার জন্য পবিত্র কুরআনের আম্মাপারার ছোট্ট সূরাসমূহের মধ্য থেকে একটি সূরা 'সূরা হুমাযাহ' তিলাওয়াত ও সরল অনুবাদ পেশ করেছি। আল্লাহ পাক যেন আমাকে আপনাদের সামনে সঠিক ভাবে দারস পেশ করার তাওফীক দান করেন। "অমা তাওফীকি ইল্লাবিল্লাহ।"

সূরার নামকরণ ঃ অন্যান্য সূরার ন্যায় এই সূরাটিরও নামকরণ করা হয়েছে প্রতীকী বা চিহ্ন হিসেবে। সূরার প্রথম আয়াতে উল্লেখিত همزه শব্দ থেকেই এর নামকরণ করা হয়েছে। همزة -শব্দের অর্থ সামনাসামনি নিন্দা করা বা ধিক্কার দেয়া।

সূরাটি নাযিলের সময়কাল ঃ সমস্ত তাফসীরকারকগণই এ ব্যাপারে একমত যে, সূরাটি মাক্কী। তাছাড়া এর বিষয়বস্তু ও বাচনভঙ্গীর প্রতি লক্ষ্য করলে প্রতিয়মান হয় যে, এই সূরাটিও নবী করীম (সঃ) এর মাক্কী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ।

সূরাটির বিষয়বস্তু ঃ ইসলাম পূর্বযুগে জাহিলিয়াতের যামানায় আরব সমাজের অর্থলিপ্সু বা অর্থপূজারী ধনী লোকদের মধ্যে কতগুলো মারাত্মক ধরনের নৈতিক ত্রুটি ও দোষ বিদ্যমান ছিলো। এই সূরায় তারই বিভৎসতা উল্লেখ করে তার প্রতিবাদ করা হয়েছে। তাদের নৈতিক ত্রুটি ও দোষের প্রথমটি ছিলো, তারা মানুষকে সামনাসামনি গালমন্দ করতো, বিদ্রুপ করতো এবং ধিক্কার দিয়ে অপমান অপদস্ত করতো। তাদের দ্বিতীয় নৈতিক ত্রুটি ও দোষ ছিলো, তারা অসাক্ষাতে বা পেছনে মানুষের বদনাম করতো, নিন্দা-মন্দ করতো এবং গীবত করতো। তৃতীয় যে নৈতিক দোষ বা ত্রুটি

ছিলো, তা হলো- তারা ছিলো অত্যন্ত অর্থলিপ্সু বা অর্থপূজারী। তারা যেভাবেই হোক অর্থ উপার্জন করতো, জমা করে রাখতো এবং তা বার বার গুনে গুনে দেখতো। তারা মনে করতো যে, এই অর্থ-সম্পদই তাদেরকে অমর বা চিরস্থায়ী করে রাখবে। আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদের এই নৈতিক ত্রুটি ও দোষের প্রতিবাদ করেছেন এবং তাদের কঠিন পরিণতির কথাও এই সূরায় উল্লেখ করেছেন।

ব্যাখ্যাঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা ও বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনাদের সামনে 'সূরা হুমাযাহ' এর সরল অনুবাদসহ ব্যাখ্যার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য পেশ করলাম যা দারস বুঝার জন্য সহায়ক হবে। এখন আমি আপনাদের সামনে 'সূরা হুমাযাহ' এর ব্যাখ্যা ধারাবাহিকভাবে পেশ করছি।

সূরার শুরুতেই মানুষের নৈতিক দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন- وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

চরম দুর্ভোগ যা ধ্বংস এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য, যে সামনাসামনি মানুষকে ধিক্কার দেয় কিম্বা গালমন্দ করে আর অসাক্ষাতে বা পেছনে দোষ-ত্রুটি প্রচার করে বেড়ায়।

وَيْلٌ -মানে ধ্বংস। এই ধ্বংশ বলতে পরকালের ধ্বংস বা বিপর্যয় কিম্বা দূর্ভোগের কথাই বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে পরকালের তুলনায় দুনিয়ার ধ্বংশ বা বিপর্যয় কোন ধ্বংশ কিম্বা বিপর্যয় নয়। সুতরাং এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আখিরাতের বিপর্যয় যাদের মধ্যে নিম্নে উল্লেখিত মারাত্মক ধরনের নৈতিক ত্রুটি ও দোষ বিদ্যমান থাকবে। তার মধ্যে প্রথম দু'টি দোষ বা ত্রুটি হলো- هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

যারা সামনাসামনি গাল মন্দ করে কিম্বা ধিক্কার দেয় আর অসাক্ষাতে বা পেছনে পরনিন্দা বা গীবত করে বেড়ায়।

আরবী 'হুমাযাহ' 'লুমাযাহ' শব্দ দু'টি অর্থের দিক দিয়ে প্রায় সমর্থবোধক। অর্থের দিক দিয়ে শব্দ দু'টি এতই কাছাকাছি যে, কখনও কখনও শব্দ দু'টি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়, আবার কখনও কখনও শব্দ দু'টির মধ্যে পার্থক্য করা হয়। কিন্তু সেই পার্থক্যও এমন যে, স্বয়ং আরবী ভাষা-ভাষীরা 'হুমাযাহ' এর যে অর্থ বলেন, অন্য কিছু লোক ঠিক সেই অর্থই

বলেন 'লুমাযাহ' শব্দের। পক্ষান্তরে 'লুমাযাহ' এর যে অর্থ করেন, অন্য লোকের মতে উহাই হলো 'হুমাযাহ' এর অর্থ। এইজন্য তাফসীরকারকদের মধ্যেও 'হুমাযাহ' ও 'লুমাযাহ' এর অর্থের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) هُمَزَةٍ শব্দের অর্থ করেছেন সামনাসামনি খোটা দানকারী এবং لمزة শব্দের অর্থ করেছেন পেছনে গীবত কারী।

হযরত রবী ইবনে আনাস (রাঃ) বলেন, সামনে মন্দ বলাকে هُمَزَةٍ বলা হয় এবং অসাক্ষাতে নিন্দা করাকে لُمَزَةٍ বলা হয়।

হযরত কাতাদাহ (রহঃ) বলেন,এর ভাবার্থ হলো- মুখের ভাষায় এবং চোখের ইশারায় আল্লাহর বান্দাদেরকে কষ্ট দেয়া।

মুজাহীদ (রহঃ) বলেন, هُمَزَةٍ এর অর্থ হলো-হাত এবং চোখ দ্বারা কষ্ট দেয়া এবং لُمَزَةٍ এর অর্থ হলো মুখ বা জিহ্বা দ্বারা কষ্ট দেয়া।

(ইবনে কাসীর)

সূরার প্রথমেই মানুষের নৈতিক ত্রুটি এবং বদ অভ্যাসের এই শব্দ দু'টি একসঙ্গে একই স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। এ কারণে উভয়ের মিলিতভাবে এই অর্থ প্রকাশ করে যে, যে ব্যক্তির অভ্যাসই হলো অন্য লোকদের ঘৃণা ও অপমান-অপদস্ত করা। কাউকেই পেলে অমনি আঙ্গুল দিয়ে সংকেত দেয়া এবং চোখ দিয়ে কটাক্ষ করা। কারও বংশের উপর অভিশাপ দেয়া এবং কলঙ্কিত করা। কারও ব্যক্তি চরিত্রে দোষ বের করা। কাউকেও সামনা সামনি আঘাত করা। কারও অনুপস্থিতিতে তার দোষ রটিয়ে বেড়ানো। চোগলখুরী ও কুটনাগিরি করা। একজনের কথা অন্য জনকে বলা। একজনের বিরুদ্ধে অন্যজনকে উত্তেজিত করে বন্ধুকে শত্রু বানানো। কোথাও ভাইদের মধ্যে বিবাদ বাধিয়ে দেয়া। লোকদের খারাপ নাম রাখা, বিদ্রুপ করা এবং কলঙ্ক রটানো, সেইসব লোকদের বদ অভ্যাস সম্পর্কেই এখানে বলা হয়েছে, যা অত্যন্ত গর্হিত এবং জঘণ্য অপরাধমূলক কাজ। ফলে এর শাস্তিও অত্যন্ত কঠিন। এদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে যে, তাদের ধ্বংশ নিশ্চিত।

সূরা হুজুরাতের ১২ নং আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ط اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ-

"আর তোমরা কেউ কারও গোপনীয় বিষয় খুঁজে বেড়িয়ে না এবং কেউ কারও অসাক্ষাতে গীবত করো না। তোমাদের কেউ কি তার মরা ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? অথচ তোমরা তা ঘৃণাই করো।"

হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন–

شرا عباد الله تعلى المشاؤن بالنميمة المفرقون بين الاحبة الباغون للبراء العنت

"আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম তারা, যারা পরোক্ষ (পশ্চাতে) নিন্দা করে, বন্ধুদের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে এবং নিরাপরাধ লোকদের দোষ খুঁজে বেড়ায়।"

হাদীসে আরও উল্লেখ রয়েছে–

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّمِيْمَةِ وَنَهٰى عَنِ الْغِيْبَةِ وَعَنِ الْاِسْتِمَاعِ الْغِيْبَةِ-

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) চোগলখোরী করতে নিষেধ করেছেন, অনুরূপভাবে তিনি গীবত বলতে ও শুনতেও নিষেধ করেছেন।" (সহীহ বুখারী)

চোগলখোরী ও গীবতের পরিণতি সম্পর্কে মহানবী (সঃ) বলেন–

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ

"হযরত হুযায়ফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ চোগলখোর ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।"

(সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলীম)

তৃতীয় যে নৈতিক ত্রুটি বা দোষ তা উল্লেখ করে মহান আল্লাহ বলেন–

اَلَّذِىْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ○ يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗ اَخْلَدَهٗ

যে অর্থ-সম্পদ জমা করে এবং তা গুনে গুনে রাখে। আর মনে করে যে, তার এই অর্থ-সম্পদ তাকে অমর বা চিরঞ্জীব করে রাখবে।

অর্থাৎ মানুষের তৃতীয় যে নৈতিক দোষ-ত্রুটি এবং বদ অভ্যাস তা হলো অর্থ লিপ্সা বা অর্থপূজা।

এ আয়াতে একে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, অর্থলিপ্সা বা অর্থপূজার কারণে সে তা বারবার গুনে গুনে দেখে আর মনে করে যে, এ অর্থই তাকে অমর বা চিরঞ্জীব করে রাখবে। অর্থাৎ তার এই পুঞ্জীকৃত অর্থ-সম্পদ তাকে চিরস্থায়ী জীবন দান করবে, তাকে চিরকাল বাঁচিয়ে রাখবে এবং রক্ষা করবে।

আল্লাহর বিধান হলো- প্রত্যেক মানুষই ক্ষণস্থায়ী, চিরঞ্জীব নয়। যখন তার বিদায়ের ঘন্টা বেজে যাবে তখন কোন শক্তিই তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

অথচ অর্থ ও ধন-সম্পদ সঞ্চয় করা এবং তা গুনে গুনে হিসাব রাখার কাজে সে এতই মশগুল যে, তাকে যে মরতে হবে সেকথাও সে বেমা'লুম ভুলে গেছে। মরার কথা তার স্মৃতি থেকে মুছে গেছে। তাকে যে এসব কিছু ছেড়েছুড়ে এ দুনিয়া থেকে চিরদিনের তরে খালি হাতে বিদায় নিয়ে চলে যেতে হবে, সে কথাও কোন এক মুহূর্তের জন্যও তার স্মরণে আসে না।

যাদের মধ্যে উপরোক্ত এই তিনটি বড় বড় নৈতিক ত্রুটি ও দোষ রয়েছে তাদের ভয়াবহ পরিণতি বর্ণনা করে মহান আল্লাহ বলেন-

كَلَّا لَيُنۢبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ -

কক্ষণও নয়, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায়।

حُطَمَةُ - আরবী শব্দটির মূল শব্দ হলো- حُطَمٌ - এর অর্থ হলো-ভেঙ্গে ফেলা, চূর্ণবিচূর্ণ করা ও নিস্পেষিত করা।

জাহান্নামের সাতটি স্তর বা নামের মধ্যে 'হুতামাহ' হলো একটি স্তর বা নাম। এর নাম এই জন্যই রাখা হয়েছে যে, তাতে যাই নিক্ষিপ্ত হবে, তার সীমাহীন গভীরতা এবং আগুনের প্রজ্জ্বলন ও প্রচন্ডতা দ্বারা তাকে ছিন্নভিন্ন এবং চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলবে।

لَيُنۢبَذَنَّ -শব্দটি نَبْذٌ শব্দ থেকে উৎপন্ন। যার অর্থ হলো-কোন জিনিসকে নীচ বা হীন ও নগণ্য মনে করে ফেলে দেয়া, নিক্ষেপ করা। সুতরাং এ

থেকে বুঝা যায় যে, যে প্রত্যক্ষ বা সামনাসামনি ধিক্কার দেয়, পেছনে বা অসাক্ষাতে গীবত বা পরনীন্দা করে বেড়ায় এবং অর্থ-সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলে নিজেকে একজন ধনী মনে করে কিয়ামতের দিন এসব লোককে অত্যন্ত ঘৃণাভরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

অতঃপর মহান আল্লাহ তা'য়ালা 'হুতামাহ' নামক জাহান্নামের ভয়াবহাতা ও প্রচন্ডতা সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে প্রশ্নাকারে নবীজী বলেন–

وَمَآ اَدْرٰكَ مَا الْحُطَمَةُ -তুমি কি জান, হুতামাহ (চূর্ণবিচূর্ণকারী) কি?

প্রতিউত্তরে আল্লাহ নিজেই হুতামাহর বর্ণনা দিয়ে বলেন–

نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ۝ الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْئِدَةِ

তা হলো আল্লাহর প্রজ্জলিত আগুন। যা (মানুষের) অন্তর বা দিল পর্যন্ত পৌছে যাবে।

এখানে হুতামাহ নামক জাহান্নামের আগুনকে 'আল্লাহর আগুন' বলা হয়েছে। আল কুরআনে এ স্থান ছাড়া আর কোন স্থানেই জাহান্নামকে 'আল্লাহর আগুন' বলা হয়নি। এখানে 'আল্লাহর আগুন' বলার মাধ্যমে একদিকে যেমন তার ভয়াবহতা প্রকাশিত হয়েছে অপরদিকে তেমনি সেই সঙ্গে এ কথাও জানা যাচ্ছে যে, যারা মানুষকে সাক্ষাতে বা সামনাসামনি ধিক্কার এবং গালাগালি দিয়ে অপমান-অপদস্ত করে, পেছনে বা অসাক্ষাতে কুৎসা রটিয়ে এবং গীবত করে অপরের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করে, আর অগাধ অর্থ-সম্পদের মালিক বলে নিজেকে বড় মনে করে গর্ব-অহংকারে নিমজ্জিত হয়, আল্লাহ তাদেরকে অত্যন্ত ঘৃণা করেন এবং কিয়ামতের দিন তাদের প্রতি অত্যন্ত তীব্র ক্রোধের দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন। আর এই কারণেই তিনি তাদেরকে যে আগুনে নিক্ষেপ করবেন- সেই আগুনকে নিজের আগুন বলে অবহিত করেছেন।

تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْئِدَةِ এর تَطَّلِعُ শব্দটি اِطَّلَعَ হতে এসেছে। এর দু'টি অর্থের একটি অর্থ হলো- উদয় হওয়া, উপরে পৌছে যাওয়া। আর দ্বিতীয় অর্থ হলো- অবগত হওয়া, খবর পাওয়া।

اَفْئِدَةٌ - শব্দটি বহুবচন। এর একবচন শব্দ হলো- فُؤَادٌ যার অর্থ- দিল বা হৃদয় বা অন্তর। বুকের মধ্যে সদাসর্বদা স্পন্দনকৃত হৃৎপিন্ডকে

'ফুয়াদ' বলা হয় না। বরং মানুষের চেতনা-অনুভূতি, আবেগ-উচ্ছাস, কামনা-বাসনা, আকিদা-বিশ্বাস, চিন্তাধারা, ইচ্ছা ও মনমানসিকতার উৎস মুখ ই হলো 'ফুয়াদ'। এর কয়েকটি অর্থ করা যেতে পারে। যেমন–

প্রথম অর্থ ঃ মানুষের খারাপ চিন্তা-চেতনা, ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস, অশ্লীল কামনা-বাসনা ও আবেগ-উচ্ছাস এবং প্রখর খারাপ ইচ্ছা-বাসনার কেন্দ্রস্থল পর্যন্ত এই আগুন পৌছে যাবে।

দ্বিতীয় অর্থ ঃ আল্লাহর সেই আগুন দুনিয়ার আগুনের ন্যায় অন্ধ ও বিবেচনাহীন হবে না। যে লোক আগুনের শাস্তি পেতে পারে, আর যে পেতে পারে না, এমন সকলকেই সেই আগুন সমানভাবে জ্বালাবে না। বরং তা এক একজন পাপীর অন্তর বা দিল পর্যন্ত পৌছে যাবে এবং তার প্রাপ্য পরিমান আযাব দেবে।

তৃতীয় অর্থ ঃ সাধারণত দুনিয়ার আগুনের বৈশিষ্ট্য হলো, তাতে যা কিছুই নিক্ষিপ্ত হবে তা সবই জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। মানুষও তাতে নিক্ষিপ্ত হলে তার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ হৃদয়ও জ্বলে-পুড়ে যাবে।

এখানে জাহান্নামের আগুনের এই বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করার কারণ হলো এই যে, দুনিয়ার আগুন মানুষের দেহে লাগলে হৃদয় বা অন্তর পর্যন্ত পৌছার আগেই মানুষের মৃত্যু হয়ে যায়। কিন্তু জাহান্নামে মৃত্যু হবে না। বরং তাতে জীবিত অবস্থায় হৃদয় পর্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক আযাব দেয়া হবে। অর্থাৎ জাহান্নামের আগুন তাকে জ্বালিয়ে ছাই করে দেবে কিন্তু তার মৃত্যু হবে না।

হযরত সাবিত বানানী (রহঃ) এ আয়াত তিলাওয়াত করে যখন এর অর্থ বর্ণনা করতেন, তখন কেঁদে ফেলতেন এবং বলতেন, "আল্লাহর আযাব তাদেরকে ভীষণ যন্ত্রণা দিয়েছে।"

মুহাম্মদ ইবনে কা'ব (রহঃ) বর্ণনা করেন, "প্রজ্জ্বলিত আগুন কণ্ঠনালী পর্যন্ত পৌছে যায়, তারপর ফিরে আসে, আবার পৌছে"।

অতঃপর আল্লাহ তা'য়ালা আয়াতের পরবর্তী অংশে বলেন–

إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ **-অবশ্যই তা তাদের উপর ঢেকে বন্ধ করে দেয়া হবে।**

অর্থাৎ অপরাধীদের কঠোর শাস্তি দেয়ার জন্য জাহান্নামে নিক্ষেপের পর ভাতের চাল দ্রুত সিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে উত্তাপ বৃদ্ধির জন্য যেমন হাঁড়ির মুখ ঢাকনা দিয়ে ঢেঁকে দেয়া হয়, তেমনি জাহান্নামের আগুনের উত্তাপের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে উপর হতে তার মুখ ঢাকনা দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হবে। কোন দুয়ার বা জানালা খোলা থাকাতো দূরের কথা সামান্যতম একটি ছিদ্র পর্যন্তও খোলা থাকবে না।

সূরার সবশেষে মহান আল্লাহ তা'য়ালা জাহান্নামীদের জাহান্নামে আটকিয়ে রাখা সম্পর্কে বলেন–

فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ -তাদেরকে উঁচু উঁচু খাম্বায় বা খুঁটিতে বেঁধে দেয়া হবে।

এই আয়াত বা বাক্যাংশের কয়েকটি অর্থ হতে পারে। যেমন–

প্রথম অর্থ হলো- জাহান্নামের দরজাসমূহ উপর থেকে বন্ধ করে দেয়ার পর উপরের দিকে বড় বড় খাম্বা বা স্তম্ভ বসিয়ে দেয়া হবে।

দ্বিতীয় অর্থ হলো- অপরাধী লোকদেরকে উঁচু উঁচু খাম্বা বা খুঁটির সাথে বেঁধে রাখা হবে।

তৃতীয় অর্থ হলো- সেই আগুনের লেলিহান শিখা লম্বা লম্বা খুঁটি বা স্তম্ভের ন্যায় উপর দিকে উঠতে থাকবে। এই অর্থ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) করেছেন। (তাফহীমুল কুরআন)

عَمَدٍ -এর অর্থে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, এসব জাহান্নামীদের ঘাড়ে শিকল বাঁধা থাকবে। লম্বা লম্বা স্তম্ভের মধ্যে আবদ্ধ করে তাদের উপর থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। সেই আগুনের লেলিহান শিখা বা স্তম্ভের মধ্যে তাদেরকে নিকৃষ্ট ধরনের শাস্তি দেয়া হবে।

আবু সালিহ (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে, তাদের জন্যে ভারী বেড়ী এবং শিকল থাকবে। তাতে তাদেরকে বন্দী করে দেয়া হবে।

(তাফসীরে ইবনে কাসীর)

শিক্ষা ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা ও বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে 'সূরা হুমাযাহ' এর কিছু তথ্যসহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেশ করা হলো। এসব ব্যাখ্যা থেকে আমাদের জন্য যেসব শিক্ষনীয় রয়েছে তা হলো–

০ আল্লাহর নিকট অত্যন্ত অপ্রিয়, আখিরাতকে ধ্বংশকারী নৈতিক-দোষ-ত্রুটি ও বদ অভ্যাস থেকে সদাসর্বদা দূরে থাকতে হবে।

০ মানুষ কষ্ট পায় অথবা অপমানিত হয় এমন আচরণ যেমন-সামনাসামনি গালাগাল করা বা ধিক্কার দেয়া কিম্বা তিরস্কার করা থেকে দূরে থাকতে হবে। চোখ বা হাতের ইশারা-ইঙ্গিতে অপমানকর কোনো অঙ্গভঙ্গি করা থেকে দূরে থাকতে হবে।

০ মানুষের অগোচরে, পশ্চাতে কিম্বা পেছনে গীবত করা যাবে না। পরনিন্দা-পরচর্চা করা যাবে না। দোষ প্রচার করা যাবে না এবং শোনাও যাবে না। যদি কেউ কারও গীবত করে তবে তার কাছ থেকে সরে যেতে হবে কিম্বা গীবত করা থেকে বাঁধা দান করতে হবে। কেননা, গীবত, পরনিন্দা, পরচর্চা করা এবং শোনা একই অপরাধ। এর শাস্তিও কঠিন।

০ অর্থ-সম্পদ সংগ্রহের জন্য সবকিছুকে ত্যাগ করে আত্মনিয়োগ করা যাবে না। অর্থই সবকিছুর মূল মনে করে তার পেছনেই সারাজীবন ছুটা যাবে না এবং জমাকৃত অর্থ-সম্পদ বার বার গুনে গুনে দেখা যাবে না। কেননা, এতে মানুষকে কৃপণ বানিয়ে দেয়। তাছাড়া অর্থ-সম্পদ সঞ্চয় এবং পুঞ্জিভূত করার জন্য আল্লাহ, রাসূল এবং পরকাল ভুলে যাওয়া যাবে না। কেননা, অর্থ-সম্পদ আল্লাহকে ভুলিয়ে দেয়, মৃত্যুর স্মরণ থেকে বেখিয়াল করে দেয়, ব্যক্তির মধ্যে ধনী ধনী ভাব সৃষ্টি করে অহংকারী করে দেয়। যা আল্লাহর নিকট অত্যন্ত অপ্রিয় এবং গর্হিত অপরাধ।

০ পুঞ্জিকৃত অর্থ-সম্পদকেই মানুষের জীবন-মরণ মনে করা যাবে না। কেননা, টাকা-পয়সা, অর্থ-সম্পদ মানুষকে অমর করে রাখতে পারে না। চিরজীবন দান করতে পারে না। মানুষ মরণশীল, তাকে মরতেই হবে। কোন কিছুই তাকে তার মরণ থেকে বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না। মৃত্যুর সময় হলে এক মুহুর্তের জন্যও কেউ মরণকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

০ সামনাসামনি গালমন্দ করা, ধিক্কার দেয়া, কিম্বা অপমানকর কোন মন্তব্য করা এবং পেছনে বা অসাক্ষাতে গীবত, পরনিন্দা, পরচর্চা করা, দোষ-ত্রুটি প্রচার করে বেড়ানো এবং অর্থলিপ্সু বা অর্থপূজায় সবকিছু ভুলে সারা জীবন অর্থের পেছনে ঘুরে বেড়ানো, অগাধ অর্থ-সম্পদের মালিক হয়ে

ধনী ধনী ভাব সৃষ্টি হয়ে অহংকার করা ও অর্থ-সম্পদকেই জীবনের সবকিছু মনে করা-এসব অনৈতিক কার্যক্রমের জন্য পরকালে কঠিন শাস্তি রয়েছে। যাদের স্থান হবে চূর্ণবিচূর্ণকারী হুতামাহ নামক জাহান্নামে। যার আযাবও অত্যন্ত কঠিন। সুতরাং পরকালের কঠিন আযাব থেকে বাঁচার জন্যই উপরে উল্লেখিত হুকুকুল ইবাদ (বান্দার অধিকার) এবং হুকুকুল্লাহ (আল্লাহর অধিকার) পরিপন্থী অনৈতিক কার্যক্রম থেকে দূরে থাকতে হবে।

আহ্বান ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা ও বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা 'হুমাযাহ' এর যে দারস পেশ করা হলো এতে যদি আমার অজান্তে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি কিম্বা বাড়াবাড়ি হয়ে যায় তার জন্য মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর এই দারস থেকে আমরা যেসব শিক্ষনীয় বিষয় জানতে পারলাম তা যেন বাস্তব জীবনে আ'মল করতে পারি সেই তাওফীক কামনা করে দারস শেষ করছি। অয়াআখিরু দাওয়ানা আনিল হামদু লিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন।

সাত

আল্লাহর বাছাইকৃত মুমিনদের প্রকৃত জিহাদ বা আন্দোলন করা কর্তব্য

সূরা হজ্ব আয়াত- ৭৮

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى
اَمَّابَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ؕ هُوَاجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ؕ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ؕ هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ۙ مِنْ قَبْلُ وَفِىْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ؕ هُوَ مَوْلٰكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ○

সরল অনুবাদ ঃ ইরশাদ হচ্ছে- (৭৮) তোমরা আল্লাহর জন্যে জিহাদ (আন্দোলন-সংগ্রাম) করো যেভাবে জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে নিজের (দ্বীনের) জন্যে বাছাই করে নিয়েছেন। আর দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা চাপিয়ে দেননি। তোমরা তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের মিল্লাতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো। আল্লাহ পূর্বেও তোমাদের নাম 'মুসলিম' রেখেছিলেন, আর এই কুরআনেও (তোমাদের এই নাম রেখেছেন) যেন রাসূল তোমাদের জন্যে সাক্ষ্যদাতা হন, আর তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমন্ডলীর জন্যে। সুতরাং তোমরা নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে মজবুত ভাবে আঁকড়ে ধরো। কেননা, তিনিই তোমাদের মাওলা (অভিভাবক)। তিনি কতইনা উত্তম মাওলা এবং কতো উত্তম সাহায্যকারী।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ وَ -আর/এবং। جَاهِدُوْا -তোমরা জিহাদ/সংগ্রাম/

আন্দোলন করো। فِى اللهِ -আল্লাহর জন্যে। حَقَّ -যথাযথ/প্রকৃত। جِهَادِهٖ -তার জিহাদ। هُوَ -তিনি। اِجْتَبٰكُمْ -তোমাদেরকে বাছাই করে নিয়েছেন। مَا -না। جَعَلَ -আরোপ করেছেন। عَلَيْكُمْ -তোমাদের উপর। فِى الدِّيْنِ -দ্বীনের বিষয়ে/ব্যাপারে। حَرَجٍ -সংকীর্ণতা। مِلَّةَ - মিল্লাত/দ্বীন। اَبِيْكُمْ -তোমাদের পিতার। هُوَ -তিনি। سَمّٰكُمُ - তোমাদের নাম দিয়েছেন/রেখেছেন। قَبْلُ -পূর্বে। هٰذَا -এই। لِيَكُوْنَ - যেন হয়। شَهِيْدًا -সাক্ষী/সাক্ষদাতা। عليكم -তোমাদের উপর। تَكُوْنُوْا -তোমরাও হও। شُهَدَاءَ -সাক্ষী। عَلَى -উপর। النَّاسِ - সমস্ত লোকদের। فَاَقِيْمُوْ - সুতরাং তোমরা কায়েম/ প্রতিষ্ঠা করো। اٰتُوا-দাও। اِعْتَصِمُوْا-তোমরা আঁকড়ে ধরো। بِاللهِ -আল্লাহকে। هُوَ -তিনিই। مَوْلٰكُمْ -তোমাদের অভিভাবক। فَنِعْمَ -অতএব কতো উত্তম। اَلْمَوْلٰى -অভিভাবক। نِعْمَ -কতো উত্তম। النَّصِيْرُ -সাহায্যকারী।

সম্বোধন ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে/মাহফিলে উপস্থিত প্রিয় দ্বীনদার/ ইসলামী আন্দোলনের ভাইয়েরা/বোনেরা! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আমি আপনাদের সামনে দারস পেশ করার জন্য সূরা আল হজ্ব এর সর্বশেষ আয়াত তিলাওয়াত ও সরল অনুবাদ পেশ করেছি। আল্লাহ পাক যেন আমাকে তাওফীক দেন আপনাদের সামনে পেশকৃত দারসটি সঠিকভাবে তুলে ধরার।

সূরার নামকরণ ঃ এই সূরার চতুর্থ রুকুর দ্বিতীয় আয়াতে উল্লেখিত- وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ "হজ্ব উদযাপনের জন্য লোকদেরকে আহবান জানাও"- এর الحج শব্দটিকে অন্যান্য সূরার ন্যায় প্রতীকী বা চিহ্ন হিসেবে এই সূরার নামকরণ "সূরা আল হজ্ব" করা হয়েছে।

সূরাটি নাযিলের সময়কাল ঃ এই সূরার মধ্যে মাক্কী এবং মাদানী সূরা সমূহের বৈশিষ্ট্য মিশ্রভাবে লক্ষ্য করা যায়। সেই কারণে সূরাটি মাক্কী না মাদানী এই বিষয়ে তাফসীরকারকদের মধ্যে মতোবিরোধ দেখা যায়। মাক্কী-মাদানী উভয় বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ দেখা যাওয়ার কারণ হলো, একটি

অংশ মাদানী জীবনের প্রথম ভাগে অবতীর্ণ হয়েছে আবার অন্য একটি অংশ মাক্কী জীবনের শেষ দিকে অবতীর্ণ হয়েছে। এ কারণে এই সূরার মধ্যে উভয় পর্যায়ের বৈশিষ্ট্যই বর্তমান রয়েছে।

সূরার প্রথম থেকে শুরু করে ২৪ নম্বর আয়াত পর্যন্ত সম্ভবত মাক্কী জীবনের শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ হিজরাতের কিছুকাল পূর্বে নাযিল হয়েছে। অতঃপর ২৫ নম্বর আয়াত থেকে বিষয়বস্তুর ধারা পরিবর্তন হয়ে গেছে। আর এতে স্পষ্ট মনে হয় যে, এই আয়াত হতে সূরার শেষ পর্যন্ত মাদানী জীবনে অবতীর্ণ হয়েছে। আর সম্ভবত হিজরতের পর প্রথম বছর জিলহজ্ব মাসেই অবতীর্ণ হয়ে থাকবে। (আল্লাহই ভাল জানেন)

সূরার আলোচ্য বিষয় ঃ এই সূরায় তিন শ্রেণীর লোককে সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছে। তারা হলো- (১) মক্কার মুশরিক (২) দ্বিধাগ্রস্থ ও সন্দেহ-সংশয়গ্রস্থ মুসলিম এবং (৩) খাঁটি মুসলমান।

প্রথমতঃ মুশরিকদের সম্বোধন করে কথা বলা শুরু হয়েছে মক্কায়। আর মদীনায় এসে এর ধারাবাহিকতা সম্পূর্ণ হয়েছে। তাদেরকে জোরালো ভাবে সাবধান ও সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে যে, তোমরা তোমাদের অজ্ঞতা এবং ভিত্তিহীন চিন্তা বিশ্বাসের ব্যাপারে যে যিদ এবং হঠকারিতা দেখাচ্ছো। আল্লাহকে ছেড়ে এমন সব দেব-দেবীর উপর আস্থা-বিশ্বাস দেখাচ্ছো যাদের কোন শক্তি-সামর্থ নেই। অপরদিকে তোমরা আল্লাহর রাসূলকে অবিশ্বাস-অমান্য করছো। এখন তোমাদের পরিণাম সেইসব লোকদের মতোই হবে ইতোপূর্বে এই নীতি গ্রহণকারীদের পরিণাম যা হয়েছে।

নবীকে অবিশ্বাস ও অমান্য করে এবং নিজ জাতির সবচেয়ে ভাল ও সৎ-চরিত্রবান ও ভদ্রলোকদেরকে অত্যাচার-যুলুমের মাধ্যমে নিজেদেরই ক্ষতি ডেকে এনেছো। তোমাদের এই আচরণের ফলে তোমাদের উপর আল্লাহর যে গযব নেমে আসবে, তা থেকে তোমাদেরকে তোমাদের মনগড়া ও কৃত্রিম মা'বুদেরা তোমাদেরকে বাঁচাতে পারবে না।

আল্লাহ তা'য়ালা মক্কার মুশরিকদেরকে শুধু সাবধান-সতর্কই করেন নাই। সাথে সাথে তাদেরকে পুরো সূরায় বিভিন্ন ভাবে উপদেশ-নসিহত দ্বারা বুঝানোরও চেষ্টা করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত ঃ দ্বিধাগ্রস্থ ও সংশয়-সন্দেহপূর্ণ মুসলমানদের অবস্থা ছিলো এই যে, তারা আল্লাহর বন্দেগী কবুল করে নিয়েছিলো বটে কিন্তু এই পথে যে বিপদ ও ঝুঁকি আছে তা তারা গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলো না। এই সূরাই তাদেরকে কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করা হয়েছে। তাদেরকে বলা হয়েছে, এটা তোমাদের কেমন ঈমান? আরাম-আয়েশ এবং ভোগ-বিলাসের সুযোগ আসলেতো তোমরা আল্লাহকে আল্লাহ বলে মেনে নাও, আর তাঁর বান্দাহ হয়ে থাকতেও রাজী হয়ে যাও। কিন্তু যখনই আল্লাহর পথে বিপদ আসে, ঝুঁকি আসে, কষ্ট স্বীকার করার প্রয়োজন হয়, তখন না আল্লাহকে আল্লাহ বলে মানতে রাজী হও, আর না তার বান্দাহ থাকতে সম্মত হও। অথচ তোমরা এরূপ রীতি ও আচরণ গ্রহণ করে এমন কোন বিপদ-মুসিবতকে এড়িয়ে চলতে পারো না, যা আল্লাহ তোমাদের ভাগ্যে লিখে রেখেছেন।

তৃতীয়ত ঃ খাঁটি মুসলমানদের সম্মোধন করে এই সূরায় দুই ধরনের কথা বলা হয়েছে। যেমন-

ক) এক ধরনের সম্মোধন তাদের নিজেদেরকে উদ্দেশ্য করে করা হয়েছে এবং আরব দেশের জনমতকে উদ্দেশ্য করেও করা হয়েছে।

খ) অপর ধরনের সম্মোধন করা হয়েছে কেবলমাত্র ঈমানদার লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে।

প্রথম ধরনের সম্মোধনে মক্কার মুশরিকদের আচার-আচরণের বিষয়ে পাকড়াও করা হয়েছে। তারা মুসলমানদের জন্য 'মসজিদে হারামের' পথ বন্ধ করে দেয়ার কারণে তাদেরকে তিরস্কার-ভর্ৎসনা করা হয়েছে। 'মসজিদে হারাম' তাদের নিজস্ব ও ব্যক্তিগত কোন সহায় সম্পদ নয়। কাউকেও হজ্ব পালন হ'তে মাহরূম করা তাদের কোন অধিকার নাই। এই আপত্তিটা কেবল সত্যভিত্তিকই ছিলো না, বরং রাজনৈতিক দিক দিয়েও এটা কুরাইশদের বিরুদ্ধে এক বড় হাতিয়ারও ছিলো। এই নৈতিক ও রাজনৈতিক আপত্তির মাধ্যমে আরবের অন্যান্য গোত্রের লোকদের মনেও প্রশ্ন জাগিয়ে তোলা হয়েছিলো যে, কুরাইশরা কেন এমন আচরণ করে? ত তাদের কি হেরেম শরীফের মালিকনা শুধু রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব? এখন যদি তারা কেবল ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে এক শ্রেণীর লোককে হজ্ব পালন করা থেকে মাহরূম করে এবং তা সহ্য করা হয়, তাহলে ভবিষ্যতে যাদের সাথেই তাদের সম্পর্ক খারাপ হবে, তাদেরকেই

তো তারা 'মসজিদে হারাম'-এ প্রবেশে বাধাদান করতে এবং হজ্ব ও উমরা পালন বন্ধ করে দিতে সাহস পাবে। এই প্রসঙ্গে 'মসজিদে হারাম' এর ইতিহাস বর্ণনা করতে যেয়ে একদিকে বলা হয়েছে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর আদেশে যখন তাকে নির্মাণ করেন, তখন সমস্ত মানুষের জন্যই হজ্ব ও উমরা পালনের সাধারন অনুমতি দেয়া হয়েছিলো এবং প্রথম দিন থেকেই স্থানীয় বাসিন্দা এবং বাহির থেকে আগত লোকদের সেখানে প্রবেশের সমান অধিকার স্বীকার করে নেয়া হয়েছিলো। অপরদিকে বলা হয়েছে- এই ঘর শিরক করার জন্য নয়, বরং এক আল্লাহর বন্দেগী করার জন্যই নির্মাণ করা হয়েছে। এখন সেখানে এক আল্লাহর বন্দেগী করা হবে নিষিদ্ধ আর মূর্তি পূজা করার জন্য থাকবে অবাধ স্বাধীনতা-এটা খুবই আপত্তিজনক।

দ্বিতীয় ধরনের সম্বোধনে মুসলমানদেরকে কুরাইশদের যুলুম-নির্যাতনের জবাবে শক্তি প্রয়োগের অনুমতি দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে, কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা শক্তি প্রদর্শনের এটাই প্রথম আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুমতি। সেই সংগে তাদেরকে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা যখন ক্ষমতা লাভ করবে,তখন তোমাদের আচরণ হবে আদর্শ ভিত্তিক। তাদের শাসন ক্ষমতার লক্ষ্য কি হবে, কি উদ্দেশ্যে কাজ করবে তাও এই সূরাই স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে। এই কথাগুলো সূরার মাঝখানেও বলা হয়েছে এবং সূরার শেষ ভাগেও বলা হয়েছে।

সূরার শেষ ভাগে অর্থাৎ যে অংশ থেকে দারস পেশ করা হচ্ছে, সেখানে ঈমানদারদের আল্লাহরই জন্য প্রকৃত জিহাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং তাদেরকে 'মুসলিম' নামে অভিহিত করা হয়েছে। আর বলা হয়েছে যে, তোমরা তোমাদের জাতির পিতা ইব্রাহীম (আঃ) এর স্থলাভিষিক্ত আসল লোক। তোমাদেরকে দুনিয়ার মানুষের জন্য সত্যের স্বাক্ষ্যদানের কর্তব্য পালনের উদ্দেশ্যে দাঁড় করানো হয়েছে। অতএব এখন তোমাদের সালাত প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যাকাত আদায় করতে হবে এবং উত্তম ও মঙ্গলজনক কাজ করতে হবে। নিজেদের জীবনকে উত্তম আদর্শ জীবনরূপে গড়ে তুলতে হবে। আল্লাহর উপর ভরসা রাখতে হবে এবং জিহাদ-সংগ্রাম-আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে।

ব্যাখ্যা ঃ প্রিয় ভাইয়েরা ও বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে কুরআনের ব্যাখ্যা বুঝার জন্য প্রাথমিক কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরা

হলো। এখন আমি তিলাওয়াতকৃত দীর্ঘ আয়াতটির ব্যাখ্যা ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরছি।

আয়াতের প্রথমেই আল্লাহর জন্যই প্রকৃত জিহাদ বা আন্দোলনের নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন- وَجَاهِدُوْا فِى اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ **তোমরা আল্লাহর জন্যই জিহাদ করো, যেভাবে জিহাদ-সংগ্রাম করা উচিত।**

جِهَادُ (জিহাদ)-অর্থ কেবলমাত্র সম্মুখ যুদ্ধ বা হত্যাকান্ড চালানই নয়। কেননা, جِهَادُ শব্দটি جَهْدٌ বা جُهْدٌ শব্দ থেকে এসেছে। যার আভিধানিক অর্থ হলো- কষ্ট-কাঠিণ্য, কঠোর পরিশ্রম, সর্বাত্মক প্রচেষ্টা, সর্বশক্তি নিয়োগ, প্রানান্তকর চেষ্টা সাধনা বা চূড়ান্ত চেষ্টা সাধনা করা। ইসলামী শরীয়াতের পরিভাষায় আল্লাহর যমীনে আল্লাহ্র দ্বীনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে ইসলাম বিরোধী সকল প্রকার প্রতিকুল শক্তির বিরুদ্ধে জান-মাল, অর্থ-সম্পদ, জ্ঞান-বুদ্ধি, কর্মকৌশল, প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং শক্তি-সামর্থ উৎসর্গ করে সর্বাত্মক ও চূড়ান্ত চেষ্টা-সংগ্রাম বা মুজাহাদা করার নামই হলো জিহাদ।

فِى اللهِ - "আল্লাহর জন্যে" এই ব্যাক্যটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। অন্য যায়গায় জিহাদের নির্দেশ দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ্ বলেছেন-

فِى سَبِيْلِ اللهِ -"আল্লাহর পথে বা রাস্তায়"। আর এখানে سَبِيْل বা রাস্তা বাদ দিয়ে সরাসরি বলা হয়েছে- فِى اللهِ "আল্লাহর উদ্দেশ্যে"। এই শব্দ দিয়ে জিহাদের একটি শর্ত হিসেবে নির্দিষ্ট করে দিয়ে বলা হচ্ছে যে, প্রতিরোধকারী শক্তি হচ্ছে সেগুলো- যা আল্লাহর বন্দেগী, তাঁর সন্তুষ্টি কামনা এবং তাঁর নির্দিষ্ট পথে চলার প্রতিবন্ধক। এই প্রেক্ষিতে চেষ্টা ও সাধনা করার লক্ষ্য এই যে, এসব শক্তির প্রতিরোধকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়ে মানুষ নিজেও যথাযথভাবে আল্লাহর বন্দেগী করবে, আর সেই সঙ্গে দুনিয়াতেও আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ বা উঁচু করবে এবং কুফর ও খোদাদ্রোহী নাস্তিক্যবাদ শক্তিকে নাস্তানুবাদ বা পরাজিত করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে প্রাণপণ জিহাদ-সংগ্রাম করবে।

حَقَّ جِهَادِهِ -"প্রকৃত জিহাদ বা যেভাবে জিহাদ করা উচিত।" অর্থাৎ

জিহাদ বা আন্দোলন-সংগ্রামের হক আদায় করে জিহাদ করা। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহকে ভয় করা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে-
اِتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ - "তোমরা আল্লাহকে ভয় করো যেভাবে ভয় করা উচিত।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) حَقَّ جِهَادِهٖ এর অর্থে বলেন- "জিহাদে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে কর্ণপাত না করা।" অর্থাৎ জিহাদে পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করে সকল প্রকার বাধা-বিপত্তি, ঠাট্টা-বিদ্রুপকে উপেক্ষা করে নিরবচ্ছিন্নভাবে জিহাদ করা আন্দোলন-সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া।

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক বলেন, এখানে জিহাদ বলে নিজের প্রবৃত্তি ও অন্যায় কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে জিহাদ করা বুঝানো হয়েছে এবং এটাই حَقَّ جِهَادِهٖ বা যথাযোগ্য জিহাদ।

ইমাম বগভী প্রমুখ এই উক্তির সমর্থনে একটি হাদীসও বর্ণনা করেছেন- (হাদীসের সনদটি দূর্বল) একবার সাহাবায়ে কিরামের একটি দল কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হতে ফিরে আসলে নবী করীম (সঃ) তাদের উদ্দেশ্যে বলেন – قَدِمْتُمْ مِنَ الْجِهَادِ الْاَصْغَرِ اِلَى الْجِهَادِ الْاَكْبَرِ "তোমরা ছোট জিহাদ হতে বড় জিহাদের দিকে ফিরে এসেছো।"জিজ্ঞাসা করা হলো, সেই বড় জিহাদ কি? নবী করীম (সঃ) তখন বললেন - مُجَاهَدَةُ الْعَبْدِ هَوَاهُ "বান্দার নিজের নফসের খাহেশের বিরুদ্ধে চেষ্টা ও সাধনা করা।" এই হাদীসটি ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করে বলেছেন যে, এর সনদে ত্রুটি রয়েছে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

حَقَّ جِهَادِهٖ তথা 'প্রকৃত জিহাদের' অর্থ এই দাঁড়ায় যে, সাধনা-সংগ্রামের প্রথম আঘাত আসে ব্যক্তির নিজের নফসের খায়েশের বিরুদ্ধে। কেননা, তা প্রতিমুহূর্তে আল্লাহর নির্দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য চেষ্টায় রতো থাকে এবং ব্যক্তিকে ঈমান ও আল্লাহর আনুগত্যের পথ থেকে বিচ্যুত করতে অবিরাম চেষ্টা চালাতে থাকে। তাই উহাকে যতক্ষণ পর্যন্ত অনুগত ও নিয়ন্ত্রণ করা না যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বাইরের কোন শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করার কোন সম্ভাবনা থাকে না। তাই বান্দার নিজের

নফস বা আত্মার খায়েশের বিরুদ্ধে চেষ্টা-সাধনা করা। তারপর জিহাদের বিশাল ক্ষেত্র গোটা দুনিয়ায় বিস্তৃত করা। অর্থাৎ দুনিয়ায় খোদাদ্রোহী যতো শক্তি আছে তার বিরুদ্ধে জান-প্রাণ, অর্থ-সম্পদ, বুদ্ধি-কৌশল, শক্তি-সামর্থ দিয়ে প্রাণান্তকর চেষ্টা সাধনা চালিয়ে যাওয়া।

حَقَّ جِهَادِهٖ "জিহাদের মতো জিহাদ" এই বাক্যটির তাৎপর্য আমরা আমাদের সমাজে প্রচলিত কতকগুলো মন্তব্যের সাথে তুলনা করতে পারি। যেমন-কোন কাজকে নিখুঁত এবং ভালো ভাবে করার জন্য তাগাদা দিয়ে বলা হয়- "কাজের মতো কাজ করো" অর্থাৎ কাজ যেভাবে করা উচিত সেভাবে কাজ করো। আবার পড়ার ক্ষেত্রে বলা হয়- "পড়ার মতো পড়ো"। অর্থাৎ যেভাবে পড়া উচিত সেভাবে পড়ো। আবার লিখার ক্ষেত্রে বলা হয়- "লিখার মতো লিখো"। অর্থাৎ যেভাবে লিখা উচিত সেভাবে লিখ। আবার খেলার বিষয়ে বলা হয়- "খেলার মতো খেলো"। অর্থাৎ যেভাবে খেলা উচিত সেভাবে খেলো ইত্যাদি। সুতরাং জিহাদের ক্ষেত্রে আল্লাহর এই নির্দেশ হলো- حَقَّ جِهَادِهٖ "জিহাদ করার মতো জিহাদ করো।" অর্থাৎ যেভাবে জিহাদ করা উচিত সেভাবে হক আদায় করে জিহাদ করো। সুতরাং জিহাদ বা চেষ্টা-সংগ্রাম হবে নিজের নফসের খায়েসের বিরুদ্ধে, অর্থ-সম্পদ, ক্ষমতা ইত্যাদি যা আল্লাহর হুকুম পালনে বাধা সৃষ্টি করে তার বিরুদ্ধে। খোদাদ্রোহী শক্তি তথা নাস্তিকতার বিরুদ্ধে কথা,কাজ,কৌশল ইত্যাদির মাধ্যমে সকল প্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও নিরবছিন্নভাবে অবিরাম গতিতে সর্বাত্তক চেষ্ট-সংগ্রাম চালিয়ে যাবার নামই হলো- حَقَّ جِهَادِهٖ বা প্রকৃত জিহাদ। (এর পরও আল্লাহই বেশী ভাল জানেন)।

অতঃপর মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন-

هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ

তিনিই তোমাদেরকে নিজের কাজের জন্যে বাছাই করে নিয়েছেন। আর দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা চাপিয়ে দেন নাই।

هُوَ اجْتَبٰكُمْ এই বাক্যে মহান আল্লাহ তা'য়ালা মানব জাতির মধ্য থেকে উম্মতে মুহাম্মদিকে তার কাজের জন্য অর্থাৎ দ্বীনের জন্য বাছাই করে

নিয়েছেন বা মনোনীত করেছেন। অন্যান্য উম্মতবর্গের উপর তিনি তোমাদেরকে মর্যাদা দান করেছেন।

কুরআনের অন্যান্য আয়াতে মহান আল্লাহ পাক উম্মতে মুহম্মদিকে এভাবে উল্লেখ করেছেন - جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا - "তোমাদেরকে মধ্যবর্তী জাতি বানানো হয়েছে।" (সূরা বাকারা - ১৪৩)

অন্য এক আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে-كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ "তোমরাই হচ্ছো উত্তম জাতি, তোমাদেরকে জনগণের জন্য তৈরী করা হয়েছে।" (সূরা ঈমরান- ১১০)

জেনে রাখা উচিত যে, এই আয়াতটিতে সাহাবাদের মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। এরপর অন্যান্য লোকেরা শামিল হতে পারে যারা তাঁদেরকে অনুসরণ করবে।

তিনি নিজের কাজের জন্য বাছায় করে নিয়ে উম্মতে মুহাম্মদিকে কয়েক ভাবে মহা সম্মানিত করেছেন। যেমন, প্রথমতঃ পূর্ণ রাসূল ও বিশ্ব নবী প্রেরণ করে মর্যাদা দান করেছেন, যা পূর্বে কোন নবীই পূর্ণ বা বিশ্ব নবী ছিলেন না। দ্বিতীয়তঃ পূর্ণ শরীয়ত দানের মাধ্যমে মর্যাদা দান করেছেন, যা পূর্বে কোন সময় পূর্ণ শরীয়ত বলবত ছিলো না। তৃতীয়তঃ সহজ এবং উত্তম দ্বীন প্রদান করে মর্যাদা দান করেছেন, যা পূর্বে এরকম সহজ দ্বীন ছিলো না। চতুর্থতঃ উম্মতে মুহাম্মদীর উপর এমন কঠিন আহকাম দেন নাই যা পালন করা কঠিন। কিন্তু পূর্বের উম্মতদের উপর অত্যন্ত কঠিন আহকাম বলবত ছিলো। পঞ্চমতঃ এমন বোঝা তিনি চাপিয়ে দেন নাই যা বহন করা উম্মতের সাধ্যের বাইরে।

অতঃপর আয়াতের পরবর্তী অংশে মহান আল্লাহ্ বলেন-

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ

আর তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন প্রকার সংকীর্ণতা চাপিয়ে দেন নাই।

অর্থাৎ তোমাদের দ্বীনকে সেই সব বাধা-বন্ধন হতে মুক্ত করে দেয়া হয়েছে, যা অতীত উম্মতের উপর তাদের ফকীর, পীর, আলিম ও পাদ্রীরা চাপিয়ে দিয়ে দ্বীনকে সংকীর্ণ করে দিয়েছিলো। পক্ষান্তরে এই দ্বীনে চিন্তা

গবেষণার ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই, জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই। শরীয়ত এবং আকীদা-বিশ্বাসের মধ্যে থেকে বাস্তব কর্মজীবনে তমদ্দুন ও সমাজ উন্নতির ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি, যুদ্ধ-সন্ধি সকল ক্ষেত্রে মানুষের জন্যে কল্যাণধর্মী এক উদার দ্বীন মহান আল্লাহ্ পাক উম্মতে মুহাম্মদিকে দান করেছেন। এই আয়াতে কথাটিকে ইতিবাচক ভাবে বলা হয়েছে, অন্য আয়াতে সেসব বিষয়ই আবার নেতিবাচক ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন সূরা আ'রাফে বলা হয়েছে–

يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ --- (الخ)

"(এই রাসূল) তাদেরকে জানা-চেনা নেক কাজের আদেশ করেন এবং সেইসব খারাপ কাজ হতে বিরত রাখেন, যা মানুষের প্রকৃতিই খারাপ মনে করে। আর সেইসব জিনিস হালাল ঘোষণা করেন, যা পাক ও পবিত্র এবং হারাম ঘোষণা করেন সেইসব জিনিস যা খারাপ। আর তাদের উপর হতে সেই সব কঠিন বোঝা নামিয়ে দেন যা তাদের উপর চাপানো ছিলো। সেইসব জিঞ্জিরগুলি খুলে ফেলেন, যাতে তারা বন্দি ছিলো।"

(সূরা আ'রাফ -১৫৭)

দ্বীনের মধ্যে ইবাদতের ক্ষেত্রেও কোন সংকীর্ণতা নেই যেমন-পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের মর্যাদা পাঁচ ওয়াক্তের মধ্যে নিহিত রেখেছেন। বাড়িতে থাকাকালীন চার রাকাআত বিশিষ্ট ফরজ নামায চার রাকাআতই পড়তে হয়। আর সফরে চার রাকাআতের স্থলে দুই রাকাআত পড়তে হয়। যুদ্ধের বা ভয়ের নামায হাদীস অনুযায়ী মাত্র এক রাকাআত পড়লেই হয়ে যায়। অসুস্থ মানুষ বসে নামায পড়তে পারে এবং বসে পড়তে না পারলে শুয়েও পড়তে পারবে, এমনকি ইশারাতেও নামায পড়তে পারবে। এছাড়া অন্যান্য ফরজ এবং ওয়াজিব ইবাদাতগুলোও সহজ সাধ্য করেছেন এজন্যই নবী করীম (সঃ) বলতেন, "আমি একনিষ্ঠ ও খুবই সহজ দ্বীন নিয়ে আগমন করেছি।"

হযরত মু'য়াজ (রাঃ) এবং হযরত আবু মুসা (রাঃ) কে যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইয়ামানের আমীর (শাসক) নিযুক্ত করে পাঠান তখন তাঁদেরকে

উপদেশ দিয়ে বলেন ঃ "তোমরা (জনগণকে) সুসংবাদ দিবে, তাদের মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টি করবে না এবং এমন কাজের নির্দেশ দিবে যা পালন করা তাদের পক্ষে সহজ সাধ্য হয়, কঠিন না হয়।" এই বিষয়ে আরো বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমন–

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) এই আয়াতের তাফসীরে বলেছেন- "তোমাদের দ্বীনে কোন সংকীর্ণতা এবং কোন কঠোরতা নেই।(তাফসীরে ইবনে কাসীর)

অতঃপর আয়াতের পরবর্তী অংশে আল্লাহ বলেন– مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَٰهِيمَ

তোমরা তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের মিল্লাতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো।

"মিল্লাতে ইব্রাহীম" বলতে এখানে ইসলামকে বুঝানো হয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে একে "মিল্লাতে নূহ", "মিল্লাতে মূসা", "মিল্লাতে ঈসাও" বলা হয়েছে। কিন্তু তার পরেও আল কুরআনে 'মিল্লাতে ইব্রাহীম' বার বার উল্লেখ করা হয়েছে এবং তা অনুসরণের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে সম্ভবতঃ তিনটি কারণে। যেমন–

প্রথম কারণ ঃ কুরআনে প্রথম সম্বোধন হলো আরববাসীদের প্রতি। কেননা, তারা যতোটা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে চিনতো-জানতো, ততোটা অন্য কাউকে চিনতোনা জানতোনা। তাদের ইতিহাস- ঐতিহ্য ও ভক্তি-শ্রদ্ধায় যে ব্যক্তির সবচেয়ে বেশী প্রভাব প্রতিপত্তি ছিলো, তিনি হলেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)

দ্বিতীয় কারণ ঃ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-ই ছিলেন সেই ব্যক্তি, যিনি নেককার এবং মহান ব্যক্তি হওয়া সম্পর্কে ইহুদী, খৃষ্টান, আরবের মুশরিক ও মুসলমান সকলেই একমত ছিলো। এমনকি মধ্য প্রাচ্যের 'সাবেয়ী' লোকেরাও এটা মানতো। নবী-রাসূলগনের মধ্যে এমন কেউ ছিলেন না, যাঁকে সকলেই এক বাক্যে মেনে নিতো।

তৃতীয় কারণ ঃ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) অন্যসব মিল্লাত সৃষ্টির বহু পূর্বেই দুনিয়ায় আগমন করেছিলেন। ইহুদী, খৃষ্টান, সাবেয়ী সম্প্রদায়তো এই ইতিহাস জানতো-এমন কি আরবের মুশরিকরাও জানতো যে, তাদের মূর্তি পূজার প্রচলন হয়েছে 'আমর ইবনে লুহাইর' সময় থেকে। সে ছিলো বনী খুযায়ার সর্দার। 'মায়াব' অঞ্চল হতে 'হুবল' নামক বুতটি এনেছিলো। কাজেই তাদের এই শিরকী মিল্লাতও হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর কয়েকশো বছর পরে উদ্ভাবিত হয়েছে। এর পরিপেক্ষীতে মহাগ্রন্থ আল কুরআন যখন বলে তোমরা সকল মিল্লাতকে বাদ দিয়ে ইব্রাহীম (আঃ) এর মিল্লাতকে

গ্রহণ করো। আর ইব্রাহীম (আঃ) এর মিল্লাততো ছিলো ইসলাম। আর আমাদের শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এরও দাওয়াত সেই মিল্লাতেরই দিকে। আর এইজন্যই হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে সবার পিতা বা জাতীয় পিতা বলা হয়।

পরবর্তী অংশে আল্লাহ বলেন- هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا

তিনি পূর্বেও তোমাদের নাম রেখেছিলেন 'মুসলিম' এবং এই কুরআনেও (তোমাদের এই নাম রেখেছেন)।

অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এরও পূর্বে 'মুসলিম' নামকরণ করেন। কেননা, তাঁর প্রার্থনা ছিলো-

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দু'জন (ইব্রাহীম ও ইসমাঈল আঃ) কে তোমার জন্য মুসলিম (অনুগত) বানাও এবং আমাদের পরবর্তী সন্তানদের মধ্যে থেকে একটি মিল্লাত মুসলিম (অনুগত) বানিয়ে দাও।" কোন কোন তাফসীরকারক 'তিনি পূর্বে মুসলিম নামকরণ করেছেন' বলতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে বুঝিয়েছেন। যদি তাই হতো তাহলে উপরে উল্লেখিত আয়াতের প্রার্থনায় 'মুসলিম' হওয়ার জন্য দোয়া করতেন না। তিনি নিজেইতো তাঁর সন্তান ইসমাঈল (আঃ) কে সাথে নিয়ে দোয়া করছেন- "হে আল্লাহ আমাদের দু'জনকে মুসলিম বানিয়ে দাও।"

সুতরাং এখানে 'তিনি' বলতে আল্লাহ, 'পূর্বে' বলতে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ এবং 'এই কিতাব' বলতে সর্বশেষ কিতাব আল কুরআনকে বুঝানো হয়েছে।

ইতোপূর্বে আয়াতে উম্মতে মুহাম্মদীকে জিহাদের জন্য বাছাই করে নেয়া হয়েছে বলে উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে এবং তাদের দ্বীন সংকীর্ণতার উর্দ্ধে উঠে সহজ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই দ্বীনের প্রতি আরও বেশী আকর্ষণ সৃষ্টি করার জন্য বলা হচ্ছে-এটা হলো ঐ দ্বীন যা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আনয়ন করেছিলেন। অতঃপর এই উম্মতের মর্যাদার জন্য এবং তাদেরকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ বলেন, তোমাদের বর্ণনা আমার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও ছিলো। যুগ যুগ ধরে নবীদের উপর অবতীর্ণ আসমানী কিতাবসমূহে তোমাদের আলোচনা হতে থেকেছে। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের পাঠকেরা তোমাদের সম্পর্কে পূর্ণভাবে অবগত। সুতরাং এই কুরআনের পূর্বে এবং এই কুরআনেও তোমাদের

নাম 'মুসলিম'। আর এই নামকরণ করেছেন স্বয়ং মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন। সুতরাং আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের যে নাম রেখেছেন 'মুসলিম', সেই নামেই ডাকো। কেননা, আদম (আঃ) থেকে শুরু করে যারাই আল্লাহর একাত্ববাদ, পরকাল, রিসালাত এবং আল্লাহর কিতাব বা সহীফাকে মান্য করে তারা সকলেই ছিলো মুসলিম। তারা কেউই ইব্রাহীম (আঃ) এর দল, মূসা (আঃ)এর দল, ঈশা (আঃ)এর দল বলে পরিচিত ছিলো না। তারা সকলেই ছিলো মুসলিম।

অতঃপর আয়াতের পরবর্তী অংশে মহান আল্লাহ বলেন–

لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ-

যেন রাসূল তোমাদের জন্যে সাক্ষী হন, আর তোমরা সাক্ষী হও সমস্ত মানুষের জন্যে।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেছেন, তোমরা অন্যান্য নবীর উম্মতের ন্যায় উম্মত নও। কিম্বা তোমরা অন্যান্য জাতির ন্যায় জাতি নও। বরং তোমরা হচ্ছো সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত- 'উম্মতে মুহাম্মদী'। তোমরা হচ্ছো সর্বউত্তম জাতি মুসলিম জাতি। সুতরাং আমি তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠ উম্মত এবং মর্যাদাপূর্ণ জাতি মুসলিম এজন্যই করেছি যে, যাতে তোমাদের জন্য সাক্ষী হন মুহাম্মদ (সঃ) এবং তোমরাও সাক্ষী হও গোটা মানব জাতির জন্য।

সূরা বাকারার ১৪৩ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ সাক্ষী সংক্রান্ত বিষয়ে একটু আগপিছু করে বলেন–

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ
الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا -

"আমি তোমাদেরকে এক অতিউত্তম মধ্যপন্থি জাতি বানিয়েছি এইজন্য যে, যাতে করে তোমরা মানুষের জন্যে সাক্ষী হও, আর রাসূলও হন তোমাদের জন্যে সাক্ষী।"

হাশরের মাঠে পূর্ববর্তী সকল উম্মতই 'উম্মতে মুহাম্মদীর' শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা স্বীকার করবে। এই উম্মত সমস্ত উম্মতের উপর নেতৃত্ব লাভ করেছে বিধায় অন্যান্য উম্মতের উপর গ্রহণযোগ্য হবে। আর মুহাম্মদ (সঃ)ও হাশরের ময়দানে সাক্ষ্য দেবেন যে, আমি আল্লাহ তা'য়ালার বিধি-বিধান এই উম্মতের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলাম, আর উম্মতে মুহাম্মদীও তা স্বীকার করবে। কিন্তু অন্যান্য নবীরা যখন এই দাবী করবেন তখন তাঁদের উম্মতেরা তা অস্বীকার করে বসবে। তখন উম্মতে মুহাম্মদীরা স্বাক্ষ্য দেবে

যে, সকল নবীই তাঁদের উম্মতের নিকট আল্লাহর বিধি-বিধান নিশ্চিতভাবে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন। তখন পূর্বের নবীদের উম্মতেরা জেরা করবে যে, আমাদের যামানায় উম্মতে মুহাম্মদীর অস্তিত্বই ছিলো না। সুতরাং তারা আমাদের ব্যাপ্যারে কিভাবে স্বাক্ষ্য হতে পারে? তখন উম্মতে মুহাম্মদীর পক্ষ থেকে জেরার জবাবে বলা হবে, আমরা তখন উপস্থিত ছিলামনা বটে, কিন্তু আমরা আমাদের রাসূল (সঃ) এর মুখে শুনেছি, যার সত্যবাদীতাই কোন সন্দেহ নেই। কাজেই আমরা স্বাক্ষ্য দিতে পারি। অতঃপর তাদের সাক্ষী গ্রহণ করা হবে।

এই সম্পর্কে মুসনাদ-ই-আহমাদের বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন হযরত নূহ (আঃ)-কে ডাকা হবে এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করা হবে, "তুমি কি আমার বাণী আমার বান্দাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলে? তিনি বলবেন, হে প্রভু! হ্যাঁ, আমি পৌঁছিয়ে দিয়েছি। অতঃপর তাঁর উম্মতকে ডাকা হবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, নূহ (আঃ) কি তোমাদের কাছে আমার বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন? তারা স্পষ্টভাবে অস্বীকার করবে এবং বলবে, আমাদের নিকট ভয় প্রদর্শক আসেননি। তখন হযরত নূহ (আঃ) কে বলা হবে, তোমার উম্মততো অস্বীকার করছে সুতরাং তুমি স্বাক্ষী হাযির করো। তখন তিনি বলবেন, হ্যাঁ, মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর উম্মতগণই আমার স্বাক্ষী- وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ আয়াতটির ভাবার্থ এটাই।

(এধরণের হাদীস সহীহ বুখারী, জামে' আত্ তিরমিজী, নাসায়ী এবং ইবনে মাযাতেও রয়েছে।)

সর্বশ্রেষ্ট এবং মর্যাদাপূর্ণ উম্মতে মুহাম্মদী মুসলিম জাতি দুনিয়ার জীবনে কিভাবে স্বাক্ষ্য দিয়ে তার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ন রাখবে সে বিষয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। কেননা, দুনিয়ার জীবনে তার মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে না পারলে কিয়ামতের দিন সে কোন ভাবেই স্বাক্ষী দিতে পারবে না। কেননা, মহান আল্লাহ অন্য আয়াতে মুসলিম ঈমানদারদেরকে ডেকে বলেছেন- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ
"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর জন্যে সত্যের স্বাক্ষী হয়ে দাঁড়াও।"
(সূরা-নিসা -১৩৫)

আর এটা কোনো কথার কথা নয় বরং এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে কড়া নির্দেশ। যেমন মহান আল্লাহ বলেন-

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللهِ

"তার চেয়ে আর কে বড় যালিম হতে পারে, যার কাছে আল্লাহর বিষয়ে স্বাক্ষ্য থাকার পরেও তা গোপন রাখে"? (সূরা বাকারা - ১৪০)

উম্মতে মুহাম্মাদী তার মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে ব্যার্থ হলে তার পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, তোমাদের পূর্বে ইহুদী জাতিকে এ স্বাক্ষ্য দেয়ার জন্য দ্বায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো, কিন্তু তারা সত্যের কিছুটা গোপন করেছিলো আর কিছুটা তার বিপরীত স্বাক্ষ্য দান করেছিলো। ফলে, আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে এক প্রচন্ড আঘাতে সরিয়ে দিলেন এবং তাদের অবস্থা এরূপ দাঁড়ালো যে-

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَ بَاءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ۔

"লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, অপমান, অধঃপতন ও দূরবস্থা তাদের উপর চেপে বসলো এবং তারা আল্লাহর গজবে নিমজ্জিত হয়ে পড়লো।"

উম্মতে মুহাম্মদী মুসলিম জাতির স্বাক্ষ্য দেয়ার পদ্ধতি কেমন হওয়া উচিত ঃ

স্বাক্ষ্য দু'ধরণের হয়ে থাকে। এক. মৌখিক স্বাক্ষ্য। দুই. বাস্তব স্বাক্ষ্য।

মৌখিক স্বাক্ষ্য ঃ নবী করীম (সঃ) এর মাধ্যমে আমাদের কাছে যে সত্য বাণী এসেছে তা নিজে স্বীকার ও গ্রহণ করা এবং দুনিয়ার অন্যান্য মানুষের কাছে বক্তৃতা ও লেখনির মাধ্যমে তুলে ধরা। মানুষ যাতে বুঝতে পারে এবং গ্রহণ করতে পারে এমন সকল পথ-পন্থা অবলম্বন করে দাওয়াত ও তাবলীগ এবং প্রচার-প্রোপাগান্ডার সম্ভাব্য সকল উপায় উপকরণ ব্যবহার করা এবং আধুনিক প্রযুক্তির জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল মাধ্যমকে কজায় এনে আল্লাহর মনোনীত দ্বীনের সাথে দুনিয়ার মানুষের পরিচয় করিয়ে দেয়া। যতক্ষণ পর্যন্ত না মুসলিম জাতি মানুষকে হিদায়াতের পথ দেখানোর জন্য নবীদের ন্যায় চিন্তা-ভাবনা করবে, সে পর্যন্ত এ মৌখিক স্বাক্ষ্য দানের দ্বায়িত্ব পুরোপুরি আদায় হবে না। আর এ দ্বায়িত্ব পালন করতে না পারলে নবীও আমাদের জন্য স্বাক্ষ্যদাতা হবেন না।

বাস্তব স্বাক্ষ্য ঃ বাস্তব স্বাক্ষ্য দান হলো এই যে, যেসব নিয়ম নীতিকে সত্য বলে আমরা গ্রহণ করেছি ও প্রচার করেছি, আমাদের বাস্তব জীবনেও সেগুলোকে বাস্তবায়ন করতে হবে। আমরা যাদের কাছে দাওয়াত দিচ্ছি তারা যেন আমাদের কাছ থেকে ঐসব নীতির কথাগুলো মৌখিক চর্চাই শুনতে না পায়, বরং তারা যেন স্বচক্ষে আমাদের জীবনে

ঐসবের সৌন্দর্য ও কল্যাণকারিতা দেখতে পায়। আমরা যদি ব্যক্তিগত ও জাতিগতভাবে নিজেরা দ্বীনের বাস্তব স্বাক্ষ্যে পরিণত হতে পারি, আমাদের ব্যক্তি চরিত্র সততার প্রমাণ পেশ করে, আমাদের ঘর-বাড়ী সৌরভে মাতোয়ারা হয়ে উঠে, আমাদের দোকানপাট ও কলকারখানাগুলো তার রৌশনীতে ঝলমল করে উঠে, আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ তারই আলোকে আলোকিত হয়ে উঠে, আমাদের শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সাংবাদিকতা তারই সৌন্দর্য চর্চায় নিয়োজিত থাকে এবং আমাদের রাজনীতি, অর্থনীতি, জাতীয় নীতি ও সকলের চেষ্টা সাধনা তার সত্যতার উজ্জ্বল নিদর্শনে পরিণত হয়, তাহলে এ স্বাক্ষ্যদানের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালিত হয়েছে বলা যেতে পারে। আর তখনই সে উম্মতে মুহাম্মদী এবং মুসলিম জাতির মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হবে। তার তখনই কেবলমাত্র তার জন্য নবীও স্বাক্ষ্য দান করবেন। (তাফহীমূল কুরআন)

অতঃপর আয়াতের পরবর্তী অংশে মহান আল্লাহ মুসলিমদেরকে কতিপয় কাজের নির্দেশ দিয়ে বলেন-

فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ط

তোমরা নামায কায়েম করো, যাকাত আদায় করো এবং আল্লাহকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো।

অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদেরকে মানুষের মাঝ থেকে বাছাই করে উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে মুসলিম হিসেবে গণ্য করেছেন, আর এই মর্যাদার কারণে তোমাদেরকে দুনিয়া এবং আখিরাতে গোটা মানব জাতির স্বাক্ষী বানিয়ে দিয়ে যে নি'য়ামত দান করেছেন তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা তোমাদের একান্ত কর্তব্য। অতএব আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের উপর যা কিছু ফরয করে দিয়েছেন তা অতি আগ্রহ ও নিষ্ঠার সাথে খুশীমনে পালন করা উচিত।

এখানে আল্লাহ মুসলমানদেরকে মৌলিক কয়েকটি নির্দেশ দিয়ে বলেন–

প্রথম নির্দেশ হলো ঃ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ -নামায কায়েম করবে।অর্থাৎ মুসলিম পরিচয় দানকারী আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় ইবাদত- 'নামায' প্রতিষ্ঠা করবে। অর্থাৎ নামাযের ভিতর বাইরের যাবতীয় বিধিবিধান ও নিয়ম-কানুন মেনে যথাযথভাবে আদায় করে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে প্রতিষ্ঠা করবে।

দ্বিতীয় নির্দেশ হলো ঃ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ -এবং যাকাত আদায় করবে। অর্থাৎ ইবাদতের মধ্যে নামাযের পরেই দ্বিতীয় যে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও পবিত্রকারী ইবাদত 'যাকাত' আদায় করবে। কেননা, যাকাত একদিকে যেমন নিজের ধন-সম্পদকে পবিত্র করে রুজিতে বরকত দান করে, অন্য দিকে তেমন আদায়কৃত যাকাতের অর্থ দিয়ে সমাজের অসহায় অনাথ ঋণগ্রস্থ মানুষের সহায়তা দান করে দারিদ্রতা বিমোচন করে একটি সমৃদ্ধশালী সমাজ গঠনে ভূমিকা পালন করে এবং মানুষের কাছে মানুষের যে অধিকার রয়েছে তা আদায়ের ব্যাবস্থা করে। অতএব নবীর উম্মতের মর্যাদা রক্ষার জন্য সমাজের সম্পদশালী ব্যক্তিরা যাকাত আদায় করবে।

তৃতীয় নির্দেশ হলো ঃ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ -আর আল্লাহকে শক্ত বা মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরবে। অর্থাৎ আল্লাহকে অবলম্বন করবে, তাঁর উপর পূর্ণ ভরসা রাখবে, সমস্ত কাজে তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করবে, সদাসর্বদা তাঁর উপরই নির্ভর করবে, হিদায়াত ও জীবনবিধান কেবল তাঁর নিকট হতেই গ্রহণ করবে, আনুগত্য কেবল তাঁরই করবে, কেবল তাঁকেই ভয় করে চলবে এবং আকাংখা ও কামনা-বাসনা কেবল তাঁর কাছেই করবে, কখনও তাঁকে ভুলে যাবে না।

অতঃপর আয়াতের সর্বশেষ অংশে মুসলিমদের অভিভাবক ও সাহায্যকারী সম্পর্কে বলতে গিয়ে মহান আল্লাহ্ বলেন–

هُوَ مَوْلٰكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ তিনিই তোমাদের মাওলা - মুনিব। তিনি বড়ই উত্তম মাওলা এবং বড়ই উত্তম সাহায্যকারী।

অর্থাৎ হে মুসলিম জাতি তোমরা যাকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরবে, তিনি কে জানো? তিনি তো হলেন সেই সত্তা, যিনি তোমাদের মাওলা-মুনিব-অভিভাবক। অর্থাৎ তিনিই তোমাদের এমন উত্তম অভিভাবক যে, তিনি তোমাদেরকে সকল প্রকার বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেন। তিনিই তোমাদেরকে বিভিন্ন কাজে সহায়তা দান করেন। তিনিই তোমাদের শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করে বিজয় দান করেন। তিনি সর্বোত্তম অভিভাবক। তিনি যার অভিভাবক হয়ে যান, তার আর কোন অভিভাবকের প্রয়োজন হয় না। তিনি যার সাহায্যকারী হয়ে যান, তার আর কোনো সাহায্যকারী প্রয়োজন হয় না। দুনিয়ার সবাই যদি শত্রু হয়ে যায় তাতেও কোনো যায় আসে না। সবার উপরই তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান, তিনি সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী।

হাদীসে কুদসীতে হযরত ওয়াহিব ইবনু অরদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "হে আদম সন্তান! তোমার রাগের সময় তুমি আমাকে স্মরণ করো, তাহলে আমিও আমার রাগের সময় তোমাকে ক্ষমা করে দেবো। আর যাদের উপর আমার শাস্তি বর্ষিত হবে তাদের মধ্যে থেকে আমি তোমাকে রক্ষা করবো, ধ্বংশ প্রাপ্তদের সাথে আমি তোমাকে ধ্বংশ করবো না। হে আদম সন্তান! যখন তোমার উপর যুলুম করা হয় তখন তুমি ধৈর্যধারণ করো, আমার দিকে দৃষ্টি দাও এবং আমার সাহায্যের উপর ভরসা রাখো ও আমার সাহায্যের উপর সন্তুষ্ট থাকো। জেনে রেখো, তুমি তোমার নিজেকে সাহায্য করবে এর চেয়ে আমিই তোমাকে সাহায্য করবো-এটাই উত্তম। (মুসনাদে ইবনু হাতিম)

শিক্ষা ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা ও বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা আল হজ্জের সর্বশেষ আয়াতের যে ব্যাখ্যা পেশ করা হলো তা থেকে আমাদের জন্য যেসব শিক্ষনীয় রয়েছে তা হলো ঃ

o একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই পারতোপক্ষে জিহাদের যাবতীয় হক আদায় করে আন্দোলন করা। অর্থাৎ আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিষ্টার জন্য নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি, বিবেক, শক্তি-সামর্থ সবটুকু কাজে লাগিয়ে জান-প্রাণ, ধন-সম্পদ দিয়ে সকল প্রকার প্রতিকূল পরিবেশকে উপেক্ষা করে অবিরাম গতীতে নীরবচ্ছিন্নভাবে ধৈর্যের সাথে আন্দোলন অব্যাহত রাখা।

o আল্লাহ তা'য়ালা যে তার দ্বীনের জন্য আমাদেরকে বাছাই করে নিয়ে মহা সম্মানিত করেছেন, সে জন্য তাঁর নি'য়ামত আদায় করার লক্ষ্যে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিয়োজিত থাকা এবং দ্বীনের যাবতীয় হুকুম-আহকাম, বিধি-বিধান মেনে চলা।

o দ্বীনের বিষয়ে যেহেতু আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের উপর কোনো প্রকার সংকীর্ণতা চাপিয়ে দেন নাই, সেহেতু নিজেরা ফতোয়া দিয়ে পূর্বের উম্মতের পাদ্রী এবং যাযকদের মতো দ্বীনকে মানুষের নিকট অগ্রহণীয় করে না তোলা বরং দ্বীনের বিধি-বিধানের মধ্য থেকে দুনিয়ার যাবতীয় উপায়-উপকরণ এবং প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে অতিউত্তম ও মধ্যম পন্থী মুসলিম জাতির ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া।

০ জাতির পিতা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর মিল্লাত তথা মুসলিম জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকা। কেননা, আল্লাহ তা'য়ালা পূর্ব থেকেই আল্লাহর আনুগত্যকারীদের নাম মুসলিম রেখেছিলেন। আর আমাদের এই আল কুরআনেও মুসলিম নামকরণ করেছেন। সুতরাং আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে থেকেই তার বিধি-নিষেধ মেনে চলা।

০ যদি আমরা আল্লাহর আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে তার দ্বীনের যাবতীয় বিধি-নিষেধকে মেনে চলতে পারি এবং মৌখিক ও বাস্তব জীবনে কাজের মাধ্যমে স্বাক্ষ্য দিতে পারি, তাহলে রাসূল (সঃ) হবেন আমাদের জন্য স্বাক্ষী আর আমরাও হতে পারবো গোটা মানব জাতির জন্য স্বাক্ষী।

০ মুসলিম জাতি হিসেবে পরিচয় দানকারী প্রথম যে মৌলিক ইবাদত নামায তা যথাযথ নিয়ম-কানুন মেনে পূর্ণভাবে আদায় করা এবং পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রিয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করা।

০ মুসলিম জাতি হিসেবে অর্থ-সম্পদকে পবিত্রকারী এবং দারিদ্রতা বিমোচনকারী মৌলিক যে ইবাদত যাকাত আদায় করা।

০ আল্লাহকে মজবুতভাবে ধারণ করা। অর্থাৎ সকল ক্ষেত্রে তাঁর উপরই ভরসা করা, তাকেই সাহায্যকারী বনানো, তার উপরই আশা-ভরসা রাখা, তাকেই আশ্রয়দানকারী শত্রুদের বিরুদ্ধে মোকাবেলাকারী বানানো, মঙ্গল-অমঙ্গলের মালিক তাকেই বানানো, তারই হেদায়াত মতো চলা, তার বিধি-বিধানকে সকল ক্ষেত্রে মান্য করা। অর্থাৎ সকল ক্ষেত্রে তাকেই উত্তম অভিভাবক বানানো।

আহ্বান ঃ প্রিয় ভাইয়েরা ও বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা হজ্জের সর্বশেষ আয়াতের দারস পেশ করতে যেসব তথ্য, তত্ত্ব, ব্যাখ্যা এবং শিক্ষা পেশ করা হলো, এতে যদি আমার অজান্তে কোন ভুল-ত্রুটি এবং বাড়াবাড়ি হয়ে যায় তার জন্য মহান আল্লাহর কাছে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর এই দারস থেকে আমরা যেসব গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা লাভ করলাম তা যেন সকলেই বাস্তব জীবনে আ'মল করে আখিরাতের চিরস্থায়ী কল্যাণ লাভ করতে পারি, আল্লাহর কাছে সেই তাওফীক কামনা করে আমি আমার দারস শেষ করছি। অয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন।

আট

শেষ রাতের নামায ও কুরআন তিলাওয়াত তাক্‌ওয়ার জন্য খুব বেশী ফলদায়ক

সূরা মুয্‌যাম্মিল ১ - ১৩ আয়াত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلاَمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى
اَمَّابَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰاَيُّهَاالْمُزَّمِّلُ ○ قُمِ الَّيْلَ اِلَّاقَلِيْلاً ○ نِّصْفَهٗٓ اَوِانْقُصْ مِنْهُ
قَلِيْلاً ○ اَوْزِدْعَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلاً ○ اِنَّا سَنُلْقِيْ
عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيْلاً ○ اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْئًاوَّاَقْوَمُ
قِيْلاً ○ اِنَّ لَكَ فِى النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلاً ○ وَاذْكُرِ اسْمَ
رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلاً ○ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآاِلٰهَ
اِلَّاهُوَفَاتَّخِذْهُ وَكِيْلاً ○ وَاصْبِرْعَلٰى مَايَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ
هَجْرًا جَمِيْلاً ○ وَذَرْنِيْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ اُوْلِى النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ
قَلِيْلاً ○ اِنَّ لَدَيْنَآ اَنْكَالاً وَّجَحِيْمًا ○ وَّطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ
وَّعَذَابًا اَلِيْمًا ○

সরল অনুবাদ ঃ ইরশাদ হচ্ছে- (১) হে চাঁদর মুড়ি দিয়ে শয়নকারী! (২) রাত্রিতে দাঁড়িয়ে যান কিছু অংশ বাদ দিয়ে। (৩) অর্ধরাত্রি অথবা তার চেয়েও কিছু কম (৪) অথবা তার চেয়েও কিছু বেশী এবং কুরআন তিলাওয়াত করুন থেমে থেমে, স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে। (৫) আমি আপনার উপর নাযিল করবো এক গুরুত্বপূর্ণ বাণী। (৬) প্রকৃতপক্ষে (ইবাদাতের জন্যে) রাতে উঠা প্রবৃত্তি দমনে খুবই সহায়ক এবং কুরআন যথাযথ ভাবে পড়ার জন্য অনুকুল। (৭) দিনের বেলায় তো আপনার খুব কর্মব্যস্ততা।

(৮) সুতরাং আপনি আপনার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করুন এবং সবকিছু হতে বিচ্ছন্ন হয়ে একমাত্র তার জন্যই হয়ে যান। (৯) তিনি তো পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তের মালিক-অধিকর্তা। তিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। কাজেই তাকেই উকিল (অভিভাবক) বানিয়ে নিন। (১০) আর কাফির লোকেরা যেসব কথা-বার্তা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে তার জন্য আপনি ধৈর্য ধারণ করুন এবং সৌজন্যতার সাথে তাদেরকে পরিহার করে চলুন। (১১) আর এসব বিত্তশালী বিলাসী মিথ্যাচারী লোকদের বুঝা-পড়ার কাজটি আমার উপর ছেড়ে দিন। আর কিছু সময়ের জন্য এসব লোকদেরকে এই অবস্থার উপরই থাকতে দিন। (১২) (এদের জন্য) আমার কাছে আছে শিকল (বেড়ী) ও দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা আগুন (১৩) আর আছে গলায় আটকিয়ে যাওয়া খাদ্য এবং কঠিন পীড়াদায়ক আযাব।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ يَاَيُّهَا -হে/ ওহে। الْمُزَّمِّلُ -বস্ত্রাবৃত/চাঁদর মুড়ি দিয়ে শয়নকারী। قُمْ -উঠুন। لَيْلَ -রাতে। اِلَّا -ব্যতীত/ছাড়া। قَلِيْلًا -কিছু অংশ। نِصْفَهُ -তার অর্ধেক। اَوْ -বা/অথবা। اِنْقُصْ -কম করুন। مِنْهُ -তা থেকে। قَلِيْلًا -সামান্য। زِدْ -বাড়ান। عَلَيْهِ -তার উপর। وَ -এবং। رَتِّلْ -ধীরে ধীরে তিলাওয়াত করুন। تَرْتِيْلًا -স্পষ্টভাবে/ধীরে ধীরে/সুন্দরভাবে। اِنَّا - আমরা নিশ্চয়। سَنُلْقِىْ - শিঘ্রই অর্পণ করবো। عَلَيْكَ -আপনার উপর। قَوْلًا -বাণী/বার্তা। ثَقِيْلًا -ভারী। اِنَّ -নিশ্চয়। نَاشِئَةَ -উত্থান/শয্যাত্যাগ। الَيْلِ -রাত্রিকালের। هِىَ -তা। اَشَدُّ -প্রবলতর। وَطْئًا -প্রবৃত্তি দলনে। اَقْوَمُ -সঠিকতর/খুবই সহজতর। قِيْلًا -বাক্যস্ফুরণে। لَكَ -আপনার জন্যে। فِى النَّهَارِ -দিনের মধ্যে/বেলায়। سَبْحًا -ব্যস্ততা। طَوِيْلًا -দীর্ঘ। وَاذْكُرْ -এবং স্মরণ করুন। اِسْمَ -নাম। رَبِّكَ -আপনার মা'বুদের/প্রতিপালকের। تَبَتَّلْ -সবকিছু থেকে বিচ্ছন্ন হয়ে। اِلَيْهِ -তার দিকে/জন্য। تَبْتِيْلًا -হয়ে যান। رَبُّ -প্রতিপালক/অধিকর্তা। الْمَشْرِقِ -পূর্বদিগন্ত। وَالْمَغْرِبِ -পশ্চিম দিগন্ত। لَا اِلٰهَ -কোন ইলাহ/মা'বুদ নেই। هُوَ -তিনি। فَاتَّخِذْهُ -অতএব তাকে গ্রহন করুন/বানিয়ে নিন। وَكِيْلًا -উকিল/ কর্মবিধায়ক। وَاصْبِرْ -

এবং আপনি ধৈর্য্যধারণ করুন। عَلٰى -উপর/বিষয়ে/ব্যাপারে। مَا -যা। يَقُوْلُوْنَ -তারা (কাফিররা) কথাবার্তা বলে। وَاهْجُرْهُمْ -এবং তাদেরকে পরিহার করুন। هَجْرًا جَمِيْلًا - উত্তম পরিহার। ذَرْنِىْ- আমার উপর ছেড়ে দিন। اَلْمُكَذِّبِيْنَ-মিথ্যাচারী/মিথ্যাবাদী লোকদেরকে। اُولِى النَّعْمَةِ -বিত্তশালী, বিলাসী। مَهِّلْهُمْ -তাদেরকে এই অবস্থায় থাকতে দিন। قَلِيْلًا -কিছু সময়ের জন্য। لَدَيْنَا -আমার কাছে আছে। اَنْكَالًا -শিকল/বেড়ী। جَحِيْمًا -জলন্ত আগুন। طَعَامًا -খাদ্য/খাবার। ذَاغُصَّةٍ -গলায় আটকিয়ে যাওয়া। عَذَابًا -আযাব/শাস্তি। اَلِيْمًا -কষ্টদায়ক/কঠিন পীড়াদায়ক।

সম্বোধন ঃ দারসে কুরআন মাহফিলে/অনুষ্ঠানে উপস্থিত ইসলাম প্রিয় দ্বীনদার ভাইয়েরা/বোনেরা! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আমি আপনাদের সামনে সূরা মুয্যাম্মিল এর ১ থেকে ১৩ নম্বর আয়াত পর্যন্ত তিলাওয়াত ও সরল অনুবাদ পেশ করেছি। আল্লাহ পাক যেন আমাকে আপনাদের সামনে সহীহ্ সালামতে এবং সঠিকভাবে দারস পেশ করার তাওফীক দান করেন। "অমা তাওফীকি ইল্লাবিল্লাহ"।

সূরার নামকরণ ঃ সূরার প্রথম আয়াতে উল্লেখিত اَلْمُزَّمِّلُ শব্দটিকেই সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। আল কুরআনের অন্যান্য সূরার ন্যায়ও এই সূরাটি প্রতীকী বা চিহ্ন হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। কেননা, এই সূরার নামের সাথে বিষয়বস্তুর তেমন কোন মিল নেই। সুতরাং এই সূরাটির নাম কোন শিরোনাম হিসেবে নামকরণ করা হয়নি।

সূরাটি নাযিল হওয়ার সময়কাল ঃ সূরাটির দু'টি রুকু। দু'টি রুকুই পৃথক পৃথক সময়ে নাযিল হয়েছে।

প্রথম রুকুর আয়াতগুলো সর্বসম্মতভাবে মাক্কী। কেননা, এর বিষয়বস্তু ও বিভিন্ন হাদীস থেকে তারই প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে মাক্কী জীবনের কোন্ সময় এটা নাযিল হয় তা হাদীস দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে আয়াতগুলোর বিষয়বস্তু আলোচনা করলে কোন্ সময় নাযিল হয়েছে তা প্রমাণের সাহায্য পাওয়া যায়। যেমন–

প্রথমত ঃ এতে নবী করীম (সঃ) কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আপনি রাত্রিকালে বিছানা ত্যাগ করে উঠুন এবং আল্লাহর ইবাদাতে মনোনিবেশ করুন। তাহলে আপনার উপর নবুওতের বিরাট বোঝা বহন এবং অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার শক্তি অর্জন করা সম্ভব হবে। এ থেকেই জানা যায় যে, নবী করীম (সঃ) এর নবুয়তী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে এই নির্দেশ নাযিল হয়েছিলো। কেননা, এই প্রাথমিক পর্যায়ে নবুয়াতের দায়িত্ব পালনের জন্য রাসূলে কারীম (সঃ) কে আল্লাহর পক্ষ থেকে তারবিয়াত বা প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছিলো।

দ্বিতীয়ত ঃ এতে তাহাজ্জুদ নামাযে অর্ধেক রাত পর্যন্ত কিম্বা তা থেকে কিছুটা কম বা বেশী সময় কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই নির্দেশ থেকে এটাই জানা যায় যে, এই রুকুর আয়াত কয়টি যখন অবতীর্ণ হয়েছিলো, তখন কুরআন মজীদের অন্তত এতোটা অংশ অবতীর্ণ হয়েছিলো যা দীর্ঘ সময় ধরে তিলাওয়াত করা যায়।

তৃতীয়ত ঃ এই আয়াতসমূহে খোদাদ্রোহী শক্তির সকল প্রকার বাধা এবং অত্যাচারমূলক আচরণের মোকাবেলার জন্য নবী করীম (সঃ) কে চরম ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেয়া হয়েছে। আর সেই সঙ্গে মক্কার কাফিরদেরকে আযাবের ভয় দেখানো হয়েছে। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, এই সূরার প্রথম রুকুর আয়াতসমূহ তখন অবতীর্ণ হয় যখন নবী করীম (সঃ) প্রকাশ্যভাবে ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন, ফলে মক্কায় তাঁর বিরোধিতাও প্রবলভাবে শুরু হয়ে গিয়েছিলো।

দ্বিতীয় রুকুর আয়াতসমূহ নাযিলের ব্যাপারে অনেক তাফসীরকারকই একমত পোষণ করেছেন যে, এই রুকুটিও মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু অপর কয়েকজন তাফসীরকারক মত দিয়েছেন যে, উহা মাদানী জীবনে অবতীর্ণ। আর আয়াতগুলোর মূল বিষয়বস্তু থেকে তারই প্রমাণ পাওয়া যায়। কেননা, এই আয়াতসমূহে আল্লাহর পথে সশস্ত্র যুদ্ধ করার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু মক্কায় এই যুদ্ধের কোন প্রশ্নই উঠে না। তাছাড়া আয়াতগুলোতে ফরজ যাকাত আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর এই ব্যাপারে সবাই একমত যে, যাকাতের নির্দিষ্ট হার এবং নিছাবের পরিমান মাদানী জীবনেই ফরয হয়েছিলো। (আল্লাহই ভাল জানেন)

সূরার বিষয়বস্তু ঃ সূরার প্রথম সাতটি আয়াতে নবী করীম (সঃ) কে নির্দেশ

দেয়া হয়েছে যে, নবুয়াতের যে বিরাট কাজের বোঝা আপনার উপর অর্পণ করা হয়েছে সেই দ্বায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার জন্য আপনি নিজেকে প্রস্তুত করুন। আর নিজের প্রবৃত্তিকে প্রস্তুত করার কর্মসূচী হিসেবে আপনি অর্ধেক রাত্রি বা তার চেয়ে কিছুটা কম বা বেশী সময় ধরে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করুন।

সূরার ৮ হতে ১৪ নম্বর আয়াতসমূহে নবী করীম (সঃ) কে সবকিছু থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একমাত্র মুনিব-মাওলা আল্লাহর জন্য অনুগত হয়ে যাবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর হে নবী, নিজের বিষয়গুলো আল্লাহর উপর ন্যাস্ত করে আপনি নিশ্চিত থাকুন। বিরোধিরা যা কি করে এবং যা কিছু বলে তার জন্য আপনি ধৈর্য ধারণ করুন এবং তাদেরকে মোকাবেলা করার বিষয়টি আল্লাহর উপর ছেড়ে দিন।

সূরার ১৫ থেকে ১৯ নম্বর আয়াতসমূহে বিরুদ্ধবাদী মক্কার কাফিরদের সাবধান করে দিয়ে মহান আল্লাহ্ বলেন, আমি তাদের প্রতি একজন রাসূল পাঠিয়েছি। যেমন করেফিরাউনের প্রতিও রাসূল পাঠিয়েছিলাম। অতঃপর লক্ষ্য করো-ফিরাউন যখন আল্লাহর রাসূলকে অমান্য ও অগ্রাহ্য করলো, তখন সে করুন পরিণতির সম্মুখীন হয়েছিলো। অতএব তোমরা যদি রাসূলের সাথে অনুরূপ আচরন করো তাহলে তোমাদের পরিণতিও অনুরূপ হতে পারে। আর যদি দুনিয়ায় নাও হয়, তবে আখিরাতের পরিণতি থেকে কিভাবে উদ্ধার পাবে? কেউ তোমাদেরকে তোমাদের পাপের শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত সূরার প্রথম রুকুর আয়াতসমূহের বিষয়বস্তু আলোচনা করা হলো। অতঃপর দ্বিতীয় রুকু অবতীর্ণ হয় প্রথম রুকুর প্রায় দশ বছর পরে। এ ধরণের বর্ণনা হযরত সায়ীদ ইবনে যুবাইর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। প্রথম রুকুতে বলা 'তাহাজ্জুদ' নামাযটি এই রুকুতে অনেকটা হালকা ও সহজ সাধ্য করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে তাহাজ্জুদ নামায যতটা সহজে আদায় করা যায়, সেই চেষ্টায় করবে। কিন্তু মুসলিম সমাজ সর্বত্র সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করবে ফরজ নামাযে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায পূর্ণ সতর্কতা ও সুষ্ঠতার সাথে আদায় করবে। ফরজ যাকাত যথা নিয়মে আদায় করবে এবং আল্লাহর ওয়াস্তে নিজের ধন-সম্পদ খরচ করতে থাকবে।

সূরার শেষ অংশে মুসলমানদের উপদেশ দিয়ে বলা হচ্ছে, দুনিয়ায় তোমরা যে ভালো ভালো কাজ করো তা কখনই নষ্ট ও নিস্ফল হবে না। তোমরা দুনিয়াতে থাকতেই যেই সম্পদ অগ্রীম পাঠিয়ে দিয়েছো তা তোমরা আল্লাহর নিকট পৌছিয়ে ঠিকঠাক এবং যথাযথ ভাবেই মৌজুদ পেয়ে যাবে। এই অগ্রীম পাঠানো সামগ্রী-সরঞ্জাম তোমাদের দুনিয়ায় রেখে যাওয়া দ্রব্য-সামগ্রীর তুলনায় অধিক উত্তমই নহে বরং আল্লাহর নিকট তোমরা তোমাদের পাঠানো আসল সম্পদ হতে অনেক বেশী বেশী প্রতিদান পাবে।

ব্যাখ্যা ঃ দারসে কুরআন মাহফিলে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা ও বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত সূরাটির ব্যাখ্যা সহজভাবে অনুধাবন করার জন্য প্রাথমিক অথচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা হলো। এখন আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা ধারাবাহিকভাবে পেশ করছি। সূরার প্রথমেই নবীজীকে নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন–

يَاَيُّهَاالْمُزَّمِّلُ **ওহে চাঁদর মুড়ি দিয়ে শয়নকারী।**

আয়াতের প্রথমেই يَاَيُّهَاالرَّسُوْلُ (হে রাসূল) বা يَاَيُّهَاالنَّبِيُّ (হে নবী) না বলে يَاَيُّهَاالْمُزَّمِّلُ বলে সম্বোধন করে ডাকার পেছনে কয়েকটি কারণ হতে পারে। যেমন–

এক. এভাবে সম্বোধন করার পেছনে এক প্রকারের করুণা এবং অনুগ্রহ আছে। করুণা প্রকাশার্থে স্নেহ ও ভালবাসায় আপ্লুত হয়ে সাময়িক অবস্থার দ্বারাও কাউকে সম্বোধন করা হয়ে থাকে। (রুহুল মা'আনী)

দুই. মন খরাপ করে চাঁদর মুড়ী দিয়ে থাকা অবস্থায় তাঁকে এভাবেই কোনো কাজের নির্দেশ দেয়ার জন্য সম্বোধন করে থাকতে পারেন। যেমন–

ইবনে কাসীরে একটি বর্ণনা রয়েছে– মুসনাদে বায্যারে হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, কুরাইশের মুশরিকরা তাদের সম্মেলন কেন্দ্র "দারুন নদুআতে" একত্রিত হয়ে পরস্পর বলাবলি করলো যে, এসো আমরা এই লোকের (মুহাম্মদের) এমন একটি নাম ঠিক করি যাতে সবার মুখ দিয়ে একই নাম শুনা যায়। তখন কেউ কেউ বললো- তার নাম 'কাহিন' (গণক) রাখা হোক। একথা শুনে অন্যরা বললো, প্রকৃতপক্ষে সেতো কাহিন (গণক) নয়। তখন অন্য একটি প্রস্তাব উঠলো যে, তাহলে

তার নাম 'মাজনুন' (পাগল) রাখা হোক। এই প্রস্তাবের উপরেও অন্যরা আপত্তি তুললো যে, সেতো মাজনুন (পাগল) নয়। এরপর প্রস্তাব করা হলো যে, তাহলে তার নাম 'সাহির' (যাদুকর) রাখা হোক। কিন্তু এ প্রস্তাবও প্রত্যাখান হলো এবং বলা হলো যে, সেতো সাহিরও (যাদুকর) নয়। মোট কথা তারা তাঁর তেমন এমন কোন খারাপ নাম ঠিক করতে পারলো না যাতে সবাই একমত হতে পারে। এভাবেই ঐ মজলিশ (সভা) ভেঙ্গে গেল। তাদের একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) চাঁদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন। এমতাবস্থায় হযরত জিবরীল আমীন তাঁর নিকট আসলেন এবং يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ বলে সম্বোধন করলেন। (ইবনে কাসীর)

তিন. একথা দিয়ে এও হতে পারে যে, তিনি (সঃ) স্বাভাবিক ভাবেই চাঁদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন। তাঁকে এ অবস্থায় ডাকতে গিয়ে 'হে নবী' বা 'হে রাসূল' না বলে 'হে চাঁদর মুড়ি দিয়ে শয়নকারী' বলে সম্বোধনের পেছনে একটি সুক্ষ্ম তাৎপর্য আছে। এতে বুঝা যায় যে, চাদর মুড়ি দিয়ে আরামে পা ছাড়িয়ে দিয়ে শুয়ে থাকার সময় শেষ হয়ে গেছে, এখন তাঁর উপর একটি বিশেষ কাজের দ্বায়িত্ব অর্পিত হচ্ছে যা অন্য রকমের এবং পূর্বাপেক্ষা ভিন্নতর। (তাফহীমূল কুরআন)

চার. 'হে চাদর দিয়ে আবৃত' কথাটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ এও হতে পারে যে, "হে কুরআনকে উত্তমভাবে গ্রহণকারী"। কেননা, রাসূল (সঃ)-ই একমাত্র কুরআনকে উত্তমভাবে আঁকড়ে ধরতে পারেন, আর কেউ নয়। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ (আল্লাহই ভাল জানেন)

নবী করীম (সঃ) কে এভাবে সম্বোধন বা ডাকার পর মহান আল্লাহ পরবর্তী আয়াতে নির্দেশ দিয়ে বলেন-

قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا -রাত্রিতে (নামাযের জন্য) দণ্ডায়মান হোন কিছু অংশ বাদ দিয়ে।

এই আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা মহানবী (সঃ) কে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, হে নবী (সঃ) আপনি রাত্রিকালে চাদর মুড়ি দিয়ে শয়ন করা ত্যাগ করে উঠুন এবং তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে যান। যেমন অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন–

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ -

"তারা শয্যা ত্যাগ করে তাদের রবের ডাকে আশায় ও আশংকায়, আর আমি তাদেরকে যে রিযিক দান করেছি তা হতে তারা খরচ করে।"

(সূরা সাজদা- ১৬)

রাসূলুল্লাহ (সঃ) সারা জীবন এই নির্দেশ পালন করে গেছেন।

اِلَّا قَلِيْلًا -**কিছু অংশ বাদ দিয়ে**। এ কথাটির দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হলো- হে নবী (সঃ) রাত্রিটা নামাযে দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দিন। আর উহার কম অংশ ঘুমানোর কাজে ব্যয় করুন। আর দ্বিতীয় অর্থ হলো- সারা রাতটাই নামাযে কাটিয়ে দিন- হে নবী এমন কথা আপনাকে বলা হচ্ছে না। বরং সেই সঙ্গে আপনি বিশ্রামও করুন।

অবশ্য অন্য আয়াতে প্রথম অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন-

আল্লাহ বলেন- وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهٗ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا

"রাতের বেলা আল্লাহর সামনে সিজদাবত হয়ে থাকুন এবং রাতে দীর্ঘ সময় তাঁর তাস্‌বীহ করে কাটিয়ে দিন।" (সূরা দহর- ২৬)

তাহাজ্জুদের নামায রাসূল (সঃ) এর জন্য কি ফরয ছিলো ঃ

ইবনে কাসীর (রহঃ) বলেন, তাহাজ্জুদের নামায রাসূল (সঃ) এর জন্য ফরজ ছিলো এবং উম্মতের জন্য ওয়াজিব নয়। যেমন তিনি নিম্নের আয়াত উল্লেখ করেন- وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا

"আর আপনি রাতের কিছু অংশ তাহাজ্জুদ কায়েম করুন। এটা আপনার জন্য এক অতিরিক্ত কর্তব্য। আশা করা যায় যে, আপনার রব আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে।"(সূরা বনি ইসরাঈল-৭৯)

মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী' (রহঃ) তাফসীরে মা'রিফুল কুরআনে উল্লেখ করেন যে, আলোচ্য আয়াতগুলো কুরআন নাযিলের প্রাথমিক যুগে নাযিল হয়েছে। তখনও পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ হয়নি। পাঁচ ওয়াক্ত নামায মি'রাজের রাতে ফরজ হয়।

হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাঃ) প্রমুখের হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম বগভী (রহঃ) বলেন, এই আয়াতের আলোকে তাহাজ্জুদ অর্থাৎ রাতের নামায রাসূলুল্লাহ (সঃ) ও সমস্ত উম্মতের উপর ফরজ ছিলো। এই নির্দেশ পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ হবার পূর্বের কথা।

এই আয়াতে তাহাজ্জুদের নামায শুধু ফরজই করা হয়নি; বরং তাতে এক চতুর্থাংশ সময় মশগুল থাকাও ফরয করা হয়েছে। কারণ, আয়াতের মূল নির্দেশ হচ্ছে কিছু অংশ বাদে সমস্ত রাত্রি নামাযে মশগুল থাকা।

ইমাম বগভী (রহঃ) বলেন, এই হুকুম পালন করতে যেয়ে, রাসূল (সঃ) ও সাহাবায়ে কিরাম রাতের অধিকাংশ সময় তাহাজ্জুদ নামাযে ব্যয় করতেন। ফলে তাদের পা দু'টি দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ফুলে যেত এবং হুকুমটি বেশ কষ্টকর হয়। এক বছর পর এই সূরার শেষাংস – فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ নাযিল হলে দীর্ঘক্ষণ নামাযে দাঁড়িয়ে থাকার বাধ্যবাধকতা রহিত করে দেয়া হয় এবং বিষয়টি ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়ে বলা হয় যে, যতক্ষণ নামায পড়া সহজ মনে হয়, ততক্ষণ নামায পড়াই তাহাজ্জুদের জন্য যথেষ্ট। এই বিষয়বস্তু আবু দাউদ ও নাসায়ীতে হযরত আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, মি'রাজের রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ হওয়ার হুকুম অবতীর্ণ হলে তাহাজ্জুদের (ফরযের) আদেশ রহিত হয়ে যায়। তবে এর পরেও তাহাজ্জুদ সুন্নত থেকে যায়। কারণ, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ও অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরাম সর্বদা নিয়মিতভাবে তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন। (তাফসীরে মাযহারী)

হাদীসে পাওয়া যায় রাসূলুল্লাহ (সঃ) যুদ্ধের সফরেও তাহাজ্জুদের নামায বাদ দিতেন না, এমন কি সওয়ারীর উপরও এই নামায আদায় করতেন। মা আয়িশার বর্ণিত হাদীসে আরও পাওয়া যায়, ঘুম অথবা দুঃখ কষ্ট কিম্বা রোগের কারণে রাতে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করতে না পারলে দিনের বেলায় তিনি তা বার রাকায়াত আদায় করে নিতেন। (সহীহ মুসলিম) অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) জীবদ্দশায় কোন রাতই তাহাজ্জুদ নামায পড়া বাদ দেন নাই।

অতঃপর আল্লাহ তা'য়ালা পরবর্তী আয়াতে রাত্রি কতটুকু তাহাজ্জুদে অতিবাহিত করতে হবে তার ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন–

نِصْفَهٗٓ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ○ اَوْ زِدْ عَلَيْهِ

অর্ধরাত্রি বা তার চেয়েও কিছু কম অথবা তার চেয়েও কিছু বেশী নামাযে মশগুল হোন।

إِلَّا قَلِيلًا -ব্যতিক্রমধর্মী বর্ণনা। তাই প্রশ্ন সৃষ্টি হয় যে, অর্ধেক রাত্রি তো কিছু অংশ হতে পারে না? উত্তর এই যে, রাতের প্রথম অংশ তো মাগরীব ও ঈশা নামাযে অতিবাহিত হয়ে যায়। এখন অর্ধেকের অর্থ হবে বাকী রাতের অর্ধেক। সেটা সারা রাতের তুলনায় কিছু অংশ। এই আয়াতে অর্ধরাতের কমেরও অনুমতি আছে আবার বেশীরও অনুমতি আছে। তাই সামষ্টিকভাবে বিশ্লেষণ করলে সারমর্ম এই হয় যে, কমপক্ষে রাতের এক চতুর্থাংশ বা চার ভাগের এক ভাগের চেয়ে কিছু বেশী সময় নামাযে মশগুল থাকা। বেশীটুকু নিজের এখতিয়ারের উপর নির্ভর করে।

অতঃপর আয়াতের শেষাংশে মহান আল্লাহ তা'আলা কুরআন তিলাওয়াতের পদ্ধতি শিখিয়ে বলেন- وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا

আর কুরআন পাঠ করুন থেমে থেমে স্পষ্ট ও সুন্দর ভাবে।

تَرْتِيْلًا -এর কয়েকটি অর্থ রয়েছে। যেমন- ধীরে ধীরে, স্পষ্ট ভাবে, সুন্দর ভাবে, অনুধাবন করে ইত্যাদি। অর্থাৎ দ্রুততার সাথে খুব তাড়াতাড়ি না পড়া, যেভাবে আমাদের সমাজের অধিকাংশ কুরআনে হাফিজ সাহেবানরা পাঠ করে থাকেন। বরং ধীরে ধীরে পাঠ করা, এক একটি শব্দ মুখে উচ্চারণ করা এবং প্রতিটি আয়াতে থামা। যেন আল্লাহর কালামের অর্থ ও তাৎপর্য পূর্ণমাত্রায় তিলাওয়াতকারী ও শ্রবণকারীর হৃদয়ঙ্গম হয়, উহার বিষয়বস্তু মনের মধ্যে গেঁথে যায় এবং মন উহা গ্রহণে প্রভাবিত হয়। কুরআনের যে জায়গায় আল্লাহর সত্তা ও তাঁর গুণাবলীর কথা বর্ণনা করা হয়েছে সেই জায়গা তিলাওয়াত করার ফলে আল্লাহর বিরাটত্ব ও মহানত্ব পাঠকের মনে-দেলে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। কোথাও হয়তো আল্লাহর রহমতের উল্লেখ রয়েছে তা তিলাওয়াত করার সাথে সাথে পাঠকের অন্তর আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ে উচ্ছসিত হয়ে উঠে। যে আয়াতে আল্লাহর গযব-আযাবের উল্লেখ রয়েছে তা তিলাওয়াত করার ফলে স্বাভাবিক ভাবেই তিলাওয়াতকারীর অন্তরে ভয় ও আতংক-জেগে উঠে। কোথাও কোনো জায়গায় কোনো কাজের আদেশ করা হয়েছে বা কোথাও কোনো কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে, এসব আয়াত পাঠ করার সাথে সাথে হৃদয়-মন যেন তা অনুধাবন করতে পারে।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) এমন হৃদয়ঙ্গম সহকারে কুরআন তিলাওয়াত করতেন যে- হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রাঃ) বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "একবার আমি রাতের নামায (তাহাজ্জুদে) রাসূলে করীম (সঃ) এর সাথে দাঁড়িয়ে

গেলাম। তখন দেখলাম, তিনি কুরআন তিলাওয়াত করছেন এভাবে যে, যেখানে আল্লাহর তাস্‌বীহ করা হয়েছে, সেখানে তিনি তাস্‌বীহ পাঠ করছেন। যেখানে দোয়া করার সুযোগ আসতো সেখানে তিনি দোয়া করছেন। যেখানে আল্লাহর কাছে আশ্রয় গ্রহণের বিষয় হতো, সেখানে তাঁর নিকট তিনি পানাহ চাইতেন।" (সহীহ মুসলিম, নাসায়ী)

হযরত আবু যর (রাঃ) থেকে আরো একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ (সঃ) একবার রাতের (তাহাজ্জুদ) নামাযে কুরআন তিলাওয়াত করতে করতে যখন তিনি–

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

"হে আল্লাহ! তুমি যদি তাদের আযাব দাও, তবে (তুমি তা দিতে পারো) তারা তো তোমারই বান্দাহ মাত্র। আর তুমি যদি তাদের ক্ষমা করে দাও, তবে (তা করারও তোমার ক্ষমতা আছে) তুমি তা করতে পারো। কেননা, তুমি তো প্রতাপশালী ও মহাবিজ্ঞানী।" আয়াত পর্যন্ত পৌছলেন, তখন তিনি (তাতে এতই অভিভুত হয়ে গেলেন যে) এই আয়াতটি বারবার পাঠ করতে লাগলেন। আর এভাবেই ভোর হয়ে গেল।

(সহীহ বুখারী, মুসনাদে আহমাদ)

রাসূল (সঃ) এর কুরআন তিলাওয়াতের পদ্ধতি ঃ

নবী করীম (সঃ) কিভাবে কুরআন তিলাওয়াত বা পাঠ করতেন তা হযরত আনাস (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। জবাবে তিনি বলেছিলেন যে, তিনি (সঃ) প্রতিটি শব্দ টেনে টেনে দীর্ঘ করে পড়তেন। তিনি উদাহরণ হিসেবে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়ার কথা উল্লেখ করে বললেন যে, তাতে তিনি (সঃ) اَللّٰهُ - رَحْمٰنِ - رَحِيْمِ এই শব্দগুলি খুব বেশী টেনে টেনে পড়তেন। (সহীহ বুখারী)

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) কে অনুরূপ প্রশ্ন করা হলে তিনিও বললেন, "রাসূলে করীম (সঃ) এক একটি আয়াত আলাদা আলাদা করে পাঠ করতেন এবং প্রত্যেকটি আয়াত পাঠ করে থেমে যেতেন। যেমন- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ পড়ে থামতেন। তারপর اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়ে থামতেন। তারপর পড়তেন– مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ "

(মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী)

অপর একটি বর্ণনায় হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বলেছেন, "নবী করীম (সঃ) কুরআনের এক একটি শব্দ স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে পাঠ করতেন।"

(তিরমিযী, নাসায়ী)

সুন্দর লিহান বা সুরে কুরআন তিলাওয়াত করা ঃ

ترتيل এর একটি অর্থ হলো, খুব সুন্দর ও মিষ্টি সুরে কুরআন তিলাওয়াত করা। যেমন হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কুরআনকে নিজের সুর দ্বারা সৌন্দর্য মন্ডিত করো এবং ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে মিষ্টি সুরে কুরআন তিলাওয়াত বা পাঠ করে না। আর হযরত আবু মুসা আল আশআরী (রাঃ) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর এ মন্তব্য করা যে, "তাকে হযরত দাউদ (আঃ) এর বংশধরের মধুর সুর দান করা হয়েছে" এবং হযরত মুসা (আঃ) এর এ কথা বলা, "আমি যদি জানতাম যে, (হে নবী সঃ) আপনি আমার কুরআন তিলাওয়াত শুনেছেন তাহলে আমি আরও উত্তম ও মধুর সুরে পড়তাম।"

কুরআন তিলাওয়াত খুব দ্রুত এবং কবিতার মতো পাঠ না করা ঃ

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, তোমরা বালুকার মতো কুরআনকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিও না এবং কবিতার মতো কুরআনকে অভদ্রতার সাথে পাঠ করো না। এর চমৎকারিত্বের প্রতি খেয়াল রেখো এবং অন্তরে তা অনুধাবন করো। আর সূরা তাড়াতাড়ি শেষ করার পেছনে লেগে পড়ো না।"

(ইবনে কাসীর। ইমাম বগভী রহঃ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)

একবার এক লোক এসে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) কে বললো যে, আমি মুফাস্সালের সমস্ত সূরা আজ রাতে একই রাকায়াতে পাঠ করে ফেলেছি। তার একথা শুনে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) তাকে বললেন, তা হলে সম্ভবতঃ তুমি কবিতার মতো তাড়াতাড়ি করে পাঠ করে থাকবে। ঐ সূরাগুলো আমার বেশ মুখস্ত আছে যেগুলো রাসূলুল্লাহ (সঃ) মিলিয়ে পড়তেন। তারপর তিনি মুফাস্সাল সূরাগুলোর মধ্য থেকে বিশিষ্ট সূরার নাম লিখেন যেগুলোর দু'টি করে সূরা মিলিত করে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এক এক রাকায়াতে পাঠ করতেন। (ইবনে কাসীর)

আফসোস! আমাদের সমাজের ইমাম সাহেবানরা বিশেষ করে হাফিযে কুরআন"এরা রমযানে "খতমে তারাবীর" নামে কি করছেন ? তারা কি

কুরআনকেই খতম করে দিচ্ছেন না? নেকী লাভের পরিবর্তে গোনাহ কামাই করছেন না? আল্লাহ ঐ সমস্ত অবুঝ ভাইদেরকে বুঝ দান করুন। আমীন।

কুরআন ধীরে ধীরে স্পষ্টভাবে পাঠকারীর মর্যাদা ঃ

যারা কুরআনকে تَرْتِيل এর সাথে নবী করীম (সঃ) এর পদ্ধতি অনুযায়ী পাঠ করেন, তাদের সম্পর্কে হাদীসে বর্ণনা রয়েছে। "হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কুরআনের পাঠককে কিয়ামতের দিন বলা হবেঃ পড়তে থাকো এবং ধীরে ধীরে ও স্পষ্টভাবে পড়তে থাকো যেভাবে দুনিয়ায় তুমি পাঠ করতে। তোমার মনযিল ও মরতবা বা মর্যাদা হলো ওটা যেখানে তোমার আখিরী আয়াত শেষ হয়।" (মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আমাদের কিরাত বা কুরআন তিলাওয়াত কেমন হওয়া উচিত তা আমরা উপরের বর্ণনা থেকে শিক্ষা নিয়ে আ'মল করতে পারি। আর যদি আমরা অশুদ্ধভাবে আয়াতে আয়াতে না থেমে দ্রুততার সাথে কবিতার মতো আউড়িয়ে অন্তরে ছোয়া না লাগিয়ে বুলবুলি পাখীর মতো না বুঝে পড়ি, তাহলে আমাদের জীবনে কুরআনের যেমন প্রভাব পড়বে না তেমনি গোনাহর পাল্লাহও হবে ভারী। আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন।

অতঃপর পরবর্তী আয়াতে মহান আল্লাহ মহানবী (সঃ) কে এক অতি মহান দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন- إِنَّا سَنُلْقِىْ عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيْلاً **নিশ্চয় আমি আপনার উপর নাযিল করবো এক গুরুত্বপূর্ণ (ভারী) বাণী।**

এখানে قَوْلاً ثَقِيْلاً 'ভারী ও দুর্বহ বাণী' বলতে আল কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। আল কুরআন এমনই এক ভারী ও দুর্বহ বাণী যা একমাত্র আল্লাহর নবীর পক্ষেই বহন করা সম্ভব। আর অন্য কোন সৃষ্টির পক্ষেই বহন করা সম্ভব নয়। যেমন মহান আল্লাহ এ সম্পর্কে সূরা হাশরে উল্লেখ করে বলেন-

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ۗ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ـ

"যদি আমি এই কুরআন পাহাড়ের উপর নাযিল করতাম, তাহলে তুমি দেখতে যে, পাহাড় বিণীত হয়ে আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে গেছে। আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্য বর্ণনা করি, যাতে করে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।" (সূরা হাশর-২১)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আল কুরআনের গুরুভার বহন করা কোন জ্যান্ত প্রাণী কেন কোন নির্জীব পাথর বা মাটির পাহাড়ের পক্ষেও কঠিন হয়ে পড়বে যা তার ভারে নূয়ে পড়বে এবং আল্লাহর ভয়ে দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে ভেঙ্গে পড়বে।

قَوْلًا ثَقِيلًا এর কয়েকটি তাৎপর্য হতে পারে। যেমন–

প্রথমত ঃ হে নবী (সঃ) রাতের বেলায় নামায আদায়ের নির্দেশ আপনাকে এজন্য দেয়া হচ্ছে যে, আমি আপনার উপর এমন এক ভারী ও দুর্বহ বাণী নাযিল করতে যাচ্ছি যার গুরুভার বা বোঝা বহনের শক্তি আপনার মধ্যে সৃষ্টি ও সঞ্চারিত হওয়া প্রয়োজন। আর এই শক্তি আপনার মধ্যে অর্জিত এভাবে হতে পারে যদি আপনি রাতের বিশ্রাম ত্যাগ করে উঠে পড়েন এবং নামাযে দাঁড়িয়ে যান এবং রাতের অর্ধেক বা তার চেয়ে কিছু বেশী বা কিছু কম সময় ধরে ইবাদতে অতিবাহিত করেন।

দ্বিতীয়ত ঃ কুরআন মজীদকে ভারী দুর্বহ বোঝা বলা হয়েছে এ কারণে যে, উহার বিধি বিধান পালন করা। উহার শিক্ষা ও আদর্শের অনুসরণের মাধ্যমে বাস্তব রূপ দেখিয়ে দেয়া, উহার দাওয়াত নিয়ে সারা বিশ্বের দরবারে বাধাসত্ত্বেও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে যাওয়া। তাতে বর্ণিত আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তা-ভাবনা, নিতি-নৈতিকতা, আচার-আচরণ, সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রচলিত সকল ব্যবস্থাপনার উপর বিপ্লব সৃষ্টি করা এমন এক মহা সাধনা, যার চেয়ে বড় এবং দুঃসাধ্য কাজ কল্পনাও করা যায় না।

তৃতীয়ত ঃ কুরআনকে দুঃসাধ্য ও দুর্বহ কালাম বা বাণী বলার আরও একটি কারণ হলো, উহা নাযিলের সময়ের ভার এবং উহার বোঝা বহন করা অত্যন্ত কঠিন ও দুঃসাধ্য ব্যাপার। এ সম্পর্কে বেশ কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমন- অহী লেখক হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ) বর্ণনা করেন। "তিনি বলেন যে, একবার নবী করীম (সঃ) এর উপর অহী নাযিল হচ্ছিল। এই সময় তিনি তাঁর উরু আমার উরুর উপর রেখে শুয়েছিলেন। তখন আমার উরুর উপর এমন এক চাপ অনুভব করলাম

যাতে আশংকা করলাম যে, আমার উরু চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে যাবে।"
(সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী)

আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) কে জিজ্ঞাসা করেন ঃ "অহী নাযিলের সময় আপনি কি কিছু অনুভব করেন? রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) উত্তরে বলেন, আমি এমন শব্দ শুনতে পাই যেমন কোন জিঞ্জীরের শব্দ হয়। তখন আমি নিঃশব্দ হয়ে পড়ি। যখনই অহী নাযিল হয় তখন তা আমার উপর এমন বোঝা হয় যে, যেন মনে হয় আমার প্রাণই বেরিয়ে পড়বে।" (মুসনাদে আহমাদ)

হযরত আয়িশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, "আমি তীব্র শীত কালেও নবী করীম (সঃ) এর উপর অহী নাযিল হতে দেখেছি। সেই সময়ও তাঁর কপাল থেকে ঘাম ঝরে পড়তো।"(সহীহ্ বুখারী-মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী)

অন্য এক হাদীসে হযরত আয়িশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, "হযরত মুহাম্মদ (সঃ) উটের উপর আরোহী থাকা অবস্থায় তাঁর উপর অহী নাযিল হতে থাকলে উট তার বুক (ভারে) মাটির সাথে মিশিয়ে দিতো এবং অহী নাযিল সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত উট বিন্দুমাত্র নড়াচড়াও করতে পারতো না।"(মুসনাদে আহমাদ, হাকেম, ইবনে জরীর)

অর্থাৎ অহীর ভারেই এমন অবস্থা হতো। অনুরূপ ভাবে তার যে হুকুম আহকাম আছে তাও পালন করা ছিলো অনুরূপ কঠিন। হযরত ইমাম ইবনে জারীর (রহঃ) এর উক্তিও এটাই।

হযরত আবদুর রহমান (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, দুনিয়াতে যেমন এটা ভারী কাজ, তেমনি আখিরাতেও এর প্রতিদান ও পুরস্কারও হবে ভারী (মূল্যবান)। (ইবনে কাসীর)

অতঃপর পরবর্তী আয়াতে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা রাতে উঠার উপকারীতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন–

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا

প্রকৃতপক্ষে (ইবাদতের জন্যে) রাতে উঠা প্রবৃত্তি দমনে খুবই সহায়ক এবং কুরআন যথাযথভাবে পড়ার জন্য অনুকুল।

نَاشِئَةَ اللَّيْلِ এর তাৎপর্য উল্লেখ করে তাফসীরকার এবং ভাষাবিদগণ চারটি অর্থ করেছেন। যেমন–

প্রথম অর্থ হলো- রাতের বেলায় বিছানা ত্যাগকারী ব্যক্তি।
দ্বিতীয় অর্থ হলো- রাত্রি কালিন সময়।
তৃতীয় অর্থ হলো- রাতের বেলায় বিছানা ত্যাগ করা।
চতুর্থ অর্থ হলো- এই শব্দটি কেবল রাতের বেলায় বিছানা ত্যাগ করে উঠাই বুঝায় না, ঘুমিয়ে উঠাও বুঝায়।

হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেনঃ এর অর্থ রাতে ঘুমের পর নামাযের জন্যে গাত্রোত্থান করা। তাই এর অর্থ হয়ে গেছে তাহাজ্জুদ। কারণ এর শাব্দিক অর্থও রাতে ঘুমের পর উঠে নামায পড়া। ইবনে কায়মান (রহঃ) বলেন, শেষরাতে গাত্রোত্থান করাকে نَاشِئَةَ الَّيْلِ বলা হয়।

ইবনে যায়েদ (রহঃ) বলেন, রাতের যে অংশতে কোন নামায পড়া হয়, তা نَاشِئَةَ الَّيْلِ এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে যুবায়ের (রহঃ) তাই বলেছেন। (তাফসীরে মাযহারী)

প্রকৃতপক্ষে এসব উক্তির মধ্যে কোনই বিরোধ নেই। রাতের যে কোন অংশে যে নামায পড়া হয় অর্থাৎ ঈশার পর যে নামায পড়া হয়, তাই- قِيَامَ الَّيْلِ ও نَاشِئَةَ الَّيْلِ এর অন্তর্ভুক্ত, যেমন হাসান বসরী (রহঃ) বলেছেন। তবে রাসূল (সঃ) সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীনগণ সর্বদাই এই নামায ঘুমের পর শেষ রাতে উঠে পড়তেন। তাই এটাই উত্তম এবং বেশী বরকতপূর্ণ। তবে ঈশা নামাযের পর যে কোন নফল নামায পড়া যায়, তাতে তাহাজ্জুদের সুন্নত আদায় হয়ে যাবে। (মা'রিফুল কুরআন)
هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا -এর অর্থ ও তাৎপর্য ব্যাপক। একটি বাক্যে এর তাৎপর্য প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাই নিম্নে কয়েকটি তাৎপর্য উল্লেখ করা হলো ঃ

প্রথম তাৎপর্য এ হতে পারে যে, রাতের বেলা ইবাদাতের জন্য ঘুম থেকে উঠা এবং দীর্ঘ সময় ধরে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের স্বভাব বিরোধী কাজ। মানুষের প্রকৃতিই হলো এই সময় বিশ্রাম গ্রহণ করা। ফলে এই অবস্থায় এ কঠিন কাজটি করা নিঃসন্দেহে কৃচ্ছসাধনার কাজ। এই কৃচ্ছসাধনা মানুষের প্রবৃত্তি দমনের ও নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য বেশ প্রভাবশালী ব্যাপার। আর যে ব্যক্তি এভাবে নিজের নফসের উপর নিয়ন্ত্রণ আনতে পারে এবং নিজের দেহ ও মনের উপর প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয় ও নিজের সমস্ত শক্তিকে আল্লাহর পথে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়, সেই সবচেয়ে বেশী দৃঢ়তার সাথে

সত্য ও শাশ্বত দ্বীনের দাওয়াতকে দুনিয়ার বুকে বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়।

দ্বিতীয় তাৎপর্য এও হতে পারে যে, মন-দিল ও মুখের মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টিতে এটা একটা বড় মাধ্যম ও উপায়। কেননা, রাতের বেলায় এ সময়ে বান্দাহর এবং আল্লাহর মধ্যে তাসাউফ বা গভীর প্রেম সৃষ্টিতে কোন প্রতিবন্ধক বা আড়াল সৃষ্টিকারী কিছুই থাকে না। এই অবস্থায় বান্দাহ তার মুখ দিয়ে যা কিছুই বলে তার দিল বা হৃদয়ের গভীর কন্দরেরই কথা হয়ে থাকে।

ইবনে যায়েদ (রাঃ) বলেন যে, রাতে নামাযের জন্য উঠা অন্তর, দৃষ্টি, কান ও জিহবার মধ্যে পারস্পরিক একাত্মতা সৃষ্টিতে খুবই কার্যকর।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন أَشَدُّ وَطْئًا এর অর্থ এই যে, কান ও অন্তরের মধ্যে তখন অধিকতর একাত্মতা থাকে। কারণ, রাতের বেলায় সাধারণতঃ কাজকর্ম ও হট্টোগোল থাকে না। তখন মুখ থেকে যা উচ্চারিত হয় কানও তা শুনে এবং অন্তরেও তা উপলব্ধি করে।

তৃতীয় তাৎপর্য এ হতে পারে যে, এটা ব্যক্তির ভিতর ও বাইরের মধ্যে সঙ্গতি সৃষ্টিতে বড় কার্যকর উপায়। কেননা, রাতের বেলায় সকলের অজান্তে যে ব্যক্তি নিজের আরাম-বিরাম উপেক্ষা করে ইবাদত করার জন্য বিছানা ত্যাগ করে, সে অবশ্যই এটা একান্ত নিষ্ঠার কারণে এবং নিষ্ঠার সাথেই করবে বা করে থাকে। তার মধ্যে রিয়া বা লোক দেখানোর কোন সুযোগ থাকে না।

চতুর্থ তাৎপর্য এও হতে পারে যে, যেহেতু এই ইবাদত দিনের বেলার ইবাদতের তুলনায় অনেক কষ্টকর। তাই এই ইবাদত নিয়মিত পালন করার ফলে ব্যক্তির মধ্যে অবিচলতা, স্থিতিশীলতা, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার গুণ সৃষ্টি হয়, ফলে সে আল্লাহর পথে যে কোন কাজ খুব দৃঢ়তা ও অবিচলতার সাথে করতে পারে এবং কঠিন বিষয়গুলো খুব সহজভাবে দৃঢ়তার সাথে সমাধান করতে সক্ষম হয়।

أَقْوَمُ قِيلًا-এর أَقْوَمُ এর শাব্দিক অর্থ-অধিক সঠিক। আর قِيلًا এর অর্থ-বাণী বা কথা। অর্থাৎ أَقْوَمُ قِيلًا এর শাব্দিক অর্থ হলো-'কথাকে অধিক যথার্থ ও সঠিক বানায়'। কিন্তু এর আসল বক্তব্য হলো, এই সময়

কুরআনকে বেশী শান্তি-প্রশান্তি, নিশ্চিন্ততা এবং মনোযোগের সাথে পড়া যেতে পারে। কেননা, তখন বিভিন্ন প্রকার ধ্বনি, চেঁচামেচি ও হট্টোগোল দ্বারা অন্তর ও মস্তিষ্ক ব্যাকুল হয়ে উঠে না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই শব্দ দু'টির তাৎপর্যে বলেছেন, এই সময় কুরআন বেশী বেশী চিন্তা-গবেষণা ও মনোযোগ-মনোনিবেশের সাথে পাঠ করা যেতে পারে। (আবু দাউদ)

অতঃপর আল্লাহ তা'য়ালা পরবর্তী আয়াতে নবিজীর দ্বিনের ব্যস্ততার কথা উল্লেখ করে বলেন- اِنَّ لَكَ فِى النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا

(হে নবী) দিনের বেলায় তো আপনার খুব কর্মব্যস্ততা।

নবী (সঃ) কে উল্লেখ করে অন্যান্য সবাইকে আল্লাহ পাক এই আয়াতে নির্দেশনা দিয়ে বলেন, "হে নবী (সঃ) দিনের বেলায়তো দ্বীনের দায়িত্ব পালন, নিজের ও পরিবারের কাজের ব্যস্ততা এবং সমাজের দ্বায়িত্ব পালনে আপনাকে খুবই ব্যস্ত থাকতে হয়, সুতরাং রাতকে আপনি আল্লাহর ইবাদতের জন্য বাছাই করে নিন। কেননা, দিনের সমস্ত কর্মব্যস্ততা থেকে মুক্ত হয়ে নিরিবিলি একাগ্রচিত্তে ইবাদতে মনোনিবেশ করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই রাতে প্রয়োজন মতো ঘুম ও বিশ্রাম এবং তাহাজ্জুদের নামাযও মনোনিবেশের সাথে ব্যস্ততা ছাড়াই পড়া হয়ে যায়। এই নির্দেশ আল্লাহর নবীর সাথে অন্যান্য ব্যক্তিদের জন্যও প্রযোজ্য।

অতঃপর মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا

সুতরাং আপনি আপনার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করুন এবং সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একমাত্র তাঁর জন্যই হয়ে যান।

تَبَتُّل শব্দের অর্থ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন হওয়া। পূর্ববর্তী আয়াতে তাহাজ্জুদের নামাযের আদেশ দেয়ার পর এই আয়াতে এমন এক ইবাদতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যা রাত অথবা দিনের সাথে বিশেষ ভাবে সম্পৃক্ত নয়। বরং তা সর্বদা ও সকল অবস্থায় জারি থাকে। আর তা হলো, আল্লাহর যিকির বা আল্লাহকে স্মরণ করা।

এখানে সদাসর্বদা অব্যাহত রাখার অর্থে আল্লাহকে স্মরণ রাখার আদেশ করা হয়েছে। কেননা, এ কথা কল্পনাও করা যায় না যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)

আল্লাহকে স্মরণ করতেন না, তাই এই আদেশ করা হয়েছে। (মাযহারী) বরং আয়াতের উদ্দেশ্য হলো এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে দিনরাত সর্বক্ষণ আল্লাহকে স্মরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, এতে কোন সময় অবহেলা ও অসাবধনতাকে প্রশ্রয় দেয়া উচিত নয়। এখানে স্মরণ করাকে ব্যাপক অর্থে নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ মুখে এবং অন্তরে আল্লাহকে স্মরণ করা অথবা দেহের অঙ্গ-প্রতঙ্গকে আল্লাহর আদেশ পালনে সর্বদা নিয়োজিত রাখা। অর্থাৎ যে কোন প্রকারে আল্লাহকে স্মরণ করা।

হযরত আয়িশা সিদ্দিকা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে পাওয়া যায়। তিনি বলেন- كَانَ يَذْكُرُاللهَ عَلٰى كُلِّ حِيْنٍ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সঃ) সর্বক্ষণ আল্লাহকে স্মরণ করতেন। তবে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) পায়খানা প্রস্রাবের সময় মুখে আল্লাহকে স্মরণ করতেন না। তবে তিনি মুখে আল্লাহকে স্মরণ না করলেও অন্তরে স্মরণ রাখতেন।

অন্তরে স্মরণ দু'প্রকার- (১) শব্দ কল্পনা করে স্মরণ করা। (২) আল্লাহর গুণাবলী নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা। (মাওলানা থানভী রহঃ)

আলোচ্য আয়াতের দ্বিতীয় নির্দেশ হলো- وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا

(হে নবী) আপনি সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একমাত্র তাঁর জন্যেই হয়ে যান।

অর্থাৎ হে নবী সঃ! আপনি সমগ্র সৃষ্টি থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের আশায় ইবাদতে মগ্ন হয়ে যান। সাধারণ অর্থে বলা যায়- ইবাদতের মধ্যে শিরক না করা, নিজের সমস্ত কর্মকান্ড তথা উঠাবসা, চলাফেরায় আল্লাহর প্রতি দৃষ্টি রাখা এবং আল্লাহর উপর ভরসা রাখা। অন্যকে লাভ-লোকসান ও বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধারকারী মনে না করা।

হযরত ইবনে যায়েদ (রাঃ) বলেন- تَبَتَّلْ এর অর্থ দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছুকে পরিত্যাগ করা এবং আল্লাহর নিকট যা আছে, তার প্রতি মনোনিবেশ করা। (মাযহারী)

তবে এই تَبَتَّلْ তথা দুনিয়ার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ সেই رَهْبَانِيَّةً তথা বৈরাগ্যবাদ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন যা কুরআনে নিন্দা করা হয়েছে এবং হাদীসে- لَارَهْبَانِيَّةَ فِى الْاِسْلَامِ "ইসলামে কোন বৈরাগ্যবাদ নেই" বলে প্রত্যাখান করা হয়েছে।

এখানে تَبَتَّل বা দুনিয়ার সাথে সম্পর্কছেদ বলতে বিশ্বাসগত ভাবে বা কাজেকর্মে আল্লাহর সম্পর্কের উপর কোন সৃষ্টির সম্পর্ককে প্রবল না করা। আর এ ধরনের সম্পর্কছেদ-বিবাহ-সাদী, আত্মীয়তা, যাবতীয় সাংসারিক কাজকর্ম এবং সামাজিক কাজকর্মের সাথে জড়িত থেকেই করা সম্ভব। আর নবী (সঃ) এর আচার-আচরণ ও সমগ্র কর্মজীবন এর সাক্ষ্য বহন করে। তিনিই আল্লাহ এবং দুনিয়ার সাথে সমন্বয়কারী হিসেবে আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। সুতরাং আমাদের জন্য এখানে শিক্ষায় হলো-আমরা যেমন দুনিয়াভোগী হবো না তেমনি দুনিয়াত্যাগীও হবো না।

অতঃপর পরবর্তী আয়াতে উকিল বা অভিভাবক কাকে বানানো উচিত সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন-

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا

তিনি তো পূর্ব ও পশ্চিমের (অর্থাৎ সারা জাহানের) মালিক অধিকর্তা। তিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। কাজে তাঁকেই উকিল বা অভিভাবক বানিয়ে নিন।

এখানে وَكِيْلً (উকিল) বলতে তাকেই বুঝানো হয়েছে, যার উপর নির্ভর করে এবং আস্থা স্থাপন করে নিজের যাবতীয় ব্যাপার সুসম্পন্ন করার দায়িত্বভার অর্পণ করা যায়। আমরা প্রচলিত ভাষায় উকিল তাকেই বলি, যার উপর নিজের মামলা-মুকাদ্দামা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় ছেড়ে দিয়ে নিশ্চত থাকি। উকিল সম্পর্কে আমাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস ও আস্থা থাকে যে, সে আমার মামলা ভালভাবে দেখাশুনা করবে, লড়বে ও চালাবে এবং সেই বিষয়ে আমাকে কিছুই করতে হবে না। কাজেই فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا বাক্যের অর্থ এই যে, নিজের সব কাজ-কারবার ও অবস্থা আল্লাহর কাছে সোপর্দ বা সমার্পণ করা। পরিভাষায় একেই বলে তাওয়াক্কুল। এই দৃষ্টিতে আয়াতটির বক্তব্য হলো, হে নবী এই দ্বীনের দাওয়াত মানুষের কাছে পেশ করার ফলে আপনার বিরুদ্ধে বিরোধিতার যে প্রচন্ড তুফান মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, আর আপনি যে বিপদ-আপদ, অসুবিধা ও সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পড়েছেন, সেই জন্য আপনার দিশেহারা ও বিচলিত হবার কোনই প্রয়োজন নেই এবং কাতর হয়ে পড়াও উচিত হবে না। কেননা, আপনার আল্লাহ তো পূর্ব ও পশ্চিম তথা সমগ্র সৃষ্টির একচ্ছত্র মালিক-অধিপতি। তিনি তো সমস্ত ক্ষমতার মালিক। অতএব আপনি সমস্ত ব্যাপার তারই উপর ছেড়ে দিয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত ও আশ্বস্ত হয়ে থাকুন। এখন সমস্ত বিষয় ও

ব্যাপার তিনিই দেখাশুনা করবেন। আপনার বিরোধিতাকারীদের সাথে বুঝাপড়া তিনিই করবেন। তিনিই আপনার সমস্ত কাজ সুসম্পন্ন করবেন।

অতপর পরবর্তী আয়াতে বিরুদ্ধবাদীর সাথে কিরূপ আচরণ করতে হবে সেই প্রসঙ্গে নির্দেশনা দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন–

وَاصْبِرْ عَلٰى مَايَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا

আর (কাফির) লোকেরা যেসব কথাবার্তা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে তার জন্য আপনি ধৈর্য ধারণ করুন এবং সৌজন্যতার সাথে তাদেরকে পরিহার করে চলুন।

وَاصْبِرْ عَلٰى مَايَقُوْلُوْنَ -তারা অর্থাৎ কাফিররা যা কিছু বলে বা বলে বেড়ায় তার জন্য আপনি ধৈর্য ধারণ করুন। অর্থাৎ হে নবী (সঃ) আপনি আপনার নবুয়তি দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে তারা আপনার মিশনকে থামিয়ে দেয়ার জন্য আপনার বিরুদ্ধে যেসব আজেবাজে ও অর্থহীন কথাবার্তা বলে বা মন্তব্য করে এবং কাজকর্ম করে তার প্রতি আপনি দৃষ্টি দিবেন না, তাদের কথায় কান দিবেন না বরং তাদেরকে উপেক্ষা করে চলুন। তারা যেসব অন্যায় আচার-আচরণ করছে, তার কোন জবাব না দিয়ে ধৈর্য ধারণ করুন। এটাই হলো উত্তম পন্থা এবং আপনার জন্য শোভনীয়।

وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا -এর শাব্দিক অর্থ, বিষণ্ন ও দুঃখিত মনে কোন কিছুকে ত্যাগ করা। অর্থাৎ মিথ্যারোপকারী কাফিররা আপনাকে যেসব মনোকষ্টকর ও পীড়াদায়ক কথাবার্তা বলে ও কাজকর্ম করে আপনি সেসবের প্রতিশোধ নিবেন না ঠিক, কিন্তু তাদের সাথে সম্পর্কও রাখবেন না। সাধারণতঃ মানুষের অভ্যাস হলো যার সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করে, তাকে গালমন্দ দেয়। তাই রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে সম্পর্ক ত্যাগ করার পদ্ধতি শিক্ষা দিতে গিয়ে هَجْرًا جَمِيْلًا যোগ করে বলা হচ্ছে- সৌজন্যতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করুন। আপনার উচ্চ মর্যাদা ও সম্মানের খাতিরে কাফিরদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার সময় মন্দ ও কটু কথাও বলবেন না।

নবী (সঃ) এর প্রতি এরূপ নির্দেশের প্রেক্ষিতে একথা মনে করা ঠিক হবে না যে, তাঁর আচার-আচরণ বুঝি এ হতে ভিন্নতর ও বিপরীত ছিলো, আর এই জন্যই বুঝি আল্লাহ তা'য়ালা রাসূলে করীম (সঃ) কে এরূপ উপদেশ বা শিক্ষা দিচ্ছেন। না, এটা ঠিক নয়। আসলে নবী করীম (সঃ) পূর্ব

থেকেই এই নীতি ও পন্থা অবলম্বন করে চলছিলেন। কিন্তু আল কুরআনে এরূপ নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে। সেই উদ্দেশ্য হলো, কাফিরদেরকে একথা জানিয়ে ও বুঝিয়ে দেয়া যে, তোমরা যেসব কথা-বার্তা, আচার-আচরণ ও কর্মপন্থা গ্রহণ করেছো তার জবাবে রাসূলে করীম (সঃ) যে কিছুই বলছেন না বা করছেন না তা তাঁর কোন দূর্বলতার কারণে নয়। বরং তার মূল কারণ হলো- তোমাদের জবাবে এরূপ সৌজন্যমূলক কর্ম ও আচার-আচারণ গ্রহণ করতে স্বয়ং আল্লাহই তাঁকে নির্দেশ ও শিক্ষা দিয়েছেন এবং তিনি আল্লাহর নির্দেশনা মেনেই এসব কিছুকে উপেক্ষা করে সৌজন্যমূলক আচরণ করছেন।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে কাফিরদের সৌজন্যতার সাথে ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়ে তাদের আচার-আচরণ এবং অসৌজন্যমূলক কর্ম কান্ডের প্রতিদানের বিষয়টি তার হাতে ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন-

وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا

আর এসব বিত্তশালী বিলাশী মিথ্যাচারী লোকদের বুঝা-পড়ার কাজটি (হে নবী) আমার উপর ছেড়ে দিন। আর কিছু সময়ের জন্য এসব লোকদেরকে এই অবস্থার উপরই থাকতে দিন।

وَالْمُكَذِّبِينَ মিথ্যাচারী কিম্বা মিথ্যাবাদী বলতে কাফির বা খোদাদ্রোহী শক্তিকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর দাওয়াতী মিশনকে বন্দ করার জন্য তারা যেসব কথাবার্তা বা গালমন্দ করতো তা তারা মিথ্যার উপর নির্ভর করেই করতো।

أُولِي النَّعْمَةِ এর نعمة শব্দের অর্থ ভোগ-বিলাস, ধন-সম্পদ সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য। এতে ইঙ্গিত আছে যে, দুনিয়ার ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে যাওয়া অবিশ্বাসী কাফিরদেরই কাজ। এতে প্রমাণিত হয় যে, মক্কায় যেসব লোক রাসূল (সঃ) কে অমান্য-অগ্রাহ্য করতো, কটু কথা বলতো, গালমন্দ করতো এবং মানুষকে রাসূল (সঃ) এর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতো তারা ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, ভোগ-বিলাসী সচ্ছল অবস্থাসম্পন্ন লোক ছিলো। রাসূল (সঃ) এর দাওয়াত ও আন্দোলনের বড় আঘাত এসব লোকদের স্বার্থের উপরই পড়ছিলো। শুধু তৎকালীন সময়ই নয় বরং যুগে যুগে সমাজ পরিবর্তন প্রচেষ্টার পথে এই

শ্রেণীর লোকেরাই চিরকাল প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেননা, অনইসলামী সমাজ ব্যবস্থা থেকে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা হলে সবচেয়ে বেশী যারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে এবং স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটবে তারা হচ্ছে এসব ধনীক শ্রেণীর বিলাসী লোকদের। তাই আল্লাহ পাক রাসূল (সঃ) কে সান্তনা দিয়ে বলেন, তাদের এইসব মনোকষ্টকর আচরণ, গালমন্দ এবং কর্মকান্ডের জবাব দেয়ার দ্বায়িত্বটি হে নবী (সঃ) আমার উপরই ছেড়ে দিন। আর তাদের এই কর্মতৎপরতা চালাবার জন্য আরও কিছু সময় দিন এবং তাদেরকে এ অবস্থায়ই থাকতে দিন। সময় হলে আমি তাদেরকে তাদের প্রাপ্য সাজা পরিমান মতো দিয়ে দেবো।

তাদের সাজার কথা বর্ণনা দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ পরবর্তী আয়াতে বলেন-إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا ۝ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا

(তাদের জন্য) আমার কাছে আছে শিকল বা বেড়ী, দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা আগুন, আর আছে গলায় আটকিয়ে যাওয়া খাদ্য এবং কঠিন পীড়াদায়ক আযাব।

দারসের সর্বশেষ এই আয়াতে মহান আল্লাহ পাক দাওয়াত ইলাল্লাহ (আল্লাহর দিকে আহবান) এবং জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ বা ইসলামী আন্দোলনে যারা বাধাদানকারী হবে তাদের শাস্তির কয়েকটি বর্ণনা দিয়েছেন।

প্রথম শাস্তি ঃ أَنكَالًا -শিকল বা বেড়ী। অর্থাৎ জাহান্নামে দুনিয়ার এসব পাপী-অপরাধী লোকদের পায়ে বড় এবং ভারী লোহার শিকল বা বেড়ী পরিয়ে দেয়া হবে। জাহান্নাম থেকে পালিয়ে যাবার আশংকায় তাদের পায়ে বেড়ী পরানো হবে না। কেননা, কারো শক্তি বা ক্ষমতা নেই যে জাহান্নাম থেকে পালাতে পারে। বরং বেড়ী পরানোর উদ্দেশ্য হলো শাস্তি দেয়া। এটা হলো শাস্তি বা সাজার বেড়ী। এই বেড়ীর ভারে তারা উঠতে এবং চলতে ফিরতে পারবে না। এটা হলো শাস্তির উপর শাস্তি।

দ্বিতীয় শাস্তি ঃ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ -গলগ্রহ খাদ্য। অর্থাৎ যে খাদ্য গলায় এমনভাবে আটকিয়ে যাবে যে, গিলাও যাবে না আবার উগলিয়ে ফেলাও যাবে না। এ ধরণের খাদ্যের কথা হাদীসে যরী ও যাক্কুমের বর্ণনা করা হয়েছে।

তৃতীয় শাস্তি ঃ وَّجَحِيْمًا -কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি। 'জাহীম' জাহান্নামের সাতটি স্তর বা নামের মধ্যে একটি স্তর। তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে বটে তবে সেই শাস্তি হবে কঠিন যন্ত্রণা ও পীড়াদানকারী শাস্তি যা কুরআন এবং হাদীসে তার ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

আল্লাহ আমাদেরকে এসব কঠিন শাস্তি থেকে হেফাজত করুন এবং দুনিয়াতে এসব কঠিন পীড়াদানকারী শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য দাওয়াত ইলাল্লাহ (আল্লাহর দিকে দাওয়াত) এবং জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ (আল্লাহর পথে জিহাদ বা ইসলামী আন্দোলন) করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

শিক্ষাঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা ও বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত সূরা মুজ্জাম্মিল এর ১ থেকে ১৩ নং আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে আমরা যেসব শিক্ষা লাভ করলাম তা হলোঃ

০ সূরা মুজ্জাম্মিল এর নির্দেশ বা শিক্ষাগুলো যদিও নবী করীম (সঃ) কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। কিন্তু এর শিক্ষা গোটা উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য। কেননা, কুরআনের শিক্ষা কোন ব্যক্তি কেন্দ্রিক এবং সাময়িক নয় বরং সামগ্রীক এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত কার্যকরী থাকবে। আমরা যখন কুরআন অধ্যয়ন করবো তখন মনে করতে হবে যে, কুরআনের নির্দেশ যেন এখনই আমার জন্যই নাযিল হলো

০ আল্লাহর নবীর মাধ্যমে আমাদের উপর দাওয়াতে দ্বীনের এবং জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর যে দ্বায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তা আলোস্য ভাবে হাত পা ছড়িয়ে দিয়ে চাঁদর মুড়ী দিয়ে বিমুখ না থেকে বরং মহান দায়িত্ব পালনে উঠে পড়ে লেগে যাওয়া। রাতের কিছু অংশ বাদ দিয়ে অর্থাৎ কিছু সময় ঘুমিয়েই ঘুম থেকে উঠে পড়া এবং তাহাজ্জুদ নামাযে দাঁড়িয়ে যাওয়া ও নিয়মিত এই নামায আদায় করা। উল্লেখ্য যে, যদিও এই নামায আমাদের উপর নফল তবুও তা নিয়মিতভাবে আদায় করা।

০ তাহাজ্জুদ নামাযে কতটুকু রাত অতিবাহিত করতে হবে তার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। আর তা হলো- অর্ধ রাতকে ভিত্তি করে তার চেয়ে বেশীও হতে পারে আবার কমও হতে পারে। এটা ব্যক্তির ইখতার বা ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। এখানে কোনো বাধ্য-বাধকতা নেই। শরীর-স্বাস্থ্য এবং ধৈর্যের উপর নির্ভর করে।

০ কুরআন পাঠ করতে হবে থেমে-থেমে স্পষ্টভাবে বুঝে-সুঝে এবং সুন্দর-সাবলীল আওয়াজে। এখানে কিভাবে কুরআন তিলাওয়াত বা নামাযের কিরাত পড়তে হবে তার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। আল্লাহর এই নির্দেশের প্রতি লক্ষ্য রেখে নামাযের কিরাত তা জিহরী (প্রকাশ্য) হোক বা (শিররী) অপ্রকাশ্য কিরাত হোক সকল কিরাতই বিশুদ্ধ ও স্পষ্টভাবে, টান দিয়ে, আয়াতে আয়াতে থেমে থেমে, অনুধাবন করে সুন্দর ও সাবলীলভাবে পাঠ করা, অশুদ্ধ, অস্পষ্ট এবং দ্রুততার সাথে না বুঝে কবিতার মতো পাঠ না করা। যা আমরা অধিকাংশ লোকই করে থাকি। বিশেষ করে রমযান মাসের কুরআন খতমের নামে একটি নফল আ'মল করতে যেয়ে অধিকাংশ হাফিজে কুরআন ফরজ তরক করে থাকেন। আল্লাহ আমাদেরকে এ অবুঝ আ'মল থেকে বাঁচিয়ে বুঝ দান করে সহীহ আ'মল করার তাওফীক দান করুন।

০ আমাদের উপর অর্পিত মহান দ্বায়িত্ব আল কুরআনের বিধি-বিধানের গুরুভার বহন করার জন্য তাহাজ্জুদ নামায আদায় করা। কেননা, মহান এ দ্বায়িত্ব এবং গুরুভার বহন করার জন্য তাহাজ্জুদ নামায অত্যন্ত সহায়ক।

০ ইবাদতের জন্য রাতের বেলা উঠা কুপ্রবৃত্তি দমনে বেশ সহায়ক। রাতের নামাযের কয়েকটি তাৎপর্য উল্লেখ করা হলো–

১. মানুষের প্রকৃতিই হলো রাতের বেলা ঘুমানো এবং বিশ্রাম গ্রহণ করা। এই স্বভাবসুলভ প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিশ্রাম ত্যাগ করে ইবাদতে দীর্ঘক্ষণ নিয়োজিত থাকা কৃচ্ছসাধনার কাজ। এই কৃচ্ছসাধনা প্রবৃত্তি দমন ও নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য বেশ সহায়ক। আর যে লোক এভাবে নিজের নফসের উপর নিয়ন্ত্রণ আনতে পারবে এবং নিজের দেহ ও মনের উপর প্রভাব ফেলতে পারবে এবং নিজের সমস্ত শক্তিকে আল্লাহর পথে ব্যয় ও ব্যবহার করতে পারবে, সেই সবচেয়ে বেশী দৃঢ়তার সাথে সত্য ও শাশ্বত দ্বীনের দাওয়াতকে দুনিয়ার বুকে বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে।

২. মানুষের মন-দেল ও মুখের ভাষার মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করতে পারবে। কেননা, রাতের বেলায় নিরিবিলি এই নামাযে বান্দা এবং আল্লাহর মধ্যে তাসাউফ বা গভীর প্রেম সৃষ্টি করতে খুব বেশী সহায়ক হয়।

৩. রাতের বেলায় এই ইবাদত বান্দার ভিতর ও বাইরের মধ্যে সঙ্গতি সৃষ্টি করে। কেননা, রাতের বেলায় সবার অজান্তে যে ব্যক্তি আরাম-বিরামকে উপেক্ষা করে ইবাদাত করার জন্য বিছানা ছেড়ে উঠে, সে অবশ্যই এটা একান্ত নিষ্ঠার কারণে এবং আন্তরিকতার সাথেই করে থাকে। তার মধ্যে রিয়া বা লোক দেখানোর কোন সুযোগই থাকে না।

৪. যেহেতু এই ইবাদত দিনের বেলার তুলনায় বেশ কষ্টকর। তাই এই নামায নিয়মিত আদায় করার ফলে ব্যক্তির মধ্যে অবিচলতা, স্থিতিশীলতা, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার গুণ সৃষ্টি হয়। ফলে আল্লাহর পথে যে কোন কাজ খুব দৃঢ়তা ও অবিচলতার সাথে করা যায় এবং কঠিন বিষয় গুলো সহজভাবে সমাধান করা যায়।

○ রাতের বেলায় কুরআন তিলাওয়াত করা। কারণ, রাতে কুরআনকে খুব বেশী প্রশান্তি, নিশ্চিন্ততা ও মনোযোগের সাথে পড়া যায়। কেননা, তখন বিভিন্ন প্রকার ধ্বনি, কোলাহল, চেঁচামেচি ও হট্টগোল দ্বারা অন্তর ও মস্তিষ্ক ব্যাকুল হয়ে উঠে না। রাতে কুরআন খুব বেশী চিন্তা, গবেষণা ও মনোযোগের সাথে পড়া যায়।

○ দিনের বেলায় মানুষকে নিজের ও পরিবারের ব্যস্ততা এবং সমাজের দ্বায়িত্ব পালনে খুবই ব্যস্ত থাকতে হয়, সুতরাং রাতকেই আল্লাহর ইবাদতের জন্য বাছাই করে নেয়া উচিত। কেননা, দিনের সমস্ত কর্মব্যস্ততা থেকে মুক্ত হয়ে নিরিবিলি একাগ্রচিত্তে ইবাদতে মনোনিবেশ করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই রাতে প্রয়োজন অনুযায়ী ঘুম ও বিশ্রাম এবং তাহাজ্জুদের নামায মনোনিবেশের সাথে ব্যস্ততা ছাড়াই আদায় করা যায়।

○ সদাসর্বদা আল্লাহর যিকির বা স্মরণে মশগুল থাকা। এখানে যিকির মানে সমাজে প্রচলিত একটি নির্দিষ্ট সময়ে এক বিশেষ কায়দায় الله الله বলা নয়। বরং উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে, কাজে-কর্মে, মুখে-অন্তরে সর্বদা ও সকল অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ রাখা। অর্থাৎ সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধি-বিধান মেনে চলা।

○ দুনিয়ার সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একমাত্র আল্লাহর জন্যই হয়ে যাওয়া। এর মানে এই নয় যে, দুনিয়ার সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে رَهْبَانِيَّةً বা বৈরাগ্যবাদী হয়ে যাওয়া। কেননা, বৈরাগ্যবাদকে ইসলাম

সমর্থন করে না। এর অর্থ হলো, সমস্ত সৃষ্টির সাহায্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে একমাত্র আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল বা নির্ভর করা। ইবাদতের মধ্যে কোন শিরক না করা, নিজের সমস্ত কাজ-কর্ম, উঠা-বসা, চলাফেরায় আল্লাহর প্রতি দৃষ্টি রাখা এবং আল্লাহর উপরই ভরসা রাখা। অন্যকে লাভ-লোকসান ও বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধারকারী মনে না করা। আর এসব কিছুই বিবাহ-সাদী, আত্মীয়তা, যাবতীয় সাংসারিক কাজ-কর্ম এবং সামাজিক কাজ কর্মের সাথে জড়িত থেকেই করা সম্ভব। আল্লাহ এবং দুনিয়ার সাথে সমন্বয় করেই দুনিয়াতে চলতে হবে। দুনিয়াভোগীও যেমন হওয়া যাবে না, তেমনি দুনিয়া ত্যাগীও হওয়া যাবে না।

০ পূর্ব ও পশ্চিম অর্থাৎ সারা জাহানের মালিককেই একমাত্র উকিল বানানো। নিজের দেখভাল করার দ্বায়িত্ব আল্লাহর উপর ছেড়ে দেয়া। তাঁর উপরই নির্ভর করা। দাওয়াতী দ্বীনের দ্বায়িত্ব পালন করতে যেয়ে প্রচন্ড বিরোধিতা এবং বিভিন্ন বিপদ-আপদ ও সমস্যার সম্মুখীন হলে দিশেহারা ও বিচলিত না হয়ে পড়া বরং তা মোকাবেলা করার দ্বায়িত্ব আল্লাহর উপর সোপর্দ করে দিয়ে অর্পিত দ্বায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখা।

০ আল্লাহর দ্বীনের কাজ করতে যেয়ে খোদাদ্রোহী, মুশরিক ও মুনাফিক শক্তির বিভিন্ন মন্তব্য, কটুক্তি ও গালমন্দের প্রতি দৃষ্টি এবং কান না দিয়ে উপেক্ষা করে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া। আর তারা যেসব অন্যায় আচার-আচরণ করে তার কোন জবাব না দিয়ে আল্লাহর দ্বীনের খাতিরে ধৈর্য ধারণ করা এবং প্রতিবাদ স্বরূপ তাদেরকে গালমন্দ না করা। তাদের মনোকষ্টকর ও পীড়াদায়ক কথা ও কাজকর্মের প্রতিশোধ না নিয়ে বরং তাদেরকে এড়িয়ে চলা।

০ দ্বীনি আন্দোলনের বিরোধিতাকারী, মিথ্যাচারী, ভোগবাদী এবং অর্থ সম্পদের অহংকারী শক্তির বুঝাপড়ার বিষয়টি নিজে না নিয়ে আল্লাহর উপরই ছেড়ে দেয়া। কেননা, যারা দ্বীনি আন্দোলনের বিরোধিতা করে তারা মিথ্যার উপরই নির্ভর করেই করে থাকে। তারা সত্যকে গোপন করে। অর্থ-সম্পদ, ভোগ-বিলাস এবং জনবল মানুষকে খোদাদ্রোহিতায় উদ্বুদ্ধ করে। এজন্য যুগে যুগে দেখা যায় এসব লোকরাই আল্লাহর দ্বীনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং আল্লাহর দ্বীনের বিরোধীদের মোকাবেলা যুগে যুগে আল্লাহ নিজেই করে এসেছেন। সুতরাং এখনও তিনি

এর মোকাবেলা করবেন এবং ভবিষ্যতেও করতে থাকবেন। তাই যারা আল্লাহর দ্বীনের বিরোধিতা করে তাদের এই কাজটি করার সুযোগ দিয়ে দেয়। আল্লাহ সুযোগ এবং সময় মতো তার জবাব দিয়ে দেবেন।

এবং পরকালে তাদেরকে কঠিন সাজা দান করবেন। সাজা বা শাস্তিগুলো হলো-

১. তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হিসেবে লোহার ভারী এবং বড় শিকল বা বেড়ী পরিয়ে দেবেন। যাতে তারা উঠতে বসতে না পারে। এটা হলো শাস্তির উপর শাস্তি।

২. তাদেরকে দেয়া হবে গলগ্রহ খাদ্য। যে খাদ্য এমন ভাবে আটকিয়ে যাবে যে, গিলতেও পারবে না আবার উগলিয়ে ফেলতেও পারবে না। যেমন হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যরী ও যাক্কুম নামীয় খাদ্য।

৩. কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি দেয়া হবে। জাহান্নামে তো তাদের শাস্তি দেয়া হবে। কিন্তু সেই শাস্তি হবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আল্লাহ আমাদের এসব শাস্তি থেকে হিফাজত করুন। আমীন।

আহ্বান ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে প্রিয় ভাইয়েরা ও বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত সূরা মুজ্জাম্মিল এর প্রথম দিকের আয়াতগুলোর যে ব্যাখ্যা ও শিক্ষা পেশ করা হলো তা যদি আমার অজান্তে কোন প্রকার ভুল-ভ্রান্তি কিম্বা বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, তার জন্য আমি মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর দারস থেকে যেসব শিক্ষা লাভ করলাম তা যেন বাস্তব জীবনে আমরা আ'মল করতে পারি সেই তাওফীক কামনা করে আমি আমার দারস শেষ করছি। অয়াআখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন।

---o---

লেখকের প্রকাশিত অন্যান্য বই

দারসে হাদীস ১ম খন্ড

দারসে হাদীস ২য় খন্ড

দারসে কুরআন ১ম খন্ড

দারসে কুরআন ২য় খন্ড

দারসে কুরআন ৩য় খন্ড

দারসে কুরআন ৪র্থ খন্ড

ইসলামী সংগঠন ও প্রশিক্ষণ

বিষয় ভিত্তিক নির্বাচিত হাদীস

আল-কুরআনে মানব সৃষ্টি তত্ত্ব

রাসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) রূহানী নামায

বিষয় ভিত্তিক কুরআন হাদীস সংকলন

বাংলা উচ্চারণ সহ ১০০ মাসনুন দোয়া

কুরআন হাদীসের আলোকে পাঁচ দফা কর্ম সূচী

ফাযায়িলে ইকামাতে দ্বীন বা দ্বীন প্রতিষ্ঠার (চেষ্টার) মর্যাদা

রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়। - আল হাদীস

লেখকের অন্যান্য বই

দারসে হাদীস-১ম খন্ড
দারসে হাদীস-২য় খন্ড
দারসে কুরআন-১ম খন্ড
দারসে কুরআন-২য় খন্ড
দারসে কুরআন-৩য় খন্ড
দারসে কুরআন-৪র্থ খন্ড
ইসলামী সংগঠন ও প্রশিক্ষণ
বিষয়ভিত্তিক নির্বাচিত হাদীস
আল কুরআনে মানব সৃষ্টি তত্ত্ব
রাসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) রূহানী নামায
বিষয়ভিত্তিক কুরআন হাদীস সংকলন
বাংলা উচ্চারণসহ ১০০ মাসনুন দোয়া
কুরআন হাদীসের আলোকে ৫দফা কর্মসূচী
ফাযায়েলে ইক্বামাতে দ্বীন বা দ্বীন প্রতিষ্ঠার (চেষ্টার) মর্যাদা

সাহাল প্রকাশনী

সাহাল প্রকাশনী

দারসে কুরআন

৫

অধ্যাপক আবদুল মতিন

দারসে
কুরআন

৫ম খন্ড

অধ্যাপক আবদুল মতিন

দারসে কুরআন- ৫ম খন্ড

প্রকাশনায় ঃ সাহাল প্রকাশনী
৩০৮, খানজাহান আলী রোড,
(তারের পুকুর), খুলনা।

প্রকাশকাল ঃ
মে - ২০১১ সাল
বৈশাখ - ১৪১৮ সন
রবিউস সানি -১৪৩২ হিজরী

সত্ত্ব ঃ লেখক কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত।

প্রচ্ছদ ঃ কৃষ্টি কম্পিউটার,
৩০৮, খানজাহান আলী রোড, খুলনা।

অক্ষর বিন্যাস ঃ তাবাস্‌সুম ও সাহাল
৩০, খানজাহান আলী রোড, খুলনা।

নির্ধারিত মূল্য ঃ ৬০ টাকা

পরিবেশনায় ঃ সাহাল বুক কর্ণার
৩০৮, খানজাহান আলী রোড,
(তারের পুকুর), খুলনা।

মোবাইল ঃ ০১৭১১-৩৮৯০৭৬ (লেখক)
ঃ ০১১৯১-৭৮২২৮৬ (দোকান)

প্রাপ্তিস্থান

ইসলামিয়া লাইব্রেরী, বরিশাল।	কাটাবন বুক কর্ণার, ঢাকা।
আল-হেলাল লাইব্রেরী, যশোর।	ঢাকা বুক কর্ণার, পুরানাপল্টন, ঢাকা।
আল-আমীন লাইব্রেরী, সিলেট।	তাসনিয়া বই বিতন, মগবাজার, ঢাকা।
আল-আমীন লাইব্রেরী, সাতক্ষীরা।	খন্দকার প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা।
একাডেমী লাইব্রেরী, দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম।	প্রফেসরস বুক কর্ণার, মগবাজার, ঢাকা।

এ ছাড়াও জেলা শহরের বিভিন্ন লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়।

উৎসর্গ

আল কুরআনের সমাজ প্রতিষ্ঠার
আন্দোলনে যাঁরা জীবন দান করেছেন
তাঁদের শাহাদাত কামনায়।

ভূমিকা

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহীম

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সর্বশেষ আসমানী কিতাব যা মানব জাতির পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর উপর অবতীর্ণ হয়।

মানুষের ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে, পারিবারীক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের যাবতীয় সমাধান আল-কুরআনে রয়েছে। সুতরাং প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর করণীয় হলো আল-কুরআনকে নিজের ভাষায় বুঝে তার শিক্ষানুযায়ী বাস্তব জীবনে আমল করা। কিন্তু সমস্যা হলো আমাদের দেশের সামাজিক এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় আল-কুরআনের সঠিক শিক্ষাকে তুলে ধরার তেমন কোনো বাস্তব মাধ্যম নেই। যতটুকু আছে তাও আবার সিলেবাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং ভিন্নভাবে কুরআনকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল-কুরআনের বিধি-বিধান মানতে হলে কুরআনের প্রকৃত বুঝ থাকা প্রয়োজন। আল-কুরআনের প্রকৃত বুঝ দেবার জন্যেই আমি আল কুরআনের বাছাই করা কতকগুলো অংশ থেকে 'দারসে কুরআন' খন্ড আকারে প্রকাশ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। তারই অংশ হিসেবে **পঞ্চম খন্ড** প্রকাশ করা হলো এবং আগামীতে আরও খন্ড প্রকাশ করার ইচ্ছা আছে-যদি আল্লাহ্ আমাকে লিখার তাওফীক দান করেন।

আমি 'দারসে কুরআন' এর খন্ডগুলো ইসলামী আন্দোলনের আধুনিক ও সাধারণ শিক্ষিত কর্মী ভাই-বোনদের দারস পেশ করার উপযোগী করে লিখার চেষ্টা করেছি। তাছাড়া দারসে কুরআন প্রথম খন্ডের প্রথম দিকে কুরআনকে সহজে বুঝানোর জন্য ধারাবাহিকভাবে দারস দানের পদ্ধতি ও দারসের সময় বন্টনের নমুনা হিসেবে চারটি ছক উল্লেখ করেছি এবং সাধারণ মানুষের উপর যাতে দারসের প্রভাব পড়ে সেই জন্য দারস দানকারীর কতিপয় করণীয় উল্লেখ করেছি। বইটি লিখার বিশেষ বৈশিষ্ট

হলো শ্রোতার সামনে যেন আপনি নিজেই দারস পেশ করছেন।

দারসে কুরআন পঞ্চম খন্ড লিখা এবং প্রকাশের ক্ষেত্রে যেসব গুণগ্রাহী ব্যক্তি ও পাঠক-পাঠীকা পরামর্শ, সময় ও উৎসাহ দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করেছেন তাদের শুকরিয়া আদায় করছি এবং মহান আল্লাহর কাছে তাদের জন্য উত্তম প্রতিদান কামনা করছি।

লিখা ও ছাপার ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। অতএব কোনো সুহৃদয় ব্যক্তির দৃষ্টিতে যদি ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে কিংবা কোন পরামর্শ থাকে, তাহলে আমাকে সরাসরি জানালে আমি কৃতজ্ঞ থাকবো এবং ভবিষ্যতে সংশোধন করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ্।

পরিশেষে মহান আল্লাহ তাবারাক ওয়া তা'লার কাছে আমার আরজ, হে আল্লাহ! তোমার এই মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের ব্যাখ্যা এবং শিক্ষা পেশ করতে যেয়ে যদি আমার অজান্তে কোনো ভুল-ত্রুটি কিংবা বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, তার জন্য তুমি আমাকে মেহেরবানী করে ক্ষমা করে দিও। আর সীমিত জ্ঞানের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করে আখিরাতে আদালতে নাজাতের জারিয়া বানিয়ে দিও। আমীন।

মুহাম্মদ আবদুল মতিন

সহকারী অধ্যাপক, ইসলামীক ষ্টাডিজ বিভাগ
দৌলতপুর কলেজ (দিবা-নৈশ)
দৌলতপুর, খুলনা।

তারিখ- ০১. ০৬. ২০১২

সূচী পত্র

বিষয় পৃষ্ঠা নং

১. তাওহীদ বা আল্লাহর একাত্মবাদ। (সূরা আল ইখলাস) -------- ০৭

২. দ্বীনের প্রতি দাওয়াত এবং শিরক ও কুফর থেকে
বাধা দানের নির্দেশ। (সূরা আল মুদ্দাস্‌সির-১-৭) -------- ৩০

৩. কথায় কাজে গরমিল বর্জন। (সূরা আস্ সফ- ১-৪) -------- ৫০

৪. হায়াত মউতের মালিক আল্লাহ্ তা'লা। কর্মীদের সাথে
ভালো ব্যবহার এবং ত্রুটি মাফ করা। পরামর্শের ভিত্তিতে
সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সিদ্ধান্তের উপর অটল থাকা ও আল্লাহর
উপর ভরসা করা। আল্লাহর সাহায্য থাকলে কোনো শক্তিই
বিজয়ী হতে পারবে না। (সূরা আলে ঈমরান- ১৫৬-১৬০) ----- ৬৪

৫. হকদারের আমানত ফেরৎ দেয়া। ন্যায়নীতির সাথে মিমাংসা করা।
আল্লাহ্, রাসূল এবং আমীরের আনুগত্য করা। কোনো
বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দিলে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের
নির্দেশের দিকে ফিরে যাওয়া। (সূরা আন্ নিসা- ৫৮-৫৯) ----- ৮৭

৬. মতোবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সমাধানের উপায় হলো কুরআন ও সুন্নাহ।
কঠোর থেকে কঠোরতর পরীক্ষা দিয়েই মুমিনদের জান্নাতে
প্রবেশ করতে হবে। পরীক্ষা মোকাবেলার মাধ্যম হলো
সবর ও আল্লাহর সাহায্য। (সূরা-আল বাকারা - ২১৩-২১৪) -- ১১২

৭. রাসূলুলাহ (সঃ) সত্য নবী হওয়া, তাঁর প্রতি অবতীর্ণ
ওহী তথা আল কুরআনে সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ
না থাকা এবং নবী করীমের (সঃ) জিবরাঈল কে আসল
রূপে স্বচক্ষে দেখা প্রসঙ্গে। (সূরা-আন্ নাজম -১-১৫) ------ ১৩৪

এক

তাওহীদ বা আল্লাহর একাত্মবাদ

সূরা আল ইখলাস- ১১২

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّى عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ ۝ اَللهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝

وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝

সরল অনুবাদ ঃ ইরশাদ হচ্ছে- (১) (হে মুহাম্মদ) আপনি বলুন ঃ তিনিই আল্লাহ্ একক-অদ্বিতীয়। (২) আল্লাহ্ কারো-ই মুখাপেক্ষী নন, সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। (৩) তাঁর কোনো সন্তান নেই এবং তিনিও কারো সন্তান নন। (৪) এবং তাঁর সমতুল্য বা সমকক্ষ কেউ-ই নেই।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ قُلْ - বলো/বলুন। هُوَ - তিনি/তিনিই। اَحَدٌ- একক/অদ্বিতীয়। اَلصَّمَدُ - মুখাপেক্ষীহীন। لَمْ يَلِدْ - তাঁর কোনো সন্তান নেই/তিনি কাউকে জন্ম দেননি। وَ - এবং। لَمْ يُوْلَدْ - তিনি কারো সন্ত ান নন/তাঁকে জন্ম দেয়া হয়নি। وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ - এবং নেই তাঁর। كُفُوًا - সমতুল্য/সমকক্ষ। اَحَدٌ - কেউ/কেউই/দ্বিতীয় কেউ।

সম্মোধন ঃ দারসে কুরআন মাহফিলে/ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ইসলাম প্রিয়/ দ্বীনদার/ ইসলামী আন্দোলনের ভাইয়েরা/ বোনেরা/ ভাই ও বোনেরা! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি অয়াবারাকাতুহ্।

আমি আপনাদের সামনে/ খিদমতে পবিত্র আল কুরআনের ১১৪টি সূরার মধ্যে ছোট্ট একটি সূরা তিলাওয়াত ও সরল অনুবাদ পেশ করেছি।

আল্লাহ্ পাক যেন আমাকে আপনাদের সামনে এই ছোট্ট অথচ ব্যাপক অর্থবোধক ও ব্যাখ্যা সম্বলিত সূরাটির দারস পেশ করার তাওফীক দান করেন। "অমা-তাওফীকি ইল্লাবিল্লাহ"।

সূরার নামকরণ ঃ আলোচ্য সূরাটির নাম "আল ইখলাস"। এর অর্থ- খালেস বা নির্ভেজাল-একনিষ্ঠ। পবিত্র আল কুরআনের অন্যান্য সূরার নামকরণ করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট সূরার মধ্য থেকে কোনো একটি শব্দকে বেছে নিয়ে প্রতীকী বা চিহ্ন হিসেবে। কিন্তু এই সূরাটির নামকরণের ক্ষেত্রে সূরার মধ্য থেকে কোনো একটি শব্দকে গ্রহণ করা হয়নি। বরং সূরার শিরোনাম হিসেবে বিশেষ একটি পৃথক শব্দকে বেছে নেয়া হয়েছে। এই সূরার আলোচ্য বিষয় ও অন্তরনিহিত ভাবধারার সাথে সামঞ্জস্য রেখেই নামকরণ করা হয়েছে। কেননা, এই সূরার পুরোটাই খালেস, নির্ভেজাল, একনিষ্ঠ তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে যে কেউ-ই এই সূরাটির অর্থ ও তাৎপর্য বুঝে উহার মূল কথার উপর ঈমান আনবে, সে অবশ্যই শিরক থেকে মুক্তি লাভ করবে।

সূরাটি নাযিলের কারণ ও সময়কাল ঃ সূরাটি মাক্কী না মাদানী এই বিষয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। সূরাটি নাযিল হওয়া সম্পর্কে যেসব বিভিন্ন হাদীসের বর্ণনা রয়েছে তার প্রেক্ষিতেই বিভিন্ন মতের সৃষ্টি হয়েছে। নিম্নে সূরাটি নাযিল সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা উল্লেখ করা হলো ঃ

হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার কুরাইশের লোকেরা নবী করীম (সঃ) কে বললো, আল্লাহর বংশ-তালিকা আমাদের বলুন, তখন এই সুরাটি নাযিল হয়। (তাবারাণী)

অন্য এক হাদীসে আবুল আলীয়া হযরত উবাই ইবনে কা'বের সূত্রে বলেছেন, মুশরিকরা নবী করীম (সঃ) কে বললো, আপনার মা'বুদের বংশ-তালিকা আমাদের বলুন। তখন আল্লাহ তা'লা এই সূরাটি নাযিল করেন। (আহমদ, ইবনে আবু হাতিম, ইবনে জরীর, তিরমিযী, বুখারী, হাকেম, বায়হাকী)

অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে হয়রত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ থেকে। একজন আরব লোক (কোনো কোনো বর্ণনায় লোকেরা) নবী করীম (সঃ) কে বললো, আপনার রব-এর বংশ পরিচয় আমাদেরকে বলুন, তখন আল্লাহ তা'লা এই সূরাটি নাযিল করেন।

(আবু ইয়ালা, ইবনু জরীর, ইবনুল মুনযির, তাবারাণী, বায়হাকী)

অন্য হাদীসে ইকরামা ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। ইহুদীদের একদল লোক রাসূলে করীম (সঃ) এর নিকট হাজির হলো। কা'ব ইবনে আশরাফ ও হাই ইবনে আখতারও এদের মধ্যে ছিলো। তারা বললো, হে মুহাম্মদ! বলুন, আপনার সেই রব কি রকম যিনি আপনাকে পাঠিয়েছেন। তখন আল্লাহ্ তা'লা এই সূরাটি নাযিল করেন।

(ইবনে আবু হাতিম, ইবনে আদী, বায়হাকী)

এসব বর্ণনা ছাড়াও ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) তাঁর তাফসীরে সূরা ইখলাস নাযিলের আরও কিছু বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। যেমন, হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, খায়বরের কতিপয় ইহুদী রাসূলে করীম (সঃ) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, হে আবুল কাসিম! ফিরিশতাদেরকে আবরণের নূর হতে, আদমকে মাটির পচাগলা গাড়া হতে, ইবলীসকে অগ্নিশিখা হতে, আকাশমন্ডলিকে ধোয়া হতে এবং পৃথিবীকে পানির ফেনা হতে বানিয়েছেন। এখন আপনি আপনার আল্লাহ্ সম্পর্কে বলুন, তাঁকে কি দিয়ে বানানো হয়েছে ? নবী করীম (সঃ) তাদের একথার কোনো জবাব দিলেন না। পরে জিবরাঈল (আঃ) আসলেন এবং বললেন, হে মুহাম্মদ (সঃ)! লোকদেরকে বলে দিন- هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ (তিনি আল্লাহ একক)

অন্য হাদীসে আমর ইবনে তোফাইল নবী করীম (সঃ) কে বললো, হে মুহাম্মদ! আপনি আমাদেরকে কোন জিনিসের দিকে দাওয়াত দিচ্ছেন ? নবী করীম (সঃ) বললেন, আল্লাহ তা'লার দিকে। আমের বললো, আচ্ছা তাহলে তাঁর বিবরণ আমাকে বলুন, তিনি কি সোনা না রূপা দ্বারা তৈরী, না লোহার বানানো ? এর জবাবে এই সূরাটি নাযিল হয়।

দহ্হাক কাতাদাহ ও মুকাতিল বর্ণনা করেন, ইহুদীদের কিছু আলিম নবী করীম (সঃ) এর নিকট এসে বললো, হে মুহাম্মদ! আপনার আল্লাহর বিবরণ আমাদেরকে বলুন, আমরা হয়তো আপনার প্রতি ঈমান আনতেও পারি। আল্লাহ্ তাওরাতে নিজের পরিচিতি নাযিল করেছেন। আপনি বলুন, তিনি কি জিনিস দ্বারা তৈরী ? কোন্ পদার্থের-সোনা দ্বারা না তামা, পিতল, লোহা কিংবা রূপা দ্বারা তৈরী ? আর তিনি কি খাবার খান ? তিনি কি দুনিয়াকে কারো কাছ থেকে উত্তরাধিরাকার সূত্রে পেয়েছেন ? এরপর তাঁর উত্তরাধিকার কে হবেন ? এর প্রতিউত্তরে আল্লাহ তা'লা এই সূরাটি নাযিল করেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। নাজরানের খৃষ্টানদের একটি প্রতিনিধি দল সাতজন পাদ্রীসহ নবী করীম (সঃ) নিকট হাজির হলো। তারা নবী করীম (সঃ) কে বললো, আমাদের বলুন, আপনার রব কি রকমের ? তিনি কি জিনিস দ্বারা তৈরী ? নবী করীম (সঃ) বললেন, আমার রব কোনো জিনিস দ্বারা তৈরী নন। তিনি সব জিনিস হতে স্বতন্ত্র। এই সময় আল্লাহ তা'লা এ সূরাটি নাযিল করেন।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হলো যে, নবী করীম (সঃ) মক্কার কুরাইশ কাফির, মুশরিক এবং মদীনার ইহুদী, খৃষ্টান ও অন্যান্যদের নিকট এক আল্লাহর বন্দেগী করার দাওয়াত দিয়েছেন। আর তখনই তারা আল্লাহর প্রকৃত রূপ ও পরিচয় জানতে চেয়েছে। আর সবক্ষেত্রেই নবী করীম (সঃ) আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী সূরা ইখলাস পেশ করেছেন। প্রথমতঃ মক্কার কুরাইশ বংশের মুশরিকরা তাঁর নিকট এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলো। তাদের জবাব স্বরূপ এই সূরাটি নাযিল হয়। দ্বিতীয়তঃ নবী করীম (সঃ) যখন হিজরত করে মদিনায় চলে যান, তখন কখনও ইহুদীরা আবার কখনও খৃষ্টানরা এবং কখনও আরবের অন্যান্য লোকেরা নবী করীম (সঃ) এর নিকট এ ধরনের প্রশ্ন করেছে। আর প্রত্যেক বারই আল্লাহর পক্ষ থেকে এই সূরাটি পেশ করারই নিদের্শ দেয়া হয়েছে। সুতরাং উপরের হদীসের বর্ণনা থেকে কোনো বৈপরিত্র পাওয়া যায় না।

অর্থাৎ আল কুরআনের আয়াত বা সূরা একেবারেই নাযিল হয়। আল্লাহর নবী যখন একই প্রশ্নের বা ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন, তখনই আল্লাহ তা'লা তাঁকে ওহীর মাধ্যমে সেই আয়াত বা সূরার কথা স্বরণ করিয়ে দিয়েছেন।

অতএব সূরা ইখলাস নাযিল সম্পর্কে এই কথা প্রমাণিত হয় যে, এই সূরাটি সর্বপ্রথম মক্কা শরীফে নাযিল হয়। শুধু তাই নয় বরং এর বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করলে স্পষ্ট মনে হয় যে, এটা মক্কার প্রথম যুগেই নাযিল হয়। সুতরাং সূরাটি মাক্কী।

সূরার বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য ঃ এই সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূল বক্তবই হলো নির্ভেজাল তাওহীদ বা আল্লাহর একাত্ত্ববাদ। কেননা, তৎকালীন মক্কার লোকদের ধর্মীয় অনুভূতিই ছিলো এই যে, যার ইবাদত করা হবে তার দেহ বা আকার থাকতে হবে। মানুষের মতো স্বামী-স্ত্রী থাকতে হবে। তাদের যথারীতি বংশধারা চলতে থাকবে। এভাবে তাদের পূজকদের

সম্পর্কে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন ধারণা বদ্ধমূল ছিলো। তৎকালীন মূর্তীপূজারী মুশরিক ছাড়াও অগ্নিপূজক মাজুশী ও নক্ষত্রপূজক সাবেয়ীও ছিলো। এরূপ অবস্থায় লোকদেরকে যখন এক ও লা-শারীক আল্লাহর বন্দেগী কবুল করার আহবান জানানো হলো, তখন তাদের মনে নানান প্রশ্ন মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। দীর্ঘ দিন ধরে তাদের মনে প্রতিষ্ঠিত ধ্যান ধারণার বিপরীত এই আহবানে তাদের মনে সেই একক খোদার পরিচয় জানার বিষয়টি তীব্র হয়ে উঠলো। আল্লাহ তা'লা তাদের নানান ধারণা ও প্রশ্নের জবাবে মাত্র কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ শব্দবিশিষ্ট একটি ছোট্ট সূরা নাযিল করে আল্লাহ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পেশ করলেন। আল কুরআনের এই জবাবে আল্লাহ সম্পর্কে সকল প্রকার মুশরিকী ধ্যান-ধারণা ও কল্পনার মুলোৎপাটন করা হয়েছে। এর দ্বারা শিরকী আকীদার চির অবসান ঘটানো হয়েছে। এই সূরার দ্বারা আল্লাহর সত্তার সাথে সৃষ্টিকূলের মধ্যে কারও কোনো গুণের বিন্দুমাত্র মিল হবার কোনো-ই সুযোগ থাকলো না।

সূরাটির বিশেষ ফযিলত ও গুরুত্ব ঃ নবী করীম (সঃ) এর নিকট এই সূরাটির অত্যধিক গুরুত্ব ও মর্যাদা ছিলো। তিনি মুসলিমদেরকে নানাভাবে এর গুরুত্ব অনুভব করাতে চেষ্টা করতেন। তাঁর কামনা ছিলো, মুসলমানরা এই সূরাটি খুব বেশী করে পাঠ করুক এবং জনগণের মধ্যে একে খুব বেশী করে প্রচার করুক। কেননা, এই সূরাটিতে ইসলামের মৌলিক আকিদা-তাওহীদ সম্পর্কে মাত্র চারটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষা ও ভঙ্গিতে বলে দেয়া হয়েছে। এর বিশেষ মুজিযা হলো- এই বাক্য কয়টি শুনা মাত্রই তা মানুষের মনে স্থায়ী ও সুদৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হয়ে যায় এবং অতি সহজেই মুখস্ত করা যায়।

সূরা ইখলাসের ফযিলত ও মর্যাদা সম্পর্কে সহীহুল বুখারীর তাওহীদ অধ্যায়ে হযরত আয়িশা সিদ্দকা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন, নবী করীম (সঃ) কোনো একজনের নেতৃত্বে একদল সেনাবাহিনী পাঠালেন। তাঁরা ফিরে এসে নবী করীম (সঃ) কে বললেন, হে আল্লাহর নবী! যাঁকে আপনি আমাদের নেতা করে পাঠিয়েছিলেন তিনি প্রত্যেক নামাযে কিরআতের সাথে قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ সূরাটি পাঠ করতেন। নবী করীম (সঃ) তাঁদেরকে বললেন ঃ সে কেন এরূপ করতো তা তোমরা

তাঁকে জিজ্ঞেস করোতো ? তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে উত্তরে তিনি বললেন, এই সূরা আল্লাহ রহমানুর রহীমের গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে, এ কারণে এ সূরা পড়তে আমি খুব ভালোবাসি। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, তাকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহও তাকে ভালোবাসেন।

(ইবনে কাসীর)

অনুরূপ সহীহুল বুখারীর সালাত অধ্যায়ে হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। একজন আনসারী মসজিদে কুবা-র ইমাম ছিলেন। তাঁর অভ্যাস ছিলো, তিনি সূরা ফাতিহা পাঠের পরই সূরা ইখলাস পাঠ করতেন। তারপর কুরআনের অন্য অংশ পাঠ করতেন। মুক্তাদীরা একদিন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি সুরা ইখলাস পাঠ করার পর অন্য সূরাও এর সাথে মিলিয়ে পাঠ করেন, ব্যাপারটা কি ? হয় শুধু সূরা ইখলাস পাঠ করুন অথবা এটা ছেড়ে দিয়ে অন্য সূরা পাঠ করুন। আনসারী ইমাম জবাব দিলেন,আমি যেমন করছি তেমনিই করবো, তোমাদের ইচ্ছা হলে আমাকে ইমাম রাখো, না হলে বলো, আমি তোমাদের ইমামতি ছেড়ে দিচ্ছি। মুসল্লীরা দেখলেন যে, এ তো মুশকিল ব্যাপার! কারণ সকলের মধ্যে তিনিই ছিলেন ইমামতির জন্য সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি। তাই তাঁর উপস্থিতিতে অন্য কারো ইমামতি মেনে নিতে পারলেন না। একদিন রাসূলুল্লাহ (সঃ) সেখানে আসলে মুসল্লীরা তাঁর কাছে এ ঘটনা বর্ণনা করলেন। তিনি তখন ঐ ইমামকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি মুসল্লীদের কথা মানো না কেন? প্রত্যেক রাকায়াতে সূরা ইখলাস পড়ো কেন ? ইমাম সাহেব উত্তরে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এ সূরার প্রতি আমার বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে। তাঁর একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বললেন, এ সূরার প্রতি তোমার আসক্তি ও ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। (ইবনে কাসীর)

মুসনাদ-ই আহমদ ও জামে’ আত্ তিরমিযীতে হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। একজন লোক এসে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি قُلْ هُوَاللهُ اَحَدٌ এই সূরাটিকে ভালোবাসি। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বললেন, তোমার এ ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। (ইবনে কাসীর)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণির্ত আছে । রাসুলুল্লাহ (সঃ)

সাহাবীদেরকে বললেন, তোমরা কি প্রত্যেকেই কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পাঠ করতে পারবে না! সাহাবীদের কাছে এটা খুবই কষ্টসাধ্য মনে হলো। তাই তাঁরা বলেলন, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাদের মধ্যে কার এ ক্ষমতা আছে ? তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে বললেন, জেনে রেখো قُلْ هُوَاللهُ اَحَدٌ এ সূরাটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশ। (সহীহুল বুখারী)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। একবার রাসূলুল্লাহ (সঃ) কোথাও হতে আসলেন, তাঁর সাথে হযরত আবু হুরাইরাও (রাঃ) ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) একজন লোককে এই সূরাটি পাঠ করতে শুনে বললেনঃ 'ওয়াজিব হয়ে গেছে'। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কি ওয়াজিব হয়ে গেছে ? তিনি উত্তরে বললেন, জান্নাত (ওয়াজিব হয়ে গেছে)। (জামে' আত্ তিরমিযী, নাসায়ী)

সূরা ইখলাসের ফজিলত ও মর্যাদা সম্পর্কে এভাবে অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ প্রিয় ভাই ও বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত সূরা ইখলাসের মূল ব্যাখ্যা পেশ করার পূর্বে সূরা সম্পর্কে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনাদের খিদমতে পেশ করা হলো- যা দারস বুঝার জন্য বেশ সহায়ক হবে। এখন আমি ধারাবাহিকভাবে সূরাটির ব্যাখ্যা পেশ করছি।

সূরার প্রথমেই মুশরিকদের আল্লাহ সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরে নবী করীম (সঃ) কে লক্ষ্য করে মহান আল্লাহ বলেনঃ

قُلْ هُوَاللهُ اَحَدٌ **(হে মুহাম্মদ সঃ) বলুন, আল্লাহ একক-অদ্বিতীয়।**

এই সূরাটি নাযিলের কারণ সম্পর্কে পূর্বেই বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত ইকরামা (রহঃ) বলেন যে, ইহুদীরা বলতো- 'আমরা আল্লাহর পুত্র (নাউযুবিল্লাহ) উযায়ের (আঃ) এর উপাসনা করি'। আর খৃষ্টানরা বলতো- 'আমরা আল্লাহর পুত্র (নাউযুবিল্লাহ) ঈসা (আঃ) এর উপাসনা করি'। মাজুসীরা বলতো- 'আমরা চন্দ্র-সূর্যের উপাসনা করি।' আবার মুশরিকরা বলতো- 'আমরা দেব-দেবীর পূজা করি'। আল্লাহ তা'লা তখন এই সূরা অবতীর্ণ করেন।

قُلْ ঃ 'বলুন'-শব্দটি রিসালাত ও নবুয়াতের দায়িত্ব পালনের জন্য প্রথমে

তো নবী করীম (সঃ) এর প্রতি। কেননা, আপনার আল্লাহ্ কে-কেমন ও কি প্রকৃতির এবং তাঁর বংশ-পরিচয় বা কি, এই প্রশ্নতো তাঁকেই জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো। আর এই প্রশ্নের জবাব স্বরূপ পরবর্তী কথা বলার জন্য তাঁকেই নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু আল্লাহর এই নির্দেশ মুহাম্মদ (সঃ) পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। বরং তাঁর পরে উম্মতে মুহাম্মদীর প্রত্যেক মুসলিমের জন্যই প্রযোজ্য। কেননা, এই সূরাটিতে নবী করীম (সঃ) কে ইহুদী, খৃষ্টান ও মুশরিকদের প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ্ সম্পর্কে যে কথা বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, ঈমানের দাবীদার প্রত্যেক মুমিনের-ই উচিত সেই কথা নিজে দৃঢ় বিশ্বাস করা এবং সে ভাবেই বলা বা জবাব দেয়া।

আল্লাহর নবীসহ প্রত্যেক মুমিনকে 'আল্লাহ' সম্পর্কে বলার নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

هُوَ اللّٰهُ -তিনি আল্লাহ। 'আল্লাহ' শব্দটি এমন এক সত্তার নাম যিনি চিরকাল আছেন এবং চিরকাল থাকবেন। তিনি সকল গুণের উৎস ও সকল দোষ হতে পবিত্র। তিনি তো এমন এক সত্তা যিনি আমাদের সকলের-ই রব-প্রতিপালক। এটা হলো- প্রশ্নকারীদের প্রশ্নের প্রথম জবাব।

اَللّٰهُ -নামের তাৎপর্য ঃ বিশ্ব জাহানের সৃষ্টি কর্তার জাত নাম হলো-اَللّٰهُ (আল্লাহ)। আল্লাহর যে নিরানব্বইটি নাম রয়েছে তার মধ্যে 'আল্লাহ' বাদ দিয়ে আর সবগুলোই 'সিফাতি' বা গুণবাচক নাম। আর 'আল্লাহ' নামটি আদিকাল থেকে সকলের কাছেই পরিচিত। আল্লাহর নবী (সঃ) সকল প্রকার পূজক, উপাস্য ও দেব-দেবীর উপাস্যকে বাদ দিয়ে এককভাবে যে রবকে একমাত্র মা'বুদ হিসেবে গ্রহণ করার জন্য আহবান জানিয়েছিলেন তা কোনো নতুন নাম ছিলো না। বরং 'আল্লাহ' শব্দটি আরবদের নিকট খুব-ই পরিচিত ছিলো। প্রাচীন কাল থেকেই তারা বিশ্বজাহানের সৃষ্টি কর্তাকে বুঝানোর জন্য এই 'আল্লাহ' শব্দটি ব্যবহার করে এসেছে। তাদের অন্য কোনো উপাস্যকে বুঝানোর জন্য তাদের নিকট প্রচলিত শব্দ ছিলো 'ইলাহ'। 'আল্লাহ' সম্পর্কে তাদের ধারণা ও বিশ্বাস এমন ছিলো যে, যখন আবরাহা বাদশাহ কা'বা ঘর ধ্বংস করার জন্য মক্কা আক্রমন করেছিলো, তখন তাদের মুখ দিয়ে 'আল্লাহ' শব্দটিই উচ্চারিত হয়েছিলো। অথচ সেই

সময় কা'বা ঘরের মধ্যে তাদের উপাসনার জন্য ৩৬০ টি মূর্তি বিদ্যমান ছিলো। অথচ তারা কা'বা ঘরকে রক্ষার জন্য তাদের এসব দেব-দেবীকে না ডেকে আল্লাহ-কেই ডেকেছিলো। তাদের মনের মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো এই যে, এ ঘর একমাত্র রক্ষা করতে পারবে 'আল্লাহ', অন্য কেউ-ই এই বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারবে না। তাছাড়া কা'বা ঘরের মধ্যে ৩৬০ টি মূর্তি বা প্রতিমা থাকার পরও ওই ঘরের নাম তাদের মা'বুদ সম্পর্কে পরিচিত শব্দ 'বায়তুল আলেহা' বা 'উপাস্যের ঘর' ব্যবহার করতো না, বরং তারা 'বায়তুল্লাহ' বা 'আল্লাহর ঘর' বলেই অভিহিত করতো।

আল্লাহ সম্পর্কে আরবের মুশরিকদের যে ধারণা ও বিশ্বাস ছিলো, তা পবিত্র আল কুরআনের অসংখ্য যায়গায় উল্লেখ রয়েছে। তার মধ্য হতে উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি আয়াত নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

সূরা যুখরুফ-এ বলা হয়েছে-

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللهُ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ

"(হে নবী!) আপনি যদি এই লোকদেরকে জিজ্ঞেস করেন যে, তাদেরকে কে সৃষ্টি করেছে ? তা হলে তারা অবশ্যই বলবে যে, নিশ্চয় আল্লাহই আমাদেরকে সৃষ্টি করেছে।" (আয়াত নং-৮৭)

সূরা আনকাবুত-এ বলা হয়েছে-

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللهُ ج فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ٥ اَللهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ط اِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ٥ وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ مِنْ م بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللهُ ط قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ط بَلْ اَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ

"(হে নবী!) আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন যে, আসমান ও যমীন কে সৃষ্টি করেছে, চন্দ্র ও সূর্যকে কে নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছে ? তাহলে তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ'। আর যদি তাদেরকে জিজ্ঞেসা করেন, আসমান

হতে কে পানি বর্ষণ করেছে এবং তার সাহায্যে মৃত যমীনকে পুণর্জীবিত করেছে ? তা হলে তারা অবশ্যই বলবে 'আল্লাহ'। বলুন, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। কিন্তু তার আধিকাংশই নির্বোধ। (আয়াত নং-৬১-৬৩)
সূরা ইউনুসে বলা হয়েছে-

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَ
بْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ
وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ ط فَسَيَقُوْلُوْنَ اللهُ ج فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ

"(হে নবী!) এদেরকে জিজ্ঞেস করুন, তোমাদেরকে আসমান ও যমীন হতে কে রিযিক দান করে ? তোমাদের এই শোনার শক্তি ও দেখার শক্তি কার কর্তৃত্বের অধীনে ? কে জীবিতকে মৃত থেকে এবং মৃতকে জীবিত হতে বের করে ? আর কে এই বিশ্ব ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করছে ? এরা নিশ্চয়ই বলবে, 'আল্লাহ'। অতএব তাদেরকে বলুন, এরপরও কি তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে না ?" (আয়াত নং-৩১)
সূরা বনী ইসরাঈলে বলা হয়েছে-

وَاِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِى الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ اِلَّآ اِيَّاهُ ج فَلَمَّا نَجّٰكُمْ
اِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ ط وَكَانَ الْاِنْسَانُ كَفُوْرًا

"সমুদ্রে যখন তোমাদের উপর বিপদ আসে। তখন সেই এক আল্লাহ ছাড়া আর যাকে যাকে তোমরা ডাকো, তারা সবাই হারিয়ে যায়। কিন্তু যখন তিনি তোমাদেরকে বাঁচিয়ে স্থলভাগে পৌছিয়ে দেন, তখন তোমরা তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ।" (আয়াত-৬৭)

উপরোক্ত আয়াতসমুহের প্রতি দৃষ্টি দিলে লক্ষ্য করা যায় যে, মক্কার লোকেরা যখন নবীজিকে জিজ্ঞেস করলো-তোমার রব কে, তিনি কি রকম, হে মুহাম্মদ! যাঁর ইবাদত-বন্দেগী করার জন্য তুমি আমাদেরকে ডাকছো? তখন তাদের উত্তর দেয়া হলো- هُوَ اللهُ "তিনি তো আল্লাহ"। অর্থাৎ মুশরিকরা পূর্ব থেকেই একক সত্তা যেই আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করতো এবং মানতো, তাদেরকে তো কেবল সেই আল্লাহর কথা-ই বলা হচ্ছে। সুতরাং আল্লাহ সম্পর্কে তাদের যেসব প্রশ্ন ছিলো তার উত্তর তো এছাড়া আর অন্য কিছুই হতে পারে না।

তারপর পরবর্তীতে সকলেরই পরিচিত একক সত্ত্বা 'আল্লাহ্‌র' একত্ববাদের প্রথম ঘোষণা হলো-

اَحَدٌ অর্থ- একক। কুরআন মজিদ নাযিল হওয়ার পূর্বে আরবী ভাষায় اَحَدٌ শব্দটি গুণবাচক হিসেবে কোনো জিনিস বা কোনো ব্যক্তির জন্য ব্যবহার হয়নি। আল কুরআন নাযিলের পর এই اَحَدٌ শব্দটি কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই ব্যবহৃত হতে শুরু করে। শব্দটির এই অস্বাভাবিক ব্যবহার হতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, 'একক' ও 'অনন্য' হওয়ার গুণটি কেবলমাত্র এক আল্লাহ্‌র জন্যই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট। বিশ্বজাহানের অন্য কোনো ব্যক্তি বা জিনিস-ই এই গুণে গুণান্বিত হওয়ার অধিকার রাখে না। কেবলমাত্র তিনিই এক-একক ও অনন্য, তাঁর দ্বিতীয় কেউ নেই-বিকল্প কোনো কিছুই নেই।

অন্য দিকে মক্কার মুশরিক ও মদীনার 'আহলি কিতাব' তথা ইহুদী-খৃষ্টানরা নবী করীম (সঃ) কে তাঁর রব সম্পর্কে যেসব প্রশ্ন করতো, সেই দৃষ্টিতে هُوَاللهُ বলার পর اَحَدٌ বলে তাদের প্রশ্নাবলীর অত্যন্ত সুন্দর ও সাবলীলভাবে উত্তর দেয়া হয়েছে, যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অর্থাৎ আল্লাহ তা'লার একত্বের অর্থ হচ্ছে, তাঁর অস্তিত্বে তিনি একা। তাঁর একত্বের এই অস্তিত্ব ছাড়া আর কিছুই সত্য নয়, তাঁর অস্তিত্ব ছাড়া অন্য কিছুরই কোনো অস্তিত্ব নেই। তিনি ছাড়া অন্য যা কিছু আছে তা তাঁরই দান। তাঁর কাছ থেকেই সাহায্য গ্রহণ করে এবং নিজেদের অস্তিত্বের ধারণাও তাঁর মূল অস্তিত্ব থেকে গ্রহণ করে।

সুতরাং এই বিশ্ব জগতের সত্যিকার ও স্থায়ী যদি কর্তৃত্ব থেকে থাকে তা আল্লাহ তা'লার-ই আছে, অন্য কারো নয়। এ থেকে একথা যানা যায় যে, এই সূরায় বর্ণিত আকীদায় মানুষের বিশ্বাসগত আকীদা ও তাঁর অস্তিত্বের ব্যাখ্যা এ উভয়টাই প্রমাণ করে।

'ওলুহিয়াত' বা আল্লাহর একাত্ববাদ সম্পর্কে পবিত্র আল কুরআনের কতিপয় আয়াত নিম্নে উল্লেখ করা হলো। যেমন- সূরা বাকারা'য় বলা হয়েছে- وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ

"তোমাদের ইলাহ- মা'বুদ এক ও একক ইলাহ। সেই রহমান ও রহীম ইলাহ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ইলাহ নেই।" (আয়াত নং-১৬৩)

সূরা আলে ইমরান-এ বলা হয়েছে-

شَهِدَاللهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَلا وَالْمَلٰئِكَةُ وَاُولُوالْعِلْمِ قَآئِمًام بِالْقِسْطِ ط
لَآاِلٰهَ اِلاَّ هُوَالْعَزِيْزُالْحَكِيْمُ

"আল্লাহ স্বাক্ষ্য দেন যে, তিনি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই। ফিরিশতাগণ এবং সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানী লোকেরাও সাক্ষ্য দেন যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (আয়াত নং-১৮) একই সূরায় বলা হয়েছে-

وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَافِى الْاَرْضِ ط وَاِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ

"আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর; আর আল্লাহর কাছেই সবকিছু ফিরে যাবে।" (আয়াত নং-১০৯)

সূরা আশ্ শুরা-য় বলা হয়েছে-

لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الاَرْضِ وَهُوَالْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ

"আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তা তাঁরই। তিনি সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান।" (আয়াত নং-৪)

সূরা আন্ নূর-এ বলা হয়েছে-

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ ج وَاِلَى اللهِ الْمَصِيْرُ

"আসমান ও যমীনের সার্বভৌমত্ব আল্লাহর-ই এবং তাঁর-ই দিকে সকলকে ফিরে যেতে হবে।" (আয়াত নং-৪২)

সূরা আস্ সাফ্ফাত-এ বলা হয়েছে-

اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ○ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا وَرَبُّ
الْمَشَارِقِ

"নিশ্চয়-ই তোমাদের ইলাহ এক-একক। যিনি আসমান ও যমীন এবং তাদের মধ্যবর্তী সব কিছুর রক্ষক এবং রক্ষক পূর্বদিগন্তের।"(আয়াত-৪-৫)

উপরোক্ত আয়াতসমূহে বিশ্বজাহানের ইলাহ, সংরক্ষক, নিয়ন্ত্রক, প্রতিপালক ও সার্বভৌমত্বের মালিক এক আল্লাহর কথাই ঘোষণা দেয়া হয়েছে। সুতরাং তাওহীদপন্থী একজন মুমিন যেমন নিজের মন-মগজে সকল বিষয়ে একমাত্র আল্লাহর একাত্ববাদকে লালন করবে, তেমনি যখন-ই কোনো গোষ্ঠী বা ব্যক্তির দ্বারা আল্লাহর একাত্ববাদের বিষয়ে প্রশ্নের সম্মুখীন হবে, তখন-ই তার প্রথম জবাবই হবে اَللهُ اَحَدٌ আল্লাহ একক-অদ্বিতীয়।

তাওহীদ বা আল্লাহর একাত্ববাদের দ্বিতীয় ঘোষণা হলো-

اَللهُ الصَّمَدُ - আল্লাহ কারো-ই মুখাপেক্ষী নন, সব-ই তাঁর মুখাপেক্ষী।

صَمَدُ -মূল শব্দ। ص- م- د এর মূল অক্ষর। এটি একটি ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ অর্থবোধক শব্দ। এর অর্থের তাৎপর্য নিম্নে বিভিন্ন জনের উক্তিসহ বর্ণনা করা হলো ঃ

হযরত আলী, ইকরামা ও কা'ব আহবার বলেছেন, صَمَدُ (সামাদ) সে, যার উপরে কেউ নেই।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও আবু ওয়ায়িল শরীক ইবনে সালামা (রাঃ) বলেছেন, صَمَدُ (সামাদ) সেই সরদার-সমাজপতি যার নেতৃত্ব ও প্রাধান্য পরিপূর্ণ এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাসের অপর এক বক্তব্য হলো- صَمَدُ (সামাদ) সেই, যার নিকট কোনো প্রকার বিপদ-মুসীবত দেখা দিলে সাহায্য চাওয়া হয়। তাঁর আরো একটি উক্তি হলো- যে সরদার-সমাজপতি তার নিজের সরদারী ও প্রাধান্যে, স্বীয় মর্যাদায় নিজের মাহাত্মে ও বড়ত্বে, নিজের ধৈর্য ও সহিষ্ণুতায়, স্বীয় জ্ঞানে ও নিজের বুদ্ধিমত্তা এবং কর্মকুশলতায় পরিপূর্ণ।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেছেন, صَمَدُ (সামাদ) সে, যে কারো মুখাপেক্ষী নয়, সবাই তার মুখাপেক্ষী।

হযরত ইকরামার আরো একটি উক্তি হলো, صَمَدٌ (সামাদ) তা, যার মধ্য হতে কোনো জিনিস কখনও বের হয়নি, বের হয় না। সে খায় না, পানও করে না। অর্থাৎ যার পেট নেই।

সুদ্দী বলেন, صَمَدٌ (সামাদ) অর্থ-পার্থিব জিনিসগুলি পাবার জন্য যার দিকে তাকানো হয়। বিপদের সাহায্যের জন্য যার প্রতি আশা করা হয়।

সায়ী'দ ইবনে জুবাইর বলেন, صَمَدٌ (সামাদ) সে, যে নিজের সব গুণ ও কাজে পরিপূর্ণ।

রুবাই ইবনে আনাস বলেন, যার উপর কোনো বিপদ-আপদ আসে না, সে صَمَدٌ (সামাদ)।

মুকাতিল ইবনে হাইয়্যান বলেন, صَمَدٌ (সামাদ) সেই, যার কোনো দোষ-ত্রুটি নেই।

ইবনে কাইসান বলেন, صَمَدٌ (সামাদ) সে, যার গুণে অন্য কেউ গুণান্বিত হতে পারে না।

হাসান বসরী ও কাতাদাহ বলেন, صَمَدٌ (সামাদ) অর্থ- যে চিরস্থায়ী, শাশ্বত, অশেষ।

মুররাতুল হামাদানীর অন্য একটি বক্তব্য হলো, صَمَدٌ (সামাদ) সে, যে নিজের ইচ্ছানুযায়ী যা ইচ্ছা ফায়সালা করে, যে কাজ ইচ্ছা করে। তার নির্দেশ, সিদ্ধান্ত ও ফয়সালার উপর পুনর্বিবেচনা করার কেউ নেই।

ইবরাহীম নখয়ী' বলেন, صَمَدٌ (সামাদ) হলো সে, যার দিকে মানুষ নিজের প্রয়োজনে ফিরে তাকায়; আশা পোষণ করে। (তাফহীমুল কুরআন)

এভাবে اَللّٰهُ الصَّمَدُ এর বিভিন্ন জন বিভিন্ন অর্থ করেছেন। সবগুলো অর্থ যদি সমন্বয় করে এক কথায় প্রকাশ করা হয়, তাহলে এর অর্থ এই দাঁড়ায়- 'আল্লাহ কোনো বিষয়ে কারো মুখাপেক্ষী নন, বরং সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী।'

বিবেচ্য বিষয় ঃ আল্লাহ্ সম্পর্কে মুশরিকদের প্রশ্নের জবাবে সূরার প্রথম বাক্যে اَللهُ اَحَدٌ এ-اَحَدٌ শব্দের প্রথমে ال ছাড়া কেন বলা হলো, আর দ্বিতীয় বাক্যে اَللهُ الصَّمَدُ -এ- صَمَدُ এ ال দিয়ে কেন বলা হলো, এবং এ বলার কারণ কি ? তা এখন বিবেচনা করতে হবে। এর বিবেচ্য বিষয় হলো - اَحَدٌ শব্দ সম্পর্কে আমরা পূর্বে ব্যাখ্যায় বলেছি যে, এটা কেবলমাত্র আল্লাহর জন্যই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট। অন্য কারো জন্য কখনো ব্যবহৃত হয় না এবং ব্যবহারও করা হতো না। এ কারণে اَحَدٌ শব্দটি ال ছাড়াই نَكِرَةٌ (নাকেরাহ) বা অনির্দিষ্ট অর্থবোধক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু صَمَدُ (সামাদ) শব্দটি সৃষ্টির যে কোনো জিনিস বা ব্যক্তির জন্য ব্যবহৃত হয় এবং হতে পারে। এই জন্য اَللهُ صَمَدُ (আল্লাহ সামাদ) এর পরিবর্তে صَمَدُ এ- ال সংযুক্ত করে اَللهُ الصَّمَدُ (আল্লাহুস সামাদ) নির্দিষ্ট শব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হলো, আসল ও প্রকৃত صَمَدُ (সামাদ) হলো আল্লাহ তা'লা, তিনি ছাড়া আর কেউ নয়। সৃষ্টির কোনো জিনিস বা অন্য কেউ صَمَدُ (সামাদ) যদি হয়ও, তবে তা কেবলমাত্র কোনো একটি দিক দিয়ে হবে, অন্য সবদিক দিয়ে হবে না, হতেও পারে না। কেননা, তা ধ্বংসশীল বা মরণশীল চিরস্থায়ী ও শাশ্বত নয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী। তিনি সবগুণে গুণান্বিত। বিশ্বজগত তার মুখাপেক্ষী। কিন্তু তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। সুতরাং اَلصَّمَدُ এই কারণে যে, তিনি একাই মা'বুদ অন্য কেউ মা'বুদ হতে পারে না। বরং অন্যরা সবাই আ'বদ। অতএব মানুষ যদি কারো ইবাদত-আরাধনা করতে চায়, তবে আল্লাহর করবে অন্য কারো করবে না-করতে পারে না। "আশরাফুল মাখলুকাত" বা "সৃষ্টির সেরা" মানুষের জন্য আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করা শোভা পায় না এবং মানুষের জন্য তা মর্যাদাপূর্ণও নয়।

তাওহীদ বা আল্লাহ তা'লার একাত্ববাদ সম্পর্কে তৃতীয় আকিদা বা বিশ্বাস হলো- لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ

তার কোনো সন্তান নেই এবং তিনিও কারো সন্তান নন।

মুশরিকদের আল্লাহর বংশ সম্পর্কে এবং ইহুদী-খৃষ্টানদের আল্লাহর সন্তান সম্পর্কে যে প্রশ্ন ছিলো, তার উত্তরে মহান আল্লাহ তা'লা বলেন, হে মুহাম্মদ! তাদেরকে বলে দিন, আল্লাহর কোনো সন্তান নেই অর্থাৎ তিনি কাউকে জন্ম দেননি, অপর পক্ষে তিনিও কারো সন্তান নন অর্থাৎ তিনি কারো কাছ থেকে জন্ম নেননি।

মক্কার মুশরিকদের ধারণা ছিলো, তাদের উপাস্যদের মতো আল্লাহও বুঝি একটি জাতির অন্তর্ভুক্ত। তাদের বিয়ে-শাদী অনুষ্ঠিত হবে, সন্তানের জন্ম দেবে, ধারাবাহিকভাবে বংশধারা চলতে থাকবে। তাদের এ ধারণা মূলতঃ জাহিলী ধারণা, ভিত্তিহীন কল্পনা মাত্র। আরবদের এরূপ বিশ্বাসের কথা পবিত্র আল কুরআনেও বর্ণনা করা হয়েছে। তারা ফিরিশতাদের আল্লাহর কন্যা মনে করতো। আবার কোনো কোনো নবী রাসূলকেও আল্লাহর পুত্র মনে করতো (নাউযুবিল্লাহ)। যেমন, ইহুদীরা ওজায়ের (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র (নাউযুবিল্লাহ) দাবী করতো এবং খৃষ্টানরা ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র (নাউযুবিল্লাহ) বলে মনে করতো। মহান আল্লাহ তা'লা তাদের এ দাবী বা বিশ্বাসকে সূরা ইখলাস নাযিল করে স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিলেন যে- لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ

তাঁর কোনো সন্তান নেই এবং তিনিও কারো সন্তান নন।

মহান আল্লাহ তা'লা তাদের এই শিরকী আকিদার উত্তর সূরা ইখলাস নাযিল করে তীব্র ও অকাট্য প্রতিবাদ করেই ক্ষান্ত হননি ররং আল কুরআনের বিভিন্ন সূরায় বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবে এ কথার বারবার উল্লেখ করেছেন, যাতে করে তাওহীদি আকীদার উপর সমাচ্ছন্ন অমূলক ধারণার সব অন্ধকার চিরতরে দূর হয়ে যায় এবং প্রকৃত বিষয় মানুষের কাছে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ এখানে এই পর্যায়ের কিছু আয়াত উল্লেখ করা হলো।

যেমন, সূরা আন নিসা'য় মহান আল্লাহ্ বলেন-

اِنَّمَااللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ط سُبْحٰنَهٗٓ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ لَهٗ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط

"আল্লাহ তো একমাত্র মা'বুদ। তাঁর কোনো সন্তান হবে- এ হতে তিনি পবিত্র। যা কিছু আকাশ জগতে আছে, আর যা কিছু পৃথিবীতে আছে, তা সব-ই তাঁরই মালিকানাধীন।" (আয়াত নং-১৭১)

অনুরূপ সূরা আস্ সাফ্ফাত-এ বলা হয়েছে-

اَلَاۤ اِنَّهُمْ مِّنْ اِفْكِهِمْ لَيَقُوْلُوْنَ ۝ وَلَدَاللّٰهُ لا وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ

"জেনে রাখো, এই লোকেরা নিজেদের মনগড়া কল্পনা হিসেবেই বলে যে, আল্লাহর সন্তান আছে। প্রকৃত কথা এই যে,এই লোকেরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।" (আয়াত নং-১৫১-১৫২)

সূরা আনয়া'ম-এ মহান আল্লাহ্ বলেন-

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ ط وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ

"তিনি তো আসমান-যমীনের সৃষ্টিকর্তা, কি করে তাঁর সন্তান হতে পারে? তাঁর তো স্ত্রী নেই, সকল জিনিসতো তিনিই সৃষ্টি করেছেন।"(আয়াত -১০১)

সূরা আম্বিয়া-য় মহান আল্লাহ্ বলেন-

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ط بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ

"আর এই লোকেরা বলে, রহমান আল্লাহ কাওকেউ পুত্র বানিয়ে নিয়েছেন। তিনি মহান পবিত্র। (যাকে তাঁর সন্তান বলে) তারা তো তাঁর সম্মানিত বান্দাহ মাত্র।" (আয়াত নং-২৬)

সূরা মু'মিনুন-এ মহান আল্লাহ্ বলেন-

مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ -

"আল্লাহ্ কাওকেউ পুত্র বানান নি। আর অন্য কোনো ইলাহ্ও তাঁর সাথে নেই।" (আয়াত নং-৯১)

হাদীসে উল্লেখ রয়েছে- "রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, কষ্টদায়ক কথা শুনে এতো বেশী ধৈর্য ধারণকারী আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই। মানুষ বলে যে, আল্লাহর সন্তান রয়েছে, তবুও তিনি তাকে অন্ন দান করেন, স্বাস্থ্য ও সুস্থ্তা দান করেন।" (সহীহুল বুখারী)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! উপরে উল্লেখিত আয়াতসমূহে এবং হাদীসের বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট ও পরিস্কার। যারা আল্লাহর পুত্র-সন্তান আছে, কিংবা তিনি কোনো পালকপুত্র গ্রহণ করেছেন বলে মনে করে ও এ ধরণের আকীদা পোষণ করে, এসব আয়াত ও হাদীস তাদের এই ধারণা এবং আকীদার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। প্রকৃত পক্ষে তাদের এই ধারণা ও আকীদা যে ভুল ও ভিত্তিহীন তাও অকাট্য দলিল এবং যুক্তির মাধ্যমে স্পষ্ট ও অনস্বীকার্য করে তুলেছে। বর্ণিত এসব আয়াত এবং আরোও অন্যান্য আয়াত সূরা ইখলাসের لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ এই বক্তব্যকে মজবুত ও স্পষ্ট করে তুলেছে।

তাওহীদ বা আল্লাহর একাত্ববাদের চতুর্থ আকীদা বা বিশ্বাস হলো -

وَلَمْ يَكُنْ اللهُ كُفُوًا اَحَدٌ-আর তাঁর সমতুল্য বা সমকক্ষ কেউ-ই নেই।

كُفُوً এর অর্থ হলো- সমতুল্য, সমকক্ষ, সহযোগী, সমমর্যাদা সম্পন্ন, ক্ষমতার সমান অধিকারী ইত্যাদি। মুসলিম সমাজে বিবাহের ক্ষেত্রে كُفُوًا (কুফু) শব্দটি ব্যবহৃত হয় এবং এই শব্দটি খুবই সুপরিচিত। এর অর্থ হলো, বর ও কনের সামাজিক মর্যাদার দিক দিয়ে সামঞ্জস্যতা বা সমকক্ষতা। কাজেই এই আয়াতটির অর্থ হলো, গোটা বিশ্ব জাহানে আল্লাহর মতো গুণাবলীতে তাঁর সমকক্ষ, কাজ ও ক্ষমতা-ইখতিয়ারে তাঁর সমান, কোনো দিক দিয়েই বিন্দুপরিমাণ সমকক্ষ ও সমমর্যদার কেউ নেই, কেউ কোনো দিন ছিলো না, কেউ কখনো হতে পারে না এবং কোনো দিন হতেও পারবে না।

এই সূরাটি তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের ইসলামী আকীদার স্বীকৃতি প্রদান করে। আর 'সূরা কাফিরূন' তাওহীদ ও শিরকের আকিদার মাঝে

কোনো প্রকার সামঞ্জস্য ও মিলমিশকে প্রত্যাখান করে। এই উভয় সূরার মাঝেই তাওহীদে বিশ্বাসের ভিন্ন ভিন্ন দু'টি দিক বর্ণিত ও পরিস্ফুটিত হয়ে আছে।

সহীহ হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফজরের দু' রাকায়াত সুন্নত নামাযে অর্থাৎ প্রথম রাকায়াতে 'সূরা কাফিরূন' এবং দ্বিতীয় রাকায়াতে 'সূরা ইখলাস' এই দুই সূরা পড়ে দিনের সূচনা করতেন। এভাবে শুরু করার একটা গভীর ও উঁচুমানের উদ্দেশ্য নিহিত ছিলো।

যারা সূরা ইখলাসে বর্ণিত আকীদার বিপরীত আকীদা পোষণ করবে তারা শিরকে লিপ্ত হবে। আর শিরকের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। এ সম্পর্কে কুরআন এবং হাদীসে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। যেমন- মহান আল্লাহ বলেন-

وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ الْجَنَّةَ

"আর যে আল্লাহর সাথে শিরক করে, অবশ্যই আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন।"

মহান আল্লাহ তা'লা বিশ্ব মানব সন্তানদেরকে লোকমানের ঘটনাকে উল্লেখ করে শিক্ষা দিচ্ছেন-

وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللهِ ط اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

"স্মরণ করো, যখন লোকমান উপদেশ হিসেবে তাঁর পুত্রকে বললেন ঃ হে বৎস! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না, নিশ্চয় আল্লাহর সাথে শরীক করা মস্ত বড় যুলুম।" (সূরা লোকমান-১৩)

আল্লাহর নবীকেও শিরকের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে বলেন ঃ

وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ج لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

"(হে নবী!) আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্বের (নবীদের) প্রতি অবশ্যই ওহী নাযিল করা হয়েছে। যদি আপনি আল্লাহর সাথে শরীক করেন, তবে আপনার আ'মল বিফল হয়ে যাবে এবং আপনি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে গণ্য হবেন।" (সূরা যুমার-৬৫)

হাদীস শরীফে হযরত যাবের বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "দু'টি বিষয় অপর দু'টি বিষয়কে অনিবার্য করে তোলে। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, হুজুর সে দু'টি বিষয় কি? নবী করীম (সঃ) বললেনঃ যে আল্লাহর সাথে কাউকেও শরীক করে মরেছে, সে অবশ্যই জাহান্নামে যাবে। পক্ষান্তরে যে আল্লাহর সাথে কাউকেও শরীক না করে মরেছে, সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে।"

(সহীহ মুসলিম)

শিরককারীদের সাথে আল্লাহ সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এ সম্পর্কে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ বলেন, "আমি মুশরিকদের শিরক থেকে পবিত্র। যে ব্যক্তি এমন আ'মল করলো যাতে আমাকে ছাড়া আর অন্য কাউকেউ শরীক করা হয়েছে, আমি তার সাথে সম্পর্ক রাখি না। তার সম্পর্ক তার সাথে থাকে, যাকে সে শরীক করেছে।" (সহীহ মুসলিম, সুনানে ইবনে মাযাহ)

শিক্ষা ঃ প্রিয় ভাই ও বোনেরা! পবিত্র আল কুরআনের ক্ষদ্রতম সূরাগুলোর মধ্যে সূরা ইখলাস একটি ক্ষুদ্রতম সূরা হলেও তাৎপর্য ও ব্যাখ্যা ব্যাপক বিস্তর। ক্ষুদ্রজ্ঞান নিয়ে চেষ্টা করেছি তার ব্যাখ্যা করার। এখন আমরা জানবো, এই সূরা আমাদেরকে কি কি শিক্ষা দিচ্ছে। নিম্নে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করা হলোঃ

১. তৎকালীন নবীর যুগে মক্কার মুশরিক, সাবেয়ী এবং অগ্নিপুজক আর মদীনার ইহুদী, খৃষ্টান ও অন্যান্যরা আল্লাহ সম্পর্কে যেসব প্রশ্ন, ধারণা এবং আকীদা পোষণ করতো, যুগ যুগ ধরে বর্তমান সময় পর্যন্ত উপরোক্ত জাতি বা গোষ্ঠীর লোকেরা তো আছেই তার সাথে যোগ হয়েছে নামধারী মুসলিমরা, যারা অহরহ আল্লাহর সাথে শিরক করে যাচ্ছে। আর আকীদাগত ভাবেও একজন মুসলিম হওয়ার পরও শিরকী আকীদা পোষণ করে যাচ্ছে যা অত্যন্ত গরহীত অমার্জনীয় অপরাধ। একজন খাঁটি তাওহীদবাদী মুমিন এ আকীদা পোষণ করবে না- করতে পারে না।।

২. তাওহীদ তথা আল্লাহর একাত্ববাদের বিষয়ে বাস্তবে তো নয়, বরং আকীদাগত ভাবেও এ ধরনের ধারণা বা বিশ্বাস থেকে মুক্ত থাকতে হবে। আল্লাহর একাত্ববাদের বিপরীত তখনই হবে, যখন আল্লাহর জাত ও শিফাতের সাথে অন্য কাউকেও শরীক করা হবে। যেমন, আল্লাহর জাতের

সাথে কতিপয় অবুঝ বিদআ'তী নামধারী আলিমরাও বলে থাকেন, "আল্লাহর নূরে নবী পয়দা তার নূরে সবই পয়দা" (নাউযুবিল্লাহ)। এছাড়া কেউ কেউ তো কোনো কোনো পীর, ওলী-আউলিয়াকে আল্লাহ কেন, আল্লাহর উপরেও পৌঁছিয়ে দেয় (নাউযুবিল্লাহ)।

যেন রাখুন, যার যা মর্যাদা আছে তাকে সেখানেই মর্যাদা দিতে হবে। যেমন, আল্লাহকে আল্লাহর স্থানে রাখতে হবে। তার স্থানে অন্য কাকেউ কেন, কোনো কিছুকেই স্থান দেয়া যাবে না। নবী-রাসূলগণকে নবী-রাসূলদের মর্যাদায় রাখতে হবে, অন্য কাকেউ তাঁদের স্থানে স্থান দেয়া যাবে না। সাহাবাগণকে সাহাবাদের স্থানেই রাখতে হবে, অন্য কাকেউ তাঁদের স্থানে স্থান দেয়া যাবে না। তাবেয়ী'নদেরকে তাঁদের স্থানেই রাখতে হবে, অন্য কাকেউ তাঁদের স্থানে স্থান দেয়া যাবে না। তাবা তাবেয়ী'নদেরকে তাঁদের স্থানেই রাখতে হবে, অন্য কাকেউ তাঁদের স্থানে স্থান দেয়া যাবে না। পীর বলে তো ইসলামে কোনো পদ-পদবী নেই। আর ওলী আউলিয়া কে, তাতো আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন-ই বেশী ভালো জানেন। যে কোনো মুমিন-মুসলিমই আল্লাহর ওলী হতে পারেন,তাঁর জ্ঞান, তাকওয়া ও আ'মল বা কর্মদ্বারা।

৩. এ আকীদা বা ধারণা রাখতে হবে যে, কোনো ক্ষেত্রে বা কোনো বিষয়ে আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী বা নির্ভরশীল নন। তিনি যেমন বিশ্ব জাহান সৃষ্টির ক্ষেত্রে কারো মুখপেক্ষী বা সহযোগিতা নেননি, তেমনি তাঁর এই বিশ্বজাহান পরিচালনার জন্যও কারো সহযোগিতা কামনা করেন না এবং কারো মুখাপেক্ষী বা নির্ভরশীল নন। এমনকি কারো ইবাদত পাওয়ার জন্যও মুখাপেক্ষী নন। কেননা, সারা দুনিয়ার মানুষও যদি তাঁর ইবাদত-বন্দেগী না করে, তাতে তার একবিন্দুও ক্ষতি হবে না। আবার সারা দুনিয়ার মানুষও যদি দিন-রাত ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকে, তাতেও তাঁর একবিন্দু উপকার হবে না। লাভ-ক্ষতি মানুষের-ই। যদি মানুষ আল্লাহর দাসত্ব করে তবে বান্দাহর-ই লাভ। আর যদি দাসত্ব বা ইবাদত বন্দেগী না করে তবে বান্দাহর-ই ক্ষতি।

৪. আল্লাহর কোনো বংশ-জাত নেই। অর্থাৎ আল্লাহকে যেমন কেউ জন্ম দেননি-তেমনি আল্লাহও কাউকে জন্ম দেননি, এই আকিদা পোষণ করতে হবে। ইহুদীরা যেমন ওজায়ের (আঃ) কে আল্লাহর সন্তান দাবী করে

দ্বিত্ববাদে বিশ্বাস করে শিরক করে, তেমনি খৃষ্টানরা ঈসা (আঃ) কে আল্লাহর সন্তান এবং মরিউম (আঃ) কে আল্লাহর স্ত্রী দাবী করে তৃত্ববাদে বিশ্বাস করে শিরক করে। আর মুশরিকরা অসংখ্য ছোট-বড় দেব-দেবীর পূজা করে বহু ঈশ্বরবাদে বিশ্বাস করে শিরক করে। একজন তাওহীদ বাদী বা পন্থী এর কোনোটাতেই বিশ্বাস তো দূরে থাক, ধারণাও পোষণ করতে পারে না।

৫. আল্লাহর সাথে কাকেউ সমকক্ষ মনে করা বা তুলনা করা যাবে না। আল্লাহকে আল্লাহর স্থানেই স্থান দিতে হবে। তাহলে একজন মুসলিম হয়েও কিভাবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করে ? পীর পূজা করে? কবর পূজা করে? চাকুরী পাবার জন্য, ব্যবসা-বাণিজ্যে লাভবান ও স্বনির্ভর হওয়ার জন্য, সন্তান লাভের জন্য পীরবাবার দরবারে ছাগল, মুরগী, টাকা-পয়সা নিয়ে ছুটে যায়? কিভাবে একজন মৃতব্যক্তির কবরের পাশে বসে চোখের পানি ছেড়ে কাঁদতে থাকে, আর পীর বাবার কাছে প্রার্থনা করতে থাকে ? কিভাবে একজন মুসলমান আল্লাহ ছাড়া মানুষের সামনে মাথানতো করে, এমনকি পায়ের সামনে সাজদায় পড়ে যেতে পারে? ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভুনীতে বা দিনের শুরুতেই বাকী দিলে সারাদিনে বাকী দিতে হবে মনে করতে পারে ? বিবাহ-সাদীর ক্ষেত্রে হিন্দু সম্প্রদায়ের মতো কিভাবে আচার অনুষ্ঠান করে শিরক করে থাকে ? আল্লাহকে ছাড়া অন্যকে মঙ্গল-অমঙ্গলের মালিক মনে করতে পারে ? অথচ আমরা কালিমায় ঘোষণা দেই যে, لَاإِلٰهَ إِلَّا اللهُ 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, মা'বুদ নেই, কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক নেই'।

৬. একজন তাওহীদবাদী আল্লাহ ছাড়া অন্য কাকেউ আইন দাতা, রিযিক দাতা, পালনকর্তা মনে করতে পারে না এবং আকীদাও পোষণ করতে পারেনা। অথচ আমাদের দেশের মতো অসংখ্য সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলিম দেশও কুরআনের স্পষ্ট বিধি-বিধান, আইন-কানুন থাকার পরেও এবং শেষ নবী মুহাম্মদ (সঃ) ১০টি বছর আল্লাহর আইন দ্বারা রাষ্ট্র এবং বিচার ব্যবস্থা পরিচালনার বাস্তব আদর্শ থাকার পরও আমরা মানব রচিত আইন ও বিধি-বিধান দ্বারা রাষ্ট্রীয় শাসন ও বিচার ব্যবস্থা পরিচালনা করে যাচ্ছি। এমন কি মানুষের তৈরী করা আইন ও আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য জান-প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করে যাচ্ছি। আর যারা আল্লাহর বিধি-বিধান এবং

নবীর আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করছে বা আন্দোলন সংগ্রাম করছে, তাদেরকে বাধা সৃষ্টি করছি। নবীর যুগের কাফির-মুশরিকদের মতো জুলুম-নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছি। এমনকি সমাজ থেকে তাদেরকে উৎক্ষাত করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা ও ক্ষমতা প্রয়োগ করছি। তাহলে কি আমরা ইহুদী, নাসারা ,কাফির ও মুশরীকদের থেকেও এক ধাপ এগিয়ে যাচ্ছি না ? একজন তাওহীদবাদী মুসলমান কোনো ভাবেই আল্লাহর বিধি-বিধান এবং শাসন ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোনো বিধি-বিধান এবং শাসন ব্যবস্থা বিশ্বাস এবং গ্রহণ করতে পারে না। যারা এরূপ করে, মহান আল্লাহ সূরা মায়িদায় তাদেরকে কাফির, ফাসিক এবং যালিম বলে আখ্যায়িত করেছেন।

হে আল্লাহ আমাদেরকে কাফির, মুশরিক, ফাসিক এবং যালিম হিসেবে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে একজন পরিপূর্ণ খাঁটি তাওহীদবাদী মুসলিম হিসেবে মৃত্যুবরণ করার তাওফীক দান করো। আমীন।

আহবানঃ প্রিয় ভাই ও বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা ইখলাসের যে ব্যাখ্যা এবং শিক্ষা পেশ করা হলো, তাতে যদি আমার অজান্তে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং বাড়াবাড়ি হয়ে যাই তার জন্য মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর আমরা আল্লাহর একাত্ববাদ সম্পর্কে যেসব শিক্ষা লাভ করলাম তা যেন বাস্তব জীবনে আ'মল করতে পারি, সেই তাওফীক কামনা করে দারস শেষ করছি।

দুই

দ্বীনের প্রতি দাওয়াত এবং শিরক ও কুফর থেকে বাধা দানের নির্দেশ

সূরা আল মুদ্দাস্‌সির-৭৪
আয়াত ১ -৭

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ○ قُمْ فَاَنْذِرْ ○ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ○ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ○ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ○ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ○ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ○

সরল অনুবাদ ঃ ইরশাদ হচ্ছে- (১) ওহে কম্বল জড়িয়ে শয়নকারী। (২) উঠুন, অতঃপর (জাতিকে) সাবধান-সতর্ক করুন। (৩) আর আপনার রব এর বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন। (৪) আপনার পোষাক-পরিচ্ছদ পবিত্র করুন (৫) এবং (সকল প্রকার) অপবিত্রতা হতে দূরে থাকুন। (৬) বেশী প্রতিদান পাবার আশায় অন্যকে দান করবেন না। (৭) আর আপনার রব এর উদ্দেশ্যে ধৈর্য ধারণ করুন।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থঃ يَا - হে/ওহে। اَلْمُدَّثِّرُ - চাদরাবৃত/ কম্বল জড়িয়ে শয়নকারী। قُمْ - দাঁড়ান/উঠুন। فَاَنْذِرْ - অতঃপর সতর্ক করুন/সাবধান করুন। وَ - এবং/আর। رَبَّكَ - তোমার/আপনার প্রতিপালকের। فَكَبِّرْ - অতঃপর বড়ত্ব/মহত্ব ঘোষণা করুন। ثِيَابَكَ - আপনার পোষাক। فَطَهِّرْ - অতঃপর পবিত্র করুন/পবিত্র রাখুন। اَلرُّجْزَ - অপবিত্রতা/ মলিনতা।

فَاهْجُرْ - অতএব দূরে থাকুন। وَلَاتَمْنُنْ - এবং দান/অনুগ্রহ করবেন না। تَسْتَكْثِرُ - অধিক/বেশী পাবার আশায়। لِرَبِّكَ - আপনার পালনকর্তার জন্যে /উদ্দেশ্যে। فَاصْبِرْ - অতএব ধৈর্য ধারণ করুন।

সম্বোধনঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে/মাহফিলে উপস্থিত সম্মানিত ভাইয়েরা/বোনেরা! আস্‌সালামুআলাইকুম। আমি আপনাদের সামনে পবিত্র আল কুরআনের একেবারেই প্রথম পর্যায়ে নাযিলকৃত 'সূরা মুদ্দাস্‌সির' এর প্রথম সাতটি আয়াত তিলাওয়াত ও সরল অনুবাদ পেশ করেছি। আল্লাহ পাক যেন আমাকে আপনাদের সামনে তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর দারস সঠিকভাবে পেশ করার তাওফীক দান করেন। 'অমা তাওফীকী ইল্লাবিল্লাহ'।

সূরাটির নামকরণ ঃ এই সূরাটিও অন্যান্য সূরার ন্যায় প্রতীকী বা চিহ্ন হিসেবে সূরার প্রথম আয়াতে উল্লেখিত اَلْمُدَّثِّرُ শব্দটিকেই নামকরণ হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে, কোনো বিষয়বস্তুর শিরোনাম হিসেবে নয়। اَلْمُدَّثِّرُ শব্দটি دَثَارُ (দাসার) থেকে উদ্ভুত। অর্থ শীত বা ঠান্ডা ইত্যাদি থেকে আত্মরক্ষার জন্যে সাধারণ পোষাকের উপর ব্যবহৃত অতিরিক্ত কাপড়। যাকে আমরা এক কথায় লেপ বা কম্বল বলে থাকি।

সূরাটি নাযিলের কারণ ও সময়কাল ঃ সূরাটি দু'টি অংশে অবতীর্ণ হয়। প্রথম অংশ ১ম থেকে ৭ম আয়াত পর্যন্ত নাযিল হয়। আল কুরআনের সর্বপ্রথম সূরা আ'লাকের ১ম পাঁচটি আয়াত নাযিলের পর নবী করীম (সঃ) কে রাসূলের দায়িত্ব দিয়ে কতিপয় নির্দেশ সম্বলিত মুদ্দাস্‌সিরের প্রথম সাতটি আয়াত অবতীর্ণ হয়। আর দ্বিতীয় অংশ নাযিল হয় যখন নবী করীম (সঃ) প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করেন, তখন কাফিরদের মধ্যে এই আশংকা সৃষ্টি হলো যে, যদি তাঁর এ দাওয়াত মানুষের কাছে পৌছে যায় তাহলে তো আমাদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি হবে। তাই তাঁর এই দাওয়াতকে বন্ধ করার জন্য তৎকালীন কাফিরদের মধ্যে কোটিপতি অলীদ ইবনে মুগীরার নেতৃত্বে কুরাইশদের সভা করে (আল্লাহর বাণী কুরআন এবং নবী মুহাম্মদ (সঃ) কে সত্য জানার পরেও)

সিদ্ধান্ত নিয়ে তারা কুরআনকে যাদু ও মুহাম্মদ (সঃ) কে যাদুকর বলে প্রচার করে বিরোধিতা শুরু করে। তাদের এই বিরোধিতা এবং ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করে সূরার দ্বিতীয় অংশ নাযিল হয়।

সূরার ১ম সাতটি আয়াত মক্কায় নবুওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে নাযিল হয়। সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, তিরমিযী ও মুসনাদ-ই আহমদ প্রভৃতি কিতাবে হযরত জাবির ইবনে অব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত বেশ কয়েকটি হাদীসের উল্লেখ রয়েছে। তাতে এতদূর বলা হয়েছে যে, ইহা রাসূলে করীম (সঃ) এর প্রতি অবতীর্ণ হওয়া কুরআন মজিদের প্রাথমিক আয়াত। কিন্তু গোটা মুসলিম উম্মাহর নিকট একথা সর্বসম্মত ও সর্বসমর্থিত মত যে, নবী করীম (সঃ) এর প্রতি সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হওয়া আয়াত হলো সূরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ হতে مَا لَمْ يَعْلَمْ পর্যন্ত। তবে সহীহ বর্ণনা সূত্রে পাওয়া যায় যে, এই প্রথম ওহীর পর কিছুকাল ওহী নাযিল হওয়া বন্ধ থাকে। বন্ধ থাকার পর পুনরায় ওহী নাযিল হওয়া আরম্ভ হলে সূরা الْمُدَّثِّرُ এর প্রথম এই সাতটি আয়াত অবতীর্ণ হয়।

ইমাম জহুরী (রহঃ) এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে বর্ণনা করেন যে, প্রথম ওহী নাযিলের পর একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত নবী করীম (সঃ) এর উপর ওহী নাযিল বন্ধ থাকে। ওহী বন্ধ থাকার ফলে তাঁর মনে তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি হয় এবং তিনি দুঃখ-বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েন, ফলে তিনি কখনও কখনও পাহাড়ের চূড়ায় উঠে নিজেকে নিচে ফেলে দিতেও উদ্ধত হয়ে যেতেন। কিন্তু তিনি যখনই কোনো পাহাড়ের চূড়ায় উঠতেন, তখনই হযরত জিবরাঈল (আঃ) উপস্থিত হয়ে তাঁকে বলতেন, 'আপনি তো আল্লাহর নবী।' একথা শুনে তাঁর অস্থির মনে অনেকটা শান্তনা ফিরে পেতো এবং মনের অস্থিরতা ও উদ্বেগে জর্জরিত অবস্থার লাঘব হতো।
(ইবনে জরীর)

'ফাতরাতুল ওহী' বা 'ওহী বন্ধ থাকা' এই সময়ের কথা উল্লেখ করে স্বয়ং নবী করীম (সঃ) বলেছেন ঃ একবার আমি পথ চলছিলাম। এমন সময় আমি উপর থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম। উপরের দিকে তাকালেই দেখতে পেলাম, সেই ফিরিশতা যিনি হেরা গুহায় হাজির

হয়েছিলেন। তিনি আসমান ও যমীনের মাঝখানে একটি আসনে বসে আছেন। এ দেখে আমি ভয়ানক ভীত ও সংকিত হয়ে বাড়ীতে ফিরে গিয়ে বললামঃ زَمِّلُوْنِىْ زَمِّلُوْنِىْ 'আমাকে কম্বল জড়িয়ে দাও','আমাকে কম্বল দিয়ে জড়িয়ে ধরো'। বাড়ীর লোকেরা এটা শুনে আমাকে কম্বল বা লেপ দিয়ে জড়িয়ে দিলো। এই সময় আল্লাহ তা'লা ওহী নাযিল করলেন- يٰاَيُّهَاالْمُدَّثِّرُ - অতঃপর অব্যাহত ও ধারাবাহিকভাবে ওহী নাযিল হতে থাকলো। (সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, আহমদ, ইবনে জরীর)

সূরার অবশিষ্ট অংশ অষ্টম আয়াত হতে শেষ পর্যন্ত নাযিল হয় তখন, যখন প্রকাশ্য ভাবে ইসলাম প্রচার শুরু হয়ে যাবার পর মক্কায় প্রথম বারের মতো হজ্জ্ব পালন করার সুযোগ আসে। (সিরাতে ইবনে হিসামে এর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আছে)

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য ঃ সর্বপ্রথম ওহী সূরা আ'লাকের ১ম পাঁচটি আয়াতে জ্ঞান অর্জন ও তার গুরুত্ব এবং মানুষের সৃষ্টিত্বত্ত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু মুহাম্মদ (সঃ) কে কোন্ মহান কাজের দায়িত্বশীল বানানো হচ্ছে এবং তাঁর দায়িত্ব বা কি তার কিছুই এখানে বলা হয়নি। কেবলমাত্র একটা প্রাথমিক পরিচিতি তুলে ধরে কিছু দিনের জন্য ওহীর বিরতি দেয়া হয়, যেন এই প্রথম ওহী নাযিলের অভিজ্ঞতায় তাঁর মন-মগয ও প্রকৃতির উপর যে কঠিন চাপ পড়েছে- এই সময়ের মধ্যে তা দূর হয়ে যায় এবং ভবিষ্যতে ওহী গ্রহণের ও নবুওয়াতের কঠিন দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি মানুষিক ও শারিরীকভাবে প্রস্তুত হতে পারেন। এই মানষিক ও শারিরীক প্রস্তুতিকালটি অতিবাহিত হওয়ার পর দ্বিতীয়বার যখন ওহী নাযিলের ধারা শুরু হলো, তখন এই সূরায় প্রথম সাতটি আয়াত নাযিল করে প্রথমবারের মতো তাঁকে নির্দেশ দেয়া হলোঃ হে মুহাম্মদ (সঃ)! উঠুন, এখন কম্বল দিয়ে জড়িয়ে শুয়ে থাকার কোনো সুযোগ নেই। আপনি আপনার নবুওয়াতের দাযিত্ব পালন করুন, মানুষকে সতর্ক করুন, নিজের মন-মগজ, পোষাক-আষাক ও দেহকে পবিত্র করুন, পংকিলময় গোটা সমাজ ব্যবস্থাকে পংকিলতা থেকে মুক্ত করুন। মানুষকে সাহায্য-সহযোগিতা করুন। আর এই সাহায্য-সহযোগিতার জন্য বিনিময়

আশা করবেন না। সবকিছু আল্লাহর ওয়াস্তে করুন এবং আপনি আল্লাহর জন্যই ধৈর্যধারণ করুন।

সূরার দ্বিতীয় অংশে নবীজীর প্রকাশ্যে দাওয়াতে কাফিররা যে ভীত ও চিন্তিত হয়ে পড়েছিলো, বিশেষ করে হজ্জের মওসুমে নবীজী যদি হজ্জের কাফিলার সাথে স্বাক্ষাৎ করেন এবং হাজীদের সমাবেশে কুরআনের এই অতুলনীয় ও মর্মস্পর্শী কালাম পাঠ করে শুনাতে থাকেন, তাহলেতো গোটা আরবের প্রত্যান্তঞ্চলে তাঁর দাওয়াত পৌঁছে যাবে। আর তার ফলে কতো মানুষ যে প্রভাবিত হয়ে পড়বে তার ইয়ত্তা থাকবে না। এই কারণে কুরাইশ সরদাররা একটি সম্মেলনের আয়োজন করে সিদ্ধান্ত নিলো যে, হাজীদের মক্কায় আগমনের সঙ্গে সঙ্গে মুহাম্মদ (সঃ) এর বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার-প্রপাগান্ডা শুরু করে দিতে হবে। এ কথায় সবাই একমত পোষণ করলে তৎকালীন কোটিপতি কুরাইশ সর্দার অলীদ ইবনে মুগীরা বললো, মুহাম্মদ (সঃ) সম্পর্কে বিভিন্ন জন বিভিন্ন কথা বললে তো লোকেরা আমাদের কারো প্রতি আস্থা রাখতে পারবে না, কাজেই তাঁর সম্পর্কে আমাদেরকে একটি বক্তব্যই ঠিক করে নিতে হবে-যাতে করে সবাই একই কথা বলে। তখন কেউ কেউ বললো, মুহাম্মদকে গণক, কেউ কেউ বললো, জ্বিনগ্রস্থ, কেউ কেউ বললো, পাগল, কেউ কেউ বললো, কবি, আবার কেউ কেউ বললো, যাদুকর বলা হোক। কুরাইশ সরদার অলীদ বললো, এসবের মধ্যে হতে যা কিছুই তোমরা তাঁর সম্পর্কে বলো না কেন, লোকেরা এসবকে একটি অবাঞ্ছিত অভিযোগ বলে উড়িয়ে দেবে। অলীদ আল্লাহর নামে শপথ করে বললো, কুরআনের এই বাণী অত্যন্ত মাধুর্যপূর্ণ। এর শিকড় অতী গভীরে। উহার শাখা-প্রশাখাও প্রচুর ফলদায়ক। অলীদের এ কথায় আবু জেহেল সংশয় প্রকাশ করে বললো, অলীদ, তুমি যদি তোমার নিজের বক্তব্য স্পষ্ট ভাষায় না বলো, তাহলে জাতির লোকেরা তোমার প্রতি আস্থাশীল হতে পারবে না। তখন সে চিন্তা-ভাবনা করে বললো, তোমরা সবাই আরবদের নিকট বলবে, মুহাম্মদ একজন যাদুকর। তিনি এমন বাণী পেশ করেন, যা লোকদেরকে তার বাপ,ভাই,স্ত্রী,সন্তান ও গোটা পরিবার হতে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। অলীদের এ কথাটি উপস্থিত সবাই গ্রহণ করলো। পরবর্তীতে হজ্জের মওসুমে পরিকল্পনা অনুযায়ী কুরাইশ বংশের প্রতিনিধিরা হাজীদের সামনে মুহাম্মদ (সঃ) সম্পর্কে তাদের পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একই কথা ছড়াতে লাগলো

এবং মুহাম্মদ সম্পর্কে তাদের সতর্ক করে দিলো। কিন্তু এতে হিতে বিপরীত হলো যে, তাদের এই প্রচারণায় মুহাম্মদ (সঃ) এই সংবাদ গোটা আরব জাহানে ছড়িয়ে বিস্তার করে দিলো। (সীরাতে ইবনে হিসাম-১ম খন্ড) আলোচ্য সূরার দ্বিতীয় অংশে অর্থাৎ ৮ নং আয়াত হতে শেষ পর্যন্ত এই ঘটনারই পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৮ থেকে ১০ নম্বর পর্যন্ত আয়াতে সত্যদ্বীন অমান্যকারীদের সাবধান করা হয়েছে এই বলে যে, আজ তারা যা কিছু করছে এর মারাত্মক পরিণতি কিয়ামতের দিন তারা নিজেরাই দেখে নেবে।

১১ থেকে ২৬ নম্বর পর্যন্ত আয়াতসমূহে অলীদ ইবনে মুগীরার নাম না নিয়েই বলা হয়েছে যে, লোকটিকে আল্লাহ তা'লা অফুরন্ত নিয়া'মাত দিয়েছিলেন, কিন্তু সে তার বিনিময়ে নির্লজ্জভাবে সত্য দ্বীনের বিরোধীতায় মেতে উঠেছে। সে একদিকে মুহাম্মদ (সঃ) ও আল কুরআনের সত্যতার প্রতি বিশ্বাসী ছিলো। কিন্তু অন্যদিকে সে নিজ জাতির মধ্যে প্রাধান্য এবং নেতৃত্বকে বিপন্ন করে দিতে প্রস্তুত ছিলো না। ফলে সে ঈমানতো আনলো-ই না, বরং আল কুরআনকে যাদু এবং মুহাম্মদ (সঃ) কে যাদুকর বলে আখ্যায়িত করে মানুষকে তাঁর থেকে দূরে রাখার জন্য প্রাণ-পণ চেষ্টা চালাতে থাকলো। লোকটির এই জঘণ্য মানসিকতার বিভৎস রূপকে এখানে তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহর বাণী ও তাঁর নবীর সাথে এসব হীন কার্যকলাপের পরও সে নির্লজ্জভাবে দাবী করতো যে, তাকে আরো নিয়া'মাত দেয়া হোক। অথচ তার এই কার্যকলাপের জন্য কোনো পুরস্কার তো দূরে থাক, দোযখের কঠিন শাস্তি তার জন্যে অপেক্ষা করছে।

২৭ থেকে ৪৮ নম্বর আয়াতসমূহে দোযখের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে, কোন্ সব চরিত্র ও নৈতিকতার অধিকারী লোকেরা এই দোযখের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে, সেসব বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৪৯ থেকে ৫৩ নম্বর আয়াতসমূহে কাফিরদের রোগের আসল কারণ ও মূলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর তা হলো, পরকাল সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ নির্ভীক-বেপরোয়া। দুনিয়ার এই জীবনকেই তারা সবকিছু বলে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে। এটাকেই তারা সর্বশেষ মনে করে। এই কারণেই তারা আল কুরআন হতে অনেক দূরে সরে যায়।

সূরার সর্বশেষ অংশে অর্থাৎ ৫৪ থেকে ৫৬ নম্বর আয়াতসমূহে স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তো কারো ঈমানের কাঙ্গল নন। কেউ ঈমান আনুক আর না আনুক তাতে তাঁর কিছুই যায় আসে না। কুরআন কোনো ব্যক্তির নয় বরং সকলের জন্যই নসীহতের কিতাব। তা সকলের সামনে পেশ করে দেয়া হয়েছে। এখন যার ইচ্ছা সে ঈমান আনবে। আর যার ইচ্ছা হবে না সে ঈমান আনবে না। তবে নাফরমানী করার ব্যাপারে আল্লাহকে অবশ্যই ভয় করা উচিত। যে ব্যক্তিই আল্লাহকে ভয় করে চলবে, আল্লাহ্ তাকে অবশ্যই ক্ষমা করে দেবেন-পূর্বে সে যতোবার-ই অপরাধ করে থাকুক না কেন।

তিলাওয়াতকৃত আয়াতসমূহের বিষয়বস্তু ঃ দারসের জন্য তিলাওয়াতকৃত এক থেকে সাত নম্বর আয়াতসমূহের বিষয়বস্তু হলো, প্রথম ওহী নাযিলের পর দীর্ঘ সময় বিরতির কারণে নবী করীম (সঃ) এর মনে যে দিধা ও হতাশা সৃষ্টি হয়েছিলো, পরক্ষণে পুনরায় পথ চলতে গিয়ে বিশালকায় জীবরাঈল (আঃ) কে দেখে যে ভীতি সৃষ্টি হয়ে জ্বরে বা ঠান্ডায় মানুষ যে ভাবে কাঁপে সেভাবে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ীতে গিয়ে কম্বল বা লেপ গায়ে জড়িয়ে শুয়ে পড়েছিলেন। সে অবস্থায় রিসালাতের দ্বায়িত্ব পালনের জন্য তাঁকে ডেকে বলা হচ্ছে, এভাবে কম্বল গায়ে জড়িয়ে শুয়ে থাকলে চলবে না। হে নবী! উঠুন, আপনি আপনার রিসালাতের দায়িত্ব পালন করুন, এ বলে তাঁকে ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে সাতটি কাজের নির্দেশ দেয়া হয়, যা পরবর্তীতে ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হবে ইনশাআল্লাহ ।

ব্যাখ্যা ঃ প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা মুদ্দাস্‌সির এর কতিপয় অথচ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরা হলো, যা দারস বুঝার জন্য বেশ সহায়ক হবে। এখন আপনাদের সামনে তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা পেশ করছি। তার পূর্বে জেনে নেয়া প্রয়োজন কোন্ প্রেক্ষাপটে বা কারণে আয়াতগুলো নাযিল হয়।

শানে নুযুল বা নাযিলের কারণ ঃ তাফসীরে ইবনে কাসীরে সূরা মুদ্দাস্‌সির এর উল্লেখিত আয়াতসমূহ নাযিলের প্রেক্ষাপট বা কারণ হিসেবে দু'টি বর্ণনা পাওয়া যায়। সহীহ মুসলিমে উল্লেখ রয়েছে যে, "ফাত্‌রাতুল ওহী" অর্থাৎ অহী বন্ধ হয়ে যাবার ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে নবী করীম (সঃ) বলেন, একদিন আমি পথে চলছিলাম, হঠাৎ আকাশের দিক হতে

আমার কানে একটা শব্দ পৌঁছলো! চোখ তুলে দেখলাম যে, হেরা পর্বতের গুহায় যে ফিরিশতা আমার নিকট এসেছিলেন তিনি আকাশ ও যমীনের মাঝখানে একটি কুরসির উপর বসে রয়েছেন। ভয়ে আমি মাটির দিকে ঝুঁকে পড়ি এবং বাড়ী এসেই বলি যে ' زَمِّلُوْنِىْ ' ' زَمِّلُوْنِىْ ' 'আমাকে বস্ত্র দিয়ে ঢেকে দাও' 'আমাকে বস্ত্র দিয়ে ঢেকে দাও'। আমার কথামতো বাড়ীর লোকেরা আমাকে বস্ত্র দিয়ে ঢেকে দিলো। তখন يَاَيُّهَاالْمُدَّثِّرْقُمْ فَاَنْذِرْ হতে فَاهْجُرْ পর্যন্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়"। তারপর ক্রমান্বয়ে ওহী নাযিল হতে থাকে। (ইবনে কাসীর)

অন্য এক বর্ণনায় হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ওলীদ ইবনে মুগীরা কুরায়িশদের যিয়াফত দেয়। খাওয়া-দাওয়ার পর তারা পরস্পর বলাবলি করে; আচ্ছা, তোমরা কি এই লোকটি (মুহাম্মদ) সম্পর্কে বলতে পারো ? কেউ কেউ বললো যে, তিনি যাদুকর। অন্য কেউ বললো যে, না, তিনি যাদুকর নন। কেউ কেউ তাঁকে গণক বললো। আবার অন্য কেউ বললো যে, না তিনি গণকও নন। কেউ কেউ তাঁকে কবি বলে মন্তব্য করলো, কিন্তু অন্য কেউ বললো যে, না, তিনি কবিও নন। তাদের কেউ কেউ এই মন্তব্য করলো, তিনি এমন যাদুকর- যে যাদু তিনি লোক পরম্পরায় লাভ করেছেন। পরিশেষে তারা সবাই একথাই একমত হলো যে, তাঁকে যাদুকরই বলা হবে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ খবর পেয়ে খুবই দুঃখিত ও মর্মাহত হলেন এবং তিনি কাপড় দিয়ে মাথাসহ গোটা শরীরকে বস্ত্রাবৃত করে শুয়ে পড়লেন, ঐ সময় يَاَيُّهَاالْمُدَّثِّرْ হতে فَاهْجُرْ পর্যন্ত নাযিল হয়।

(ইবনে কাসীর। ইমাম তিবরাণীও এরূপ বর্ণনা করেছেন)

প্রথম ওহী --اِقْرَا দ্বারা মুহাম্মদ (সঃ) কে নবী হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। আর এই ওহী- يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرْ দ্বারা তাঁকে রাসূল বানিয়ে দেয়া হয়েছে।

يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرْ-এই সূরার দারসের পটভূমিকায় এবং ব্যাখ্যার শুরুতে এই আয়াত কয়টির পটভূমির যে বিবরণ আমরা উল্লেখ করেছি, সেই সম্পর্কে

চিন্তা গবেষণা করলে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যায় যে, এখানে মুহাম্মদ (সঃ) কে يَاَيُّهَاالرَّسُلُ বা يَاَيُّهَاالنَّبِىُّ বলে সম্বোধন করা হয়নি। বরং তার পরিবর্তে يَاَيُّهَاالْمُدَّثِّرُ বলে সম্বোধন করা হয়েছে। যেহেতু নবী করীম (সঃ) পথ চলার সময় জিবরাঈল (আঃ) কে আসমান ও যমীনের মাঝখানে আসনে বসে থাকতে দেখে ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত্র হয়ে পড়েছিলেন অথবা অন্য বর্ণনা অনুযায়ী কুরাইশরা তাঁর সম্পর্কে সম্মিলিতভাবে 'যাদুকর' মন্তব্য করায় যারপর নাই দুঃখ-বেদনায় ভারাক্রান্ত মন নিয়ে কম্বল বা লেপ দিয়ে মুখসহ গোটা দেহ আবৃত্ত করে শুয়ে পড়েছিলেন। এই কারণেই মহান আল্লাহ তাঁকে অন্য নামে সম্বোধন না করে يَاَيُّهَاالْمُدَّثِّرُ বলে সম্বোধন করেছেন, এটা একটা সুক্ষ্ম সম্বোধন পদ্ধতি। এটা হতে বুঝতে পারা যায় যে, আল্লাহ যেন বলছেন ঃ হে আমার প্রিয় বান্দাহ! আপনি কম্বল জড়ে শুয়ে পড়লেন কেমন করে ? আপনার উপর তো এক মহা কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। তা পালনের জন্য মন ভাঙ্গা হলেও চলবে না কিম্বা ভয়ে ভীত হলেও চলবে না। বরং তা পালনের জন্য আপনাকে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হতে হবে এবং শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে যেতে হবে।

সূরার প্রথমেই يَاَيُّهَاالْمُدَّثِّرُ বলে সম্বোধন করে মুহাম্মদ (সঃ) কে তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব হিসেবে প্রাথমিকভাবে কতিপয় ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক নির্দেশ দিয়ে বলা হচ্ছে ঃ

প্রথম নির্দেশ ঃ قُمْ فَاَنْذِرْ -উঠুন, আর (জাতিকে) সতর্ক করুন।

قُمْ এর আক্ষরিক অর্থ 'দাঁড়ান'ও হতে পারে। অর্থাৎ আপনি কম্বল দিয়ে মুখ ঢেকে শুয়ে না থেকে দাঁড়িয়ে যান। এখানে কাজের জন্যে প্রস্তুত হওয়ার অর্থও নেয়া যেতে পারে। উদ্দেশ্য হলো, এখন আপনি হিম্মত করে জনগণকে পরিশুদ্ধি বা সংশোধনের কাজে আত্মনিয়োগ করুন।

فَاَنْذِرْ শব্দটি اِنْذَارٌ শব্দ থেকে উদ্ভুত। এর অর্থ 'সতর্ক করা'। আর এই সতর্ক হলো স্নেহ ও ভালোবাসার সতর্ক। যেমন, পিতা তার সন্তানকে সাপ-বিচ্ছু থেকে সতর্ক করে, পথ চলতে গিয়ে গাড়ী-ঘোড়া ইত্যাদি থেকে সতর্ক করে।

রাসূলগণকে نَذِيْرٌ (সতর্ককারী) ও بَشِيْرٌ (সুসংবাদ দানকারী) উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। মুহাম্মদ (সঃ) এর ন্যায়ও হযরত নূহ (আঃ) কে নবুওয়াতের দায়িত্ব দেয়া কালেও ঠিক এই ধরনেরই একটি নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছিলো ঃ اَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّأْتِيَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

"(হে নবী!) কঠিন পীড়াদায়ক আযাব আসার পূর্বেই তুমি তোমার জাতির লোকদেরকে ভয় দেখাও, সতর্ক-সাবধান করো।" (সূরা নূহ-১)

এই দৃষ্টিতে আলোচ্য আয়াতটির তাৎপর্য হলো, হে কম্বল জড়িয়ে শুয়ে থাকা ব্যক্তি! উঠুন, আর আপনার চারপাশের অবহেলায়-উপেক্ষায় পড়ে থাকা লোকদেরকে সতর্ক করুন, সাবধান করুন। তারা বর্তমানে যে অবস্থায় পড়ে আছে, তারা যদি এ অবস্থানের পরিবর্তন না ঘটায় তাহলে তাদের জন্য ভয়াবহ পরিণতি অপেক্ষা করছে। হে নবী (সঃ)! তাদেরকে সাবধান করে দিন যে, তারা এমন কোনো মগের মুল্লুকে বাস করছে না যে, এখানে তারা যা ইচ্ছা তাই করতে পারে! তারা যেনো এমন কিছু মনে না করে যে, তাদের দুনিয়ার এই কার্যকলাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হবে না এবং তাদেরকে তার প্রতিফল ভোগ করতে হবে না!

দ্বিতীয় নির্দেশ ঃ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ -আর আপনার রবের শ্রেষ্ঠত্ব-বড়ত্বের ঘোষণা করুন।

এখানে رَبٌّ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, এটাই এই নির্দেশের মূল কারণ। যিনি বিশ্ব জাহানের পালনকর্তা, একমাত্র তিনিই সকল প্রকার বড়ত্ব ও মহত্ব বর্ণনার যোগ্য বা অধিকারী। تَكْبِيْر শব্দটি আল্লাহর জন্যই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন বলা হয়ে থাকে- اَللّٰهُ اَكْبَرُ ।

একজন নবীর প্রাথমিক কাজ-ই হলো, আল্লাহর তাকবীর বা বড়ত্ব ঘোষণা করা। দুনিয়ায় আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধাণ্য প্রতিষ্ঠিত করাই হলো নবী-রাসূলদের কাজ। সুতরাং হে নবী! আপনার প্রথম পর্যায়ের কাজ-ই হলো, অজ্ঞ-মূর্খ লোকেরা এখানে যার যার শ্রেষ্ঠত্ব-প্রাধাণ্য মেনে চলছে, তাদের সকলের-ই মূলোৎপাটন করা এবং দরাজ কণ্ঠে গোটা দুনিয়ায় ঘোষণা

করে দেয়া যে, এই বিশ্বলোকে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো কোনো শ্রেষ্ঠত্ব বা প্রাধাণ্য নেই। আর এই কারণেই ইসলামে اَللهُ اَكْبَرْ বাক্য ও ধ্বনিটি খুব বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এই জন্যই সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সাথে সাথেই اَللهُ اَكْبَرْ এর ধ্বনি কানে পৌছিয়ে দেয়া হয়। দিনে পাঁচবার আজানের শুরুতেই اَللهُ اَكْبَرْ ধ্বনি উচ্চারিত হয়। সালাতের শুরুতেও اَللهُ اَكْبَرْ ধ্বনি দিয়েই সালাত আরম্ভ করা হয়। জবেহ্ করার সময় জন্তুকে হালাল করার জন্য بِسْمِ اللهِ اَللهُ اَكْبَرْ বলেই জবেহ করতে হয়। সাহাবাগণও কোনো উচ্চ ধ্বনি দিলে اَللهُ اَكْبَرْ বলেই ধ্বনি দিতেন। এমনকি আবহমান কাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মুসলিমরা কোনো শ্লোগান দিলে اَللهُ اَكْبَرْ বলেই শ্লোগান দেয়। এটা মুসলমানদের সর্বাধিক বৈশিষ্ট্য ও সাতন্ত্র বিধানকারী নিদর্শন।

আল্লাহর নবীকে তাঁর রবের বড়ত্ব ও মহাত্ম ঘোষণার নির্দেশের পেছনে আরও একটি তাত্মিক দিক হলো, আলোচ্য সূরার প্রাথমিক আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার কারণ থেকেই জানা যায় যে, তৎকালীন মক্কা ছিলো শিরক এর লিলা কেন্দ্র। সেখানকার লোকজন সাধারণ আরবদের ন্যায় কেবল মুশরীক-ই ছিলো না, বরং এই এলাকার লোকেরা ছিলো এর চেয়েও অনেক বেশী অগ্রসর। সবচেয়ে বড় কথা হলো এই যে, মক্কা শরীফ ছিলো গোটা আরবের মুশরীকদের কেন্দ্রীয় তীর্থভূমি। আর কুরাইশ বংশের লোকেরাই ছিলো এর-ই সেবায়েত বা খাদেম। এরূপ যায়গায় কোনো একজন ব্যক্তির একাকী এই প্রতিষ্ঠিত শিরকের বিরুদ্ধে তাওহীদের পতাকা উত্তোলন করা ছিলো বড়ই কঠিন ও প্রাণ হরণকারী কাজ। এই কারণেই সূরার শুরুতেই 'উঠুন' এবং 'সাবধান করুন' বলার পর পরই বলা হয়েছে, 'আপনার রবের প্রাধাণ্য ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে দিন'। এরূপ বলা হতেই বুঝতে পারা যায় যে, এসবের একবিন্দু পরওয়া না করতে বলা হয়েছে। নির্দেশ দেয়া হয়েছে, হে নবী! ঘোষণা করে দিন যে, আমার আল্লাহ সেইসব হতেও বড় ও শ্রেষ্ঠ, যারা আমার এই দ্বীনি দাওয়াত ও আন্দোলনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। আল্লাহর কাজ আরম্ভ করার

পূর্বে কোনো ব্যক্তির সাহস-হিম্মত বৃদ্ধি করার জন্য এছাড়া আর বড় কথা কোনো কিছুই হতে পারে না।

বস্তুতপক্ষে যার মন-মগজে আল্লাহর বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব দৃঢ় মজবুত ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে, কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিই একাকী গোটা দুনিয়ার বিরুদ্ধে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে ও সকল বিরোধী শক্তির সাথে লড়াই শুরু করতে একবিন্দু দ্বিধাসংকোচ বা ভয়-শঙ্কা অনুভব করতে পারে না।

তৃতীয় নির্দেশ ঃ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ **- আপনার পোষাক-পরিচ্ছদ পবিত্র করুন।**

ثِيَابٌ শব্দটি ثَوْبٌ এর বহুবচন। একে لِبَاسٌ ও বলা হয়। এর আসল অর্থ কাপড়। এর অনেকগুলো রূপক অর্থ রয়েছে। যেমন, কর্ম বা কাজকে ثَوْبٌ বা لِبَاسٌ বলা হয়। আবার অন্তর, মন, চরিত্র ও ধর্মকেও ثَوْبٌ বা لِبَاسٌ বলা হয়। আবার মানব দেহকেও لِبَاسٌ বলা হয়। যার প্রমাণ আল কুরআনে ও আরবী বাক-পদ্ধতিতে প্রচুর পাওয়া যায়।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরবিদগণ উপরোক্ত সকল অর্থই গ্রহণ করেছেন। এমতাবস্থায় আয়াতের নির্দেশের অর্থ হবে এই যে, হে নবী! আপনি স্বীয় পোষাক ও দেহকে বাহ্যিক অপবিত্রতা থেকে পবিত্র রাখুন এবং অন্তর ও মনকে ভ্রান্ত বিশ্বাস ও চিন্তাধারা থেকে এবং অসৎচরিত্রতা থেকে মুক্ত রাখুন। (মাযহারী)

মাওলানা মওদুদী (রহঃ) তার তাফসীরে ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ এর তাৎপর্য ব্যাপক ও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। যেমন-

প্রথম তাৎপর্য ঃ হে নবী! আপনি আপনার পোষাক ও দেহকে মলিনতা ও অপবিত্রতা হতে পবিত্র রাখুন। কেননা, দেহ ও পোষাকের পবিত্রতা ও মন মানসিকতা এবং আত্মার পবিত্রতা পরস্পর ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। রাসূলে করীম (সঃ) যে সমাজ বা জনপদে ইসলামের দাওয়াতী কাজ করেছেন, সেই সমাজ বা জনপদ কেবল আকীদা-বিশ্বাস ও নীতি-নৈতিকতার দিক দিয়েই চরম বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছিলো না। বরং তাদের মধ্যে পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার সাধারণ ও প্রাথমিক জ্ঞান বা

ধারণাটুকুও ছিলো না। এমতাবস্থায় রাসূলে করীম (সঃ) এর কাজ ছিলো এই লোকদেরকে সবদিক দিয়ে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার শিক্ষা দেয়া। এ কারণেই তাঁকে এখানে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, হে নবী! আপনি আপনার বাহ্যিক পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার একটা উচ্চতর মান রক্ষা করে চলুন। বস্তুত এই নির্দেশের কারণেই নবী করীম (সঃ) মানব জাতিকে দেহ ও পোষাকের পবিত্র ও পরিচ্ছন্নতার খুটি-নাটি বিস্তারিত শিক্ষা দিয়েছেন। যা হাদীসের কিতাবসমূহের প্রথমেই "কিতাবুত তাহ্‌রাত" বা "পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতার অধ্যায়" দিয়ে শুরু করা হয়েছে।

দ্বিতীয় তাৎপর্য ঃ হে নবী! আপনি আপনার পোষাক পরিচ্ছদ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখুন। অতীত কাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত দুনিয়াত্যাগী বগ ধার্মিকদের অপরিস্কার-অপরিচ্ছন্ন থাকাকেই ধর্মপালনের একটি মান নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। আর তা হলো, যতো বেশী অপরিষ্কার ও গন্ধযুক্ত পোষাক জড়িয়ে থাকা যায়, ধর্মীয় পবিত্রতা ততো বেশী অর্জন করা যায় এবং যে লোক যতো বেশী অপরিচ্ছন্ন সে ততো বেশী ধার্মীক ও আল্লাহর প্রিয় ওলী বা দরবেশ। আর যদি কেউ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোষাক পরে, তাহলে তাকে দুনিয়াদার বলে অভিহিত ও দোষারোপ করা হয়।

অথচ প্রকৃত ব্যাপার হলো, মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি হলো ময়লা-অপরিচ্ছন্নতাকে ঘৃণা করা। আর ভদ্রতা ও পরিচ্ছন্নতার সাধারণ অনুভূতিই যার মধ্যে আছে সে ভদ্র ও পরিচ্ছন্ন মানুষের সাথেই ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি করে। এ কারণেই আল্লাহর দ্বীনের দিকে আহবানকারী দায়ী'দের প্রতি যরুরী করে দেয়া হয়েছে যে, তাদের বাহ্যিক অবস্থা যেন এতোটুকু সুষ্ঠ, সুন্দর ও নির্মল পরিচ্ছন্ন হয় যার ফলে লোকেরা তাদেরকে সম্মান ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে। মানুষের মনে ঘৃণা সৃষ্টি করতে পারে এমন কোনো মলিনতা যেন তাদের ব্যক্তিত্বে এক বিন্দু পরিমাণ স্থান না পায়।

তৃতীয় তাৎপর্য ঃ হে নবী! আপনি আপনার পোষাককে নৈতিক দোষত্রুটি হতে মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন রাখুন। আপনার পোষাক তো অবশ্যই স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন হবে। কিন্তু তাতে যেন অহংকার, গৌরব, দেখানোপনা, রিয়াকারিতা, জাঁক-জমক ও শান-শওকতের চিহ্ন পর্যন্ত না থাকে। পোষাক-ই যেন আপনার পরিচয় না তুলে ধরে। বরং নীতি-নৈতিকতায় যেন আপনার পরিচয় হয়। কেননা, যেসব জিনিস ব্যক্তিকে জনগণের

সাথে পরিচয় ঘটিয়ে দেয় তার মধ্যে পোষাক-ই হলো প্রথম জিনিস। সে কি ধরনের পোষাক পরেছে, তা দেখেই অনুমান করা যায় যে, সে কি রকমের লোক। লোকটি আসলে কি রকম- তা তার পোষাকেই জনগণকে প্রথমেই জানিয়ে দেয়। যেমন, রাজা-বাদশাহ, সমাজ প্রধান, রাষ্ট্র প্রধান, নবাব-সুবেদারদের পোষাক। অহংকারী দাম্ভিক ও বড় লোকদের পোষাক। হীন ও নীচ চরিত্রের লোকদের পোষাক। ধর্মব্যবসায়ীদের পোষাক। গণক, ঠাকুর ও ভবোঘুরাদের পোষাক আপন আপন ব্যক্তিত্বের ও স্বভাব-প্রকৃতির পরিচিতি দান করে। এদের মধ্যে আল্লাহর দিকে আহবানকারী দায়ী'দের মেযাজ-প্রকৃতি স্বভাব এসব লোক থেকে স্বভাবতই ভিন্ন হয়ে থাকে। এসব কারণেই তাদের পোষাক-আশাক এইসব লোক থেকে ভিন্ন ধরনের হবে। তাদের পোষাক এমনই হবে, যা দেখেই মানুষ অনুভব করবে যে, এরা খুবই ভদ্র লোক। তাদের মনমানসিকতায় কোনো প্রকার খারাবী স্থান পায়নি।

চতুর্থ তাৎপর্য ঃ হে নবী! আপনি আপনার চরিত্র পবিত্র ও নিষ্কলুষ রাখুন। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ), ইব্রাহীম নখয়ী, শা'বী, আতা, মুজাহীদ, কাতাদাহ, সায়ী'দ ইবনে জুবাইর, হাসান বসরী ও অন্যান্য বড় বড় মুফাস্সীর এই আয়াতের তাৎপর্যে বলেছেন, আপনার চরিত্র পবিত্র ও নিস্কলুষ রাখুন ও সকল প্রকার দোষ-ক্রটি হতে নিজেকে মুক্ত রাখুন- দূরে রাখুন। যেমন, আরবী প্রবাদে বলা হয় - فُلَانٌ طَاهِرُ الثِّيَابِ "অমুক ব্যক্তির কাপড় পরিচ্ছন্ন" বা فُلَانٌ طَاهِرُ الذَّيْلُ "অমুক ব্যক্তি পবিত্র চরিত্রের অধিকারী"। এধরনের কথা থেকে নৈতিক পরিচ্ছন্নতা বুঝানো হয়ে থাকে।

এর বিপরীত অর্থজ্ঞাপক প্রবাদ হলো فُلَانٌ دَنِسُ الثِّيَابِ "অমুক ব্যক্তির কাপড় অপরিচ্ছন্ন"। আর এর তাৎপর্য হয়, লোকটি বড়ই খরাপ কাজ করে বা নিকৃষ্ট চরিত্রের লোক। তার কথা বিশ্বাস করা যায় না।

(তাফহীমুল কুরআন)

পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতাকারীদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন-

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

"নিশ্চয় আল্লাহ্ তাওবাকারীদের এবং পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন।"

হাদীসে পবিত্রতাকে ঈমানের অর্ধেক উল্লেখ করে বলা হয়েছে-

اَلطُّهُوْرُ نِصْفُ الْاِيْمَانِ - "পবিত্রতা হলো ঈমানের অর্ধাংশ"।

তাই প্রত্যেক মুসলমানকে সর্বাবস্থায় শরীর ও পোষাককে বাহ্যিক নাপাকি থেকে এবং মন ও অন্তরকে আভ্যন্তরীন অশুচি থেকে পবিত্র রাখার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

চতুর্থ নির্দেশঃ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ আর (সকল প্রকার) অপবিত্রতা-মালিনতা হতে দূরে থাকুন।"

رُجْزَ শব্দটির অর্থ ব্যাপক অর্থবোধক। মাওলানা মওদূদী (রহঃ) তাঁর তাফসীরে বলেছেন, অপবিত্রতা-মলিনতা-পুতিগন্ধময়তা বলতে সকল প্রকার খারাপ জিনিস বুঝানো হয়েছে। আকিদা-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, মতাদর্শ, নীতি-নৈতিকতা, চরিত্র ও কর্ম কিংবা পোষাক-পরিচ্ছদ, থাকা, খাওয়া, চলা-ফিরা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্র ও সকল পর্যায়ের অপবিত্রতা ও পুতিগন্ধময়তা এর অন্তরভুক্ত।

মূল কথা হলো, হে নবী! আপনার চারপাশের অর্থাৎ গোটা সমাজেই যে চরম পর্যায়ের অপবিত্রতা ও পুতিগন্ধময়তা বিদ্যমান রয়েছে, তা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে পবিত্র ও মুক্ত রাখুন। কেউই যেন বলতে না পারে যে, আপনি সমাজের মানুষকে যেসব খারাপ কাজ-কর্ম অপবিত্রতা হতে দূরে থাকতে বলছেন, তা কোনো একটির সামান্য পরিমান নামগন্ধও আপনার জীবনে বিদ্যমান রয়েছে।

তাফসীরবিদ মুজাহিদ, ইকরামা, কাতাদা, যুহরী ও ইবনে যায়েদ প্রমুখ এখানে رُجْزَ এর অর্থ নিয়েছেন 'প্রতিমা' বা 'মূর্তি'। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর এক অর্থ নিয়েছেন 'গোনাহ্'। অতএব আয়াতের অর্থ হলো এই যে, হে নবী! আপনি প্রতিমা পূজা ও গোনাহ্ পরিত্যাগ করুন। এ বিষয়ে কথা হলো, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তো আগে থেকেই প্রতিমা পুজা ও

গোনাহ্ থেকে মুক্ত ছিলেন, তার ধারে-কাছেও ছিলেন না। তাহলে তাঁকে এই আদেশ দেয়ার অর্থ কি ? তাঁকে এই নির্দেশ দেয়ার অর্থ হলো, হে নবী! আপনিতো এসব থেকে মুক্ত আছেন-ই, ভবিষ্যতেও একাজ থেকে দূরে থাকুন।

প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্র নবীর উপর নির্দেশের অর্থ হলো, তাঁর মাধ্যমে উম্মতে মুহাম্মদীকে শিক্ষা দেয়া। তাই উম্মতে মুহাম্মদীকে শিক্ষা দেয়ার জন্য বেশী গুরুত্ব প্রদানের উদ্দেশ্যে রাসূলকেই সম্বোধন করে নির্দেশটি দেয়া হয়েছে। যাতে উম্মতে মুহাম্মদী বুঝতে পারে যে, কাজটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই নিষ্পাপ নবীকেও এ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়নি।

পঞ্চম নির্দেশ ঃ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ - আর বেশী পাবার আশায় অন্যকে দান করবেন না।

এই নির্দেশটির অর্থ ও তাৎপর্য ব্যাপক। একটি মাত্র বাক্য দ্বারা এর সমস্ত তাৎপর্য ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। এই জন্য এর অর্থের কয়েকটি তাৎপর্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

প্রথম তাৎপর্য ঃ হে নবী! আপনি যার প্রতি অনুগ্রহ করবেন বা যাকে দান করবেন কিম্বা যার প্রতি ভাল ব্যবহার করবেন, তা করবেন নিঃস্বার্থভাবে। আপনার দান, বদান্যতা, সৌজন্যতা, দানশীলতা ও উত্তম আচার-আচরণ কেবলমাত্র আল্লাহ্র জন্যে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই হতে হবে। মনের মধ্যে কোনো প্রকার দুনিয়ার স্বার্থ বা সুযোগ সুবিধা লাভ করার একবিন্দু আশাও পোষণ করবেন না।

দ্বিতীয় তাৎপর্য ঃ হে নবী! নবুয়াতের দায়িত্ব পালনে আপনি যে কাজ-ই করছেন, নিঃসন্দেহে এটা একটা নিজস্বভাবে মহান কাজ। কেননা, আপনার কারণে ও আপনার মাধ্যমেই বিশ্ব মানব হিদায়েত লাভ করেছে। কিন্তু সেই জন্য আপনি মানুষের প্রতি কোনো প্রকার দয়া বা অনুগ্রহ করছেন তা কখনও ধারণা করবেন না বা মনে প্রশ্রয় দেবেন না। আর তার জন্য নিজে কোনো সুযোগ সুবিধা বা স্বার্থ লাভের চেষ্টাও করবেন না।

তৃতীয় তাৎপর্য ঃ হে নবী! আপনি যদিও একটি অনেক বড় কাজ ও মহান কাজ সুসম্পন্ন করছেন, কিন্তু নিজের দৃষ্টিতে নিজের কাজকে কখনও খুব

বড় ও বিরাট কাজ মনে স্থান দেবেন না। মনে করবেন না যে, আপনি বিরাট কিছু করে ফেলেছেন। আর নবুওয়াতের দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করে এবং এই কাজে যার পরনাই কষ্ট স্বীকার করে আপনি আপনার আল্লাহর প্রতি মস্ত বড় একটা অনুগ্রহ করছেন এমন কথা বা কল্পনা কস্মিণ কালেও মনে স্থান দিবেন না। এই আয়াত হতে উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য কি কি শিক্ষা রয়েছে তা পরবর্তীতে শিক্ষণীয় বিষয়ে উল্লেখ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

ষষ্ঠ নির্দেশ ঃ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ **- আর আপনার রব এর জন্য ধৈর্যধারণ করুন।**

এখানে صَبْرٌ (সবর)শব্দটির অর্থও ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ। অর্থাৎ হে নবী (সঃ)। রিসালাতের মহান যে দায়িত্ব আপনার উপর সঁপিয়া দেয়া হচ্ছে তা অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ, দুর্বিসহ এবং কষ্টদায়ক কাজ। এই কাজে বহু রকম ও ধরনের কঠিন বিপদ-মসীবত, বাঁধা-প্রতিবন্ধকতা ও দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে। এ কাজের কারণে নিজের জাতির লোকেরাই আপনার শত্রু হয়ে যাবে। গোটা আরব মল্লুক আপনার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু হে নবী, এ পথে যা কিছুরই আপনাকে সম্মুখীন হতে হোক না কেন তা আল্লাহর জন্য হাঁসিমুখে বরণ করে নিতে হবে। বিচলিত হলে চলবে না। তাতে ধৈর্যধারণ করতে হবে এবং পূর্ণমাত্রায় দৃঢ়তা ও স্থিতিশিলতার সাথে তা বরদাস্ত করে নিজের দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করে যেতে হবে।

হে নবী! আপনাকে এ কাজ হতে নিরব রাখার জন্য ভয়, লোভ-লালসা, বন্ধুতা, শত্রুতা, ভলোবাসা ইত্যাদি অনেক কিছুই আপনার পথের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু এসব কিছুর মুকাবিলায় আপনাকে নিজের নীতি, আদর্শ ও দায়িত্ব-কর্তব্যের উপর অটল-অবিচলভাবে ধৈর্যের সাথে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। (তাফহীমূল কুরআন)

প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা! আল্লাহ তা'লা তাঁর রাসূল (সঃ) কে এসব আদেশ-নির্দেশ দিয়েছিলেন তখন, যখন তাঁকে বলা হয়েছিলো যে, কম্বল বা লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে না থেকে হে নবী, আপনি উঠুন এবং উঠে

নবুয়তের দায়িত্ব পালনের কাজ শুরু করে দিন। এসব ছোট ছোট বাক্য এবং এর অর্থ ও তাৎপর্য কেউ যদি চিন্তা-বিবেচনা করে দেখে, তাহলে তার মন অবশ্যই সাক্ষ্য দিবে যে, একজন নবীকে তাঁর নবুয়তের কাজ আরম্ভ করার সময় এর চেয়ে উত্তম কোনো হিদায়াত দেয়া যেতে পারে না। বস্তুত তাঁকে কার্যত কি কি কাজ করতে হবে, এখানে সেসব বিষয় স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে।

শিক্ষা ঃ প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা মুদ্দাস্‌সির এর প্রথম ৭টি আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য পেশ করা হলো। এখন এখান থেকে আমাদের জন্য কি কি শিক্ষণীয় রয়েছে তা জানা প্রয়োজন। নিম্নে শিক্ষনীয় বিষয়গুলো উল্লেখ করা হলোঃ

১. আল্লাহর দ্বীনী দায়িত্ব পালনে কোনো প্রকার ভয়-ভীতি কিম্বা মনের কষ্টের কারণে ঘরে শুয়ে-বসে থাকা যাবে না।

২.মানুষকে কঠিন ও ভয়াবহ আযাব থেকে বাঁচার জন্য দরদী মন নিয়ে, স্নেহ ও ভালোবাসা দিয়ে সতর্ক-সাবধান করে যেতে হবে, এতে মানুষ ভুল বুঝে যতই বিরোধীতা করুক না কেন, অথবা ঠাট্টা-বিদ্রুপ কিম্বা কটুক্তি করুক না কেন।

৩. যদি কারো বড়ত্ব, মহত্ব কিম্বা শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতে হয়, তাহলে গোটা বিশ্ব জাহানের রব বা প্রতিপালক মহান আল্লাহ তায়ালার-ই করতে হবে। তাকবীর ধ্বনী দিতে হলে আল্লাহরই তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করতে হবে। শ্লোগান দিতে হলে আল্লাহর নামেই শ্লোগান দিতে হবে। কেননা, দুনিয়াতে আল্লাহ ছাড়া আর কেউই বড়ত্ব ও মহত্ব পাওয়ার বা ঘোষণা দেয়ার যোগ্য নয়।

৪. একদিকে যেমন বাহ্যিকভাবে নিজের দেহ ও পোষাক পরিচ্ছদকে অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করতে হবে। তেমনি দেহ-মন ও অন্তরকেও সকল প্রকার ভ্রান্ত বিশ্বাস-চিন্তা ও পংকিলতা থেকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। আবার গোটা সমাজ ব্যবস্থাকেও পবিত্রতা, পংকিলতা ও কুসংস্কার থেকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করতে হবে। এজন্য ব্যক্তিগতভাবে ও সম্মিলিতভাবে অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

৫. যারা বকধার্মিক-তারা শরীর ও পোষাক-আশাককে অপরিস্কার-অপরিচ্ছন্ন ও এলোমেলো থাকাকেই ধার্মিকতা ও আল্লাহ্ প্রেমীক দরবেশী কাজ মনে করে থাকে। তাদের এ অলীক কল্পণা ও বকধার্মিকতা থেকে দূরে থাকতে হবে। অপরিস্কার-অপরিচ্ছন্নতা, ময়লা দুর্গন্ধময়তাকে আল্লাহ্ যেমন পছন্দ করেন না তেমনি ফিরিশতারাও তার ধারে কাছেও যায় না। আল্লাহ্ এবং তাঁর ফিরিশতামন্ডলী পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করে থাকেন। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ "নিশ্চয় আল্লাহ্ তাওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীকে পছন্দ করেন।" হাদীসে ঈমানের অর্ধেক বলে নবী করীম (সঃ) বলেন اَلطُّهُوْرُ نِصْفُ الْإِيْمَانِ "পবিত্রতা হলো ঈমানের অর্ধেকাংশ।"

৬. পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে আরো একটি শিক্ষা হলো, পোষাক-পরিচ্ছদ নৈতিক দোষ-ত্রুটি হতে মুক্ত থাকতে হবে। পোষাক-পরিচ্ছদ অবশ্যই পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, তবে তা যেন গর্ব-অহংকার ও রিয়াকারে পরিণত না হয়ে যায়। নিজের পোষাক-ই যেন পরিচয় তুলে না ধরে। বরং নীতি-নৈতিকতায় যেন ব্যক্তির পরিচিতি হয়। এ দিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে।

৭. নিজের চরিত্র পবিত্র ও নিষ্কলুস রাখতে হবে। সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে নিজের চরিত্রকে মুক্ত রাখতে হবে-দূরে রাখতে হবে।

৮. অপবিত্রতা, মলিনতা পুতিগন্ধময়তা থেকে দূরে থাকতে হবে। একদিকে যেমন নিজের আকিদা বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, মতাদর্শ, নীতি-নৈতিকতা ও চরিত্রকে সকল প্রকার অপবিত্রতা, পংকিলতা ও পুতি গন্ধময়তা থেকে দূরে থাকতে হবে, তেমনি পোষাক-পরিচ্ছদ, খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফিরা ও কাজ-কামকে অপবিত্রতা ও পংকিলতা থেকে মুক্ত রাখতে হবে। শিরকের মতো মহা গোনাহ যেমন, প্রতিমা বা মূর্তিপূজা, কবর পূজা, পীর পূজা, খানকা-দরগাহ পূজা সহ বিভিন্ন প্রকার পূজা থেকে দূরে থাকতে হবে। তাছাড়া সকল প্রকার গোনাহর কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে।

৯. বেশী পাবার আশায় অন্যকে দান করা যাবে না। বিনিময় পাবার মানসিকতা পরিহার করতে হবে। কারো কোনো উপকার করলে তার বিনিময়ের আশা করা যাবে না। হাদীয়া বা উপঢৌকন বিনিময় পাবার আশায় দেয়া যাবে না। এমনকি আল্লাহর কোনো বন্দেগী বা নেক কাজ করে কিম্বা দ্বীনের কাজ করে মনে করা যাবে না যে, আল্লাহর মহা উপকার করলাম। কেননা, কোনো নেক কাজ কিম্বা দীনের কাজ করে আল্লাহর কোনো উপকার হয় না, যদি উপকার বা কল্যাণ হয় তা নিজেরই উপকার বা কল্যাণ হয় মনে করতে হবে।

১০. আল্লাহর দ্বীনের এসব কাজ বা আ'মল করতে যেয়ে অধৈর্য হলে চলবে না। বরং আল্লাহর দ্বীনের কাজ করতে যেয়ে একদিকে যেমন ভয়-ভীতি, জুলুম-নির্যাতন, বাধা-বিপত্তি, ক্ষয় ক্ষতিকে ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করতে হবে, তেমনি অন্যদিকে আল্লাহর দ্বীনের কাজ থেকে দূরে রাখার জন্য বিভিন্ন প্রকার লোভনীয় অফার, লোভ-লালসা, সম্মান-খাতিরকেও মহা পরীক্ষা মনে করে ধৈর্যের সাথে সবকিছুকে উপেক্ষা করে দ্বীনী আন্দোলনের কাজ চালিয়ে যেতে হবে এবং আল্লাহর দ্বীনে টিকে থাকার জন্য সদাসর্বদা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে।

আহ্বান ঃ প্রীয় ভাইয়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা মুদ্দাস্‌সির এর ১ম সাতটি আয়াতের যে ব্যাখ্যা পেশ করা হলো, এতে যদি আমার অজান্তে বা অজ্ঞাতে কোনো ভুল-ত্রুটি হয়ে যায় কিম্বা কোনো ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, তার জন্য মহান রাব্বুল আ'লামীনের কাছে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর আপনাদের সামনে যেসব শিক্ষা তুলে ধরা হলো তা যেন বাস্তব জীবনে আমরা সবাই আ'মল করতে পারি, মহান আল্লাহর কাছে সেই তাওফীক কামনা করে আমি আমার দারস শেষ করছি। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন।

তিন

কথায় কাজে গরমিল বর্জন

সূরা আস্ সফ- ৬১

আয়াত নং-১-৪

نَحمَدُهُ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ج وَهُوَالعَزِيْزُ

الْحَكِيْمُ ○ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَالَا تَفعَلُوْنَ ○

كَبُرَمَقْتًاعِنْدَاللهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَالَا تَفْعَلُوْنَ ○ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ

الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ○

সরল অনুবাদ ঃ ইরশাদ হচ্ছে-(১) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর পবিত্রতা ও মাহিমা ঘোষণা করছে। তিনিই পরাক্রমশালী ও মহাবিজ্ঞানী। (২) হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা কেন সেই কথা বলো যা তোমরা কাজে করো না। (৩) এটা আল্লাহর কাছে খুবই ক্রোধের বিষয় যে, তোমরা এমন কথা বলো, যা তোমরা করো না। (৪) আল্লাহ তো সেই সব লোকদেরকে ভালোবাসেন, যারা সীসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় দলবদ্ধভাবে তাঁর পথে লড়াই করে।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ سَبَّحَ - তাসবীহ/পবিত্রতা/মহিমা বর্ণনা করে। لِلّٰهِ - আল্লাহর জন্যে। مَا - যা কিছু। فِىْ - মধ্যে। اَلسَّمٰوٰتِ - আসমানসমূহের/ আকাশমন্ডলীর। اَلاَرْضِ - পৃথিবীর। وَهُوَ -

এবং তিনিই। اَلْعَزِيْزُ - পরাক্রমশালী। اَلْحَكِيْمُ- প্রজ্ঞাময়/মহাবিজ্ঞানী।

يَا - ওহে/হে। اَلَّذِيْنَ- যারা। اٰمَنُوْا - ঈমান এনেছো। لِمَ -

কেন। تَقُوْلُوْنَ - তোমরা বলো। مَا - যা। لَاتَفْعَلُوْنَ - তোমরা করো

না। كَبُرَمَقْتًا -অত্যন্ত ক্রোধের বিষয়/অতিশয় ক্রোধ জনক। عِنْدَاللهِ -

আল্লাহর নিকট বা কাছে। اَنْ تَقُوْلُوْا - তোমরা বলো এমন কথা যে। مَا

لَاتَفْعَلُوْنَ -যা তোমরা করো না। اِنَّ اللهَ - নিশ্চয় আল্লাহ। يُحِبُّ -

মহব্বত করেন/ পছন্দ করেণ। اَلَّذِيْنَ - যারা। يُقَاتِلُوْنَ - লড়াই

করে। فِيْ سَبِيْلِهٖ - তাঁর পথে। صَفًّا-দলবদ্ধভাবে/ সারিবদ্ধভাবে।

كَاَنَّهُمْ - যেন তারা। بُنْيَانٌ - প্রাচীর। مَرْصُوْصٌ - সীসা ঢালা/সুদৃঢ়।

সম্বোধন ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে/মাহফিলে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা/ বোনেরা! আসসালামুআলাইকুম অয়ারহমাতুল্লাহি অয়াবারাকাতুহ। এতক্ষণ পর্যন্ত আমি সূরা আস্ সফ এর প্রথম চারটি আয়াত তিলাওয়াত ও সরল অনুবাদ পেশ করেছি। আল্লাহ পাক যেন আমাকে আপনাদের সামনে তিলাওয়াকৃত আয়াত কয়টির দারস সঠিকভাবে পেশ করার তাওফীক দান করেন। আমীন।

সূরার নামকরণ ঃ অত্র সূরার ৪নং আয়াত يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا এ উল্লেখিত صَفٌّ শব্দটিকেই বেছে নিয়ে সূরার নামকরণ করা হয়েছে। صَفٌّ শব্দের অর্থ হলো, দলবদ্ধ বা সারিবদ্ধ। অর্থাৎ এটা সেই সূরা যার মধ্যে صَفٌّ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। পবিত্র আল কুরআনের ১১৪টি সূরার অধিকাংশ সূরার নামকরণ প্রতীকী বা চিহ্ন হিসেবে করা হয়েছে। অনুরূপ সূরা সফ এর নামকরণও প্রতীকী বা চিহ্ন হিসেবে করা হয়েছে, কোনো শিরোনাম হিসেবে নয়। তবে তা করা হয়েছে ওহীর নির্দেশ ক্রমেই।

সূরাটি নাযিল হওয়ার সময়কাল ঃ সর্বসম্মত মতে সূরাটি মাদানী। তবে কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে এ সূরাটি নাযিলের সময়কাল জানা যায়নি। কিন্তু এর বিষয়বস্তু থেকে অনুমান করা যায় যে, সম্ভবত সূরাটি ওহুদ যুদ্ধের কাছাকাছি সময় নাযিল হতে পারে। কেননা, এতে যে অবস্থার ইঙ্গিত রয়েছে তা এই সময়টিই বিরাজ করছিলো।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য ঃ সংক্ষেপে সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য হলো, কথা ও কাজে গরমিল বর্জন। ঈমানের ব্যাপারে নিষ্ঠা ও আন্ত রিকতা সৃষ্টি এবং আল্লাহর পথে জান-মাল উৎসর্গ করার জন্য মুমিনদেরকে উৎসাহ প্রদান এবং জান-মাল উৎসর্গকারীদের মর্যাদা ও পুরস্কারের কথাও বলা হয়েছে।

তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর বিষয়বস্তু ঃ সূরা আস্ সফ এর ১ থেকে ৪নং আয়াতগুলোর বিষয়বস্তু হলো- সৃষ্টির সবকিছুই আল্লাহর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে। মুমিনদেরকে মুনাফিকী বর্জনের তাগাদা। আল্লাহর নিকট অত্যন্ত ঘৃণার বিষয় কোন্‌টি এবং তাঁর প্রিয়ভাজন কারা সেই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সূরাটির শানে নুযূল ঃ তিরমিজী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, একদা কিছু সাহাবী (রাঃ) পরস্পর বলাবলি করছিলেন যে, আল্লাহ তা'লার নিকট সবচেয়ে প্রিয় আ'মল কোন্‌টি যদি আমরা তা জানতে পারতাম, তাহলে আমরা তাই করতাম। বগভী (রহঃ) এ প্রসঙ্গে আরও বর্ণনা করেন যে, কেউ কেউ একথাও বললেন যে, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় আ'মলটি কি জানতে পারলে আমরা তার জন্যে জান-মাল সবকিছুই কোরবান করে দিতাম।

(তাফসীরে মাযহারী)

ইবনে কাসীর মুসনাদ-ই আহমদের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন, তাঁরা একত্রিত হয়ে পরস্পর এই আলোচনা করার পর একজনকে রাসূল (সঃ) এর নিকট এ বিষয়ে জানার জন্যে পাঠাতে চাইলেন, কিন্তু কারও তাঁর কাছে যাবার হিম্মত হলো না। ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁদের প্রত্যেককে নামে নামে নিজের কাছে ডেকে পাঠালেন। (এতে বোঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ওহীর মাধ্যমে তাঁদের সমাবেশ ও আলোচনার বিষয় সম্পর্কে জানতে পারেন।) তাঁরা সবাই এক এক করে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর

দরবারে হাজির হলে তিনি তাঁদেরকে "সূরা আস্ সফ" পুরোটাই শুনিয়ে দিলেন- যা তখনই তাঁদের কথার পরিপেক্ষিতে নাযিল হয়েছিলো।

এ সূরা থেকে জানা যায়, যেসব সাহাবী সবচেয়ে প্রিয় আ'মল বা কাজটির তালাশ করছিলেন সেটি হলো, জান-মাল দিয়ে প্রাচীরের ন্যায় দলবদ্ধভাবে আল্লাহর পথে জিহাদ বা আন্দোলন-সংগ্রাম করা। তবে আল্লাহ তা'লা এই সূরাতেই তাঁদের এ ধরনের আগে বেড়ে আ'মল তালাশের বিষয়টি সমালোচনা করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে দারসের জন্য কতিপয় প্রয়োজনীয় এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা হলো। এখন তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা পেশ করছি। সূরার প্রথম আয়াতে মহান আল্লাহ তা'লা তাঁর মাহাত্ম বর্ণনা করে বলেন-

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الاَرْضِ وَهُوَالْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

আসমানসমূহে এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে। তিনি পরাক্রমশালী মহাবিজ্ঞানী।

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَافِى الْاَرْضِ এর سَــبَّحَ শব্দটি ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ অর্থবোধক শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ- পবিত্রতা বা মহিমা। ব্যাপক অর্থে বিশ্বজাহানের প্রতিটি জিনিস-ই চিরকাল ঘোষণা করে আসছে যে, উহার সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক মহান আল্লাহ তা'লা সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি, ভুল-ভ্রান্তি হতে মুক্ত ও পবিত্র। অসম্পূর্ণতা, দূর্বলতা ও খারাবী হতে পূত-পবিত্র। তাঁর সত্তা পাক ও পবিত্র। তাঁর গুণাবলী পরিচ্ছন্ন ও কলংকমুক্ত। তাঁর কাজ-কর্মসমূহ সম্পূর্ণ নির্দোষ। তাঁর আইন-কানুন, হুকুম আহকামও (তা প্রাকৃতিক নিয়ম-নীতি পর্যায়ের হোক কিংবা শরীয়তের পর্যায়ে হোক) সবই পুত-পবিত্র। এ সবই হলো سَبَّحَ শব্দটির অর্থ ও তাৎপর্য। এ শব্দটি অতীত কালও বুঝায়, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালও বুঝায়। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, বিশ্বজাহানের প্রতিটি বিন্দু ও অনুপরমানু উহার মহান সৃষ্টিকর্তা ও লালন-পালনকারী রব এর পবিত্রতা, মাহাত্ম ও মহিমা বর্ণনা ও প্রকাশ করে আসছে,

আজও করছে, ভবিষ্যতেও সদাসর্বদা করতে থাকবে। তবে সৃষ্টির সেরা মানুষ এর ব্যতিক্রম।

সমস্তপ্রাণী ও গাছপালা আল্লাহ্ তা'লার পবিত্রতা বর্ণনা করে থাকে। সপ্ত আসমান ও যমীন এবং এগুলোর মাঝে অবস্থানকারী সমস্ত সৃষ্টিজীব ও প্রত্যেকটা জিনিসই তাঁর পবিত্রতা, প্রশংসা ও গুণকীর্তনে মশগুল রয়েছে, কিন্তু মানুষ এদের তাসবীহ্ পাঠ বুঝতে পারে না।

যেমন, সূরা বনী ইসরাঈলের ৪৪ নং আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন-

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ؕ وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا

"সপ্ত আসমান ও যমীন এবং এগুলোর মধ্যে যারা রয়েছে, সবাই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে থাকে। আর এতে এমন কিছু নেই যা তাঁর প্রশংসার সাথে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু (হে মানুষ) তোমরা তাদের তাসবীহ্ বুঝতে পারো না। নিশ্চয়ই তিনি অতি সহনশীল ও ক্ষমাপরায়ন।"

আল্লাহ্ তা'লার বড়ত্ব ও মাহত্বের বর্ণনা হলো, সবাই তাঁর সামনে নীচু, অক্ষম ও শক্তিহীন। তাঁর নির্ধারিত শরীয়ত এবং হুকুম-আহকাম, হিকমত ও কৌশলে পরিপূর্ণ। প্রকৃত বাদশাহীতো তাঁরই যাঁর কতৃত্বাধীনে আসমান ও যমীন রয়েছে। সমস্ত মাখলুকের ব্যবস্থাপক তিনিই। জীবন ও মৃত্যু তাঁরই হাতে। তিনিই সৃষ্টি করেন আবার তিনিই ধ্বংস করেন। তিনি যাকে যা কিছু দেয়ার ইচ্ছা করেন, দিয়ে থাকেন। তিনি সবকিছুর উপরই পূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি যা চান তাই হয়, আর যা চান না তা হয় না বা হতে পারে না।

وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ –এই বাক্যটিতে هُوَ শব্দটি সর্বনাম যা সর্বপ্রথম বসানো হয়েছে, এতেই নিরংকুশতার তাৎপর্য প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ কথা শুধু এতটুকু-ই নয় যে, তিনি পরাক্রমশালী ও মহাবিজ্ঞানী। বরং প্রকৃত কথা হলো, একমাত্র আল্লাহ-ই এমন এক সত্তা যিনি পরাক্রমশালীও আবার মহাবিজ্ঞানীও।

عَزِيْزٌ -শব্দের অর্থ হলো, পরাক্রমশালী, মহাশক্তিমান ও অশেষ ক্ষমতার অধিকারী। যাঁর সিদ্ধান্তসমূহ কার্যকর করতে কেউই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না, তা প্রতিরোধ করা কারোরই সাধ্য নেই। যাঁর আনুগত্য প্রত্যেককেই করতে হয়। ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক প্রত্যেককেই তাঁর নির্দেশ ও আইন মেনে নিতে হয়। যাঁর নাফরমানী করে কেউ তাঁর পাকড়াও হতে রক্ষা পেতে পারে না-রক্ষা পাওয়ার কোনো উপায়ও নেই।

حَكِيْمٌ – শব্দের অর্থ হলো, মহা কৌশলী ও মহাবিজ্ঞানী। অর্থাৎ তিনি যা কিছু করেন বিশেষ বুঝ-সমঝ, বিজ্ঞতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথেই করেন। কোনো একটি কাজও অজ্ঞতা, নির্বুদ্ধিতা ও বোকামীর সাথে তিনি করেন না। এসব দূর্বলতার লেসমাত্র থাকে না।

সূরার শুরুতে এই আয়াত বা বাক্যটি পরবর্তী আয়াতগুলোতে যে বক্তব্য বা ভাষণ পেশ করা হয়েছে তার ভূমিকা স্বরূপ। এরূপ ভূমিকা দিয়ে মূল বক্তব্য শুরু করা হয়েছে এ কারণে যে, পরে যেসব বক্তব্য পেশ করা হবে তা শোনার পূর্বে প্রত্যেকেই যেন একথা খুব ভালোভাবে বুঝে নেয় যে, আল্লাহ তাবারাক ওয়া তা'লার কর্তৃত্বে কারো ঈমান আনা এবং কারোও সাহায্য ও ত্যাগ-কুরবানী স্বীকারের উপর নির্ভরশীল নয়। বরং এসব থেকে তিনি বহু উর্দ্ধে।

বিশ্ব জাহানের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তা'লার পবিত্রতা, বড়ত্ব ও বিজ্ঞতার ঘোষণা দেয়ার পর পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক ঈমানদারদের লক্ষ্য করে বলেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَالَا تَفْعَلُوْنَ ○ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَالَا تَفْعَلُوْنَ ○

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা কেন সেই কথা বলো, যা তোমরা কাজে করো না। এটা আল্লাহর জন্য খুবই ক্রোধের বিষয় যে, তোমরা এমন কথা বলো যা তোমরা করো না।

শানে নুযূল ঃ বিভিন্ন তাফসীরকারগণ এই আয়াতসমূহের শানে নুযূল সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমন হযরত ইবনে

আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, জিহাদ ফরয হওয়ার পূর্বে মুমিনদের মধ্য হতে কিছু লোক বলতো, হায়! আমরা যদি সেই আ'মল বা কাজটি জানতে পারতাম যা আল্লাহর নিকট খুবই প্রিয়, তা হলে আমরা তাই করতাম। কিন্তু যখন বলে দেয়া হলো যে, সেই আ'মল বা কাজটি হলো জিহাদ, তখন তাদের সেই বলা কথা পূর্ণ করাই তাদের জন্য কষ্ট হয়ে গেল। তখন আল্লাহ তা'লা আয়াত নাযিল করেন- لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَالَا تَفْعَلُوْنَ
"তোমরা সেই কথা কেন বলো, যা তোমরা কাজে করো না।"

কোনো কোনো গুরুজন বলেন যে, এটা ঐ লোকদের ব্যাপারে নাযিল হয় যারা বলতোঃ 'আমরা যুদ্ধ করেছি' অথচ তারা যুদ্ধ করেনি। বলতোঃ 'আমরা আহত হয়েছি', অথচ তারা আহত হয়নি। বলতোঃ 'আমরা প্রহৃত হয়েছি' অথচ প্রহৃত হয়নি। বলতো ঃ 'আমরা ধৈর্যধারণ করেছি' অথচ ধৈর্যধারণ করেনি। তারা বলতো ঃ 'আমাদেরকে বন্দী করা হয়েছে' অথচ তাদেরকে বন্দী করা হয়নি। (ইবনে কাসীর)

আয়াতটির প্রথম বক্তব্য হলো এই যে, সাচ্চা-খাঁটি নিষ্ঠাবান মুসলমানদের কথা ও কাজে পূর্ণ সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্য অবশ্যই থাকতে হবে। যে যা মুখে বলবে তাকে তা কাজে দেখাতে হবে। আর করার ইচ্ছা বা সাহস-হিম্মত না থাকলে মুখেও তা উচ্চারণ করা যাবে না। আসলে বলা যতো সহজ করা ততো কঠিন। মুখে বলা আর বাস্তবে করা এক নয়। মুখে বলে কাজে না করা এটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরনের স্বভাব। আল্লাহ তা'লার নিকট এটা অত্যন্ত ঘৃণ্য এবং ক্ষোভের বিষয়। আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাবীদার ব্যক্তির পক্ষে এরূপ বদ অভ্যাস বা স্বভাব কখনই শোভা পায় না। ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা যেমন মুমিনের বৈশিষ্ট্য তেমনি তা ভঙ্গ করা হলো মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহর নবী (সঃ) মুনাফিকদের লক্ষণ বা নিদর্শন সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে বর্ণনা করেন ঃ

اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثَةٌ - اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اُتُمِنَ خَانَ

"মুনাফিকের লক্ষণ তিনটি ঃ (মুসলিম শরীফে অতিরিক্ত বর্ণনা, যদিও সে সালাত, সওম আদায় করে এবং নিজেকে মুসলমান মনে করে, তবুও সে

মুনাফিক) (১) সে যখন কথা বলে মিথ্যা বলে (২) যখন সে ওয়াদা করে বা প্রতিশ্রুতি দেয় তা পূরণ করে না (৩) এবং কোনো কিছু তার কাছে আমানত রাখলে তার খিয়ানত করে। (সহীহুল বুখারী, সহীহ্ মুসলিম)

অপর একটি হাদীসে আরও বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করে বলা হয়েছে-

اَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَقِ حَتّٰى يَدَعَهَا - اِذَا اُتُمِنَ خَانَ وَاِذَا حَدَّثَ كَذِبَ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

"চারটি স্বভাব যার মধ্যে পাওয়া যাবে সে পূর্ণ মুনাফিক। আর যার মধ্যে উহার যে কোনো একটি স্বভাব পাওয়া যাবে তার মধ্যে মুনাফিকির একটি স্বভাব অবশ্যই পাওয়া যাবে- যতক্ষণ না সে তা ত্যাগ করে। সেই চারটি স্বভাব হলো- (১) যখন সে আমানতের খিয়ানত করবে, (২) কথা বললে মিথ্যা বলবে, (৩) ওয়াদা করলে খেলাপ করবে, আর (৪) যখন ঝগড়া-ফাসাদ করে তখন সে অশ্লীল ও অনৈতিক কথা ও কাজ করে।"

(সহীহুল বুখারী, সহীহ্ মুসলিম)

প্রকৃতপক্ষে কোনো লোক যদি আল্লাহ্‌র সাথে কোনো ওয়াদা করে কিম্বা মানত মানে অথবা মানুষের সাথে কোনো চুক্তি বা সন্ধি করে কিম্বা কাউকে কোনো প্রতিশ্রুতি দেয় অথবা কিছু করার বা দেয়ার ওয়াদা করে, তাহলে তা পূরণ করা ওয়াজিব বা অবশ্যই করণীয়। কিন্তু কেউ যদি কোনো গোনাহ্‌র কাজে ওয়াদা করে বা প্রতিশ্রুতি দেয় তাহলে সেই কাজটি তো করা যাবেই না, বরং তার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ওয়াদা বা কসমের কাফ্‌ফারা আদায় করতে হবে।

(সূরা মায়িদার ৮৯ নং আয়াতে এই কাফ্‌ফারার কথা বলা হয়েছে)

উপরোক্ত সহীহ হাদীস দু'টিতে ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারীকে মুনাফিক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর মুনাফিকদের ভয়াবহ ও কঠিন পরিণতির কথা সূরা আন্ নিসায় উল্লেখ করে বলা হয়েছে-

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ج وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا

"নিশ্চয় মুনাফিকদের (পরকালে) অবস্থান হবে জাহান্নামের নিকৃষ্টতম স্থানে এবং তোমরা তাদের জন্যে কখনও কোনো-সাহায্যকারী পাবে না।"
(আয়াত নং -১৪৫)

আয়াতের ব্যাখ্যায় এটাই প্রমাণিত হয় যে, যেসব লোক ইসলামের জন্য জান-প্রাণ ও চূড়ান্ত ত্যাগ স্বীকারের লম্বা লম্বা ও বড় বড় ওয়াদা করে, কিন্তু বাস্তবে পরীক্ষার সময় পিছুটান দেয়, বিভিন্ন প্রকার বাহানা তালাশ করে, তাদেরকে তিরস্কার করাই হলো এই কথার উদ্দেশ্য। এরা আসলে দূর্বল ঈমানের লোক। তাদের এই দূর্বলতাকে কুরআনের কয়েকটি স্থানেই শক্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, সূরা নিসা-য় বলা হয়েছে-

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْٓا اَيْدِيَكُمْ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ج فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً ج وَقَالُوْا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ج لَوْلَآ اَخَّرْتَنَآ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ط

"(হে নবী!) আপনি কি সেই লোকদের দেখেছেন, যাদেরকে বলা হয়েছিলো তোমাদের হাতগুলোকে সংযত রাখো, সালাত কায়েম করো ও যাকাত দাও? এখন যখন তাদেরকে লড়াই করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, এখন তাদের মধ্যে একদল লোকের অবস্থা এই যে, মানুষকে এমনই ভয় করে যেমন ভয় করা উচিত আল্লাহকে বরং তার চেয়েও বেশী ভয় করে। আর তারা বলে, হে আমাদের পরওয়ার দেগার! কেন আমাদের প্রতি এই যুদ্ধ লিখে (ফরজ করে) দিলে? আমাদেরকে কেন আরো একটু সময়-সুযোগ দিলে না?" (আয়াত নং-৭৭)

অনুরূপ সূরা মুহাম্মদ-এ বলা হয়েছে-

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُوْرَةٌ ج فَاِذَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَّ ذُكِرَ فِيْهَا الْقِتَالُ لا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يَّنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَاَوْلٰى لَهُمْ

"যারা ঈমান এনেছে তারা বলতেছিলো, এমন সূরা কেন নাযিল করা হয় না (যাতে যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হবে)। কিন্তু যখন একটি সুদৃঢ় সূরা নাযিল করা হলো-যাতে যুদ্ধের উল্লেখ ছিলো, তখন (হে নবী) আপনি দেখতে পেলেন যে, যাদের অন্তরে রোগ ছিলো তারা আপনার দিকে এমনভাবে তাকায়, যেন তাদের উপর মৃত্যু আচ্ছন্ন হয়ে এসেছে।" (আয়াত নং-২০)

বিশেষ করে ওহুদ যুদ্ধের সময় লোকদের এই দূর্বলতা স্পষ্ট ও প্রকটভাবে দেখা দিয়েছিলো। যা সূরা আলে ঈমরানের ১৩তম রুকু থেকে ১৭তম রুকু পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এসব দূর্বল ঈমানের লোকদের অবস্থা হাদীসেও বর্ণনা করা হয়েছে।

যেমন- মুকাতিল ইবনে হাইয়ান (রহঃ) বলেন, ওহুদ যুদ্ধে এসব লোক পরীক্ষার সম্মুখীন হলে, তারা নবী করীম (সঃ) কে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে গেলো। কাতাদাহ ও দহ্হাক (রহঃ) বলেন, কোনো কোনো লোক যুদ্ধে অংশ নিতো বটে কিন্তু তারা কোনো কাজ করতো না। কিন্তু ফিরে এসে হামবড়ামী করে বলতো, আমরা এভাবে এভাবে লড়াই করেছি, এভাবে, এভাবে মেরেছি। এ ধরনের লোকদেরকেই আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'লা বিশেষ ভাবে তিরস্কার করেছেন। অবশ্য আল্লাহর কাছে প্রিয় আ'মল তালাশকারীদের মধ্যে মজবুত ঈমানের অধিকারী লোকও ছিলো। এ সম্পর্কে মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, "যারা এসব কথা বলছিলেন তাদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা আনসারীও (রাঃ) ছিলেন। যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলো এবং জানা গেল যে জিহাদ হলো সবচেয়ে উত্তম আ'মল, তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে, মৃত্যু পর্যন্ত তিনি নিজেকে ওয়াক্ফ করে দিলেন। তার উপরই তিনি কায়েম থাকেন এবং আল্লাহর পথে শহীদ হয়ে যান।" (ইবনে কাসীর)

অতঃপর আল্লাহ তা'লার প্রিয়ভাজন লোক কারা তাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে পরবর্তী আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন-

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ

নিশ্চয় আল্লাহ সেইসব লোকদেরকে মহব্বত করেন বা ভালোবাসেন যারা সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় দলবদ্ধভাবে তাঁর পথে লড়াই-সংগ্রাম করে।

ইতোপূর্বেকার আয়াতে মহান আল্লাহ দুর্বল ঈমানের বা মুনাফিকদের তিরস্কার করে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এখন যারা প্রকৃত এবং মজবুত ঈমানের অধিকারী তাদের জন্য এক প্রকার সুসংবাদ যে, তিনি ঐসব মজবুত মুমিন বান্দাদেরকে ভালোবাসেন যারা শত্রুর বিরুদ্ধে ইস্পাত প্রাচীরের ন্যায় সারিবদ্ধ হয়ে দৃঢ়-মজবুতভাবে জিহাদ করে, আন্দোলন-সংগ্রাম করে, যাতে আল্লাহর কালিমা বুলোন্দ হয়, ইসলামের হিফাজত হয় এবং তাঁর দ্বীন সমস্ত মতোবাদের উপর বিজয়ী হয়।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ তিন শ্রেণীর লোককে দেখে আল্লাহ তা'লা হেঁসে থাকেন। ১. যারা রাতে উঠে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করে। ২. সালাতের জন্য যারা কাতারবন্দী হয় এবং ৩. যুদ্ধের জন্য যারা সারিবদ্ধ হয়। (ইবনে কাসীর)

উল্লেখিত আয়াতে কয়েকটি বিষয় জানা গেল। প্রথমতঃ জানা গেল যে, আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হয় সেইসব ঈমানদার লোকের, যারা তাঁর পথে জান-প্রাণ দিয়ে লড়াই করতে এবং বিপদ-ঝঞ্জা মাথায় নিয়ে কাজ করতে প্রস্তুত থাকে। দ্বিতীয়ত ঃ জানা গেল যে,যারা আল্লাহর সন্তোষে ধন্য হয়ে সংগ্রাম করতে চায়, তাদের মধ্যে তিনটি গুণ থাকতে হবে।

১. তারা তীব্র চেতনা ও গভীর উপলব্ধির সাথে আল্লাহর পথে লড়াই-সংগ্রাম করবে। এমন পথে লড়াই-সংগ্রাম করবে না, যা 'ফী-সাবিলিল্লাহ' বা আল্লাহর পথে পড়ে না।

২. তারা উচ্ছৃংখল হবে না, সংগঠন বিরোধী ও অনিয়মতান্ত্রিক কাজে জড়িয়ে পড়বে না। তারা সুসৃংখল, সুসংগঠিত ও নিয়মতান্ত্রিকতার সাথে কাতারবন্দী হয়ে লড়াই-সংগ্রাম করবে।

৩. দুষমন ও শত্রুদের মোকাবেলায় ইস্পাত-কঠিন প্রাচীরের ন্যায় দুর্ভেদ্য হবে। এই শেষ কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা, যুদ্ধের ময়দানে বা আন্দোলন-সংগ্রামে দূর্ভেদ্য প্রচীরের ন্যায় ইস্পাত-কঠিন ভাবে দাঁড়াতে পারে কেবলমাত্র সেই বাহিনীটি যাদের মধ্যে নিম্নের বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলী বিদ্যমান থাকবে। যেমন-

ক. তাদের নৈতিক চরিত্র হবে অতি উন্নতমানের। যদি সেই বাহিনী কিংবা দলের সেনাপতি বা সিপাহী কিম্বা নেতা-কর্মীদের সেই বন্ধন এবং মান হতে নিম্নের হয়, তাহলে পারস্পরিক ভালোবাসা-হৃদ্যতা ও আন্তরিকতা সৃষ্টি হতে পারে না, কেউ কাউকে সম্মান ও শ্রদ্ধার চোখে দেখবে না। ফলে ঐ গুণের অভাবে পারস্পারিক কোন্দল ও সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠবে যা কেউ তা থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

খ. উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মধ্যে থাকতে হবে আন্তরিকতা, দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ও অনঢ়। কেননা, লক্ষ্য অর্জনের দৃঢ় সংকল্প ও আন্তরিকতায় গোটা বাহিনীকে আত্মদান ও জীবন উৎসর্গ করতে আবেগে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। আর এর ফলেই তারা যুদ্ধের ময়দানে ইস্পাত কঠিন ও দুর্ভেদ্য প্রাচীরের ন্যায় অবিচল-অটল ও মজবুতভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।

এসবের ভিত্তিতেই নবী করীম (সঃ) এর মহান নেতৃত্বে এমন এক শক্তিশালী সামরিক বাহিনী বা সংগঠন গড়ে উঠেছিলো যার সাথে সংঘর্ষে এসে তৎকালীন বড় বড় শক্তিশালী দেশগুলোরও পতন ঘটেছিলো এবং শত শত বছর পর্যন্ত দুনিয়ার কোনো শক্তিই তার সামনে দাঁড়িয়ে টিকে থাকতে পারেনি। (তাফহীমুল কুরআন)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আজকে যুগেও যতই আধুনিক প্রযুক্তি ও পরমানুর যুগ বলিনা কেন, যদি উপরোক্ত গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী একটি সুসৃংখল, নিয়মতান্ত্রিকতা সম্পন্ন মজবুত ঈমানের অধিকারী আদর্শ চরিত্রবান দল বা সংগঠন পরিচালিত হয়, তাহলে অবশ্যই আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী হবেই। আর এরাই হচ্ছে আল্লাহর কাছে মহব্বতের এবং প্রিয়ভাজন লোক। মহান আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে সেই দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

শিক্ষা ঃ প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে 'সূরা আস্ সফ' এর প্রথম চারটি আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হলো। এখন আমরা আলোচনা করবো এতে আমাদের জন্য কি কি শিক্ষণীয় রয়েছে। নিম্নে শিক্ষাণীয় বিষয়গুলো আলোচনা করা হলো ঃ

১. আসমান এবং যমীনের (মানুষ বাদে) সব কিছুই আল্লাহর পবিত্রতা, মহত্ব ও বড়ত্ব সার্বক্ষণিকভাবে ঘোষণা করে যাচ্ছে। অতএব প্রতিটি

কৃতজ্ঞ বান্দাহর উচিত হবে আল্লাহর মহত্ব, বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করা এবং একমাত্র তাঁরই সামনে সাজদাহ্‌বনত হওয়া।

২. যদি কোনো মানুষ আল্লাহর পবিত্রতা মহত্ব এবং বড়ত্ব ঘোষণা না করে, তাহলে দুর্দন্ত প্রতাপশালী, মহাক্ষমতাধর, মহাবিজ্ঞানী ও মহাকৌশলী আল্লাহর পাকড়াও হতে কেউ-ই রেহাই পাবে না। একদিন না একদিন তাঁর কোপানলে পড়তেই হবে। বাঁচার কোনো-ই উপায় থাকবে না।

৩. আল্লাহর বিধি-বিধান পালনের জন্য কোনো কাঠিন্য বা পরীক্ষা কামনা করা উচিত নয়।

৪. প্রতিটি মুমিনেরই উচিত হলো, যা সে কথা দিবে বা ওয়াদা করবে কিম্বা কসম করবে অথবা সন্ধি করবে তা যথাযথভাবে পালন করা। তা আল্লাহর সাথেই হোক বা মানুষের সাথেই হোক কিম্বা পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন হোক। তা ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে হোক অথবা দেশে দেশে যুদ্ধের ক্ষেত্রেই হোক সকল পর্যায়েই ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি কিম্বাচুক্তি পালন করা, যদি তা অন্যায় বা পাপ কাজের জন্য না হয়। আর যদি কেউ কোনো গোনাহ্ বা অন্যায়ের কাজের কসম করে কিংম্বা প্রতিশ্রুতি তা হলে তা তো ভঙ্গ করবেই। কিন্তু ওয়াদা বা কসম ভঙ্গের কাফ্‌ফারা আদায় করবে। ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা যেমন মুমিনের লক্ষণ, তেমনি তা ভঙ্গ বা খেলাপ করাও হলো মুনাফিকির লক্ষণ। একজন মুমিন মুনাফিকী থেকে বাঁচার জন্য যখন তখন যারতার সাথে যে-সে কাজে ওয়াদা করা থেকে বিরত থাকবে। যদি কেউ কারো সাথে কোনো বিষয়ে ওয়াদা করে, তা অবশ্যই পালন করবে। আর কোনো মুমিন তো কোনো অন্যায় বা পাপের কাজে ওয়াদা করতেই পারে না।

৬. কোনো বান্দাহ্ মুখে যা বলবে তা কাজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করবে। যদি কেউ তা না করে তাহলে সে আল্লাহর রোসানলে পড়বে। কেননা, কথা দিয়ে কাজে পরিণত না করা আল্লাহর নিকট অত্যন্ত ক্রোধের বিষয়। তার পরিণতিও অত্যন্ত ভয়াবহ।

৭. আল্লাহর প্রিয়ভাজন এবং ভালোবাসার পাত্র হতে হলে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য সংঘবদ্ধ হয়ে তারই পথে জান-মাল দিয়ে জিহাদ লড়াই সংগ্রাম করতে হবে।

৮. যারা আল্লাহর পথে লড়াই করবে তাদের নীতি-নৈতিকতা ও চরিত্রের দিক দিয়ে এতো উন্নতমানের হতে হবে যে, তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ইস্পাত কঠিন হবে। আর তাদের এই ভ্রাতৃত্বই হবে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায়। সুতরাং আল্লাহর প্রিয়ভাজন বান্দাহ তারাই হবে যারা আল্লাহর মহব্বতে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে অটুট হয়ে ইস্পাত কঠিন প্রাচীরের ন্যায় মজবুত ভাবে নিজের জান-মাল উৎসর্গ করে লড়াই-সংগ্রাম করবে।

আহ্বান ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা! আমি আপনাদের সামনে সূরা আস্ সফ এর প্রথম চারটি আয়াতের যে দারস পেশ করলাম, এতে যদি আমার অজান্তে কোনো ভুল-ত্রুটি কিম্বা বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, তার জন্য আমি মহান আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর আমরা এই সূরা থেকে যেসব শিক্ষা লাভ করলাম তা যেন বাস্তব জীবনে আ'মল করতে পারি, সেই তাওফীক কামনা করে আমি আমার দারস শেষ করছি। অয়াআখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন।

চার

হায়াত মউতের মালিক আল্লাহ তা'লা। কর্মীদের সাথে ভালো ব্যবহার এবং ত্রুটি মাফ করা। পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সিদ্ধান্তের উপর অটল থাকা ও আল্লাহর উপর ভরসা করা। আল্লাহর সাহায্য থাকলে কোনো শক্তিই বিজয়ী হতে পারবে না।

সূরা আলে ঈমরান- ৩

আয়াত- ১৫৬-১৬০

اَلْحَمدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلاَمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفٰى

اَمَّا بَعدُ فَاَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ اِذَا ضَرَبُوْا فِى الْاَرْضِ اَوْكَانُوْا غُزًّى لَّوْكَانُوْا عِنْدَنَا مَامَاتُوْا وَمَاقُتِلُوْا ج لِيَجْعَلَ اللهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِىْ قُلُوْبِهِمْ وَاللهُ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ط وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ٥ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ اَوْمُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ٥ وَلَئِنْ مُّتُّمْ اَوْقُتِلْتُمْ لَاِلَى اللهِ تُحْشَرُوْنَ ٥ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ ج وَلَوْكُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ص فَاعْفُ عَنْهُمْ

وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ج فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ○ اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ج وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِىْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ م بَعْدِهٖ ط وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ○

সরল অনুবাদ ঃ ইরশাদ হচ্ছে-(১৫৬) হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা কাফিরদের মতো কথা বলো না। তাদের ভাই-বন্ধুরা পৃথিবীতে কোনো অভিযানে বের হলে কিংবা যুদ্ধে অংশ নিলে (আর সেখানে কোনো দুর্ঘটনায় পড়লে) তারা বলে, যদি তারা আমাদের কাছে থাকতো, তাহলে তারা মারাও যেতো না এবং নিহতও হতো না। এ ধরনের কথাকে আল্লাহ্ তাদের মনের খেদ ও আক্ষেপের কারণে পরিণত করেন। অথচ আল্লাহ্ই জীবন-মৃত্যু দান করে থাকেন এবং তোমাদের সমস্ত কর্মের উপর তিনি নজর রাখেন। (১৫৭) যদি তোমরা আল্লাহর পথে নিহত হও অথবা মারা যাও তাহলে তোমরা আল্লাহ্র যে রহমত ও ক্ষমা লাভ করবে, তা এরা যা কিছু সঞ্চয় করে তার চেয়ে উত্তম। (১৫৮) আর তোমরা মারা যাও কিংবা নিহত হও, সকল অবস্থায় তোমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর দিকেই একত্রিত করা হবে। (১৫৯) (হে মুহাম্মদ) এটা আল্লাহর বিশেষ রহমত যে, আপনি তাদের (অর্থাৎ সঙ্গীদের) প্রতি ব্যবহারে বড়ই রহম দেলের। যদি আপনি কর্কষভাষী ও কঠোর দেলের হতেন, তাহলে অবশ্যই তারা আপনার চারপাশ থেকে সরে পড়তো। অতএব আপনি তাদের ত্রুটি মাফ করে দিন ও তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করুন এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। তারপর যখন কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন, তখন আল্লাহর উপর ভরসা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর উপর ভরসাকারীদের ভালোবাসেন। (১৬০) যদি আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেন, তবে তোমাদের উপর কেউই বিজয় হতে পারবে না। আর যদি তিনি তোমাদেরকে ত্যাগ করেন, তাহলে এরপর কে এমন আছে তোমাদেরকে সাহায্য করার মতো? কাজেই সাচ্চা মু'মিনদের আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ يَا - হে/ওহে। اَلَّذِيْنَ - যারা। لَاتَكُوْنُوْا - তোমরা হয়ো না/বলো না। كَالَّذِيْنَ - তাদের মতো যারা। وَقَالُوْا - এবং তারা বলেছে। اِخْوَانِهِمْ - তাদের ভাইদেরকে। اِذَا - যখন। ضَرَبُوْا - তারা অভিযানে/সফরে বের হয়। فِى الْاَرْضِ - দেশে-বিদেশে /পৃথিবীতে। اَوْ - অথবা/কিংবা। غُزًّى - যুদ্ধে। لَوْكَانُوْا - যদি তারা থাকতো। عِنْدَنَا - আমাদের কাছে। مَامَاتُوْا - তারা মরতো না। وَمَاقُتِلُوْا - এবং তারা নিহত হতো না। لِ - যেন/জন্য। يَجْعَلَ اللّٰهُ - আল্লাহ বানিয়ে দেন বা করে দেন। ذٰلِكَ - ঐরূপ/এরূপ। حَسْرَةً - খেদ/আক্ষেপ। فِىْ - মধ্যে। قُلُوْبِهِمْ - তাদের অন্তরগুলোর। يُحْىِ - তিনি জীবন দান করেন। وَيُمِيْتُ - এবং তিনিই মৃত্যু দান করেন। بِمَاتَعْمَلُوْنَ - তোমরা যা কাজ করো। بَصِيْرٌ - প্রতক্ষ করেছেন/দেখে থাকেন। وَلَئِنْ - এবং অবশ্যই যদি। قُتِلْتُمْ - তোমরা নিহত হও। فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ - আল্লাহর পথে। اَوْ - অথবা। مُتُّمْ - তোমরা মৃত্যু বরণ করো। لَمَغْفِرَةٌ - অবশ্যই ক্ষমা করা হবে। مِنَ اللّٰهِ -আল্লাহর পক্ষ হতে। خَيْرٌ - উত্তম। مِمَّا - যা তা হতে। يَجْمَعُوْنَ - তোমরা জমা করছো। اِلَى اللّٰهِ - আল্লাহর দিকে। تُحْشَرُوْنَ - তোমরা একত্রিত হবে। فَبِمَارَحْمَةٍ - এটা বিশেষ বা বড়ই রহমতের। مِنَ اللّٰهِ - আল্লাহর পক্ষ থেকে। لِنْتَ لَهُمْ - আপনি তাদের প্রতি কোমল দেলের। وَلَوْكُنْتَ - আর যদি আপনি হতেন। فَظًّا - কর্কষ ভাষী। غَلِيْظَ الْقَلْبِ - কঠোর দেলের। لَانْفَضُّوْا - অবশ্যই তারা সরে পড়তো। مِنْ حَوْلِكَ -

আপনার চারপাশ থেকে। فَاعْفُ عَنْهُمْ - অতএব আপনি তাদের ক্রটি মাফ করুন। وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ - এবং তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করুন। وَشَاوِرْهُمْ - আর তাদের সাথে পরামর্শ করুন। فِي الْأَمْرِ - কাজে-কর্মের। فَإِذَا - অতঃপর যখন। عَزَمْتَ - সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ - আল্লাহর উপর ভরসা করুন। إِنَّ اللَّهَ - নিশ্চয় আল্লাহ। يُحِبُّ - মহব্বত বা পছন্দ করেন। الْمُتَوَكِّلِينَ - ভরসাকারীদের। إِنْ - যদি। يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ - আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেন। فَلَا غَالِبَ لَكُمْ - তবে কেউ তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না। وَإِنْ - এবং যদি। يَخْذُلْكُمْ - তোমাদেরকে ভুলে যান বা ত্যাগ করেন। فَمَنْ ذَا الَّذِي - অতঃপর এমন কে আছে? يَنْصُرُكُمْ - তোমাদেরকে সাহায্য করার মতো। مِنْ بَعْدِهِ - তার পরে বা এর পরে। عَلَى اللَّهِ - আল্লাহর উপরই। يَتَوَكَّلُ - ভরসা করা। الْمُؤْمِنُونَ - সাচ্চা মুমিনদের।

সম্বোধন ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাই ও বোনেরা/ভাইয়েরা/বোনেরা! আসসালামু আলাইকুম অয়ারহ্মাতুল্লাহি অয়াবারাকাতুহ। আমি আপনাদের খিদমতে সূরা আলে ঈমরানের ১৫৬ হতে ১৬০ নং পর্যন্ত মোট পাঁচটি আয়াত তিলাওয়াত ও সরল অনুবাদ পেশ করেছি। আল্লাহ পাক যেন আমাকে আপনাদের সামনে সঠিকভাবে দারস পেশ করার তাওফীক দান করেন। "অমা তাওফীকি ইল্লাহবিল্লাহ"।

সূরার নামকরণঃ অত্র সূরার ৩৩ নম্বর আয়াতে উল্লেখিত آلِ عِمْرَانَ শব্দ থেকেই এই সূরার নামকরণ করা হয়েছে। آلِ عِمْرَانَ অর্থ- 'ঈমরানের বংশধর', একেই প্রতীকী বা চিহ্ন হিসেবে সূরার নামকরণ করা হয়েছে,

কোনো শিরোনাম হিসেবে নামকরণ করা হয়নি। তবে যা কিছু করা হয়েছে তা ওহীর নির্দিশেই করা হয়েছে।

সূরাটি নাযিল হওয়ার সময়কাল ঃ আলোচ্য সূরাটি সর্বসম্মত মতে মাদানী। তবে একই সময় সম্পূর্ণ সূরাটি নাযিল হয়নি। মোট চারটি ভাষণে সূরাটি সমাপ্ত হয়েছে।

প্রথম ভাষণ ঃ সূরার প্রথম থেকে চতুর্থ রুকুর দ্বিতীয় আয়াত পর্যন্ত প্রথম ভাষণটি চলেছে। এই ভাষণটি সম্ভবতঃ বদর যুদ্ধের কাছাকছি সময় নাযিল হয়।

দ্বিতীয় ভাষণ ঃ এই ভাষণটি চতুর্থ রুকুর তৃতীয় আয়াত থেকে শুরু হয়ে ষষ্ঠ রুকুর শেষ পর্যন্ত চলেছে। নবম হিজরীতে নাজরানের প্রতিনিধি দলের আগমনের সময় এই ভাষণটি নাযিল হয়।

তৃতীয় ভাষণ ঃ এই ভাষণটি সপ্তম রুকু থেকে শুরু হয়ে দ্বাদশ রুকুর শেষ পর্যন্ত চলেছে। প্রথম ভষণের (অর্থাৎ বদর যুদ্ধের কাছাকছি সময়ের) সাথে সথেই এই ভাষণটি নাযিল হয় বলে মনে হয়।

চতুর্থ ভাষণঃ এই ভাষণটি ত্রৈদশ রুকু থেকে শুরু করে সূরার শেষ পর্যন্ত চলেছে। ওহুদ যুদ্ধের পর এই ভষণটি নাযিল হয়।

সূরাটির বিষয়বস্তু বা আলোচ্য বিষয় ঃ এই সূরায় দু'টি দলকে সম্বোধন করা হয়েছে। একটি দল হলো 'আহলি কিতাব' তথা ইহুদী-খৃষ্টান এবং দ্বিতীয় দলটি হলো রাসূলের অনুসারী 'মুসলমান'।

সূরার প্রথমে 'আহলি কিতাব' তথা ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে জোরালো ভাষায় তাদের আকীদাগত বিভ্রান্তি ও চারিত্রিক দোষ ত্রুটি সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে এবং রাসূল (সঃ) ও আল কুরআনকে মেনে নেয়ার আহবান জানানো হয়েছে।

দ্বিতীয় দল অর্থাৎ রাসূল (সঃ) এর অনুসারী মুসলমানদেরকে শ্রেষ্ঠতম দলের মর্যাদার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদের মহান দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে। সত্যের পতাকা বহন এবং বিশ্ব মানবতার সংস্কার ও সংশোধনের জন্য পরবর্তী উম্মতদের ধর্মীয় ও চারিত্রিক অধঃপতনের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরে তাদের পাদাঙ্কানুসরণ না করে দূরে থাকার জন্য সতর্ক করা হয়েছে। একটি সংস্কারবাদী দল হিসেবে তারা কিভাবে কাজ করবে এবং যেসব

'আহলি কিতাব' ও মুনাফিক মুসলমানেরা আল্লাহর দ্বীনের পথে নানা ধরনের বাধা সৃষ্টি করছে তাদের সাথে কি আচরণ করতে হবে তাদেরকে সেই আচরণ শিখিয়ে দেয়া হয়েছে। ওহুদ যুদ্ধে মুসলমান দলটির মধ্যে যেসব দূর্বলতা দেখা দিয়েছিলো তার পর্যালোচনা ও দূর্বলতা দূর করার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

সূরাটি নাযিলের প্রেক্ষাপট বা কারণ ঃ সূরা আলে ঈমরানে ওহুদ যুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। এতে জানা যায় যে, মুসলিম বাহিনীর কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে এ যুদ্ধে প্রথম দিকে জয়লাভ করার পরও মুসলমানেরা সাময়িকভাবে পরাজয় বরণ করে। ৭০ জন সাহাবী শহীদ হন। অনেকে আহত হন এবং স্বয়ং নবী করীমও (সঃ) আহত হন। কিন্তু এসবের পরেও আল্লাহ্ তা'লা যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেন এবং শত্রুরা পিছু হটে যায়। এ সাময়িক বিপর্যের তিনটি কারণ খুজে পাওয়া যায় ঃ

এক. আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের নেতৃত্বে ৫০ জন তীরন্দাজ বাহিনীর গীরিপথ রক্ষার জন্য যেসব নির্দেশ রাসূলুল্লাহ (সঃ) জারি করেছিলেন, পারস্পারিক মতোভেদের কারণে তা শেষ পর্যন্ত পালিত হয়নি। মুসলিম বাহিনীর বিজয়ের ফলে ঐ তিরন্দাজ বাহিনীর কেউ কেউ বললো, রাসূলুল্লাহ এর নির্দেশ অনুযায়ী আমাদের এখানেই অটল থাকা উচিত। কিন্তু অধিকাংশের মত ছিলো, এখন এ জায়গায় অবস্থান করার কোনো প্রয়োজন নেই। রাসূলুল্লাহর এই নির্দেশ ছিলো সাময়িক। কাফিরদের গাণিমাতের মাল সংগ্রহ করা হচ্ছে, আমরা যদি তাদের সাথে গাণিমাতের মাল সংগ্রহ করার জন্য অংশ গ্রহণ না করি, তাহলে হয়তো তা হতে বঞ্চিত হবো। অতএব সবার সাথে মিলিত হয়ে গাণিমাতের মাল সংগ্রহণ করা উচিত বলে তীরন্দাজ বাহিনীর অধিকাংশ গীরিপথ ত্যাগ করা।

দুই. মুনাফিকদের দ্বারা স্বয়ং নবী করীম (সঃ) এর নিহত হবার সংবাদ ছড়িয়ে দিলে মুসলিম বাহিনীর মধ্যে ভীতি ও হতাশা সৃষ্টি হয়। ফলে সবাই মনোভাঙ্গা হয়ে পড়ে এবং কেউ কেউ নবী করীম (সঃ) কে রেখে পালাতে থাকে।

তিন. মদীনা শহরে অবস্থান করেই শত্রুদের মোকাবেলা করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর মতের বিষয়ে যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিলো, সেটাই ছিলো সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কাফিরদের মোকাবিলা

করার বিষয়ে নবী করীম (সঃ) যখন পরামর্শে বসেন তখন উপস্থিত সাহাবাদের অধিকাংশ মদীনার বাইরে গিয়ে মোকাবেলা করার পরামর্শ দেন। ফলে অধিকাংশ মতের ভিত্তিতে তিনি (সঃ) মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

মুসলমানদের এ তিনটি বিচ্যুতির কারণেই তাঁরা সাময়িক বিপর্যের সম্মখীন হয়েছিলেন। এই সূরাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলোর সমালোচনা করা হয়েছে এবং নবী করীম (সঃ) এর শাহাদাতের খবর এবং সাময়িক পরাজয়ের কারণে তাঁদের মধ্যে যে ভীতি ও হতাশা সৃষ্টি হয়েছিলো এবং সাহাবাদের নিহত হবার প্রসঙ্গে যেসব মন্তব্য করা হয়েছে, এসব সামগ্রীক বিষয় নিয়ে এ সূরাটি নাযিল হয়।

ব্যাখ্যা ঃ প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে দারস অনুধাবনের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য প্রদান করা হলো। এখন নিম্নে তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা পেশ করা হচ্ছে ঃ

ওহুদ যুদ্ধে যারা নিহত হয়েছিলো তাদের বিষয়ে কিছু মুমিনের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ তা'লা বলেন -

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقَالُوْا لِاِ خْوَا نِهِمْ اِذَا ضَرَبُوْا فِى الْاَرْضِ اَوْكَانُوْا غُزًّى لَّوْ كَانُوْا عِنْدَنَا مَا مَاتُوْا وَمَا قُتِلُوْا ج لِيَجْعَلَ اللهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِىْ قُلُوْبِهِمْ ط وَاللهُ يُحْىِ وَيُمِيْتُ ط وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা কাফিরদের মতো কথা বলো না। তাদের ভাই-বন্ধুরা পৃথিবীতে কোনো অভিযানে বের হলে কিংবা যুদ্ধে অংশ নিলে (আর সেখানে কোনো দুর্ঘটনায় পড়লে) তারা বলে, যদি তারা আমাদের কাছে থাকতো তাহলে তারা মারাও যেতো না এবং (যুদ্ধে) নিহতও হতো না। এ ধরনের কথাকে আল্লাহ্ তাদের মনের খেদ ও আক্ষেপের কারণে পরিণত করেন। অথচ আল্লাহই জীবন-মৃত্যু দান করেন এবং তোমাদের সমস্ত কর্মের উপর তিনি নজর রাখেন।

ওহুদ যুদ্ধে সাময়িকভাবে মুসলিম বাহিনীর পরাজয়ে অনেকে আহত ও নিহত হওয়ার ফলে এবং স্বয়ং সেনাপতি প্রাণপ্রিয় নবীর শহীদ হওয়ার

সংবাদে অনেকের মধ্যে কিছু মানবিক দুর্বলতা ও অপ্রাসঙ্গিক উক্তি (তাঁরা সাহাবী হওয়ার কারণে আল্লাহ্ তাঁদেরকে মাফ করে দিয়েছেন) যা এই সূরায় উল্লেখ করা হয়েছে এবং স্বয়ং আল্লাহ তা'লা তা পর্যালোচনা করেছেন। তাদের এসব উক্তি বা ধারণা কাফিরদের উক্তি বা ধারণাতুল্য। যেমন কাফিররা তাদের ভাই বা বন্ধু কিম্বা আত্মীয়-স্বজন সফরে বা কোনো অভিযানে বের হয়ে দূর্ঘটনায় পড়ে আহত হলে কিম্বা যুদ্ধে যেয়ে নিহত হলে বলে থাকে, যদি তারা সফরে কিম্বা অভিযানে না যেতো তাহলে তারা দূর্ঘটনায় পড়ে আহত হতো না কিম্বা যুদ্ধে যদি না যেতো তাহলে তারা প্রতিপক্ষের আঘাতে নিহত হতোনা। তাদের এই কথা-বার্তা বা উক্তি ভিত্তিহীন। তাদের এ ধরণের কথাবার্তা বা ভিত্তিহীন ধারণা মনের খেদ বা আক্ষেপ বৃদ্ধি ছাড়া আর কিছুই নয়। জীবন-মৃত্যুর মালিক তো আল্লাহ তা'লাই। অতএব হে মুমিনেরা! তোমরা এসব অসংলগ্ন কথাবার্তা বা উক্তি কেন কারো এবং মৃত্যু সম্পর্কে এসব ভ্রান্ত ধারণা কেন করো। কেউ অভিযানে বা সফরে বের হোক বা না হোক যদি তার ভাগ্যে দূর্ঘটনায় পড়া বা আহত হওয়া লিখা থাকে, তাহলে তো সে অন্যভাবেও আহত হতে পারে। আবার যুদ্ধে যাক বা না যাক, যদি তার মৃত্যু সময় এসে পড়ে তাহলে সেতো যুদ্ধে না যেয়েও মৃত্যুবরণ করতে পারে! কেউই মৃত্যুর হাত থেকে রেহায় পাবে না-মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার কোনো উপায়ও নেই। যেমন- মহান আল্লাহ একই সূরার ১৪৫ নং আয়াতে বলেন- وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلاَّ بِاِذْنِ اللهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلاً

"আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া কেউ মৃত্যু বরণ করতে পারে না-সেজন্য একটা সময় নির্ধারিত রয়েছে।"

সুতরাং আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ীই মানুষ মরে এবং বাঁচে। তিনি যা ভাগ্যে লিখে দিয়েছেন তা টলাবার কারো ক্ষমতা নেই।

বর্তমান সমাজেও দেখা যায়, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন কিংবা আত্মীয়-স্বজন ইসলামী আন্দোলন করলে কিম্বা আন্দোলনের কোনো কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ করলে, আর যদি সেই আন্দোলনে বা কর্মসূচীতে কোনো ঝুঁকি থাকে তাহলে একই ভাবে অভিভাবকরা বাড়ী হতে বের হতে দেয় না, আন্দোলন করতে বারণ করে, ঝুঁকিপূর্ণ কর্মসূচীতে যেতে বাধা সৃষ্টি করে।

যারা এরূপ করে এবং ধারণা করে যে, যদি সে এসব করে তাহলে আহত হতে পারে কিংবা নিহতও হতে পারে অথবা জেল-যুলুম হতে পারে। এ ধরনের ধারণা বা কাজ কোনো মুমিন করতে পারে না, এটা কুফরী ধারণা বা কাজ। আল্লাহ তা'লা যদি ভাগ্যে লিখে রাখেন তাহলে তো অন্য ভাবেও সে আহত অথবা নিহত হতে পারে কিংবা জেলে যেতে পারে।

অতঃপর পরবর্তী আয়াতে মহান আল্লাহ তা'লা যারা আল্লাহর দ্বীনের জন্য নিহত (শহীদ) হয় তাদের মর্যাদার কথা উল্লেখ করে বলেন-

وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ اَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ

যদি তোমরা আল্লাহর পথে নিহত হও অথবা (স্বাভাবিকভাবে) মারা যাও তাহলে তোমরা আল্লাহর যে রহমত ও ক্ষমা লাভ করবে তা এরা যা কিছু সঞ্চয় করে তার চেয়ে উত্তম।

অর্থাৎ আল্লাহর পথে নিহত (শহীদ) হওয়া বা মরে যাওয়া তাঁর ক্ষমা ও করুণা লাভেরই মাধ্যম এবং এটা নিশ্চিতভাবে দুনিয়া ও তার সমুদয় জিনিস হতে উত্তম। কেননা, এটা ক্ষণস্থায়ী এবং ওটা চিরস্থায়ী। চিরস্থায়ী জিনিসের তুলনায় ক্ষণস্থায়ী জিনিস বা মর্যাদা একেবারেই মূল্যহীন। যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় বা মারা যায়, তাদের মর্যাদা সম্পর্কে পবিত্র আল কুরআনে এবং হাদীসে অসংখ্য বর্ণনা রয়েছে। যেমন, মহান আল্লাহ একই সূরার ১৬৯ আয়াতে উল্লেখ করেন-

وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ اَمْوَاتاً ط بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ

"যাঁরা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদেরকে তোমরা কখনো মৃত মনে করো না। বরং তারা জীবিত এবং তারা তাদের রবের পক্ষ থেকে রিযিক লাভ করে থাকে।"

হাদীস শরীফে শহীদের মর্যাদার কথা উল্লেখ করে হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন। "নবী করীম (সঃ) বলেছেনঃ জান্নাতে প্রবেশের পর একমাত্র শহীদ ছাড়া আর কেউ-ই দুনিয়াতে ফিরে আসতে চাইবে না, অথচ তার জন্য দুনিয়ার সবকিছুই (জান্নাতে) থাকবে। সে

ফিরে এসে দশ দশবার শহীদ হবার জন্য আকাংখা করবে।কেননা, বাস্তবে সে শহীদের মর্যাদা সেখানে (জান্নাতে) দেখতে পাবে।" (সহীহুল বুখারী)

অন্য হাদীসে শহীদের অসংখ্য মর্যাদার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। "হযরত মিকদাদ ইবনে মা'দি কারিব (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহর নিকট শহীদের ছয়টি মর্যাদা রয়েছে। যেমন -

১. প্রথম রক্তপাতেই তার সমস্ত গোনাহ-খাতা মাফ করে দেয়া হবে।

২. জান্নাতে তাকে তার স্থান দেখানো হবে।

৩. তাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করা হবে।

৪. বড় ধরনের বিপদ-আপদ থেকে সে নিরাপদ থাকবে।

৫. তার মাথায় আকর্ষণীয় একটি মুকুট পরানো হবে যার এক একটি মনিমুক্তা দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা আছে তার চাইতে উত্তম হবে। আর টানা টানা চোখ বিশিষ্ট ৭২ জন হুরের সাথে তার বিয়ে দেয়া হবে।

৬. তাকে তার ৭০ জন আত্মীয়ের শাফায়া'তের জন্য অনুমতি দেয়া হবে। (মিশকাত)

এভাবে যারা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আল্লাহকে রাজি-খুশি করার জন্য তার পথে নিহত হবে তাদের জন্য দুনিয়া এবং আখিরাতে অসংখ্য মর্যাদা দেয়া হবে।

অতঃপর পরবর্তী আয়াতে মানুষ যেভাবেই মৃত্যু বরণ করুক না কেন সকলকে তার সামনেই সমাবেত হতে হবে বলে উল্লেখ করে মহান আল্লাহ বলেন- وَلَئِنْ مُتُّمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَا اِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُوْنَ

আর যদি তোমরা মৃত্যুবরণ করো কিংবা যুদ্ধে নিহত হও তবে তোমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর দিকেই সমবেত করা হবে।

অর্থাৎ মানুষ স্বভাবিক ভাবে বিছানাই শুয়ে মৃত্যু বরণ করুক বা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে শহীদ-ই হোক, যেভাবেই দুনিয়ার জগৎ থেকে বিদায় গ্রহণ করুক না কেন, অবশ্যই সকলকে আল্লাহর নিকট একত্রিত করা হবে। কেউ-ই তার সামনে হাজির হওয়া থেকে বাঁচতে পারবে না। তারপর তারা তাদের দুনিয়ার কর্মের ফল স্বচক্ষে দেখতে পাবে,তা ভালো কাজই হোক আর মন্দ কাজই হোক। আর তা যতো ছোটই হোক বা বড়ই হোক, সমস্ত আ'মল তার চোখের সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরা হবে।

অতঃপর পরবর্তী আয়াতে মহান আল্লাহ তা'লা স্বীয় নবী (সঃ) ও মুসলমানদের উপর যে অনুগ্রহ করেছেন তা তাঁদেরকে স্মরণ করে দিয়ে বলেন-

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَا نْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ج فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ط اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

(হে নবী!) এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ যে, আপনি তাদের প্রতি রহম দেলের। যদি আপনি কর্কষ ভাষী ও কঠোর দেলের হতেন, তাহলে তারা অবশ্যই আপনার চারপাশ থেকে সরে পড়তো। অতএব আপনি তাদের ত্রুটি মাফ করে দিন ও তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করুন এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। তারপর যখন কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন, তখন আল্লাহর উপর ভরসা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ ভরসাকারীদের ভালোবাসেন।

ওহুদ যুদ্ধে কোনো কোনো সাহাবীর পদস্খলন এবং যুদ্ধের মাঠে প্রিয় নবী (সঃ) কে ছেড়ে চলে যাবার ফলে মহানবী (সঃ) অন্তরে যে আঘাত পেয়েছিলেন-যদিও স্বভাবসুলভ ভাবে ক্ষমা, করুণা ও চারিত্রিক কোমলতার কারণে তিনি সাহাবীদের প্রতি কোনো ভর্ৎসনা বা তিরস্কার করেননি এবং কোনো প্রকার কঠোরতাও করেননি। কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলের সাহাবাগণের মনোতুষ্টির উদ্দেশ্যে এবং তাঁদের মনে যে দুঃখ ও অনুতাপ সৃষ্টি হয়েছিলো, সেসব বিষয় ধুয়ে মুছে পরিস্কার করে সামনে আরো বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে গণতব্যস্থলে পৌছার লক্ষ্যেই অত্র আয়াতে মহানবী (সঃ) কে আরো বেশী কোমলতা, করুণা ও দয়া দেখানোর হিদায়েত করা হয়েছে এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করারও নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

আয়াতে প্রিয় নবী (সঃ) এর কতিপয় বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে এবং ইসলামী আন্দোলনকে গন্তব্যে পৌছার জন্যে সঙ্গী-সাথীদের বিষয়ে কতিপয় দিক নির্দেশনাও দেয়া হয়েছে।

আয়াতের প্রথমেই এক বিস্ময়কর ভঙ্গিতে বলা হয়েছে,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ "এটা আল্লাহর বিশেষ মেহেরবানী যে", বলে এখানে দু'টি তাৎপর্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন-

এক. নবী করীম (সঃ) কে এসব বিষয়ের নির্দেশ এমন ভঙ্গিতে দেয়া হয়েছে যে, এসব গুণ-বৈশিষ্ট্য পূর্ব থেকেই তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিলো।

দুই. হে নবী (সঃ)! এসব গুণ বৈশিষ্ট্য পরিপূর্ণভাবে আপনার মধ্যে থাকা আমারই রহমতের ফল। কারো ব্যক্তিগত কৃতিত্ব নয়। 'রহমত' শব্দটিকে সাধারণভাবে ব্যবহার করে রহমতের মাহাত্ম ও ব্যাপকতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এতে একথাও স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, এ রহমত শুধু সাহাবায়েকিরামদের জন্যই নয়, বরং স্বয়ং নবী করীম (সঃ) এর জন্যও রয়েছে। আর এই রহমতের কারণেই হে নবী! আপনাকে বিভিন্ন গুণ বৈশিষ্টে পরিপূর্ণতা দান করা হয়েছে। যেমন-

প্রথমত ঃ لِنْتَ لَهُمْ - "আপনি তাদের প্রতি নরম দেলের।" অর্থাৎ হে নবী (সঃ)! আল্লাহর রহমতে আপনি নরম দেলের-কোমল স্বভাবের। এখানে আল্লাহ তা'লা স্বীয় নবীর (সঃ) উপর ও মুসলমানদের উপর যে অনুগ্রহ করেছেন তা তাঁদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, নবী (সঃ) কে মান্যকারী ও তাঁর অবাধ্যতা হতে বহুদূরে অবস্থানকারীদের জন্য তিনি স্বীয় নবী (সঃ) এর অন্তরকে কোমল করে দিয়েছেন। তাঁর দয়া না হলে নবীর দেল এতো কোমল হতো না।

দ্বিতীয়ত ঃ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَا نْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ

"আর যদি আপনি কর্কষভাষী এবং কঠোর দেলের হতেন তাহলে তাঁরা আপনার পাশ থেকে সরে পড়তো।" এখানে فَظًّا শব্দের অর্থ 'কর্কষভাষী'। আর غَلِيْظَ الْقَلْبِ এর অর্থ হলো, 'কঠোর দেল বা কঠিন হৃদয়'। অর্থাৎ কারো বা কোনো নেতার পাশ থেকে সরে যাওয়া কিংবা মুখ ফিরে নেয়ার দু'টি খারাপ গুণের কথা বলা হয়েছে- একটি হলো, কর্কষভাষী বা মেজাজী। আর অপরটি হলো, কঠিন বা কঠোর দেল বা হৃদয়। অতএব হে নবী (সঃ)! আপনি যদি কর্কষভাষী ও কঠোর বা কঠিন

হৃদয়ের হতেন তাহলে আপনার পাশ হতে আপনার সঙ্গী-সাথীরা বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তো এবং আপনাকে ত্যাগ করে দূরে সরে যেতো। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাঁদের অন্তরে আপনার প্রতি এমন প্রেম ও ভালবাসা স্থাপন করে দিয়েছেন যে, আপনার জন্য তাঁরা নিজের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করে দেয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। আর এই জন্যেই আল্লাহ্ তা'লাও তাঁদের দিক হতে আপনাকেও প্রেম ও নম্রতা দান করেছেন।

অতঃপর নবী করীম (সঃ) কে তাঁর সঙ্গী-সাথীদের বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন ঃ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ - "অতএব আপনি তাঁদেরকে মাফ করে দিন এবং তাঁদের জন্য মাগফিরাত কামনা করুন।"

অর্থাৎ হে নবী (সঃ)! গীরিপথে পাহারায় নিয়োজিত ৫০ জন তীরন্দাজ বাহিনীর অধিকাংশ আপনার নির্দেশকে উপেক্ষা করে গীরিপথের পাহারা ছেড়ে দিয়ে গাণিমাতের মাল সংগ্রহ করার কাজে নিয়োজিত হওয়ার এই ত্রুটি, আর তাঁদের এই ভুলের কারণেই ৭০ জন সাহাবীর শাহাদাৎ, আপনিসহ অসংখ্য সাহাবীর আহত হওয়া এবং আপনাকে যুদ্ধের ময়দানে ফেলে রেখে পলায়ন করায় আপনি যে মানসিক এবং শারিরীক ভাবে আঘাত প্রাপ্ত হয়েছেন এজন্য আপনি তাঁদের প্রতি কঠোর আচরণ না করে কোমলতা প্রদর্শন করুন এবং তাঁদের মানবিক দূর্বলতা ও ত্রুটিকে নিজেও মাফ করে দিন এবং তাঁদের অপরাধের জন্য আল্লাহর কাছেও মাগফিরাতের দোয়া করুন।

অতঃপর পরবর্তী বাক্যে নবী (সঃ) কে নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে- وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ " আর তাঁদের সাথে কাজে-কর্মে পরামর্শ করুন।"

হে নবী (সঃ)! ইতোপূর্বে যেভাবে তাঁদের সাথে কাজে-কর্মে এবং কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পরামর্শ করতেন, তেমনিভাবে এখনও তাদের সাথে পরামর্শ করুন, যাতে তাঁদের মনে প্রশান্তি আসে।

উল্লেখিত আয়াতে মহানবী (সঃ) কে প্রথমে তো সাহাবীদের সাথে পরামর্শ গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, অতঃপর আচরণ-পদ্ধতি সম্পর্কে হিদায়েত দেয়া হয়েছে।

পরামর্শ গ্রহণ সম্পর্কে পবিত্র আল-কুরআনে সরাসরি দু'জায়গায় নির্দেশ দেয়া হয়েছে। একটি হলো- এই আয়াতে এবং দ্বিতীয়টি হলো-

সূরা আশ্ শুরা'র সে আয়াত যাতে সত্যিকার মুসলমানদের গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে একটি গুণ এই বলা হয়েছে যে, وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ "তাদের প্রতিটি কাজ হবে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে।" (আয়াত -৩৮) অর্থাৎ তারা যেমন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাজে পরামর্শ করবে, তেমনি ইসলামী সংগঠন পরিচালনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও পরামর্শ গ্রহণ করবে, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে পারিবারীক কাজেও পরামর্শ করবে।

"সকল কাজে তাদের সাথে পরামর্শ গ্রহণ করো"-মহান আল্লাহর এই নির্দেশের কারণেই সাহাবীগণকে সন্তুষ্ট রাখার উদ্দেশ্যে মহানবী (সঃ) সকল কাজে তাঁদের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন এবং এটা তাঁর অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিলো।

তাফসীরে ইবনে কাসীরে আল্লাহর রাসূল (সঃ) এর বিভিন্ন কাজে পরামর্শ গ্রহণ করার বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। যেমন- বদরের যুদ্ধের দিন শত্রুবাহিনীর দিকে ধাবমান হওয়ার জন্যে তিনি সাহাবীগণের নিকট পরামর্শ নেন। তখন তাঁরা বলেছিলেন, হে নবী (সঃ)! যদি আপনি আমাদেরকে সমুদ্রের তীরে দাঁড় করিয়ে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সমুদ্র পাড়ি দেয়ারও নির্দেশ দেন, তবুও সে নির্দেশ পালনে আমরা মোটেই দ্বিধাবোধ করবো না। আর যদি আপনি আমাদেরকে 'বাবকুল গামাদ' পর্যন্ত নিয়ে যেতে ইচ্ছে করেন, তাহলেও আমরা দ্বিধাহীন চিত্তে আপনার সাথে রওয়ানা হয়ে যাবো। আমরা হযরত মুসা (আঃ) এর সাথীদের ন্যায় 'তুমি ও তোমার প্রভু যুদ্ধ করো, আমরা এখানে বসে থাকছি'-এরূপ কথা কখনও মুখে আনবো না। বরং আমরা আপনার ডানে-বামে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে শত্রুদের মোকাবেলা করবো। এভাবে যুদ্ধে অবতরণের জায়গা কোথায় হবে তিনি তারও পরামর্শ করেন। এতে হযরত মুনজির ইবনে আমর (রাঃ) পরামর্শ দেন যে, আগে বেড়ে তাদের (শত্রুদের) সামনে হতে হবে।

অনুরূপভাবে ওহুদের যুদ্ধেও পরামর্শ নেন যে, মদীনার ভিতরে থেকেই যুদ্ধ করতে হবে, না বাইরে গিয়ে মুশরিকদের মোকাবিলা করতে হবে ? অধিকাংশ লোক মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করারই মতামত দেন। ফলে তিনি তাই করেন।

পরিখার (খন্দকের) যুদ্ধেও রাসূলুল্লাহ (সঃ) সঙ্গী-সাথীদের সাথে পরামর্শ করেন যে, মদীনার উৎপাদিত ফলের এক তৃতীয়াংশ প্রদানের অঙ্গিকারে বিরোধী দলের সাথে সন্ধি করা হবে, কি হবে না? হযরত সা'দ ইবনে উবাদাহ (রাঃ) এবং সা'দ ইবনে মুআজ (রাঃ) এটা প্রদানে অস্বীকার করেন এবং তিনিও এ পরামর্শ গ্রহণ করেন ও সন্ধি করা থেকে বিরত থাকেন।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) হুদায়বিয়াতেও তাঁর সঙ্গীদের সাথে পরামর্শ করেন যে, মুশরিকদেরকে আক্রমন করা হবে কি, হবে না? তখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) বলেন, আমরা যুদ্ধ করতে আসিনি, উমরা পালন করাই আমাদের উদ্দেশ্য, আল্লাহর রাসূল (সঃ) এই মতই গ্রহণ করে নেন।

মুনাফিকরা যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর প্রাণপ্রিয় স্ত্রী হযরত আয়িশা সিদ্দিকা (রাঃ) এর উপর অপবাদ দেয় তখন তিনি বলেন, 'হে মুসলমান ভাইয়েরা! যেসব লোক আমার স্ত্রীর দুর্ণাম করছে তাদের ব্যাপারে আমি কি করতে পারি, তোমরা আমাকে এই বিষয়ে পরার্মশ দাও। আল্লাহর শপথ! আমার জানামতে তো আমার স্ত্রীর কোনো দোষ নেই। আর যে লোকটার সাথে অপবাদ দিচ্ছে, আল্লাহর কসম! সেও তো আমার মতে ভালো লোক বটে। হযরত আয়িশা (রাঃ) কে পৃথক করার বিষয়ে তিনি হযরত আলী ও হযরত উসামা (রাঃ) এর পরামর্শ গ্রহণ করেন।

মোট কথা যুদ্ধ সম্পর্কীয় কাজ এবং অন্যান্য কাজেও রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবাগণের সাথে পরার্মশ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। (ইবনে কাসির)

এভাবে তিনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর স্ত্রীদের নিকটও পরামর্শ নিতেন, যেমন সিরাত গ্রন্থে পাওয়া যায়, হুদায়বিয়ার সন্ধির একমূখী অপমানকর চুক্তি যখন সাহাবাগণ মেনে নিতে পারছিলেন না, এমতাবস্থায় চুক্তি মোতাবেক মক্কায় না গিয়ে মদীনায় ফিরে যাবার জন্য রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর সঙ্গীদের হুদায়বিয়াতেই মাথা মুন্ডণ ও কুরবানী করার ঘোষণা দিলেন, তখন অপমান এবং মনোবেদনার কারণে সাহাবাগণ তাঁর কথায় সাড়া না দেয়ায় রাসূলুল্লাহ (সঃ) পেরেশান হয়ে তাবুতে প্রবেশ করেন ও তাঁর স্ত্রীর নিকট পরামর্শ চান তাঁর যুদ্ধের সফর সঙ্গী বিচক্ষণা স্ত্রী উম্মে সালমা (রাঃ) তাঁকে পরামর্শ দেন যে, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি নিজেই সেই কাজ আরম্ভ করে দিন, দেখবেন আপনার প্রাণপ্রিয় অনুগত

সাহাবাগণও সেই আ'মল শুরু করে দিবেন। নবী করীম (সঃ) তাঁর স্ত্রীর পরামর্শে তাই করলেন।

পরামর্শ গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যক্তি বাছাই ঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যারতার সাথে পরামর্শ করা উচিত নয়। পরামর্শ দাতার জ্ঞান, দুরদর্শীতা, বিচক্ষণতা, বিশ্বস্ততা ও অভিজ্ঞতার দিকে লক্ষ্য রেখেই ব্যক্তি বাছাই করে পরামর্শ নেয়া উচিত। যেমন- সুনানে ইবনে মাজায় বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ যার নিকট পরামর্শ গ্রহণ করা যায়, সে হবে একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি।

তাফসীরে ইবনে কাসীরে উল্লেখ রয়েছে, পরামর্শ গ্রহণ করার উল্লেখিত এ আয়াতে (শায়খাইন) হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রাঃ) এর সাথে পরামর্শ করার নির্দেশ রয়েছে। (হাকিম) কেননা, এ দু'জন সহচর-ই ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সাহায্যকারী ও পরামর্শদাতা। আর ঐ দু'জনই ছিলেন মুসলমানদের পিতৃতুল্য। (কালবী)

মুসনাদ-ই আহমাদে বর্ণনা রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ দু'জন সাহাবীকে বলেছিলেন, কোনো কাজে যদি তোমরা দু'জন একমত হয়ে যাও তবে আমি কখনও তোমাদের বিপরীত মত পোষণ করবো না।

পরামর্শ দেয়ার ক্ষেত্রে কল্যাণকর পরামর্শ দেয়া ঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ তার ভাইয়ের নিকট কোনো পরামর্শ চায়, তখন যেন সে তাকে ভালো (কল্যাণকর) পরামর্শ দেয়।

(আল্লামা ইবনে কাসির)

পরামর্শের উপকারীতাঃ পরামর্শ করে কাজ করার উপকারীতা এবং কল্যাণকারীতা সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়, যেমন হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস-

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ

"রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যে পরামর্শ করে কাজ করবে সে লজ্জিত হবে না।" (আল মুজামুস সগীর)

অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায়, যদি কেউ পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আর যদি তা ভুলও হয়, তবুও সে একটি নেকী পাবে।

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সঃ) পরামর্শ করাকে রহমত বলে উল্লেখ করেছেন। (বায়হাকী)

পরামর্শ ছাড়া আমীরের শপথ বৈধ নয়। এ বিষয়ে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে-

يَقُوْلُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَايَعَ اَمِيْرًا عَنْ غَيْرِ مَشْوَرَةِ الْمُسْلِمِيْنَ فَلاَ بَيْعَةَ لَهُ وَلاَ لَّذِىْ بَايَعَهُ

"রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মুসলমানদের পরামর্শ ছাড়া আমীর হিসেবে বাইয়াত (শপথ) নিবে তার শপথ বৈধ হবে না। আর যারা তার ইমারতের বাইয়াত গ্রহণ করবে তাদের বাইয়াতও বৈধ হবে না"।

(মুসনাদ-ই আহমাদ)

হযরত উমর (রাঃ) বলেন ঃ لاَخِلاَ فَةَ اِلاَّ عَنْ مَشُوْرَةَ

"পরামর্শ ছাড়া কোনো খিলাফত হতে পারে না।" (কানযুল উম্মাল)

অতঃপর আয়াতের সর্বশেষে মহান আল্লাহ তা'লা সিদ্ধান্ত হয়ে যাবার পরের নীতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন-

فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ط اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

অতঃপর (হে নবী!) যখন কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন, তখন আল্লাহর উপর ভরসা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'লা ভরসাকারীদের ভালোবাসেন।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে জিজ্ঞেস করা হয়- عَزْمٌ শব্দের অর্থ কি ? জবাবে তিনি বলেন, জ্ঞানীদের পরামর্শক্রমে যখন কোনো কাজের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে যাবে তখন তা মেনে নেয়া। (ইবনে মিরদুইয়া)

অর্থাৎ পরামর্শদানকারী জ্ঞানী-গুণীদের মতামতের ভিত্তিতে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে যাবে, সেই সিদ্ধান্তের উপর সিদ্ধান্তদানকারী আমীর বা নেতাকে অটল-অবিচল থাকতে হবে। সেইজন্য আয়াতে عَزَمْتَ (আযামতা) একবচন শব্দ ব্যবহার করে রাসূল (সঃ) কে বুঝিয়েছেন, عَزَمْتُمْ (আযামতুম) বহুবচন শব্দ ব্যবহার করে সাহাবাদেরকে বুঝানো হয়নি। কেননা, নেতা তো হয় একজনই।

অর্থাৎ হে নবী (সঃ)! আপনি যখন আপনার সহচর সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন, তখন সেই সিদ্ধান্তের উপর অটল-অবিচল থাকুন এবং সম্মিলিত এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল বা নির্ভর করুন। কেননা, আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল বা নির্ভর করা ছাড়া কোনো পরিকলাপনা কিংবা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। আর যারা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য আল্লাহর উপর ভরসা করে আল্লাহ তাদেরকেই ভালোবাসেন, মহব্বত করেন এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য সাহায্যও করেন।

হাদীসে বর্ণনা রয়েছে, যে কাজ পরামর্শ ছাড়াই করা হয় তাতে আল্লাহর সাহায্য থাকে না। আর যে কাজ পরামর্শ করে করা হয় তা বাস্তবায়নে আল্লাহর সাহায্য থাকে।

আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সিদ্ধান্তের উপর অটল-অবিচল থাকা ও আল্লাহর উপর ভরসা করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

অতঃপর আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কারো পক্ষেই বিজয় হওয়া সম্ভব নয় উল্লেখ করে পরবর্তী আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন-

اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۚ وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا
الَّذِىْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ

যদি তোমাদেরকে আল্লাহ সাহায্য করেন, তবে তোমাদের উপর কেউই বিজয়ী হতে পারবে না। আর যদি তিনি তোমাদেরকে ত্যাগ করেন, তাহলে এরপর কে এমন আছে তোমাদের সাহায্য করার মতো? কাজেই সাচ্চা মুমিনদের আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত।

পূর্বের আয়াতে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর ঐ গৃহীত সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়নের জন্য আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল বা ভরসার কথা বলা হয়েছে। কেননা, সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে আল্লাহর সাহায্যের প্রয়োজন। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা মোটেই সম্ভব নয়। তাই এই আয়াতে মহান আল্লাহ মুমিনদেরকে লক্ষ্য করে বলছেন, হে মুমিনরা! যদি আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেন অর্থাৎ তোমাদের পক্ষে

থাকেন তাহলে এমন কোনো পরাশক্তি নেই যে, তোমাদের উপর বিজয় লাভ করতে পারে, বরং তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা ঈমানদারীর সাথে বিজয়ের ব্যাপারে আল্লাহর উপরই পূর্ণভাবে তাওয়াক্কুল বা নির্ভর করতে পারো। তিনি আরো সতর্ক করে দিয়ে বলেন,আর যদি আল্লাহ তোমাদেরকে প্রত্যাখ্যান বা ত্যাগ করেন অর্থাৎ সাহায্যের হাত গুটিয়ে নেন, তাহলে দুনিয়াতে আল্লাহ ছাড়া এমন কোনো শক্তি নেই যে তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে! কাজেই প্রকৃত খাঁটি মুমিনদের বিজয়ের জন্য আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত।

এ সম্পর্কে সূরা তাওবার ৫১ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন-

قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَا اِلاَّ مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ج هُوَ مَوْلٰنَا ج وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ

"(হে নবী!) আপনি বলুনঃ আল্লাহ তা'লা আমাদের জন্য যা নির্ধারণ করে রেখেছেন, তাছাড়া আমাদের কাছে আর কিছুই পৌঁছবে না। তিনি আমাদের অভিভাবক। আল্লাহর উপরই মুমিনদের ভরসা করা উচিত।"

আল্লাহর উপর মুমিনদের কিভাবে ভরসা করা উচিত সেই বিষয়ে একটি চমৎকার হাদীস বর্ণিত আছে। হাদীসটি হযরত উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। "তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে বলতে শুনেছি। যদি তোমরা হক আদায় করে (আল্লাহর উপর) তাওয়াক্কুল বা ভরসা করতে তাহলে তিনি পাখির রিযিক দেওয়ার মতই তোমাদেরকেও দিতেন। পাখি তো সকাল বেলা খালি পেটে বের হয়ে যায় এবং সন্ধ্যায় ভরা পেটে ফিরে আসে।" (জামে'আত্ তিরমিযী)

সুতরাং মুমিন যদি আল্লাহর উপর এভাবে তাওয়াক্কুল বা ভরসা করে তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তাদের হয়ে যাবেন এবং বিজয় অর্জিত হয়ে যাবে।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়ার কোনো শক্তি নয় বরং পূর্ণভাবে তাঁর উপরই তাওয়াক্কুল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

শিক্ষাঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা আলে ঈমরানের ১৫৬ থেকে ১৬০ নং পর্যন্ত মোট পাঁচটি আয়াতের বিস্তারিত দারস পেশ করা হলো। এখন এতে আমাদের জন্য কি কি শিক্ষা রয়েছে তা আমরা আলোচনা করবো। কেননা, আল কুরআনের প্রতিটি আয়াত বা সূরা কেবল আল্লাহর রাসূল (সঃ) এবং সমসাময়িক তাঁর সাহাবাগণের জন্যই অবতীর্ণ হয়নি বরং আল্লাহর নবীর মাধ্যমে গোটা বিশ্ব জাহানের মানবকুলের জন্যই নাযিল হয়েছে। তা যতই আধুনিক থেকে অত্যাধুনিক অথবা ডিজিটাল কিংবা প্রযুক্তির যুগ হোক না কেন? তাতে সকল কালের সকল যুগের মানুষের জন্যই শিক্ষা রয়েছে। অতএব আমরা এখন আলোচনা করবো এই আয়াতসমূহের শিক্ষণীয় বিষয়গুলো কি কি ঃ

১. কোনো মুমিনের একথা বলা বা ধারণা করা উচিত নয় যে, পিতা বা ছেলে কিংবা আত্মীয়-স্বজন যদি অভিযানে বা সফরে না যেতো কিংবা বাইরে বের না হতো বাড়ীতে অবস্থান করতো, তাহলে সে দুর্ঘটনায় পড়তো না কিংবা মারাও যেতো না। অথবা একথা বলা বা ধারণা করা উচিত হবে না যে, যদি আমার পিতা/মাতা/ভাই/বোন/সন্তান-সন্ততি জিহাদে তথা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন-সংগ্রামে জড়িত না থাকতো অথবা এ ধরণের কোনো কর্মসূচীতে যোগ না দিতো তাহলে সে আহত হতো না অথবা জেলে যেতো না কিংবা নিহত ও (শহীদ) হতো না। এসব কথা বা ধারণা হলো কুফরী কথা বা ধারণা। কোনো মুমিন এ ধরনের কথা বলতে বা ধারণা পোষণ করতেই পারে না। কেননা, জীবন-মরনের মালিক একমাত্র আল্লাহ্ তা'লা। যার যখন যেখানে যেভাবে মৃত্যু লিখা থাকবে তখন তার সেখানে সেভাবে মৃত্যু হবেই, কেউই ঠেকাতে পারবে না।

২. মুমিনদের আরো বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আমরা যখন যে কার্জকলাপ-ই করি নাই কেন, আল্লাহ তা তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে পরখ করছেন। আল্লাহর দৃষ্টির অগোচরে আমরা কোনো কিছুই করতে পারবো না- কোনোভাবেই আল্লাহর দৃষ্টিকে এড়াতে পারবো না।

৩. যারা 'ফি সাবিলিল্লাহ' বা আল্লাহর পথে তথা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করতে যেয়ে নিহত হয় অর্থাৎ শহীদ হয় অথবা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরীক থেকে শহীদ না হয়ে স্বাভাবিক মৃত্যুও হয় তাহলে তারা দু'টি মর্যাদা লাভ করবে। তার একটি হলো, তারা আল্লাহর রহমত লাভ করবে এবং দ্বিতীয়টি হলো, মাগফিরাত বা ক্ষমা লাভ করবে, যা দুনিয়াদারদের অর্জিত ও সঞ্চিত সম্পদের চেয়েও অনেক অনেক উত্তম।

৪. প্রতিটি মুমিনের এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, যারা দুর্ঘটনায় পড়ে কিংবা স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যু বরণ করে এবং যারা জিহাদ-সংগ্রাম করতে করতে নিহত হয় বা শহীদ হয়, সকলকেই কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে জমায়েত হতেই হবে।

৫. আন্দোলন-সংগ্রাম করতে যেয়ে যদি আনুগত্যশীল কর্মীরা বা অধিনস্থরা মানবিক দূর্বলতা অথবা দুষমনদের আক্রমনের ভয়ে কিংবা অনুকূল পরিবেশে আবেগের বসে সীমালংঘণ বা ভুল-ত্রুটি কিংবা অপরাধ করে ফেলে তাহলে আমীর বা নেতাকে কয়েকটি কাজ করতে হবে।

ক. তাদের প্রতি কর্কষভাষা প্রয়োগ কিংবা কঠোরতা আরোপ না করে সহানুভুতিশীল হতে হবে।

খ. যদি তারা তাদের স্বীয় দূর্বলতা, ভুল-ত্রুটি ও অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হয় তাহলে তাদেরকে মাফ করে দিতে হবে এবং তাদের এই ঈমানী দূর্বলতা, ত্রুটি ও অপরাধের জন্য আল্লাহর কাছে মাগফিরাত কামনা করতে হবে। তবে যদি কেউ নিজের দূর্বলতা, ভুল কিংবা অপরাধ স্বীকার না করে এবং অনুতপ্ত না হয়, তাহলে তাদের বিষয়ে সাংগঠনিকভাবে অবশ্যই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

গ. ইসলামী সংগঠনের উপর থেকে নীচ স্তর পর্যন্ত পরিকল্পনা গ্রহণ এবং যে কোনো সিদ্ধান্ত পরামর্শের ভিত্তিতে হতে হবে। এছাড়াও পারিবারীক, সামাজীক এবং অন্যান্য সংস্থার কাজের ক্ষেত্রেও পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। তবে পরামর্শ দেয়া-নেয়ার ক্ষেত্রে নিম্নের নীতিমালা মেনে চলতে হবে। যেমন-

* যাদের সাথে পরামর্শ করা হবে তারা জ্ঞানী, বিচক্ষণ, দুরদর্শী হবে ও তাদের মধ্যে পরিবেশ বিশ্লেষণী শক্তি থাকতে হবে এবং তারা বিশ্বস্ত হবে। এধরনের মানসম্মত মহীলাদের সাথেও পরামর্শ করা যাবে। যেমন নবী করীম (সঃ) হুদায়বিয়ায় তাঁর স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করেছিলেন।

* যারা পরামর্শ দেবেন তাদেরকে অবশ্যই ভালো কল্যাণকর পরামর্শ দিতে হবে। মনের মধ্যে কোনো প্রকার কুট-কৌশল রাখা যাবে না। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার মানসিকতা নিয়েই পরামর্শ দিতে হবে।

* পরামর্শ করে কোনো পরিকল্পনা কিংবা সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে পরামর্শ দাতা যেমন সন্তুষ্ট চিত্তে তা মেনে নিবে, তেমনি গৃহীত পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে তার সতস্ফুর্ত অংশ গ্রহণও থাকতে হবে।

* পরামর্শের ভিত্তিতে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে, সেই সিদ্ধান্তের উপর সভাপতি বা আমীর বা নেতাকে অনঢ় থাকতে হবে, তাতে যতই প্রতিকূল পরিবেশ হোক না কেন। বার বার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা নেতৃত্বের দূর্বলতারই লক্ষণ। তবে হাঁ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য কর্মকৌশল পরিবর্তন করা যেতে পারে। আশপাশের যাকেই বিশস্ত এবং যোগ্য পাওয়া যাবে তাদের সাথে তাৎক্ষণিক ভাবে পরামর্শ করে নিতে হবে। যদি এমন পরিবেশ হয় যে, সেই সুযোগও পাওয়া যাচ্ছে না তাহলে নেতৃত্ব এককভাবে সিদ্ধান্ত দিতে পারবেন। তবে পরামর্শ ভিত্তিক গৃহীত সিদ্ধান্ত থেকে নেতৃত্ব পিছে সরে আসবেন না।

* পরামর্শের ভিত্তিতে কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ কিংবা সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর আল্লাহর উপর ভরসা করতে হবে এবং তারই সাহায্য কামনা করতে হবে। কেননা, আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত বাস্ত বায়ন করা কোনো ভাবেই সম্ভব নয়।

৬. প্রতিটি মুমিন মুজাহীদের এই আত্মবিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহর সাহায্য ছাড়া দ্বীন বিজয় হওয়া মোটেই সম্ভব নয়। আল্লাহকে বাদ দিয়ে বৈষয়িক কোনো বস্তু বা শক্তির উপর নির্ভর করা ঠিক নয়। কেননা, আল্লাহ ছাড়া এমন কোনো শক্তি বা পরাশক্তি নেই যে বিজয়ের জন্য সাহায্য করতে পারে। এটাও বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ যদি বান্দাহর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে ত্যাগ করে সাহায্য বন্ধ করে দেন, তাহলে এমন কোনো শক্তি নেই যে, তাদেরকে সাহায্য করতে পারে।

৭. মানুষ হচ্ছে তাড়াহুড়ো প্রবণ! কোনো কাজের ফলাফল তাৎক্ষণিক পেতে চায়। কিন্তু এটা ধৈর্যশীল মুমিনের বৈশিষ্ট্য নয়। ধৈর্যশীল প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্যই হলো, সর্বশক্তি দিয়ে কাজ করা, তারপর ফলাফল পাওয়ার জন্য আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল বা ভরসা করা।

আহ্বান ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা আলে ঈমরানের ১৫৬ থেকে ১৬০ পর্যন্ত আয়াতের যে দারস পেশ করা হলো এতে যদি আমার অজান্তে কোনো ত্রুটি বা বাড়াবাড়ি হয়ে যাই, তার জন্য আল্লাহ্ তা'লার নিকট ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর এই দারস থেকে যেসব শিক্ষা আমরা লাভ করলাম তা যেন বাস্তব জীবনে আমরা পালন করতে পারি সেই তাওফীক কামনা করে দারস শেষ করছি।

পাঁচ

হকদারের আমানত ফেরৎ দেয়া। ন্যায়নীতির সাথে মিমাংসা করা। আল্লাহ, রাসূল এবং আমীরের আনুগত্য করা। কোনো বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দিলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের দিকে ফিরে যাওয়া।

সূরা আন্ নিসা- ০৪

আয়াত-৫৮-৫৯

نَحْمَدَهُ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّ اللهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوْا الْاَمٰنٰتِ اِلٰى اَهْلِهَا لا وَاِذَا
حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ط اِنَّ اللهَ نِعِمَّا
يَعِظُكُمْ بِهٖ ط اِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيْعًا م بَصِيْرًا ○ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ
فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ
كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط ذٰلِكَ
خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلاً ○

সরল তরজমা ঃ ইরশাদ হচ্ছে- (৫৮) (হে মুসলিমগণ!) নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় আমানত তার হকদারের হাতে ফেরৎ দেয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন। আর তোমরা মানুষের মাঝে বিচার-মিমাংসা করার সময় আ'দল বা ন্যায়নীতির সাথে ফায়সালা করো। আল্লাহ তোমাদেরকে সদুপদেশ

দান করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সবকিছু শোনেন ও দেখেন। (৫৯) হে ঈমানদারগণ! আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রাসূলের এবং সেইসব লোকের যারা তোমাদের মধ্যে দায়িত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী। অতঃপর যদি তোমাদের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতোবিরোধ দেখা দেয়, তাহলে তাকে আল্লাহ্ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাকো। আর এটাই কল্যাণকর কর্মপদ্ধতি এবং পরিণতির দিক দিয়েও অতি উত্তম।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ اِنَّ اللهَ - নিশ্চয়ই আল্লাহ। يَأْمُرُكُمْ - তোমাদের নির্দেশ দেন। اَنْ تُؤَدُّوْا - যেন তোমরা সমার্পণ করো/ফিরিয়ে দাও। اَلْاَمٰنٰتِ - গচ্ছিত সম্পদ। اِلٰى - দিকে/নিকট। اَهْلِهَا - উহার প্রাপক। وَ - এবং। اِذَا - যখন। حَكَمْتُمْ - তোমরা বিচার-মিমাংসা করো। بَيْنَ النَّاسِ - মানুষের মধ্যে। اَنْ تَحْكُمُوْا - যেন তোমরা ফয়সালা বা মিমাংসা করো। بِالْعَدْلِ - ন্যায়নীতির সাথে। اِنَّ اللهَ - নিশ্চয়ই আল্লাহ। نِعِمَّا يَعِظُكُمْ - তোমাদের সদুপদেশ দেন। سَمِيْعًا - সবকিছু শুনেন। بَصِيْرًا - সবকিছু দেখেন। يَاَيُّهَا - ওহে/হে। اَلَّذِيْنَ - যারা। اٰمَنُوْا - ঈমান এনেছো/ঈমানদাররা। اَطِيْعُوا اللهَ - তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো। وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ - এবং রাসূলের আনুগত্য করো। اُولِى الْاَمْرِ - দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃত্বশীলদের। مِنْكُمْ - তোমাদের মধ্যে। فَاِنْ - অতঃপর যদি। فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ -অতঃপর যদি তোমারা মতোভেদ করো। فِىْ شَيْءٍ -কোনো বিষয়ে। فَرُدُّوْهُ - তবে তা ফিরিয়ে দাও। اِلَى اللهِ - আল্লাহর দিকে। اِنْ كُنْتُمْ- যদি তোমরা হয়ে থাকো। تُؤْمِنُوْنَ - তোমরা ঈমানদার। يَوْمَ الْاٰخِرِ -আখিরাতের দিনের।

ذٰلِكَ - ঐটা /এরূপ। خَيْرٌ - কল্যাণকর। اَحْسَنُ - অতি উত্তম। تَاْوِيْلاً - পরিণতি/পরিসমাপ্তি।

সম্বোধন ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সম্মানিত ভাইয়েরা/বোনেরা! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু। আমি আপনাদের খিদমতে পবিত্র কালামে হাকীম আল কুরআনের সূরা আন্ নিসা-র ৫৮ ও ৫৯ ২টি আয়াত তিলাওয়াত ও অনুবাদ পেশ করেছি। মহান আল্লাহ্ পাক যেন আমাকে আপনাদের সামনে সঠিকভাবে দারস পেশ করার তাওফীক দান করেন। আমীন।

সূরাটির নামকরণ ঃ আলোচ্য সূরার প্রথম আয়াতে উল্লেখিত وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءً এর نِسَاءً শব্দটিকে সূরার নাম হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে। نِسَاءً অর্থ হলো 'স্ত্রীলোক'। তবে এই নামকরণ কোনো শিরোনাম হিসেবে করা হয়নি, বরং প্রতীকী বা চিহ্ন হিসেবেই করা হয়েছে।

সূরাটি নাযিল হওয়ার সময়কাল ঃ সর্বসম্মতিক্রমে সূরাটি মাদানী। তবে সূরাটি একই সময় নাযিল হয়নি। কয়েকটি ভাষণে নাযিল হয়েছে। সূরাটির বিষয় এবং ঘটনার দিকে লক্ষ্য করলে বুঝা যায়, ওহুদ যুদ্ধের পর অর্থাৎ তৃতীয় হিজরীর শেষের দিক হতে পঞ্চম হিজরীর প্রথম দিকের সময়কালের বিভিন্ন সময় এর বিভিন্ন অংশ নাযিল হয়।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য ঃ মহানবী (সঃ) এর মদীনায় ইসলামী সমাজ গঠনের দু'তিন বছর অতিবাহিত হয়ে যাবার পর সূরাটি নাযিল হয় বিধায় এই সূরাতে ইসলামী সমাজের নিয়ম-কানুন ও বিধি-বিধান সম্পর্কীত বিষয়গুলোই বেশী আলোচিত হয়েছে। এই সূরায় পরিবার গঠনের নীতি বর্ণনা করা হয়েছে এবং সমাজের নারী ও পুরুষের সম্পর্কের সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। এতিমদের অধিকার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। মীরাস বন্টনের নিয়ম-কানুন, অর্থনৈতিক লেনদেনের পদ্ধতি এবং ঘরোয়া বিবাদ মিটানোর পদ্ধতি শিখানো হয়েছে। অপরাধের শাস্তির বিধান এবং মদ পান নিষেধ করা হয়েছে। পাক পবিত্রতার বিধি-বিধান শিক্ষা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ ও তাঁর বান্দাহ্দের সাথে পরহিজগার লোকদের সম্পর্ক কেমন হবে তা বলা হয়েছে। মানবতার মুক্তির জন্য জিহাদের গুরুত্ব তুলে

ধরা হয়েছে। মুসলিমদের দলীয় সাংগঠনিক শৃংখলা প্রতিষ্ঠার বিধান শিক্ষা দেয়া হয়েছে। 'আহলে কিতাব' তথা ইহুদী-খৃষ্টান এবং মুনাফিকদের কাজের সমালোচনা এবং তাদের বিষয়ে মুসলিমদেরকে সতর্ক-সাবধান থাকতে বলা হয়েছে। কোনো সংবাদ পেলে তাৎক্ষণিক প্রচার না করে দায়িত্বশীলদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য বলা হয়েছে। ইহুদীদের অসংগত কাজের জন্য মুসলমানদের সতর্ক করা হয়েছে এবং তাদেরকে শেষ পর্যন্ত মদীনা থেকে বহিস্কারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। চুক্তিবদ্ধ গোত্রের সাথে কি ধরনের ব্যবহার করা হবে তার বিধান শিক্ষা দেয়া হয়েছে। মুসলমানদের নৈতিক চরিত্রের সংশোধন করা হয়েছে। সূরার সবশেষে ইহুদী, খৃষ্টান এবং মুশরিকদেরকে দ্বীন ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের মূল বক্তব্য ঃ তিলাওয়াতকৃত আয়াত দু'টির মূল বক্তব্যই হলো প্রাপকের আমানত ফেরৎ দেয়া। বিচার-মিমাংসার সময় ইনসাফ তথা ন্যায়নীতির সাথে ফায়সালা করা। আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল এবং আমীরের আনুগত্য করা এবং কোনো বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের নির্দেশের দিকে ফিরে যাবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনাদের সামনে সূরা আন্ নিসা-র বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করলাম।এখন আমি তিলাওয়াতকৃত আয়াত দু'টির ব্যাখ্যা পেশ করছি। প্রথম আয়াতে আল্লাহ মুসলিমদের নির্দেশ দিয়ে বলেন ঃ

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوْا الْأَمٰنٰتِ إِلٰى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ط إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ٥

(হে মুসলিমগণ!) নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে যাবতীয় আমানত তার হকদারের হাতে ফেরৎ দেয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন। আর তোমরা মানুষের মাঝে কোনো বিচার-মিমাংসা করার সময় 'আদল' বা ন্যায়নীতির সাথে ফায়সালা করো। আল্লাহ তোমাদেরকে সদুপদেশ দান করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও দেখেন।

এই আয়াতে মুসলিমদেরকে আল্লাহ তা'লা দু'টি বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে নির্দেশ দিয়েছেন। একটি হলো হকদারের নিকট আমানত ফেরৎ দেয়া এবং দ্বিতীয়টি হলো মানুষের মধ্যে ন্যায় বিচার করা।

শানে নুযূল ঃ আলোচ্য আয়াতটি নাযিলের একটি বিশেষ ঘটনা রয়েছে। ঘটনাটি হলো, ইসলামের পূর্বকাল থেকেই কা'বা ঘরের সেবা করাকে এক বিশেষ মর্যাদা ও সম্মানের কাজ মনে করা হতো। কা'বা ঘরের খিদমতের জন্য যারা মনোনীত হতো, তারা গোটা সমাজ তথা জাতির মধ্যে বিশেষ সম্মানিত ও বিশিষ্ট বলে গণ্য হতো। আর এই জন্যই বায়তুল্লাহ শরীফের বিশেষ খিদমত বিভিন্ন জনের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হতো। জাহিলিয়াতের যুগ থেকেই হজ্জের মওসুমে হাজীদের 'যমযম' কূপের পানি পান করানোর সেবার দায়িত্ব মহানবী (সঃ) এর চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ) এর উপর ন্যাস্ত ছিলো। একে বলা হতো 'সেকায়া'। এমনিভাবে অন্যান্য আরো কিছু কিছু সেবার দায়িত্ব হুজুর (সঃ) এর অন্য চাচা আবু তালিবের উপর ছিলো। আর কা'বা ঘরের চাবি নিজের কাছে রাখা এবং নির্ধারিত সময়ে তা খুলে দেয়া ও বন্ধ করার দায়িত্ব ছিলো ওসমান ইবনে তালহার উপর।

এ বিষয়ে ওসমান ইবনে তালহা নিজেই বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, জাহিলিয়াতের যুগে আমরা সোমবার ও বৃহস্পতিবারের দিন বায়তুল্লাহর তথা কা'বা ঘরের দরজা খুলে দিলে জনগণ তাতে প্রবেশের সুযোগ পেতো। হিজরাতের পূর্বে একবার মহানবী (সঃ) কতিপয় সাহাবীসহ বায়তুল্লাহ্‌তে প্রবেশের উদ্দেশ্যে গেলে আমি (তখনও মুসলমান হয়নি) তাঁকে প্রবেশে বাধা দিলাম এবং অত্যন্ত বিরক্তি দেখলাম। কিন্তু মহানবী (সঃ) অত্যন্ত ধৈর্য ও গাম্ভীর্যের সাথে আমার কটুক্তিগুলো সহ্য করে নিলেন। অতঃপর বললেন, 'হে উসমান! হয়তো তুমি একদিন বায়তুল্লাহ্‌র (আল্লাহর ঘরের) এই চাবি আমার হাতেই দেখতে পাবে।' তখন যাকে ইচ্ছা তাকে এই চাবি প্রদানের অধিকার আমারই থাকবে। আমি বললাম, যদি তাই হয়, তাহলে তো সেদিন কুরাইশরা অপমান অপদস্ত হয়ে পড়বে। হুযুর বললেন, না তা হবে না। বরং কুরাইশরা আযাদ (স্বাধীন) হবে এবং তারা হবে যথার্ত সম্মানে সম্মানিত। এ কথা বলতে বলতে তিনি বায়তুল্লাহ্ তথা কা'বা ঘরে প্রবেশ করলেন। অতঃপর আমি যখন আমার মনের ভেতর অনুসন্ধান চালালাম, তখন যেন আমার নিশ্চিত

বিশ্বাস হয়ে গেল যে, তিনি যা কিছু বললেন, তা অবশ্যই ঘটবে। সে মূহুর্তেই আমি মুসলমান হয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম। কিন্তু আমি আমার সম্প্রদায়ের মতিগতি ভালো দেখলাম না। তারা আমাকে কঠোরভাবে তিরস্কার ভর্ৎসনা করতে লাগলো। কাজেই আমি আমার (মুসলমান হওয়ার) সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করতে পারলাম না। অতঃপর মক্কা বিজয় হয়ে যাবার পর রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে ডেকে বায়তুল্লাহ্‌র চাবি চাইলে আমি তাঁকে তা দিয়ে দিলাম। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে যে, ওসমান ইবনে তালহা চাবি নিয়ে বায়তুল্লাহ্‌র উপর উঠে পড়লেন, তখন হযরত আলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর নির্দেশে তার নিকট হতে জোর করে চাবি ছিনিয়ে নিয়ে হুজুরের হাতে তুলে দেন। যা হোক, বায়তুল্লায় প্রবেশ করে সেখানে নামায আদায় করার পর মহানবী (সঃ) যখন বাইরে বেরিয়ে এলেন, তখন পুনরায় আমার হাতেই সে চাবি ফিরিয়ে দিলেন এবং বললেন ঃ এই নাও, এখন থেকে এ চাবি কিয়ামত পর্যন্ত তোমার বংশধরদের হাতেই থাকবে। আর অন্য যে কেউ তোমাদের হাত থেকে এ চাবি ফিরিয়ে নিতে চাইবে, সে হবে যালিম-অত্যাচারী। উদ্দেশ্য ছিলো এই যে, তোমাদের হাত থেকে এ চাবি ফিরিয়ে নেবার কোনো অধিকার কারোর-ই থাকবে না। সাথে তিনি এই উপদেশ দিলেন যে, বায়তুল্লাহ্‌র সেবার বিনিময়ে তোমরা যে সম্পদ অর্জন করবে তা শরীয়তের রীতি অনুযায়ী ব্যবহার করবে। ওসমান ইবনে তালহা বলেন, যখন আমি চাবি নিয়ে আনন্দের সাথে আসছিলাম, তখন হুজুর (সঃ) আমাকে ডেকে পূর্বের মন্তব্য স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, ওহে ওসমান! আমি যা বলেছিলাম তাই হলো না কি? তৎক্ষণাৎ আমার সেই কথাটি মনে হয়ে গেল হিজরাতের পূর্বে যা তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'একদিন এ চাবি আমার হাতে দেখবে।' তখন আমি আরজ করলাম, 'নিঃসন্দেহে আপনার কথা বাস্তবায়িত হয়েছে।' আর আমিও সেই মুহূর্তে কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলাম। (তাফসীরে মাযহারী)

হযরত ফারুকে আযম হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলেন যে, সেদিন যখন মহানবী (সঃ) বায়তুল্লাহ থেকে বেরিয়ে আসেন তখন তাঁর মুখে এ আয়াতটি উচ্চারিত হচ্ছিল-

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ إِلٰى أَهْلِهَا

"হে মুসলিমগণ! আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানতসমূহ তার হকদারের নিকট ফিরিয়ে দাও।"

(তাফসীরে মা'রিফুল কুরআন)

তাফসীরে ইবনে কাসীরে উল্লেখ রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) কা'বা ঘর থেকে বের হয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে একটি দীর্ঘ ভাষণ দান করে সবেমাত্র বসে পড়েছেন- এমন সময় হযরত আলী (রাঃ) একটু আগে বেড়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ) চাবিটি আমাকে দিন, যেন বায়তুল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের যমযমের পানি পান করানোর মর্যাদা এ দু'টোই এক জায়গায় একত্রিত হয়।' কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সঃ) চাবিটি তাকে দিলেন না। তিনি "মাকামে ইব্রাহীমকে" কা'বার ভিতর হতে বের করে কা'বার দেয়ালের সাথে মিলিয়ে রেখে লোকদেরকে বললেন ঃ এটাই আমাদের কিবলাহ।

অতঃপর তিনি তাওয়াফের কাজে লেগে পড়লেন। তিনি কেবলমাত্র দু'বার প্রদক্ষিণ করেছেন এমন সময় হযরত জিবরাইল (আঃ) অবতীর্ণ হন এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)- اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ এ আয়াতটি পড়তে আরম্ভ করেন। তখন হযরত উমরে ফারুখ (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার মা-বাপ আপনার জন্য কুরবান হোক, আমি এর আগে তো আপনাকে এ আয়াতটি পড়তে শুনিনি। তখন তিনি হযরত উসমান ইবনে তালহাকে ডেকে তাকে চাবিটি দিয়ে দেন।

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আমানতসমূহ তার হকদারের নিকট ফিরিয়ে দাও।" এই আয়াতটি যদিও উপরোক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে। কিন্তু এর হুকুম আ'ম বা সাধারণ। এই নির্দেশ সাধারণ মুসলমান হতে পারে কিংবা বিশেষ ভাবে ক্ষমতাসীন শাসকগণও হতে পারে। তবে সবচেয়ে স্পষ্ট বিষয় হলো, এমন সবাই এর লক্ষ্য যারা আমানতের রক্ষক বা আমানতদার। এতে সাধারণ জনগণ এবং শাসক শ্রেণী উভয়ই এর অন্তর্ভুক্ত। (মা'রিফুল কুরআন)

আমানতের প্রকারভেদ ঃ আয়াতের প্রথম নির্দেশ- اَمَانَاتٌ (আ-মা-না-ত) শব্দটি বহুবচন ব্যবহার করে সমস্ত প্রকারের আমানত বুঝানো হয়েছে।

যেমন-রাষ্ট্রীয় আমানত, দায়িত্বের আমানত, ক্ষমতার আমানত, ভোটের আমানত, মর্যাদার আমানত, সম্পদের আমানত, কথার আমানত, গোপন বিষয় সংরক্ষণের আমানত ইত্যাদি।

রাষ্ট্রীয় পদমর্যাদা আল্লাহ্ তা'লার আমানত ঃ এতে প্রতীয়মান হয় যে, রাষ্ট্রীয় যতো পদ ও পদমর্যাদা রয়েছে সেসবই আল্লাহ্ তা'লার আমানত। যাদের হাতে নিয়োগদান এবং বরখাস্তের ক্ষমতা বা অধিকার রয়েছে সে সমস্ত কর্মকর্তারা হচ্ছেন সে পদের আমানতদার। কাজেই তাদের পক্ষে এমন পদ এমন কাউকে অর্পণ করা বৈধ নয়, যে লোক সেই পদের জন্য যোগ্য নয়। এ ক্ষেত্রে তার দায়িত্বই হলো সংশ্লিষ্ট পদের জন্য যোগ্য ব্যক্তিকে যাচাই-বাছাই করে যোগ্য ব্যক্তিকেই সেই পদে নিয়োগ দান করা। তবে যদি পরিপূর্ণভাবে সেই পদের জন্য শর্ত মোতাবেক কোনো যোগ্য লোক না পাওয়া যায়, তবে উপস্থিত লোকদের মধ্যে যে বেশী যোগ্যতাসম্পন্ন এবং সততার দিক দিয়ে বেশী অগ্রবর্তী তাকেই নিয়োগ দেয়া। কেননা, বৈষয়িক যোগ্যতার কিছু ঘাটতি থাকলেও সততার কারণে তার সে ঘাটতি পূরণ হয়ে যাবে এবং তার এই সততার কারণে তার অধিনস্থরাও তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে না এবং সাধারণ মানুষ হয়রানি হবে না। বরং তারা তাদের অধিকার ফিরে পাবে।

আর যদি কোনো পদে অযোগ্য ও অসৎ ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হয়, তাহলে নিয়োগকর্তা অভিসম্পাতের অধিকারী হবে। হাদীসে বর্ণনা রয়েছে। নবী করীম (সঃ) বলেন, যাকে সাধারণ মুসলমানদের কোনো দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, তারপর যদি সে কাকেও তার যোগ্যতা যাচাই ছাড়াই একান্ত বন্ধুত্ব কিংবা বিশেষ কোনো সম্পর্কের কারণে কোনো পদে নিয়োগ প্রদান করে, তবে তার উপর আল্লাহর লানত (অভিসম্পাত) বর্ষিত হবে। না তার ফরজ (ইবাদত) কবুল হবে, না তার নফল ইবাদত। এমনকি জাহান্নামে সে নিক্ষিপ্ত হবে। (মা'রিফুল কুরআন)

অতএব রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যারা থাকবে, তাদেরকে অবশ্যই গচ্ছিত এই আমানতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে। অর্থাৎ সরকারী পদসমূহে সেইসব লোককেই নিয়োগ দিতে হবে যাদেরকে সর্বাধিক যোগ্য বলে মনে করা হবে। কোনো প্রকার স্বজনপ্রীতি, আত্মীয়তার সম্পর্ক কিংবা এলাকা বা দলীয় বিবেচনায় অথবা ঘুষ-উৎকোচের বিনিময়ে যেন

নিয়োগ দেয়া না হয়। নয়তো এর ভয়াবহ পরিণতি দুনিয়া এবং আখিরাতে ভোগ করতে হবে। তাতে যেমন আল্লাহর অভিসম্পাত পেত হবে তোমনি জনগণেরও অভিশাপ ভোগ করতে হবে।

আয়াতে আরো একটি নিয়োগের ক্ষেত্রে মূলনীতি নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে- যা বর্তমানে রাষ্ট্রীয়ভাবে তা হয়ে থাকে, যা গ্রহণযোগ্য নয়। সেটা হলো কোটা পদ্ধতি। যেমন, এক বিভাগ বা জেলা কিংবা এলাকার জন্য পৃথক পৃথক কোটা নির্ধারণ। এক এলাকার কোটায় অন্য এলাকার লোক নিয়োগ করা যাবে না, তাতে প্রার্থী যতই যোগ্য হোক না কেন।

অপরপক্ষে নির্ধারিত এলাকার প্রার্থী যতই অযোগ্য ও অথর্ব্য হোক না কেন তাকেই নিয়োগ দিতে হবে। পবিত্র আল কুরআনে পরিস্কার ভাষায় ঘোষণা করে দেয়া হয়েছে যে, এসব পদ কারোর-ই ব্যক্তিগত বা এলকাগত অধিকার নয়, বরং এগুলো হলো রাষ্ট্রীয় আমানত, যা কেবলমাত্র এর যোগ্য হকদারকেই অর্পণ করতে হবে, তা সে যে এলাকার লোক হোক না কেন। অবশ্য কোনো এলাকা বা প্রদেশের শাসনের সুবিধার্তে সে এলাকার মানুষকে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে, যাতে বহুবিদ কল্যাণ নিহিত থাকবে। কিন্তু তাতে শর্ত হলো এই যে, কাজের যোগ্যতা এবং সততা ও আমানতদারীর ব্যাপারে তার উপর পূর্ণ আস্থা থাকতে হবে।

বনী ঈসরাইলদের অর্থাৎ ইহুদী-নাসারাদের একটি মৌলিক ও বড় দোষ ছিলো, তারা নিজেদের পতনের যুগে আমানতসমূহ অর্থাৎ দায়িত্বপূর্ণ পদ, ধর্মীয় নেতৃত্ব ও জাতীয় নেতৃত্বের ক্ষেত্রে মর্যাদাপূর্ণ পদসমূহ এমনসব লোকদেরকে দেয়া শুরু করেছিলো, যারা ছিলো- অযোগ্য, অর্থব্য, সংকীর্ণমনা, অসৎ, চরিত্রহীন, দুর্নীতিবাজ, খিয়ানতকারী ও ব্যাভীচারী। ফলে এসব নেতৃত্বের কারণে গোটা সমাজের লোক অনাচারে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলো। তাই মুসলমান নেতৃত্বকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে যে, তোমরা স্থানীয় ও জাতীয় নেতৃত্ব অথবা যে কোনো দায়িত্বপূর্ণ পদে সৎ, যোগ্য, খোদাভীরু ও চরিত্রবান লোকদেরকেই নিয়োগ দান করবে।

সংবিধান সম্পর্কীত কয়েকটি মূলনীতি ঃ আয়াতের এই সংক্ষিপ্ত ব্যাক্যে সংবিধান সম্পর্কিত কয়েকটি মূলনীতি 'তাফহীমূল কুরআন'- নিম্নরূপ বর্ণনা-এ করা হয়েছে। যেমন-

১. আয়াতের প্রথম বাক্যে إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ এর দ্বারা আরম্ভ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রকৃত হুকুম বা নির্দেশ দানের মালিক আল্লাহ তা'লা। পৃথিবীর শাসকগণ কেবল তার আজ্ঞাবহ দাস। এতে প্রতীয়মান হয় যে, শাসনক্ষেত্রে সার্বভৌমত্বের মালিকও একমাত্র আল্লাহ তা'লা।

২. সরকারী পদসমূহ দেশের অধিবাসীদের অধিকার নয়, যা জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে বন্টন করা যেতে পারে; বরং এগুলো হলো আল্লাহ প্রদত্ত আমানত, যা কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলের পক্ষ থেকে যোগ্য ও যথার্থ লোককেই দেয়া যেতে পারে।

৩. পৃথিবীতে মানুষের যে শাসন, তা কেবলমাত্র একজন প্রতিনিধি ও আমানতদার হিসেবেই হতে পারে। তারা দেশের আইন প্রণয়নে যেসব নীতিমালার অনুসরণ করতে বাধ্য থাকবে যা একক ক্ষমতার মালিক মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে বাতলে দেয়া হয়েছে। যা পবিত্র আল কুরআনে উল্লেখ রয়েছে।

৪. এই আয়াতের দ্বিতীয় যে নির্দেশ তা হলো, বিচার-মিমাংসার জন্য যখন কোনো মামলা-মোকাদ্দমা আসবে, তখন বংশ, গোত্র, বর্ণ, ভাষা এমন কি ধর্ম ও মতবাদের পার্থক্য করা যাবে না। বরং আ'দল ও ন্যায়নীতির মাধ্যমে ফায়সালা করে দিতে হবে।

তাফসীরে ইবনে কাসীরে রয়েছে, আল্লাহ তা'লার সমস্ত হক আদায় করাও এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন- নামায, রোযা, কাফ্ফারা, নযর ইত্যাদি।

হযরত আলি (রাঃ) বলেন, যে যে জিনিসের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং যা নিষেধ করা হয়েছে ঐ সবগুলোই আমানত। হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেন যে, নারীর নিকট তার লজ্জাস্থান একটি আমানত। (স্বামী ছাড়া কেউ ভোগ-ব্যবহার করতে পারে না।)

হযরত রাবী' ইবনে আনাস (রহঃ) বলেন, তোমার ও অপরের মধ্যে যে লেনদেন হয় ঐসবগুলোই আমানত। (ইবনে কাসীর)

হকদারের আমানত ফেরৎ দেয়ার তাগাদা ঃ

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ إِلٰى أَهْلِهَا "নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন হকদারের আমানত তার কাছে ফেরৎ দেয়ার"।

এই নির্দেশের সারমর্ম হলো এই যে, যার দায়িত্বে কোনো আমানত থাকবে হকদারের কাছে তার আমানত ফিরিয়ে দেয়া তার একান্ত কর্তব্য। যা নবী করীম (সঃ) যাহিলী যুগে উসমান বিন তালহার নিকট গচ্ছিত কা'বা ঘরের চাবি মক্কা বিজয়ের পর যখন নবী করীম (সঃ) এর হাতে অর্পিত হয়, তখন নবী করীম (সঃ) এর হাতে এই চাবি অর্পণের সময় উসমান ইবনে তালহা (অমুসলমান থাকার পরেও) বলেছিলো, আল্লাহর আমানতের সঙ্গে দিচ্ছি। (ইবনে কাসীর) আর উক্ত চাবি হাতে নিয়ে নবী করীম (সঃ) কা'বা ঘরে প্রবেশ করে রক্ষিত সকল মূর্তি নিজ হাতে ভেঙ্গে চুরমার করে পানি ঢেলে দিয়ে পাকসাপ করার পর কা'বা ঘর থেকে বের হলে আমানত হকদারের কাছে ফেরৎ দেয়ার নির্দেশ সম্বলিত আয়াতটি নাযিল হয়। নবী করীম (সঃ) এই নির্দেশ পাওয়ার ফলে কা'বা ঘরের চাবি চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ) এবং চাচাত ভাই হযরত আলী (রাঃ) চাইলেও তাদেরকে না দিয়ে নবীকে ভর্ৎসনাকারী (তখনও অমুসলিম) ওসমান বিন তালহার নিকট বায়তুল্লাহর চাবি রাষ্ট্রীয়ভাবে অর্পণ করেন। আর এই চাবি ফিরে পেয়ে সাথে সাথে কালিমা পড়ে ওসমান বিন তালহা মুসলমান হয়ে নবীর সাহাবাগণের কাতারে সামিল হয়ে যান।

গোটা মুসলিম মিল্লাতের জন্য আমানত ফেরৎ দেয়ার তাগাদা সম্বলিত অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমন, হযরত সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যে তোমার সাথে বিশ্বস্ততা প্রদর্শণ করে, তুমি তার গচ্ছিত দ্রব্য-সামগ্রী ফেরৎ দাও এবং যে তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তুমি তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করো না।

(মুসনাদ-ই আহমাদ)

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এমন খুব কম হয়েছে যে, নবী করীম (সঃ) কোনো ভাষণ দিয়েছেন অথচ তাতে একথা বলেননি- لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَنَاتَهُ وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا اَحْدَلَهُ

“যার মধ্যে আমানতদারী নেই তার মধ্যে ঈমান নেই। আর যার মধ্যে ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি রক্ষার নিয়মানুবর্তিতা নেই, তার দ্বীন নেই।”

(শোআ'বুল ঈমান)

আমানত রক্ষা করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য, আবার খিয়ানত করা মুনাফিকীর বৈশিষ্ট্য। পবিত্র কালামে হাকীম সূরা মু'মিনুনে মুমিনদের যে সাতটি গুণাবলীর কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে দু'টি গুণ হলোঃ

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ

(তারাই মুমিন!) "যারা তাদের আমানতসমূহ এবং প্রতিশ্রুতিসমূহ সংরক্ষণ করে।"

আবার সহীহ বর্ণনায় হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে মুনাফিকদের লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করতে গিয়ে একটি বৈশিষ্ট বলা হয়েছে, এরূপ- وَاِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ "আর যখন তার কাছে কোনো আমানত রাখা হয় তখন তা সে খিয়ানত করে"।

(সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম)

আমানতের হক আদায় না করার পরিণতি ঃ হক বা প্রাপকের হক আদায় না করলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'লা শুধু মানুষ কেন এক পশুকে আর এক পশু দ্বারা তার প্রাপ্য হক আদায় করার ব্যবস্থা করবেন। যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "কিয়ামতের দিন প্রত্যেক হকদারকে তার হক আদায় করিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে। এমন কি শিংওয়ালা ছাগল কোনো শিংবিহীন ছাগলকে মেরে থাকলে ওর প্রতিশোধও করিয়ে দেয়া হবে।" (ইবনে কাসীর)

মুসনাদ-ই ইবনে আবি হাতিমে রয়েছে- "হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, সাক্ষ্য দানের কারণে সমস্ত পাপ মুছে যায়, কিন্তু আমানত মুছে যায় না। যদি কোনো লোক আল্লাহর পথে শহীদও হয়ে থাকে তাকেও কিয়ামতের দিন আনা হবে এবং বলা হবে আমানত আদায় করো। সে উত্তরে বলবে এখন তো দুনিয়ায় নেই, সুতরাং আমি কোথা থেকে আমানত আদায় করবো? অতঃপর সে ঐ জিনিস জাহান্নামের তলদেশে দেখতে পাবে এবং তাকে বলা হবে ওটা নিয়ে এসো। তখন সে তা তার ঘাড়ে বহন করে চলতে থাকবে। কিন্তু ওটা পড়ে যাবে এবং সে পুনরায় ওটা নিতে যাবে। এভাবে সে ঐ শাস্তিতেই জড়িত থাকবে।"

(ইবনে কাসীর)

অতঃপর অত্র আয়াতের দ্বিতীয় হুকুম ন্যায় বিচারের নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ -

আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে কোনো বিচার-মিমাংসা করবে তখন আ'দল বা ন্যায়নীতির সাথে করবে।

উল্লেখিত আয়াতে প্রথম হুকুম প্রকৃত প্রাপকের কাছে আমানত পৌঁছিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়ার পর পরবর্তী এই বাক্যটিতে ন্যায় বিচারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই নির্দেশ দু'টির মধ্যে আমানত পরিশোধের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেয়ার কারণ সম্ভবতঃ এই হতে পারে যে, এর অবর্তমানে কোথাও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা হতেই পারে না। কাজেই যাদের হাতে দেশের শাসনক্ষমতা থাকবে, তাদেরকে প্রথমে গচ্ছিত এই আমানতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে। অর্থাৎ সরকারী পদসমূহ কিংবা বিচার ব্যবস্থায় সেসব লোককেই নিয়োগ দিতে হবে যারা সংশ্লিষ্ট পদের জন্য যোগ্য। যারা সৎ, খোদাভীরু, আমানতদার। যদি এসব লোক নিয়োগ করা হয় তাহলেই কেবলমাত্র জনসাধারণ আ'দল বা ন্যায়বিচার লাভ করবে। আর যদি স্বজনপ্রীতি ও আত্মীয়তার সম্পর্ক কিংবা কোনো সুপারিশ অথবা ঘুষ বা দুর্নীতির মাধ্যমে অযোগ্য, অথর্ব্য, অসৎ, খোদাবিমুখ, আত্মসাতকারী ও অত্যাচারী লোককে কর্মকর্তা বা বিচারক নিয়োগ করা হয় তাহলে তাদের কাছ থেকে কোনো ভাবেই আ'দল বা ন্যায় বিচারের আশা করা যায় না। সরকার যদিও একান্তভাবে দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তবুও তাদের পক্ষে সেই লক্ষ্য অর্জন করা কোনো ভাবেই সম্ভব নয়। কারণ ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার এরাই হলো রাষ্ট্রের কর্ণধার।

এতো গেল রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কথা। এছাড়া আরও অন্যান্য ক্ষেত্রেও ন্যায় বিচার বা আ'দল প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যেমন- একজন স্বামীর একাধীক স্ত্রী থাকলে তাদের প্রতি আ'দল বা ইনসাফ করতে হবে। ছেলে সন্তান বা মেয়ে সন্তানদের প্রতি ইনসাফ করতে হবে। সমাজের কোনো সালিস-দরবারে আ'দল বা ন্যায়বিচার করতে হবে ইত্যাদি।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সময় বনি ইসরাঈলরা যেভাবে আমানতের খিয়ানত করতো, তেমনি তারা আ'দল বা ন্যায়নীতির বিষয়েও অত্যন্ত দূর্বল ছিলো। ব্যক্তিগত ও জাতীয় স্বার্থে তারা ঈমান বিরোধী কাজ করতো। ইনসাফ বা ন্যায়নীতির গলায় তারা ছুরি চালাতে দ্বিধাবোধ করতো না। যা মুসলমানেরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিলো। তাই মহান আল্লাহ তা'লা তাদের এই বেইনসাফির বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করার পর এবার মুসলমানদের উপদেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা ওদের মতো অবিচারক হয়ো না। কারো সাথে বন্ধুত্ব বা শত্রুতা যাই থাক না কেন সর্ব অবস্থায় ইনসাফ ও ন্যায়নীতির কথা বলবে এবং ইনসাফ ও সুবিচার সহকারে ফয়সালা করবে।

ন্যায়বিচারকের প্রতিদান ও মর্যাদা ঃ

হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'লা বিচারকের সাথে থাকেন যে পর্যন্ত তিনি ন্যায়বিচার করেন। যখন সে অত্যাচার করে তখন তারই দিকে তা ফিরিয়ে দেন। অন্য এক হাদীসে রয়েছে, এক দিনের ন্যায়বিচার চল্লিশ বছরের ইবাদতের সমান।

(ইবনে কাসীর)

ন্যায়বিচারক শাসককেও আল্লাহ তা'লা হাশরের ময়দানে মহা সম্মানিত করবেন। অর্থাৎ যেদিন আল্লাহর আরশের ছায়া ছাড়া অন্য কোনো ছায়া থাকবে না, সেই কঠিন দিনে আল্লাহ সাত শ্রেণীর লোককে আশ্রয় দেবেন তার মধ্যে প্রথম শ্রেণী-ই হলো- اِمَامٌ عَادِلٌ ন্যায়বিচারক শাসক।

এই জন্য সকল স্তরের বা সকল পর্যায়ে বিচার মিমাংসাকারীকে সকল বিচারকের বিচারক মহান আল্লাহ তা'লার প্রতি খেয়াল রেখে তাঁকে ভয় করেই বিচার মিমাংসা করা অপরিহার্য্য। তাই আয়াতের শেষাংশে মহান আল্লাহ তা'লা উপদেশ দিয়ে বলেন- اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ

নিশ্চয় আল্লাহ তা'লা তোমাদের সদুপদেশ দান করেন।

অর্থাৎ আল্লাহ তা'লা তোমাদেরকে প্রকৃত হকদার এবং যোগ্য লোকদের হাতে সকল পর্যায়ের আমানত তুলে দেয়া ও সকলের ক্ষেত্রে আ'দল বা ন্যায়বিচার করার নির্দেশ দিচ্ছেন, হে মুসলিম সম্প্রদায়! এটা তোমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে অতি উত্তম ও কল্যাণকর উপদেশ।

আয়াতের সবশেষে বলা হয়েছে ঃ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا

নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু শোনেন ও সবকিছু দেখেন।

এখানে মুসলমানদের সতর্ক ও সাবধান করে দিয়ে মহান আল্লাহ বলেছেন, হে মুসলিম সমাজ, আমানত ও ইনসাফ সম্পর্কে তোমরা যাই কিছু বলো বা কারো না কেন, তিনি সবকিছুই শুনছেন এবং সবকিছুই দেখছেন।

অতঃপর পরবর্তী আয়াতে মুসলমানদেরকে আনুগত্যের নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন-

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ

হে মুমিনগন! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো। আর আনুগত্য করো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের।

দারসের জন্য তিলাওয়াতকৃত আয়াত দু'টির প্রথম আয়াতের লক্ষ্য যেমন ছিলো শাসকশ্রেণী, তেমনি দ্বিতীয় এই আয়াতে সাধারণ মুসলিমদের সম্বোধন করে বলা হচ্ছে,"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ, রাসূল এবং তোমাদের নেতৃত্ববর্গের আনুগত্য করো।"

আয়াতের শানে নুযুল ঃ সহীহ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি ছোট নৌবাহিনীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হুযায়ফা ইবনে কায়েস (রাঃ) কে প্রেরণ করেন। তাঁর ব্যাপারে এ আয়াতটি নাযিল হয়। (ইবনে কাসীর)

মাওলানা মওদুদী (রঃ) তাঁর তাফসীরের কিতাব 'তাফহীমূল কুরআনে' উল্লেখ করেন যে, এ আয়াতটি ইসলামের সমগ্র ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনের বুনিয়াদ বা ভিত্তি। এটি একটি ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের প্রথম নম্বর ধারা। এখানে কতকগুলো নীতিমালা স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়া হয়েছে।

মুমিনদেরকে উদ্দেশ্য করে মহান আল্লাহ নীতিমালাগুলো ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করে বলেন-

এক. أَطِيْعُوا اللهَ "তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো।"

অর্থাৎ এই নির্দেশ দ্বারা বুঝা যায় যে, ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় প্রকৃত আনুগত্য লাভের অধিকারী হচ্ছেন মহান আল্লাহ তা'লা। একজন মুসলিমের প্রথম পরিচয় হলো, সে একজন আল্লাহর বান্দাহ্, এরপর সে অন্য কিছু। সুতরাং একজন মুসলমানের ব্যক্তিগত জীবন ও সমাজ জীবন ব্যবস্থা উভয়ের কেন্দ্রবিন্দু ও লক্ষ্য হচ্ছে বিনাশর্তে আল্লাহর আনুগত্য করা ও বিশ্বস্ততার সাথে তাঁর আদেশ মেনে চলা। অন্যান্য আনুগত্য ও অনুসরণ কেবলমাত্র তখনই গ্রহণযোগ্য হবে, যখন তা আল্লাহর আনুগত্য ও অনুসরণের বিপরীত হবে না, বরং তার অধীন এবং অনুকূল হবে। যদি এই আসল ও মৌলিক আনুগত্য বিরোধী কোনো আনুগত্য হয়, তাহলে সেই আনুগত্যের শৃংখল ভেঙ্গে ছুড়ে ফেলতে হবে। একথাটিকে নবী করীম (সঃ) এভাবে ব্যক্ত করেছেন- لَاطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

"স্রষ্টার নাফরমানি করে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।"

অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্যের উপর আর কোনো আনুগত্য নেই। বরং সমস্ত আনুগত্যই হবে আল্লাহকে কেন্দ্র করে। অর্থাৎ সকল আনুগত্যের কেন্দ্রবিন্দু হবে আল্লাহ তা'লা।

দুই. وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ "এবং আনুগত্য করো রাসূলের।"

অর্থাৎ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় আল্লাহর আনুগত্যের পরই দ্বিতীয় মূলনীতি হলো রাসূলের আনুগত্য। এটি কোনো স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ আনুগত্য নয়। বরং আল্লাহর আনুগত্যের এটিই একমাত্র বাস্তব ও কার্যকর পদ্ধতি।

রাসূলের আনুগত্য এ জন্য করতে হবে যে, আল্লাহর বিধি-বিধান ও নির্দেশ আমাদের কাছে পৌছার একমাত্র বিস্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য মাধ্যম। কাজেই আমরা কেবলমাত্র রাসূলে করীম (সঃ) এর আনুগত্য করার পথ ধরেই আল্লাহর আনুগত্য করতে পারি। রাসূলে করীম (সঃ) এর সার্টিফায় এবং প্রমাণপত্র ছাড়া আল্লাহর কোনো আনুগত্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। রাসূলের আনুগত্য মানেই আল্লাহর আনুগত্য। আর তাঁকে প্রত্যাখান মানেই আল্লাহকে প্রত্যাখান যা বিদ্রোহের সামিল। এ বিষয়ে মহানবী (সঃ) এর স্পষ্ট ঘোষণা-

مَنْ اَطَاعَنِىْ فَقَدْ اَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ عَصَى اللهَ

"যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো সে যেন আল্লাহরই আনুগত্য করলো। আর যে ব্যক্তি আমার নাফরমানি করলো সে যেন আল্লাহরই নাফরমানি করলো।"

অতঃপর ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার আরো একটি মূলনীতি উল্লেখ করে মহান আল্লাহ্ বলেন,

তিন. وَاُوْلِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ "আর আনুগত্য করো তোমাদের মধ্যে দায়িত্বশীল নেতৃবর্গের।"

উপরোক্ত দু'টি আনুগত্যের পর তাদেরই অধীনে আরো একটি আনুগত্য করা মুসলমানদের জন্য অবশ্যই করণীয় কর্তব্য। আর তা হলো মুসলিম সমাজে যারা "উলিল আমর" তথা দায়িত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী তাদের আনুগত্য করা।

উলিল আমর কে? ঃ আভিধানিক অর্থে- اُوْلِى الْاَمْرِ এর অর্থ হলো, সেসব লোক যাদের হাতে ক্ষমতা থাকে বা কোনো বিষয়ের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব থাকে। এ বিষয়ে মুফাস্সীরগণের কয়েকটি মতামত পাওয়া যায়।

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ ও হাসান বসরী (রহঃ) বলেছেন 'উলিল আমর' হলো, ওলামা ও ফোকাহা সম্প্রদায়। তারাই হচ্ছেন মহানবী (সঃ) এর নায়েব বা প্রতিনিধি। তাঁদের হাতেই দ্বীনি ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পিত।

২. মুফাস্সীরগণের অপর এক জামায়াত যাদের মধ্যে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) প্রমুখ সাহাবাগণও রয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, 'উলিল আমর' এর অর্থ হচ্ছে, সেসব লোক যাদের হাতে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব থাকে। (মা'রিফুল কুরআন)

৩. তাফসীরে মাযহারীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'উলিল আমর' হলো, ওলামা ও শাসক উভয় শ্রেণীকেই বুঝায়। কারণ নির্দেশ দানের বিষয়টি তাঁদের উভয়ের সাথেই সম্পৃক্ত। (ইবনে কাসীর)

৪. তাফহীমুল কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুসলমানদের সামাজিক ও সামষ্টিক কাজের বিষয়ে দায়িত্বসম্পন্ন ও নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তি মাত্রই 'উলিল আমর' এর অন্তর্ভূক্ত। তাঁরা মুসলমানদের মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও চিন্তাগত ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানকারী উলামায়ে কিরাম বা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ হতে পারেন, আবার দেশের শাসনকার্য পরিচালনাকারী প্রশাসকবৃন্দ হতে পারেন অথবা আদালতের বিচারকগণ হতে পারেন কিংবা তামাদ্দুনিক ও সামাজিক বিষয়ে গোত্র, মহল্লা ও জনবসতির নেতৃত্বদানকারী শেখ সরদার প্রধানরাও হতে পারেন। মোটকথা যে ব্যক্তি যে কোনো পর্যায়েই মুসলমানদের নেতৃত্বদানকারী হবেন তিনি অবশ্যই অধিনস্থদের আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী হবেন।

'উলিল আমর' এর আনুগত্য শর্তসাপেক্ষ ঃ আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য হবে নিঃসর্ত। কিন্তু 'উলিল আমর' বা দায়িত্বশীল নেতৃবর্গের আনুগত্য হবে শর্ত সাপেক্ষে। শর্তগুলো নিম্নরূপঃ

ক. প্রথম শর্ত হলো, তাঁকে অবশ্যই মুসলমান হতে হবে।

খ. দ্বিতীয় শর্ত হলো, তাঁকে আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত হতে হবে।

গ. তৃতীয় শর্ত হলো, কেবলমাত্র মা'রুফ বা সৎকাজে আনুগত্য করা যাবে।

উলিল আমরের আনুগত্যের বিষয়ে পবিত্র আল কুরআনে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা না করলেও হাদীসে তা স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। যেমন- মহানবী (সঃ) বলেনঃ

اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِىْ مَا اَحَبَّ وَكَرِهَ مَالَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَاِذَا اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ

"নেতৃবৃন্দের কথা শোনা ও মেনে চলা মুসলমানদের জন্য অবশ্যই কর্তব্য তা তার পছন্দ হোক বা না হোক যে পর্যন্ত না তাকে নাফরমানির কাজে নির্দেশ দেয়া হয়। আর যখন তাকে নাফরমানির কাজে নির্দেশ দেয়া হবে তখন তা যেমন শোনাও যাবে না তেমনি মানাও যাবে না।"

(সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

আল্লাহর নাফরমানির কাজে কোনো আনুগত্য নেই ঃ হাদীসে বলা হয়েছে-

لَاطَاعَةَ فِيْ مَعْصِيَةٍ اِنَّمَاالطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوْفِ

"আল্লাহ ও রাসূলের নাফরমানির কাজে কোনো আনুগত্য নেই, বরং আনুগত্য করতে হবে শুধুমাত্র মা'রুফ বা বৈধ ও সৎকাজে।"

(সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

এ বিষয়ে আরো স্পষ্ট করে ইবনে কাসির মুসনাদ-ই আহমাদ এর বরাত দিয়ে হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করে বলেনঃ রাবী বলেন, কোনো এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এক সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন এবং একজন আনসারীকে তার নেতৃত্ব প্রদান করেন। একবার তিনি সৈন্যদের উপর কোনো এক ব্যাপারে ভীষণভাবে রাগান্বিত হয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) কি তোমাদেরকে আমার আনুগত্য করার নির্দেশ দেননি? তাঁরা বলেন, হ্যাঁ। এরপর তিনি বলেন, তোমরা জ্বালানি কাঠ জমা করো। তারপর তিনি আগুন দিয়ে কাঠগুলোকে জ্বালিয়ে দেন। অতঃপর বলেন, আমি তোমাদেরকে এ আগুনে প্রবেশ করার নির্দেশ দিলাম। তখন একজন যুবক সৈনিকদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন যে, আপনারা আগুন থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উদ্দেশ্যেই আল্লাহর রাসূলের নিকট আশ্রয় নিয়েছেন। তাই আপনারা এ ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করবেন না যে পর্যন্ত না আপনারা রাসূল (সঃ) এর সাথে স্বাক্ষাৎ করেন। অতঃপর তিনি যদি আগুনে প্রবেশ করার নির্দেশ দেন, তাহলে তাতে প্রবেশ করবেন। অতঃপর তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর নিকট ফিরে এসে ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। তখন তিনি বললেন, তোমরা যদি আগুনে ঝাপ দিতে তাহলে আর কখনো সেই আগুন থেকে বের হতে পারতে না (অর্থাৎ তা হতো আত্মহত্যা। আর তার ফলে তোমাদেরকে চিরদিন জাহান্নামের আগুনে পুড়তে হতো)। জেনে রেখো, আনুগত্য শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজেই রয়েছে।" (সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও হাদীসটি হযরত আনাস থেকে বর্ণিত আছে)

ব্যক্তির পরিবর্তনে আনুগত্যের পরিবর্তন হবে না ঃ নেতৃত্ব যেহেতু পরিবর্তনশীল। তাই একজন ব্যক্তিই আজীবন নেতৃত্ব দিতে বা থাকতে পারেন না। ব্যক্তির অবশ্যই পরিবর্তন হবে। যেহেতু কতিপয়

শর্তসাপেক্ষে ব্যক্তিকে নেতৃত্ব দেয়া হয়, সুতরাং শর্ত ঠিক রেখে যদি ব্যক্তি পরিবর্তন হয়, তাহলে এর জন্য আনুগত্যের কোনো হেরফের হবে না, সেই ব্যক্তি তার পছন্দ হোক কিংবা না হোক। যদিও সে ব্যক্তি নাক কাটা হাবসী গোলামও হয়। এবিষয়ে কয়েকটি হাদীস বর্ণিত আছে। যেমন-

১. হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমরা শোন ও মেনে চলো যদিও তোমাদের উপর একজন ক্ষুদ্র মাথাবিশিষ্ট হাবসী গোলামকেও আমীর বানিয়ে দেয়া হয়"।

(সহীহুল বুখারী)

২. হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, "আমার বন্ধু (সঃ) আমাকে নেতার কথা শোনার ও মেনে চলার উপদেশ দিয়েছেন যদিও সে একজন ত্রুটিযুক্ত হাত-পা বিশিষ্ট হাবসী ক্রীতদাসও হয়"।

(সহীহ মুসলিম)

৩. হযরত উম্মে হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে বিদায় হজ্জের ভাষণে বলতে শুনেছেন; "যদি তোমাদের উপর একজন ক্রীতদাসকে 'আ'মেল' বানিয়ে দেয়া হয় এবং সে তোমাদেরকে আল্লাহ তা'লার কিতাব অনুযায়ী পরিচালিত করে, তবে তোমরা তার কথা শুনবে এবং মেনে চলবে।" (সহীহ মুসলিম) অন্য বর্ণনায় 'কর্তিত অঙ্গবিশিষ্ট হাবশী ক্রীতদাস' এ শব্দগুলো রয়েছে।

আমীরের অপছন্দনীয় কাজে ধৈর্যধারণ করা ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে বলতে শুনেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমীরের কোনো অপছন্দনীয় কাজ দেখে সে যেন ধৈর্য ধারণ করে (আনুগত্য করে যায়)। আর যে ব্যক্তি জামায়াত হতে অর্ধহাত পরিমান দূরে সরে যাবে, সে জাহিলিয়াতের যুগের মৃত্যুবরণ করবে।"

(সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম)

হযরত ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে বলতে শুনেছেনঃ "যে ব্যক্তি আনুগত্যের হাত গুটিয়ে নেবে, সে কিয়ামতের দিন হুজ্জত ও দলীল ছাড়াই আল্লাহ তা'লার সাথে স্বাক্ষাৎ করবে। আর যে এমন অবস্থায় মারা যাবে যে তার ঘাড়ে আনুগত্যের বন্ধন নেই, সে জাহিলিয়াতের যুগের মৃত্যুবরণ করবে।" (সহীহ মুসলিম)

অন্য হাদীসে নবী করীম (সঃ) বলেছেনঃ "তোমাদের উপর এমন লোকও শাসন কর্তৃত্ব চালাবে যাদের অনেক কথাকে তোমরা 'মা'রুফ' (বৈধ) ও অনেক কথাকে 'মুনকার' (অবৈধ) পাবে। এ ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি তাদের মুনকার কাজের বিরুদ্ধে অসন্তুষ্ট প্রকাশ করেছে সে দায়মুক্ত হয়ে গেছে। আর যে ব্যক্তি তা অপছন্দ করেছে সেও বেঁচে গেছে। কিন্তু যে ব্যক্তি তাতে সন্তুষ্ট রয়েছে এবং তার অনুসরণ করেছে সে (আল্লাহর দরবারে) পাকড়াও হবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে এ ধরনের শাসকদের শাসন আমলে আমরা কি তাদের সাথে যুদ্ধ করবো ? হুজুর (সঃ) জবাব দেন, না যতক্ষণ তারা নামায পড়তে থাকবে (ততক্ষণ তাদের সাথে যুদ্ধ করতে পারবে না)। (সহীহ মুসলিম)

যেহেতু নামায মুসলিম ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্য করে, সুতরাং নামায ছেড়ে দিলেই কেবলমাত্র তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে। কেননা, শাসকদের দায়িত্ব শুধু নিজে নামায পড়া নয়, বরং সমাজ জীবনে নামায প্রতিষ্ঠিত রাখা। এ সম্পর্কে মহানবী (সঃ) বলেনঃ "তোমাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম সরদার হচ্ছে তারা যারা তোমাদের ঘৃণা করে এবং তোমরাও তাদের ঘৃণা করো, তোমরা তাদের প্রতি লানত (অভিশাপ) দিতে থাকো এবং তারাও তোমাদের প্রতি লানত বর্ষণ করতে থাকে। সাহাবীগণ আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যখন এ অবস্থার সৃষ্টি হবে তখন কি আমরা তাদের মোকাবিলা করার জন্য মাথা তুলে দাঁড়াবো না ? তিনি জবাব দেন; না, যতোদিন তারা তোমাদের মধ্যে নামায কায়েম করতে থাকবে! না, যতোদিন তারা তোমাদের মধ্যে নামায কায়েম করতে থাকবে।"

(সহীহ মুসলিম)

অতঃপর আয়াতের শেষে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় আরো একটি মূলনীতি উল্লেখ করে মহান আল্লাহ বলেন-

চার. فَاِنْ تَنَازَعتُم فِى شَئٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنتُم تُؤمِنُونَ بِاللهِ وَاليَومِ الاَخِرِ

অতঃপর যদি কোনো বিষয়ে বা ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে মতোবিরোধ দেখা দেয়, তাহলে তাকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও-যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হও।

অর্থাৎ ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় আল্লাহর নির্দেশ ও রাসূল (সঃ) এর সুন্নাহ-ই হচ্ছে শরীয়তের মূল উৎস বা আইন। মুমিনদের মধ্যে অথবা মুসলিম শাসক ও জনগণের মধ্যে যদি কোনো বিষয়ে বা ব্যাপারে বিরোধ দেখা দেয়, তাহলে তা মিমাংসার জন্য কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে আসতে হবে। কুরআন ও সুন্নাহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যে ফায়সালা দেবে তা উভয় পক্ষকে মাথা পেতে মেনে নিতে হবে। এই নীতি মেনে নেওয়া হলো আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী একজন মুমিন ও মুসলিম শাসক এবং নাগরিকের দায়িত্ব। এভাবে জীবনের সকল বিষয় ও ক্ষেত্রে একই নীতি অবলম্বন করতে হবে।

এ প্রসংগে কেউ কেউ সংশয় প্রকাশ করে বলেন যে, জীবনের যাবতীয় সব বিষয়ের ফায়সালার জন্য কুরআন ও সুন্নাহর দিকে কিভাবে ফিরে যাওয়া সম্ভব হতে পারে ? কেননা, মিউনিসিপ্যালিটি, রেলওয়ে, ডাকঘর ইত্যাদি অসংখ্য বিষয় সম্পর্কিত কোনো নিয়ম-কানুনের উল্লেখই তাতে নেই। কিন্তু এ সংশয়টি সৃষ্টি হয়েছে দ্বীনের মূলনীতিসমূহ সঠিকভাবে অনুধাবন না করার কারণে। একজন কাফির ও একজন মুসলমানের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যই হলো, কাফির অবাধ স্বাধীনতার দাবীদার। কিন্তু একজন মুমিন অবাধ স্বাধীনতার অধিকারী নয়। সে আল্লাহর দাস। তাকে ইসলাম যতোটুকু স্বাধীনতা দিয়েছে ততোটুকুই সে ভোগ ব্যবহার করতে পারে, এর বাইরে নয়। একজন কাফির তার নিজের মনগড়া আইন দ্বারা তার যাবতীয় বিষয়ের বিচার-ফায়সালা করে এবং ঐশি কোনো সমর্থনের বা অনুমোদনের কোনো তোয়াক্কাই করে না। পক্ষান্তরে একজন মুসলিম তার প্রতিটি ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুমোদন বা সমর্থন আছে কি না, তা দেখে। সেখান থেকে কোনো নির্দেশ পেলে সে তার অনুসরণ করে। আর কোনো নির্দেশ না পেলে কেবলমাত্র এ অবস্থায়ই সে স্বাধীন ভাবে পদক্ষেপ নেয়ার সুযোগ লাভ করে। তবে এটা তার কর্মের স্বাধীনতা। তারপরেও এই স্বাধীনতা ভোগ করতে যেয়ে যেন কুরআন সুন্নাহ এবং ন্যায়নীতি পরিপন্থী কোনো কার্যকলাপ না হয়ে যায়। তার প্রতি তাকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়।

আয়াতের সর্বশেষে মহান আল্লাহ এই পদ্ধতিকে উত্তম বলে উল্লেখ করে বলেনঃ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

এটিই একটি কল্যাণকর কর্মপদ্ধতি এবং পরিণতির দিক দিয়েও অতি উত্তম।

অর্থাৎ একজন মুমিন যদি কুরআন ও সুন্নাহর নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করে, তাহলে তাতে মানুষের অধিকার লঙ্ঘিত হবে না, সমাজে মানুষের শত্রু বৃদ্ধি পাবে না, হিংসা-বিদ্বেস সৃষ্টি হবে না, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও বিসৃংখলা সৃষ্টি হবে না। বরং একজন মুমিন আর একজন মুমিনের মধ্যে এবং শাসক ও নাগরীকদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হবে। সমাজে শৃংখলা ফিরে আসবে। মানুষ মানুষের প্রতি সহানুভুতিশীল হবে ও শান্তি বিরাজ করবে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে কাজের গতি ফিরে আসবে। সাথে সাথে আখিরাতের জীবনও কল্যাণকর হবে।

শিক্ষা ঃ প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা আন্ নিসা-র ৫৮ ও ৬৯ দু'টি আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেশ করা হলো। এখন এতে আমাদের জন্য কি কি শিক্ষণীয় রয়েছে তা জানা প্রয়োজন। তাই নিম্নে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো তুলে ধরা হলোঃ

১. সকল প্রকারের আমানত, তা কথা হোক বা দায়িত্ব-কর্তৃত্ব হোক কিম্বা চাকুরী হোক অথবা সম্পদ ইত্যাদি হোক না কেন, তা তার প্রকৃত হকদার বা প্রাপকের নিকট যথাযথ ভাবে পৌঁছিয়ে দিতে হবে।

২. কোনো চাকুরী কিংবা নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব দেয়া বা অর্পণের জন্য টাকা বা অন্য কোনো বিনিময় গ্রহণ না করা। যেমন, হাদীয়া বা উপঢৌকন কিম্বা ঘুষ অথবা উৎকোচ যাই হোক না কেন।

৩. কোনো শালিস বা বিচার-মিমাংসার ক্ষেত্রে- তা পারিবারিক হোক কিম্বা সামাজিক হোক অথবা শাসন ব্যবস্থায় হোক কিম্বা বিচার ব্যবস্থায় হোক, সকল ক্ষেত্রে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র ইত্যাদি পার্থক্য না করে আ'দল ও ইনসাফ ভিত্তিক ফায়সালা করা।

৪. মহান আল্লাহ তা'লা সকলেরই স্রষ্টা। তাঁর আদেশ বা নির্দেশ সকলের জন্যই ইনসাফপূর্ণ ও কল্যাণকর। সুতরাং তাঁর আদেশকে সদুপদেশ মনে করে মনে-প্রাণে গ্রহণ করা।

৫. প্রতিটি মানুষের এই খেয়াল ও বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আ'লিমুল গায়িব মহান্ আল্লাহ্ তা'লা প্রতিটি কথা শোনেন-তা প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য মনের গভীর তলদেশেরই কথা হোক। তাছাড়া এও বিশ্বাস রাখতে হবে যে, তিনি আমাদের প্রতিটি কর্মপরিকল্পনা, কার্যক্রম ও কর্মতৎপরতা দেখে থাকেন ও পর্যবেক্ষণ করেন।

৬. নির্দিধায় নিঃসংকচে, নিঃশর্তভাবে আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ মেনে নিতে হবে এবং আনুগত্য করতে হবে। যেহেতু রাসূল (সঃ) ওহী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। এইজন্য তাঁর সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত সকল সুন্নাহ বা রীতি-নীতিকে এবং নির্দেশকে মেনে চলতে হবে। কেননা, রাসূলকে অমান্য করলে আল্লাহকে অমান্য ও তাঁর নাফরমানী করা হয়।

৭. 'উলিল আমর', অর্থাৎ ইসলামী সংগঠনের আমীর বা নেতৃত্ব এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের নেতৃত্ব কর্তৃত্বশীল ব্যক্তিদের শর্তসাপেক্ষে মা'রুফ কাজের আনুগত্য করতে হবে। শরীয়ত সম্মত কোনো নির্দেশ দিলে তা অবশ্যই মান্য করতে হবে তা পছন্দ হোক কিম্বা পছন্দ না হোক।

৮. ব্যক্তির পরিবর্তনে আনুগত্যের পরিবর্তন হবে না। যদিও সে নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তি গরীব হোক কিংবা নাক কাটা, কান কাটা কালা কুৎসিত হাবসী গোলামও হোক না কেন। কেননা, আল্লাহর নিকট সেই বেশী সম্মানী যে আল্লাহকে বেশী ভয় করে চলে। (আল কুরআন)

৯. আমীর বা শাসক শ্রেণী কোনো অন্যায় কাজে নির্দেশ দিলে তা যেমন শোনা যাবে না তেমনি মানাও যাবে না। তার এই অন্যায় কাজের বিরোধীতা করতে হবে এবং নিয়মতান্ত্রীকভাবে তা দূর করার জন্য চেষ্টা করতে হবে।

১০. যতক্ষণ পর্যন্ত শাসকবৃন্দ নিজে নামায পড়বে এবং সমাজ জীবনে নামায প্রতিষ্ঠিত রাখবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার আনুগত্য করে যেতে হবে। আর যদি এ আ'মলটি ছেড়ে দেয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রাম করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আমাদের সমাজে শাসকবৃন্দ কেউ কেউ ব্যক্তি জীবনে নামায পড়লেও রাষ্ট্রীয়ভাবে সমাজে আল্লাহর দ্বীন ও নামায প্রতিষ্ঠিত নেই। সুতরাং সমাজ জীবনে দ্বীন ও নামায প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন সংগ্রাম করতে হবে। কেননা, মহান আল্লাহ আল

কুরআনে ঘোষণা করেছেন- اَقِيْمُوا الدِّيْنَ "তোমরা দ্বীন কায়েম করো।" اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ "তোমরা সালাত বা নামায কায়েম করো।"

১১. পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র এবং বিচার ব্যবস্থায় আ'দল বা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এক্ষেত্রে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র কোনো পার্থক্য করা যাবে না। মানুষ হিসেবে সকলেই মুমিনদের কাছে ন্যায়বিচার প্রত্যাশা করে।

১২. কোনো বিষয়ে কিংবা ব্যাপারে মতোভেদ হলে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের বিধান ও সুন্নাহর দিকে ফিরে যেতে হবে। তাহলেই কেবলমাত্র বিতর্কের অবসান হতে পারে।

১৩. আল্লাহ ও রাসূলের বিধান ও সুন্নাহ অনুযায়ী ফায়সালা করলে ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করলে যেমন দুনিয়াতে শান্তি ও শৃংখলা বিরাজ করবে, তেমনি আখিরাতেও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করে চিরসুখী হওয়া যাবে।

আহবান ঃ প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা আন্ নিসা-র ৫৮ ও ৫৯ দু'টি আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও শিক্ষা পেশ করা হলো। এতে যদি আমার অজান্তে বা অজ্ঞাতে কোনো ভুল-ত্রুটি হয়ে যায়, তার জন্য আমি মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর এই দারস থেকে আমরা যেসব শিক্ষা লাভ করলাম তা যেন বাস্তব জীবনে আ'মল করতে পারি সেই তাওফিক কামনা করে দারস শেষ করছি। 'অ'আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন'।

ছয়

মতোবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সমাধানের উপায় হলো কুরআন ও সুন্নাহ। কঠোর থেকে কঠোরতর পরীক্ষা দিয়েই মুমিনদের জান্নাতে প্রবেশ করতে হবে। পরীক্ষা মোকাবেলার মাধ্যম হলো সবর ও আল্লাহর সাহায্য।

সূরা-আল বাকারা - ০২

আয়াত- ২১৩-২১৪

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيّنَ مُبَشِّرِيْنَ
وَمُنْذِرِيْنَ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ
النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ط وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ
مِنْ م بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًا م بَيْنَهُمْ ج فَهَدَى اللهُ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ ط وَاللهُ
يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْ
خُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ط
مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ

الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ط اَلَاۤ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ ٥

সরল অনুবাদ ঃ ইরশাদ হচ্ছে- (২১৩) প্রথম দিকে তো সমস্ত মানুষ একই পথের অনুসারী ছিলো (পরবর্তীতে তারা মতোভেদ সৃষ্টি করে) তখন আল্লাহ্ সত্য-সঠিক পথের অনুসারীদের জন্য (জান্নাতের) সুসংবাদ দাতা এবং বিপথগামীদের জন্য (জাহান্নামের) ভয় প্রদানকারী হিসেবে নবী পাঠালেন এবং তাঁদের সাথে নাযিল করলেন সত্য কিতাব, যাতে সত্য-সঠিক বিষয় সম্পর্কে তাদের মধ্যে যে মতোবিরোধের সৃষ্টি হয়েছিলো- তার চূড়ান্ত মিমাংসা করতে পারে। আসলে কিতাবের ব্যাপারে অন্য কেউ মতোভেদ করেনি, বরং পরিস্কার নির্দেশ এসে যাবার পর পরস্পরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেস বশত ঃ তারাই সেই সত্য-সঠিক বিষয় নিয়ে মতভেদ সৃষ্টি করেছিলো, যারা কিতাব প্রাপ্ত হয়েছিলো। অতঃপর আল্লাহ্ নিজের ইচ্ছানুযায়ী ঈমানদারদেরকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন সেই সত্য বিষয়ে, যে বিষয়ে তারা মতোবিরোধে জড়িয়ে পড়েছিলো। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সঠিক পথ দেখিয়ে দেন। (২১৪) তোমরা কি মনে করে নিয়েছো যে, তোমরা অতি সহজেই জান্নাতে প্রবেশ করার অনুমতি পাবে ? অথচ এখন পর্যন্ত তোমাদের উপর তোমাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় (বিপদ-আপদ) আসে নাই। তাদের উপর এসেছে বহু কষ্ট-কঠোরতা ও কঠিন বিপদ-মসীবত, তাদেরকে অত্যাচার-নির্যাতনে জর্জরিত করে দেয়া হয়েছে। এমন কি তৎকালীন রাসূল এবং তাঁদের সংগী-সাথীরা আর্তনাদ করে বলে উঠেছিলো, আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে ? তখন তাদেরকে সান্তনা দিয়ে বলা হয়েছিলো, যেন রেখো! আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ كَانَ - ছিলো। النَّاسُ -মানুষ। اُمَّةً - জাতি/দল। وَاحِدَةً - এক/একই। فَبَعَثَ اللّٰهُ - অতঃপর আল্লাহ পাঠালেন। اَلنَّبِيّٖنَ- নবীগণকে। مُبَشِّرِيْنَ -সুসংবাদদাতা। وَ - এবং। مُنْذِرِيْنَ -ভয় প্রদর্শনকারী। اَنْزَلَ- অবতীর্ণ করলেন। مَعَهُمْ - তাদের

সাথে। اَلْكِتٰبَ - গ্রন্থ। بِالْحَقِّ - সত্য সহকারে। لِيَحْكُمَ - যাতে মিমাংসা করতে পারে। بَيْنَ النَّاسِ - মানুষের মাঝে। فِيْمَا - যে বিষয়ে। اِخْتَلَفُوْا - তারা মতোভেদ করেছিলো। فِيْهِ - উহাতে/তাতে। اِلَّا - ছাড়া/ব্যতিরেকে। الَّذِيْنَ -যারা/যাদের। اُوْتُوْهُ -উহা দেয়া হয়েছিল। مِنْ م بَعْدِ - পরও। مَا - সাথে/যা। جَاءَتْهُمُ - তাদের নিকট আসলো। الْبَيِّنٰتُ - স্পষ্ট/উজ্জ্বল নিদর্শন। بَغْيًام - বিদ্বেষবশত। بَيْنَهُمْ -তাদের মাঝে। فَهَدَى اللّٰهُ - অতঃপর আল্লাহ পথ দেখালেন। الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا - যারা ঈমান এনেছিলো। لِمَا اخْتَلَفُوْا - যে বিষয়ে তারা মতোভেদ সৃষ্টি করেছিলো। فِيْهِ - তাতে/উহাতে। مِنَ الْحَقِّ - সেই সত্য বিষয় সম্পর্কে। بِاِذْنِهٖ - তাঁর অনুমতিক্রমে। يَهْدِى - পথ দেখান। مَنْ يَّشَاءُ - যাকে ইচ্ছা করেন। اِلٰى - দিকে। صِرَاطٍ - পথ। مُسْتَقِيْمٍ - সরল সঠিক। اَمْ حَسِبْتُمْ - তোমরা কি হিসাব/মনে করে নিয়েছো? اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ - যে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? وَلَمَّا - অথচ এখন পর্যন্ত। يَاْتِكُمْ - তোমাদের কাছে/উপর আসেনি। مَثَلُ - আবস্থা/অনুরূপ। الَّذِيْنَ - যারা। خَلَوْا - অতীত হয়েছে। مِنْ قَبْلِكُم তোমাদের পূর্বে। مَسَّتْهُمُ - নেমে এসেছিলো তাদের উপর। اَلْبَاْسَاءُ - অর্থ সংকট। اَلضَّرَّاءُ - দুঃখ কষ্ট/বিপদ-মসিবত। وَزُلْزِلُوْا-এবং তারা প্রকম্পিত হয়ে উঠেছিলো। حَتّٰى -এমন কি। يَقُوْلَ -তারা বলে উঠেছিলো/আর্তনাদ করেছিলো। اَلرَّسُوْلُ - তদানীন্তন রাসূল। وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا - আর যারা ঈমান এনেছিলো। مَعَهٗ

তাঁদের সাথে । مَتٰى - কখন আসবে? نَصْرُ اللّٰهِ - আল্লাহর সাহায্য। اَلَاۤ - হাঁ/যেন রেখো। اِنَّ - নিশ্চয়। نَصْرَ اللّٰهِ - আল্লাহর সাহায্য। قَرِيْبٌ - অতি নিকটে।

সম্বোধন ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা! আসসালামু আলাইকুম অয়া রাহমাতুল্লাহি অয়া বারাকাতুহ্। আমি আপনাদের সামনে পবিত্র আল কুরআনের সর্ববৃহত সূরা- সূরা আল বাকারার ২১৩ ও ২১৪ দু'টি আয়াত তিলাওয়াত ও সরল অনুবাদ পেশ করেছি। মহান আল্লাহ পাক যেন আমাকে হক আদায় করে তিলাওয়াতকৃত আয়াত দু'টির দারস পেশ করার তাওফীক দান করেন। "অমা তাওফীকি ইল্লাহবিল্লাহ।"

সূরার নামকরণ ঃ এই সূরার নাম 'সূরাতুল বাকারা'। بَكَرَةٌ - শব্দের অর্থ গাভী বা গরু। অত্র সূরার ৮ম রুকুর ৬৭-৭১ নম্বর আয়াত পর্যন্ত বনী ইসরাঈলদের প্রতি গরু জবেহ্ করার নির্দেশ দিতে গিয়ে بَكَـــرَةٌ শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে। সেই উল্লেখিত 'বাকারা' শব্দটিকেই বাছাই করে চিহ্ন বা প্রতীকী হিসেবে এই সূরার নাম "সূরাতুল বাকারা" নামকরণ করা হয়েছে। এই সূরার নামকরণ কোনো শিরোনাম হিসেবে করা হয়নি। তবে যা কিছু করা হয়েছে ওহীর নির্দেশেই করা হয়েছে।

সূরাটি নাযিলের সময়কাল ঃ এই সূরার অধিকাংশ আয়াত-ই হিজরাতের পর মাদানী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়। অবশ্য এই সূরার কিছু আয়াত মাদানী জীবনের শেষের দিকে যেমন, সুদ হারাম সংক্রান্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্ক থাকার কারণে এই সূরার সাথে সম্পর্কিত করে দেয়া হয়। আবার কিছু আয়াত বিশেষ করে সূরার শেষের আয়াতগুলো হিজরাতের পূর্বে মক্কায় নাযিল হয়েছিলো, কিন্তু বিষয় বস্তুর সাথে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে এই সূরার সাথে সংযোগ করে দেয়া হয়েছে। তবে সবকিছুই করা হয়েছে ওহীর নির্দেশের মাধ্যমে।

এই সূরার অধিকাংশ আয়াতই হিজরাতের পরে নাযিল হয়েছে বিধায় এই সূরাকে 'মাদানী' সূরা বলা হয়। এটি আল কুরআনের সবচেয়ে বড় সূরা। এতে ৪০টি রুকু এবং ২৮৬টি আয়াত রয়েছে।

সূরাটির বিষয়বস্তু ঃ এই দীর্ঘতম সূরায় ইসলামের অধিকাংশ মূল নীতিগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। সূরার প্রথমেই মুত্তাকী, কাফির ও মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য এবং তাদের প্রতিফল ও পরিণামের কথাও বর্ণনা করা হয়েছে। আদম সৃষ্টি ও মানব জাতির দুনিয়ায় আগমনের ইতিকথাও আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া বনি ইসরাঈলদের প্রতি আল্লাহর অসংখ্য অনুগ্রহ এবং তাদের অকৃতজ্ঞতার কথাও বর্ণনা করা হয়েছে। এতে মৌলিক ইবাদত- নামায, রোজা, জাকাত ও হজ্জ্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া বিবাহ-তালাক, হালাল-হারাম, ব্যবসা-বানিজ্য, জিহাদ এবং যুদ্ধনীতি ইত্যাদি বিষয়ে বিধি-বিধান ও নিয়ম-কানুন বর্ণনা করা হয়েছে। তাছাড়া কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশ এবং সূরার সবশেষে দুনিয়া এবং আখিরাতের কল্যাণ কামনার জন্য মহান আল্লাহ পাক বান্দাহদের এক হৃদয়গ্রাহী মুনাজাত শিখিয়ে দিয়েছেন।

আলোচ্য আয়াত দু'টির বিষয়বস্তু ঃ ২১৩ নং আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে যে, প্রথম দিকে সকল মানুষই একই পথ-পন্থার অনুসারী ছিলো। কালক্রমে তারা বিভেদে জড়িয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় তাদের বিভেদ দূর করার জন্য যুগে যুগে নবী পয়গাম্বর পাঠিয়েছেন সত্য পথের অনুসারীদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদদাতা এবং বিপথগামীদের জন্য জাহান্নামের ভয় দান কারী হিসেবে। সাথে সাথে তাদের মতোভেদ দূর করার জন্য আসমানী কিতাব দান করেছেন।

২১৪ নং আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে যে, ঈমানের দাবীদাররা মনে করে যে, তারা কোনো পরীক্ষা ছাড়াই এমনি এমনি বিনা বাধায় জান্নাতে চলে যাবে। অথচ অতীতের নবী-রাসূল এবং তাঁদের সঙ্গী-সাথীদের কঠিন থেকে কঠিনতর পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। সেই পরীক্ষা এমন ছিলো যে, কঠিন যুলুম নির্যাতনে তারা জর্যরিত হয়ে আল্লাহর সাহায্যের জন্য আর্তনাদ করে উঠেছিলো, আর আল্লাহও তাদেরকে সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছিলেন।

সূরার পটভূমি ঃ মাক্কী সূরাগুলোতে মহান আল্লাহ পাক মক্কার কাফির ও মুসলমানদেরকে সম্বোধন করেই বিভিন্ন সূরা ও আয়াত নাযিল করেন। তার কারণ মক্কাতে এ দু'টি দলই ছিলো। মুসলমানরা মুহাম্মদ (সঃ) কে আল্লাহর রাসূল এবং আল কুরআনকে আল্লাহর কালাম হিসেবে মানতো।

পক্ষান্তরে কাফিররা আল্লাহর রাসূলের বিরোধীতা করতো এবং আল কুরআনকে আল্লাহর কালাম বলে স্বীকার করতো না। এ কারণেই এই দু'দলের উপলক্ষ্যেই কুরআনের আয়াতসমূহ নাযিল হতো। কিন্তু মদীনায় হিজরাতের পর আরো দু'টি দল ইহুদী ও মুনাফিকদের মোকাবেলা করতে হলো। ইহুদীরা 'আহলি কিতাব' হওয়ার কারণে তারা নবী-রাসূল বিহিশত-দোযখ, কিয়ামত, আখিরাত ও আসমানী কিতাব- তাওরাত, যাবুর এবং ইঞ্জিলে রাসূলের পরিচয় ও তাঁর উপর নাযিল হওয়া আল কুরআন আল্লাহ তা'লার নিজস্ব কালাম হওয়ার সত্যতা বর্ণিত হয়েছে, তা তারা জানতো। কিন্তু ইহুদীরা অহেতুক হিংসার বশবর্তী হয়ে তাঁর সত্যতা সম্পর্কে জানা-শোনার পরও রাসূলের বিরোধীতা করতো। অপর পক্ষে মুনাফিকরা মুসলিম সমাজের সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার লোভে মুখে নিজেকে মুসলিম হিসেবে জাহির করলেও ভিতরে ভিতরে তারা মুহাম্মদ (সঃ) ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতা করতো। এমনকি তারা কিভাবে মুহাম্মদ (সঃ) এবং তাঁর দলকে ধ্বংস করা যায়, তার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকতো এবং সুযোগ পেলেই কাজে লাগাতো। মাদানী এই সূরা আল বাকারা উপরোক্ত এই চার শ্রেণী লোকদের সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা আল বাকারার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হলো। এখন আমি তিলাওয়াতকৃত আয়াত দু'টির ব্যাখ্যা আপনাদের সামনে ধারাবাহিকভাবে পেশ করছি। প্রথম আয়াতে সকল মানুষ একই দলভুক্ত ছিলো কিন্তু কালক্রমে তারা মতোভেদে জড়িয়ে পড়ে উল্লেখ করে মহান আল্লাহ বলেন-

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ ج فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ ط وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

প্রথমে তো সকল মানুষ একই পথের অনুসারী ছিলো (পরবর্তীতে তারা মতোভেদে জড়িয়ে পড়ে)। তখন আল্লাহ্ নবী পাঠালেন সত্য সন্ধানীদের জন্য সুসংবাদদাতা এবং বিপথগামীদের জন্য আযাবের ভয় দানকারী হিসেবে। তার সাথে নাযিল করলেন কিতাব, যাতে তাদের মধ্যে যে মতোবিরোধ সৃষ্টি হয়েছিলো সে বিষয়ে তারা চূড়ান্ত ফায়সালা করতে পারে। আসলে কিতাবের ব্যাপারে অন্য কেউ মতোভেদ করেনি, বরং পরিস্কার নির্দেশ এসে যাবার পর পরস্পরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেশ ও হঠকারিতার কারণে তারাই সেই সত্য সঠিক বিষয় নিয়ে মতোভেদ সৃষ্টি করেছিলো, যারা কিতাব প্রাপ্ত হয়েছিলো। অতঃপর আল্লাহ্ নিজ ইচ্ছানুযায়ী ঈমানদারদেরকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন সেই সত্য বিষয়ে যে ব্যাপারে তারা মতোবিরোধে জড়িয়ে পড়েছিলো। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সঠিক পথ দেখিয়ে দেন।

অর্থাৎ এই আয়াতে যা পাওয়া যায় তা হলো, কোনো এক সময় পৃথিবীর সমস্ত মানুষ একই মতাদর্শ ও প্রকৃতির ধর্ম ইসলামের অনুসারী ছিলো। সবাই একই ধরনের বিশ্বাস ও আকীদা পোষণ করতো। কালক্রমে তাদের মধ্যে আকীদা-বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার মধ্যে বিভেদ দেখা দেয়। ফলে হক ও বাতিল তথা সত্য মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই মহান আল্লাহ মেহেরবাণী করে সত্য ও সঠিক মতবাদকে প্রকাশ করার জন্যে এবং সঠিক পথ বাতলিয়ে দেয়ার জন্যে নবী ও রাসূলগণকে প্রেরণ করেন এবং সাথে সাথে তাদের প্রতি আসমানী কিতাব নাযিল করেন। নবী ও রাসূলগণের চেষ্টা ও দাওয়াতের ফলে মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদল আল্লাহর প্রেরিত নবী-রাসূল এবং তাঁদের প্রদর্শিত সত্য-সঠিক পথ ও মতবাদকে গ্রহণ করে নিয়ে মুমিন-মুসলিম হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। আর একদল তা প্রত্যাখান করে নবী রাসূলগণকে মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করে অবাধ্য ও অবিশ্বাসী হয়ে কাফির হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

أُمَّةٌ (উম্মাতুন) কাকে বলে? ঃ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً আয়াতে উল্লেখিত أُمَّةٌ শব্দের অর্থ করতে গিয়ে ইমাম রাগেব ইস্পাহানী 'মুফরাদুল কুরআনে' বলেছেন, আরবী অভিধান অনুযায়ী এমন মানব গোষ্ঠীকে أُمَّةٌ

(উম্মত) বলা হয়, যাদের মধ্যে কোনো বিশেষ কারণে সংযোগ, ঐক্য ও একতা বিদ্যমান থাকবে। সেই ঐক্য, মতাদর্শ ও বিশ্বাসজনিতই হোক অথবা একই যুগে একই এলাকা বা দেশের অধিবাসী হওয়ার কারণেই হোক কিংবা কোনো অঞ্চলের বংশ, বর্ণ ও ভাষার মিলের কারণেই হোক।

(মা'রিফুল কুরআন)

কোন্ বিষয়ে এক বা ঐক্যবদ্ধ ছিলো ? ঃ আয়াতে উল্লেখ আছে أُمَّةً وَّاحِدَةً "একই উম্মত বা দলভুক্ত ছিলো।" কোন্ বিষয়ে এক বা ঐক্যবদ্ধ ছিলো? এর উত্তর আয়াতের শেষের বাক্যটির দ্বারা পাওয়া যায়। এতে তাদের মধ্যে মতানৈক্য বা মতোভেদ সৃষ্টি হওয়া এবং বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে হক ও সত্য সঠিক মতবাদ নির্ধারণের ব্যাপারে নবী ও রাসূল পাঠানোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, এ মতাদর্শের মধ্যে মীমাংসা করার জন্যে নবী-রাসূল প্রেরণ এবং আসমানী কিতাব নাযিল করা হয়েছে। এতেই বুঝা যায় বা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাদের মধ্যে মতাদর্শ, আকীদা ও চিন্তা-চেতনার বিষয়ে মতোবিরোধ বা মতানৈক্য দেখা দিয়েছিলো। একাত্ববাদ বলতে আল্লাহর একাত্বকেই বুঝানো হয়েছে।

সুতরাং এই বাক্যটির অর্থ দাঁড়ায় এই যে, এমন এক সময় ছিলো, যখন প্রতিটি মানুষ একই মত ও আদর্শ এবং একই ধর্মের অনুসারী ছিলো। এখানে প্রশ্ন হলো তারা কি তাওহীদ ও ঈমানের দিক দিয়ে ঐক্যবদ্ধ ছিলো না মিথ্যা ও কুফরীর বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ ছিলো? অধিকাংশ তাফসীরবিদগণের মতে তারা তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদ ও ঈমানের বিষয়ে ঐক্যমত বা ঐক্যবদ্ধ ছিলো।

তাওহীদ ও ঈমানের বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকার যুগ কোন্‌টি ? ঃ এখন জানা প্রয়োজন যে, সত্য দ্বীন ও ঈমানের উপর সমস্ত মানুষ কোন্ কালে বা যুগে ঐক্যবদ্ধ ছিলো ? এখানে কয়েকটি মত পাওয়া যায়। যেমন-

প্রথম মত ঃ তাফসীরকার সাহাবীগণের মধ্যে হযরত উবাই ইবনে কা'ব ও ইবনে যায়েদ (রাঃ) বলেছেনঃ এ বিষয়টি 'আ'লামে আযল' বা আত্মার জগতের বিষয়। কেননা, সমস্ত মানুষের রূহ বা আত্মাকে সৃষ্টি করে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো- أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ "আমি কি তোমাদের রব বা

পালনকর্তা নই?" তখন তারা সকলেই এক ব্যাক্যে বলেছিলো- قَالُوْابَلٰى (হ্যাঁ, নিশ্চয়।) অর্থাৎ তারা একই আকিদা ও বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিলো, যাকে ঈমান ও ইসলাম বলা হয়। (কুরতুবী)

দ্বিতীয় মত ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এই একত্ববাদের বিশ্বাস তখনকার, যখন হযরত আদম (আঃ) তাঁর স্ত্রী (হাওয়াকে) নিয়ে দুনিয়াতে আগমন করলেন এবং তাঁদের সন্তান-সন্ততি জন্মাতে লাগলো আর মানব বংস বৃদ্ধি পেতে শুরু করলো। তারা সবাই আদম (আঃ) এর ধর্ম, তাঁর শিক্ষা ও শরীয়তের অনুগত ছিলো। একমাত্র কাবিল ছাড়া সবাই তাওহীদের অর্থাৎ একাত্ববাদের সমর্থক ছিলো। মুসনাদ-ই বায্যার গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাসের উদ্ধৃতির সাথে একথাও উল্লেখ রয়েছে যে, একাত্ববাদের ধারণা হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে হযরত ইদ্রীস (আঃ) পর্যন্ত বিদ্যমান ছিলো। সে সময় সবাই মুসলমান ও একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলো। এ উভয় নবীর (আদম থেকে ইদ্রীস আঃ পর্যন্ত) মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান ছিলো দশ 'কর্ণ'। বাহ্যিকভাবে এক 'কর্ণ' দ্বারা এক শতাব্দী বোঝা যায়। সুতরাং মোট সময়কাল ছিলো দশ শতাব্দী বা এক হাজার বছর।

তৃতীয় মত ঃ কোনো কোনো তাফসীরকারকগণ বলেছেন, এই একই বিশ্বাসের যুগ ছিলো হযরত নূহ (আঃ) এর তুফান পর্যন্ত। নূহ (আঃ) এর সাথে যারা নৌকায় উঠেছিলো তারা ছাড়া সমগ্র বিশ্ববাসী এতে ডুবে মরেছিলো।

প্রকৃতপক্ষে এই তিনটি মতের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। তিনটি যুগই এমন ছিলো, যে যুগগুলোতে সমস্ত মানুষ একই মতবাদ ও একই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত ছিলো এবং সত্য দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো।

(মা'রিফুল কুরআন)

পরবর্তীতে কোন্ বিষয়ে মতোবিরোধ হলো ঃ উল্লেখিত আয়াতে কোন্ বিষয়ে মতোভেদ হলো তার কোনো উল্লেখ না করেই বলা হয়েছে-

فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ " অতঃপর আল্লাহ তা'লা নবী পাঠালেন"।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত নূহ (আঃ) ও হযরত আদম (আঃ) এর মধ্যে দশটি যুগ ছিলো। ঐ যুগসমুহের লোকেরা

সত্য শরীয়তের অনুসারী ছিলো, অতঃপর তাদের মধ্যে মতোভেদ সৃষ্টি হলো, তখন আল্লাহ তা'লা নবীগণকে প্রেরণ করেন। তার কিরাত হলো- وَمَاكَانَ النَّاسُ اِلَّآ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوْا "অর্থাৎ মানব জাতি একই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলো, অতঃপর তারা মতোভেদ সৃষ্টি করে।"

(সূরা ইউনুস-১৯)

হযরত কাতাদাহ্ও তাফসীর এরকমই করেছেন যে, যখন তাদের মধ্যে মতোভেদ সৃষ্টি হয়ে যায়, তখন আল্লাহ তা'লা তাঁর প্রথম রাসূল হযরত নূহ (আঃ) কে প্রেরণ করেন। হযরত মুজাহীদও এটাই বলেন।

(ইবনে কাসীর)

যদিও এখানে এবং সূরা ইউনুসের ১৯ নং আয়াতে কোন্ বিষয়ে মতানৈক্য বা মতোভেদ সৃষ্টি হয়েছিলো তা উল্লেখ করা না হলেও উপরে উল্লেখিত তাফসীরে যে বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ ছিলো অর্থাৎ তাওহীদ ও ঈমানের বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ ছিলো উল্লেখ করা হয়েছে, এতেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পরবর্তীতে তাদের মধ্যে সেই বিষয়েই মতোভেদ বা মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছিলো।

মানুষের মধ্যে এসব মতানৈক্য মিমাংসার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিলো, সে প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ পরবর্তী ব্যাক্যে বলেন-

فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ

অতঃপর আল্লাহ তা'লা নবী পাঠালেন (মুমিনদের জান্নাতের) সুসংবাদ এবং (কাফিরদের আযাবের) দুঃসংবাদ দানকারী হিসেবে।

অর্থাৎ যারা তাওহীদ ও ঈমানের বিষয়ে মানুষের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হওয়ার পরও প্রকৃতির ধর্ম ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো, তাদের জন্য আল্লাহ তা'লা যুগে যুগে নবী রাসূল পাঠিয়ে চিরস্থায়ী জান্নাতের সুসংবাদ দান করছেন এবং যারা মতানৈক্য সৃষ্টি করে আল্লাহর একত্ববাদের মধ্যে শিরক ঢুকিয়ে দিলো এবং ঈমানের বিষয়ে কুফরী করলো তাদেরকে জাহান্নামের কঠিন আযাবের দুঃসংবাদ শুনিয়ে দিলেন।

অতঃপর তাদের মতানৈক্য মিমাংসার জন্য নবীদের কাছে কিতাব পাঠালেন উল্লেখ করে পরবর্তী ব্যাক্যে মহান আল্লাহ বলেন-

وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ

এবং তিনি তাঁদের সাথে সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করলেন, যাতে করে ঐ কিতাব দ্বারা তাদের মধ্যে মতোভেদের বিষয়গুলো মিমাংসা করে দেন।

অর্থাৎ মানুষের মধ্যে যেসব মতাদর্শের সৃষ্টি হয়েছিলো তা নিরসনকল্পে মহান আল্লাহ নবীদের উপর ওহী ও আসমানী কিতাব নাযিল করলেন যাতে করে বিভিন্ন মতাদর্শের নিরসন করে সত্য ও সঠিক মতাদর্শ জানিয়ে দিতে পারেন।

অতঃপর আয়াতের পরবর্তী ব্যাক্যে মহান আল্লাহ বলেন-

وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ

অথচ কিতাবের ব্যাপারে অন্য কেউ মতোভেদ করেনি, বরং তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও পরস্পরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেশ ও হঠকারিতা বশতঃ তারাই সেই সত্য সঠিক বিষয় নিয়ে মতোভেদ সৃষ্টি করেছিলো, যারা কিতাব প্রাপ্ত হয়েছিলো।

অর্থাৎ নবী রাসূল এবং আসমানী কিতাবের দ্বারা প্রকাশ্য ও অকাট্য যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন করার পরও বিশ্ববাসী দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে গেল। কিছু লোক এ হিদায়েতকে প্রত্যাখান করে কাফির হয়ে গেল। আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো এই যে, যাদের কাছে নবী-রাসূল এবং বস্তুনিষ্ঠ আসমানী কিতাব এসেছে তাদেরই একদল তা অগ্রাহ্য করেছে। অর্থাৎ ইহুদী-নাসারাগণ যাদেরকে 'আহলি কিতাব' বলা হয়। এরা জেনে বুঝেও শুধুমাত্র গোড়াঁমী, হিংসা-বিদ্বেস ও জেদের বশবর্তী হয়ে তারা এসবের বিরোধিতা করেছে।

আর অপর দলটি আল্লাহর হিদায়েতকে মেনে নিলো। নবী-রাসূল ও আসমানী কিতাবের বিষয়ে মতানৈক্য বা সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি না করে বরং তারা প্রকৃত দ্বীন ইসলামের উপর টিকে থেকে আল্লাহর অনুগত বান্দাহ হিসেবে গণ্য হলো। অতঃপর পরবর্তী ব্যাক্যে মহান আল্লাহ বলেন-

فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ ؕ وَاللّٰهُ

يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

অতঃপর আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী ঈমানদারদেরকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন সেই সত্য বিষয়ে, যে ব্যাপারে তারা মতোবিরোধে জড়িয়ে পড়েছিলো। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সঠিক পথ দেখিয়ে দেন।"

অর্থাৎ আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী মুমিনদের সুপথ দেখিয়ে দেন। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে মুমিনদের জন্য বিশেষ অনুগ্রহ। সুতরাং তারা মতোবিরোধের চক্র হতে বের হয়ে সরল সঠিক পথের সন্ধান লাভ করে।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) হাদীসে উল্লেখ করেন, আমরা দুনিয়ায় আগমনকারী হিসেবে সর্বশেষ বটে, কিন্তু কিয়ামতের দিন জান্নাতে প্রবেশের ক্ষেত্রে আমরাই সর্বপ্রথম হবো। আহলি কিতাবকে (ইহুদী নাসারাদেরকে) আল্লাহর কিতাব আমাদের পূর্বে দেয়া হয়েছে এবং আমাদের দেয়া হয়েছে পরে। কিন্তু তারা তাতে মতোভেদ সৃষ্টি করে এবং আল্লাহ আমাদেরকে সুপথ দেখান। জুমুয়া'র দিন সম্পর্কেও এদের মধ্যে মতোবিরোধ রয়ে যায়। কিন্তু আমাদের এই বিষয়ে সৌভাগ্য লাভ হয় যে, এই দিক দিয়েও সমস্ত আহলি কিতাব আমাদের পেছনে পড়ে যায়। 'শুক্রবার' আমাদের, 'শনিবার' ইহুদীদের এবং 'রবিবার' খৃষ্টানদের।

হযরত যায়েদ বিন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, জুমু'য়া ছাড়াও কিবলার বিষয়েও এটা ঘটেছে। খৃষ্টানরা পূর্ব দিককে কিবলা বানিয়েছে, আব ইহুদীরা কিবলা করেছে বায়তুল মুকাদ্দাসকে, কিন্তু মুহাম্মদ (সঃ) এর অনুসারীরা কা'বাকে তাদের কিবলা নির্ধারণ করেছে।

নামাযের বিষয়েও মুসলমানরা আগে রয়েছে। আহলি কিতাবদের কারও নামাযে রুকু আছে কিন্তু সাজদাহ নেই, আবার কারও সাজদাহ্ আছে কিন্তু রুকু নেই। আবার কেউ কেউ নামাযে কথাবার্তা বলে থাকে, আবার কেউ কেউ নামাযে চলাফেরা করে থাকে। কিন্তু মুহাম্মদ (সঃ) এর উম্মতের নামায নীরবতা ও স্থীরতার সাথে পালিত হয়। এরা নামাযের মধ্যে না কথা বলবে, না চলাফেরা করবে। রোযার বিষয়েও তাদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কিন্তু এতেও মুহাম্মদ (সঃ) এর উম্মত সুপথ লাভ করেছে। পূর্বের উম্মতের লোকেরা কেউ কেউ তো দিনের কিছু অংশ রোযা রাখতো এবং কেউ কেউ কোনো কোনো প্রকারের খাদ্য ত্যাগ করতো। কিন্তু আমাদের রোযা সবদিক দিয়েই পূর্ণতা লাভ করেছে এবং এর মধ্যে আমাদেরকে সত্য পথ সম্বন্ধে বুঝানো হয়েছে।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কে ইহুদীরা বলেছিলো যে, তিনি ইহুদী ছিলেন এবং খৃষ্টানরা বলেছিলো যে, তিনি খৃষ্টান ছিলেন। কিন্তু তিনি একজন পুরোপুরি মুসলিম ছিলেন। সুতরাং এই ব্যাপারেও আমরা সুপথ লাভ করেছি এবং ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কে আমাদেরকে সঠিক ধারণাই দেয়া হয়েছে।

হযরত ঈসা (আঃ) কেও ইহুদীরা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো এবং তাঁর সম্মানিতা মা সম্পর্কে জঘণ্য মিথ্যা কথা বলেছিলো। আর খৃষ্টানরা তাঁকে আল্লাহ ও আল্লাহর পুত্র বলেছিলো। কিন্তু মুসলমানকে আল্লাহ্ তা'লা এ দু'টো হতেই রক্ষা করেছেন। তারা তাঁকে আল্লাহর রূহ, আল্লাহর কালিমা এবং সত্য নবী বলে স্বীকার করেছে। (ইবনে কাসীর)

হযরত রাবী বিন আনাস (রাঃ) বলেন, আয়াতটির ভাবার্থ এই যে, যেমনভাবে সমস্ত লোক আল্লাহর উপাসনাকারী ছিলো, তারা সৎকাজ করতো এবং অসৎ কাজ হতে বিরত থাকতো। অতঃপর মাঝপথে তাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছিলো। তেমনিভাবে শেষ উম্মতকে আল্লাহ তা'লা মতানৈক্য হতে সরিয়ে প্রথম দলের ন্যায় সঠিক পথে নিয়ে এসেছেন। এই উম্মত অন্যান্য উম্মতের উপর স্বাক্ষী হবে। এমনকি হযরত নূহ (আঃ) এর উম্মতের উপরেও এরা স্বাক্ষ্য দেবে। হযরত হুদ (আঃ) এর কওম, হযরত তালূত (আঃ) এর কওম, হযরত সালেহ (আঃ) এর কওম, হযরত শুয়া'ইব (আঃ) এর কওম এবং ফিরাউনের বংশধরদের মীমাংসাও এদের স্বাক্ষের মাধ্যমেই হবে। এরা বলবে যে, এই নবীগণ (আঃ) প্রচার করছিলেন আর এই উম্মতেরা তাঁদেরকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো। (ইবনে কাসীর)

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে-

وَاللّٰهُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

আর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সরল সঠিক পথ দেখিয়ে থাকেন।

অর্থাৎ সঠিক পথ পাবার জন্য চেষ্টা করতে হবে। তবে সঠিক পথ পাওয়া আল্লাহর উপর নির্ভর করে। তিনি যাকে ইচ্ছা সঠিক পথ দেখিয়ে থাকেন। এই জন্য সঠিক পথ পাবার জন্য নিজে যেমন চেষ্টা করতে হবে তেমনি চেষ্টার সাথে সাথে আল্লাহর কাছে সাহায্যও চাইতে হবে।

সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন রাতে তাহাজ্জুদ নামাযের জন্যে উঠতেন তখন এই দোয়াটি পাঠ করতেন-

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَاءِ يْلَ وَاِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ - اِهْدِنِيْ لِمَااخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِكَ اِنَّكَ تَهْدِيْ مَنْ تَشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

"হে আল্লাহ! হে জিবরাঈল, মিকাঈল ও ইসরাফিলের রব! হে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা! হে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্যের জ্ঞাতা! তুমিই তোমার বান্দাহ্দের পারস্পারিক মতোভেদের মীমাংসা করে থাকো। আমার মুনাজাত এই যে, যেসব বিষয়ে মতোভেদ সৃষ্টি হয়, তার মধ্যে যা সঠিক তুমি আমাকে তারই জ্ঞান দান করো। তুমি তো যাকে ইচ্ছা সরল সঠিক পথ দেখিয়ে থাকো।"

এছাড়াও নবী করীম (সঃ) আরও দোয়া পাঠ করে থাকতেন। যেমন-

اَللّٰهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ الْحَقَّ وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهٗ وَاَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلاً وَّارْزُقْنَا اجْتِنَابَهٗ وَلَاتَجْعَلْهُ مُتَلَبِّسًا عَلَيْنَا فَنَضِلُّ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا

"হে মহান আল্লাহ! যা সত্য তা আমাদেরকে সত্য হিসেবেই দেখাও এবং তা অনুসরণ করার তাওফীক আমাদেরকে দান করো। আর মিথ্যাকে মিথ্যা হিসেবেই আমাদেরকে দেখাও এবং আমাদের তা হতে বাঁচবার তাওফীক দান করো। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সামনে সত্য এবং মিথ্যার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে দেখিও না, যার কারণে আমরা বিপথগামী হয়ে পড়ি। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে সৎ ও মুত্তাকী লোকদের ইমাম বানিয়ে দাও। (ইবনে কাসীর) নবীর সঠিক-সত্য পথ পাবার জন্য এই পথ ধরেই আমাদেরকে চলতে হবে।

পূর্বোকালে তো আহলি কিতাবীরা দ্বীনের বিষয়ে মতানৈক্য করেছিলো। কিন্তু অতীতকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে আল

কুরআন ও নবীর সহীহ্ হাদীস থাকার পরও নিজেরাই মতানৈক্যে-মতোভেদে জড়িয়ে পড়েছে এবং পড়ছে। আর এই মতোভেদ সৃষ্টি করছেন আলেম শ্রেণীরাই। সুতরাং আমাদেরকে সঠিক এবং সত্য পথ পেতে হলে অথবা কোনো বিষয়ে সত্য তালাশ করতে হলে আল কুরআন এবং সহীহ্ হাদীস থেকেই তালাশ করতে হবে। আর যদি এ দু'টি থেকে আমরা সত্য-সঠিক বিষয় সন্ধান করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে অবশ্যই আমরা গোমরাহীর পথে ধাবিত হবো। যেমন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বিদায় হজ্বের ভাষণে তাঁর উম্মতের সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া সম্পর্কে বলতে গিয়ে হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণিত হাদীসে মহানবী (সঃ) বলেছেন-

اِنِّىْ قَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا اِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهٖ فَلَنْ تَضِلُّوْا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهٖ

"আমি তোমাদের মাঝে এমন দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি- যা আঁকড়ে ধরলে তোমরা কখনো বিপথগামী হবে না। তার একটি হচ্ছে আল্লাহর কিতাব এবং অপরটি হচ্ছে তাঁর নবীর সুন্নাহ।" (মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

হে আল্লাহ! আমাদেরকে তোমার পবিত্র কালাম আল কুরআন এবং নবীর সহীহ্ হাদীস থেকেই সঠিক বিষয় তালাশ করার তাওফীক দান করো। আমীন।

অতঃপর জান্নাত পাবার সঠিক পথ বাতলিয়ে দিয়ে মহান আল্লাহ পরবর্তী আয়াতে বলেন-

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللهِ ط اَلَآ اِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيْبٌ

তোমরা কি মনে করে নিয়েছো যে, তোমরা অতি সহজেই জান্নাতে প্রবেশ করার অনুমতি পাবে। অথচ এখন পর্যন্ত তোমাদের উপর পূর্ববর্তীদের ন্যায় (বিপদ-আপদ) আসে নাই। তাদের উপর এসেছে বহু কষ্ট-কঠোরতা ও কঠিন বিপদ-মুসীবত, তাদেরকে অত্যাচার-নির্যাতনে জর্জরিত করে

দেয়া হয়েছে। এমনকি তৎকালীন রাসূল এবং তাঁদের সংগী-সাথীরা আর্তনাদ করে বলে উঠেছিলো, আল্লাহর সাহায্য কবে আসবে ? তখন তাদেরকে সান্তনা দিয়ে বলা হয়েছিলো যে, জেনে রেখো, আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে।

উপরের আয়াত এবং এই আয়াতের মাঝখানে এক লম্বা ঘটনা উল্লেখ করা হয়নি। উল্লেখ না করার কারণ হলো, শেষের আয়াত-ই সেই দিকে পরিস্কার ভাবে ইংগিত করেছে এবং আল কুরআনের মাক্কী সূরা সমূহে যা সূরা বাকারার পূর্বে নাযিল হয়েছিলো সেসব সূরাগুলোতে এই মহা পরীক্ষার ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

অনেকের ধারণা বা আশা যে, দুনিয়ার পরীক্ষা ছাড়াই সে বাধাহীন সহজ সহজ আ'মল করে জান্নাতে চলে যাবে। এ শ্রেণীর লোক আগেও ছিলো, এখনও আছে, হয়তো ভবিষ্যতেও থাকবে। কিন্তু আয়াতের ভাবার্থে বুঝা যায় যে, পরীক্ষার পূর্বে জান্নাতে প্রবেশের আশা করা ঠিক নয়। আয়াতেই উল্লেখ করা হয়েছে, যুগে যুগে যতো নবী-রাসূল এসেছেন, তাঁদের সকলকেই এবং তাঁদের অনুসারী সঙ্গী-সাথীদেরকে কঠিন থেকে কঠিনতর পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাঁদেরকে যেমন একদিকে দুনিয়ার বালা-মসিবত, রোগ-শোক, বিপদ-আপদ, অভাব-অনটন ইত্যাদি দিয়ে শারিরীক, মানসিক ও আর্থিক পরীক্ষা করা হয়েছিলো, তেমনি সমসাময়িক শত্রুর মোকাবেলা করতে হয়েছিলো। আল্লাহদ্রোহী ও অহংকারী লোকদের সহিত জান-প্রাণ দিয়ে মোকাবিলা করতে হয়েছিলো। তাঁদেরকে শত্রুর ভয় ও আতংকে আতংকিত করে তুলেছিলো। তারপরও তাঁরা সকল ধরনের ও প্রকারের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে সফলতা লাভ করেছিলেন। ফলে তাঁরা এই কঠিন থেকে কঠিনতর পরীক্ষা মোকাবেলা করেই জান্নাত লাভ করেছিলেন।

পরীক্ষা ছাড়া জান্নাত পাওয়া যাবে না, তাই পরীক্ষার উদ্দেশ্য হলো ঈমানের দাবীদারদের সত্য-মিথ্যা প্রমাণ করা। এই সম্পর্কে সূরা আনকাবুতের ২ ও ৩ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন-

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوْا أَنْ يَقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ○ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ

"মানুষেরা কি মনে করে নিয়েছে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' একথাটুকু বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? অথচ আমি তাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম। আর আল্লাহ্ অবশ্যই (পরীক্ষার মাধ্যমে) জেনে নিবেন কারা কারা ঈমানের এই দাবীতে সত্যবাদী এবং কারা কারা মিথ্যাবাদী।"

অতীতের নবী রাসূলদের পরীক্ষার ধরণ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর (সঃ) বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি, যা সহীহুল বুখারীতে উল্লেখ রয়েছে। হাদীসটি হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একবার নবী করীম (সঃ) এর নিকট (আমাদের দুঃখ-দুর্দশা ও অত্যাচার-নির্যাতন সম্পর্কে) অভিযোগ করলাম। তখন তিনি তাঁর চাদরটিকে বালিশ বানিয়ে কা'বা ঘরের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আমরা তাঁকে বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চান না? আপনি কি আমাদের জন্য দোয়া করেন না? তখন তিনি সোজা হয়ে বসে বললেনঃ তোমাদের উপর এমন কি দুঃখ-কষ্ট, জুলুম-নির্যাতন এসেছে। তোমাদের পূর্বেকার ঈমানদার লোকদের অবস্থা ছিলো এই যে, তাঁদের কারো জন্যে তো গর্ত খোড়া হতো এবং সেই গর্তের মধ্যে তাঁর দেহের অর্ধেক পুতে তাঁকে দাঁড় করিয়ে মাথার উপর করাত দিয়ে চিরে তাঁকে দ্বিখন্ডিত করে ফেলা হতো। কিন্তু এই অমানুষিক নির্যাতন তাঁকে তার দ্বীন থেকে দূরে সরাতে পারেনি। আবার কারো কারো শরীর থেকে লোহার চিরুনী দিয়ে আঁচড়িয়ে হাড় থেকে গোশত আলাদা করে ফেলা হতো। কিন্তু এতেও তাঁকে তার দ্বীন থেকে ফিরাতে পারেনি। আল্লাহর কসম! এ দ্বীন অবশ্যই পূর্ণতা লাভ করবে (অর্থাৎ বিজয় লাভ করবে।) তখন যে কোনো উষ্ট্রারোহী ব্যক্তি 'সানআ' থেকে 'হাযরামাউত' পর্যন্ত দীর্ঘ পথ নিরাপদে পাড়ি দেবে। আর এ দীর্ঘ সফরে সে আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে ভয় করবে না। এবং (মালিক তার) মেষ পালের ব্যাপারে নেকড়ে (বাঘ) ছাড়া আর অন্য কারো ভয় করবে না। কিন্তু আফসোস! তোমরা খুবই তাড়াহুড়ো করছো।

পরীখার (খন্দকের) যুদ্ধেও সাহাবায়ে কিরামদেরও পরীক্ষা নেয়া হয়েছিলো। পবিত্র কুরআনেই এই চিত্র আঁকা হয়েছে।

إِذْ جَآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ
وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ۝ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ
الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ۝ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ
وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ۝

"বলা হচ্ছে, যখন তারা (কাফিররা) তোমাদের উপরের দিক হতে ও নীচের দিক হতেও তোমাদের উপর চড়াও হয়েছিলো এবং যখন (ভয়ে-বিস্ময়ে) তোমাদের চোখ ছানাবড়া হয়ে গিয়েছিলো ও তোমাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হয়েছিলো। আর তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানারূপ ধারণা পোষণ করছিলে। সে সময়ে মুমিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিলো এবং ভীষণভাবে আতংকিত হয়ে পড়েছিলো। তখন মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে ব্যধি ছিলো তারা বলেছিলো, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আমাদের দেয়া ওয়াদা ধোকা ছাড়া আর কিছুই নয়। (সূরা আহযাব ১০-১২)

পরীক্ষার পরেই বিজয় আসে। এ প্রসঙ্গে সহীহুল বুখারীর 'কিতাবুল ওহী' অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। খৃষ্টান বাদশাহ রোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াস যখন হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) কে তাঁর কুফরীর অবস্থায় জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, নবুওয়াতের দাবীদার মুহাম্মদ (সঃ) এর সাথে আপনাদের কোনো যুদ্ধ হয়েছিলো কি? আবু সুফিয়ান বলেছিলেন, 'হাঁ'। হিরাক্লিয়াস পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, যুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছিলো? তিনি বলেছিলেন, কখনও আমরা জয়যুক্ত হয়েছিলাম এবং কখনও তিনি। হিরাক্লিয়াস বলেন, এভাবেই নবীদের (আঃ) পরীক্ষা হয়ে আসছে। কিন্তু পরিণামে প্রকাশ্য বিজয় তাঁদেরই হয়ে থাকে।

সুতরাং যুগে যুগে নবী মুহাম্মদ (সঃ) এর অনুসারী উম্মতদের এভাবেই জান-মালের পরীক্ষা দিয়েই জান্নাত যেতে হবে। সহজ সহজ আ'মল করে, তাগুতীশক্তির সাথে আপোশ করে, বাধাহীনভাবে চোরাগোপ্তা কোনো পথে জান্নাতে যাওয়া যাবে না। এভাবে এই পথে মুমিনদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দান আল্লাহর নিয়ম নয়। অথচ আমাদের মুসলিম সমাজের অধিকাংশ লোক এ পথেই জান্নাতে যাবার চেষ্টায় নিয়োজিত আছে।

চূড়ান্ত পরীক্ষার পরই আল্লাহর সাহায্য আসে ঃ আয়াতের সর্বশেষ ব্যাক্যে মহান আল্লাহ বলেন,

اَلا اِنَّ نَصرُ اللهِ قَرِيبُ **জেনে রেখো! আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে।**

অর্থাৎ আয়াতের এই শেষাংশে বলা হচ্ছে, যুগে যুগে যখন নবী-রাসূল ও তাঁদের অনুসারী সঙ্গী-সাথীদের পরীক্ষা করা হয়েছে, তখন তাঁরা যুলুম-নির্যাতনে জর্যরিত হয়ে চিৎকার করে বলে উঠেছিলো, আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে। এ কথা বলার দ্বারা এই নয় যে, নবীরা বুঝি আল্লাহর সাহায্য আসার ব্যাপারে সন্ধিহান ছিলেন! না, তাঁরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন যে, আল্লাহর সাহায্য অবশ্যই আসবে। তাঁদের এ প্রশ্নের বা আকুতির উদ্দেশ্য এই ছিলো যে, যদিও আল্লাহ তা'লা সাহায্যের ওয়াদা করেছেন, কিন্তু এর সময় ও স্থান ঠিক করে দেননি। সুতরাং তাঁদের এ অশান্ত অবস্থায় এ ধরনের আকুতির অর্থ ছিলো এই যে, আল্লাহর সাহায্য তাড়াতাড়ি নাযিল হোক। এটা নবীদের শানের পরিপন্থী নয়। বরং মহান আল্লাহ বান্দাহ্দের সবিনয় প্রার্থনাকে পছন্দ করেন। আর নবী রাসূলগণই এ ধরনের প্রার্থনার বেশী উপযুক্ত। আর নবীগণই সবচেয়ে বেশী পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন। যেমন বলা হয়েছে-

قَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمْ اَشَدُّ النَّاسَ بِلاَءً اَلاَ نْبِيَـاءِ ثُمَّ الْاَمْثَلُ فَالْاَ مْثَلُ

"রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ সবচেয়ে কঠিন বালা-মুসিবতের সম্মুখীন হয়েছেন নবী-রাসূলগণ। তারপর তাঁদের নিকটবর্তী ব্যক্তিগণ। সুতরাং আল্লাহ অত্যাচার নির্যাতনে জর্যরিত নবী-রাসূল এবং মুমিনদেরকে আশ্বসত ঃ করে বলছেন, তোমরা অত্যাচার নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে পড়ো না, আরো একটু ধৈর্যধারণ করো-আল্লাহর সাহায্য তো তোমাদের দোর গোড়ায়।

অতএব যুগে যুগে মুমিনদেরকে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আর তখনই প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় শক্তি, খোদাদ্রোহী তাগুতি শক্তি এবং নাস্তিকরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে যুলম-নির্যাতন চালাবে। মিথ্যাচার করে চরিত্রের উপর কালিমা লেপন করবে। শারিরীক, মানসিক ও অর্থনৈতিক নির্যাতন করবে। সেই ক্ষেত্রে জান্নাত পাবার লোভে এসবকে

তুচ্ছ মনে করে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং আল্লাহর সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। অবশ্যই আল্লাহর সাহায্য আসবে এবং দ্বীনের বিজয় হবে। আল্লাহর সাহায্যতো তখনই আসবে, যখন বান্দাহর সমস্ত চেষ্টা শেষ হয়ে যাবে। চেষ্টা না করেই এমনি এমনি দোয়া করলে কোনো কাজে আসবে না।

সূরা মুহাম্মদের ৩১ নম্বর আয়াতে এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন-

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ وَنَبْلُوَا اَخْبَارَكُمْ

"আমি তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করবো, যতক্ষণ না প্রকাশ হয় কে কে তোমাদের মধ্যে জিহাদকারী (আন্দোলন-সংগ্রামকারী) এবং কে কে সবরকারী। আর যতক্ষণ না আমি তোমাদের অবস্থানসমূহ যাচাই করি।"

শিক্ষাঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় দ্বীনি ভাইয়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে পবিত্র আল কুরআনের গুরুত্বপূর্ণ সূরা-সূরা আল বাকারার ২১৩ ও ২১৪ নম্বর দু'টি আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হলো। এখন জানতে হবে যে, এ দু'টি আয়াতে আমাদের জন্য কি কি শিক্ষণীয় রয়েছে? নিম্নে তা ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হলো ঃ

১. মানুষের প্রকৃতির ধর্ম বা আদি ধর্ম হলো ইসলাম, আয়াত দ্বারা এটিই প্রমাণিত হয়। আর ইসলামের মূল ভিত্তিই হলো তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদ। পরবর্তীতে মানুষের মধ্যে যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে তা তাওহীদ ও ঈমান নিয়েই সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং আমাদের তাওহীদের বিষয়ে কোনো আপোষ করা যাবে না। অথচ আমরা মুখে বলে থাকি যে, আমরা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করি, কিন্তু বাস্তব জীবনে আ'মল করতে গিয়ে জেনে হোক আর না জেনে হোক, বুঝে হোক আর না বুঝে হোক, ছোট হোক আর বড় হোক, বিভিন্নভাবে অনেকেই শিরকে জড়িয়ে পড়ি। অথচ যতো রকম বা ধরনের গোনাহ আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং আল্লাহর নিকট অমার্জনীয় গোনাহ হলো শিরক। এজন্য আমাদেরকে শিরক মুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদবাদী হতে হবে এবং এ বিষয়ে কোনো মতানৈক্য সৃষ্টি করা যাবে না। আর যুক্তি দিতে গিয়ে প্রচ্ছন্ন ও পরোক্ষ শিরকে জড়িতও হওয়া যাবে না।

২. যুগে যুগে যতো নবী-রাসূল এসেছেন, সকলেই সমসাময়িক মানুষের জন্য সত্য-সঠিক পথ দেখানোর জন্যই এসেছেন এবং তাঁরা সত্য সন্ধানী ও অনুসারীদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। পক্ষান্তরে সত্য-সঠিক বিষয়কে প্রত্যাখানকারীদের জন্য জাহান্নামের কঠিন আযাবের দুঃসংবাদ পৌছিয়ে দিয়েছেন। সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সঃ) তিনিই বিশ্ব জাহানের নবী ও সর্বশেষ নবী। আর আল কুরআন হলো সর্বশেষ পরিপূর্ণ আসমানী কিতাব। এরপরে আর কোনো নবী ও কিতাব আসবে না এবং আসারও প্রয়োজন নেই। সুতরাং আমাদের মাঝে কোনো বিষয়ে বিতর্ক দেখা দিলে অথবা মতানৈক্য সৃষ্টি হলে তার সমাধান আল কুরআন এবং নবীজীর সহীহ হাদীস দ্বারাই সমাধান করতে হবে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সাধারণ মানুষ নয়, বরং আলিম শ্রেণীর লোকেরাই মতানৈক্যে জড়িয়ে পড়ছে। আর এই মতোভেদ বা মতানৈক্যের সমাধানের জন্য আল কুরআন এবং সহীহ হাদীসের সন্ধান না করে বিভিন্ন ব্যক্তির কথা বা ফতুয়াকে অবলম্বন করে আরো বেশী বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে সমাজের সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন এবং সত্য ও সঠিক বিষয় থেকে দূরে সরিয়ে দিয়ে গোমরাহীর কাজে সাহায্য করছেন।

৩. আল কুরআন নাযিলের পর যারা এই কিতাব এবং রাসূল (সঃ) সম্পর্কে বিতর্ক বা মতানৈক্য করেছিলো তারা ছিলো 'আহলি কিতাব' তথা কিতাবধারী ইহুদী ও নাসারা। তারা যে বিতর্ক এবং মতোভেদ সৃষ্টি করেছিলো তা ছিলো তাদের গোঁড়ামী, হিংসা-বিদ্বেশ এবং হঠকারিতার কারণে। সুতরাং আমরা যারা মুসলিম নামধারী আছি, এখন যদি আমরাই আল্লাহর কিতাব এবং নবীর সুন্নাহ নিয়ে বিতর্ক, বিভেদ ও সন্দেহ সৃষ্টি করি তাহলে তো ইহুদী খৃষ্টান থেকে আমাদের কোনো পার্থক্যই থাকে না। অথচ দেখা যায়, অনেক আলিম শ্রেণীর লোকেরাই বিদ্বেস বশত ঃ এবং গোড়ামীর কারণে কুরআন ও সহীহ হাদীসকে কটাক্ষ করে বসেন। অতএব তাওহীদবাদী খাঁটি মুমিনদের অবশ্যই আল কুরআন এবং সহীহ হাদীসের বিষয়ে মতোভেদ সৃষ্টি করা হতে দূরে থাকতে হবে।

৪. সত্য-সঠিক পথের হিদায়াত পাওয়া আল্লাহর মর্জি ছাড়া সম্ভব নয়। সুতরাং সত্য-সঠিক সন্ধান পাওয়ার জন্য যেমন আল কুরআন এবং সহীহ হাদীস থেকে তালাশ করতে হবে, তেমনি সত্য সঠিক পথ পাওয়ার জন্য

আল্লাহর কাছেও সাহায্য কামনা করতে হবে। যেভাবে নবীজী তাহাজ্জুদ নামাযে উঠার সময় কামনা করেছিলেন, যা পূর্বে ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে।

৫. জান-মালের পরীক্ষা ছাড়া কোনো মুমিনই যেনতেন ভাবে চোরাগোপ্তা পথে জান্নাত পাবার আশা পোষণ করতে পারে না। বরং দুনিয়ার জীবনে যুলুম-নির্যাতন, দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ, জান-মালের ক্ষতি এবং মানসিক কষ্ট ইত্যাদির চূড়ান্ত পরীক্ষার পরই বান্দাহ্র কাঙ্খিত জান্নাত পাওয়া যাবে এটাই সদাসর্বদা মনে রাখতে হবে।

৬. আল্লাহ মুমিন কেন, যুগে যুগে সকল নবী রাসূলগণকেই কঠিন থেকে কঠিনতর বিপদ-মুসিবত এবং তৎকালীন তাগুতী শক্তির চরম বাধা ও নির্যাতনের মাধ্যমে পরীক্ষা করেছেন। আর নবী রাসূলগণকে তো সাধারণ মুমিন থেকে বেশী এবং কঠিন থেকে কঠিনতর পরীক্ষা করা হয়েছে।

৭. প্রতিটি মুমিন-মুমিনাকে জান্নাত পাবার জন্য যে কোনো পরীক্ষার সম্মুক্ষীন হওয়ার প্রস্তুত থাকতে হবে। আর যখন পরীক্ষা শুরু হয়ে যাবে তখন তা থেকে উদ্ধারের জন্য দু'টি পথ অবলম্বন করতে হবে। একটি হলো-সবর বা চরম ধৈর্য, আর অপরটি হলো- আল্লাহর সাহায্য।

৮. তাগুতিশক্তি বা যুলুমবাজ সরকারের চরম যুলুম-নির্যাতন এবং বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষা মোকাবেলা চরম ধৈর্যের দ্বারাই করতে হবে। অধৈর্য-অসহিঞ্চু হলে চলবে না এবং আল্লাহর সাহায্য আসতে দেরী দেখে পালিয়েও যাওয়া যাবে না বা গা ঢাকা দেয়া যাবে না কিম্বা আপোশ করাও যাবে না এবং অধৈর্য হয়ে আল্লাহ সম্পর্কে কোনো মন্তব্য বা খারাপ ধারণা পোষণ করাও যাবে না। এতে আল্লাহর সাহায্য বন্ধ হয়ে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতই ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

আহবান ঃ প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা! সূরা আল বাকারার ২১৩ ও ২১৪ নম্বর আয়াত দু'টির দারস দিতে গিয়ে যদি আমার অজান্তে কোনো ভুল-ত্রুটি কিংবা বাড়াবাড়ি হয়ে যাই, তার জন্য আমি মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর এ দু'টি আয়াত থেকে আমরা যেসব বিষয়ে শিক্ষা লাভ করলাম, তা যেন বাস্তব জীবনে আ'মল করতে পারি মহান আল্লাহর কাছে সেই তাওফীক কামনা করে আমি আমার দারস শেষ করছি।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) সত্য নবী হওয়া, তাঁর প্রতি অবতীর্ণ ওহী তথা আল কুরআনে সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ না থাকা এবং নবী করীমের (সঃ) জিবরাঈল কে আসল রূপে স্বচক্ষে দেখা প্রসঙ্গে।

সূরা-আন্ নাজম -৫৩

আয়াত -১-১৫

اَلْحَمدُ للهِ وكَفى وَسَلامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالنَّجْمُ اِذَا هَوٰى ○ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ○

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ○ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ○

عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى ○ ذُوْمِرَّةٍ ط فَاسْتَوٰى ○ وَهُوَ

بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى ○ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى ○ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ

اَوْ اَدْنٰى ○ فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى ○ مَا كَذَبَ

الْفُؤَادُ مَا رَاٰى ○ اَفَتُمٰرُوْنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰى ○ وَلَقَدْ رَاٰهُ

نَزْلَةً اُخْرٰى ○ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ○ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى

সরল অনুবাদ ঃ ইরশাদ হচ্ছে-(১) শপথ তারকার, যখন ওটা ডুবে যায়। (২) তোমাদের সঙ্গী (মুহাম্মদ সঃ) বিভ্রান্ত হননি এবং বিপথগামিও হননি। (৩) তিনি নিজের মনগড়া কথাও বলেন না। (৪) এটা তো একটা ওহী,

যা তাঁর প্রতি নাযিল করা হয়েছে। (৫) তাঁকে শিক্ষা দান করেন এক শক্তিশালী ফিরিশতা, (৬) যে বড় কৌশলী। সে নিজ আকৃতিতে সামনে এসে দাঁড়ালো, (৭) যখন সে উর্দ্ধ দিগন্তে অবস্থিত ছিলো। (৮) অতঃপর সে নিকটে আসলো এবং উপরে ঝুলে থাকলো। (৯) তখন দুই ধনুকের ব্যবধান ছিলো অথবা আরও কম। (১০) তখন সে আল্লাহ্র বান্দাহকে ওহী পৌছালো, যে ওহী-ই তাঁকে পৌছানোর ছিলো। (১১) রাসূলের অন্তর মিথ্যা বলেনি যা তিনি দেখেছেন। (১২) এখন কি তোমরা সেই বিষয়ে বিতর্ক করবে, যা তিনি নিজ চোখে দেখেছেন? (১৩) নিশ্চয় তিনি তাকে আর একবার দেখেছেন, (১৪) 'সিদরাতুল মুনতাহার' নিকট, (১৫) যার কাছে অবস্থিত জান্নাতুল মা-ওয়া।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ وَالنَّجْمِ - তারকার কসম/নক্ষত্রের শপথ। اِذَا - যখন। هَوٰى - অস্তমিত হয়/ডুবে যায়। مَاضَلَّ - গোমরাহ/পথভ্রষ্ট হননি। صَاحِبُكُمْ - তোমাদের সঙ্গী। مَاغَوٰى - বিপথগামী হননি। وَ - এবং। مَايَنْطِقُ - কথা বলেন না। عَنِ الْهَوٰى - প্রবৃত্তি থেকে/প্রবৃত্তির তাড়নায়। اِنْ -নয়/যদি। هُوَ - উহা/তা। اِلَّا - এছাড়া/ব্যতিরেকে। وَحْىٌ - ওহী/প্রত্যাদেশ। يُوْحٰى - যা প্রত্যাদেশ হয়/নাযিল হয়। عَلَّمَهٗ - তাঁকে শিক্ষা দিয়েছে। شَدِيْدُالْقُوٰى -প্রবল শক্তিশালী (ফিরিশতা)। ذُوْمِرَّةٍ - প্রজ্ঞাসম্পন্ন/মহা কৌশলী। فَاسْتَوٰى - অতঃপর সে স্থির হয়ে (দাঁড়িয়ে) ছিল। وَهُوَ - এবং সে। بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى - উর্দ্ধ দিগন্ত/উচ্চতর দিগন্ত। ثُمَّ - এরপর। دَنَا - সে নিকটবর্তী হলো/নিকটে আসলো। فَتَدَلّٰى - অতঃপর উপরে ঝুলে থাকলো। فَكَانَ -অতঃপর সে ছিলো। قَابَ - ব্যবধান/দূরত্বে। قَوْسَيْنِ - দুই ধনুকের। اَوْ - অথবা। اَدْنٰى - (তারও) কিছু কম। فَاَوْحٰى - অতঃপর ওহী পৌছালো/প্রত্যাদেশ করলো। اِلٰى -

দিকে/নিকট। عَبْدِهٖ - তাঁর (আল্লাহর) বান্দাহর। مَا - যা। اَوْحٰى - ওহী পৌঁছানো বা প্রত্যাদেশ করার ছিলো। مَاكَذَبَ - মিথ্যা বলেনি। اَلْفُؤَادُ - দিল/অন্তর। مَارَاٰى - যা সে দেখেছে। اَفَتُمٰرُوْنَهٗ - তোমরা কি সেই বিষয়ে বিতর্ক করবে। عَلٰى - উপর। مَايَرٰى - যা সে দেখেছে। وَلَقَدْ - এবং অবশ্যই। رَاٰهُ-তাকে সে দেখেছিলো। نَزْلَةً-অবতরণ হতে। اُخْرٰى আরেকবার/দ্বিতীয়বার। عِنْدَ -নিকট। سِدْرَةِ -বদবৃক্ষ/কুলগাছ। اَلْمُنْتَهٰى - শেষ প্রান্ত। عِنْدَهَا - উহার নিকট/যার নিকট। جَنَّةُ - ঘনপাতা বিশিষ্ট বাগান। اَلْمَاْوٰى - ঠিকানা/বসবাসের স্থান/বিশ্রামস্থল।

সম্বোধন ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত দ্বীনদার ভইয়েরা/বোনেরা! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি অয়া বারাকাতুহ। আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কালামে হাকীম আল কুরআনের সূরা আন্ নাযম এর ১ থেকে ১৫ পর্যন্ত মোট ১৫টি আয়াত তিলাওয়াত ও তরজমা পেশ করেছি। আল্লাহ পাক যেন আমাকে আপনাদের সামনে তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর দারস সঠিকভাবে পেশ করার তাওফীক দান করেন। অমা তাওফীকি ইল্লাবিল্লাহ।

সূরার নামকরণ ঃ সূরার শুরুতে উল্লেখিত وَالنَّجْمِ শব্দ থেকেই এই সূরার নাম 'আন্-নাযম' রাখা হয়েছে। বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, এই সূরার নাম কোনো শিরোনাম হিসেবে নামকরণ করা হয়নি। বরং পরিচিতি বা আলামত হিসেবেই এই সূরার নামকরণ করা হয়েছে। তবে যা কিছু করা হয়েছে ওহীর নির্দেশেই করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল ঃ সূরাটি সর্বসম্মত মতে মাক্কী। সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসায়ী হাদীস গ্রন্থ সমূহে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সাজদাহ বিশিষ্ট সর্বপ্রথম যে সূরাটি অবতীর্ণ হয়, তা হলো এই 'আন্ নাজম' সূরা।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতেও এই হাদীসের যেসব অংশ ও টুকরা আসওয়াদ ইবনে ইয়াজীদ, আবু ইসহাক ও জুহাইর ইবনে মুয়াবিয়ার সূত্রে বর্ণিত হয়েছে- তা থেকে জানা যায় যে, এটা কুরআন মজীদের এমন একটি সূরা যা নবী করীম (সঃ) কুরাইশদের এক সাধারণ সভায় (ইবনে মারদুইয়ার বর্ণনানুযায়ী হেরেম শরীফে) সর্বপ্রথম পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। সভায় কাফির ও মুমিন উভয় শ্রেণীর লোকই উপস্থিত ছিলো। শেষের দিকে তিনি যখন সাজদার আয়াত পাঠ করে সাজদাহ্ করলেন, তখন উপস্থিত (মুমিন কাফির) সমস্ত লোকই তাঁর সাথে সাথে সাজদাহ্ করলো। শুধু কাফিরদের একটি লোক যে সাজদাহ্ করার পরিবর্তে একমুষ্টি মাটি নিয়ে কপালে লাগিয়ে নিলো এবং বললো, আমার জন্য এটাই যথেষ্ট। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেন, আমি দেখি যে, এরপর ঐ লোকটি কুফরীর অবস্থাতেই মারা যায়। ঐ লোকটি ছিলো উমাইয়া ইবনে খাল্‌ফ। অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায়, ঐ লোকটি ছিলো 'উৎবা ইবনে রাবীয়া'

(ইবনে কাসীর, মা'রিফুল কুরআন এবং তাফহীমুল কুরআন)

সূরাটি রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর মাক্কী জীবনের নবুয়াতের পঞ্চম বর্ষে অবতীর্ণ হয়। প্রমাণ হিসেবে ইবনে সায়া'দ বলেন, ইতোপূর্বে নবুয়াতের পঞ্চম বর্ষের রজব মাসে সাহাবায়ে কিরামদের একটি ছোট্ট দল আবিসিনীয়ায় হিজরাত করেছিলো। এই বছরেই নবী করীম (সঃ) কুরাইশদের সভায় সূরা আন্ নাজম পাঠ করলেন এবং মুমিন ও কাফির সকলেই তাঁর সাথে সাজদায় পড়ে গেলো। এতে আবিসিনীয়ায় হিজরাতকারীদের নিকট ভিন্নভাবে খবর পৌছলো যে, মক্কায় কাফির লোকেরা সব মুসলমান হয়ে গেছে। এরূপ খবর পেয়ে আবিসিনীয়ায় হিজরাতকারী লোকদের মধ্য হতে কিছু লোক নবুওয়াতের ৫ম বর্ষে মক্কায় ফিরে আসলেন। কিন্তু তাঁরা এখানে ফিরে এসে দেখলেন যে, যুলুম-নির্যাতনের মাত্রা কোনো পরিবর্তন হয়নি। শেষ পর্যন্ত তাঁরা পুনরায় হিজরাত করে আবিসিনীয়ায় চলে গেলেন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা নিঃসন্দেহে জানা যায় যে, এই সূরাটি নবুয়াতের পঞ্চম বর্ষে অবতীর্ণ হয়েছিলো। (তাফহীমুল কুরআন)

সূরাটির ঐতিহাসিক পটভূমি ঃ কোন অবস্থার প্রেক্ষিতে সূরাটি নাযিল হয়েছিলো তা উপরোক্ত নাযিলের সময়কালে আলোচনায় জানা যায় যে,

নবুওয়াতের পঞ্চম বর্ষে তা নাযিল হয়েছিলো। নবুওয়াতের এই পাঁচটি বছর রাসূলুল্লাহ (সঃ) বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে টার্গেট ভিত্তিক যোগাযোগ এবং গোপন বৈঠকে-মজলিসে ও বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে আল কুরআনের বাণী শুনিয়ে শুনিয়ে আল্লাহর দ্বীনের দিকে আহবান জানাচ্ছিলেন। এই দীর্ঘ পাঁচ বছরে কাফির-মুশরিকদের কঠিন প্রতিবন্ধকতার কারণে প্রকাশ্যে কোনো সাধারণ জনসমাবেশে আল কুরআনের বাণী পাঠ করে শুনানোর কোনো সুযোগই তাঁর হয়ে উঠেনি। মুহাম্মদ (সঃ) এর ব্যক্তিত্ব, দাওয়াতী কার্যক্রম ও কর্ম তৎপরতার আকর্ষণ এবং আল কুরআনের আয়াতসমূহের কি যে মারাত্মক প্রভাব ছিলো তারা সেই বিষয়ে পুরোপুরিভাবে অবহিত ছিলো। এজন্য তারা নিজেরাও যেমন এই অমিও বাণী শুনতে চাইতো না, তেমনি অন্যরাও যেন শুনতে না পায় সেইজন্য তাদের চেষ্টা যত্নের কোনো ত্রুটি ছিলো না। রাসূলে করীম (সঃ) এর বিরুদ্ধে জনসাধারণের মধ্যে নানা ধরনের ভুল ধারণা এবং মিথ্যা প্রচারণার দ্বারা তারা দ্বীনী আন্দোলনের দাওয়াতকে অবরুদ্ধ ও দমন করে দিতে চেয়েছিলো। এই উদ্দেশ্যে তারা যেমন বিভিন্ন জায়গায় এই বলে বিভ্রান্ত ছড়াচ্ছিলো যে, মুহাম্মদ যেমন নিজে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে, তেমনি অন্য লোকদেরকেও বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আবার অপর দিকে তিনি যেখানেই পবিত্র আল কুরআনের বাণী শুনানোর চেষ্টা করতেন, সেখানেই তারা হট্টগোল, চিৎকার, হইহুল্লোড় করা তাদের একটা স্থায়ী বদ অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিলো। এরূপ আচরণ করার মূল উদ্দেশ্যই ছিলো, তাঁকে কি কারণে পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত বলা হচ্ছে লোকেরা যেন তা জানতেই না পারে। এরূপ অবস্থায় একদিন মুহাম্মদ (সঃ) হেরেম শরীফের মধ্যে কুরাইশ বংশের এক সমাবেশে যেখানে কাফির-মুমিন উভয় লোকই ছিলো, সেখানে ভাষণ দেয়ার জন্য আকস্মিকভাবে দাঁড়িয়ে যান। এই সময় আল্লাহ তা'লা রাসূলে করীম (সঃ) এর মুখ দিয়ে যে ভাষণটি বের করে দিয়েছিলেন, তাই আমাদের সামনে রয়েছে সূরা 'আন্-নাজম' রূপে। এই কালামের প্রভাব এতো তীব্রভাবে দেখা দিয়েছিলো যে, তিনি যখন এটা শুনাতে শুরু করলেন, তখন ওর বিরুদ্ধে তাদের পূর্ব অভ্যাস অনুযায়ী কোনো চিৎকার বা হট্টগোল করার হুঁশ-ই তাদের ছিলো না। ভাষণ শেষ করে নবী করীম (সঃ) যখন সাজদায় পড়ে গেলেন, তখন তারাও সাজদায়

পড়ে গেল। এটা ছিলো তাদের একটা বড় দুর্বলতা। তাদের এই দুর্বলতা যখন তাদের কাছে ধরা পড়ে গেল তখন নেতারা যেমন বিব্রত হয়ে পড়লো, তেমনি সাধারণ লোকেরাও তাদেরকে তিরস্কার-ভর্ৎসনা করতে লাগলো এই বলে যে, যে কালাম শুনতে তারা অন্যদেরকে নিষেধ করে বেড়াচ্ছে, তারা নিজেরাই সেই কালাম শুধু যে মনোযোগ দিয়ে শুনেছে তাই নয় বরং মুহাম্মদ (সঃ) এর সাথে তারাও সাজদাহ করেছে। সাধারণ লোকদের এই ভর্ৎসনা হতে বাঁচার জন্য তারা একটা মিথ্যা কথা বলা শুরু করে দিলো। তারা বললোঃ দেখো, আমরা তো মুহাম্মদ (সঃ) এর মুখ থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম যে - أَفَرَأَيْتُمُ اللَّتَ وَالْعُزَّى وَمَنَوٰةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى পড়ার পর যেন পড়ছেন - تلك الغرالقة العلى وان شفاعتهن لتجى "এই উচ্চ সম্মানিত দেবী! আর তাদের শাফায়াত পাওয়ার খুবই আশা করা যায়" এই কারণে আমরা মনে করেছিলাম যে, মুহাম্মদ আমাদের আকীদা-বিশ্বাসের পথে ফিরে এসেছে। এই কারণেই তাঁর সংগে সাজদাহ করতে আমরা কোনো দোষ মনে করিনি।

অথচ তারা যে বাক্য কয়টি শুনতে পেয়েছে বলে দাবী করছে, এই গোটা সূরার সাথে কোনো সম্পর্ক আছে এবং তাতে এই বাক্য কয়টি পড়া হয়ে থাকতে পারে, এমন কথা কেবলমাত্র পাগলরাই চিন্তা করতে পারে। আসলে আল কুরআনের অমীয় বাণী সূরা আন্ নাজমের প্রভাবেই তারা তাদের মিথ্যা কথা বেমা'লুম ভুলে গিয়েই রাসূলের সাথে সাথে সাজদায় লুটিয়ে পড়েছিলো।

সূরাটির মূল বিষয়বস্তু ঃ সূরা 'আন্ নাজম' এর এক কথায় বিষযবস্তু হলো- 'রিসালাত'। বিস্তারিত ভাবে বলা যায় যে, মক্কায় কুরাইশ কাফিররা পবিত্র আল কুরআন এবং হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর বিরুদ্ধে যে আচরণ করছে তা যে একান্তই ভুল সেই কথা জানিয়ে দেয়া এবং তাদেরকে এই বিষয়ে সতর্ক করে দেয়াই এই ভাষণটির মূল বিষয়বস্তু।

তিলাওয়াতকৃত আয়াতসমূহের বিষয়বস্তু ঃ নবী, ফিরিশতা ও ওহী বা কিতাব এই তিন এর সমন্বয়ে হয় 'রিসালাত'। মহান আল্লাহ তা'লা কুরাইশদের মাধ্যমে গোটা দুনিয়াবাসীকে খবর দিচ্ছেন যে, মুহাম্মদ (সঃ)

যে রাসূল, সুতরাং তাঁর স্বভাব চরিত্র ও বৈশিষ্ট কেমন হওয়া উচিত তা তুলে ধরা হয়েছে। আর যে ওহীর মাধ্যমে তাঁকে রাসূল বানানো হয়েছে, সে ওহীও নির্ভেজাল এবং এটা মুহাম্মদের কোনো নিজস্ব মনগড়া কথা নয়, তাও তুলে ধরা হয়েছে এবং ওহী বাহক জিবরাঈল (আঃ) এর আসলরূপ ও প্রকৃতিও তুলে ধরা হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে/মাহফিলে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা/ বোনেরা ! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা আন্ নাজম সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেয়ার জন্য ব্যাখ্যার পূর্বে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় তুলে ধরা হলো। এখন আমি তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর ধারাবাহিকভাবে ব্যাখ্যা পেশ করছি।

মহান আল্লাহ পাক সূরার শুরুতে পরবর্তী বক্তব্যের গুরুত্ব তুলে ধরার জন্য আয়াতের প্রথমেই তাঁর সৃষ্টির কসম খেয়ে বলেন-

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى **শপথ তারকার, যখন ওটা অস্তমিত হয় বা ডুবে যায়।**

এখানে শুরুতেই যে 'وَ' (ওয়াও) ব্যবহৃত হয়েছে, যাকে আরবী ব্যাকারণের পরিভাষায় "ওয়াও-এ-কাসমিয়া" বলা হয়। অর্থাৎ কোনো সূরার শুরুতেই যখন 'وَ' অক্ষরটি ব্যবহৃত হয়, তখন শপথ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। অথচ 'وَ' এর আভিধানিক অর্থ হলো- এবং/ও/আর।

اَلنَّجْمُ - এই نَجْمُ শব্দটির অর্থ মুফাস্সীরগণ বিভিন্ন অর্থ করেছেন। যেমন- হযরত ইবনে আব্বাস, মুহাম্মদ ও সুফিয়ান সাওরী বলেছেন, এর অর্থ 'কৃত্তিকা সপ্তনক্ষত্র' বা 'সুরাইয়া'। ইবনে জরীর ও জামাখশারী এই অর্থকেই বেশী অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কেননা, আরবী ভাষায় যখন শুধু اَلنَّجْمُ শব্দটি ব্যবহৃত হয়, তখন সাধারণত ঃ এর অর্থ হয় কৃত্তিকা সপ্তনক্ষত্র সমষ্টি।

সুদ্দী বলেন, এর অর্থ 'শুক্রগ্রহ' বা 'জুহরা তারা'। আরবী ব্যাকারণ বিশারদ আবু ওবাইদাহ বলেন, এখানে اَلنَّجْمُ শব্দটি বলে নক্ষত্র পুঞ্জ

বুঝানো হয়েছে। এ দৃষ্টিতে এর অর্থ হলো, যখন সকাল হলো ও নক্ষত্রপুঞ্জ অস্তমিত হয়ে গেল। মাওলানা মওদুদী (রহঃ) বলেন, স্থান ও ক্ষেত্রের দৃষ্টিতে আমরা এই শেষ অর্থকেই অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য বলে মনে করি। (তাফহীমূল কুরআন)

هَوٰى - শব্দটি পতিত হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়। নক্ষত্রের পতিত হওয়ার মানে অস্তমিত হওয়া/ডুবে যাওয়া। ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন। হযরত শা'বী (রহঃ) বলেন যে, 'সৃষ্টিকর্তা তাঁর সৃষ্টি বস্তুর যেটার ইচ্ছা সেটার-ই নামে কসম খেতে পারেন, কিন্তু সৃষ্টজীব তার সৃষ্টিকর্তা ছাড়া আর কারো কসম খেতে পারে না।' (ইবনে কাসীর)

অর্থাৎ মানুষ আল্লাহ ছাড়া আর কারো নামে কসম খেতে বা শপথ করতে পারে না।

পবিত্র আল কুরআনের অসংখ্য সূরার প্রথমেই মহান আল্লাহ তা'লা তাঁর বিভিন্ন সৃষ্টির এবং সময়ের ইত্যাদির কসম বা শপথ করে তাঁর বক্তব্য শুরু করেছেন। এসবের কসম বা শপথ করার উদ্দেশ্য এই নয় যে, তিনি বুঝি ঐ জিনিস বা বস্তুটির গুরুত্ব বুঝাচ্ছেন। আসলে তা নয়, বরং পরবর্তীতে তিনি যে বক্তব্য বা বিষয়টি মানুষের কাছে তুলে ধরতে চান তার গুরুত্ব বুঝানো এবং মানুষের দৃষ্টিকে সেই দিকে আকৃষ্ট করার জন্যই তিনি বিভিন্ন সৃষ্টির এবং সময়ের কসম খেয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেছেন।

(আল্লাহই ভালো জানেন)

পরবর্তী আয়াতগুলোতে রিসালাতের প্রসঙ্গ তুলে ধরে মহান আল্লাহ বলেন-

مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَاغَوٰى তোমাদের সঙ্গী বিভ্রান্ত হননি এবং বিপথগামীও হননি।

এখানে 'তোমাদের সঙ্গী' বলে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে বুঝানো হয়েছে।

صَاحِبُ শব্দটি আরবী ভাষায় বন্ধু, সঙ্গী, সাথী, নিকটে অবস্থানকারী এবং একসাথে উঠাবসা করে এমন লোককে বুঝায়।

নবী বা রাসূল কিংবা মুহাম্মদ বলার পরিবর্তে সঙ্গী বলার তাৎপর্য ঃ এখানে নবী করীম (সঃ) এর নাম বলা হয়নি, কিম্বা তোমাদের রাসূল এ কথাটিও বলা হয়নি। এর পরিবর্তে 'তোমাদের সঙ্গী' বলে নবী করীম (সঃ) কে

বুঝানোর পেছনে গভীর রহস্য ও তাৎপর্য লুক্কায়িত রয়েছে। একথা বলে মূলতঃ কুরাইশ বংশের লোকদেরকে এই অনুভূতি দিতে চাওয়া হয়েছে যে, মুহাম্মদ (সঃ) বাইরে থেকে আসা কোনো অপরিচিত মুসাফির বা প্রবাসী ব্যক্তি নন, যার কারণে তাঁর সত্যবাদিতায় তোমরা সন্দেহ পোষণ করবে। বরং তিনি তোমাদের সার্বক্ষণিক সঙ্গী-সাথী। সে তো তোমাদেরই সাথে বসবাসকারী জাতির লোক। তোমাদের দেশেই তাঁর জন্ম। এখনেই তিনি শৈশবকাল পার করে যৌবনে পৌছেছেন। তোমাদের কাছে তাঁর জীবনের কোনো কিছুই গোপন নয়। তাঁর স্বভাব চরিত্র, আচার-আচরণ, কায়-কারবার, আদত-অভ্যাস সব কিছুই তোমাদের সমাজের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার জানা আছে। তোমরা পরীক্ষা করে দেখেছো যে, তিনি কখনও মিথ্যা বলেন না। তোমরা তাকে শৈশব কাল থেকে কোনো সময়ই কোনো মন্দ বা বাজে কাজে জড়িত হতে কিম্বা ধারে কাছেও যেতে দেখোনি। তাঁর চরিত্র, স্বভাব, সততা ও বিশ্বাস্ততার প্রতি তোমাদের এতোটুকু আস্থা ছিলো যে, গোটা আরববাসী তাঁকে 'আল আমীন' বা বিশ্বাসী খেতাবে ভূষিত করে। এখন তিনি নবুওয়াতের দাবী করায় তোমরা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলতে শুরু করে দিয়েছো!

ضَلَّ অর্থ- 'বিভ্রান্ত হওয়া'। অর্থাৎ পথ না জানার কারণে কোনো ভুল পথে চলে যাওয়া। আর غَوٰى শব্দের অর্থ- 'পথভ্রষ্ট'। অর্থাৎ জেনে বুঝে ও ইচ্ছা করে ভুল পথ অবলম্বন করা।

নক্ষত্রপুঞ্জ বা তারকারাজির কসম খেয়ে মহান আল্লাহর একথা বলার তাৎপর্য হলো এই যে, মুহাম্মদ (সঃ) তো তোমাদের অতি পরিচিত ব্যক্তি। তিনি পথভ্রষ্ট বা বিভ্রান্ত হয়ে গেছেন তোমাদের এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। প্রকৃতপক্ষে না তিনি পথভ্রষ্ট হয়েছেন, না বিভ্রান্ত হয়েছেন।

নক্ষত্রপুঞ্জ বা তারকারাজির শপথ করার তাৎপর্য ঃ আয়াতের প্রথমেই তোমাদের সঙ্গী মুহাম্মদ (সঃ) না পথভ্রষ্ট হয়েছেন, আর না বিভ্রান্ত হয়েছেন, এ কথাটি বলার জন্য নক্ষত্রপুঞ্জ বা তারকারাজির শপথ করার পেছনে বিশেষ তাৎপর্য ও সামঞ্জস্য রয়েছে। রাতের অন্ধকারে নক্ষত্ররাজি যখন নীল আকাশে জ্বল জ্বল করে জ্বলতে থাকে, তখন অন্ধকারের মধ্যে

তারকাগুলোর সেই ঝাপসা আলোতে চারিদিকের জিনিসপত্র স্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া যায় না। তখন এই আলো-আঁধারে বিভিন্ন জিনিসের আকার-আকৃতি দেখে সেসব বিষয়ে বিভ্রান্ত এবং ভুল ধারণা সৃষ্টি হওয়া অমুলক নয়। যেমন, ধরুন-অন্ধকারে খনিকটা দূরে দাঁড়িয়ে থাকা একটি গাছকে ভুত মনে করা যেতে পারে। আবার মাটির উপর পড়ে থাকা একটা রশি বা দড়িকে সাপ মনে হতে পারে। বালুর স্তুপের উপর কোনো পাথর উঁচু হয়ে থাকতে দেখে তাকে কোনো বিরাট জন্তু বসে আছে মনে হতে পারে। কিন্তু তারকাসমূহ যখন ডুবে যায় এবং ভোরের উজ্জ্বল আলোতে আলোকিত হয়, তখন প্রত্যেকটা জিনিস তার নিজ নিজ রূপ নিয়ে প্রত্যেকটি লোকের সামনে উদ্ভাসিত হয়, তখন কোনো জিনিস বা বস্তুর সঠিক রূপ বা আকার আকৃতির বিষয়ে কোনো সন্দেহ সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না। অতএব হে কুরাইশের লোকেরা! তোমাদের মাঝে বসবাসকারী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর ব্যাপারটিও ঠিক এরূপ। তাঁর জীবন ও ব্যক্তিত্ব কোনো কিছুই অন্ধকারে নিমজ্জিত নয়। তা সকাল বেলার আলোর মতই উজ্জ্বল ও সর্বজন বিদিত।

তোমরা তো নিশ্চিত জান যে, তোমাদের এই সাহেব বা সঙ্গী-সাথী একজন অত্যন্ত ভদ্র লোক, শান্তশিষ্ট এবং বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি গোমরাহ হয়ে গেছেন, তোমাদের মনের মধ্যে এরূপ ভুল ধারণা কি করে সৃষ্টি হতে পারে? তিনি যে অত্যন্ত সত্যবাদী মানুষ তাও তোমাদের পরীক্ষা করা আছে। তাহলে তিনি জেনে-বুঝে কিভাবে নিজে বাঁকা পথে চলতে পারেন এবং অন্যদেরকেও বাঁকা পথে চলার আহবান জানাতে পারেন, এধরনের কথা ও চিন্তা তোমাদের মনের মধ্যে কিভাবে স্থান করে নিতে পারে? প্রকৃতপক্ষে তোমরাই ঘোর অন্ধকারে এবং বিভ্রান্তিতে রয়েছো।

কাফিরদের মনে মুহাম্মদ (সঃ) মিথ্যা রচনা করেন বলে যে ধারণা সৃষ্টি হয়েছিলো তার উত্তরে মহান আল্লাহ তা'লা পরবর্তী আয়াতে বলেন-

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ○ اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى

তিনি নিজের মনগড়া কথাও বলেন না। এটা তো একটা ওহী, যা তাঁর প্রতি নাযিল হয়।

অর্থাৎ যেসব কথার কারণে তিনি পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত হয়ে গেছেন বলে তোমরা অভিযোগ উত্থাপন করছো, তা তো তিনি নিজে রচনা করে মনগড়া ভাবে আল্লাহর নামে চালিয়ে দিচ্ছেন, এটা কোনো দিন-ই কোনো কাল-ই হওয়া সম্ভব নয়। তিনি যা বলেন, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে পাওয়া কথাই তোমাদেরকে বলে থাকেন। তিনি তো নবী হওয়ার জন্য কোনো সময়ের জন্যই দাবী করেননি এবং মনের খায়েশও তোমাদের কাছে কখনো কোনো সময়ের জন্য পেশ করেননি। বরং আল্লাহই যখন তাঁর প্রতি ওহী নাযিল করে তাঁকে এই দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত করলেন, ঠিক তখনই তিনি তোমাদের মাঝে 'রিসালাত' প্রচার করতে শুরু করলেন। সুতরাং তিনি যা কিছুই বলেন, তা সবই আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে প্রত্যাদেশ হয়। (তাফহীমূল কুরআন)

ইবনে কাসীরে উল্লেখ রয়েছে যে, তাঁর কোনো কথা ও আদেশ তাঁর প্রবৃত্তি ও ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে হয় না। বরং আল্লাহ তা'লা তাঁকে যে বিষয়ের তাবলীগ বা প্রচারের নির্দেশ করেন তাই তিনি তার মুখ দিয়ে বের করেন। সেখান থেকে যা কিছু বলা হয়, সেটাই তাঁর মুখে উচ্চারিত হয়। আল্লাহর কথা ও হুকুমের কম বেশী করা হতে তাঁর জবান পবিত্র। ওহী লেখক হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহর (সঃ) নিকট হতে যা শুনতাম তা লিখে নিতাম। অতঃপর কুরাইশের লোকেরা আমাকে একাজ করতে নিষেধ করে বললো, তুমি তো রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে যা শুনছো তার সবই লিখে নিচ্ছো অথচ তিনি তো একজন মানুষ। তিনি কখনো কখনো রাগের বশবর্তী হয়ে কিছু বলে ফেলেন? আমি তখন লিখা হতে বিরত থাকলাম এবং রাসূলল্লাহর (সঃ) নিকট একথা উল্লেখ করলাম। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন আমাকে বললেন, তুমি আমার কথাগুলো লিখতে থাকো। আল্লাহর শপথ! সত্য কথা ছাড়া আমার মুখ দিয়ে অন্য কোনো কথা বের হয় না।

(আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে আবী শায়বা)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে আমি তোমাদেরকে যে খবর দিয়ে থাকি তাতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে এ বিষয়ে আরো একটি হাদীস বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)

বলেছেনঃ আমি সত্য ছাড়া কিছু বলি না। তখন একজন সাহাবী তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি তো আমাদের সাথে রসিকতা করে থাকেন? উত্তরে তিনি বললেন ঃ তখনও আমি সত্য কথাই বলে থাকি। (অর্থাৎ রসিকতার সময়েও আমার মুখ দিয়ে মিথ্যা কথা বের হয় না)। (ইমাম আহমাদ)

উপরোক্ত আয়াত দু'টিতে আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (সঃ) এর সত্যবাদিতার প্রমাণ পেশ করা হয়েছে।

অতঃপর পরবর্তী আয়াত দু'টিতে মুহাম্মদ (সঃ) কে শিক্ষাদানকারী জিবরাঈল (আঃ) এর প্রকৃতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন-

عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى ٥ ذُوْمِرَّةٍ ط فَاسْتَوٰى

তাঁকে শিক্ষা দান করে এক শক্তিশালী ফিরিশতা, যে বড় কৌশলী। সে নিজ আকৃতিতে সামনে এসে দাঁড়ালো।

এই আয়াত দু'টিতে কুরাইশদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে যে, হে লোকেরা! তোমরা যা মনে করছো তা নয়, কোনো মানুষ মুহাম্মদ (সঃ) কে কোনো কিছুই শিক্ষা দেয় না। বরং তাঁকে যা শিক্ষা দেয়া হচ্ছে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়োগকৃত মহাশক্তিশালী, কৌশলী ও বিচক্ষণ ফিরিশতা জিবরাঈল (আঃ) এর দ্বারাই শিক্ষা দেয়া হচ্ছে।

شَدِيْدُ الْقُوٰى - 'মহাশক্তিশালী' বলতে কাকে বুঝানো হয়েছে ? ঃ

মহাশক্তিশালী বা মহাশক্তিধর বলতে কেউ কেউ মনে করেছেন যে, এই বাক্য দ্বারা মহান আল্লাহ তা'লার সত্তাকেই বুঝানো হয়েছে। কিন্তু তাফসীরকারকদের অধিকাংশই এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, এই কথাটি দ্বারা ফিরিশতা জিবরাঈল (আঃ) কে বুঝানো হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ), হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ), হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) এবং কাতাদাহ, মুজাহীদ ও রুবাই ইবনে আনাস (রহ) হতে এ কথাই বর্ণিত হয়েছে।

তাফসীরকারক ইবনে জরীর, ইবনে কাসীর, রাজী ও আ-লুসী প্রমুখ এ কথাটিকেই গ্রহণ করেছেন। শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী, মাওলানা আশরাফ আলী থানভী এবং মাওলানা মওদূদী (রহঃ) তাঁদের আপন আপন তাফসীরে এ কথারই অনুসরণ করেছেন।

প্রকৃত কথা হলো এই যে, পবিত্র আল কুরআনের অন্যান্য আয়াতের স্পষ্ট ঘোষণা হতে এ কথাটিরই প্রমাণিত হয়।

যেমন, সূরা আত্তাকভীর-এ মহান আল্লাহ বলেন-

اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ٥ ذِىْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ مَكِيْنٍ ٥ مُّطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ ٥

"নিশ্চয়ই এই কুরআন সম্মানিত বার্তাবাহকের আনীত বাণী, যে শক্তিশালী, আরশের মালিকের নিকট বড় মর্যাদাসম্পন্ন, যাকে সেথায় মান্য করা হয় এবং যে বিশ্বাসযোগ্য।" (আয়াত নং-১৯-২১)

এই আয়াতেও বলা হয়েছে যে, তিনি বার্তাবাহক ফিরিশতা জিবরাঈল (আঃ), যিনি শক্তিশালী।

সূরা আল বাকারার ৯৭ নং আয়াতে ফিরিশতার নামও বলে দেয়া হয়েছে- যেমন বলা হয়েছে-

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ -

"(হে নবী!) আপনি বলে দিন, যে কেউ জিবরাঈলের শত্রু হয়। কেননা, তিনি আল্লাহর আদেশে এ কালাম আপনার অন্তরে নাযিল করেছেন।"

সুতরাং এসব আয়াত কয়টি যদি সূরা 'আন্-নাজম' এর এই আয়াতের সাথে একত্রিত করে পাঠ করা হয়, তাহলে এখানে 'মহাশক্তিশালী শিক্ষাদাতা' বলতে যে হযরত জিবরাঈল (আঃ) কেই বুঝানো হয়েছে- আল্লাহ তা'লাকে নয়, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

হযরত জিবরাঈল (আঃ) কি রাসূল (সঃ) এর শিক্ষক হতে পারেন? ঃ

রাসূল (সঃ) কে শিক্ষা দিয়েছেন এক মহাশক্তিশালী ফিরিশতা জিবরাঈল (আঃ)। এই কথার দ্বারা কেউ কেউ সংশয়পূর্ণ প্রশ্ন করতে পারেন যে, জিবরাঈল (আঃ) কিভাবে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর শিক্ষক হতে পারেন? তাঁর অর্থ তো এই দাঁড়ায় যে, তিনি ওস্তাদ আর নবী করীম (সঃ) ছাত্র। এতে কি রাসূল (সঃ) এর তুলনায় জিবরাঈল (আঃ) এর মর্যাদা বেশী হয়ে যায় না? উত্তরে বলা যায় যে, এই সংশয় ও প্রশ্ন ভিত্তিহীন। কেননা, জিবরাঈল (আঃ) তাঁর নিজস্ব কোনো ইলম বা জ্ঞান রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে শিক্ষা

দিতেন না। তাঁকে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে নবী করীম (সঃ) পর্যন্ত ইলম পৌছানোর মাধ্যম হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি জ্ঞান দানের শুধু মাধ্যম হওয়ার কারণে পরোক্ষভাবে তাঁর শিক্ষক ছিলেন, প্রত্যক্ষভাবে নয়। কাজেই রাসূলের উপর জিবরাঈল (আঃ) মর্যাদাবান হওয়ার কোনো কথা প্রমাণিত হয় না। তিনি যদি নিজস্ব ইলম তাঁকে শিখাতেন, তাহলেই একথা বলা যেতো।

যেমন, একটা দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে- সহীহুল বুখারী, সহীহ্ মুসলিম, তিরমিজী ও মুয়াত্তা ইমাম মালেক সহ বিভিন্ন কিতাবে বিশুদ্ধ বর্ণনা সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করে দেয়ার পর আল্লাহ্ তা'লা মুহাম্মদ (সাঃ) কে সালাতের সঠিক সময় ও নিয়ম শিক্ষা দেয়ার জন্য হযরত জিবরাঈল (আঃ) কে পাঠালেন। তিনি পরপর দুই দিন তাকে পাঁচ পাঁচ করে দশ ওয়াক্ত সালাত পড়ালেন। প্রথম দিন প্রথম ওয়াক্তে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের ইমামতি করলেন, আর দ্বিতীয় দিন শেষ ওয়াক্তে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের ইমামতি করলেন। এ বিষয়ে রাসূল (সঃ) নিজে বলেন যে, তিনি ছিলেন মুক্তাদী, আর জিবরাঈল (আঃ) ঈমাম হিসেবে সালাত পড়িয়েছিলেন। কিন্তু কেবলমাত্র সালাতের সময় ও পদ্ধতি শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে জিবরাঈল (আঃ) কে ইমাম বানিয়ে দেয়ার কারণে তিনি রাসূল (সঃ) এর তুলনায় বেশী মর্যাদাবান হয়ে গিয়েছেন এমন কথা বলা যায় না।

সুতরাং এসব বর্ণনা থেকে আমাদেরকে এটাই বুঝে নিতে হবে যে, মুহাম্মদ (সঃ) এর প্রকৃত শিক্ষাদাতা ছিলেন মহান আল্লাহ্ তা'লা। আর হযরত জিবরাঈল (আঃ) ছিলেন মাধ্যম মাত্র।

ذُوْمِرَّةٍ-এর অর্থঃ ذُوْمِرَّةٍ এর অনুবাদের সময় 'কৌশলী', 'প্রজ্ঞাসম্পন্ন' করেছি। কিন্তু বিভিন্ন জন এর বিভিন্ন অর্থ করেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস ও কাতাদাহ (রাঃ) এর অর্থ করেছেন- সৌন্দর্য মন্ডিত, ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ।

মুজাহীদ, হাসান বসরী, ইবনে যায়দ ও সুফিয়ান সওরী এর অর্থে বলেছেন- শক্তিমান।

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব এর মতে এর অর্থ-প্রজ্ঞা ও কলা-কৌশল সম্পন্ন।

আরবী কথনে ذُوْمِرَّةٍ শব্দটি খুবই স্পষ্ট, যথার্থ ও নির্ভুল মতদান ক্ষমতা সম্পন্ন, বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী, বিবেকবান অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

আল্লাহ তা'লা এখানে জিবরাঈল (আঃ) সম্পর্কে এই ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করেছেন এই উদ্দেশ্যে যে, হযরত জিবরাঈল (আঃ) বুদ্ধিবৃত্তিক ও দৈহিক উভয় দিকে যাবতীয় শক্তি সামর্থ পূর্ণ মাত্রায় বর্তমান রয়েছে। (তাফহীমুল কুরআন)

فَاسْتَوٰى - এর অর্থ- **সোজা হয়ে গেলেন বা সামনে এসে দাঁড়ালেন।** **উদ্দেশ্য হলো এই যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) জিবরাঈল (আঃ) যখন প্রথম দেখেন, তখন তিনি আকাশ থেকে নীচে অবতরণ করছিলেন। অর্থাৎ আকাশ থেকে অবতরণ করে নবী করীম (সঃ) এর সামনে স্ব আকৃতিতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন।**

জিবরাঈল (আঃ) আকাশ থেকে কোথায় অবতরণ করেছিলেন, সেই সম্পর্কে বলতে গিয়ে পরবর্তী আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন-

وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى **এবং তখন সে উর্দ্ধ দিগন্তে অবস্থিত ছিলো।**

وُفُقِ الْاَعْلٰى - 'উর্দ্ধ দিগন্ত'। এখানে দিগন্তের সাথে উর্দ্ধ সংযুক্ত করা হয়েছে। 'দিগন্ত' আকাশের পূর্ব কোন্, যেখান থেকে সূর্য উদয় হয় ও দিনের আলো ফুটে উঠে ও ছড়িয়ে পড়ে। উভয় আয়াত হতে স্পষ্ট জানা যায় যে, প্রথমবার যখন নবী করীম (সঃ) জিবরাঈল (আঃ) কে দেখতে পান, তখন তিনি আকাশের পূর্ব কোন্ হতে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। অনেকগুলো গ্রহণযোগ্য হাদীসের বর্ণনা হতে জানা যায় যে, এই সময় হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাঁর আসল আকার আকৃতিতে বিদ্যমান ছিলেন, যেই আকৃতিতে আল্লাহ তাঁকে সৃষ্টি করেছিলেন।

ইমাম আহমদে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত জিবরাঈল (আঃ) কে তাঁর আকৃতিতে দেখেছিলেন। তাঁর ছয়শটি পালক ছিলো। এক একটি পালক বা ডানা এমনই ছিলো যে, আকাশের সমস্ত প্রান্তকে ঢেকে ফেলেছিলো। আর ওগুলো হতে পান্না ও মনিমুক্তা ঝরে পড়ছিলো। (ইবনে কাসীর)

ইবনে কাসীরে আরও উল্লেখ রয়েছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সাঃ) হযরত জিবরাঈল (আঃ) কে তাঁর আসল চেহারায় দেখার জন্য তাঁর কাছে আবেদন জানান। তখন জিবরাঈল (আঃ) তাঁকে বলেন, আপনি এজন্য আল্লাহ তা'লার নিকট প্রার্থনা করুন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) প্রার্থনা করলে দেখতে পান যে, কি একটা জিনিস উঁচু হয়ে উঠছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে। এটা দেখেই তিনি বেহুশ হয়ে পড়েন। তৎক্ষণাৎ হযরত জিবরাঈল (আঃ) আগমন করেন এবং তাঁর জ্ঞান ফিরিয়ে দেন ও তাঁর মুখের থুথু মুছিয়ে দেন।

অতঃপর পরবর্তী আয়াতদ্বয়ে মুহাম্মদ (সঃ) থেকে জিবরাঈল (আঃ) কতটুকু দুরে অবস্থান করছিলেন, সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন- ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى ۝ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى

অতঃপর সে তাঁর নিকটবর্তী হলো এবং উপরে ঝুলে থাকলো, ফলে তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রইলো অথবা তার চেয়েও কম।

دَنَا শব্দের অর্থ- নিকটবর্তী হলো, আর تَدَلّٰى শব্দের অর্থ- ঝুলে গেল। অর্থাৎ জিবরাঈল (আঃ) আকাশের উর্দ্ধে পূর্ব দিগন্তে আত্মপ্রকাশ করার পর রাসূলে করীম (সঃ) এর দিকে অগ্রসর হতে শুরু করলেন। অগ্রসর হতে হতে তিনি তাঁর উপর এসে শুন্যে ঝুলে থাকলেন। পরে তিনি নবী করীম (সঃ) এর দিকে ঝুঁকেন এবং ঝুঁকতে ঝুঁকতে এতোটা নিকটবর্তী হয়ে গেলেন যে, তাঁদের উভয়ের মাঝে দুই ধনুকের সমান কিম্বা তার চেয়েও কম দূরত্ব থাকলো।

قَابَ قَوْسَيْنِ ব্যাক্যের অর্থ- তাফসীরকারকগণ সাধারণত "দুই ধনুক পরিমান" অর্থ করেছেন। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) قَوْسَيْنِ এর অর্থ 'হাত' করেছেন। আর كَانَ كَابَ قَوْسَيْنِ এর তাৎপর্যে বলেছেন, উভয়ের মাঝে কেবল দুই হাতের দূরত্ব ছিলো। ধনুকের মধ্যবর্তী ব্যবধানকে قَابَ বলা হয়। এই ব্যবধান আনুমানিক এক হাত হয়ে থাকে।

দুই ধনুকের সমান কিংবা তার চেয়েও কম এরূপ বলায় কারো মনে এরূপ ধারণা করা ঠিক নয় যে, আল্লাহ্ বুঝি দূরত্বের পরিমান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সংশয়ের মধ্যে পড়েছিলেন, (নাউযুবিল্লাহ) তা কিন্তু নয়। এটা একটা বাচনভঙ্গী। (তাফহীমুল কুরআন)

قَابَ قَوْسَيْنِ 'দুই ধনুকের মধ্যবর্তী' ব্যবধান বলার কারণ এই যে, আরব বাসীদের একটা অভ্যাস ছিলো, দুই ব্যক্তির মধ্যে শান্তিচুক্তি বা সখ্যতা স্থাপন করতে চাইলে তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত আলামত ছিলো হাতের উপর হাত মারা। অপর একটি আলামত ছিলো এই যে, উভয়েই আপন আপন ধনুকের কাঠ নিজের দিকে এবং ধনুকের সুতা বা দড়ি অপরের দিকে রাখতো। এভাবে উভয় ধনুকের সুতা পরস্পরের মিলিত হয়ে যাওয়াকে সম্প্রীতি ও সখ্যতার আলামত বা ঘোষণা মনে করা হতো। এসময় উভয় ব্যক্তির মাঝখানে দুই ধনুকের 'কাবের' ব্যবধান থেকে যেতো, অর্থাৎ দুই হাত বা এক গজ। এরপর اَوْ اَدْنٰى বলে আরও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই মিলন সাধারণত প্রথাগত মিলনের অনুরূপ ছিলো, বরং এর চেয়েও কম।

আলোচ্য আয়াতে জিবরাঈল (আঃ) এর খুব কাছাকাছি হওয়ার বিষয়টি বর্ণনা করার কারণ এই দিকে ইঙ্গিত করা যে, তিনি যে ওহী পৌঁছিয়েছেন তা শ্রবণে কোনো সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই। এই নৈকট্য ও মিলনের কারণে জিবরাঈল (আঃ)-কে নাচেনা এবং শয়তানের হস্তক্ষেপ করার সম্ভাবনাও বাতিল হয়ে যায়। (মা'রিফুল কুরআন)
ইবনে কাসীর উল্লেখ করেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى এই আয়াতের ব্যাপারে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "আমি হযরত জিবরাঈল (আঃ) কে দেখেছিলাম, তাঁর ছয়শটি পাখা ছিলো।"

(হাদীসটি ইমাম ইবনে জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেছেন)

জিবরাঈল (আঃ) নবী করীম (সঃ) এর নিকটবর্তী হয়ে কি করলেন, সে বিষয়ে বলতে গিয়ে মহান আল্লাহ্ পরবর্তী আয়াতে বলেন-

فَـاَوْحٰى اِلٰى عَبْـدِهٖ مَـا اَوْحٰى -তখন সে আল্লাহর বান্দাহকে ওহী পৌঁছালো, যে ওহী-ই পৌঁছানোর ছিলো।

فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَـا اَوْحٰى এই বাক্যটির দু'ধরনের অর্থ হতে পারে। একটি হলো এইঃ "তিনি ওহী পাঠালেন তাঁর বান্দাহর প্রতি যা কিছুই ওহী পাঠালেন।" আর দ্বিতীয় অর্থ হলো এরূপঃ "তিনি ওহী পাঠালেন নিজের বান্দাহর প্রতি যা কিছুই ওহী করলেন।"

প্রথম অর্থের দৃষ্টিতে আয়াতের বক্তব্য হয় এরূপঃ 'জিবরাঈল আল্লাহর বান্দাহর প্রতি ওহী দিলেন, তাঁর ওহী দেয়ার যা কিছু ছিলো।' আর দ্বিতীয় অর্থে আয়াতের বক্তব্য হবে এরূপঃ 'আল্লাহ জিবরাঈলের মাধ্যমে তাঁর বান্দাহর নিকট ওহী করলেন যা কিছুই তাঁর ওহী করার ছিলো।' তাফসীরকারকগণ এই উভয় প্রকার অর্থই সঠিক বলেছেন। কিন্তু পূর্বাপরের দৃষ্টিতে প্রথম অর্থ-ই বেশী যুক্তিপূর্ণ বলে মনে হয়। হযরত হাসান বসরী ও ইবনে যায়েদ হতে এই তাফসীর-ই বর্ণিত হয়েছে।

(তাফহীমুল কুরআন)

উপরের আলোচনায় বুঝা যায় যে, عَبْـدِهٖ 'তাঁর বান্দাহর' এই 'ه' সর্বনামটি আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব اَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ এর অর্থ হয়, 'জিবরাঈল আল্লাহর বান্দাহর প্রতি ওহী করলেন।' কিংবা 'জিবরাঈলের মাধ্যমে নিজের বান্দাহর প্রতি ওহী করলেন।'

সে ওহীটি কি ছিলো? ঃ ইবনে কাসীরে উল্লেখ রয়েছে। হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রহঃ) বলেন যে, সে সময়ের ওহী ছিলো আল্লাহ তা'লার এই উক্তিগুলো ঃ اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَـاٰوٰى অর্থাৎ "তিনি কি তোমাকে ইয়াতীম অবস্থায় পাননি?" (সূরা যোহা-৬) এবং وَرَفَعْنَا لَـكَ ذِكْـرَكَ "আর আমি তোমার খ্যাতিকে উচ্চমর্যাদা দান করেছি।"(সূরা ইনশিরাহ-৪)

অন্য কেউ বলেছেন যে, আল্লাহ তা'লা ঐ সময় নবী (সঃ) এর প্রতি ওহী করেনঃ "নবীদের উপর জান্নাত হারাম যে পর্যন্ত না তুমি তাতে প্রবেশ করো এবং উম্মতের উপর জান্নাত হারাম যে পর্যন্ত না তোমার উম্মত তাতে প্রবেশ করে।"

পরবর্তী আয়াতে নবী করীমের (সঃ) জিবরাঈলকে দেখা সম্পর্কে বলতে গিয়ে মহান আল্লাহ তা'লা বলেন-

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَارَاٰى ٥ اَفَتُمٰرُوْنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰى

রাসূলের অন্তর তা মিথ্যা বলেনি যা তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। এখন কি তোমরা সেই বিষয়ে বিতর্ক করো-যা তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন?

فُؤَادُ শব্দের অর্থ- 'দিল' বা 'অন্তর'। এর উদ্দেশ্য হলো এই যে, চোখ যা কিছু দেখেছে দিল বা অন্তর তা যথাযথ উপলব্ধি করতে কোনো ভুল করেনি। এই ভুল ও ত্রুটিকেই আয়াতে كَذَبَ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ দেখা বস্তু উপলব্ধি করার ব্যাপারে অন্তর মিথ্যা বলেনি।

مَارَاٰى শব্দের অর্থ- 'যা কিছু দেখেছে।' কিন্তু কি দেখেছে, আল কুরআনে তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। এ ব্যাপারে সাহাবী, তাবেয়ী ও তাফসীরকারগণের উক্তি দু'রকমের। কারও কারও মতে স্বয়ং আল্লাহ তা'লাকে দেখেছেন এবং কারও কারও মতে জিবরাঈল (আঃ) কে আসল আকৃতিতে দেখেছেন। এই তাফসীর অনুযায়ী رَاٰى শব্দটি আক্ষরিক অর্থে চর্মচক্ষে দেখার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই এখানে অন্তঃচক্ষু দ্বারা দেখার অর্থ নেয়া নিশ্প্রয়োজন। সুতরাং رَاٰى অর্থাৎ চর্মচক্ষে দেখেছেন দ্বারা হযরত জিবরাঈল (আঃ) কেই দেখেছেন।

আয়াতে অন্তঃকরণকে উপলব্ধি করার কর্তা করা হয়েছে। অথচ খ্যাতনামা দার্শনিকদের মতে উপলব্ধি করতে হলে বোধশক্তি থাকতে হবে। এই প্রশ্নের জবাব এই যে, আল কুরআনের অনেক আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, উপলব্ধির আসল কেন্দ্রস্থল হলো দিল বা অন্তঃকরণ। তাই কখনও বোধশক্তিকে قَلْبُ (অন্তঃকরণ) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। যেমন-

لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ আয়াতে 'কল্‌ব' বলে বিবেক ও বোধশক্তি বুঝানো হয়েছে। আল কুরআনের لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ইত্যাদি আয়াতের পক্ষে স্বাক্ষ্য দেয়। (মা'রিফুল কুরআন)

আল্লামা ইবনে কাসীর এই আয়াতের তাফসীরে বলেন- আয়াতসমূহে উল্লেখিত দেখা ও নিকটবর্তী হওয়ার অর্থ জিবরাঈলকে দেখা ও জিবরাঈলের নিকটবর্তী হওয়া বুঝায়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) প্রথমবার তাঁকে আসল আকৃতিতে দেখেছিলেন এবং দ্বিতীয়বার মি'রাজের রাতে 'সিদরাতুন মুনতাহার' নিকটে দেখেছিলেন। প্রথমবারে দেখা নবুওয়াতের সম্পূর্ণ প্রাথমিক যামানায় হয়েছিলো। তখন জিবরাঈল (আঃ) সূরা ইকরার প্রথম পাঁচটি আয়াত নিয়ে আগমন করেছিলেন। এরপর ওহীতে বিরতি ঘটে, যার কারণে রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিদারুন উৎকণ্ঠা ও ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েন। এমন কি পাহাড় থেকে পড়ে আত্মহত্যা করার ধারণা তাঁর মনে জাগ্রত হতে থাকে। কিন্তু যখনই এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হতো, তখনই জিবরাঈল (আঃ) আড়াল থেকে আওয়াজ দিয়ে বলতেনঃ হে মুহাম্মদ (সঃ)! আপনি তো আল্লাহর সত্য নবী, আর আমি জিবরাঈল। এই আওয়াজ শুনে তাঁর মনের অস্থিরতা দূর হয়ে যেতো। এভাবে তাঁর মনে যখনই বিরূপ কল্পনা দেখা দিতো, তখনই জিবরাঈল (আঃ) অদৃশ্য থেকে এই আওয়াজের মাধ্যমে তাকে সান্তনা দিতেন। অবশেষে একদিন জিবরাঈল (আঃ) মক্কায় খোলা মাঠে তাঁর আসল আকৃতিতে আগমন করলেন। তাঁর ছয়শত বাহু ছিলো এবং তিনি গোটা দিগন্তকে তাঁর বাহু দিয়ে ঘিরে রেখেছিলেন। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর নিকট আসেন এবং তাঁকে ওহী পৌছান। তখন রাসূলুল্লাহর (সঃ) কাছে জিবরাঈলের মাহাত্ম এবং আল্লাহ তা'লার দরবারে তাঁর উচ্চমর্যাদার স্বরূপ ফুটে উঠে। সারকথা এই যে, ইবনে কাসীরের মতে উল্লেখিত আয়াতসমূহের তাফসীর তাই যা উপরে বর্ণনা করা হলো, এই প্রথম দেখা এ জগতেই মক্কার দিগন্তে হয়েছিলো।

কোনো কোনো বর্ণনায় আরো বলা হয়েছে যে, জিবরাঈলকে প্রথমবার আসল আকৃতিতে দেখে রাসূলুল্লাহ (সঃ) অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। অতঃপর জিবরাঈল (আঃ) মানুষের আকৃতি ধারণ করে তাঁর নিকটে আসেন এবং খুবই নিকটে আসেন।

অতঃপর পরবর্তী আয়াতসমূহে জিবরাঈল (আঃ) কে দ্বিতীয়বার দেখার বর্ণনা দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন-

وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى ○ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ○ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى

আর অবশ্যই তাঁকে আরেকবার দেখেছেন, 'সিদরাতুল মুনতাহার' নিকটে, যার কাছে অবস্থিত জান্নাতুল মা-ওয়া।

অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সঃ) জিবরাঈল (আঃ) কে আরো একবার আসল রূপে দেখেছিলেন 'সিদরাতুল মুনতাহার' নিকটে, যেখানে জান্নাতুল মা-ওয়া অবস্থিত।

কেউ কেউ বলেছেন যে, তাঁকে বলতে আল্লাহকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ী এবং মুফাস্‌সীরদের অভিমত হলো, তাঁকে বলতে জিবরাঈল (আঃ) কে বলা হয়েছে। (এ বিষয়ে ইবনে কাসীর এবং মা'রিফুল কুরআনে হাদীসগুলো বর্ণিত হয়েছে)

نَزْلَةً اُخْرٰى এর অর্থ- 'দ্বিতীয়বার অবতরণ'। জিবরাঈল (আঃ) কে দেখার বিষয়ে যেমন প্রথম অবতরণের স্থান মক্কার উর্দ্ধ দিগন্ত বলা হয়েছে, তেমনি এখানে দ্বিতীয়বার দেখার স্থান হিসেবে 'সিদরাতুল মুনতাহার' কথা বলা হয়েছে।

সকলের জানা কথা যে, মি'রাজের রাতেই রাসূলুল্লাহ (সঃ) সপ্তম আকাশে গমন করেছিলেন। সুতরাং জিবরাঈলকে দ্বিতীয়বার দেখার সময়টাও মোটামুটিভাবে নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

سِدْرَةُ শব্দের আভিধানিক অর্থ 'বদরিকা বৃক্ষ' বা 'বরই' বা 'কুল গাছ'।

আর مُنْتَهٰى শব্দের আভিধানিক অর্থ- 'শেষ প্রান্ত'। সপ্ত আকাশে আরশের নীচে এই 'বদরিকা বৃক্ষ' বা 'কুল গাছ' অবস্থিত।

সহীহ মুসলিমের এক বর্ণনায় একে ষষ্ঠ আকাশে বলা হয়েছে। উভয় বর্ণনার এভাবে সমন্বয় হতে পারে যে, এই গাছের মূল শিকড় ষষ্ঠ আকাশে এবং এর শাখা-প্রশাখা সপ্তম আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। (কুরতুবী)

সাধারণ ফিরিশতাদের গমনাগমনের এটাই শেষ সীমা। তাই একে মুনতাহা বা শেষ প্রান্ত বলা হয়।

কোনো কোনো বর্ণনায় আছে যে, আল্লাহ তা'লার বিধানসমূহ প্রথমে 'সিদরাতুল মুনতাহায়' নাযিল হয়, তারপর এখান থেকে সংশ্লিষ্ট ফিরিশতাগণের নিকট সোপর্দ করা হয়। পৃথিবী থেকে আকাশগামী আ'মলনামা ইত্যাদিও ফিরিশতাগণ এখানে পৌছায় এবং এখান থেকে অন্য কোনো পন্থায় আল্লাহ তা'লার দরবারে পেশ করা হয়। মুসনাদ-ই আহমদে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে একথায় বর্ণিত আছে।

(ইবনে কাসীর)

আল্লামা আলুসী তাঁর রূহুল মায়া'নী তাফসীর গ্রন্থে এর ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ

اليها ينتهى عالم كل عالم وما وراها لا يعلمه الا الله

অর্থাৎ "এখানেই সকল জগতের জ্ঞান শেষ ও পরিসমাপ্ত। এর অপর পারে যা কিছু আছে, সেই বিষয়ে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ কিছুই জানে না।" (তাফহীমূল কুরআন)

অতঃপর আল্লাহ তা'লা 'সিদরাতুল মুনতাহার' অবস্থান সম্পর্কে আরো নিশ্চিত করে বলেন যে,

عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى "যার নিকট জান্নাতুল মা-ওয়া অবস্থিত।"

مَاْوٰى শব্দের অর্থ- 'ঠিকানা' বা 'বিশ্রামস্থল'। জান্নাতকে مَاْوٰى (মা-ওয়া) বলার কারণ হলো এই যে, এটাই মানুষের আসল এবং শেষ ঠিকানা। আদম (আঃ) এখানেই সৃজিত হন, এখান থেকেই তাঁকে পৃথিবীতে নামানো হয় এবং এখানেই জান্নাতীরা বসবাস করবে।

(মা'রিফুল কুরআন)

'জান্নাতুল মা-ওয়া' সম্পর্কে হযরত হাসান বসরী বলেছেন, এটা সেই জান্নাত যা পরকালে ঈমান ও তাকওয়াবান লোকদেরকে দেয়া হবে। এই আয়াতে দলীল হিসেবে পেশ করে তিনি এও বলেছেন যে, এই জান্নাত আকাশ মন্ডলে রয়েছে। কাতাদাহ বলেন, এটা সেই জান্নাত যেখানে শহীদদের রূহ সংরক্ষিত হয়। এটা সেই জান্নাত নয়, যা পরকালে পাওয়া যাবে। হযরত ইবনে আব্বাসও এ কথাই বলেছেন। তিনি আরও একটু বাড়িয়ে বলেছেন যে, পরকালে ঈমানদার লোকদেরকে যে জান্নাত দেয়া হবে তা আকাশ মন্ডলে নয়, ওর স্থান এই পৃথিবীতে। (তাফহীমুল কুরআন)

শিক্ষাঃ প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা আন্ নাজম এর প্রথম ১৫টি আয়াতের যে ব্যাখ্যা পেশ করা হলো, তা থেকে আমাদের জন্য যেসব শিক্ষণীয় রয়েছে তা হলোঃ

১. আকাশের তারকারাজি অস্তমিত হয়ে যেভাবে রাতের আলো-আঁধার কেটে দিনের উজ্জ্বল আলো উদ্ভাসিত হয়ে পৃথিবীর যাবতীয় জিনিস স্বরূপে পরিস্কারভাবে দৃষ্টিগোচর হয়, অনুরূপভাবে রাসূল (সঃ) এর স্বভাব-চরিত্র, নীতি-নৈতিকতা, জীবন ও ব্যক্তিত্ব সকাল বেলার উজ্জ্বল আলোর মতই স্পষ্ট ও সর্বজন স্বীকৃত।

২. মুহাম্মদ (সঃ) নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে আল্লাহ, রাসূল, ওহী এবং ওহী বাহক জীবরাঈল ও আখিরাত সম্পর্কে যেসব বক্তব্য পেশ করেছেন, সে বিষয়ে যেমন কোনো ভাবেই কুরাইশ কাফিরদের মতো তাঁকে বিভ্রান্ত বা বিপদগামী বলে মন্তব্য করা যাবে না, তেমনি মনের মধ্যেও এ বিষয়ে সামান্যতম ধারণাও পোষণ করা যাবে না।

৩. নবী মুহাম্মদ (সঃ) যা কিছুই বলেন, তা তাঁর নিজস্ব মরগড়া কোনো কথা নয়, বরং তা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি নাযিল কৃত ওহী বা প্রত্যাদেশ।

৪. নবী করীম (সঃ) কে শিক্ষা দেয়ার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে মাধ্যম হিসেবে যাকে নিয়োগ করা হয়েছে, তিনি তো কোনো সাধারণ ফিরিশতা নন, বরং তিনি একজন মহাশক্তিশালী, কৈশলী ও বিচক্ষণ ফিরিশতা জিবরাঈল (আঃ), যার ছয়শত বাহুবিশিষ্ট দেহ যা আসমান যমীনের দিগন্তকে ঢেকে ফেলে।

৫. এটাও বিশ্বাস রাখতে হবে যে, নবী করীম (সঃ) এর নিকট যে ফিরিশতা ওহী নিয়ে এসেছেন, তাঁকে তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন যা তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন। সুতরাং যে ওহী তিনি নিয়ে এসেছেন তা নিয়ে বিতর্ক করা বা সন্দেহ পোষণ করা কোনো মুমিন মুসলিমের কাজ হতে পারে না। যদি কেউ তা নিয়ে বিতর্ক বা সন্দেহ পোষণ করে তবে তা হবে কুরাইশ কাফিরদের অনুরূপ আ'মল।

৬. এও বিশ্বাস করতে হবে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফিরিশতা জিবরাঈল (আঃ) কে আসলরূপে দু'বার দেখেছেন। একবার হলো নবুওয়াতের

প্রাথমিক যুগে মক্কার খোলা মাঠে। আর একবার দেখেছেন মি'রাজের রাতে 'সিদরাতুল মুনতাহা' বা কুল গাছের নিকট যেখানে জান্নাতুল মা-ওয়া অবস্থিত। সেখানে জান্নাতিদের রূহ অবস্থান করে।

৭. সর্বোপরি একজন খাঁটি মুমিনকে যেমন শিরকমুক্ত তাওহীদে পূর্ণ বিশ্বাসী হতে হবে, তেমনি রিসালাতের বিষয়েও পূর্ণ ও সংশয়মুক্ত বিশ্বাসী হতে হবে। অর্থাৎ নবী , ওহী বা কিতাব এবং ফিরিশতা এই তিনের সমন্বয়ে 'রিসালাত'। সুতরাং এর প্রত্যেকটিতে পূর্ণ এবং সংশয়মুক্ত বিশ্বাসী হতে হবে।

আহ্বানঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা আন্ নাজম এর প্রথম ১৫টি আয়াতের যে দারস পেশ করা হলো, এতে যদি আমার অজান্তে কোনো ভুল-ত্রুটি কিম্বা বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, তার জন্য আমি মহান আল্লাহ্ তাবারাক ওয়া তা'লার নিকট ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর আমরা সূরা আন্ নাজমের এই অংশ থেকে যেসব শিক্ষা লাভ করলাম তা যেন বিশ্বাসে ও আ'মলে পূর্ণ মুমিন হতে পারি, মহান আল্লাহ্র কাছে সেই তাওফীক কামনা করে দারস শেষ করছি। "অয়া আখিরুদাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন"।

———— o ————

লেখকের প্রকাশীত অন্যান্য বই

দারসে হাদীস ১ম খন্ড
দারসে হাদীস ২য় খন্ড
দারসে কুরআন ১ম খন্ড
দারসে কুরআন ২য় খন্ড
দারসে কুরআন ৩য় খন্ড
দারসে কুরআন ৪র্থ খন্ড
দারসে কুরআন ৫ম খন্ড
ইসলামী সংগঠন ও প্রশিক্ষণ
বিষয়ভিত্তিক নির্বাচিত হাদীস
আল-কুরআনে মানব সৃষ্টি তত্ত্ব
রাসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) রূহানী নামায
বিষয় ভিত্তিক কুরআন হাদীস সংকলন
বাংলা উচ্চারণসহ ১০০ মাসনুন দোয়া
কুরআন হাদীসের আলোকে পাঁচ দফা কর্মসূচী
ফাযায়িলে ইকামাতে দ্বীন বা দ্বীন প্রতিষ্ঠার (চেষ্টার) মর্যাদা

রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়। - আল হাদীস

লেখকের অন্যান্য বই

দারসে হাদীস-১ম খন্ড
দারসে হাদীস-২য় খন্ড
দারসে কুরআন-১ম খন্ড
দারসে কুরআন-২য় খন্ড
দারসে কুরআন-৩য় খন্ড
দারসে কুরআন-৪র্থ খন্ড
ইসলামী সংগঠন ও প্রশিক্ষণ
বিষয়ভিত্তিক নির্বাচিত হাদীস
আল কুরআনে মানব সৃষ্টি তত্ত্ব
রাসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) রুহানী নামায
বিষয়ভিত্তিক কুরআন হাদীস সংকলন
বাংলা উচ্চারণসহ ১০০ মাসনুন দোয়া
কুরআন হাদীসের আলোকে ৫দফা কর্মসূচী
ফাযায়েলে ইক্বামাতে দ্বীন বা দ্বীন প্রতিষ্ঠার (চেষ্টার) মর্যাদা

সাহাল প্রকাশনী

দারসে কুরআন

৬

অধ্যাপক আবদুল মতিন

দারসে
কুরআন

৬ষ্ঠ খন্ড

অধ্যাপক আবদুল মতিন

দারসে কুরআন- ৬ষ্ঠ খন্ড

প্রকাশনায় ঃ সাহাল প্রকাশনী
৩০৮, খানজাহান আলী রোড,
(তারের পুকুর) খুলনা।

প্রকাশকাল ঃ
নভেম্বর - ২০১৩ সাল
আশ্বিন - ১৪২০ সন
মহররম - ১৪৩৫ হিজরী

সত্ত্ব ঃ লেখক কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত।

প্রচ্ছদ ঃ কৃষ্টি কম্পিউটার,
৩০৮, খানজাহান আলী রোড, খুলনা।

অক্ষর বিন্যাস ঃ তামান্না
৩২১, খানজাহান আলী রোড, খুলনা।

নির্ধারিত মূল্য ঃ ৭০ টাকা

পরিবেশনায় ঃ সাহাল বুক কর্ণার
৩০৮, খানজাহান আলী রোড,
(তারের পুকুর) খুলনা।

মোবাইল ঃ ০১৭১১-৩৮৯০৭৬ (লেখক)
ঃ ০১১৯১-৭৮২২৮৬ (দোকান)

প্রাপ্তিস্থান

ইসলামিয়া লাইব্রেরী, বরিশাল।	কাটাবন বুক কর্ণার, ঢাকা।
আল-হেলাল লাইব্রেরী, যশোর।	ঢাকা বুক কর্ণার, পুরানাপল্টন, ঢাকা।
আল-আমীন লাইব্রেরী, সিলেট।	প্রফেসরস পাবলিকেশন, মগবাজার, ঢাকা।
আল-আমীন লাইব্রেরী, সাতক্ষীরা।	প্রফেসরস বুক কর্ণার, মগবাজার, ঢাকা।
একাডেমী লাইব্রেরী, দেওয়ান বাজার,চট্টগ্রাম।	খন্দকার প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা।

এ ছাড়াও জেলা শহরের বিভিন্ন লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়।

সূচী পত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১. কদর রাতের মর্যাদা- (সূরা কদর)	০৫
২. নারী-পুরুষের পর্দার বিধিবিধান-(সূরা আন-নূর-৩০-৩১)	২৩
৩. সন্তানের প্রতি আদর্শ পিতার উপদেশ-(সূরা লুকমান-১৩-১৯)	৫৪
৪. সুখে-দুঃখে সকল অবস্থায় ভারসাম্যপূর্ণ জীবন-যাপন করা। প্রাপকের হক বুঝিয়ে দেয়া। সূদ নয় বরং যাকাতই সম্পদ বৃদ্ধি করে। স্থল ও জলের বিপর্যয় মানুষেরই অর্জিত ফল- (সূরা রূম-৩৩-৪২)	৭৬
৫ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার মৌলিক নীতিমালা- (সূরা বানী ইসরাঈল -২৩-৩৮)	৯৩
৬. যুদ্ধ-জিহাদে বৈষয়িক কোন কিছু লাভের উদ্দেশ্যই আসল না হয়ে বরং আলাহর সন্তুষ্টি লাভই আসল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার জন্য দুর্বলের মুকাবিলা না করে সবল শক্তির মুকাবিলা করা- (সূরা আনফাল -১-৮)	১২৪
৭. নারী-পুরুষ সকলেই আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য হিজরত করা, বাড়িঘর থেকে বের করে দেয়া এবং নিহত হবার প্রতিদান- (সূরা আলে ঈমরান -১৯৪-২০০)	১৪৩

ভূমিকা

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহীম

নাহমাদুহু অনুসল্লি আ'লা রাসূলিহিল কারীম। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সর্বশেষ আসমানী কিতাব যা মানব জাতির পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর উপর অবতীর্ণ হয়।

মানুষের ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে, পারিবারীক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের যাবতীয় সমাধান আল-কুরআনে রয়েছে। সুতরাং প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর করণীয় হলো আল-কুরআনকে নিজের ভাষায় বুঝে তার শিক্ষানুযায়ী বাস্তব জীবনে আ'মল করা। কিন্তু সমস্যা হলো আমাদের দেশের সামাজিক এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় আল-কুরআনের সঠিক শিক্ষাকে তুলে ধরার তেমন কোনো বাস্তব মাধ্যম নেই। যতটুকু আছে তাও আবার সিলেবাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং ভিন্নভাবে কুরআনকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল-কুরআনের বিধি-বিধান মানতে হলে কুরআনের প্রকৃত বুঝ থাকা প্রয়োজন। আল-কুরআনের প্রকৃত বুঝ দেবার জন্যেই আমি আল কুরআনের বাছাই করা কতকগুলো অংশ থেকে 'দারসে কুরআন' খন্ড আকারে প্রকাশ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। তারই অংশ হিসেবে **ষষ্ঠ খন্ড** প্রকাশ করা হলো এবং আগামীতে আরও খন্ড প্রকাশ করার ইচ্ছা আছে-যদি আল্লাহ্ আমাকে লেখার তাওফীক দান করেন।

আমি 'দারসে কুরআন' এর খন্ডগুলো ইসলামী আন্দোলনের আধুনিক ও সাধারণ শিক্ষিত কর্মী ভাই-বোনদের দারস পেশ করার উপযোগি করে লেখার চেষ্টা করেছি। তাছাড়া দারসে কুরআন প্রথম খন্ডের প্রথম দিকে কুরআনকে সহজে বুঝানোর জন্য ধারাবাহিকভাবে দারস দানের পদ্ধতি ও দারসের সময় বন্টনের নমুনা হিসেবে চারটি ছক উল্লেখ করেছি এবং সাধারণ মানুষের উপর যাতে দারসের প্রভাব পড়ে সেই জন্য দারস দানকারীর কতিপয় করণীয় উল্লেখ করেছি। বইটি লেখার বিশেষ বৈশিষ্ট হলো শ্রোতার সামনে যেন আপনি নিজেই দারস পেশ করছেন।

দারসে কুরআন পঞ্চম খন্ড লেখা এবং প্রকাশের ক্ষেত্রে যেসব গুণগ্রাহী ব্যক্তি ও পাঠক-পাঠীকা পরামর্শ, সময় ও উৎসাহ দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করেছেন তাদের শুকরিয়া আদায় করছি এবং মহান আল্লাহর কাছে তাদের জন্য উত্তম প্রতিদান কামনা করছি।

লেখা ও ছাপার ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। অতএব কোনো সুহৃদয় ব্যক্তির দৃষ্টিতে যদি ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে কিংবা কোন পরামর্শ থাকে, তাহলে আমাকে সরাসরি জানালে আমি কৃতজ্ঞ থাকবো এবং ভবিষ্যতে সংশোধন করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ্।

পরিশেষে মহান আল্লাহ তাবারাক ওয়া তা'লার কাছে আমার আরজ, হে আল্লাহ! তোমার এই মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের ব্যাখ্যা এবং শিক্ষা পেশ করতে যেয়ে যদি আমার অজান্তে কোনো ভুল-ত্রুটি কিংবা বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, তার জন্য তুমি আমাকে মেহেরবানী করে ক্ষমা করে দিও। আর সীমিত জ্ঞানের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করে আখিরাতে আদালতে নাজাতের জারিয়া বানিয়ে দিও। আমীন।

মুহাম্মদ আবদুল মতিন
সহকারী অধ্যাপক, ইসলামীক ষ্টাডিজ বিভাগ
দৌলতপুর কলেজ (দিবা-নৈশ)
দৌলতপুর, খুলনা।

তারিখ- ০১. ১১. ২০১৩

এক

কদর রাতের মর্যাদা

সূরা-কদর-৯৭

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝ وَمَا اَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝
لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۙ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ۝ تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ
فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ اَمْرٍ ۝ سَلٰمٌ ۛ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝

সরল অনুবাদ ঃ ইরশাদ হচ্ছে -(১) নিশ্চয়ই আমি উহা (কুরআনকে) কদরের রাতে নাযিল করেছি। (২) হে নবী, আপনি কি জানেন কদরের রাত কি? (৩) কদরের রাত হলো হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম-কল্যাণময়। (৪) এই (রাতে) ফিরিশতাগণ ও রূহ (জীবরীল আমীন) তাদের রব এর অনুমতিক্রমে সকল হুকুম নিয়ে অবতীর্ণ হয়। (৫) এতে শান্তি তথা নিরাপত্তা বর্ষিত হতে থাকে ফজরের উদয় পর্যন্ত।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ اِنَّا -নিশ্চয়ই আমি। اَنْزَلْنٰهُ -আমি তা/ উহা (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি। فِيْ -মধ্যে/তে। لَيْلَةِ -রাত। الْقَدْرِ - সম্মান্বিত/মহিমান্বিত। وَ -আর। مَا -কি? اَدْرٰىكَ -আপনি জানেন। مَا - সম্পর্কে/সম্বন্ধে। خَيْرٌ -উত্তম/শ্রেষ্ঠ। مِنْ -হতে/থেকে। اَلْفِ -হাজার। شَهْرٍ -মাস। تَنَزَّلُ -অবতীর্ণ হয়। الْمَلٰٓئِكَةُ -ফিরিশতাগণ। وَ -এবং। الرُّوْحُ -রূহ (জীবরীল আমীন)। فِيْهَا -তাতে। بِاِذْنِ - অনুমতিক্রমে।

رَبِّهِمْ -তাদের রবের/প্রতিপালকের। مِنْ كُلِّ -প্রত্যেকটি। أَمْرٍ -বিষয়ে/কর্মে। سَلَٰمٌ -শান্তি/নিরাপত্তা। هِىَ -সেই রাতে। حَتَّىٰ -পর্যন্ত। مَطْلَعِ -উদয়/উত্তোলন। الْفَجْرِ -ফজরের।

সম্বোধন ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে/মাহফিলে উপস্থিত প্রিয়/সম্মানিত ভাইয়েরা/বোনেরা/ভাই ও বোনেরা! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ। আমি আপনাদের সামনে/খিদমতে পবিত্র আল কুরআনের সূরা সমূহের মধ্য থেকে ছোট্ট অথচ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি সূরা তিলাওয়াত ও সরল অনুবাদ পেশ করেছি। আল্লাহ্ পাক যেন আমাকে আপনাদের খিদমতে এই তাৎপর্যপূর্ণ সূরার ব্যাখ্যা ও শিক্ষা সঠিকভাবে তুলে ধরার তাওফীক দান করেন। আমীন।

সূরাটির নামকরণ ঃ এই সূরাটির নাম 'সূরা কদর'। এই সূরার প্রথম আয়াতে উল্লেখিত الْقَدْرِ শব্দটিকে কেন্দ্র করেই সূরার নাম 'কদর' নামকরণ করা হয়েছে। 'কদর' শব্দের অর্থ সম্মান্বিত বা মহিমান্বিত। সাধারণতঃ পবিত্র আল কুরআনের অধিকাংশ নামকরণ প্রতীকী বা চিহ্ন হিসেবে করা হয়েছে। তবে এই সূরাটির বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করলে মনে হয়, এই সূরাটির নামকরণ শিরোনাম হিসেবেই করা হয়েছে। তবে যা কিছু করা হয়েছে তা ওহীর নির্দেশেই করা হয়েছে।

সূরাটি নাযিলের সময়কাল ঃ এই সূরাটি মাক্কী না মাদানী, এই বিষয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। যেমন আবু হাইয়্যান তাঁর 'বাহরে মুহীত' নামক গ্রন্থে দাবী করে বলেছেন যে, অধিকাংশ বিশেষজ্ঞদের মতে এই সূরাটি মাদানী। আলী ইবনে আহমদ আল-ওয়াহেদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, মদীনায় সর্বপ্রথম এই সূরাটিই অবতীর্ণ হয়।

অপর পক্ষে আল্লামা আল-মাওয়ার্দী বলেন, অধিক সংখ্যক কুরআন বিশারদদের মতে এই সূরা মাক্কী। যেমন, ইমাম সুয়ূতী 'আল-ইতকান' গ্রন্থে এ কথাই লিখেছেন। ইবনে মারদুইয়া, ইবনে আব্বাস, ইবনু যুবাইর ও হযরত আয়িশা (রাঃ) একটি উক্তি উল্লেখ করেছেন, তাতে রয়েছে এই সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। সূরাটির মূল বক্তব্য ও বিষয়বস্তু নিয়ে

চিন্তা-গবেষণা করলে মনে হয়, এই সূরাটি মক্কার পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অতএব ধরে নেয়া হয়, এই সূরাটি অবশ্যই মক্কায় অবতীর্ণ হয়ে থাকবে। এর পরেও আল্লাহই ভাল জানেন।

শানে নুযূল বা নাযিলের কারণ ঃ এই সূরার শানে নুযূল বা অবতরণের কারণ সম্পের্কে দু'টি বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন, মুসনাদে ইবনে আবী হাতিমে হযরত আলী ইবনে উরওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সঃ) বানী ইসরাঈলের চারজন আবেদের কথা উল্লেখ করেন। তাঁরা আশি বছর পর্যন্ত আল্লাহ তা'লার ইবাদত করেছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁরা ক্ষণিকের জন্যেও আল্লাহর নাফরমানী করেননি। তাঁরা হলেন, হযরত আইউব (আঃ), হযরত যাকারিয়া (আঃ), হযরত হাযকীল ইবনে আ'জুয (আঃ) এবং হযরত ইউশা ইবনু নুন (আঃ)। সাহাবাগণ (রাঃ) এ ঘটনা শুনে খুবই অবাক হলেন। তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট এসে বললেনঃ "হে মুহাম্মদ (সঃ)! আপনার উম্মত এই ঘটনায় বিস্ময়বোধ করছেন, জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তা'লা আপনার উপর এর চেয়েও উত্তম জিনিস দান করেছেন। আপনার উম্মত যে ব্যাপারে বিস্মিত হয়েছে এটা তার চেয়েও উত্তম।" তারপর তিনি তাঁর কাছে এই সুরাটি পাঠ করলেন। এতে রাসূলুল্লাহ (সঃ) ও সাহাবায়ে কিরাম অত্যন্ত খুশী হলেন।

(ইবনে কাসীর)

তাফসীরে মা'রিফুল কুরআনে ইবনে আবী হাতেম (রাঃ) এর বর্ণনার উদ্বৃত দিয়ে উল্লেখ রয়েছে। একবার রাসূলুল্লাহ (সঃ) বানী ইসরাঈলের জনৈক মুজাহিদ ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করলেন যে, সে এক হাজার মাস পর্যন্ত অবিরাম জিহাদে মশগুল থাকে এবং কখনও সে অস্ত্র সংবরণ করেনি। সাহাবাগণ একথা শুনে বিস্মিত হলে এ সূরা কদর অবতীর্ণ হয়। এতে এ উম্মতের জন্যে শুধু এক রাতের ইবাদতই সেই মুজাহিদের এক হাজার মাসের ইবাদতের চেয়েও শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করা হয়েছে।

ইবনে জরীর (রহঃ) অপর একটি ঘটনা এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, বানী ইসরাঈলের জনৈক এক ইবাদতকারী ব্যক্তি সমস্ত রাত ইবাদাত-বন্দেগীতে মশগুল থাকতো ও সকাল হলেই জিহাদের জন্যে বের হয়ে পড়তো এবং সারাদিন জিহাদে লিপ্ত থাকতো। সে এক হাজার মাস

এভাবে কাটিয়ে দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ তা'লা সূরা কদর নাযিল করে এ উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। এ থেকে আরও প্রতীয়মান হয় যে, 'লাইলাতুল কদর' উম্মতে মুহাম্মদীরই বৈশিষ্ট্য। (মাযহারী)

সূরাটির মূল বক্তব্য বা আলোচ্য বিষয় ঃ পবিত্র আল কুরআনের মর্যাদা, মূল্য ও গুরুত্ব বুঝানোই এই সূরার মূল বক্তব্য। আল কুরআনে সূরাগুলোকে পরস্পর সাজানোর ক্ষেত্রে এই সূরাটিকে 'সূরা আ'লাকের' পর রাখা বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। স্বাভাবিক ভাবে মনে হয়, সূরা আ'লাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত নাযিলের মাধ্যমে যে মহাগ্রন্থ আল কুরআনের অবতরণ শুরু হয়েছিলো সেই কুরআন সম্পর্কেই এই সূরায় বলা হয়েছে যে, এই কুরআন যে রাতে অবতরণ হতে শুরু করেছিলো তা এক ইতিহাস সৃষ্টিকারী ও মানুষের ভাগ্য নির্ধারণকারী রাত ছিলো। এই কিতাব অতি মর্যাদাপূর্ণ ও মহাগ্রন্থ এবং নাযিল হওয়াও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার।

ব্যাখ্যা ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে/মাহফিলে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা/ বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে দারস বুঝানোর জন্য সূরাটি সম্পর্কে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কতিপয় বিষয় তুলে ধরা হলো। এখন নিম্নে ধারাবাহিকভাবে সূরাটির ব্যাখ্যা পেশ করছি।

সূরাটির প্রথম আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন- إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

নিশ্চয় আমি উহাকে (কুরআনকে) কদরের রাতে অবতীর্ণ করেছি।

এখানে আয়াতের প্রথমেই বলা হয়েছে إِنَّا أَنزَلْنَاهُ "নিশ্চয় আমি উহাকে নাযিল করেছি।" কিন্তু এর পূর্বে কুরআনের কথা উল্লেখ করা হয়নি। যদিও এতে কুরআনের দিকেই ইংগিত করা হয়েছে। কেননা, 'নাযিল করা' কথাটা দ্বারা স্বাভাবিক ভাবে বুঝা যায় যে, এটা কুরআন সম্পর্কেই বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআনেই এর বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এখানে 'কুরআন' শব্দটি উল্লেখ না করে জমির বা সর্বনাম 'ه' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ এর আগে-পরে কোথাও 'কুরআন' শব্দটি উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু কথার ধরণ এবং সূরার আলোচনা থেকে স্বাভাবিক ভাবেই বুঝা যায় যে 'ه' বা 'উহাকে' সর্বনামটি আল কুরআনকেই বুঝিয়েছে।

فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ - "কদরের রাতে।" অর্থাৎ আমি কুরআন কদরের রাতে অবতীর্ণ করেছি। আর সূরা বাকারার ১৮৫ নম্বর আয়াতে মাসের নাম নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ "রমযান মাস, যেই মাসে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে।" এ থেকে এও জানা গেল যে, যে রাতে হযরত জিবরাঈল (আঃ) সর্বপ্রথম নবী করীম (সঃ) এর নিকট ওহী নিয়ে এসেছিলেন, তা রমযান মাসের-ই একটি রাত ছিলো। এই রাতের পরিচয় এই সূরাতেই দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ 'কদরের রাতে' অর্থাৎ উহা কদরের রাত ছিলো। আর সূরা দোখান এর ০৩ নম্বর আয়াতে একে মুবারক বা বরকতপূর্ণ রাত উল্লেখ করে বলা হয়েছে- اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ "নিশ্চয় আমি উহাকে (কুরআনকে) বরকতপূর্ণ রাতে অবতীর্ণ করেছি"।

একটি প্রশ্নঃ আমরা সবাই জানি যে, পবিত্র আল কুরআন দীর্ঘ তেইশ বছরে নাযিল হয়েছে। অথচ আমরা এখানে দেখছি পবিত্র কুরআন রমযান মাসে কদরের রাতে অবতীর্ণ হয়েছে?

উত্তরঃ উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর এভাবে সহজে দেয়া যায় যে, পবিত্র কুরআন নাযিল দু'টি পর্বে বিভক্ত।

যেমন- (১) اِنْزَال (ইনযাল) (২) تَنْزِيْل (তানযীল)

প্রথম পর্ব ঃ اِنْزَال (ইনযাল) এর অর্থ হলো -"একত্রে অবতরণ করা"। পবিত্র আল কুরআন মহান আল্লাহর আরশে আযীমে অবস্থিত 'লওহে মাহফুজ' বা সংরক্ষিত ফলকে সংরক্ষিত ছিলো। সেখান হতে রমযান মাসের কদরের রাতে পৃথিবী সংলগ্ন আসমানে অর্থাৎ প্রথম আসমানে অবস্থিত 'বায়তুল ইয্যাতে' সমূর্ণ কুরআন একই সাথে অবতীর্ণ হয়। পবিত্র কুরআন অবতরণের এই পর্বকে اِنْزَال বলা হয়। এ সম্পর্কে কয়েকটি উদ্ধৃতি নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ যেমন, সূরা বাকারার ১৮৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে- شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ "রমযান মাস, যে মাসে কুরআন (একসঙ্গে) অবতীর্ণ করা হয়েছে"।

মহান আল্লাহ্ সূরা কদরের ০১ নম্বর আয়াতে আরও বলেছেন-

إِنَّا أَنْزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ الْقَدْرِ

"নিশ্চয়ই আমি উহা (কুরআন)-কে কদরের রাতে অবতীর্ণ করেছি"।

অর্থাৎ, একই সাথে পূর্ণ কুরআন অবতীর্ণ করেছি। সূরা দোখান এর ০৩ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন-

إِنَّا أَنْزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةٍ مُّبَٰرَكَةٍ- "নিশ্চয়ই আমি কুরআনকে বরকতময় রাতে অবতীর্ণ করেছি"।

উপরোক্ত তিনটি আয়াতেই إِنْزَالٌ শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে একত্রে পূর্ণ কুরআন নাযিলেরই প্রমাণ বহন করে।

দ্বিতীয় পর্ব ঃ تَنْزِيْل (তানযীল) তানযীল শব্দের অর্থ হলো– "পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ করা"। পবিত্র আল কুরআন কদরের রাতে একই সাথে প্রথম আসমানে অবতীর্ণ হবার পর বায়তুল ইয্যাত হতে প্রধান ফিরিশতা হযরত জিবরাঈল (আঃ) এর মাধ্যমে ২৩ বছর ব্যাপী প্রয়োজন অনুযায়ী অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হওয়াকে تَنْزِيْل বা 'পর্যায়ক্রমে অবতরণ' বলা হয়।

এর উদাহরণ হিসেবে সূরা বানী ইসরাঈল এর ১০৬ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন-

وَقُرْاٰنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيْلًا

"আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি খন্ড খন্ড ভাবে, সময়ে সময়ে, যাতে আপনি মানুষের নিকট ধীরে ধীরে পাঠ করেন এবং আমি তা অবতীর্ণ করেছি পর্যায়ক্রমে"।

এখানে تَنْزِيْل শব্দটি দ্বারা পবিত্র কুরআন ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে প্রয়োজন মাফিক দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে নাযিলের কথায় বুঝানো হয়েছে।

অর্থাৎ আমরা উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর সহজেই এইভাবে সমাধান করতে পারি যে, পবিত্র আল কুরআন সপ্ত আসমানে লাওহে মাহফুজ থেকে রমযান মাসে কদরের রাতে প্রথম আসমানে একত্রে অবতীর্ণ হয় এবং

সেখান থেকে নবী করীম (সঃ) এর দীর্ঘ ২৩ বছর নবুয়তের জিন্দেগীতে প্রয়োজনমত দুনিয়ার এই যমীনে অবতীর্ণ হয়। এ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ সাহাবী হতে বর্ণিত আছে যে, কদরের রাতে সমগ্র কুরআন লাওহে মাহফুজ হতে প্রথম আসমানে অবতীর্ণ হয়েছে। তারপর ঘটনা অনুযায়ী দীর্ঘ তেইশ বছরে ধীরে ধীরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। (ইবনে কাসীর)

দ্বিতীয় এও হতে পারে যে, কদরের রাতে সূরা আ'লাকের ১ম পাঁচটি আয়াত অবতরণের মাধ্যমে কুরআন নাযিলের সূচনা হয়। অতঃপর অবশিষ্ট কুরআন পরবর্তী সময়ে ২৩ বছরে ধাপে ধাপে অবতীর্ণ হয়।

সমস্ত আসমানি কিতাব রমযান মাসেই অবতীর্ণ হয়েছে ঃ হযরত আবুযর গিফারী (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, ইব্রাহীম (আঃ) এর উপর সহীফাসমূহ ৩রা রমযান, তাওরাত ৬ই রমযান, ইনজীল ১৩ই রমযান এবং যাবুর ১৭ই রমযানে অবতীর্ণ হয়েছে। আর আল কুরআন ২০শে রমযানে নাযিল হয়েছে। (মাযহারী-মা'রিফুল কুরআন)

قَدْرٌ (কদর) অর্থ ঃ কদরের এক অর্থ মাহাত্ম ও সম্মান। কেউ কেউ এখানে এই অর্থই নিয়েছেন। এর মাহাত্ম ও সম্মানের কারণে একে لَيْلَةِ الْقَدْرِ তথা 'মহিমান্বিত রাত' বলা হয়।

কদরের আর এক অর্থ তাকদীর ও আদেশও হয়ে থাকে। এ রাতে পরবর্তী এক বছরের অবধারিত বিধিলিপি ব্যবস্থাপক ও প্রয়োগকারী ফিরিশতাগণের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এতে প্রত্যেক মানুষের বয়স, মৃত্যু, রিযিক, বৃষ্টি ইত্যাদির পরিমান নির্দিষ্ট ফিরিশতাগণকে লিখে দেয়া হয়। এমনকি এ বছর কে হজ্জ করবে তাও লিখে দেয়া হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর উক্তি অনুযায়ী চার জন ফিরিশতাকে এসব কাজ অর্পণ করা হয়। তারা হলেন, ইসরাফীল, মীকাঈল, আযরাঈল ও জিবরাঈল (আঃ)-(কুরতুবী)

তাছাড়া নিম্নের আয়াত দ্বারা তাই প্রমাণিত হয়। যেমন-

إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ○ فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيْمٍ ○ أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا ط إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ○

"নিশ্চয় আমি উহাকে (কুরআনকে) এক বরকতপূর্ণ রাতে অবতীর্ণ করেছি। নিশ্চয় আমি সাবধানকারী। এ রাতে প্রত্যেক জ্ঞানপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয় আমার আদেশক্রমে। আর আমিই প্রেরণকারী।" (সূরা দুখান ৩-৬)

অধিকাংশ তাফসীরবিদদের মতে لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ এর অর্থ কদরের রাত।

কদর এর রাত কোনটি ঃ আল কুরআনের সুস্পষ্ট বর্ণনা দ্বারা একথা প্রমাণিত যে, কদরের রাত রমযান মাসে। কিন্তু সঠিক তারিখ সম্পর্কে ওলামাদের বিভিন্ন মতামত রয়েছে যা সংখ্যায় প্রায় ৪০ পর্যন্ত পৌঁছেছে। নিম্নে তাঁদের কয়েকটি উক্তি উল্লেখ করা হলো ঃ

১. হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সঃ) কদরের রাত সম্পর্কে বলেছেন, উহা ২৭ কিংবা ২৯ রাত। (আবু দাউদ) একই রাবীর দ্বিতীয় আরো একটি বর্ণনায় রয়েছে, উহা রমযানের শেষ রাত। (আহমাদ)

২. যির ইবনে হুবাইশ হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) কে কদরের রাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি শপথ করে বললেন; উহা ২৭ তম রাত, তিনি এর ব্যতিক্রম দেখেননি।
(আহমাদ, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে হাব্বান)

৩. হযরত উবাই ইবনে সামেত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। নবী করীম (সঃ) বলেছেন, কদরের রাত রমযান মাসের শেষ দশ রাতের মধ্যে একটি বে-জোড় রাত। আর তা হলো ২১, ২৩, ২৫, ২৭ কিংবা ২৯ তম অথবা সর্বশেষ রাত। (আহমাদ)

৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, উহাকে রমযান মাসের শেষ দশ রাতের মধ্যে সন্ধান করো- যখন মাস শেষ হতে ০৯ দিন বাকী থাকবে, কি ০৭ দিন থাকবে, কি ০৫ দিন বাকী থাকবে। (সহীহ বুখারী)

বিশেষজ্ঞদের অধিকাংশের এ ব্যাপারে মত হলো, নবী করীম (সঃ) এ কথা দ্বারা বে-জোড় রাত বুঝাতে চেয়েছেন।

৫. হযরত আবু বকর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, ০৯ দিন বাকী থাকলে কিংবা ০৭ দিন অথবা ০৫ দিন কিংবা ০৩ দিন অথবা শেষ রাত। অর্থাৎ এসব রাতে কদরের রাত খোঁজ করে দেখ। (তিরমিযী, নাসাঈ)

৬. হযরত আয়িশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, তোমরা কদরের রাত রমযান মাসের শেষ দশ রাতের কোন বেজোড় রাতে খোঁজ করো। (সহীহ্ বুখারী-মুসলিম, আহ্মাদ, তিরমিযী)।

৭. হযরত আয়িশা (রাঃ) এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) হতে এও বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সঃ) তার জীবদ্দশায় রমযান মাসের শেষ দশ রাতে ই'তিকাফ করেছেন।

৮. হযরত ওবাদা ইবনে সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে কদরের রাত সম্পর্কে খবর দেয়ার জন্য বের হলেন। কিন্তু পথে দেখলেন যে, দু'জন মুসলমান পরস্পর ঝগড়া করছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বললেন, আমি তোমাদেরকে কদরের রাতের খবর দিতে এসেছিলাম। কিন্তু উমুক উমুকের ঝগড়ার কারণে ঐ রাতের বিষয়টি আমার স্মৃতি থেকে তুলে নেয়া হয়েছে। সম্ভবতঃ এর মধ্যে তোমাদের জন্যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এখন ওটাকে রমযানের শেষ দশকের নবম, সপ্তম ও পঞ্চম রাতে তালাশ করো।

(ইবনে কাসীর)

এ রাত নির্ধারিত না হলে প্রতি বছরের কদরের রাত কবে তা জানা যেত না, এখানে এটাই বুঝানো হয়েছে। কদরের রাতের মধ্যে যদি রদবদল হতো, তাহলে সেই বছরের কবে কদরের রাত তা জানা যেত না, এখানে এটাই বুঝানো হয়েছে। অন্যান্য বছরের জন্যে এ নির্ধারণ কাজে আসতো না। তবে হ্যাঁ, একটা জবাব এও হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ বছরের কদরের রাতের সংবাদ দেয়ার জন্যেই এসেছিলেন। এ হাদীস থেকে এটাও প্রমাণ হয় যে, ঝগড়া-বিবাদ কল্যাণ, বরকত এবং ফলপ্রসু জ্ঞানকে নষ্ট করে দেয়। অন্য একটি সহীহ্ হাদীসে বর্ণনা রয়েছে যে, বান্দাই নিজের পাপের কারণে আল্লাহর দেয়া রিযিক থেকে বঞ্চিত হয়।

(ইবনে কাসীর)

উপরোক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন যে, কদরের রাত তুলে নেয়া হয়েছে। এর প্রকৃত অর্থ হলো কদরের রাত নির্দিষ্ট করণের জ্ঞান তুলে নেয়া হয়েছে। কদরের রাতই যে তুলে নেয়া হয়েছে এমন নয়, কিন্তু অজ্ঞ ও বিভ্রান্ত শিয়া সম্প্রদায় বলে যে, কদরের রাতই তুলে নেয়া হয়েছে। কদরের রাত যে তুলে নেয়া হয়নি তার বড় প্রমাণ এই যে, উপরোক্ত

কথার পরই রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন,"কদরের রাত রমযানের শেষ দশকের নবম, সপ্তম ও পঞ্চম রাতে তালাশ করো।" (ইবনে কাসীর)

"নবী করীম (সঃ) যে বলেছেন, কদরের রাত নির্দিষ্ট করণ সম্পর্কিত জ্ঞান তুলে নেয়ার মধ্যে সম্ভবতঃ তোমাদের জন্যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এর ভাবার্থ হলো এই যে, এই রাত তালাশকারীরা সম্ভাব্য সমস্ত রাতে ভক্তি ও বিনয়ের সাথে ইবাদত বন্দেগী করবে। আর যদি এই রাত নির্দিষ্ট হয়ে যায় তাহলে শুধু ঐ রাতেই ইবাদত করবে। আর এই রাত নির্দিষ্ট করে না দেয়ার মধ্যে আল্লাহর হিকমত এই যে, এই মর্যাদাপূর্ণ রাত পাবার আশায় বান্দাই-বান্দীরা পবিত্র রমযান মাসে মন দিয়ে ইবাদত করবে এবং রমযানের শেষ দশকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইবাদত বন্দেগীর কাজে নিয়োজিত থাকবে। (ইবনে কাসীর)

নবী করীম (সঃ) তাঁর জীবদ্দসায় রমযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন। তাঁর ওফাতের পর তাঁর স্ত্রীগণও উক্ত সময়ে ই'তিকাফ করতেন। (সহীহ বুখারী-মুসলিম)

কদরের রাত পাবার জন্য রাসূলুল্লাহ (সঃ) শেষ দশককে এমন গুরুত্ব দিতেন যে, হযরত আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। রমযানের দশদিন বাকী থাকতেই রাসূলুল্লাহ (সঃ) সারা রাত জেগে কাটাতেন এবং বাড়ীর সকলকেই জাগাতেন ও কোমর কষে বেঁধে নিতেন। অর্থাৎ ইবাদতের জন্যে উঠে পড়ে লেগে যেতেন। (সহীহ বুখারী-মুসলিম)

উপরোক্ত বিশদ আলোচনা থেকে আমরা পরিস্কারভাবে জানতে পারলাম যে, কদরের রাত হিসেবে কোন এক রাতকে নির্দিষ্ট করে নেয়া সঠিক নয়। যেমন ভাবে আমাদের সমাজের বেশীর ভাগ আলেমরা ২৭ তারিখকে নির্দিষ্ট করে নিয়েছেন। অথচ নবী করীম (সঃ) নিজে, তাঁর সাহাবাগণ এবং পরবর্তীকালের ঈমাম এবং বিশেষজ্ঞ আলেমরা নির্দিষ্ট করে নেননি। ঈমাম মালেক (রহঃ) বলেন যে, রমযানের শেষ দশ রাতে কদরের রাতকে সমান গুরুত্বের সাথে তালাশ করতে হবে। কোন রাতকে কোন রাতের উপর প্রাধাণ্য বা গুরুত্ব দেয়া যাবে না। (ইবনে কাসীর)

অথচ আমাদের সমাজের অধিকাংশ আলেম এবং মসজিদের ইমাম সাহেবগণ ২৭ তারিখ নিয়ে একটু বেশী বাড়াবাড়িই করে থাকেন,

যা বিদ'আতের মধ্যে গণ্য হয়ে যায়। আল্লাহ্ আমাদেরকে বিদ'আত থেকে হিফাজত করুন এবং প্রকৃত সুন্নত আ'মল করার তাওফীক দান করুন।

পরবর্তী আয়াতে কদরের রাতের মর্যাদা বা মাহাত্ম সম্পর্কে বলতে গিয়ে মহান আল্লাহ্ পাক বলেন-

وَمَا اَدْرٰئكَ مَالَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ

হে নবী, আপনি কি জানেন, কদরের রাত কি? কদরের রাত হলো হাজার মাসের চেয়েও উত্তম।

আয়াত দু'টির প্রথম আয়াতে কদরের বিস্ময়কর মর্যাদার কথা জানানোর জন্য নবী করীম (সঃ) এর দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ প্রশ্নাকারে বলছেন যে, হে নবী, আপনি কি জানেন কদর রাতের মর্যাদা ও মাহাত্ম কতো? আপনার সঙ্গী-সাথী সাহাবাগণ দীর্ঘ আয়ুপ্রাপ্ত বানী ইসরাঈলের লোকদের দীর্ঘজীবন ইবাদত-বন্দেগী করার সুযোগ পাবার কারণে তাদের যে আফসোস-আক্ষেপ,তারা তা এক রাতের ইবাদত-বন্দেগী করেই তার চেয়ে বেশী মর্যাদার অধিকারী হয়ে যাবে। যা আপনার উম্মত ছাড়া অন্য কোন উম্মতের ভাগ্যে জোটেনি। আর জেনে নিন যে, لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ "কদরের রাতের মর্যাদা হলো হাজার মাসের চেয়েও উত্তম"।

এখানে হাজার মাস বলতে গুনে গুনে ৮৩ বছর ৪ মাস বুঝায় না, বরং অনেক অনেক বুঝায়। কেননা, বহু-বিপুল সংখ্যা বুঝাবার জন্য 'হাজার' সংখ্যা ব্যবহার করা আরববাসীদের সাধারণ অভ্যাস- তাদের সাধারণ প্রচলন। কাজেই আয়াতটির প্রকৃত অর্থ হলো এই যে, এই একটি মাত্র রাতে কল্যাণ ও মঙ্গলের এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল- এত বড় একটা কাজ হলো, যা মানব ইতিহাসের দীর্ঘ সময়েও এরূপ বিরাট ঘটনা বা কাজ সম্পন্ন হয়নি।

কদর রাতের মর্যাদা ঃ আল কুরআন নাযিলের এই রাতের মর্যাদা সম্পর্কে এই সূরাতেই বলা হয়েছে হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। এখানে বুঝা যায় যে, বান্দাহ এ রাতে ইবাদতের মাধ্যমে কমপক্ষে হাজার মাসের ইবাদত-বন্দেগীর মর্যাদা পেয়ে যাবেন। আর বেশীর কোন সীমা নেই। আল্লাহকে

বান্দাহ যতো বেশী রাজী-খুশী করতে পারবে, সে ততো বেশী মর্যাদা লাভ করবে। এটা নির্ভর করবে বান্দার নেক আ'মল ও নিষ্ঠার উপর।

কদর রাতের ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে বান্দাহ যে কেবল মাত্র হাজার মাসের ইবাদতের চেয়ে বেশী নেকী অর্জন করবে শুধু তাই নয়। বরং তার অতীতের গুনাহও মাফ হয়ে যাবে। যেমন, হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন-

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"যে ব্যক্তি কদরের রাতে ঈমান ও (আত্মপর্যালোচনার মাধ্যমে) নেকীর আশায় দাঁড়িয়ে (নামাযে) কাটাবে, তার অতীতের সব গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।" (সহীহ বুখারী-মুসলিম)

অন্য এক হাদীসে হযরত উবাদাহ ইবনে সামিত (রাঃ) বর্ণনা করেন। নবী করীম (সঃ) বলেছেন, কদরের রাত রমযান মাসের শেষ দশ রাত্রিতে রয়েছে। যে ব্যক্তি আত্মপর্যালোচনার মাধ্যমে সোয়াব লাভের উদ্দেশ্যে ইবাদতের মাধ্যমে দাঁড়িয়ে কাটাবে, আল্লাহ তার আগের ও পরের গুনাহ মাফ করে দিবেন। (আহমাদ)

মুসনাদে ইবনে আবী হাতিমে হযরত মুজাহীদ (রহঃ) হতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বানী ইসরাঈলের জনৈক এক ব্যক্তির উল্লেখ করে বলেন যে,ঐ লোকটি এক হাজার মাস পর্যন্ত জিহাদে অংশ নিয়েছিলো। মুসলমানরা একথা শুনে অবাক হওয়ায় আল্লাহ তা'লা সূরা কদর নাযিল করে জানিয়ে দেন যে, কদরের রাতের ইবাদত ঐ ব্যক্তির এক হাজার মাসের ইবাদতের চেয়েও উত্তম। (ইবনে কাসীর)

ইমাম ইবনে জরীর (রহঃ) হযরত মুজাহীদ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন, বানী ইসরাঈলের জনৈক এক লোক রাতের বেলায় সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত থাকতো এবং দিনের বেলায় সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধে লিপ্ত থাকতো। সে এভাবে এক হাজার মাস পর্যন্ত কাটিয়ে দেয়। এতে সাহাবীরা বিস্মিত হলে আল্লাহ তা'লা সূরা কদর নাযিল করে প্রিয় নবীর উম্মতকে সুসংবাদ দেন যে, যদি এই উম্মতের কোন ব্যক্তি কদরের রাতের উবাদত করে তবে সে বানী ইসরাঈলের ঐ ইবাদতকারীর চেয়েও বেশী নেকী লাভ করবে। (ইবনে কাসীর)

অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা এ রাতের অত্যধিক বরকতের কারণে বহুসংখ্যক ফিরিশতা অবতীর্ণ করেন। তিনি বলেন -

تَنَزَّلُ الْمَلٰئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ۝ سَلٰمٌ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

ঐ রাতে ফিরিশতাগণ ও রূহ (জিবরাঈল) তাদের রব এর অনুমতিক্রমে সকল হুকুম নিয়ে অবতীর্ণ হন। এতে শান্তি বর্ষিত হতে থাকে ফজরের উদয় পর্যন্ত।

رُوْحُ (রূহ) বলে হযরত জিবরাঈল (আঃ) কে বুঝানো হয়েছে। তাঁর মর্যাদা ও মাহাত্ম্য সাধারণ ফিরিশতাদের চেয়ে উর্দ্ধে হওয়ায় তাঁর উল্লেখ আলাদাভাবে করা হয়েছে। হাদীসে পাওয়া যায়, কদরের রাতে জিবরাঈল (আঃ) ফিরিশতাদের বিরাট একটি দল নিয়ে পৃথিবীতে নেমে আসেন এবং যতো নারী-পুরুষ নামায কিংবা যিকিরে মশগুল থাকে, তাদের জন্যে রহমত ও কল্যাণের দোয়া করেন। (মাযহারী)

فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ -"তারা তাদের রব এর অনুমতিক্রমে অবতীর্ণ হয়।" অর্থাৎ তারা নিজস্বভাবে ও নিজেদের ইচ্ছামত আসে না, বরং আসে তাদের রব এর অনুমতিক্রমে নির্দেশক্রমে।

مِنْ كُلِّ اَمْرٍ -আর সব হুকুম বা প্রত্যেক নির্দেশ বলে বুঝানো হয়েছে 'প্রত্যেক বিজ্ঞানসম্মত-যুক্তিসম্মত কাজ। যেমন সূরা দুখান এর ৫ম আয়াতে বলা হয়েছে اَمْرٍ حَكِيْمٍ বিজ্ঞানসম্মত কাজ। (তাফহীমুল কুরআন)

سَلٰمٌ অর্থ- 'শান্তি'। অর্থাৎ এ রাত 'শান্তিই শান্তি, মঙ্গলই মঙ্গল। এতে অনিষ্টের নামও নেই। (কুরতুবী) কেউ কেউ একে مِنْ كُلِّ اَمْرٍ এর বিশেষণ সাব্যস্ত করে অর্থ করেছেন- ফিরিশতারা প্রত্যেক শান্তি ও কল্যাণকর বিষয় নিয়ে আগমন করে। (মাযহারী)

هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ -"ফজরের উদয় পর্যন্ত"। অর্থাৎ, কদরের এই বরকত ও কল্যাণময় রাত কোন এক বিশেষ অংশে সীমাবদ্ধ নয়। বরং সন্ধ্যা হতে সকাল অর্থাৎ ফজরের উদয় হওয়া পর্যন্ত সমস্ত রাত

কেবল বরকত ও কল্যাণে পরিপূর্ণ। এটা সকল প্রকার অকল্যাণ, অন্যায় ও বিপর্যয় হতে সম্পূর্ণ মুক্ত।

ইমাম আবু মুহাম্মদ ইবনে আবী হাতিম (রহঃ) এই সূরার তাফসীর প্রসঙ্গে একটি বিস্ময়কর বর্ণনা এনেছেন। হযরত কা'ব (রাঃ) বলেন যে, ৭ম আকাশের শেষ সীমায় জান্নাতের সাথে সংযুক্ত রয়েছে 'সিদরাতুল মুনতাহা', যা দুনিয়া ও আখিরাতের দূরত্বের উপর অবস্থিত। এর উচ্চতা জান্নাতে এবং এর শিকড় ও শাখা প্রশাখাগুলো কুরসীর নিচে প্রসারিত। তাতে এতো বেশী ফিরিশতা অবস্থান করে যে, তাদের সংখ্যা নির্ণয় করা মহান আল্লাহ ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এমন কি কোন চুল পরিমাণও জায়গা নেই যেখানে ফিরিশতা নেই। ঐ গাছের মধ্যভাগে হযরত জিবরাঈল (আঃ) অবস্থান করেন।

আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে হযরত জিবরাঈল (আঃ) কে ডাক দিয়ে বলা হয়, হে জিবরাঈল (আঃ), কদরের রাতে সমস্ত ফিরিশতাকে নিয়ে পৃথিবীতে চলে যাও। এই ফিরিশতাদের সবারই অন্তর স্নেহ ও দয়া দ্বারা পরিপূর্ণ। প্রত্যেক মুমিনের জন্যে তাঁদের মনে অনুগ্রহের উদ্দিপনা রয়েছে। সূর্য ডোবার সাথে সাথেই এসব ফিরিশতা হযরত জিবরাঈল (আঃ) এর সাথে নেমে গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে এবং সব জায়গায় সাজদায় পড়ে যায়। তারা সকল মুমিন নারী-পুরুষের জন্যে দু'আ করে। কিন্তু তারা গীর্জায়, মদখোরের আড্ডায়, মাদক দ্রব্যের আস্তানায়, মূর্তি রাখার জায়গায়, গান বাজনার সাজসরঞ্জাম রাখার স্থানে এবং পেসাব-পায়খানার জায়গায় গমন করে না। বাকী সব স্থানে ঘুরে ঘুরে তারা মুমিন নারী-পুরুষদের জন্য দু'আ করে থাকে। হযরত জিবরাঈল (আঃ) সব মুমিনদের সাথে করমর্দন করেন। তার করমর্দনের সময় মুমিন ব্যক্তির শরীরের লোমকুপ খাড়া হয়ে যায়, মন নরম হয় এবং চোখে অশ্রুধারা নেমে আসে। এসব নিদর্শন দেখা দিলে বুঝতে হবে তার হাত জিবরাঈল (আঃ) এর হাতের মধ্যে রয়েছে। রাবী হযরত কা'ব (রাঃ) বলেন যে, ঐ রাতে যে ব্যক্তি তিনবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করে, তার প্রথমবার পাঠের সাথে সাথেই সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়। দ্বিতীয়বার পড়ার সাথে সাথেই আগুন থেকে সে মুক্তি পেয়ে যায় এবং তৃতীয়বার পাঠ করার সাথে সাথেই জান্নাতে প্রবেশ নিশ্চিত হয়ে যায়। রাবী বলেন, হে আবু ইসহাক (রহঃ)! যে ব্যক্তি সত্য বিশ্বাসের সাথে এ কালিমা উচ্চারণ করে

তার কি হয়? জবাবে তিনি বলেন, সত্য বিশ্বাসীর মুখ হতেই তো এ কালিমা উচ্চারিত হবে। যে আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ! কদরের রাত কাফির ও মুনাফিকদের উপর এতো ভারী মনে হবে যে, যেন তাদের পিঠের উপর পাহাড় ভেঙ্গে পড়ছে। ফজর পর্যন্ত ফিরিশতারা এভাবে রাত কাটিয়ে দেয়। তারপর হযরত জিবরাঈল (আঃ) উপরের দিকে উঠে যায় এবং অনেক উপরে উঠে তার নিজের পালক ছড়িয়ে দেয়। অতঃপর সে সেই বিশেষ দু'টি সবুজ রঙ্গের পালক ছড়িয়ে দেয় যা অন্য কোন সময় ছড়ায় না। এর ফলে সূর্যের আলো মলিন ও স্তিমিত হয়ে যায়। তারপর সে সমস্ত ফিরিশতাকে ডেকে নিয়ে যায়। সব ফিরিশতা উপরে উঠে গেলে তাদের নূর এবং জিবরাঈল (আঃ) এর পালকের নূর মিলে সূর্যের আলোকে ঢেকে দেয়। ঐ দিন সূর্য অবাক হয়ে যায়। সমস্ত ফিরিশতা সে দিন আকাশ ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থানের ঈমানদার নারী-পুরুষের জন্য রহমত কামনা করে তাদের জন্য ক্ষমা চাইতে থাকে। তারা ঐসব লোকের জন্যেও দু'আ করে যারা সৎ নিয়তে রোযা রাখে এবং সুযোগ পেলে পরবর্তী রমযান মাসেও আল্লাহর ইবাদত করার মনোভাব পোষণ করে।

সন্ধ্যার সময় সবাই প্রথম আসমানে পৌঁছে যায়। সেখানে অবস্থানকারী ফিরিশতারা এসে তখন পৃথিবীতে বসবাসকারী ঈমানদারকে অমুকের পুত্র অমুক, অমুকের কন্যা অমুক বলে বলে খবরাদি জিজ্ঞেস করেন। নির্দিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পর কোন কোন ব্যক্তি সম্পর্কে ফিরিশতারা বলেন, তাকে আমরা গত বছর ইবাদত করতে দেখেছিলাম, কিন্তু এবার সে বিদ'আতে জড়িয়ে পড়েছে। আবার অমুককে গত বছর বিদ'আতে জড়িত দেখেছিলাম, কিন্তু এবার তাকে ইবাদত করতে দেখে এসেছি। প্রশ্নকারী ফিরিশতারা তখন শেষের ব্যক্তির জন্যে আল্লাহর দরবারে মাগফিরাত ও রহমতের দু'আ করেন। ফিরিশতারা প্রশ্নকারী ফিরিশতাদের আরো জানাই যে, তারা অমুক অমুককে আল্লাহর যিকির করতে দেখেছে, অমুক অমুককে রুকুতে, অমুক অমুককে সাজদায় পেয়েছে এবং অমুক অমুককে কুরআন তিলাওয়াত করতে দেখেছে। একরাত একদিন প্রথম আসমানে কাটিয়ে তারা দ্বিতীয় আসমানে আরোহন করে। সেখানেও একই অবস্থার সৃষ্টি হয়। এমনি করে তারা নিজেদের স্থান 'সিদরাতুল মুনতাহায়' গিয়ে পৌঁছে। সিদরাতুল মুনতাহা তাদের বলে, আমাতে অবস্থানকারী হিসেবে তোমাদের প্রতি আমার দাবী রয়েছে। আল্লাহকে যারা ভালবাসে

আমিও তাদেরকে ভালবাসি। আমাকে তাদের অবস্থার কথা একটু শোনাও, তাদের নাম শোনাও। রাবী হযরত কা'ব বলেন, ফিরিশতারা আল্লাহ্র নেককার বান্দাদের নাম ও তাদের পিতার নাম শোনাতে শুরু করে। তারপর জান্নাত সিদরাতুল মুনতাহাকে সম্বোধন করে বলে, তোমাতে অবস্থানকারীরা তোমাকে যেসব খবর শুনিয়েছে সেসব তোমার খবর আমাকেও একটু শোনাও। তখন সিদরাতুল মুনতাহা জান্নাতকে সব কথা শুনিয়ে দেয়। শোনার পর জান্নাত বলে, অমুক পুরুষ ও নারীর উপর আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হোক। হে আল্লাহ্! অতি তাড়াতাড়ি তাদেরকে আমার সাথে মিলিত করো।

হযরত জিবরাঈল (আঃ) সর্বপ্রথম নিজের স্থানে পৌঁছে যায়। তার উপর তখন ইলহাম হয় এবং সে বলে, হে আল্লাহ! আমি তোমার অমুক অমুক বান্দাকে সাজদারত অবস্থায় দেখেছি, তুমি তাদেরকে ক্ষমা করে দাও। মহান আল্লাহ তখন বলেন, আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। হযরত জিবরাঈল (আঃ) তখন আরশ বহনকারী ফিরিশতাদেরকে এ কথা শুনিয়ে দেয়। তখন ফিরিশতারা একে অপরে বলাবলি করে যে, অমুক অমুক নারী-পুরুষের উপর আল্লাহ্র রহমত ও মাগফিরাত হয়েছে তারপর হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলেন, হে আল্লাহ গত বছর আমি অমুক অমুক লোককে জান্নাতের উপর আ'মলকারী এবং তোমার ইবাদতকারী হিসেবে দেখেছি, কিন্তু এবার সে বিদ'আতে জড়িয়ে পড়েছে এবং বিধিবিধানের অবাধ্যতা করছে। তখন আল্লাহ তাবারাক ওয়া তা'লা বলেন, হে জিবরাঈল! সে যদি মৃত্যুর তিন মিনিট পূর্বেও তাওবা করে নেয় তাহলে তাকে মাফ করে দিবো। হযরত জিবরাঈল (আঃ) তখন হঠাৎ করে বলে উঠেন, হে আল্লাহ তোমার জন্যেই সকল প্রশংসা। তুমিই সব প্রশংসা পাবার যোগ্য। হে আমার প্রতিপালক! তুমি তোমার সৃষ্টজীবের উপর সবচেয়ে বড় মেহেরবান। বান্দাহ তার নিজের উপর যেরূপ মেহেরবানী করে থাকে, তোমার মেহেরবানী তাদের প্রতি তার চেয়েও বেশী। ঐ সময় আরশ এবং ওর চারপাশের পর্দাসমূহ এবং আকাশ ও তার মাঝখানের সবকিছুই কেঁপে উঠে বলে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الرَّحِيْمِ - "করুণাময় আল্লাহর জন্যেই সমস্ত প্রশংসা"। রাবী হযরত কা'ব (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি রমযানের রোযা পূর্ণ করে এবং রমযানের পরে ও পাপমুক্ত

জীবন যাপনের মনোভাব রাখে সে বিনা প্রশ্নে ও বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (ইবনে কাসীর)

কদর রাতের বিশেষ দু'আ ঃ

হযরত আয়িশা (রাঃ) আল্লাহর নবী (সঃ) কে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি যদি কদরের রাত পেয়ে যাই তাহলে আমি কি দু'আ পাঠ করবো? উত্তরে তিনি (সঃ) বললেন, তুমি এই দু'আটি পাঠ করতে থাকবে - اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ -

"হে আল্লাহ্ নিশ্চয় তুমি ক্ষমাকারী। তুমি ক্ষমাকে পছন্দ করো। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করো।"

(আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাযাহ, মুসতাদরাক)

শিক্ষা ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা কদরের যে বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেশ করা হলো, তা থেকে আমাদের জন্য যেসব শিক্ষণীয় রয়েছে তা হলো ঃ

■ এটা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে যে, মহাগ্রন্থ আল কুরআন পরিপূর্ণ ও সর্বশেষ আসমানী কিতাব। এরপর আর কোন আসমানী কিতাব নাযিল হবে না এবং নাযিলের প্রয়োজনও নেই। সুতরাং আল কুরআনের বিধিবিধান অনুযায়ী আমাদের জীবনকে পরিচালনা করতে হবে।

■ রমযান মাসের শেষ দশকের যে কোন একটি রাতে মহাগ্রন্থ আল কুরআন নাযিল হয়েছে। সেই রাতকে 'লাইলাতুল কদর' বলা হয়। অতএব আমাদেরকে কদর রাতের বিশেষ মর্যাদা দিতে হবে।

■ 'লাইলাতুল কদর' যাকে আমরা 'শবে কদর' বলে থাকি। যার অর্থ ভাগ্য রজনী বা মহিমান্বিত রাত। এ রাতের মর্যাদা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। সুতরাং কুরআন নাযিলের রাত হিসেবে আমাদেরকে এ রাত ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে অতিবাহিত করতে হবে।

■ কদরের রাত যেহেতু নির্দিষ্ট নয়, সেহেতু সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রমযান মাসের শেষ দশকের বেজোড় অর্থাৎ- ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ তারিখের রাতগুলো সমান গুরুত্ব দিয়ে সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত নামায, যিকির, তিলাওয়াত ও দু'আর মাধ্যমে অতিবাহিত করতে হবে।

■ কদর রাতের মর্যাদা পেতে হলে অশ্লীল নাচ-গান, মদপান, হারাম খাদ্য খাবার, সকল প্রকারের পূজা ও শিরক এবং বিদ'আতকে পরিহার করতে হবে।

■ এ রাতে অন্যান্য ফিরিশতাসহ জিবরাঈল (আঃ) প্রতিবছর দুনিয়াতে শান্তি ও নিরাপত্তা নিয়ে আগমন করেন এবং ইবাদতকারী বান্দাহ বান্দীদের মঙ্গল এবং কল্যাণের জন্য দু'আ করেন। সুতরাং তাদের নিরাপত্তা এবং কল্যাণের দু'আ পাবার আশায় এ রাতের যথাযথ মর্যাদা দিতে হবে এবং ফজর পর্যন্ত কল্যাণ আহরণ করতে হবে।

■ রমযান মাস হলো আল কুরআনসহ সকল আসমানী কিতাব ও সহীফা নাযিলের মাস। সুতরাং অন্যান্য মাসের তুলনায় এ মাসের মর্যাদা ৭০ গুণ বেশীর কথা হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। অতএব গোটা রমযান মাসকেই ইবাদতের মাস হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

■ কদর রাতে আল্লাহ তা'লা কেবলমাত্র মু'মিন বান্দা-বান্দীর জন্য মঙ্গল ও কল্যাণ দান করেন না। বরং তিনি বান্দাহ-বান্দীহর গুনাও মাফ করে থাকেন এই জন্য নীচের এই দু'আটি বেশী বেশী পাঠ করতে হবে-

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى

■ যেহেতু মহাগ্রন্থ আল কুরআন নাযিলের কারণেই কদর রাতের এবং রমযান মাসের এতো মর্যাদা। সুতরাং আমাদেরকে মাস এবং রাতের মর্যাদা দিতে হলে আল কুরআনের মর্যাদা দিতে হবে। কুরআনের মর্যাদা দিতে হলে যা করতে হবে, তা হলো -

(i) বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে।

(ii) তার অর্থ নিজের ভাষায় জানতে হবে।

(iii)তার বিধান অনুযায়ী নিজের জীবন ও পরিবার পরিচালন করতে হবে।

(iv) তার বিধি বিধান সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

আহবান ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ভাইয়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা কদর এর যে দারস পেশ করা হলো, এতে যদি আমার অজান্তে ও অজ্ঞাতে কোন ভুল-ক্রটি কিংবা বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, তার জন্য মহান আল্লাহর কাছে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর এই সূরা থেকে যেসব শিক্ষা আমরা লাভ করলাম তা যেন বাস্তব জীবনে আ'মল করতে পারি সেই তাওফীক কামনা করে আমি দারস শেষ করছি। 'অয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন'।

দুই

নারী-পুরুষের পর্দার বিধিবিধান

সূরা আন-নূর-২৪
আয়াত- ৩০-৩১

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ كَفٰى وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى
اَمَّابَعْدُ فَاَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ط ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ م بِمَا يَصْنَعُوْنَ ○ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ص وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَائِهِنَّ اَوْ اٰبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِهِنَّ اَوْ اَبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ص وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ

مَايُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ط وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ٥

সরল অনুবাদ ঃ ইরশাদ হচ্ছে- (৩০) হে নবী! আপনি মু'মিন পুরুষদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং নিজেদের যৌনাঙ্গের হিফাযত করে। এটাই তাদের জন্যে পবিত্রতম নীতি। যা তারা করে, আল্লাহ্ সে বিষয়ে পুরোপুরি অবহিত। (৩১) আর হে নবী! মু'মিন স্ত্রীলোকদেরকেও বলুন, তারাও যেন তাদের দৃষ্টিকে নতো রাখে এবং নিজেদের যৌনাঙ্গের হিফাযত করে। আর তারা যা সাধারণতঃ আপনা হতেই প্রকাশিত হয়ে পড়ে, তা ছাড়া যেন তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার উড়নার আঁচল নিজেদের বুকের উপর ফেলে রাখে। আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, স্বামীদের পিতা (শ্বশুর), নিজেদের পুত্র, স্বামীদের পুত্র, নিজেদের ভাই, ভাইদের পুত্র (ভাস্তে), বোনদের পুত্র (ভাগ্নে), স্ত্রীলোক, নিজেদের দাস, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ ও বালক-যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ছাড়া কারো সামনে তাদের সৌন্দর্য বা সাজসজ্জা প্রকাশ না করে। তারা যেন নিজেদের পা যমীনের উপর জোরে জোরে মেরে চলাফেরা না করে। কেননা, নিজেদের যে সৌন্দর্য তারা গোপন করে রেখেছে তা লোকেরা জানতে পারে। হে মু'মিন লোকেরা, তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর কাছে তওবা করো, আশা করা যায় তোমরা কল্যাণ লাভ করবে।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ قُلْ -বলো/বলুন। لِّلْمُؤْمِنِيْنَ -মু'মিনদেরকে। يَغُضُّوْا -(তারা যেন) সংযত রাখে। مِنْ -থেকে/কে। اَبْصَارِهِمْ - তাদের দৃষ্টিসমূহ। وَ -এবং। يَحْفَظُوْا -(তারা যেন) সংরক্ষণ করে فُرُوْجَهُمْ -তাদের লজ্জাস্থানসমূহকে। ذٰلِكَ -এটা/ওটা। اَزْكٰى - পবিত্রতম। لَهُمْ -তাদের জন্যে। اِنَّ اللهَ -নিশ্চয়ই আল্লাহ। خَبِيْرٌ - খুব অবগত। بِمَا -যা কিছু। يَصْنَعُوْنَ - তারা করে। لِّلْمُؤْمِنٰتِ - মু'মিন স্ত্রীলোকদেরকে। يَغْضُضْنَ -তারা সংযত রাখে। اَبْصَارِهِنَّ -

তাদের দৃষ্টিসমূহকে। يَحْفَظْنَ -সংরক্ষণ করে। فُرُوْجَهُنَّ -তাদের লজ্জাস্থানসমূহকে। لاَ -না। يُبْدِيْنَ -প্রদর্শন করে। زِيْنَتَهُنَّ -তাদের সৌন্দর্য/ সাজসজ্জা। الاَّ -ব্যতীত/ছাড়া। مَا -যা। ظَهَرَ -(সাধারণভাবে) প্রকাশ পায়। مِنْهَا -তাতে/ ওতে। وَلْيَضْرِبْنَ -এবং যেন ফেলে রাখে بِخُمُرِهِنَّ -তাদের ওড়না। عَلٰى -উপর। جُيُوْبِهِنَّ -তাদের বক্ষদেশ। لِبُعُوْلَتِهِنَّ -তাদের স্বামীদের নিকট। اَوْ -অথবা। اٰبَاۤءِهِنَّ -তাদের পিতা। اٰبَاۤءِ بُعُوْلَتِهِنَّ -তাদের স্বামীদের পিতা(শ্বশুর)। اَبْنَاۤءِهِنَّ-তাদের পুত্রদের اَبْنَاۤءِ بُعُوْلَتِهِنَّ -তাদের স্বামীদের পুত্রদের। اِخْوَانِهِنَّ -তাদের ভাইদের। بَنِىْ اِخْوَانِهِنَّ -তাদের ভাইয়ের পুত্রদের (ভাস্তে)। بَنِىْ اَخَوٰتِهِنَّ -তাদের বোনের পুত্রদের (ভাগ্নে)। نِسَاۤءِهِنَّ -তাদের স্ত্রীলোকদের। مَا -যা। مَلَكَتْ -মালিক/ অধিকারী হয়েছে। اَيْمَانُهُن - তাদের ডান হাতের (অর্থাৎ দাসী)। التّٰبِعِيْنَ অধিনস্ত পুরুষরা। غَيْرِ -যারা নয়। اُولِى -সম্পূর্ণ। الْاِرْبَةِ -যৌন কামনা। مِنْ -মধ্য হতে। الرِّجَالِ - পুরুষদের। الطِّفْلِ -বালক। اَلَّذِيْنَ -যারা। لَمْ يَظْهَرُوْا -অবহিত হয়নি। عَلٰى-সম্পর্কে। عَوْرٰتِ -গোপন অঙ্গ। النِّسَاۤءِ -স্ত্রী লোকদের। يَضْرِبْنَ -তারা মারবে। بِاَرْجُلِهِنَّ -তাদের পাগুলোকে। لِيُعْلَمَ -যেন কেউ যানতে পারে। مَايُخْفِيْنَ -তারা যা গোপন রেখেছে। زِيْنَتِهِنَّ -তাদের সৌন্দর্য। وَتُوْبُوْا -আর তোমরা তওবা করো। اِلَى اللهِ -আল্লাহর নিকট। جَمِيْعًا - সকলেই। اَيُّهَ -ওহে। الْمُؤْمِنُوْنَ -মু'মিনরা। لَعَلَّكُمْ -আশা করা যায়। تُفْلِحُوْنَ -তোমরা কল্যাণ পাবে।

সম্বোধন ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সম্মানিত ইসলাম প্রিয় দ্বীনদার/ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ভাইয়েরা/বোনেরা! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আমি আপনাদের সামনে দারস পেশ করার জন্য পবিত্র কালামে হাকীম আল কুরআনের সূরা নূর এর ৩০ ও ৩১ নম্বর ২ টি আয়াত তিলাওয়াত ও সরল অনুবাদ পেশ করেছি। আল্লাহ পাক যেন আমাকে আপনাদের সামনে সঠিকভাবে দারস পেশ করার তাওফীক দান করেন।

সূরাটির নামকরণ ঃ সূরা আন নূরের নামকরণ সম্পর্কে তাফসীরকারগণ বলেন,এই সূরার৫ম রূকুর ৩৫ নং আয়াতে اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (আল্লাহ মহাকাশ ও পৃথিবীর নূর) এ উল্লেখিত نور শব্দটিকেই এই সূরার নাম হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে। نُوْرٌ মানে জ্যোতি বা আলো। نُوْرٌ এমন জিনিসকে বুঝায় যার সাহয্যে জিনিসগুলো প্রকাশিত ও উদ্ভাসিত হয়। অর্থাৎ যা নিজেই প্রকাশ হয় এবং অন্যান্য জিনিসকেও আলোকিত করে। অপর দিকে কোন কিছু বুঝতে না পারার অবস্থাকে বলা হয় অন্ধকার, মেঘাচ্ছন্ন, আলোবিহীন। ইসলাম আগমনের পূর্বে আইয়্যামে জাহেলিয়াত বা অন্ধকার যুগে সমাজে যেসব কাজকর্ম হতো তা সমাজকে অন্ধকার ও কুসংস্কারে ঘিরে রেখেছিলো। সূরা নূর-এ সেসব অসামাজিক কাজকর্মকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে অন্ধকারকে আলোতে পরিণত করেছে। জাহেলী যুগের অন্ধকার সমাজকে সভ্যতা ও আলোর মুখ দেখিয়েছে সূরা নূর এর কঠোর বিধি বিধান ও নিয়ম-কানুন। সুতরাং বলা যায় যে, এই সূরার বিষয়ের সাথে نُوْرٌ নামের বেশ মিল রয়েছে। অতএব এই সূরার নামকরণ শিরোনাম হিসেবেই করা হয়েছে। কেননা, আল কুরআনের অধিকাংশ সূরার নামকরণ প্রতীকী বা চিহ্ন হিসেবেই করা হয়েছে। তবে যা কিছু করা হয়েছে তা ওহীর নির্দেশনার মাধ্যমেই করা হয়েছে।

সূরাটি নাযিলের সময়কাল ঃ সর্বসম্মত মতে সূরাটি মাদানী। এটি বনীল মুস্তালিক যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর নাযিল হয়েছে এ ব্যাপারে সবাই একমত। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, পঞ্চম হিজরীর শা'বান মাসে মহানবী (সঃ)

কাফির বনীল মুস্তালিক গোত্রের বিরুদ্ধে এক অভিযান চালিয়েছিলেন। উক্ত অভিযান হতে ফিরে আসার একমাস পরই এ সূরার কিছু অংশ নাযিল হয়। তবে প্রসিদ্ধ তাফসীরকারকদের সকলেই সূরা নূর এর সমস্ত অংশই পঞ্চম হিজরীতে অবতীর্ণ হয়েছে বলে একমত পোষণ করেন।

(তাফসীরে বাহরুল মুহীত ও তাফহীমূল কুরআন)

তবে পঞ্চম হিজরী হোক কিংবা ষষ্ঠ হিজরীই হোক না কেন রাসূলুল্লাহর (সঃ) মাদানী জীবনের মাঝামাঝি সময় সূরাটি নাযিল হয়েছে।

সূরাটির বিষয়বস্তু ঃ সূরা নূর-এ পর্দার চূড়ান্ত বিধানসহ সমাজ সংস্কার ও সংশোধনের জন্য অনেকগুলো হিদায়েত এবং সামাজিক বিধি-বিধান ও নিয়ম-কানুন নাযিল করা হয়েছে। কেননা, স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, বাপ-মা, ভাই-বোন ও চাকর-চাকরানী ইত্যাদি এক অন্নভুক্ত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গড়ে উঠে পরিবার। আর পরিবার হচ্ছে সমাজেরই ভিত্তি। পরিবার থেকেই শুরু হয় মানুষের সামাজিক জীবন। আর সমাজ জীবনের সুষ্ঠতা ও সুস্থতা নির্ভর করে সুন্দর এবং সুষ্ঠ সামাজিক নিয়ম-নীতি ও বিধি-বিধানের উপর। মহান আল্লাহ সূরা নূর এর প্রথম দিকে এমন সব বিধি-বিধান লিখে দিয়েছেন যাতে করে সমাজে কোন প্রকার খারাবি সৃষ্টি হলে এর প্রতিরোধ করা যায় এবং দূর করা যায়। আর সূরার শেষের দিকে এমন সব নিয়ম-কানুন ও উপদেশ দিয়েছেন যার মাধ্যমে সমাজ জীবন থেকে দোষ-ত্রুটি ও পাপের সব পথ বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

সূরা নূর এ যেসব সামাজিক বিধি-বিধান ও নিয়ম-নীতিসমূহ বর্ণিত হয়েছে, তা হলো- (১) যিনার শাস্তির বিধান। (২) যিনার মিথ্যা অপবাদের শাস্তির বিধান। (৩) ব্যভিচারী নারী-পুরুষের বিবাহ সংক্রান্ত বিধান। (৪) স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের প্রতি যিনার অপবাদ সংক্রান্ত 'লিআনের' বিধান। (৫) ভিত্তিহীন এবং ওড়ো খবর প্রচারকারীর শাস্তির বিধান। (৬) পরের বাড়ীতে প্রবেশের নিয়ম-নীতি। (৭) পুরুষ-নারী উভয়ের দৃষ্টির সংযম এবং লজ্জাস্থান হিফাজতের বিধি-বিধান। (৮) নারীর সৌন্দর্য প্রকাশের ক্ষেত্রে পর্দা সম্পর্কে বিধান। (৯) অবিবাহীত নারী-পুরুষের বিবাহের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিধান। (১০) দাস-দাসীর অধিকার প্রতিষ্ঠার বিধান। (১১) বেশ্যাবৃত্তি সংক্রান্ত বিধি-বিধান। (১২) পারিবারিক শিষ্টাচার সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন। (১৩) বৃদ্ধা নারীদের

পর্দার বিধান। (১৪) মেহমানদারী ও ইসলামের উদারতা সংক্রান্ত নিয়ম-নীতি। (১৫) সামাজিক কাজে অংশ নেয়া এবং বিনা অনুমতিতে বিরত না থাকার নিয়ম-নীতি এবং (১৬) ভদ্রভাবে একে অপরকে ডাকা সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন।

পরিশেষে বলা যায় যে, সূরা নূর এ বর্ণিত সামাজিক বিধি-বিধান এবং নিয়ম-নীতিসমূহ নাযিল করার মূল উদ্দেশ্যই হলো, মুসলিম সমাজকে সকল প্রকারের খারাবী সৃষ্টির বিস্তার লাভ হতে রক্ষা করা। আর যদি কোন ঘটনা ঘটেই যায়, তাহলে তা তাড়াতাড়ি রোধ করা।

আলোচ্য আয়াত দু'টির বিষয়বস্তু ঃ দারসের জন্য তিলাওয়াতকৃত আয়াত দু'টির মূল বিষয়বস্তুই হলো পুরুষ-নারীর উভয়ের চোখের দৃষ্টিকে সংযত রাখা এবং নিজেদের লজ্জাস্থানকে যিনা থেকে হিফাজত করা। তাছাড়া মেয়েরা যেন নির্দিষ্ট কতিপয় পুরুষ ছাড়া তাদের সাজসজ্জা ও সৌন্দর্যকে পরপুরুষ হতে ঢেকে রাখে এবং তারা যেন চলাফেরার সময় পরপুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তাদের পা যমীনের উপর জোরে না মারে। এক কথাই বলা যা যে, এ আয়াত দু'টির মূল বিষয়বস্তুই হলো পুরুষ-নারী উভয়েরই পর্দা সংক্রান্ত বিধি-বিধান।

ব্যাখ্যাঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিতি প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা নূর এর প্রাথমিক ধারণা পেশ করা হলো। এখন তিলাওয়াতকৃত আয়াত দু'টির ব্যাখ্যা পেশ করছি। প্রথম আয়াতে মহান আল্লাহ মু'মিন পুরুষ লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন-

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ۔ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ۔ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ ۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ○

হে নবী! মু'মিন পুরুষ লোকদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং নিজেদের যৌনাঙ্গের হিফাজত করে।এটাই তাদের জন্যে পবিত্রতম নীতি। যা তারা করে, আল্লাহ সে বিষয়ে পুরোপুরি অবহিত।

এই আয়াতে মহান আল্লাহ তা'লা মু'মিন পুরুষ লোকদের পর্দা সংক্রান্ত দু'টি বিধান উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে একটি হলো বেগানা নারী থেকে নিজের চোখকে সংবরণ করা। আর দ্বিতীয়টি হলো, নিজের লজ্জাস্থান বা

যৌনাঙ্গকে নিজের স্ত্রী ছাড়া অন্যদের ক্ষেত্রে যৌনাচার থেকে হিফাজত বা সংরক্ষণ করা।

মূলে يَغُضُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ -বলা হয়েছে। غَضُّوْا শব্দটি غَضٌّ শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে। যার অর্থ কম করা, নতো করা। (রাগিব) অর্থাৎ কোন জিনিসকে মাত্রার কম করে দেয়া, হ্রাস করা ও নীচু করা। غَضٌّ بَصَرَ শব্দের অর্থ সাধারণত করা হয়-চোখ নিচু করা বা নিচু করে রাখা। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, সব সময় নিচের দিকে দেখা; বরং আসল অর্থ হলো পূর্ণ মাত্রায় ও পূর্ণ দৃষ্টিতে বা চোখ ভরে না দেখা এবং দেখার কাজটি সমাধা করার জন্য চোখকে অবাধ ও লাগামহীন করে ছেড়ে না দেয়া। আরো একটু পরিস্কার অর্থ করার জন্য বলা চলে চোখকে বেঁচে চলা। অর্থাৎ আল্লাহ পাক যে জিনিসকে হারাম করেছেন সেগুলোর প্রতি দৃষ্টি না দেয়া। যদি আকস্মিকভাবে চোখের সামনে পড়েই যায়, তবে দ্বিতীয়বার আর দৃষ্টিপাত না করা।

হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ বাজালী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ(সাঃ) কে হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে যাবার বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, সাথে সাথেই দৃষ্টি সরিয়ে নিবে। (সহীহ মুসলিম)

সূরা নূর এর এই আয়াতের ব্যাখ্যায় যে কয়েকটি বিধান পুরুষদের জন্য পাওয়া যায় তা আল্লাহর নবী (সঃ) এর সুন্নত থেকেই জানা যায়। আর তা হলো ঃ

এক. নিজের স্ত্রী এবং মুহরীম (যাদের সঙ্গে বিবাহ করা হারাম) স্ত্রীলোক ছাড়া অন্য কোন স্ত্রীলোককে চোখ ভরে দেখা বৈধ নয়। একবার হঠাৎ চোখ পড়ে গেলে তা মাফ করা হবে। কিন্তু আকর্ষিত হয়ে দ্বিতীয়বার দৃষ্টিপাত করলে তা মাফ করা হবে না। এরূপ দৃষ্টিপাতকে নবী করীম (সঃ) চোখের যিনা বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, মানুষ নিজের পূর্ণ অনুভূতি শক্তি এবং ইন্দ্রীয় শক্তি দ্বারা যিনা করে থাকে। যেমন, চোখের যিনা করা হচ্ছে দেখা, রসালো ও মন ভুলানো কথাবার্তা হলো কথার যিনা, কণ্ঠস্বর শুনে মজা লাভ করা হলো শুনার যিনা, স্পর্শ করা হলো হাতের যিনা এবং অবৈধ উদ্দেশ্যে চলা হলো পায়ের যিনা। যিনার এসব প্রাথমিক কাজ যখন সম্পন্ন হয়ে যায়, তখনই

লজ্জাস্থান বা যৌনাঙ্গসমূহ হয় তার পূর্ণাঙ্গতা দান করে (অর্থাৎ যিনা করে বসে) নতুবা তা অপূর্ণ থেকে যায়। (সহীহ্ বুখারী-মুসলিম, আবু দাউদ)

হযরত বুরাইদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। নবী করীম (সঃ) হযরত আলী (রাঃ) কে লক্ষ্য করে বলেন-

ياعلى لاتتبع النظرة النظرة فان لك الاولى وليست لك الاخرة

"হে আলী, (বেগানা নারীর) দৃষ্টির উপর দৃষ্টি ফেলো না। হঠাৎ যে দৃষ্টি পড়ে ওটা তোমার জন্য ক্ষমার যোগ্য, কিন্তু দ্বিতীয়বার দৃষ্টি তোমার জন্যে ক্ষমার যোগ্য নয়।" (আবু দাউদ)

শয়তানি দৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকার প্রতিদান সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। নবী করীম (সঃ) বলেছেন, মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-

ان النظرسهم من سهم ابليس مسموم من تركها مخافتى

ابد لته ايمانا يجد هلاوته-فى قلبه

"দৃষ্টি তো হলো ইবলীস (শয়তানের) বিষাক্ত তীরগুলির মধ্যে একটি তীর। যে ব্যক্তি আমাকে ভয় করে এই দৃষ্টি ত্যাগ করবে, তার বিনিময়ে আমি তাকে এমন ঈমান দিব, যার মজা সে অন্তরে অনুভব করতে পারবে।"(তিবরাণী)

কুদৃষ্টি থেকে মুক্ত থাকার প্রতিদান সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে। হযরত আবু উমামা (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেন -

ما من مسلم ينظر الى محاسن امراة ثم ينض بصره الا اخلف

الله له عبادة يجد حلاوتها

"যে কোন মুসলমানের দৃষ্টি কোন স্ত্রীলোকের সৌন্দর্যের উপর পড়ে, অতঃপর তা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়, আল্লাহ তা'লা এর বিনিময়ে তাকে এমন ইবাদত দান করেন, যার স্বাদ বা মজা সে অন্তরেই উপভোগ করে।" (মুসনাদে আহমাদ)

নবী করীম (সঃ) অন্যের দৃষ্টিকে বেগানা নারীর দিক হতে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য নিজেই হস্তক্ষেপ করেছেন। এ সম্পর্কে দু'টি ঘটনা উল্লেখ করা হলো–

ইমাম জাফর সাদেক তাঁর পিতা ইমাম মুহাম্মদ বাকের হতে এবং তিনি হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন। বিদায় হজ্জের সময় নবী করীম (সঃ) এর চাচাত ভাই ফযল ইবনে আব্বাস (রাঃ)-যিনি তখন এক যুবক। মাশয়ারে হারাম হতে ফিরে আসার সময় নবী করীম (সঃ) এর সাথে একই উটের পিঠে সওয়ার ছিলেন। পথ ধরে যখন স্ত্রীলোকেরা যাচ্ছিলো তখন ফযল (রাঃ) তাদের দিকে তাকাচ্ছিলেন। নবী করীম (সঃ) তাঁর মুখের উপর হাত রাখলেন এবং অন্যদিকে তাঁর (মুখকে) ফিরিয়ে দিলেন। (আবু দাউদ)

এই বিদায় হজ্জের সময়ের আরও একটি ঘটনা এই যে, খাসয়াম গোত্রের এক মহিলা পথিমধ্যে নবী করীম (সঃ) কে থামিয়ে হজ্জ সম্পর্কে একটি মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করতে লাগল, আর ফযল ইবনে আব্বাস (রাঃ) তার দিকে চোখ জুড়ে দেখতে লাগলো। নবী করীম (সঃ) তাঁর মুখ ধরে অন্যদিকে ফিরিয়ে দিলেন। (সহীহ বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী)

পথেঘাটে বসে থাকতে নবী করীম (সঃ) নিষেধ করেছেন। এ বিষয়ে সহীহ হাদীসে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ পথের উপর (ধারে) বসা হতে তোমরা বেঁচে থাকো। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ), কাজকর্মের জন্য এটা অনেক সময় জরুরী হয়ে পড়ে ? প্রতিউত্তরে তিনি বললেন, আচ্ছা তাহলে পথের হক আদায় করো। সাহাবীগণ আবার জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! পথের হক কি? তিনি বললেন ঃ চোখের দৃষ্টি নিচু রাখা, কাউকেও কষ্ট না দেয়া, সালামের জবাব দেয়া, ভাল কাজের আদেশ করা এবং মন্দ কাজ হতে বিরত রাখা। (ইবনে কাসীর)

জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়ে আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেন, হাদীসটি হযরত আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে বলতে শুনেছেন, তোমরা ছ'টি জিনিসের দায়িত্ব নিয়ে নাও, তাহলে আমিও তোমাদের জন্যে জান্নাতের দায়িত্ব নিয়ে নিচ্ছি। আর ছ'টি জিনিস হলো, (১) কথা বলার সময় মিথ্যা বলো না। (২) আমানতের খিয়ানত করো না। (৩)ওয়াদা ভঙ্গ করো না। (৪) চোখের দৃষ্টি নতো রাখবে। (৫) হাতকে যুলুম থেকে বাঁচিয়ে রাখবে এবং (৬) নিজেদের যৌনাঙ্গের হিফাজত করবে। (আবুল কাসিম আল বাগাভী)

দুই. উপরে বর্ণিত এসব কথা হতে কেউ যেন ভুল না বুঝেন যে, তখন বোধ হয় নারীদের মুখ খুলে চলাফেরার সাধারণ অনুমতি ছিলো, আর এজন্যই মনে হয় তাদের থেকে চোখ ফিরাতে ও নিচু করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নতুবা চেহারা ঢাকার পর্দা যদি প্রচলিতই থাকতো, তাহলে চোখ বাঁচানো আর না বাঁচানোর কি কোন প্রশ্ন থাকতে পারে? এরূপ কথা বলা সাধারণ বুদ্ধির দৃষ্টিতে যেমন ভুল, তেমন বাস্তব যটনার দৃষ্টিতেও ভুল।

সাধারণ বুদ্ধির দৃষ্টিতে ভুল এই জন্য যে, চেহারার পর্দা সাধারণ ভাবে প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও এমন অবস্থা দেখা দিতে পারে, যখন কোন নারী-পুরুষ একে অপরে একেবারে মুখোমুখী হয়ে পড়েছে। আর একজন পর্দানশীলা মাহিলাও অনেক সময় মুখমন্ডল খুলে রাখতে বাধ্য হতে পারে। আর মুসলিম নারীরা পর্দা করলেও এবং মুখ ঢেকে চললেও অমুসলিম মহিলাদের বেপর্দা হওয়ার সমস্যা তো থেকেই যায়। কাজেই চোখ নিচু করার এই নির্দেশটি প্রমাণ করে না যে, মুসলিম নারীরা অবশ্যই মুখ খোলা রেখে চলছিলো, আর বাস্তব ঘটনাও এই ধারণাকে অসার প্রমাণ করে। কেননা, সূরা আহযাবে এ পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পর মুসলিম সমাজে যে পর্দা প্রথা চালু করা হয়, তাতে মুখমন্ডলের পর্দাও শামিল রয়েছে। আর স্বয়ং নবী করীম (সঃ) এর জীবনেই তা কার্যকর হয়েছিলো, যা অনেকগুলো হাদীসের বর্ণনা থেকেই তা প্রমাণিত হয়। যেমন–

ইফ্ক এর ঘটনা অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সূত্রে হযরত আয়িশা (রাঃ) নিজেই বর্ণনা করেন। তাতে তিনি বলেন, প্রাকৃতিক কাজ সেরে যখন আমি মাঠ থেকে ফিরে আসলাম, আমি তখন দেখলাম কাফেলা চলে গেছে, তখন আমি বসে পড়লাম। আর ঘুমের চাপ এতোবেশী আসলো যে, আমি সেখানেই শুয়ে ঘুমাতে লাগলাম। সকালবেলা হযরত সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল সেই স্থান দিয়ে যাবার সময় দূর থেকে কাউকে পড়ে থাকতে দেখে তিনি কাছে আসলেন এবং আমাকে দেখেই চিনতে পারলেন। কেননা, পর্দা প্রথা চালু হওয়ার পূর্বে তিনি আমাকে দেখেছিলেন। আমাকে চিনতে পেরে যখন তিনি ইন্নালিল্লাহ বলে উঠলেন, তখন তার আওয়াজ শুনে আমি জেগে উঠলাম এবং চাদর দিয়ে আমি আমার মুখ ঢেকে ফেললাম।

(সহীহ বুখারী-মুসলিম, আহমাদ, ইবনে জরীর, সীরাতে ইবনে হিশাম)

আবু দাউদ শরীফের 'কিতাবুল জিহাদ'-এ উল্লেখিত একটি ঘটনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, উম্মে খালাদ নাম্মী এক মহিলার ছেলে এক যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলো। স্ত্রীলোকটি তার ছেলে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্যে নবী করীম (সঃ) এর নিকট আসলো। কিন্তু এ সময়েও সে তার মুখের উপর চাদর দিয়ে ঢেকে রেখেছিলো। কোন কোন সাহাবী বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন,"এই মূহুর্তেও তোমার মুখের উপর নিকাব রয়েছে।" অর্থাৎ ছেলের শহীদ হওয়ার খবর শুনে একজন মা তো এতদূর উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে যায় যে, তখন তার কাপড়-চোপড় ও দেহের ব্যাপারে কোন হুঁশ থাকার কথা নয়, অথচ তুমি তো বেশ নিশ্চিন্তে পর্দার সাথেই এখানে এসেছো।

জবাবে মহিলাটি বললেন- ان ارزا ابنى فلن ارزا حيائ

"আমি আমার সন্তানকে তো হারিয়েছি,কিন্ত নিজের লজ্জাশীলতাকে তো হারাইনি।"(আবু দাউদ)

হযরত আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন,এক মহিলা পর্দার ভিতর থেকে হাত বাড়িয়ে নবী করীম (সঃ) এর নিকট কোন এক বিষয়ে আবেদন করলে নবী করীম (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন,এটা কি স্ত্রীলোকের হাত না পুরুষ লোকের হাত ? সে ভিতর থেকে উত্তর দিলো,'স্ত্রীলোকেরই হাত'। তখন নবী করীম (সঃ) বললেন,স্ত্রীলোকের হাত হলে তো অন্তত নখকে মেহেদী রঙে রঙীন করা উচিত ছিলো। (আবু দাউদ)

হজ্জ কালীন যে দু'টি ঘটনার কথা ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি, তাও নবী করীম (সঃ) এর সময়ে চেহারার পর্দা চালু না হওয়ার কোন দলীল হতে পারে না। কেননা, ইহরামের পোষাকে 'মুখাবরণ' ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। তা সত্ত্বেও এই ক্ষেত্রেও সতর্ক নারীরা পরপুরুষের সামনে মুখ খোলা রাখা পছন্দ করতে পারে না। হযরত আয়িশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। বিদায় হজ্জের সফরে আমরা ইহরাম অবস্থায় মক্কার দিকে যাচ্ছিলাম। পথিকরা যখন আমাদের কাছাকাছি এসে পড়তো, তখন আমরা নারীরা মাথার উপর হতে চাদর টেনে দিয়ে মুখের উপর রাখতাম এবং মুখ ঢেকে ফেলতাম। আবার তারা যখন চলে যেতো, তখন আবার মুখ খুলে ফেলতাম। (আবু দাউদ)

তিন. চোখ নতো করা বা ফিরিয়ে নেয়ার এই নির্দেশ হতে এমন দু'টি বিশেষ অবস্থাকে মুক্ত রাখা হয়েছে, যখন স্ত্রীলোককে দেখার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যেমন- (ক) বিবাহের ক্ষেত্রে, (খ) বিচার এবং চিকিৎসার প্রয়োজনে।

(ক) বিবাহের জন্য মেয়ে দেখা ঃ যদি কোন পুরুষ কোন নারীকে বিয়ে করতে চায়, এ ক্ষেত্রে নারীকে দেখার শরীয়তে কেবল অনুমতিই দেয়নি, বরং এরূপ করা অন্ততপক্ষে মুস্তাহাব। এ বিষয়ে মুগীরা ইবনে শু'বা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি এক মেয়েকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তাব পাঠালাম। নবী করীম (সঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি মেয়েটিকে দেখেছো? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তুমি তাকে দেখে নাও। কেননা, এর ফলে তোমাদের মধ্যে বনিবনা হবে বলে আশা করা যায়।

(আহমাদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, দারেমী)

অন্য আর এক হাদীসে পাওয়া যায়। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, জনৈক এক ব্যক্তি কোন এক স্থানে বিয়ের পয়গাম পাঠিয়েছে। নবী করীম (সঃ) তাকে বললেন, তুমি তাকে দেখে নাও। কেননা, আনসার বংশের মেয়ে লোকদের চোখে দোষ হয়ে থাকে।

(সহীহ মুসলিম, নাসায়ী, আহমাদ)

আরও এক হাদীস জাবির ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন। নবী করীম (সঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন কোন মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়, তখন যতদূর সম্ভব তাকে দেখে নিয়ে এই নিশচিন্ততা অর্জন করা উচিত যে, ওই মেয়ের মধ্যে এমন কোন গুণ-বৈশিষ্ট্য আছে কিনা যা তাকে বিয়ে করার জন্যে আগ্রহ সৃষ্টির কারণ হতে পারে। (আহমাদ, আবু দাউদ)

আবু হুমাইদার বর্ণনায় রয়েছে। বিয়ে করার উদ্দেশ্যে মেয়ে দেখা সম্পর্কে নবী করীম (সঃ) বলেছেন, এতে কোন দোষ নাই। (মুসনাদে আহমাদ)

এছাড়াও বিয়ে করার উদ্দেশ্যে কোন মেয়েকে অজ্ঞাতসারে ও অজান্তে চুপিচুপি দেখে নেয়ারও অনুমতি আছে।

(খ) বিচার এবং চিকিৎসার প্রয়োজনে দেখা ঃ কোন অপরাধ অনুসন্ধানের জন্য কোন সন্দেহপূর্ণ স্ত্রীলোককে দেখা, কিংবা আদালতে স্বাক্ষ্যদানের সময় বিচারকের পক্ষ থেকে কোন নারী সাক্ষীকে দেখা, অথবা চিকিৎসার প্রয়োজনে ডাক্তারের পক্ষ থেকে কোন নারী রুগীকে দেখা ইত্যাদি।

চার. চোখ নতো বা চোখ ফিরিয়ে নেয়ার হুকুম দেয়ার উদ্দেশ্য এটাও যে, কেউ যেন অপর কোন নারী বা পুরুষের লজ্জাস্থানের উপর দৃষ্টিপাত না করে। এ প্রসঙ্গে নবী করীম (সঃ) বলেছেন-

لا ينظر الرجل الىا عورة الرجل ولا تنظر المراة الى عورة المراة

"কোন পুরুষ যেন অপর পুরুষের লজ্জাস্থানের দিকে দৃষ্টি না দেয় এবং কোন নারীও যেন অপর কোন নারীর লজ্জাস্থানের দিকে দৃষ্টিপাত না করে।" (আহমাদ, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী)

অপর এক হাদীসে হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,নবী করীম (সঃ) আমাকে বলেছেন,কোন জীবিত বা মৃত ব্যক্তির উরুর উপর দৃষ্টিপাত করো না। (আবু দাউদ,ইবনে মাজাহ)

পাঁচ. দাড়িবিহীন বালক বা কিশোরদের প্রতি দৃষ্টিপাত না করা ও দৃষ্টি নতো করার মধ্যে এ নির্দেশও রয়েছে যে,দাড়িবিহীন বালক বা কিশোরদের দিক থেকেও দৃষ্টিকে নতো করা বা ফিরিয়ে নেয়া। এ বিষয়ে ইবনে কাসীর লিখেছেন,পূর্ববর্তী অনেক মনীষী দাঁড়িবিহীন বালকদের প্রতি অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকাকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন এবং অনেক আলেমদের মতে এটা হারাম। সম্ভবতঃ এটা সেই সময়ের বিষয়, যখন বদনিয়ত ও কামভাব সহকারে দেখা হয়।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে

يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَا رِهِمْ "তোমরা তোমাদের দৃষ্টিকে নতো করো" এর হুকুম বা বিধানের বিভিন্ন দিকের আলোচনা করা হলো। পর্দা সংক্রান্ত পরবর্তী বিধান সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন- وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ "এবং তোমরা তোমাদের লজ্জাস্থান বা যৌনাঙ্গ হিফাযত করো।"

লজ্জাস্থানের হিফাযত বলতে কেবলমাত্র যৌন উত্তেজনা হতে বিরত থাকাই শুধু নয়, বরং নিজের লজ্জাস্থান অন্যকে দেখানো থেকে বিরত থাকাও এর উদ্দেশ্য।

নবী করীম (সঃ) পুরুষের জন্য লজ্জাস্থান বা 'সতর' এর সীমা নির্ধারণ করেছেন, নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত। তিনি বলেন-

عورة الرجل ما بين سرته الى ركبتيه "নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত হলো পুরুষের সতর।"(দারে কুতনী,বায়হাকী)

দেহের এই অংশটি স্ত্রী ছাড়া অন্য কারো সামনে উন্মুক্ত করা হারাম। যেমন নবী করীম (সঃ) বলেছেন, নিজের লজ্জাস্থানের হিফাযত করো,তোমার স্ত্রী এবং অধিকারভুক্ত দাসী ছাড়া (সবারই সংস্পর্শ থেকে)।

(মুসনাদে আহমাদ ও সুনান গ্রন্থসমূহ)

আসহাবে সুফফার বুযর্গ জারহাদ আসলামী (রাঃ) বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,নবী করীম (সঃ) এর মজলিসে একবার আমার উরু উলঙ্গ হয়ে গেল। তখন নবী করিম (সঃ) বললেন, তুমি কি জানো না উরুও লজ্জাস্থানের মধ্যে গণ্য ? (তিরমিযী, আবু দাউদ, মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

অন্য এক হাদীসে হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন। নবী করীম (সঃ) বলেছেন, তুমি তোমার উরুকে উলঙ্গ করিও না।

(আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

অন্যদের সামনে তো নয়ই, বরং একাকীও উলঙ্গ হওয়া নিষেধ করা হয়েছে। নবী করীম (সঃ) বলেছেন-

اياكم والتعرى فان معكم من لا يفارقكم الا عند الغائط وحين يفضى الرجل الى اهله فاستحيوهم واكرموهم

"সাবধান! তোমরা কখনই উলঙ্গ হবে না। কেননা, তোমাদের সঙ্গে এমন কেউ কেউ রয়েছে, যারা (কল্যাণ ও রহমতের ফিরিশতা) কখনই তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না-দু'টি সময় ছাড়া। এক, পায়খানা ও পেশাবের সময় এবং দ্বিতীয়, স্ত্রী সহবাসের সময়।"(তিরমিযী)

লজ্জাস্থান বা যৌনাঙ্গ হিফাযত বা সংযত রাখার আরও অর্থ হলো, কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার যতো পথ বা মাধ্যম আছে, সবগুলো থেকে যৌনাঙ্গকে সংযত রাখা। এর মধ্যে রয়েছে ব্যভিচার, পুংমৈথন, হস্তমৈথুন এবং সমকামিতা অর্থাৎ পুরুষে পুরুষে লাওয়াতাত এবং নারীতে নারীতে পারস্পরিক ঘর্ষণ যাতে কামভাব পূর্ণ হয়। এছাড়া কোন পশুর সাথে যৌনক্রিয়া পূর্ণ করা ইত্যাদি এমন সব অবৈধ কর্মের মধ্যে গণ্য।

আয়াতের এই নির্দেশের উদ্দেশ্যই হলো অবৈধ ও হারাম পন্থায় কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা এবং তার সমস্ত ভূমিকাকে নিষিদ্ধ করা। তার মধ্যে

কাম প্রবৃত্তির প্রথম ও প্রারম্ভিক কারণ হলো, দৃষ্টিপাত করা ও দেখা এবং সর্বশেষ পরিণতি হলো ব্যভিচার। এ দু'টিকেই স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে হারাম করে দেয়া হয়েছে। আর এ দু'য়ের মাঝে আর যেসব হারাম ভূমিকা রয়েছে, যেমন-কর্থাবার্তা শোনা,বলা,চলা,স্র্পশ করা এবং মনের মধ্যে তৃপ্তিবোধ করা ইত্যাদি এসবের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লামা ইবনে কাসীর হযরত ওবায়দা (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, যার দ্বারা আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধাচারণ হয়, তাই কবীরা। কিন্তু এই আয়াতে তার দুই প্রান্ত-সূচনা ও পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে। সূচনা হচ্ছে দৃষ্টিপাত বা চোখ তুলে দেখা এবং পরিণতি হচ্ছে ব্যভিচার। আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে এসব অপরাধ থেকে হিফাযত করুন। (আমীন)

অতঃপর আয়াতের পরবর্তী অংশে চোখের দৃষ্টি নতো রাখা এবং লজ্জাস্থানের হিফাযতকে পবিত্রতম ও উত্তম কাজ উল্লেখ করে মহান আল্লাহ বলেন- ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ "এটাই তাদের জন্য পবিত্রতম নীতি।" অর্থাৎ পুরুষদের জন্য উপরোক্ত পর্দা সংক্রান্ত যে দু'টি মৌলিক প্রারম্ভিক ও প্রান্তিক চোখের দৃষ্টি নতো ও যৌনাঙ্গ হিফাযত অর্থাৎ ব্যভিচার থেকে দূরে থাকার বিধান বা নীতি উল্লেখ করা হয়েছে, তা যদি কোন মু'মিন পুরুষ আল্লাহকে ভয় করে মেনে চলে, তবে তারা তাদের পবিত্রতম জীবন পরিচালনা করতে সক্ষম হবে। আর যদি তারা এই দু'টি বিধান মেনে চলতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তাদের এই অনৈতিক ও চরিত্রহীন কর্মের জন্য নিজের জীবন যেমন কুলুষিত হবে, তেমনি সমাজ জীবনও অনৈতিক যৌন চর্চার কারণে কুলুষিত ও বিশৃংঙ্খলার সৃষ্টি হবে এবং আল্লাহর গযব নেমে আসবে। বর্তমানে মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশসহ সারা দুনিয়ায় যৌনাচারের ছড়াছড়ির জন্যই আমাদের সমাজসহ সারা দুনিয়ায় অশান্তি ও বিশৃংখলা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

অতঃপর আয়াতের শেষে বলা হয়েছে- اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ

"নিশ্চয় আল্লাহ তা'লা সেসব বিষয় অবহিত যা তারা করে।"

অর্থাৎ মানুষ তার যৌনক্ষুধা মিটানোর জন্য যা কিছুই করুক না কেন-তা প্রকাশ্যই হোক আর অপ্রকাশ্যে খুব গোপনেই হোক, মহান আল্লাহ তার সবকিছুই দেখছেন এবং অবহিত আছেন। পক্ষান্তরে তারা তাদের চোখ

এবং যৌনাঙ্গের হিফাযতের জন্য যে পথ বা পন্থা অবলম্বন করছে তাও আল্লাহ অবলোকন করছেন এবং অবহিত আছেন।

অতঃপর পরবর্তী আয়াতে একইভাবে মুমিন নারীদের পর্দা এবং মুহরীম পুরুষ সংক্রান্ত বিষয়ে আরো বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করে মহান আল্লাহ বলেন-

وَ قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَايُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ص وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَائِهِنَّ اَوْاٰبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِهِنَّ اَوْاَبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْاِخْوَانِهِنَّ اَوْبَنِىْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْبَنِىْ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْنِسَائِهِنَّ اَوْمَامَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِالتّٰبِعِيْنَ غَيْرِاُوْلِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِالطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْاعَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَاءِ ص وَلاَ يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَايُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ط وَتُوْبُوْااِلَى اللهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

আর হে নবী! মু'মিন নারীদেরকে বলে দিন, তারাও যেন তাদের দৃষ্টিকে নতো রাখে এবং নিজেদের যৌনাঙ্গের হিফাযত করে। আর তারা যা নিজ হতেই সাধারণতঃ প্রকাশিত হয়ে পড়ে, তা ছাড়া যেন তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা তাদের মাথার ওড়নার আঁচল নিজেদের বুকের উপর ফেলে রাখে। আর তারা যেন তাদের স্বামী, স্বামীর পিতা (শ্বশুর), নিজেদের পুত্র, স্বামীদের পুত্র, ভাই, ভাতিজা, ভাগ্নে, স্ত্রীলোক, দাস, যৌন কামনামুক্ত পুরুষ ও বালক-যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ছাড়া কারো সামনে তাদের সৌন্দর্য বা সাজসজ্জা প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের সৌন্দর্য পর পুরুষকে জানানোর জন্য তাদের পা যমীনের উপর জোরে জোরে না মারে। হে মু'মিন লোকেরা! তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর কাছে তাওবা করো, আশা করা যায় তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারবে।

এই দীর্ঘ আয়াতে নারীদের জন্য পর্দা সংক্রান্ত অনেকগুলো বিধিবিধান বর্ণনা করা হয়েছে। নিম্নে তা ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হলো।

প্রথম বিধান ঃ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ "তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নতো রাখে বা ফিরিয়ে নেই।" অর্থাৎ নারীরাও যেন পুরুষদের মতো তাদের চোখের দৃষ্টি নতো রাখে বা ফিরিয়ে নেই। অনিচ্ছাকৃতভাবে দৃষ্টি পড়ে গেলে সাথে সাথে যেন তা নিচু করে কিংবা ফিরিয়ে নেই। ইচ্ছা করে নিজের স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষের দিকে দৃষ্টি দেয়া জায়েয নয়। পুরুষ হোক কিংবা নারী হোক লজ্জাস্থানের দিকে তাকানো বৈধ নয়। যেমন, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, কোন পুরুষ যেন অপর পুরুষের লজ্জাস্থানের দিকে দৃষ্টি না দেয় এবং কোন নারীও যেন অপর কোন নারীর লজ্জাস্থানের দিকে না তাকায়। (আবু দাউদ, মুসলিম, আহমাদ, তিরমিযী)

পর পুরুষের প্রতি দৃষ্টি না দেয়া প্রসঙ্গে কয়েকটি হাদীস পাওয়া যায়- যা পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পর বর্ণিত হয়েছে। যেমন, উম্মে সালমা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমি এবং হযরত মায়মুনা (রাঃ) আমরা দু'জন নবী করীম (সঃ) এর সাথে বসা ছিলাম। এমন সময় অন্ধ সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ) সেখানে আগমন করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে বললেন, তোমরা দু'জন এ ব্যক্তি হতে পর্দা করো। আমরা বলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! উনি তো অন্ধ লোক। তিনি আমাদেরকে না দেখতে পাবেন, না চিন্তে পারবেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, তোমরা তো অন্ধ নও যে, তাকে তোমরা দেখতে পাবে না ? হযরত সালমা (রাঃ) স্পষ্ট করে বলেন, এই ঘটনা ছিলো পর্দার হুকুম নাযিল হওয়ার পরের ঘটনা।

(আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী)

অনুরূপ আরো একটি বর্ণনা পাওয়া যায়, তাতেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। হযরত আয়িশা (রাঃ) এর নিকট একজন অন্ধ লোক আসলো। তিনি তার হতে পর্দা করলেন। তাকে বলা হলো, আপনি এই লোকটি হতে পর্দা করছেন, অথচ এতো আপনাকে দেখতে পায় না ? জবাবে উম্মুল মু'মিনিন বললেন, কিন্তু আমি তো তাকে দেখতে পারি। (মুয়াত্তা ইমাম মালিক)

পুরুষ-নারীর পর্দার ক্ষেত্রে পার্থক্য ঃ পুরুষদের নারীদের দেখা আর নারীদের পুরুষদের দেখার বিষয়ে শরীয়তের বিধানের ক্ষেত্রে কিছুটা

ভিন্নতা আছে। যেমন, শরীয়তে পুরুষদের বেগানা নারীদের দেখার কোন সুযোগ রাখা হয়নি। কিন্তু নারীদের কামভাব ব্যতীত বেগানা পুরুষদের দেখার বিষয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে সুযোগ দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে নিম্নে দু'টি বর্ণনা উল্লেখ করা হলো-

হযরত আয়িশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার ঈদের দিন মসজিদে নববীর আঙ্গিনায় কিছু সংখ্যক হাবশী যুবক সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য অস্ত্রের মহড়া দিচ্ছিলো। এই সময় নবী করীম (সঃ) নিজে হযরত আয়িশা (রাঃ) কে তাঁর পিছনে দাঁড় করিয়ে দেখাচ্ছিলেন। তিনি তাদের মহড়া মনভরে দেখার পর ক্লান্ত হয়ে চলে আসেন। (সহীহ বুখারী-মুসলিম, আহমাদ)

দ্বিতীয় আরো একটি হাদীসে বর্ণিত আছে। তাতে বলা হয়েছে, ফাতিমা বিনতে কায়েশকে যখন তার স্বামী তিন তালাক দিলো,তখন প্রশ্ন উঠলো,সে ইদ্দত কোথায় পালন করবে। প্রথমে নবী করীম (সঃ) তাকে বললেন, উম্মে শরীফ আনসারিয়ার নিকটে বসবাস করো। পরে বললেন, সেখানে আমার সাহাবীগণ খুব বেশী যাওয়া আসা করে (কেননা, সে মহিলা খুব ধনী এবং বেশী দাতা ছিলো)। অতএব তুমি আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুমের বাড়িতে থাকো। কেননা,সে তো একজন অন্ধ ব্যক্তি। তুমি সেখানে কোন রূপ অসুবিধা ছাড়াই থাকতে পারবে।

(সহীহ মুসলিম,আবু দাউদ)

এই পর্যায়ে বর্ণিত সব কয়টি হাদীস একত্রে করলে জানা যায় যে,নারীদের পক্ষে পুরুষদের দেখার ব্যাপারটি এতো কড়াকড়ি নাই,যতোটা পুরুষদের পক্ষে নারীদের দেখায় রয়েছে। তবে এক মজলিসে নেকাব দেওয়া থাকলেও সামনা সামনি বসে দেখা নিষেধ। কিন্তু পথ চলতে গিয়ে কিংবা দূর থেকে কোন বৈধ খেলা দেখার সময় পুরুষদের প্রতি দৃষ্টি পড়া নিষেধ নয়। কোন বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিলে এক বাড়িতে বসবাস করতে গিয়ে দেখা হলে কোন দোষ নাই। ইমাম গাজ্জালী ও ইবনে হাজার আসকালানীর (রহঃ) বর্ণনা হতেও প্রায় এধরণের কথায় পাওয়া যায়। এটা যে জায়েয তার সমর্থন এ থেকেও পাওয়া যায় যে, নারীদের পর্দার সাথে বাইরে যাওয়ার সমর্থন সবক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। মসজিদে, হাটে-বাজারে, কর্মক্ষেত্রে ও সফরে মহিলারা মুখের উপর নিকাব রেখে যাতায়াত করে। উদ্দেশ্য হলো এই যে, পুরুষ লোকেরা যেন তাকে

দেখতে না পারে। কিন্তু পুরুষদের তো মুখে নিকাব দিয়ে বাইরে যেতে বলা হয়নি-যেন স্ত্রীলোকেরা তাদেরকে দেখতে না পায়। এ থেকেই জানা যায় যে, এ দু'টি ব্যাপার শরীয়তের দৃষ্টিতে একইরূপ নয়, বরং ভিন্ন ভিন্ন। তবে এই নয় যে, মহিলারা আগ্রহসহকারে পর পুরুষকে দেখবে আর তাদের মনের তৃপ্তি মিটাবে, এটা কোন দিনই জায়েয হতে পারে না।

(তাফহীমুল কুরআন)

দ্বিতীয় বিধান ঃ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ "এবং তারা যেন লজ্জাস্থান বা যৌনাঙ্গের হিফাযত করে।"অর্থাৎ অবৈধ যৌন চর্চা হতে দূরে থাকবে। নিজের লজ্জাস্থান অপরের সামনে খুলতেও প্রস্তুত হবে না। এই পর্যায়ে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য শরীয়তের বিধান একইরূপ। যদিও নারীদের সতর বা লজ্জাস্থানের সীমানা পুরুষদের চেয়ে ভিন্নতর।

পুরুষদের জন্য নারীদের 'সতর' হাতের কব্জি ও মুখমন্ডল ছাড়া দেহের সমস্ত অঙ্গ। এই অঙ্গসমূহ স্বামী ছাড়া অপর কোন পুরুষের সামনে এমনকি নিজের বাপ ও ভাইয়ের সামনেও খোলা যাবে না। আর নারীদের এমন পাতলা ও আঁটসাট পোষাকও পরিধান করা উচিত নয়, যাতে তাদের দেহের অঙ্গের যৌবন শ্রী বাইরে বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ে। এ বিষয়ে হযরত আয়িশা (রাঃ) বর্ণনা করেন। আমার বোন আসমা (রাঃ) খুব পাতলা কাপড় পরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সামনে আসলে নবী করীম (সঃ) মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন-

يا اسماء ان المراة اذا بلغت المحيض لم يصلح لها ان يرى منها الا هذا وهذا واشار الى وجهه وكفيه

"হে আসমা! জেনে রাখো, মেয়েরা যখন বালেগা হয়, তখন তার মুখমন্ডল ও হাত দু'টি ছাড়া দেহের অন্য কোন অঙ্গ প্রকাশিত হওয়া উচিত নয়।"

(আবু দাউদ)

অনুরূপ ভাবে ইবনে জরীর হযরত আয়িশা (রাঃ) হতে একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তাঁর ঘরে তাঁর বৈপিত্রেয় ভাই আবদুল্লাহ ইবনে তোফায়েলের কন্যা এসেছিলো। নবী করীম (সঃ) ঘরে এসে তাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তখন আয়িশা (রাঃ) বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ (সঃ)! এতো আমার ভাইঝি। তখন নবী করীম (সঃ) বললেন-

اذا عركت المراة لم يحل لها ان تظهر الا وجهها والا مادون هذا وقبض على ذراع نفسه وترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة اخرى

"নারীরা যখন বালেগা হয়, তখন তার মুখমন্ডল ও হাত ছাড়া দেহের আর কোন অঙ্গ প্রকাশিত হওয়া বৈধ নয়। আর তিনি এমনভাবে ধরে নিজের হাতের সীমা দেখালেন যে, বাজু হতে হাতের কব্জি পর্যন্ত এক মুট বরাবর জায়গা ছিলো"।

এই ব্যাপারে শুধু এতোটুকু সুযোগ আছে যে, নিজের বাপ ও ভাইয়ের সামনে দেহের এতোটুকু পরিমাণ প্রকাশিত হওয়ার সুযোগ আছে, যা কাজকর্ম করার জন্য প্রকাশ করা অপরিহার্য। যেমন আটা তৈরীর সময় আস্তিন গুটিয়ে রাখা, কিংবা ঘর ধোয়ার সময় পরনের কাপড় কিছুটা উপরে তোলা ইত্যাদি।

আর একজন নারীর সামনে নারীর সতর এর সীমা তাই যা একজন পুরুষের সামনে অপর পুরুষের সতর। অর্থাৎ নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত। এর মানে এই নয় যে, একজন নারী অন্য নারীর সামনে অর্ধোলুঙ্গ হয়ে থাকবে। বরং এর তাৎপর্য শুধু এতোটুকু যে, নাভি ও হাঁটুর মাঝের অংশ ঢেকে রাখা ফরজ। আর অন্যান্য অংশ অপর নারীর সামনে ঢেকে রাখা ফরজ নয়।

তৃতীয় বিধান ঃ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَاظَهَرَ مِنْهَا "আর তারা যা সাধারণতঃ নিজ হতেই প্রকাশিত হয়ে পড়ে, তা ছাড়া যেন তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে।"

এখানে-زِيْنَتْ শব্দের অর্থ করা হয়েছে সাজসজ্জা বা প্রসাধন করা। এতে তিনটি জিনিস বুঝায়ঃ ১. চোখ জুড়ানো কাপড়চোপড় ২. অলংকার এবং ৩. মাথা, হাত, পা ইত্যাদিতে সাধারণ ব্যবহার্য প্রসাধন দ্রব্য। যা আধুনিক যুগে 'মেকআপ' বলা হয়ে থাকে। আর দ্বিতীয় বাক্যাংশে বলে এই বিধান হতে যা বাদ দেয়া হয়েছে, তা مَاظَهَرَ مِنْهَا অর্থাৎ "যা নিজ হতেই প্রকাশ হয়ে পড়ে" বলে প্রকাশিত হয়েছে। এটা হতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে,

এই বাদ দেয়া অংশ নারীদের ইচ্ছা করে প্রকাশ বা প্রদর্শন করা উচিত নয়। তবে আপনা আপনি যা প্রকাশ হয়ে পড়ে যেমন, চাদর বা বোরকা বাতাসে উড়ে পড়লো এবং তাতে সৌন্দর্য ও সাজসজ্জা কিছুটা প্রকাশ হয়ে পড়লো তার কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু যা নিজ হতেই প্রকাশ হয়ে থাকে- যেমন, সেই চাদর যা গায়ে জড়ানো হয়েছে। কেননা, এই চাদর তো আর লুকিয়ে বা ঢেকে রাখা সম্ভব নয়, অধিকন্তু নারীদের দেহাবরণ হওয়ার কারণে তাতেও কিছুটা আকর্ষণ থেকেই থাকে, সেই জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন পাকড়াও করা হবে না। এই আয়াতের এরূপ অর্থই বুঝিয়েছেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হাসান বসরী, ইবনে শীরীন ও ইব্রাহীম নখয়ী প্রমুখ মনীষীবৃন্দ।

পক্ষান্তরে কোন কোন তাফসীরকার مَاظَهَرَ مِنْهَا অংশের অর্থ বুঝেছেন- "মানুষ যা চলতি অভ্যাসবশত প্রকাশ করে থাকে।" আর তারা মুখমন্ডল ও হাত এবং ওদের সমস্ত সাজসজ্জা ও রূপ সৌন্দর্যসহ তাতে শামিল মনে করেন এবং তার প্রকাশ করা জায়েয মনে করেন।

এক কথায় তারা মনে করেন যে, স্ত্রীলোক নিজের মুখমন্ডলে প্রসাধন ও স্নো-পাউডার ইত্যাদি ব্যবহার করে এবং নিজের হাত ও আঙ্গুলগুলোকে গয়না ও আংটি ইত্যাদি দিয়ে সজ্জিত করে মানুষের সামনে উন্মুক্ত করতে পারে এবং তা জায়েযও বটে। আয়াতটির এরূপ তাৎপর্য হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং তাঁর শাগরিদদের দ্বারা বর্ণিত এবং হানাফী মাযহাবের বেশ কয়েকজন ফিকাহবিদ এই তাৎপর্যই গ্রহণ করেছেন।

(আহকামুল কুরআন)

কিন্তু আয়াতের مَاظَهَرَ শব্দের অর্থ مَايُظْهَرُ হতে পারে কোন নিয়ম অনুসারে তা আমরা বুঝতে অক্ষম। প্রকাশিত হওয়া 'আর প্রকাশ করা'- এই দু'টির মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। আমরা দেখতেছি যে, কুরআন মজিদ স্পষ্টভাবে এটা প্রকাশ করা হতে নিষেধ করতেছে,আর'প্রকাশিত হওয়ার'ব্যাপারটিকে মাফ করেছে। এই মাফ করার সীমাকে 'প্রকাশ করা' পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারিত করে দেয়া কুরআনেরও বিপরীত। আর হাদীসের সেইসব বর্ণনার বিপরীত, যা হতে প্রমাণিত হয় যে,নবী করীম (সঃ) এর যামানায় পর্দার বিধান নাযিল হবার পর সমাজের নারীরা মুখমন্ডল খোলা

রেখে চলাফিরা করতেন না। আর মুখমন্ডল ঢেঁকে রাখারও বিধান অন্তর্ভক্ত ছিলো। ইহরাম ছাড়া অন্যসব অবস্থায়ই মুখের আবরণকে নারীদের পোষাকের একটি অপরিহার্য অংশ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এটা ছাড়া আরও আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এই পর্যায়ে দলীল প্রদান করতে যেয়ে বলা হয়েছে যে, মুখ ও হাত নারীদের সতর এর মধ্যে গণ্য নয়। অথচ সতর ও পর্দার মাঝে আকাশ-পাতালের পার্থক্য রয়েছে।'সতর' তাই যা মুহরীম পুরুষদের সামনেও অনাবৃত ও উন্মুক্ত করা জায়েয নয়। আর পর্দা সতর থেকেও এক বড় জিনিস, যাকে নারী ও গায়রে মুহরীম পুরুষদের মাঝে আড়াল করে দেওয়া হয়েছে। আর এখানে তো আলোচনাই হলো পর্দা সম্পর্কে, সতর সম্পর্কে নয়। (তাফহীমুল কুরআন)

চতুর্থ বিধান ঃ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوْبِهِنَّ "আর তারা যেন তাদের মাথার ওড়নার আঁচল নিজের বুকের ওপর ফেলে রাখে।"

জাহেলী যুগের নারীরা সামনের বোতাম খোলা রেখে মাথার উপর এক প্রকারের চাদর দিয়ে খোপা বেঁধে রাখতো। এতে গলা ও বুকের উপরাংশ স্পষ্ট দেখা যেত। বুকের উপর কোর্তা ছাড়া আর কিছুই থাকতো না। আর পিছনের দিকে দু'টি কিংবা তিনটি বেনী ঝুলিয়ে রাখতো।

(ইবনে কাসীর-তাফসীরে কাস্সাফ)

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর থেকে মুসলিম নারীদের মধ্যে দোপাট্টা বা উড়না ব্যবহার করার প্রথা চালু হয়। আধুনিক যুবতীদের মতো ওকে ভাঁজ করে সাপের মতো বেড়ী করে ওড়না ব্যবহারের উদ্দেশ্য ছিলো না। বরং তার উদ্দেশ্যই ছিলো মাথা,কোমর,বুক সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভালোভাবে ঢেকে রাখা।মুমিন নারীরা এই আয়াতের নির্দেশ শুনা মাত্রই আ'মল করা শুরু করে দিলো। এই আ'মলের প্রসংশা করে হযরত আয়িশা (রাঃ) বর্ণনা করেন। যখন সূরাটি নাযিল হলো, তখন লোকেরা নবী করীম (সঃ) এর নিকট হতে তা শুনে বাড়িতে ফিরে এসেই নিজের স্ত্রী,কন্যা ও বোনদের শুনালে, আনসার বংশের মহিলাদের মধ্যে এমন কোন মহিলাই ছিলো না যে- وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوْبِهِنَّ আয়াতটি শুনার পর কেউ বসেছিলো। বরং প্রত্যেকে উঠলো এবং কেউ নিজের কোমর থেকে কাপড় খুলে, কেউ গায়ের চাদর দিয়ে দোপাট্টা বানিয়ে নিলো এবং তা

গোটা দেহে জড়িয়ে রাখলো। পরের দিন ফজরের সালাতে যতো নারীই 'মসজিদে নববীতে' এসেছিলো তারা সকলেই দোপাট্টা পরা ছিলো। এই পর্যায়ে আরো একটি বর্ণনায় হযরত আয়িশা (রাঃ) আরও ব্যাখা দিয়ে বলেন যে,নারীরা পাতলা কাপড় পরা বাদ দিয়ে মোটা কাপড়ের দোপাট্টা বানিয়ে নিয়েছিলো। (ইবনে কাসীর, আবু দাউদ)

যদি কেউ মোটা কাপড়ের পরিবর্তে পাতলা কাপড়ের দোপাট্টা বানায় তাহলে নিচে আরও একটি কাপড় বানিয়ে নিতে হবে। দাহ্ইয়া কলবী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সঃ) এর কাছে মিশরের তৈরী পাতলা মলমলের কাপড় আসলে, তিনি আমাকে এক টুকরা কাপড় দিয়ে বললেন, এর এক অংশ দিয়ে তুমি তোমার জামা তৈরী করো। আর এক অংশ দিয়ে তোমার স্ত্রীর দোপাট্টা বানিয়ে দিও। কিন্তু তোমার স্ত্রীকে বলে দিও তার নিচে অন্য একখানা কাপড় লাগিয়ে নিতে,যেন দেহের সৌন্দর্য ভিতর থেকে বের হয়ে না পড়ে। (আবু দাউদ, কিতাবুল লিবাস)

পঞ্চম বিধান ঃ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ "আর নিজেদের সৌন্দর্য বা সাজসজ্জা প্রকাশ করবে না ঐ লোকদের ছাড়া"। অর্থাৎ একজন নারী নিজের পূর্ণ অলংকার ও সাজসজ্জার সাথে স্বাধীনভাবে যে পরিবেশে চলাফিরা করতে পারে সেখানে এসব লোকই থাকে। এই পরিবেশের বাইরে যারাই আছে তারা আত্মীয় হোক বা অনাত্মীয় হোক, তাদের সামনে কোন নারী সাজসজ্জার সাথে আসতে পারবে না। তবে তাদের গোপন রাখার চেষ্টা সত্ত্বেও বা তাদের ইচ্ছার বাইরে য়া নিজ হতেই বের হয়ে পড়বে, কিংবা যা গোপন করা মোটেই সম্ভব নয়, তা আল্লাহ ক্ষমা করবেন।

ষষ্ঠ বিধান ঃ যাদের সামনে নারীরা নিজের সৌন্দর্য বা সাজসজ্জা প্রকাশ করতে পারবে এমন বারো শ্রেণীর লোকের কথা উল্লেখ করা হলো-

১. لِبُعُوْلَتِهِنَّ - "তাদের স্বামী"। অর্থাৎ নারীরা তাদের স্বামীর সামনে তাদের সাজসজ্জা বা সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারবে। শুধু পারবেই না বরং প্রয়োজনে তার সামনে উলঙ্গ হতেও পারবে। কেননা, হাদীসে নবী করীম (সঃ) বলেছেন, "দু'টি স্থান - একটি হলো পায়খানায় এবং দ্বিতীয়টি হলো স্বামী-স্ত্রীর মিলনের সময় ছাড়া উলঙ্গ হয়ো না। কেননা,সকল সময় তোমাদের সাথে রহমতের ফিরিশতারা অবস্থান করেন।"

২. اَوْاٰبَاۤءِهِنَّ - "অথবা তাদের পিতা"। এখানে শুধু পিতাই নয়, বরং দাদা, পরদাদা এবং নানা, পরনানাও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। কাজেই একজন নারী নিজের নানা ও দাদার সামনে ঠিক তেমনিভাবে আসতে পারবে, যেমন পারে নিজের বাপ ও শশুরের সামনে।

৩. اَوْاٰبَاۤءِ بُعُوْلَتِهِنَّ -"অথবা তাদের স্বামীদের পিতা অর্থাৎ শ্বশুর"। নিজের স্বামীদের পিতা। অর্থাৎ বর্তমান স্বামীর পিতা এবং পূর্বের মৃত স্বামীদের পিতা এর মধ্যে গণ্য। তবে তালাক দেয়া স্বামীদের পিতা এর মধ্যে গণ্য নয়।

৪. اَوْاَبْنَاۤءِهِنَّ -"অথবা তাদের পুত্র"। এখানে পুত্রদের মধ্যে নাতি, পুতি,মেয়েদের সন্তান ও তার সন্তান সবই গণ্য। আর এই ব্যাপারে সৎ ও আপন কোনই পার্থক্য নেই। নিজের সতীনের সন্তানের সামনে নারীরা নিজের সাজসজ্জা নিয়ে তেমনিভাবে আসতে ও চলাফেরা করতে পারে- যেমন পারে নিজের সন্তান ও সন্তানের সন্তানদের সামনে।

৫. اَوْاَبْنَاۤءِ بُعُوْلَتِهِنَّ - "অথবা স্বামীদের পুত্র"। অর্থাৎ স্বামীদের পুত্র বলতে এখানে বুঝানো হয়েছে স্বামীর অন্য স্ত্রীর গর্ভের সন্তানকে বুঝানো হয়েছে। বর্তমান শরীয়ত সম্মতভাবে আরো তিনজন স্ত্রীর পুত্র অথবা মৃত কিংবা তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীদের পুত্রদের সামনে সাজসজ্জা বা সৌন্দর্য প্রদর্শন করা অন্যদের মতই চলবে।

৬. اَوْاِخْوٰنِهِنَّ - "অথবা তাদের ভাই"। ভাইদের মধ্যে সহোদর, সৎ ও দুধ ভাই এবং মায়ের আগের ঘরের সন্তান সবই শামিল রয়েছে।

৭. اَوْبَنِىْۤ اِخْوَانِهِنَّ - "অথবা ভাইদের পুত্র"। ভাইদের পুত্র বলতে তিন প্রকারের ভাই এর সন্তানই বুঝায়। আর নাতী ও পর নাতীরা এর মধ্যে শামিল।

৮. اَوْبَنِىْۤ اَخَوٰتِهِنَّ - "অথবা তাদের বোনদের পুত্র"। বোনদের পুত্র বলতে তিন প্রকারের বোনের সন্তানই বুঝাই। আর তাদের নাতী ও পরনাতী এর মধ্যে শামিল।

এতক্ষণ পর্যন্ত আত্মীয়দের বিষয়ে আলোচনা করা হলো। তবে চাচা ও মামার সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ, তথাপি তাদের নাম এখানে উল্লেখ করা

হয়নি। এর কারণ এই যে, তারা হয়তো তাদের ছেলেদের সামনে তাদের ভাতিজী এবং ভাগ্নিদের সৌন্দর্য বর্ণনা করবে। এজন্যই তাদের সামনে দোপাট্টা বাঁধা ছাড়া আসা উচিত নয়। (ইবনে কাসীর)

৯. أَوْ نِسَآءِهِنَّ - "অথবা নিজেদের মেলামেশার স্ত্রীলোক"। আয়াতের এই অংশে নারীদের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ মুসলিম নারীরা নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারবে। আর অমুসলিম নারীর সামনে মুসলিম নারীরা তার সৌন্দর্য বা সাজসজ্জা প্রকাশ করতে পারবে না। এর কারণ এই যে, সম্ভবত ঐ অমুসলিম নারীরা তাদের স্বামীদের সামনে ঐ মুসলিম নারীর সৌন্দর্য বর্ণনা করবে। মুসলিম নারীদের ব্যাপারেও এই আশংকটা আছে বটে, কিন্তু শরীয়ত এটা হারাম করে দিয়েছে বলে তারা এরূপ করতে পারে না। কিন্তু অমুসলিম নারীকে এর থেকে বাধা দিবে কিসে ?

এ বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কোন নারীর জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে অন্য নারীর সাথে মিলিত হয়ে তার সৌন্দর্যের বর্ণনা নিজের স্বামীর সামনে এমনভাবে দেয়, যেন তার স্বামী স্বয়ং তাকে দেখতে পাচ্ছে।

(সহীহ বুখারী-মুসলিম)

অপর এক হাদীসে হযরত হাসির ইবনে কায়েস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হযরত আবু ওবাইদা (রাঃ) কে লিখেন ঃ আমি অবগত হয়েছি যে, কোন কোন মুসলিম নারী গোসল খানায় যায় এবং তাদের সাথে মুশরিকা নারীরাও থাকে। কোন মুসলিম নারীর জন্য বৈধ নয় যে, সে নিজের দেহ কোন অমুসলিম নারীকে দেখায়। (আবু দাউদ)

হযরত মুজাহীদও (রাঃ) أَوْ نِسَآءِهِنَّ এর তাফসীরে বলেন যে, এর দ্বারা মুসলিম নারীদেরকেই বুঝানো হয়েছে। সুতরাং তাদের সামনে ঐ সৌন্দর্য প্রকাশ করা যাবে যা মুহরিম আত্মীয়দের সামনে প্রকাশ করা যায়। অর্থাৎ ঘাড়, বালি ও হার। অতএব মুসলিম নারীর জন্য খালি মাথায় মুশরিক মহিলাদের সামনে থাকা বৈধ নয়। (ইবনে কাসীর)

তবে যদি কোন মুসলিম মহিলা অশ্লীল ও দুঃশ্চরিত্রা হয়, তবে তার সামনে মুশরিক নারীদের মতই সৌন্দর্য প্রদর্শন করা যাবে না।

১০. اَوْمَامَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ - "অথবা নিজেদের দাস"। অর্থাৎ নারীরা নিজেদের দাস এর সামনে তাদের সাজসজ্জা প্রদর্শন করতে পারে-যদি নাকি তার সাথে মুক্তির চুক্তি হয়ে না থাকে।এ বিষয়ে দু'টি হাদীস আপনাদের সামনে পেশ করছি। যেমন -

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত ফাতিমা (রাঃ) কে দেয়ার জন্য একজন গোলাম নিয়ে তার নিকট আসলেন। গোলামটিকে দেখে হযরত ফাতিমা (রাঃ) নিজেই তার দোপাট্টা দিয়ে ঢাকতে থাকেন। কিন্তু ওটা ছোট ছিলো বলে মাথা ঢাকলে পা খোলা থাকছিলো আর পা ঢাকলে মাথা খোলা থাকছিলো। এ দেখে রাসূলুল্লাহ তাকে বললেন, হে আমার প্রিয় কন্যা! তুমি এত কষ্ট করছো কেন ? আমি তো তোমার বাপ এবং এতো তোমার গোলাম।

(আবু দাউদ)

ইবনে আসাকির (রহঃ) তার ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন যে, ঐ গোলামটির নাম ছিলো আবদুল্লাহ ইবনে মাসআদাহ্ আল ফাযারী। তার দেহের রং ছিলো খুবই কালো। হযরত ফাতিমা তাকে লালন-পালন করে আযাদ করে দিয়েছিলেন। সিফ্ফীনের যুদ্ধে সে মুক্ত গোলাম হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর পক্ষ অবলম্বন করেছিলো এবং হযরত আলী (রাঃ) এর চরম বিরোধী ছিলো।

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একবার নারীদেরকে সম্বোধন করে বললেন, তোমাদের মধ্যে যার মুকাতাব গোলাম রয়েছে, যার সাথে এ শর্ত হয়েছে যে, সে যদি এতো টাকা দিতে পারে তবে সে আযাদ হয়ে যাবে। অতঃপর তার নিকট ঐ পরিমাণ টাকা যোগাড়ও হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় তোমাদের ঐ গোলাম থেকে পর্দা করা উচিত। (মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

১১. اَوِالتّٰبِعِيْنَ غَيْرِاُوْلِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ "অথবা যৌনকামনামুক্ত পুরুষ"। অর্থাৎ পুরুষদের মধ্যে যারা অধিন ও যৌন কামনা নেই, তাদের

সামনেও সৌন্দর্য বা সাজসজ্জা প্রকাশ করা যাবে।এদের বিষয়ে দু'টি শর্ত সংযুক্ত রয়েছে। ১.অধীন হবে। ২.যৌন কামনা থাকবে না।

বিশেষজ্ঞদের মতামত নিম্নরূপঃ

হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) মতে এর অর্থ সাদাসিধা ধরনের পুরুষ, যারা নারীদের ব্যাপারে কৌতুহলী নয়। হযরত কাতাদা বলেন, এমন অধীনস্থ লোক, যে শুধু খাবার পাবার জন্য তোমাদের সাথে লেগে থাকবে।

মুজাহীদ বলেন, বোকাটে ধরনের লোক, যে শুধু খাবার চায়, নারীদের প্রতি তার কোন খেয়াল নেই।

শাবী বলেন, এর অর্থ বাড়ীওয়ালার সেই অধীন ও অনুগত লোক, যার নারীদের দিকে চোখ তোলে তাকানোর কোন হিম্মত হবে না।

ইবনে যায়েদ বলেন, কোন পরিবারের সাথে লেগে থাকা লোক, যেন সে সেই পরিবারেরই একজন। সেই ঘরের লালিত-পালিত, যারা ঘরের নারীদের প্রতি তার কোন লক্ষ্য বা খেয়াল নেই, তার সাহসও নেই। সে তাদের সাথে শুধু লেগে আছে খাবার পাবার আশায়।

(ইবনে জারীর, ইবনে কাসীর)

কিন্তু সেইসব নপুংশ বা খোজা লোক থেকে দূরে থাকতে হবে, যাদের মুখের ভাষা খারাপ এবং সর্বদা মন্দ কথা ছড়িয়ে বেড়ায়। এ বিষয়ে হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন যে, একজন খোজা লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর বাড়িতে আসে। তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ এই আয়াতের মর্মানুযায়ী লোকটিকে আসতে নিষেধ করেননি। ঘটনাক্রমে ঐ সময়েই রাসূলুল্লাহ (সঃ) এসে পড়েন। ঐ সময় নপুংশ লোকটি হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) এর ভাই হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) কে বলছিলো, আল্লাহ তা'লা যখন তায়িফ জয় করাবেন তখন আমি তোমাকে গায়লানের মেয়ে দেখাবো। সে যখন আসে তখন তার পেটের উপর চারটি ভাঁজ পড়ে এবং যখন সে ফিরে যায় তখন আটটি ভাঁজ পড়ে। তার একথা শোনা মাত্রই রাসূলুল্লাহ বলে উঠেন, সাবধান! এরূপ লোককে কখনো আসতে দিবে না। অতঃপর তাকে মদীনা থেকে বের করে দেয়া হয়। সে তখন বায়দা নামক স্থানে বসবাস করতে থাকে। প্রতি শুক্রবারে সে আসতো এবং লোকদের নিকট থেকে কিছু খাবার নিয়ে চলে যেত।

(সহীহ বুখারী-মুসলিম,আবু দাউদ, নাসায়ী, আহমাদ)

এ থেকে জানা গেল যে, غَيْرِ اُوْلِى الْاِرْبَةِ পর্যায়ে গণ্য হওয়ার জন্য কোন ব্যক্তির শারীরিক দিক থেকে যৌন কাজে অক্ষম হওয়াই যথেষ্ট নয়। কেননা, তার মনে যদি যৌন লালসা গোপন ভাবে বর্তমান থাকে এবং নারীদের ব্যাপারে সে যদি কৌতুহলী হয়ে থাকে, তবে সে অনেক বড় বড় বিপদ ঘটাতে পারে।

১২. اَوِالطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَاءِ - "আর সেই সব বালক যারা এখনো নারীদের গোপন বিষয় সম্পর্কে অবগত নয়"।

এখানে নারীদেরকে তাদের সৌন্দর্য বা সাজসজ্জা প্রদর্শনের অনুমতি দেয়া হয়েছে। "সেইসব বালকদের সামনে যারা এখনও নারীদের বিশেষ গুণাবলী সম্পর্কে অজ্ঞ। নারীদের প্রতি যাদের লোলুপ দৃষ্টি এখনো পড়ে নাই। তবে হ্যাঁ, যদি তারা এমন বয়সে পৌছে যায় যে, স্ত্রীলোকদের সুশ্রী হওয়া বা বিশ্রী হওয়ার পার্থক্য তারা বুঝতে পারে এবং তাদের সৌন্দর্যে তারা মুগ্ধ হয়ে যায়, তবে তাদের থেকেও পর্দা করতে হবে-যদিও তারা যৌবনে পদার্পণ না করে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা ! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের খিদমতে পরপর বারো শ্রেণীর পুরুষের কথা আলোচনা করা হলো, যাদের সামনে পর্দা করা জরুরী নয়।

সপ্তম বিধান ঃ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ

"আর তারা যেন লোকদেরকে তাদের সৌন্দর্য জানানোর জন্য তাদের পা যমীনের উপর জোরে জোরে মেরে চলাফেরা না করে।"

আয়াতের এই অংশে মহান আল্লাহ তা'লা বলেন, নারীরা যেন তাদের গোপন সাজসজ্জা প্রকাশের উদ্দেশ্যে জোরে জোরে পা না ফেলে। জাহেলী যুগে এরূপ প্রায় হতো যে, নারীরা চলার সময় যমীনের উপর জোরে জোরে পা ফেলতো যাতে পায়ের অলংকার বেজে উঠে। ইসলামে এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং নারীদেরকে এমন প্রতিটি কাজ থেকে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে, যাতে তাদের গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ পেয়ে না যায়। এজন্য তাদেরকে আতর ও সুগন্ধি মেখে বাইরে বের হতেও নিষেধ করা হয়েছে।

হযরত আবু মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, প্রত্যেক চোখ ব্যভিচারী যখন নারী আতর মেখে, ফুল পরে, সুগন্ধি ছড়িয়ে পুরুষদের মজলিসের পাশ দিয়ে যায়, তখন সে এরূপ। অর্থাৎ ব্যভিচারী।
(তিরমিযী)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, এমন এক নারীর সাথে আমার সাক্ষাৎ ঘটে যে সুগন্ধি ছড়িয়ে চলছিলো। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি মসজিদ থেকে আসছো ? সে উত্তরে বললো, হ্যাঁ। পুনরায় আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি সুগন্ধি মেখেছো ? উত্তরে সে বললো, হ্যাঁ।আমি তাকে বললাম, আমি আমার বন্ধু আবুল কাসিম (সঃ) কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ এমন স্ত্রীলোকের নামায কবুল করেন না, যে এই মসজিদে আসার জন্য সুগন্ধি মেখেছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ফিরে গিয়ে অপবিত্রতার গোসলের ন্যায় গোসল করে।
(আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্, আহমাদ, নাসাঈ)

নবী করীম (সঃ) নসীহত করেছেন,নারীদের তো এমন সুগন্ধি ব্যবহার করা উচিত যার রং উজ্জল কিন্তু ঘ্রাণ হালকা ধরনের। (আবু দাউদ)

হযরত মায়মুনা বিনতে সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, অস্থানে সৌন্দর্য প্রকাশকারী নারীরা কিয়ামতের দিনের ঐ অন্ধকারের ন্যায় যেখানে কোন আলো নেই।

হযরত আবু উসাইদ আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) পথে পুরুষ ও নারীদেরকে একত্রে মিলেমিশে চলতে দেখে বললেন, হে নারীরা! তোমরা এদিক-ওদিক হয়ে যাও। মাঝপথ দিয়ে চলা তোমাদের জন্য শোভনীয় নয়। তাঁর এ কথা শুনে তাৎক্ষণিক নারীরা দেয়াল ঘেঁষে চলতে শুরু করে। এমনকি দেয়ালের সাথে তাদের কাপড়ের ঘর্ষণ লাগছিলো। (আবু দাউদ)

এতক্ষণ পর্যন্ত পুরুষ-নারীদের পর্দার বিধানগুলো আলোচলা করার পর আয়াতের সবশেষ পর্যায়ে নারী-পুরুষ সকলকে আহবান করে মহান আল্লাহ বলেন- وَتُوْبُوْا اِلَى اللهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

"হে মু'মিন লোকেরা, তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর কাছে তাওবা করো। আশা করা যায় যে তোমরা কল্যাণ লাভ করবে"।

অর্থাৎ সেইসব ভুলভ্রান্তি ও দোষত্রুটি হতে তওবা করো যা তোমরা এ পর্যন্ত করে ফেলেছো। আর ভবিষৎতের জন্য তোমাদের কর্মনীতিকে সংশোধন করে নাও। আর আমার বাতলানো গুণাবলীর অধিকারী হয়ে যাও। তাহলে আশা করা যায় যে, তোমরা সফলকাম হতে পারবে।

শিক্ষা ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা ! এতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনাদের সামনে সূরা নূর এর ৩০ ও ৩১ নম্বর আয়াত দু'টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেশ করলাম। এখন এই আয়াত দু'টিতে আমাদের জন্য কি কি শিক্ষণীয় রয়েছে তা জানা প্রয়োজন। নিম্নে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো এক এক করে তুলে ধরা হল ঃ-

■ পুরুষ-নারী উভয়কে অনুধিকার দৃষ্টিপাত হতে নিজেদের চোখকে সংযত রাখতে হবে। কোন কারণে যদি কোন পুরুষের-নারীর চোখে চোখ পড়ে,তাহলে সাথে সাথে চোখ নিচু করতে হবে অথবা সরিয়ে নিতে হবে। দ্বিতীয়বার তাকালে সেটাই গর্হিত কাজ বলে গণ্য হবে।

■ পুরুষ তার লজ্জাস্থান অর্থাৎ 'সতর' তথা হাঁটু নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত অন্যের দৃষ্টি হতে হিফাযত করবে। তাছাড়া নিজের যৌনাঙ্গকে ব্যভিচার, হস্তমৈথুন, পুংমৈথুন ইত্যাদি যৌনাচার থেকে সংরক্ষণ করবে।

■ নারীরা তাদের লজ্জাস্থান অর্থাৎ 'সতর' তথা মাথা থেকে পা পর্যন্ত অন্যের দৃষ্টি থেকে হিফাযতে রাখবে। নিজেরাতো অন্যের দৃষ্টি থেকে নিজের লজ্জাস্থানকে হিফাজত করবেই, সাথে সাথে ব্যভিচার, নারীতে নারীতে ঘষাঘষি ইত্যাদি থেকে নিজের যৌনাঙ্গকে হিফাযতে রাখবে।

■ নারীরা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশ হয়ে পড়ে যেমন মুখমন্ডল, হাত এবং পায়ের পাতা ছাড়া অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অন্যের সামনে প্রকাশ না করে।

■ নারীরা যেন তাদের মাথার বড় ওড়না বা দোপাট্টা দ্বারা তাদের ঘাড় বুক অর্থাৎ সারা শরীর ঢেকে রাখে।

■ নারীরা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভাস্তে, ভাগ্নে, নিজের পরিচিত নারী, দাস, যৌন কামনামুক্ত পুরুষ, নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া অন্যের সামনে সতর বা সাজসজ্জা প্রকাশ না করে।

■ নারীরা যেন জাহেলী যুগের মতো পর পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য যমীনে চলাফেরার সময় তাদের পা দু'টি জোরে জোরে না ফেলে চলে।

■ তারা যেন আতর বা অন্য কোন সুগন্ধি ব্যবহার না করে। তবে চেহারা উজ্জল করার জন্য পাউডার জাতীয় দ্রব্য ব্যবহার করতে পারবে।

■ মেয়রা যেন ছেলেদের সাথে একই সাথে দল বেঁধে চলাফেরা না করে।

■ নারী-পুরুষ সকলেই যেন অতীতের গুনাহর জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে।আর ভবিষৎতে কোনগুনাহ্ করবে না বলে অঙ্গীকার ব্যক্ত করে।

■ নারী-পুরুষ উভয়ই যদি উপরোক্ত পর্দা সংক্রান্ত বিধিবিধান মেনে চলে অতীতের সব পাপের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং ভবিষৎতে কোন অপরাধ করবেনা বলে অঙ্গীকার করে, তাহলে আশা করা যায় যে, এসব আ'মল বা কর্মের কারণে সে দুনিয়া এবং আখিরাতে সফলকাম হতে পারে।

আহ্বান ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা / বোনেরা ! এতক্ষণ পর্যন্ত সূরা নূর এর ৩০ ও ৩১ নম্বর আয়াত দু'টির যে ব্যাখা এবং শিক্ষা আপনাদের সামনে তুলে ধরা হলো, এতে যদি আমার পক্ষ থেকে কোন ভুল কিংবা বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, তার জন্য মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর আমরা এখান থেকে যেসব শিক্ষা লাভ করলাম, তা যেন বাস্তব জীবনে আ'মল করতে পারি সেই তাওফীক কামনা করে আমি আমার দারস শেষ করছি।

তিন

সন্তানের প্রতি আদর্শ পিতার উপদেশ

সূরা লুকমান- ৩১

আয়াত- ১৩-১৯

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَىَّ لَاتُشْرِكْ بِاللهِ ط
اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ٥ وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ج
حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِىْ عَامَيْنِ اَنِ
اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ ط اِلَىَّ الْمَصِيْرُ ٥ وَاِنْ جَاهَدٰكَ
عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَالَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ لا فَلَا تُطِعْهُمَا
وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ز وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ
اِلَىَّ ج ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ٥
يٰبُنَىَّ اِنَّهَآ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ
فِىْ صَخْرَةٍ اَوْفِى السَّمٰوٰتِ اَوْفِى الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَااللهُ ط
اِنَّ اللهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ٥ يٰبُنَىَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ
وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ ط اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ

عَزْمِ الْاُمُوْرِ ○ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَاتَمْشِ
فِى الْاَرْضِ مَرَحًا ط اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ○
وَاقْصِدْ فِىْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ط اِنَّ اَنْكَرَ
الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ○

সরল অনুবাদ ঃ ইরশাদ হচ্ছে-(১৩)আর যখন লুকমান তাঁর নিজ পত্রকে উপদেশ দিয়ে বললেন, হে আমার পুত্র, আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শিরক করো না। নিশ্চয় আল্লাহর সাথে শিরক করা বড় অন্যায়-যুলুম। (১৪) আর আমি মানুষকে তার বাপ-মায়ের সাথে ভাল ব্যবহার করার জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে পেটে বহন করেছে। আর তাকে দু'টি বছর লেগেছে দুধ ছাড়াতে। (এই কারণে তাকে) নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার ও বাপ-মায়ের শুকরিয়া আদায় করো। অবশেষে আমারই নিকট তোমাদের ফিরে আসতে হবে। (১৫) আর যদি তোমার বাপ-মা আমার সাথে এমন বিষয়কে শিরক করতে জোর জবরদস্তি করে যার সম্পর্কে তোমার জানা নাই, তা হলে তুমি কিছুতেই তাদের কথা মানবে না। তবে দুনিয়াতে তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে। আর যে আমার পথে চলবে তুমি তার পথ অনুসরণ করবে। পরিশেষে তোমাদের সকলকেই আমারই দিকে ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবো তোমরা কি রকম আ'মল করতেছিলে। (১৬) হে পুত্র, কোন জিনিস যদি সরিষা দানার মতও হয়। অতঃপর তা যদি কোন পাথর খন্ডের মধ্যে অথবা আকাশে কিংবা ভূ-গর্ভে লুকিয়ে থাকে, তবে তাও আল্লাহ তাকে বের করে আনবেন। নিশ্চয় আল্লাহ তা'লা সূক্ষ্মদর্শী ও সব বিষয়ে খবর রাখেন। (১৭) হে পুত্র, সালাত কায়েম করো, সৎকাজে আদেশ দাও, মন্দ কাজ হতে নিষেধ করো, আর বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণ করো। একথাগুলো এমনই গুরুত্বপূর্ণ, যে বিষয়ে খুবই তাগীদ করা হয়েছে। (১৮)অহংকার বশে তুমি মানুষের দিক হতে মুখ ফিরে কথা বলো না এবং যমীনের উপর গর্বভরে চলাফেরা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ কোন দাম্ভিক-অহংকারীকে পছন্দ করেন না। (১৯) নিজের চালচলনে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো এবং কণ্ঠস্বর কিছুটা নিচু রাখো। নিঃসন্দেহে গাঁধার আওয়াযই সবচেয়ে কর্কষ-অপ্রীতিকর।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ وَ - এবং। اِذْ -যখন। قَالَ -বলেছিলো। لِابْنِهٖ -
তার পুত্রকে। هُوَ -তিনি/সে। يَعِظُهٗ -তাকে উপদেশ দিচ্ছিলো। يٰبُنَىَّ -
হে আমার পুত্র। لَاتُشْرِكْ -শরীক করো না। بِاللّٰهِ -আল্লাহর সাথে। اِنَّ -
নিশ্চয়ই। اَلشِّرْكَ -শিরক করা। لَظُلْمٌ -অব্যশই যুলুম। عَظِيْمٌ -অতি বড়।
وَصَّيْنَا -আমি তাগিদ করেছি। اَلْاِنْسَانَ -মানুষকে। بِوَالِدَيْهِ -তার মাতা
-পিতার সাথে। حَمَلَتْهُ -তাকে (পেটে) বহন করেছে। اُمُّهٗ -তার মা।
وَهْنًا -কষ্টের। عَلٰى -উপর। وَهْنٍ -কষ্ট। فِصٰلُهٗ -তার দুধ ছাড়ানো।
فِىْ -মধ্যে। عَامَيْنِ -দু'বছর। اَنْ -যেন। اشْكُرْ -শুকর করো। لِىْ -
আমার। لِوَالِدَيْكَ -তোমার মা-বাপেরও। اِلَىَّ -আমারই দিকে। اَلْمَصِيْرُ।
-প্রত্যাবর্তন/ফিরে আসা। اِنْ -যদি। جَاهَدٰكَ -তোমাকে চাপ দেয়। اَنْ
-যে। تُشْرِكَ -তুমি শরীক করো। بِىْ -আমার সাথে। مَا -যা। لَيْسَ -
নাই। لَكَ -তোমার কাছে/জন্য। بِهٖ -সে সম্পর্কে। عِلْمٌ -কোন জ্ঞান। فَلَا
-অতএব না। تُطِعْهُمَا -উভয়ের আনুগত্য করবে/মানবে। وَ -তবে।
صَاحِبْهُمَا -উভয়ের সাথে ব্যবহার করবে। فِى الدُّنْيَا -দুনিয়াতে।
مَعْرُوْفًا -উত্তম/ভালভাবে। اِتَّبِعْ -অনুসরণ করবে/মানবে। سَبِيْلَ -পথ।
مَنْ -যে। اَنَابَ -অভিমুখী হয়েছে। اِلَىَّ -আমারই দিকে। ثُمَّ -অতঃপর।
مَرْجِعُكُمْ -তোমাদের প্রত্যাবর্তন হবে/ফিরে আসতে হবে। فَاُنَبِّئُكُمْ -তখন
তোমাদের জানাবো। بِمَا -ঐ বিষয় যা। كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ -তোমরা কাজ
করেছিলে। يٰبُنَىَّ -হে আমার পুত্র। اِنَّهَا -তা নিশ্চয়। اِنْ تَكَ -যদি হয়।
مِثْقَالَ -পরিমান। حَبَّةٍ -দানার। خَرْدَلٍ -সরিষার। فَتَكُنْ -অতঃপর হয়।

صَخْرَةٍ -পাথর খন্ডে। اَوْ -অথবা। فِى السَّمٰوٰتِ -আসমানসমূহের মধ্যে। فِى الْاَرْضِ -যমীনের মধ্যে। يَاْتِ بِهَا -তাকে(বের করে) আনবেন। اِنَّ اللهَ -নিশ্চয়ই আল্লাহ। لَطِيْفٌ -সূক্ষদর্শী। خَبِيْرٌ -খুব অবহিত। اَقِمِ -প্রতিষ্ঠা করো। وَاْمُرْ -এবং নির্দেশ দাও। بِالْمَعْرُوْفِ -সৎ/উত্তম কাজের। وَانْهَ -এবং নিষেধ করো। عَنْ -থেকে। الْمُنْكَرِ -অসৎ কাজ। اِصْبِرْ -সবর করো। مَا اَصَابَكَ -যা তোমার উপর অর্পিত হয়েছে। اِنَّ -নিশ্চয়ই। ذٰلِكَ -ঐটা/এটা। مِنْ -অন্তর্ভুক্ত। الْاُمُوْرِ -কাজসমূহ। لَاتُصَعِّرْ -ফিরাইও না। خَدَّكَ -তোমার মুখ। لِلنَّاسِ -লোকদের থেকে। لَاتَمْشِ -চলো না। فِى الْاَرْضِ -যমীনের উপর। مَرَحًا -গর্বভরে। لَايُحِبُّ -পছন্দ করেন না। كُلَّ -কোন। مُخْتَالٍ -উদ্ধত। فَخُوْرٍ -অহংকারীকে। وَاقْصِدْ -এবং মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো। فِىْ مَشْيِكَ -তোমার চলার ক্ষেত্রে। وَاغْضُضْ -এবং নিচু করো। صَوْتِكَ -তোমার কণ্ঠস্বর/আওয়াজ। اَنْكَرَ -অধীক অপ্রীতিকর/অপছন্দনীয়। الْاَصْوَاتِ -স্বরসমূহের মধ্যে। لَصَوْتُ -অব্যশই স্বর/আওয়াজ। الْحَمِيْرِ -গাধার।

সম্বোধন ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা! আমি আপনাদের সামনে সূরা লুকমানের ১৩ হতে ১৯ নম্বর পর্যন্ত আয়াতসমূহ তিলাওয়াত ও সরল অনুবাদ পেশ করেছি। মহান আল্লাহ আমাকে যেন আপনাদের সামনে তিলওয়াতকৃত আয়াতগুলোর সঠিকভাবে দারস পেশ করার তাওফীক দান করেন। অমা তাওফীকি ইল্লাহবিল্লাহ।

সূরার নামকরণ ঃ এই সূরার দ্বিতীয় রুকুর ১২ নম্বর আয়াতে وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ উল্লেখিত لُقْمٰنَ শব্দটিকে বেছে নিয়ে 'সূরা লুকমান' রাখা হয়েছে। এই সূরার দ্বিতীয় রুকুতে নিজে পুত্রের প্রতি

লুকমান হাকীমের নসীহত ও উপদেশসমূহের উল্লেক করা হয়েছে।এই সম্পর্কের কারণেই এই সূরার নামকরণ করা হয়েছে 'লুকমান'।

সূরাটি নাযিলের সময়কাল ঃ এই সূরার আলোচনা ও বিষয়াদি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে মনে হয়, সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছিলো সেই সময় যখন ইসলামী দাওয়াতকে দমন ও প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে বিরোধীদের পক্ষ থেকে যুলুম ও নির্যাতন শুরু করা হয়েছিলো।এ ছাড়াও আরো অনেক উপায় ও পন্থা গ্রহণ করা হয়েছিলো এই উদ্দেশ্যকে সফল করার লক্ষে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিরোধীতার ঝড় তখনও পুরোমাত্রায় তীব্র ও কঠিন হয়ে উঠেনি। যা এই সূরার ১৪ ও ১৫ নম্বর আয়াত হতে তা স্পষ্ট হয়ে উঠে।

সূরাটির মূল বক্তব্য ঃ শিরক যে একটা অর্থহীন ও অযৌতিক ভিত্তিহীন ব্যাপার এবং তাওহীদই যে একমাত্র সত্য ও যুক্তিসঙ্গত আর্দশ এই সূরাই সেই কথাটিই লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে। আর তাদেরকে দাওয়াত দেয়া হয়েছে যে, বাপ-দাদার অন্ধ অনুকরণ পরিহার করে মুহাম্মদ (সঃ) যে আর্দশ ও শিক্ষা আল্লাহর পক্ষ থেকে পেশ করেছেন সেই কথাটিই তোমরা খোলা মনে চিন্তা ও বিবেচনা করো।

এই প্রসঙ্গে আরও বলা হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর এই দাওয়াত এমন কোন নতুন দাওয়াত নয়। বরং পূর্বের জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক সম্পন্ন লোকেরাও এই কথাই বলতেন, যা আজ হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলছেন। তোমাদের অতীত যুগে নিজেদেরই দেশে জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন লোক ছিলো লুকমান হাকীম। তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধি সম্মত কথা-বার্তায় তোমাদের সমাজেই গল্পের মতো সকলের মুখে মুখে প্রচলন ছিলো। তিনি যেসব আকীদা ও নৈতিক শিক্ষা প্রচার করতেন, তা তোমরা নিজেরাই বিবেচনা করে দেখতে পারো।

তিলাওয়াতকৃত আয়াতসমূহের বিষয়বস্তু ঃ দারসের জন্য তিলাওয়াতকৃত আয়াত দু'টির বিষয়বস্তু হলো-লুকমান হাকীম তাঁর প্রিয় সন্তানকে যেসব নৈতিক ও চারিত্রিক শিক্ষা দিয়েছিলেন তারই বর্ণনা।

ব্যাখ্যা ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা ! এতক্ষণ পর্যন্ত দারসকে পূর্ণভাবে অনুধাবন করার জন্য সূরা লুকমানের কতিপয় প্রাথমিক অথচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনাদের সামনে উল্লেখ

করা হলো। এখন তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর ব্যাখা আপনাদের সামনে পেশ করছি। প্রথম আয়াতে মহান আল্লাহ্ তা'লা লুকমান হাকীম তাঁর স্নেহধন্য পুত্রকে নসীহতের ছলে যেসব কথা বলেছিলেন, তা উল্লেখ করে বলেন -

وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَيَعِظُهٗ يٰبُنَىَّ لَاتُشْرِكْ بِاللّٰهِ ط اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

স্মরণ করো, যখন লুকমান নিজ পুত্রকে নসীহতের ছলে বলেছিলেন, হে পুত্র! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করোনা। প্রকৃত কথা এই যে, শিরক হলো অতি বড় যুলুমের কাজ।

লুকমান কে ? ঃ তিনি হলেন লুকমান ইবনে আনকা ইবনে সুদূন। সুহাইলী (রহঃ) এর বর্ণনা অনুযায়ী জানা যায় যে, তাঁর পিতার নাম ছিলো সা'রান। তিনি নবী ছিলেন কি না এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ ওলামাদের মতে তিনি নবী ছিলেন না; বরং মুত্তাকী, ওলী, এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দাহ্ ছিলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি একজন ক্রীতদাস ও ছুতার (কাঠমিস্ত্রী) ছিলেন। হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব (রহঃ) বলেন যে, তিনি মিশরে বসবাসকারী একজন হাবশী ছিলেন। তাঁকে জ্ঞান দান করা হয়েছিলো, কিন্তু নবুওয়াত দেয়া হয়নি।

হযরত লুকমান সম্পর্কে হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, তিনি ছিলেন বেঁটে, উঁচু নাক ও মোটা ঠোঁট বিশিষ্ট একজন জ্ঞানী ব্যক্তি।

আবদুর রহমান ইবনে হারমালা (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একবার এক কালো বর্ণের হাবশী ক্রীতদাস হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রহঃ) এর নিকট আগমন করে। তাকে তিনি বলেন, তোমার দেহের রং কালো বলে তুমি নিজেকে ঘৃণা করো না। তিনজন লোক, যাঁরা সমস্ত লোক অপেক্ষা উত্তম ছিলেন তারা সবাই কালো বর্ণের ছিলেন। তাদের প্রথম জন হলেন, হযরত বিলাল (রাঃ), যিনি রাসূল (সঃ) এর গোলাম ছিলেন। দ্বিতীয় জন হলেন, হযরত মুহাজ্জা (রাঃ), তিনি ছিলেন হযরত উমর ফারুক (রাঃ) এর

গোলাম। তৃতীয় জন হলেন, হযরত লুকমান হাকীম, যিনি ছিলেন হাবশের একজন সাধারণ অধিবাসী।

হযরত খালিদ বারঈ (রহঃ) বলেন যে, হযরত লুকমান ছিলেন একজন হাবশী ক্রীতদাস ও ছুতার। একবার তাঁর মুনিব তাকে বললেন, তুমি একটি বকরী যবেহ্ করো এবং ওর গোশতের উত্তম দু'টি টুকরা আমার কাছে নিয়ে এসো। তিনি হৃৎপিন্ড ও জিহবা নিয়ে আসলেন। কিছুদিন পর পুনরায় তাঁর মুনিব তাঁকে একই আদেশই করলেন এবং বকরীর গোশতের নিকৃষ্ট দু'টি টুকরা আনতে বললেন। তিনি এবারও উক্ত দু'টি জিনিসই নিয়ে আসলেন। তাঁর মুনিব তাঁকে বললেন, ব্যাপার কি ? এটা কি ধরণের কাজ হলো ? উত্তরে তিনি বললেন, এ দু'টি যখন ভাল থাকে তখন দেহের কোন অঙ্গই এ দু'টির চেয়ে ভাল নয়। আর এ দু'টি জিনিস যখন খারাপ হয়ে যায় তখন সবচেয়ে নিকৃষ্ট জিনিস এ দু'টিই হয়ে থাকে।

হযরত মুজাহীদ (রহঃ) বলেন, হযরত লুকমান নবী ছিলেন না, তিনি একজন সৎলোক ছিলেন। তিনি ছিলেন কালো বর্ণের একজন ক্রীতদাস। তাঁর ঠোঁট ছিলো মোটা এবং পা দু'টি ছিলো মাংসপূর্ণ।

অন্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, তিনি বানী ইসরাঈলের একজন বিচারক ছিলেন। আর একটি উক্তিতে আছে যে, হযরত দাউদ (আঃ) এর যুগে হযরত লুকমান জীবিত ছিলেন। একবার তিনি এক মজলিসে ওয়াজ করছিলেন, তখন একজন রাখাল তাঁকে বলে, তুমি কি ঐ ব্যক্তি নও, যে অমুক অমুক জায়গায় আমার সাথে বকরী চরাতে ? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ ,আমি ঐ ব্যক্তি বটে। রাখালটি তখন তাঁকে প্রশ্ন করে-তাহলে তুমি কি করে এই মর্যাদা লাভ করলে ? জবাবে তিনি বললেন, সত্য কথা বলা এবং বাজে কথা না বলার কারণেই আমি এই মর্যাদা লাভ করেছি। অন্য একটি বর্ণনায় আছে যে, তিনি তার উচ্চ মর্যাদা লাভের কারণ সম্পর্কে বলেন, আমার এই উচ্চ মর্যাদা লাভের কারণ হলো, আল্লাহর অনুগ্রহ, বিশ্বস্ততা,সত্যবাদিতা এবং বাজে কাজ বর্জন করা।

মোট কথা এরূপই পরিস্কার বর্ণনা রয়েছে যে, তিনি নবী ছিলেন না। এসব বর্ণনায় এও রয়েছে যে, তিনি একজন গোলাম ছিলেন।

(ইবনে কাসীর)

হযরত লুকমান হাকীম তার নিজ পুত্রকে যে উত্তম ওয়াজ-নসীহত করেছিলেন তারই বিশদ বর্ণনা দেয়া হয়েছে। মানুষ দুনিয়ায় নিজের সন্তানের ব্যাপারে যতোখানি নিষ্ঠাবান ও স্বার্থবাদ হতে পারে, ততোখানি আর কারো ব্যাপারে হতে পারে না- একথা সর্বজন স্বীকৃত। এক ব্যক্তি অন্যকে ধোঁকা দিতে পারে, তার সাথে মুনাফিকির কথাবার্তা বলতে পারে, কিন্তু একজন অত্যন্ত খারাপ লোকও কখনো নিজের সন্তানকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করতে পারে না। এইজন্য একজন সাধারণ কিন্তু অত্যন্ত জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি লুকমান হাকীম তাঁর স্নেহের ধনকে অতি উত্তম উপদেশই দিবেন, যা দুনিয়া এবং আখিরাত উভয় জগতে সফলতা দান করবে। আর একজন আদর্শ পিতার একজন আদর্শ সন্তানের জন্য এর চেয়ে আর বেশী কিছু উত্তম উপদেশ হতে পারে না। একজন আর্দশ পিতা লুকমান হাকীম তাঁর প্রিয় পুত্রকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা নিম্নে ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করা হলো ঃ

১.প্রথম উপদেশ ঃ يٰبُنَيَّ لَاتُشْرِكْ بِاللهِ হে আমার পুত্র ! তুমি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না।

নিষ্ঠাবান পিতা লুকমান হাকীম তাঁর প্রিয় সন্তানকে প্রথম যে উপদেশ দিয়েছিলেন, সেটি হলো, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করার। এই উপদেশ দ্বারা প্রথমতঃ এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, শিরক একটি নিকৃষ্টতম কাজ। আর এই কারণেই তিনি তার প্রাণাধিক পুত্রকে সর্বপ্রথম ও সবার আগে এই শিরকের গুমরাহী পরিহার করার উপদেশ দিয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ মক্কার কাফিরদের মধ্যে অনেক বাপ-মা নিজের সন্তানকে তখন শিরক এর উপর অবিচল থাকতে এবং হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর তাওহীদের দাওয়াত কবুল না করতে বাধ্য করেছিলো- পরবর্তী আয়াত দ্বারা এ কথাটিই স্পষ্টভাবে জানা যায়। এই কারণে এই অজ্ঞ-মুর্খ লোকদেরকে শুনানো হচ্ছে যে, তোমাদের এই দেশেরই প্রখ্যাত জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিতো নিজের সন্তানের কল্যাণ লাভের উদ্দেশ্যে তাকে শিরক পরিহার করে চলার জন্য নসীহত করেছিলেন। এখন তোমরা যে তোমাদের সন্তানদের শিরক করতে বাধ্য করছো, এর ফলে সন্তানদের কোন কল্যাণ হবে না, বরং এর দ্বারা তাদের জীবনের মহা বিপদ ও অকল্যাণই ডেকে আনবে।

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ নিশ্চয়ই শিরক হচ্ছে অতি বড় যুলুমের কাজ।

এখানে যুলুম শব্দের আসল অর্থ হলো কারো হক বা অধিকারকে নষ্ট করা। ইনসাফের বিপরীত কাজ করা।

শিরককে "যুলুমে আযীম" বিরাট ও মহা যুলুম বলে অভিহিত করা হয়েছে এই কারণে যে,এর দ্বারা কোন এক সত্তাকে সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা ও নি'য়ামত দাতা মহান আল্লাহর সমান করে দাঁড় করায়- যা মানুষের ভোগ সম্ভোগের নি'য়ামত দানের ব্যাপারে যাদের একবিন্দু অংশ নাই, এমনকি একবিন্দু দখলও নাই। প্রকৃতপক্ষে এটা হলো এক মস্তবড় বেইনসাফী, এর চেয়ে বড় বেইনসাফী আর কিছুই হতে পারে না।তাছাড়া মানুষের উপর তার সৃষ্টিকর্তার হক হলো, কেবল তারই পূজা-উপাসনা করা, দাসত্ব-বন্দেগী করা। কিন্তু সে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো শক্তির বন্দেগী করে আল্লাহর এই হক নষ্ট করে।

মানুষের নিজের উপর তার নফসের হক বা অধিকার হলো এই যে, মানুষ তাকে অপমান, লাঞ্ছনা ও আযাবে নিক্ষিপ্ত করবে না। কিন্তু সে যখন তার সৃষ্টিকর্তাকে ত্যাগ করে তারই সৃষ্টির বন্দেগী করে, এতে সে নিজেকে নিজে অপমান ও লাঞ্ছিত করে এবং শাস্তি পাবার যোগ্য বানিয়ে দেয়। এভাবে মুশরিকের গোটা জীবন সর্বাত্মক ও সব সময়ের জন্য যুলুমে পর্যবসিত হয়। তার প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসই যুলুমে ভরে যায়।

দ্বিতীয় উপদেশ ঃ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

আর আমি মানুষকে তার বাপ-মায়ের সাথে ভাল ব্যবহার করার জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে পেটে বহন করেছে। আর দু'টি বছর লেগেছে তাকে দুধ ছাড়াতে। (এই কারণে তাকে) নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার ও তোমার বাপ-মায়ের শুকরিয়া আদায় করো। অবশেষে আমারই নিকট তোমাদের ফিরে আসতে হবে।

আল্লাহর সাথে শিরক না করার উপদেশ দেয়ার পর হযরত লুকমান তাঁর ছেলেকে দ্বিতীয় যে উপদেশ দিচ্ছেন সেটিও গুরুত্বের দিক দিয়ে আল্লাহর পরই তাদের স্থান। অর্থাৎ বাপ-মায়ের সাথে ভাল ব্যবহার করা

ও তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা। যেমন সূরা বানী ইসরাঈলে মহান আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন- وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا "তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না করতে এবং বাপ-মায়ের সাথে ভাল ব্যবহার করতে।"

এই উপদেশের মধ্যে বাপ-মায়ের প্রতি কর্তব্য পালনে এবং তাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে -যে হিকমত এবং অন্তর্নিহিত কারণ রয়েছে তা হলো ঃ

وَهْنٍ – শব্দের অর্থ হলো- শ্রম, কষ্ট, দুর্বলতা ইত্যাদি। এর একটি কষ্টতো হলো حَمْلُ (হামল) বা গর্ভধারণ অবস্থায় যা হয়, তা মা'ই সহ্য করে থাকে। আর দ্বিতীয়ত মা কষ্ট ভোগ করে থাকে সন্তানকে দু'বছর পর্যন্ত দুধ পান করানোর মাধ্যমে।

অর্থাৎ তার মা তাকে ধরাধামে তার আগমন ও অস্তিত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার ও অসীম দুঃখ-কষ্ট বরদাস্ত করেছে। মায়ের এই কষ্টের কথা সন্তানের সামনে এ জন্যেই প্রকাশ করা হচ্ছে যে, যেন সন্তান মায়ের এই মেহেরবানীর কথা স্মরণ করে মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞ হয় এবং আনুগত্য ও ইহ্সান করে। অন্য একটি আয়াতে বাপ-মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ দোয়া-প্রর্থনার বাণী শিখিয়ে দিয়ে বলেন-

وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِىْ صَغِيْرًا "আর বলো- হে আমার রব! তুমি তাদের দু'জনের (বাপ-মায়ের) প্রতি দয়া করো যেভাবে তারা আমার (দয়া-মায়া দিয়ে) শিশুকালে আমাকে লালন-পালন করেছিলো"।

(বানী ইসরাঈল-২৪)

আয়াতের শেষাংশে মহান আল্লাহ্ বলেন–

اَنِ اشْكُرْلِى وَلِوَالِدَيْكَ ط اِلَىَّ الْمَصِيْرُ **আমার প্রতি ও তোমার বাপ-মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞ হও। তোমাদেরতো আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে।** সুতরাং যদি তোমরা আমার এই আদেশ মেনে নাও, তাহলে আমি তোমাদেরকে এর পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করবো।

অতপর পরবর্তী আয়াতে বাপ- মায়ের আনুগত্যের সীমা নির্ধারণ করে

দিয়ে আল্লাহ্ বলেন–

وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَالَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَىَّ ج

তোমার বাপ-মা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সাথে শরীক করতে যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তা হলে তুমি তাদের কথা মানবে না, তবে দুনিয়াতে তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে এবং যে আমার পথে চলবে, তুমি তার পথ অনুসরণ করবে।

এই আয়াতে মহান আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যদি তোমার বাপ-মা আল্লাহ্র অংশীদার বা সমকক্ষ দাঁড় করাতে বাধ্য করার চেষ্টা করে, তখন আল্লাহ্র নির্দেশ হলো, তাদের কথা শুনাও যাবে না মানাও যাবে না।

এমতাবস্থায় মানুষ সাধারণতঃ সীমার মধ্যে স্থীর থাকতে পারে না। আল্লাহ্র এই নির্দেশ পালন করতে গিয়ে সন্তানের পক্ষ থেকে বাপ-মায়ের প্রতি কষ্টকর কথা বলা ও অশোভন আচারণ করে তাদেরকে অপমানিত করার বেশ সম্ভাবনা ছিলো। কিন্তু ইসলাম ন্যায়-নীতির জ্বলন্ত প্রতীক প্রত্যেক জিনিসেরই একটা সীমা আছে। তাই অংশী স্থাপন বা সমকক্ষ বানানোর ক্ষেত্রে বাপ-মায়ের অনুসরণ না করার নির্দেশের সাথে সাথে হুকুম দেয়া হয়েছে যে-

وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا 'তাদের (বাপ-মায়ের) সাথে দুনিয়াই ভাল ব্যবহার করবে।'

অর্থাৎ দ্বীনের বিরুদ্ধে তো তাদের কথা মানবে না, কিন্তু দুনিয়ার কাজকর্ম যেমন-শারীরিক সেবাযত্ন বা ধনসম্পদ ব্যয় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যেন ঘাটতি না থাকে। তাদের সাথে যেন বেআদবী ও অশালীন আচরণ করা না হয়। তাদের কথাবার্তায় এমনভাবে উত্তর দিবে না, যাতে তারা মনে কষ্ট পায়। মোট কথা, শিরক-কুফরীর ক্ষেত্রে তাদের কথা না মানার কারণে যে মর্মপীড়ার সৃষ্টি হবে,তা তো অপারোগতার কারণে বরদাস্ত করবে, কিন্তু প্রয়োজনকে তার সীমার মধ্যে রাখতে হবে। আর অন্যান্য পার্থিব লেনদেন, আচার-আচারণে যেন মনোকষ্টের কারণ না ঘটে সে সম্পর্কেও সচেতন থাকতে হবে।

হযরত সা'দ ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন যে, এ আয়াতটি আমারই ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। আমি আমার মায়ের খুবই খিদমত করতাম এবং তাঁর পূর্ণ অনুগত থাকতাম। আল্লাহ্ তা'লা যখন আমাকে হিদায়াত দান করলেন তখন আমার মা আমার প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট হয়ে গেল। সে আমাকে বললো, তুমি এই নতুন দ্বীন কোথায় পেলে ? জেনে রেখো, আমি তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি যে, এই দ্বীন তোমাকে অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে, না হলে আমি খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিবো। আর এভাবে না খেয়ে আমি মারা যাবো। কিন্তু তার কথায় আমি ইসলাম ত্যাগ করলাম না। ফলে আমার মা খানাপিনা বন্ধ করে দিলো। এতে চারদিক থেকে আমার দুর্ণাম ছড়িয়ে পড়লো যে, আমি আমার মায়ের হত্যাকারী। এতে আমার মন খুবই ছোট হয়ে গেল। আমি আমার মায়ের কাছে হাযির হলাম, তাকে বুঝালাম এবং অনুনয় বিনয় করলাম যে, তুমি তোমার এই হঠকারিতা থেকে বিরত হও। আর জেনে রেখো যে, এই সত্য দ্বীন থেকে ফিরে আসা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এভাবে আমার মায়ের তিন দিন চলে গেল এবং তার শারীরিক অবস্থা অনেক শোচনীয় হয়ে গেল। আমি তার কাছে পুনরায় গেলাম এবং বললাম, আম্মা! জেনে রেখো যে, তুমি আমার নিকট আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়,কিন্তু তাই বলে তুমি আমার কাছে দ্বীনের চেয়ে প্রিয় নও। আল্লাহর কসম! তোমার একটি জীবন কেন, তোমার মতো একশতটি জীবনও যদি ক্ষুধায় ও পিপাসায় কাতর হয়ে এক এক করে সবই বেরিয়ে যায়, তবুও শেষ মূহূর্ত পর্যন্ত আমি এই দ্বীন ইসলামকে পরিত্যাগ করবো না। আমার এই কথায় আমার মা নিরাশ হয়ে খাওয়া-দাওয়া শুরু করে দিলো। (তিবরানী-ইবনে কাসীর)

অতঃপর আয়াতের শেষাংশে মহান আল্লাহ্ বলেন-

ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

পরিশেষে তোমাদেরকে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবো, তোমরা কি রকম আ'মল করতেছিলে।

অর্থাৎ একদিকে সকল প্রকার পীড়াপিড়ি ও জবরদস্তিকে উপেক্ষা করে শিরক ও কুফরী থেকে বিরত থাকা, অপরদিকে বাপ-মায়ের সাথে পার্থিব জীবনে ভাল ও শোভনীয় আচরণ করা এবং বেয়াদবী না করার বিষয়ে

তোমরা কে কতটুকু ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে পেরেছো তা মৃত্যুর পর বিচারের দিনে যখন তোমরা আমার নিকট ফিরে আসবে তখন আমি তোমাদেরকে তা পূর্ণভাবে অবহিত করবো।

তৃতীয় উপদেশ ঃ يٰبُنَيَّ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِى السَّمٰوٰتِ اَوْ فِى الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ

হে পুত্র! কোন জিনিস যদি সরিষা দানার মতও হয়। অতঃপর তা যদি কোন পাথর খন্ডে অথবা আকাশে কিংবা ভূ-গর্ভে লুকিয়ে থাকে, তবে তাও আল্লাহ্ তাকে বের করে আনবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা সব বিষয়ে সূক্ষদর্শী ও সব বিষয়ে খবর রাখেন।

এখানে লুকমান হাকীম তাঁর সন্তানকে আরও উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, হে আমার প্রিয় সন্তান! এই বিষয়ে অটুট বিশ্বাস রাখবে যে, আসমান ও যমীনে এবং এর মাঝে যা কিছু আছে, এর প্রতিটি বিন্দুকণা মহান আল্লাহর অসীম জ্ঞানের আওতাধীন এবং সবকিছুর উপর তার পূর্ণ ক্ষমতা ও আধিপত্য রয়েছে। যতো প্রকার অন্যায় কাজ, যুলুম ও ভুল-ভ্রান্তি ইত্যাদি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র হোক না কেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'লা অবশ্যই তা উপস্থিত করবেন। মীযানে তা ওযন করা হবে এবং তার প্রতিফল দেয়া হবে। যেমন মহান আল্লাহ পাক অন্য জায়গায় বলেন-

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا

"আমি (কিয়ামতের দিন) ইনসাফের দাঁড়িপালা রেখে দিবো, সুতরাং কোন নফসের প্রতি বিন্দুমাত্র যুলুম করা হবে না।" (সূরা আম্বিয়া-৪৭)

অন্য সূরায় বলা হয়েছে-

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ

"কেউ অণু-পরমাণু পরিমাণ সৎ কাজ করলে তা দেখবে এবং অণু-পরমাণু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে তাও দেখবে।" (সূরা যিলযাল-৭-৮)

সেই নেকী কিংবা বদী কোন বাড়ীতে, কোন অট্টালিকায়, কোন দূর্গে, কোন পাথর খন্ডের মধ্যে, আসমানের উপরে, যমীনের নীচে, মোটকথা যেখানেই করা হোক না কেন আল্লাহ তা'লার কাছে তা গোপন থাকে না। মহান আল্লাহ তা পেশ করবেনই। তিনি সূক্ষ্মদর্শী, তিনি সব বিষয়ের

খবর রাখেন। ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর জিনিসও তাঁর কাছে অপ্রকাশিত থাকে না। অন্ধকার রাতে পীপিলিকা চলতে থাকলেও তিনি তাঁর পায়ের শব্দ শুনতে পান।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যদি তোমাদের মধ্য হতে কোন লোক এমন পাথরের মধ্যেও কোন আ'মল করে যার কোন দরজা-জানালা নেই ও কোন ছিদ্রও নেই, তবুও আল্লাহ তা'লা তা জনগণের সামনে ফাঁস করে দিবেন, সেই আ'মল ভালই হোক আর মন্দই হোক না কেন।

(ইবনে কাসীর)

চতুর্থ উপদেশ ঃ يٰبُنَىَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ **হে আমার সন্তান! তুমি নামায প্রতিষ্ঠা করবে।**

অর্থাৎ হে আমার পুত্র করণীয় কাজ তো অনেক। তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো নামায প্রতিষ্ঠা করা, এটা গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে অন্যান্য কার্মের পরিশুদ্ধির কারণ এবং মাধ্যমও বটে। যেমন নামায সম্পর্কে বলা হয়েছে- اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
"নিশ্চয়ই নামায যাবতীয় অশীল ও গর্হিত কাজ থেকে বাচিঁয়ে রাখে।"

(সূরা আনকাবুত-৪৫)

এজন্য অবশ্য করণীয় সৎ কাজগুলোর মধ্য হতে শুধু নামাযের বর্ণনা দিয়েই যথেষ্ঠ করেছেন।

يٰبُنَىَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ "হে বৎস! নামায প্রতিষ্ঠা করো। এই নামায প্রতিষ্ঠা অর্থ কেবল নামায পড়ে নেয়াই যথেষ্ঠ নয়, বরং নামায়ের বাইরের এবং ভিতরের কাজসমূহ পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করা। যেমন, শরীর পবিত্রের জন্য প্রয়োজনে পূর্ণভাবে গোসল করে নেয়া, না হলে অযুর অংগগুলো পরিপূর্ণভাবে ধৌত করা, যথাসময়ে এবং পূর্ণ খুশু-খূযুর সাথে নামায আদায় করা এবং এর উপর স্থায়ী ও দৃঢ থাকা ইত্যাদি সবই নামায প্রতিষ্ঠার মধ্যে গণ্য।

পঞ্চম উপদেশ ঃ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ **ভাল কাজের আদেশ দিবে এবং মন্দ ও খারাপ কাজে নিষেধ করবে ।**

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। ব্যক্তির সাথে সাথে সামাজিক জীবনের সংশোধন ও জীবনব্যবস্থা প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ অংগ। এজন্য নামাযের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ করণীয় কাজের সাথে সাথেই সৎ ও নেক কাজের আদেশ এবং অন্যায় ও অসৎ কাজে বাধা দেয়াকে অবশ্য করণীয় কর্তব্যের বর্ণনাও দেয়া হয়েছে। নামাযের পরেই সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধের এই সমাজ সংশোধনী নির্দেশনা আল কুরআনের অন্যান্য জায়গায়ও উল্লেখ্য করা হয়েছে।

ষষ্ঠ উপদেশ ঃ وَاصْبِرْ عَلٰى مَآاَصَابَكَ ط اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ

আর বিপদাপদে ধৈর্য্যধারণ করবে। নিশ্চয়ই এটা করা সাহসিকতার কাজ।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সমাজ সংশোধনের জন্য সৎ কাজে আদেশ এবং অসৎ কাজে বাধা সৃষ্টি করতে যাবে, তখন তার উপর বিপদ মুসিবত ধেয়ে আসবে। এই ধরণের লোকদের পিছনে দুনিয়া একেবারে আদা-নুন খেয়ে লেগে যাবে এবং সব ধরনের কষ্ট ও উৎপিড়ন তাকে পরিবেষ্টিত করে নিবে।

اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ

"নিশ্চয়ই এটা করা সাহসিকতার কাজ।" অর্থাৎ এটা করা অতি বড় দুঃসাহসের কাজ। কেননা ব্যক্তি সংশোধন আর জনগণকে সংশোধন করা ভিন্ন কাজ। জনগণকে সংশোধনের কাজ করার জন্য চেষ্টায় লেগে যাওয়া এবং এ পর্যায়ে যেসব অসুবিধা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে তার মুকাবিলা করা কোন কাপুরুষের কিংবা কম সাহসের লোকদের পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। এটা সেই শ্রেণীর লোকদের কাজ, যা করার জন্য খুব চওড়া বুকের পাটার প্রয়োজন রয়েছে।

সপ্তম উপদেশ ঃ وَلَاتُصَعِّرْخَدَّكَ لِلنَّاسِ **আর তুমি অহংকার বসে মানুষের দিক হতে মুখ ফিরে কথা বলবে না।**

এখানে লুকমান হাকীম তাঁর প্রিয় পুত্রকে উপদেশ দিচ্ছেন গর্ব-অহংকার পরিহার করার জন্য। অর্থাৎ হে আমার পুত্র! অহংকার বশে তুমি মানুষের দিক হতে মুখ ফিরে কথা বলো না। তাদেরকে নিকৃষ্ট এবং নিজেকে খুব বড় মনে করো না।

মূল শব্দ হলো لاتُصَعِّرْخَدَّكَ لِلنَّاس আরবী ভাষায় صَعَرٌ একটি রোগের নাম। এই রোগটি উটের গলায় হয়ে থাকে বিধায় উট সবসময় একদিকেই মুখ ফিরিয়ে রাখতে বাধ্য হয়।

আরবী ভাষায় বলা হয় فُلاَنٌ صُعِّرَخَدَّكَ "অমুক ব্যক্তি উটের মতো নিজের গলা ফিরিয়ে নিয়েছে।" অর্থাৎ অহংকারীর ন্যায় আচরণ করেছে এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। অতএব হে আমার পুত্র! তুমি মানুষের সাথে কথা বলার সময় অহংকারীর ন্যায় মুখ ফিরে কথা বলো না। বরং সামনে ফিরে হাসিমুখে কথা বলবে। হাদীস শরীফে এসেছে-"নবী করীম (সঃ) বলেছেন, তুমি সকল মুসলিম ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে কথা বলবে। হাসিমুখে কথা বলাও একটা সদকা বা নেকীর কাজ।"

অষ্টম উপদেশ ঃ وَلاَتَمْشِ فِى الاَرْضِ مَرَحًا -আর তুমি যমীনের উপর গর্বভরে চলাফেরা করবে না।

অর্থাৎ লুকমান হাকীম তার সন্তানকে লক্ষ্য করে উপদেশ দিচ্ছেন যে, হে প্রিয় বৎস! তুমি দুনিয়াতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না। কারণ, আল্লাহ কোন উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না। مَرَحًا শব্দের অর্থ গর্বভরে উদ্ধত্যের সাথে চলাফেরা করা। নিজেকে খুব বড় মনে করা এবং অন্যসবকে তুচ্ছ জ্ঞান করা।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সামনে একবার অহংকারের কথা উল্লেখ করা হলে তিনি তার খুবই নিন্দা করলেন এবং বললেন যে, এরূপ আত্মম্ভরী ও অহংকারীর প্রতি আল্লাহ খুবই রাগান্বিত হন। তখন জনৈক একজন সাহাবী (রাঃ) জানতে চাইলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি যখন কাপড় সাফ করি এবং তা খুব পরিস্কার হয়, তখন আমার খুব ভাল লাগে। অনুরূপভাবে ভালো চামড়ার জুতা পায়ে দিলে মন খুব আনন্দিত হয়। লাঠির সুন্দর আচ্ছাদনীও মনের মধ্যে আনন্দ দেয়, তাহলে এটা কি অহংকার হবে ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, না, এটা অহংকার নয়। বরং অহংকার হলো ওটাই যে, তুমি সত্যকে ঘৃণা করবে এবং মানুষকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্ল করবে। (ইবনে কাসীর)

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে- إِنَّ اللهَ لاَيُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ
নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না।

মূল শব্দ হলো- مُخْتَالٍ এবং فَخُوْرٍ । مُخْتَالٍ (মুখতাল) বলতে বুঝায় এমন ব্যক্তিকে, যে নিজেকে খুব বড় মনে করে। আর فَخُوْر (ফাখুর) বলা হয় তাকে, যে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব অন্য লোকদের সামনে প্রকাশ করে। নিজের চলনে-বলনে, আদানে-প্রদানে বড়মানুষী। ভাব দেখায় অহংকার ও দাম্ভিকতার প্রকাশ ঠিক তখনই পাওয়া যেতে পারে, যখন তার মন-মগজে অহংকারী ভাবধারা কানায় কানায় ভরে যায় এবং অন্য লোকদেরকেও তা অনুভব করাতে ইচ্ছা করে।

দাম্ভিক ও অহংকারীরা আল্লাহর ভালবাসা লাভ করতে পারে না। তাদের সর্ম্পকে মহান আল্লাহ তা'লা অন্য এক আয়াতে বলেন -

وَلاَتَمْشِ فِىالاَرْضِ مَرَحًا اَنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الاَرْضَ وَلَنْ تَبلُغَ الْجِبَالَ طُوْلاً

তুমি যমীনে দম্ভভরে চলাফেরা করো না, যেহেতু তুমি না যমীন ধ্বংস করতে পারবে, আর না পাহাড়ের চূড়ায় পৌছতে পারবে।

(সূরা বানী ইসরাঈল-৩৭)

নবম উপদেশ ঃ وَاقْصِدْ فِىْمَشْيِكَ **-এবং নিজের চাল-চলনে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো।**

কোন কোন মুফাসসীর এর অর্থ গ্রহণ করেছেন, খুব দ্রুতও চলিও না, আর খুব ধীরেও নয়। বরং মাঝামাঝি ধরণে চলো। কিন্তু পূর্বাপর বক্তব্যের আলোকে পরিস্কার মনে হয় যে, গতির দ্রুততা বা ধীরতা এখানে আলোচ্য বিষয় নয়। প্রয়োজনে মানুষকেতো দ্রুতও চলতে হতে পারে, আবার প্রয়োজনে আসতেও চলতে হতে পারে। আসলে এখানে লুকমান হাকীমের এই উপদেশের লক্ষ্যই হচ্ছে মন-মানসিকতার সংশোধন, যার ফলে চাল-চলনে অহংকার বা মিসকিনী ভাব প্রকাশ পেয়ে না যায়।

শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার অন্তরে বর্তমান থাকলে, তাতে অবশ্যই এক বিশেষ ধরণেরই চাল-চলন প্রকাশিত হবে। তা দেখে মানুষের অহংকারে

নিমজ্জিত হবার কথাই শুধু জানতে পারা যাবে না, বরং চাল-চলনে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যাবে যে, সে কোন ধরণের অহংকারে নিমজ্জিত। ধন-সম্পদ, ক্ষমতা-আধিপত্য, রূপ-সৌন্দর্য, বিদ্যা-বুদ্ধি ও শক্তি-সামর্থ্য এবং এ ধরণের অন্যান্য জিনিসই মানুষের মধ্যে অহংকারের সৃষ্টি করে। এর প্রত্যেক ধরণের অহংকারই এক বিশেষ ধরণের চাল-চলন সৃষ্টি করে।

পক্ষান্তরে চাল-চলনে মিসকিনী ভাবও কোন না কোন ঘৃণ্য মানসিকতার ফলে হয়ে থাকে। মানুষের মনের গোপন অহংকার এক ধরণের দেখানো বিনয় ও বাহ্যিক দরবেশী ভাব প্রকাশ করে। আর এই জিনিস তার চাল-চলন হতেও প্রকাশ পায়। আবার কখনো মানুষ বাস্তাবিকই দুনিয়া ও উহার অবস্থার নিকট পরাজিত হয়ে এবং নিজের কাছেই নিজে ছোট হয়ে গিয়ে এক ধরণের মরা মানুষী চালে চলতে শুরু করে দেয়। লুকমান হাকীমের উপদেশের লক্ষ্যই হলো, তোমরা নিজের নফসের এসব ভাবধারা দূর করো এবং একজন সাদাসিধে ভদ্র ও বিজ্ঞ মানুষের মতো চলাফেরা করো, যেন তোমার চরিত্রে অহংকার, গর্ব ও বড় মানুষীর লক্ষণ দেখা না যায়, যেন মরা মানুষের মতো অবস্থা দেখা না যায় এবং যেন রিয়াকারী ও দেখানোপনার পরহেযগারী এবং আল্লাহ পরস্তীর ভাব প্রকাশিত না হয়।

এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের রুচি ছিলো, যা একটি ঘটনা থেকেই প্রমাণিত হয়। "হযরত উমরে ফারুক (রাঃ) একবার এক ব্যক্তিকে মাথা নতো করে চলতে দেখে-তিনি তাকে ডেকে বললেন, মাথা তুলে চলো। ইসলাম কোন রুগী নয়। অপর এক ব্যক্তিকে তিনি মরা মানুষের মতো চলতে দেখে বললেন, হে যালিম, তুমি আমাদের দ্বীনকে মেরে ফেলছো কেন?

এই দু'টি ঘটনা হতে জানা যায় যে, হযরত উমর (রাঃ) এর মতে দ্বীনদারীর অর্থ এই নয় যে, মানুষ রোগা ব্যক্তির মতো থেমে থেমে চলবে।আর শুধু শুধু মিসকীন হয়ে থাকবে। কোন মুসলমানকে এরূপ চলতে দেখলে তিনি মনে করতেন, এরূপ চাল-চলন অন্য মানুষের সামনে ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হবে এবং স্বয়ং মুসলমানদের মনেও হীনমন্যতার ভাব জাগিয়ে তুলবে।

একবার হযরত আয়িশাও (রাঃ) এমনি একটি ঘটনার মুখোমুখি হয়েছিলেন। তিনি দেখলেন, এক ব্যক্তি খুব কাতর হয়ে চলাফিরা করছে।

জিজ্ঞেস করা হলো, এই ব্যক্তির কি হয়েছে ? তাকে বলা হলো এই ব্যক্তি একজন ক্বারী। এটা শুনে হযরত আয়িশা (রাঃ) বললেন, উমর তো ছিলেন সব ক্বারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ক্বারী। কিন্তু তিনি যখন চলাফেরা করতের তখন জোরের সাতে চলতেন, যখন কথা বলতেন তখন শক্তির পরিচয় দিতেন। আর যখন কাউকে পিটাতেন তখন বেদম মার মারতেন। (তাফহীমুল কুরআন)

দশম উপদেশ ঃ

وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ط اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ

আর তোমরা কণ্ঠস্বর নিচু রাখবে। নিঃসন্দেহে গাধার আওয়াযই সবচেয়ে কর্কষ-অপ্রীতিকর।

অর্থাৎ তার অর্থ এই নয় যে, মানুষ সবসময় খুব আস্তে আস্তে কথা বলবে, জোরের সাথে মোটেই কথা বলবে না। বরং এখানে গাধার আওয়াযের সাথে তুলনা করে ঠিক কোন ধরনের আওয়ায ও টোনে কথা বলা নিষেধ তা স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে। টোন ও কণ্ঠস্বও উচু বা নীচু , শক্ত বা নরম হওয়ার একটা অবস্থা হলো নিতান্ত স্বাভাবিক ও প্রকৃত প্রয়োজন ভিত্তিক। নিকটবর্তী লোক বা অল্প সংখ্যক লোকের সাথে কথা বলতে হলে স্বাভাবিকভাবে নীচু স্বরেই কথা বলতে হবে। আর দূরের লোক বা বেশী লোকের সাথে কথা বলতে হলে জোরের সাথে উচ্চ স্বরেই বলতে হবে। স্থান ও অবস্থা ভেদে গলার আওয়ায পার্থক্য হতে বাধ্য। যেমন প্রশংসার টোন এক রকম, আর ঘৃণা প্রকাশের টোন হবে অন্য রকম। অনুরূপভাবে সন্তুষ্টি প্রকাশের টোন হবে এক প্রকৃতির, আর অসন্তুষ্টি প্রকাশের টোন হবে অন্য প্রকৃতির, এটা তো স্বাভাবিক ব্যাপার। এতে, কোন আপত্তি থাকতেও পারে না। আর এই পার্থক্য খতম করে দিয়ে সবক্ষেত্রে ও সকল অবস্থায় নরম সূর ও নিম্নমানের ভংগিই গ্রহণ করতে হবে, হযরত লুকমানের কথার উদ্দেশ্য কিন্তু তা নয়। আপত্তির বিষয় হলো শুধু অহংকার প্রকাশের। মানুষকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলার জন্য গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে কথা বলায় হলো প্রকৃত আপত্তি। (তাফহীমুল কুরআন)

শিক্ষা ঃ প্রিয় ভাইয়েরা/ বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা লুকমান হাকীম তাঁর প্রিয় পুত্রকে উপদেশছলে দুনিয়াবাসীকে শিক্ষা দেয়ার জন্য যেসব আদর্শিক ও নৈতিক নসিহত করেছেন তা সূরা লুকমানের

১৩ থেকে ১৯ নম্বর আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখায় পেশ করা হলো। এখন সেখান থেকে আমাদের জন্য কি কি শিক্ষণীয় রয়েছে তা নিম্নে আলোকপাত করা হলো –

■ হযরত লুকমান হাকীমের এ উপদেশগুলো অত্যন্ত উপকারী ও কল্যাণকর বলেই মহান আল্লাহ কুরআনুল কারীমে এগুলো বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া তার আরো বহু জ্ঞানগর্ভ উক্তি ও উপদেশ বর্ণিত আছে। হযরত লুকমান হাকীম তাঁর নিজ পুত্রকে যেসব উপদেশ দিয়েছিলেন, ইবনে আবিদ (রহঃ) এই উপদেশের উপর একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। সুতরাং আমরা এই সূরা থেকে লুকমান হাকীমের যেসব নসীহত জানতে পারলাম, তা প্রত্যেক আদর্শ পিতারই উচিত হবে নিজ নিজ সন্তানকে এসব আদর্শবাদী উপদেশ দেয়া,নিজে আমল করা এবং সন্তানকেও আমল করানো।

■ প্রথম উপদেশ হিসেবে আমরা জানতে পারলাম, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করা। কোন কিছুরই বিনিময়ে তাঁর সমকক্ষ এবং প্রতিদ্বন্দী স্থীর না করা। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বিধি-বিধানকে গ্রহণ না করা। রিযিকদাতা হিসেবেও তাকে মান্য করা এবং মঙ্গল-অমঙ্গলের মালিক হিসেবে আল্লাহকেই জানা। অর্থাৎ ব্যক্তি, পরিবার,সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে না মানা। এমনকি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন শক্তি কিছু করতে পারে তা মনে-প্রাণে বিশ্বাস না করা।

■ বাপ-মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার করা, তাদের খিদমত করা, তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখানো,বৃদ্ধ অবস্থায় পেলে তাদের আরো বেশী খিদমত করা, এমন কোন আচরণ না করা যাতে তারা প্রকাশ্যে না হলেও অজান্তে মনের মধ্যে কষ্ট অনুভব করে। বিশেষ করে মায়ের প্রতি বিশেষ যত্নবান হওয়া। কেননা, তারা কষ্টের উপর কষ্ট সহ্য করে আমাদের পেটে ধারণ করেছে। তারপর সন্তান ভূমিষ্টের সময়ও যে কষ্ট অনুভব করেছে তা একমাত্র সন্তান ভূমিষ্টকারী মা ছাড়া আর কেউ সেই কষ্ট অনুভব করতে পারে না।সন্তানকে ভুমিষ্ট করার পর দীর্ঘ দুই বছর যাবত কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করে দুধ পান করিয়েছে। এসব কষ্টের কথা স্মরণ করে আন্তরিকতা ও সহানুভূতির মাত্রা বাড়িয়ে দেয়া।

■ বাপ-মায়ের আনুগত্য শুধু মা'রুফ কাজে। আল্লাহ্ যা নিষেধ করেছেন এমন কোন কাজ করতে যদি তারা নির্দেশ দেয়, তা হলে অত্যন্ত দরদভরা মন দিয়ে বাপ-মায়ের এই নির্দেশকে উপেক্ষা করা। বিশেষ করে শিরক ও কুফরীর ব্যাপারে আরো বেশী সতর্ক-সাবধান থাকতে হবে। কোনভাবেই এক্ষেত্রে মা-বাবার কথা শোনা যাবে না। তবে বাপ-মায়ের এ কথা অমান্য করতে যেয়ে যেন কোন ভাবেই তাদের সাথে অসাদাচরণ করা না হয়। তারা শিরক ও কুফরী করতে যতই চাপাচাপি, পিড়াপিড়ি করুক না কেন এক্ষেত্রে তাদের বুঝিয়ে-শুনিয়ে তা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করতে হবে। তবে কোন ভাবেই তারা কষ্ট পাই এমন আচরণ করা যাবে না। দুনিয়ার সকল প্রকার খিদমত অব্যাহত রাখতে হবে। বরং আল্লাহর নিদের্শকে অগ্রাধিকার দেয়ার জন্য স্বাভাবিকের চেয়ে আরো বেশী বেশী তাদের খিদমত করতে হবে।

■ ভাল কাজ কিংবা মন্দ কাজ তা যতো ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হোক না কেন, আর তা যদি পাথর খন্ডের মধ্যে লুকিয়েও রাখা হয় অথবা আকাশে কিংবা যমীনের নিচেও রাখা হয়, তবুও আল্লাহ্ তা'লা কিয়ামতের দিন তা হাজির করে সামনে উপস্থাপন করবেন। এটা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করা।

■ যথাযত নিয়ম ও পদ্ধতিতে সালাত আদায় করা। যেনতেন ভাবে সালাত আদায় করলেই হবে না, বরং পূর্ণ হক আদায় করে সালাত আদায় করতে হবে। যেমন গোসল ও অযুর মাধ্যমে পাকসাফ হতে হবে, সময় মতো সালাত আদায় করতে হবে, খুশু-খযু ও বিনয়ের সাথে ধীরস্থীরভাবে সালাত আদায় করতে হবে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সালাত প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করা।

■ ভাল ও নেক কাজ যেমন নিজে করতে হবে, তেমনিভাবে সমাজের অন্যদেরকেও তা করার আদেশ দিতে হবে।পক্ষান্তরে অন্যায় ও গুনাহর কাজ যেমন নিজে পরিহার করে চলতে হবে, তেমনি সমাজের আর অন্যান্য লোকদেরকেও তা পরিহার করে চলার জন্য নির্দেশ দিতে হবে।

■ ভাল ও নেক কাজের আদেশ এবং অন্যায় ও গুনাহর কাজে নিষেধ করতে গেলেই যেসব বাধা এবং বিপদ-আপদ ধেয়ে আসবে, ধৈর্যের সাথে তা মুকাবিলা করে সেসব কাজ অব্যাহত রাখতে হবে। এটা

অবধারিত যে, যখনই কোন মুমিন নেক কাজের আদেশ এবং গুনাহ্র কাজে বাঁধা সৃষ্টি করবে তখনই গোটা দুনিয়া তার বিপক্ষে দাঁড়িয়ে যাবে, সেই মূহুর্তে পাহাড়ের মতো অবিচল ও আটল থেকে এই ভাল কাজের উপর ধৈর্যের সাথে টিকে থাকতে হবে।

■ ছোট হোক কিংবা বড় হোক, কালো হোক কিংবা ফর্সা হোক, ধনী হোক কিংবা গরীব হোক সকল মানুষের সাথে হাঁসিমুখে কথা বলতে হবে। অবজ্ঞাভরে মুখ ঘুরে কথা বলা থেকে বিরত থাকতে হবে।

■ অহংকারের সাথে দুনিয়ায় চলাফেরা করা যাবে না, বরং স্বাভাবিক ভাবে চলাফেরা করতে হবে। কেননা, আল্লাহ্ কোন অহংকারী দাম্ভিককে মোটেই পছন্দ করেন না।

■ দুনিয়াতে না উদ্ধতভাবে পদচারনা করবে, না মিসকিনী ভাব নিয়ে চলাফেরা করবে, বরং স্বাভাবিক গতিতে চলাফেরা করবে। প্রয়োজনে দ্রুতও চলা যাবে, আবার প্রয়োজনে আস্তেও চলা যাবে, তবে কোন ভাবেই যেন তা আটিফিসিয়ালি পরহেজগারীতায় রূপ না নেই। বরং একজন মু'মিন বলিষ্ঠতার সাথে চলাফেরা করবে।

■ কথা বলার সময় উচ্চ-বাচ্চ করা যাবে না। চেচামেচি করে কথা বলাও যাবে না, বরং বলিষ্ঠ কণ্ঠে কথা বলতে হবে। গাধার আওয়াযে কর্কষ ভাষায় কথা বলা যাবে না। কেননা, আওয়াযের মধ্যে সবচেয়ে বেশী কর্কষ অপ্রীতিকর এবং বিরক্তিকর আওয়াযই হলো গাধার আওয়ায।

আহ্বান ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা লুকমানের ১৩ থেকে ১৯ নম্বর আয়াত পর্যন্ত যে দারস পেশ করলাম, এতে যদি আমার অজান্তে এবং অজ্ঞাতে কোন ভুল ত্রুটি হয়ে যায় তার জন্য আমি মহান আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর এই দারস থেকে আমরা যেসব শিক্ষা লাভ করলাম, তা যেন বাস্তবে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনে আ'মল করতে পারি সেই তাওফীক কামনা করে আমি আমার দারস শেষ করছি। "অমা তাওফীকী ইল্লাহবিল্লাহ।"

চার

সুখে-দুঃখে সকল অবস্থায় ভারসাম্যপূর্ণ জীবন-যাপন করা। প্রাপকের হক বুঝিয়ে দেয়া। সূদ নয় বরং যাকাতই সম্পদ বৃদ্ধি করে। স্থল ও জ্বলের বিপর্যয় মানুষেরই অর্জিত ফল।

সূরা রূম-৩০

আয়াত-৩৩-৪২

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ كَفٰى وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَاِذَامَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُّنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَآ
اَذَاقَهُمْ مِّنْهُ رَحْمَةً اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ ○
لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ط فَتَمَتَّعُوْا فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ○ اَمْ اَنْزَلْنَا
عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَاكَانُوْا بِهٖ يُشْرِكُوْنَ ○ وَاِذَآ
اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوْا بِهَا ط وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا
قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ اِذَاهُمْ يَقْنَطُوْنَ ○ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللهَ
يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ
لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○ فَاٰتِ ذَاالْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ

السَّبِيْلِ ط ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللهِ ز وَاُولٰئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا فِىْ اَمْوَالِ
النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللهِ ج وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُ
وْنَ وَجْهَ اللهِ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ○ اَللهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ
ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ط هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ
مَّنْ يَّفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِّنْ شَيْءٍ ط سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِ
كُوْنَ ○ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى
النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِىْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ○
قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلُ ط كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِيْنَ ○

সরল অনুবাদ ঃ ইরশাদ হচ্ছে-(৩৩) লোকদের অবস্থা হলো এই যে, যখন তারা কোন দুঃখ-কষ্টের মধ্যে পড়ে, তখন তারা তাদের রব এর অনুগত হয়ে তাকে ডাকে। অতঃপর যখন তিনি তাদেরকে রহমতের স্বাদ আস্বাদন করান, তখন সহসাই কিছু লোক তাদের রবের সাথে শিরক করতে শুরু করে দেয়, (৩৪) যাতে তারা অস্বীকার করে যা আমি তাদেরকে দিয়েছি। ঠিক আছে, মজা লুটে নাও, শ্রীঘ্রই তোমরা তোমাদের পরিণতি জানতে পারবে। (৩৫) আমি কি তাদের কাছে এমন কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেছি, যা এরা যে শিরক করছে তার সত্যতার সাক্ষ্য দেয় ? (৩৬) আর আমি যখন মানুষকে রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাই, তখন তারা গর্বে ফুলে-ফেঁপে উঠে। আর যখন তাদের কৃতকর্মের দরুণ তাদের উপর কোন বিপদ আসে, তখন তারা হতাশ হয়ে পড়ে। (৩৭) এরা কি দেখে না যে, আল্লাহ যার জন্য চান রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং (যার জন্য

চান) সংক্রীর্ণ করে দেন ? নিশ্চয়ই এতে ঈমানদার লোকদের জন্যে বহু নিদর্শন রয়েছে। (৩৮)অতএব (হে মু'মিনগণ!) আত্নীয়-স্বজনকে তাদের হক বুঝিয়ে দাও, আর মিসকীন ও মুসাফিরকে দাও (তাদের হক)। এটা তাদের জন্য উত্তম পথ, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে। আর তারাই হবে সফলকাম। (৩৯) মানুষের ধন-সম্পদে মিশে নিজেদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, এই আশায় তোমরা যে সূদ দাও, তা আল্লাহর কাছে বৃদ্ধি পায় না। পক্ষান্তরে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় তোমরা যে যাকাত দাও, মূলত এই যাকাত দানকারীরাই তাদের অর্থ বৃদ্ধি করে। (৪০) আল্লাহই তো তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের রিযিক দান করেছেন, এরপর তিনি তোমাদের মৃত্যু দিবেন, আবার তিনিই তোমাদের জীবিত করবেন। (বলো তো) তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে এসবের একটি কাজও করতে পারে ? তারা যাকে শরীক করে, আল্লাহ তা থেকে পবিত্র ও মহান। (৪১) স্থল ও জলে যে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে, তা মানুষের কৃতকর্মের ফল। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, এর ফলে হয়তো তারা ফিরে আসতে পারে। (৪২) হে নবী, তাদেরকে বলুন, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখ, তোমাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছে। তাদের অধিকাংশই ছিলো মুশরিক।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ وَ - এবং/আর। اِذَا - যখন। مَسَّ - স্পর্শ করে। النَّاسَ - মানুষকে। ضُرٌّ -দুঃখ-কষ্ট। دَعَوْا - তারা ডাকে। رَبَّهُمْ - তাদের প্রতিপালককে। مُنِيْبِيْنَ - রুজু হয়ে। اِلَيْهِ - তারই দিকে। ثُمَّ - অতঃপর/এরপর। اَذَاقَهُمْ - তাদেরকে তিনি আস্বাদন করান। مِنْهُ - তাঁর পক্ষ হতে। رَحْمَةً - রহমত/দয়া। اِذَا - তখন/যখন। فَرِيْقٌ - একদল/কিছুসংখ্যক। مِنْهُمْ - তাদের মধ্যে। بِرَبِّهِمْ - তাদের রবের সাথে। يُشْرِكُوْنَ - তারা শিরক করে। لِيَكْفُرُوْا - যেন অকৃতজ্ঞতা করে। بِمَا - ঐ বিষয়ে। اٰتَيْنٰهُمْ - তাদেরকে আমি

দিয়েছি। فَتَمَتَّعُوْا - তোমরা ভোগ করো। فَسَوْفَ - অতঃপর শীঘ্রই। تَعْلَمُوْنَ - তোমরা জানবে। اَمْ - কি। اَنْزَلْنَا - আমি নাযিল করেছি। عَلَيْهِمْ - তাদের উপর। سُلْطٰنًا - কোন দলীল/ প্রমাণ। فَهُوَ - সুতরাং যারা। يَتَكَلَّمُ - বলে। بِمَا - ঐ বিষয়ে। كَانُوا - তারা ছিলো। بِهٖ - তার সাথে। يُشْرِكُوْنَ - শিরক করতো। اَذَقْنَا - আমি আস্বাদন করাই। فَرِحُوْا بِهَا - তাতে তারা উৎফুল হয়। اِنَّ - যদি। قَدَّمَتْ - আগে পাঠিয়েছি। اَيْدِيْهِمْ - তাদের হাত। هُمْ - তারা। يَقْنَطُوْنَ - হতাশ হয়ে পড়ে। اَوْ - কি। لَمْ يَرَوْا - তারা দেখে নাই। اَنَّ - যে। يَبْسُطُ - প্রশস্ত করে দেন। الرِّزْقَ - রিযিক/জীবিকা। لِمَنْ يَّشَاءُ - তিনি যার জন্যে চান। يَقْدِرُ - সীমিত/সংক্রীর্ণ করেন। اِنَّ - নিশ্চয়ই। فِيْ - মধ্যে। لَاٰيٰتٍ - অবশ্যই নিদর্শনাবলী। لِقَوْمٍ - লোকদের জন্যে। يُؤْمِنُوْنَ - ঈমান আনে। فَاٰتِ - অতএব দাও। ذَاالْقُرْبٰى - আত্মীয়-স্বজন। حَقَّهٗ - তার প্রাপ্য। اَلْمِسْكِيْنَ - অভাবী। اِبْنَ السَّبِيْلِ - পথিক/মুসাফির। خَيْرٌ - উত্তম। لِلَّذِيْنَ - তাদের জন্য। يُرِيْدُوْنَ - তারা চায়। وَجْهَ اللهِ - আল্লাহর সন্তুষ্টি। اُولٰئِكَ - ঐসব লোক/ওরাই। هُمْ - তারাই। الْمُفْلِحُوْنَ - সফলকাম। مَا - যা কিছু। اٰتَيْتُمْ - তোমরা দিয়ে থাক। رِبًا - সূদ। لِيَرْبُوْا - যেন বৃদ্ধি পায়। اَمْوَالِ - ধন-মালসমূহ। فَلَا -প্রকৃতপক্ষে না। يَرْبُوْا -বৃদ্ধি পায়। عِنْدَ -কাছে/ নিকটে। زَكٰوةَ - যাকাত। تُرِيْدُوْنَ - তোমরা চাও। وَجْهُ - সন্তুষ্টি। فَاُولٰئِكَ - প্রকৃতপক্ষে ঐসব লোক। اَلْمُضْعِفُوْنَ - সমৃদ্ধশালী/বৃদ্ধি

করে। اَلَّذِىْ - যিনি। خَلَقَكُمْ -তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। ثُمَّ -অতঃপর/ এরপর। رَزَقَكُمْ -তোমাদেরকে রিযিক দিয়েছেন। يُمِيْتُكُمْ -তোমাদের মৃত্যু দেবেন। يُحْيِيْكُمْ তোমাদের পুনঃজীবিত করবেন। هَلْ -কি। شُرَكَائِكُمْ-তোমাদের শরীকদের। مَنْ يَّفْعَلُ -কেউ করতে পারে। ذٰلِكُمْ -ঐগুলো। شَىْءٍ - কিছু। سُبْحٰنَهٗ -তিনি পবিত্র-মহান। تَعٰلٰى - অনেক উর্দ্ধে। عَمَّا -তা হতে যা। يُشْرِكُوْنَ -তারা শরীক করে। ظَهَرَ -ছড়িয়ে পড়েছে। الْفَسَادُ - বিপর্যয়। الْبَرِّ - স্থলভাগে الْبَحْرِ - জলভাগে। بِمَا -এ কারণে যা। كَسَبَتْ -অর্জন/কামাই করেছে। اَيْدِى النَّاسِ -লোকদের হাত। لِيُذِيْقَهُمْ -যেন তিনি তাদের আস্বাদন করান। بَعْضَ -কিছুটা। عَمِلُوْا -তারা কাজ করেছে। لَعَلَّهُمْ -তারা যাতে। يَرْجِعُوْنَ -ফিরে আসে। قُلْ -বল/বলুন। سِيْرُوْا -তোমরা ভ্রমণ করো। فِى الْاَرْضِ -পৃথিবীতে/ যমীনে। فَانْظُرُوْا -অতঃপর লক্ষ্য কর/দেখ। كَيْفَ -কেমন। كَانَ - ছিলো। عَاقِبَةُ - তাদের পরিণাম। الَّذِيْنَ - যারা। مِنْ قَبْلُ - পূর্বে ছিলো। اَكْثَرُ - অধিকাংশ। هُمْ - তাদের। مُشْرِكُوْنَ - মুশরিক।

সম্বোধন ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা / বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ। আমি আপনাদের সামনে দারস পেশ করার জন্য পবিত্র আল কুরআনের সূরা রূম এর ৩৩ হতে ৪২ পর্যন্ত মোট ১০ টি আয়াত তিলাওয়াত ও সরল অনুবাদ পেশ করেছি। মহান আল্লাহ্ পাক যেন আমাকে আপনাদের সামনে সঠিকভাবে দারস পেশ করার তাওফীক দান করেন। আমীন।

সূরার নামকরণ ঃ সূরার প্রথম আয়াতে উল্লেখিত غُلِبَتِ الرُّوْمُ এর روم (রূম) শব্দটিকে নাম হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে। সূরার এই নামটিও কোন শিরোনাম হিসেবে নামকরণ করা হয়নি। বরং আল

কুরআনের অন্যান্য সূরার ন্যায় এই সূরাটিও প্রতীকী বা চিহ্ন হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। তবে যা কিছু করা হয়েছে ওহীর নির্দেশনা অনুযায়ীই করা হয়েছে।

সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল ঃ সূরাটি সর্বসম্মতভাবে মাক্কী। হাবশায় হিজরত করার সময় এই সূরাটি অবতীর্ণ হয় বলে ঐতিহাসিক বর্ণনা সূত্রে পাওয়া যায়। সূরা রূম এর শুরুতেই যে ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে , এর ভিত্তিতে এই সময়টিই সন্দেহাতীত ভাবে নির্দিষ্ট হয়ে যায়। এতে বলা হয়েছে " নিকটবর্তী অঞ্চলে রোমানরা পরাজিত হয়ে গিয়েছে।"এই সময় আরবের সাথে মিলিত জর্দান, সিরিয়া এবং ফিলিস্তিন অঞ্চল রোমানদের অধিনস্থ ছিলো। এসব এলাকায় রোমানদের উপর পারস্যবাসীর বিজয় অর্জিত হয়েছিলো ৫১৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। আর এসব কারণেই বলা যায় যে, এই সূরাটি ঠিক এই বছরেই নাযিল হয়েছিলো।

তিলাওয়াতকৃত আয়াতসমুহের মূল বক্তব্য ঃ তিলাওয়াতকৃত আয়াত কয়টির মূল বক্তব্য হলো , দুঃখের সময় মানুষ আল্লাহর কথা স্মরণ করে, কিন্তু যখনই আল্লাহর কোন দয়া কিংবা অনুগ্রহ তাদের উপর নেমে আসে তখন তারা বেমালুম আল্লাহকে ভুলে গিয়ে শিরক করা শুরু করে দেয়। আল্লাহর রহমত আসলে যেমন ফুলে-ফেঁপে গদগদ করা উচিত নয়, তেমনি দুঃখ-কষ্টে পড়লে হতাশ হয়ে যাওয়াও ঠিক নয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং যাকে ইচ্ছা রিযিক কমিয়ে দেন। এইজন্য মুমিন লোকদের উচিত হবে যার হক তাকে বুঝিয়ে দেয়া।

সুদ এর মাধ্যমে সম্পদ বৃদ্ধি পায় না বরং যাকাতই মানুষের সম্পদ বৃদ্ধি করে থাকে। রিযিক এবং সৃষ্টির মালিক আল্লাহ তা'লা, এর কোন একটি করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। স্থল এবং জ্বলে যেসব বিপর্যয় দেখা দেয়, এসব কিছুই মানুষের কর্মের ফল। মানুষের দুনিয়া ভ্রমণ করে দেখা উচিত যে, আল্লাহ অতীত যুগের মানুষের অবস্থা কি করেছেন?

ব্যাখ্যা ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা / বোনেরা ! এতক্ষণ পর্যন্ত দারস বুঝার জন্য সূরার প্রাথমিক অথচ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় আপনাদের সামনে তুলে ধরা হলো। এখন আমি আপনাদের খিদমতে তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা পেশ করছি। মহান আল্লাহ বলেন-

وَاِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُّنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَآ اَذَاقَهُمْ مِّنْهُ رَحْمَةً اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ

লোকদের অবস্থা হলো এই যে, যখন তারা কোন দুঃখ–কষ্টের মধ্যে পড়ে, তখন তারা তাদের রব এর অনুগত হয়ে তাঁকে ডাকে। অতঃপর যখন তিনি তাদের রহমতের স্বাদ আস্বাদন করান, তখন সহসাই কিছু লোক তাদের রব এর সাথে শিরক করতে শুরু করে দেয়।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা ! আল্লাহ্ তা'লা এখানে মানুষের স্বাভাব ও প্রকৃতির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন যে, যখন তাদের উপর কোন দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ আসে, তখন তারা তাদের প্রতিপালক আল্লাহ্র অত্যন্ত অনুগত বান্দা হিসেবে বিনয়ের সাথে দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদ হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রার্থনা শুরু করে দেয়। তারপর মহান আল্লাহ্ তা'লা যখন তাদের উপর রহমত বর্ষণ করেন, তখন তাদের মধ্যে হতে কিছু লোক তাঁর সাথে শিরক করা শুরু করে দেয়। অর্থাৎ অন্যান্য মা'বুদের নামে মানত মানা ও নিয়ায দেয়ার কাজ শুরু করে দেয়। আর মুখে বলে যে, অমুক হযরতের কারণেই এই বিপদ দেখা দিয়েছিলো বলে উমুক আস্তানায় নিয়ায দিলেই তা দূর হয়ে যাবে। অতঃপর মহান আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন–

لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ فَتَمَتَّعُوْا فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ

যাতে তারা অস্বীকার করে যা আমি তাদেরকে দিয়েছি। ঠিক আছে, মজা লুটে নাও, শীঘ্রই তোমরা তোমাদের পরিণতি জানতে পারবে।

আসলে তারা এসবের শিরক করে এই কারণে যে, যাতে তারা অস্বীকার করতে পারে- আমি তাদেরকে যেসব রহমত বা অনুগ্রহ দান করেছি। ঠিক আছে, কিছু দিনের জন্য তোমরা মজা লুটে নাও, সময় হলে এর যে ভয়াবহ পরিণতি তা তোমরা হাড়ে হাড়ে টের পাবে।

এখানে যারা আল্লাহ্র অকৃতজ্ঞ বান্দাহ তাদেরকে ধমক দিয়ে বলছেন যে, তোমরা তো এখন আমাকে ভুলে গিয়ে অন্যান্য মা'বুদের প্রশংসায় লেগে পড়েছো, কিন্তু এর পরিণতি যে কি ভয়াবহ তা তোমরা অচিরেই জানতে পারবে। আর তা হলো উতপ্ত আগুনে পরিপূর্ণ ভয়াবহ জাহান্নাম। যেখানে চিরদিন তোমাদের থাকতে হবে।

অতঃপর মহান আল্লাহ্ তাদেরকে প্রশ্ন করে বলেন–

أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا۟ بِهِۦ يُشْرِكُونَ

আমি কি তাদের কাছে এমন কোন প্রমাণ নাযিল করেছি, যা তাদেরকে শরীক করতে বলে ?

তাদের এই দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ আল্লাহ্ দূর করতে পারেন না বা করেন না, করেন অমুক হযরত বা পীর সাহেব, এ কথা তারা কেমন করে জানতে পারলো ? তাদেরকে যে জ্ঞান-বুদ্ধি দেয়া হয়েছে, তাতে কি তাদের এই স্বাক্ষ্যই দেয় ? কিংবা আল্লাহর এমন কি কোন কিতাব আছে, যেখানে আমি আমার কর্তৃত্ব ও ইখতিয়ার উমুক উমুক হযরতকে ভাগ-বাটোয়ারা করে দিয়েছি, এখন তারাই তোমাদের কাজ-কর্ম করে দিবে ? এমন তো কোন ব্যবস্থা আমি তোমাদেরকে করে দেয়নি, তাহলে তোমরা কেন আমার সাথে শরীক করছো ?

অতঃপর মহান আল্লাহ্ মানুষের স্বাভাবের কথা উল্লেখ করে বলেন–

وَإِذَآ أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا۟ بِهَا ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ

আর আমি যখন মানুষকে রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাই, তখন তারা গর্বে ফুলে-ফেঁপে উঠে। আর যখন তাদের কৃতকর্মের ফলে তাদের উপর কোন বিপদ-আপদ আসে, তখন তারা হতাশ হয়ে পড়ে।

উপরের আয়াতে মানুষের মুর্খতা, নির্বুদ্ধিতা, নাশুকরী ও নিমকহারামীর কারণে তাদেরকে পাকড়াও করা হয়েছে। আর এই আয়াতে তাদের হীনতা, নীচতা এবং সংকীর্ণতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এসব সংকীর্ণ বা ছোট মনের লোকেরা যখন দুনিয়ার কিছুটা ধন-সম্পদ, শক্তি-সামর্থ ও ইজ্জত-সম্মান লাভ করে এবং তাদের কাজ-কর্ম ভালভাবে চলছে দেখতে পায়, তখন এসব কিছু যে আল্লাহর অনুগ্রহ সে কথা তাদের মোটেই মনে থাকে না, বেমা'লুম ভুলে গিয়ে তারা মনে করে যে, এসব কিছু তাদের নিজেদের সক্ষমতা ও ক্ষমতার বলেই লাভ করেছে। এই ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা গর্ব ও অহংকারে মেতে উঠে। অতঃপর তারা না আল্লাহকে পরওয়া করে, না দুনিয়ার কোন কিছুকে পরওয়া করে। কিন্তু

যখনই উন্নতির ধারার ভাটা পড়া শুরু করে এবং চারদিক থেকে বিপদ-আপদ ধেয়ে আসে, তখন তাদের মন ভেঙ্গে যায়। তখন তাদের এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, তারা তখন এমন হীন ও নিচু কাজ করতে উদ্ধত হয়-এমন কি আত্নহত্যা করতেও তারা দ্বিধাবোধ করে না। সহীহ্ হাদীসে এসেছে, "মু'মিনের জন্যে বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, আল্লাহ তার জন্যে যে ফয়সালা করেন তা তার জন্যে মঙ্গল ও কল্যাণকরই হয়। আর যদি তার উপর সুখ-শান্তি নেমে আসে এবং এজন্য তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তবে সেটাও হয় তার জন্য কল্যাণকর। আর যদি সে বিপদ-আপদ ও দুঃখ-দৈন্যের মধ্যে পড়ে আর সে জন্য সে ধৈর্য ধারণ করে, তবে সেটাও হয় তার জন্য কল্যাণকর।"

অতঃপর পরবর্তী আয়াতে মানুষের রিযিকের বিষয়ে আলাহর এখতিয়ার সর্ম্পকে বলেন–

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ

এরা কি দেখে না যে, আল্লাহ্ যার জন্য চান রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং (যার জন্য চান) সংক্রীর্ণ করে দেন? নিশ্চয় এতে মু'মিন লোকদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।

অর্থাৎ কুফর ও শিরকের প্রভাব মানুষের নৈতিক চরিত্রের উপর পড়ে আর এর বিপরীত ঈমান এর নৈতিক ফল কি হয়ে থাকে, মানুষ তা এ থেকে স্পষ্ট বুঝতে এবং শিক্ষা লাভ করতে পারে। বস্তুতঃ পক্ষে যে ব্যক্তি খাঁটি দিলে আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে এবং তাঁকেই রিযিক দানের একমাত্র মালিক মনে করে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে, সে কখনই এতোখানি হীন এবং নিচু ও সংক্রীর্ণতায় ডুবে যেতে পারে না, যার ফলে মানুষ আল্লাহকে ভুলে বসে। সে যদি বিপুল পরিমাণে রিযিক পায়, তবে সে তাতে গর্বে ফুলে-ফেঁপে উঠে না, বরং সে আল্লাহর শুকুরগুজার বান্দাহ হয়ে যায়। আল্লাহর সৃষ্টির সাথে বিনয়,নম্র ও ভদ্রতার আচারণ করে। আল্লাহর সম্পদ আল্লাহর পথে খরচ করতে মোটেই দ্বিধা করে না। আর যদি কম রিযিক লাভ করে কিংবা না খেয়েই থাকতে বাধ্য হয়,তবুও সে ধৈর্যধারণ করে। বিশ্বাস্ততা, আমানতদারী ও আত্নমর্যাদাকে সে কখনই হারায় না এবং

শেষ পর্যন্ত সে আল্লাহর দয়ার আশায় তাকিয়ে থাকে। এরূপ উন্নত নৈতিক মান কোন খোদাদ্রোহী নাস্তিকের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়, সম্ভব নয় মুশরিকের পক্ষে এটা লাভ করা।

এরপর হক পৌঁছানোর তাগীদ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন-

فَاٰتِ ذَاالْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ط ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ وَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

অতএব (হে মু'মিনগণ!) আত্মীয়-স্বজনকে তাদের হক বুঝিয়ে দাও, আর মিসকীন ও মুসাফিরকে দাও (তাদের হক)। এটা তাদের জন্য উত্তম পথ, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে এবং তারাই সফলকাম।

ذَوِى الْقُرْبٰى বলতে সাধারণ আত্মীয় বোঝানো হয়েছে। মুহরীম আত্মীয় হোক বা গায়ের মুহরীম হোক সকলকেই বুঝানো হয়েছে।

مِسْكِيْنَ (মিসকীন)ঃ কেউ কেউ অভাবী, দরিদ্র লোককে বুঝিয়েছেন। যার কাছে কিছু না কিছু থাকে। কিন্তু তা তার প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই না। আবার কেউ কেউ মিসকীন তাদেরকেই বুঝিয়েছেন যারা নিস্ব। যার কিছুই নেই।

ابن السَّبِيْل মুসাফির বা অভাবী পথিক। অর্থাৎ যে মুসাফির বিদেশ গিয়ে খরচ পরিমাণ অর্থের অভাবে পড়েছে।

এই আয়াতে আত্মীয়-স্বজন, মিসকীন ও পথিককে খয়রাত দিতে বলা হয়নি। বরং বলা হয়েছে তাদেরকে তাদের হক বা প্রাপ্য দিতে। হককে হক মনে করেই তা আদায় করতে হবে। আর এটা দেয়ার সময় তাদের প্রতি কোন অনুগ্রহ বা দয়া করা হচ্ছে এমন মনোভাব পোষণ করা যাবে না। এটাও মনে করা যাবে না যে, দানকারী একজন বড় মহামানব হয়ে গেছে, আর যারা গ্রহণ করছে তারা খুব হীন ও নগণ্য জীব, তাদেরকে দেয়া হচ্ছে বিধায় খেতে পারছে। না এরূপ মনোভাব কখনও পোষণ করা যাবে না। বরং এটা মনে রাখতে হবে যে, ধন-মালের প্রকৃত মালিক মহান আল্লাহ। আর মানুষ হচ্ছে তার হিফাযতকারী কিংবা সংরক্ষক মাত্র।

অতঃপর পরবর্তী আয়াতে মানুষের সম্পদ কিসে বৃদ্ধি হয় সে সম্পর্কে

বলতে গিয়ে মহান আল্লাহ তা'লা বলেন–

وَمَاۤ اٰتَيۡتُمۡ مِّنۡ رِّبًا لِّيَرۡبُوَا۟ فِىۡۤ اَمۡوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرۡبُوۡا عِنۡدَ اللّٰهِ ۚ وَمَاۤ اٰتَيۡتُمۡ مِّنۡ زَكٰوةٍ تُرِيۡدُوۡنَ وَجۡهَ اللّٰهِ فَاُولٰۤـئِكَ هُمُ الۡمُضۡعِفُوۡنَ

মানুষের ধন-সম্পদে মিশে নিজেদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে এই আশায় তোমরা যে সূদ দাও, তা আল্লাহর কাছে বৃদ্ধি পায় না, আর আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় তোমরা যে যাকাত দাও, মূলত এই যাকাত দানকারীরাই তাদের অর্থ বৃদ্ধি করে।

এই আয়াতের তাফসীরে মুফাসসীরগণ দু'টি অর্থ নিয়েছেন। একদল মনে করেন, এখানে ربوا (রিবা) বলতে সেই সূদকে বুঝানো হয়নি, যা শরীয়তে সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। বরং এটা হলো সেই দান বা উপহার-উপঢৌকন, যা এই মনোভাব নিয়ে দেয়া হয় যে, দাতা গ্রহীতার কাছ থেকে ইহা অপেক্ষা বেশী আদায় করে নিবে। ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, দহহক, কাতাদাহ, ইকরামা, মুহাম্মদ ইবনে কা'য়াবুল কুরাযী ও শা'বী এই কথা বলেছেন।

অপর দল বলেন যে, এখানে সেটা নয়, বরং এখানেও ঠিক সেই সূদের কথাই বলা হয়েছে, যা শরীয়তে হারাম করা হয়েছে। হযরত হাসান বসরী ও সুদী এই মত প্রকাশ করেছেন।

আল্লামা আলুসী মনে করেন, আয়াতটির বাহ্যিক এটাই। কেননা, আরবী ربوا(রিবা)শব্দটি কেবল এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাফসীরকারক নীসাপুরীও এই তাফসীরই করেছেন। আমার মতে দ্বিতীয় তাফসীরটিই সঠিক। কেননা, কোন শব্দের প্রচলিত ও সর্বজনশিদ্ধ অর্থ বাদ দেয়ার পক্ষে পূর্বে উদ্ধৃত দলীল-প্রমাণ কিছুমাত্র যথেষ্ট নয়। যে সময় সূরা রূম নাযিল হয়েছে তখন কুরআন মাজীদে সূদ হারাম হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়নি, এর ঘোষণা দেয়া হয়েছে কয়েক বছর পর।

কুরআন মাজিদের রীতিই হলো এই যে, যে জিনিসকে হারাম যা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হবে, তার জন্য আগে থেকেই তা মানসিকভাবে গ্রহণ করার জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরীর কাজ শুরু হয়ে যায়। যেমন মদ সম্পর্কে

সূরা নহলের-৬৭ নম্বর আয়াতে প্রথমে শুধু এতোটুকু বলা হয়েছিলো যে, "এটা পবিত্র জীবিকা নয়।"পরে সূরা বাকারার ২১৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে-"এর অপকার উপকারের চেয়ে বেশী।" পরে একটি আয়াত অবতীর্ণ করে কেবলমাত্র সালাত আদায়ের সময় এটা পান করতে নিষেধ করা হয়। অতঃপর মদ চূড়ান্ত ভাবে হারাম হওয়ার আয়াত অবতীর্ণ হয়। অনুরূপভাবে এই আয়াতে সূদ সম্পর্কে শুধু এতটুকু কথা বলাই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে যে, সূদ দ্বারা ধন-সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না, বরং বৃদ্ধি পায় তো যাকাত দ্বারা।

এরপর সূরা আলে ঈমরানের ১৪ নম্বর রুকুতে চক্রহারে বৃদ্ধি সূদ হারাম করা হয়। আর সব শেষে চূড়ান্তভাবে সূদ হারাম করা হয় সূরা বাকারার ৩৮ নম্বর রুকুতে।

আর বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ভর করে দাতার নিয়তের খুলুসিয়াত ও নিষ্ঠার উপর। একজন ব্যক্তি যতো খালেস নিয়তে,নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় অর্থ-সম্পদ খরচ করবে, আল্লাহ তা'লাও ততো মাল-সম্পদ বৃদ্ধি করে দিবেন। সহীহ হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, "রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, এক ব্যক্তি যদি আল্লাহর পথে একটি খেজুরও দান করে, তা হলে আল্লাহ তা বৃদ্ধি করে ওহুদ পাহাড়ের ন্যায় করে দিবেন।" অতপর মহান আল্লাহ শরীকদের অক্ষমতার কথা উল্লেখ করে আন্য আয়াতে বলেন-

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ط هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَّنْ يَّفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِّنْ شَيْءٍ ط سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

আল্লাহই তো তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদেরকে রুযি দান করেছেন, এরপর তিনি তোমাদের মরণ দিবেন, আবার তিনিই তোমাদের জীবিত করবেন। (বলো তো,) তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে এসবের একটি কাজও করতে পারে ? তারা যাকে শরীক করে, আল্লাহ তা হতে পবিত্র-মহান।

এই আয়াতে আল্লাহ শিরককারীদের লক্ষ্য করে বলছেন, আল্লাহই তো তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে বিভিন্নভাবে

রুযির ব্যবস্থা করেন। মানুষ দুনিয়াতে আগমনের সময় উলঙ্গ, অজ্ঞ, বয়রা, দৃষ্টিহীন এবং শারিরীকভাবে অত্যন্ত দূর্বল অবস্থায় থাকে। আল্লাহ তা'লা তাকে সবকিছু দান করেন। ধন-সম্পদ দেন, মালিকানা দেন, উপার্জনে সক্ষম করেন, ব্যবসা-বাণিজ্য করার বুদ্ধি দান করেন। মোট কথা অসংখ্য নি'য়ামত দান করেন।

হযরত খালিদ (রাঃ) এর দু'সন্তান হযরত হাববাহ (রাঃ) ও হযরত সাওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, আমরা একবার নবী করীম (সঃ) এর নিকট হাজির হলাম। ঐ সময় তিনি কোন কাজে ব্যস্ত ছিলেন। আমরাও তাঁকে তাঁর কাজে সাহায্য করলাম। তিনি বললেন, "জেনে রেখো, তোমরা রিযিক থেকে নিরাশ হয়ো না, যে পর্যন্ত তোমাদের মাথা নড়তে থাকে অর্থাৎ তোমরা থাকো জীবিত। মানুষ উলঙ্গ ও অভুক্ত অবস্থায় দুনিয়াতে আগমন করে। একটি ছাল বা বাকলাও তার পরনে থাকে না। কিন্তু দয়াময় আল্লাহ তাকে রিযিক দান করেন।"(মুসনাদে আহমাদ)

অতঃপর আল্লাহই তোমাদেরকে জীবনের নির্দিষ্ট সময় দুনিয়ায় অবস্থানের পর মৃত্যু ঘটাবেন। তারপর পুনরায় তোমাদের দুনিয়ার জীবনের ভাল-মন্দ চূড়ান্তভাবে বিচারের জন্য জীবিত করে হাশরের ময়দানে উঠাবেন। অতএব বলো দেখী, তোমরা যেসব দেব-দেবীর পূজা করো তাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে যারা বা যে এসবের কোন একটিও করতে পারে ? অতএব জেনে রেখো, তোমরা যাদেরকে শরীক করো, আল্লাহ তা হতে পবিত্র ও মহান। তাঁর মহান পবিত্র সত্তা এসব হতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। তাঁর শরীক হোক এ হতে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র। অথবা তাঁর সমকক্ষ কেউ হোক, তাঁর সন্তানাদি ও পিতা-মাতা থাক, তা থেকে তিনি বহু উর্দ্ধে। তিনি একক, অদ্বিতীয়, মুখাপেক্ষীহীন এবং অভাবমুক্ত। তাঁর সমকক্ষ বা সমতুল্ল কেউই নেই।

অতঃপর পরবর্তী আয়াতে মানুষের কৃতকর্মের ফলসরূপ মহান আল্লাহ বলেন–

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِىْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ

স্থলে ও জলে যে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে, তা মানুষের কৃতকর্মের ফল।

আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা ফিরে আসতে পারে।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মাওলানা মওদূদী (রহঃ) তাঁর তাফহীমুল কুরআনের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন, এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে তখনকার সময়ের রোমান ও পারসিকদের মধ্যে চলা যুদ্ধের দিকে। এই যুদ্ধের লেলিহান শিখা গোটা মধ্যপ্রাচ্যকে গ্রাস করে নিয়েছিলো। লোকদের নিজেদের হাতে করা কাজ বলতে বুঝানো হয়েছে সেই ফিসক-ফুজুরী, যুলুম-নিপীড়ন, যা শিরকী বা নাস্তিকতার আকীদা অবলম্বনের ও পরকাল অস্বীকার করার অনিবার্য ফল হিসেবে লোকদের চরিত্রে দেখা দিয়ে থাকে। 'হয়তো তারা ফিরে আসবে' এই কথার তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ তা'লা পরকালে শাস্তির আগে এই দুনিয়ায় মানুষের সব আ'মলের নয়- কোন কোন আ'মলের খারাপ পরিণাম দেখিয়ে দেন, যেন সে প্রকৃত ব্যাপারকে বুঝতে পারে এবং নিজের ধারণা-খেয়ালের ভুল বুঝতে পেরে নবী-রাসূল কর্তৃক চিরকালীন প্রচলিত সত্য ও সনাতন আকীদাকে বিশ্বাস করে, যা গ্রহণ না করলে মানুষের আ'মলকে সঠিক নির্ভুল বুনিয়াদে প্রতিষ্ঠা করার অন্য কোন উপায়ই থাকতে পারে না।

তাফসীরে ইবনে কাসীরে উল্লেখ রয়েছে- بر (বার) বা স্থলভাগের বিপর্যয় দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাওয়া, ফসল ও ফল-মূল সৃষ্টি না হওয়া এবং দুর্ভিক্ষ হওয়া ইত্যাদি বুঝায়। আর بحر (বাহার) বা জলভাগের বিপর্যয় দ্বারা উদ্দেশ্য হলো,বৃষ্টি না হওয়া,পানির জন্তুগুলো অন্ধ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি

তাফসীরে রুহুল-মা'আনীতে বলা হয়েছে, 'বিপর্যয়' বলে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অগ্নীকান্ড, পানিতে নিমজ্জিত হওয়ার ঘটনাসমূহের প্রাচুর্য, সবকিছু থেকে বরকত উঠে যাওয়া, উপকারী জিনিসের উপকার কম এবং ক্ষতি বেশী হয়ে যাওয়া ইত্যাদি আপদ-বিপদ বোঝানো হয়েছে।

আয়াত থেকে জানা যায় যে, দুনিয়ার এসব বিপদ-আপদের কারণ মানুষের গুনাহ ও দুষ্কর্ম। তার মধ্যে শিরক ও কুফর সবচেয়ে মারাত্মক। এরপর অন্যান্য গুনাহসমূহ।

মহান আল্লাহ তা'লা বলেন, এর ফলে তাদেরকে কোন কোন কর্মের শাস্তি তিনি আস্বাদন করান যাতে তারা সঠিক পথে ফিরে আসে। যেমন অন্য

এক আয়াতে বলা হয়েছে-

وَبَلَوْنٰهُمْ بِالْحَسَنٰتِ وَالسَّيِّاٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ

"আমি তাদেরকে মঙ্গল ও অমঙ্গল দ্বারা পরীক্ষা করি যাতে তারা সঠিক পথে ফিরে আসে।" (সূরা আ'রাফ-১৬৮)

অতঃপর পরবর্তী আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন-

قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلُ ط كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِيْنَ

হে নবী ! তাদেরকে বলুন, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখ, তোমাদের পূর্ববর্তীদের পরিনাম কি হয়েছিলো। তাদের অধিকাংশই ছিলো মুশরিক।

আয়াতে আল্লাহর নবী (সঃ) কে ডেকে বলা হচ্ছে, হে নবী (সঃ)! আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, যারা আজকে শিরক ও কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে তাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা কি হয়েছিলো! রোমান ও পারসিকদের এই ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ আজকের জন্য কোন নতুন ঘটনা নয়। অতীত ইতিহাসে বড় বড় জাতিগুলোর এই ধ্বংসে মর্মান্তিক কাহিনীতে ভরপুর হয়ে রয়েছে। এসব জাতিকে যেসব অন্যায় ধ্বংস করেছে তার মূলে ছিলো এই শিরক। আজ এটা থেকে বিরত থাকার জন্যই তোমাদেরকে আহ্বান জানানো হচ্ছে।

শিক্ষা ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা / বোনেরা ! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে পবিত্র কালামে হাকীম আল-কুরআনের সূরা রূম এর ৩৩ থেকে ৪২ নম্বর আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা পেশ করা হলো। এখন সেখান থেকে কি কি শিক্ষণীয় রয়েছে তা আমাদের জানা প্রয়োজন। এজন্য নিম্নে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো তুলে ধরা হলো ঃ

■ দুঃখ-কষ্টের মধ্যে যেমন আল্লাহমুখী হয়ে তাঁর অনুগত থেকে তাঁকে ডাকতে হবে, তেমনি সুখের সময়ও কিংবা আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত নাযিলের সময়ও তাঁর অকৃতজ্ঞ বান্দাহ হয়ে শিরকে লিপ্ত হওয়া যাবে না। বরং একজন কৃতজ্ঞ বান্দাহ হিসেবে বেশী বেশী করে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে হবে।

■ আল্লাহ্ তা'লা কৃতজ্ঞ বান্দাকেই বেশী ভালবেসে থাকেন। অতএব যখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন নি'য়ামত প্রাপ্ত হবে, সহসা তখনই কৃতজ্ঞ বান্দাহ হিসেবে তাঁর বেশী বেশী ইবাদাত-বন্দেগীতে মনোনিবেশ করতে হবে। নতুবা এর পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ।

■ আল্লাহর সাথে শরীক করার কোন দলীল-প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। অতএব একজন মু'মিন কোন দলীল-প্রমাণ ছাড়াই আল্লাহর সাথে কোন কিছুর শরীক করতে পারে না।

■ আল্লাহর রহমত লাভ করলে যেমন গর্বে ফুলে-ফেঁপে বেপরওয়া হওয়া যাবে না। তেমনি বিপদ-আপদ এসে হাজির হলে হতাশ ও মনমরাও হওয়া যাবে না। এটা মু'মিনের পরিচয় নয়। একজন মু'মিন যেমন সুখের সময় গর্বে ফেটে পড়বে না, বরং স্বাভাবিক থাকবে, তেমনি কোন বিপদ-আপদ আসলে কিংবা দুঃখ-কষ্টে পড়লেও হতাশ না হয়ে বরং স্বাভাবিক থাকবে।

■ আল্লাহই রুযির মালিক। তাঁর হাতেই রয়েছে সমস্ত রিযিকের ভান্ডার। তিনি যাকে চান বা যার জন্য চান রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং যাকে চান বা যার জন্য চান রিযিক কমিয়ে দিয়ে থাকেন। এ ক্ষমতা এককভাবে আল্লাহর হাতে। এটা একজন কৃতজ্ঞ বান্দার মনে-প্রাণে বিশ্বাস রাখা উচিত।

■ আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় আত্মীয়-স্বজন অর্থাৎ নিকটতম আত্মীয় হোক কিংবা দূরবর্তী আত্মীয় হোক, তাদের অধিকার বা প্রাপ্য বুঝিয়ে দিতে হবে। আর মিসকীন বা অভাবী লোকদের যাদের প্রয়োজন অত্যন্ত তীব্র কিন্তু সম্মানের জন্য মুখ ফুটে চাইতে পারে না, এমনসব অভাবী দরীদ্র লোকদের খুঁজে খুঁজে বের করে তাদের হক আদায় করতে হবে।

■ অভাবী মুসাফির অর্থাৎ বিদেশ গিয়ে যদি অভাবে পড়ে এমন কোন পথিককেও তাদের প্রাপ্য বুঝিয়ে দিতে হবে। এসব হক বা প্রাপ্য তাদের প্রকৃত প্রাপ্য হিসেবই দিতে হবে। এদের বিষয়ে কোন প্রকার সাহায্য বা সহানুভূতি দেখানোর মানসিকতা রাখা যাবে না। তারাই সফলকাম হবে, যারা প্রকৃত হকদারের হককে পুংখানুপুংখভাবে বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হবে।

■ সূদ হচ্ছে হারাম, এতে সম্পদ বৃদ্ধি পায় না, বরং আমরা সম্পদকে বৃদ্ধি করার জন্য যে যাকাত দিয়ে থাকি তাতেই সম্পদে বরকত হয় এবং বৃদ্ধি পাই, কিন্তু মানুষ এটা সহজে উপলব্ধি করতে চাই না।

■ আল্লাহই আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আবার আমাদের রিযিকের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, তিনিই আমাদের মৃত্যু দান করবেন, আবার তিনিই পুনরায় আমাদের উত্থান ঘটাবেন। এসবের কোন একটি কাজ বা তার কোন একটি অংশ আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ কি তা করতে পারে ? মহান আল্লাহ্ এসব থেকে পবিত্র ও মহান। এসবের ক্ষমতা এককভাবে মহান আল্লাহ্ তা'আলা অন্য কারোও নেই।

■ স্থলে ও জলে যেসব বিপর্যয় দেখা দেয়, বিশেষ করে বড় বড় বিপর্যয় যেমন- জলোচ্ছাস, টর্ণেডো, ভূমিকম্প, ভূমিধ্বস, মহামারি, ক্ষুধা-দারিদ্রতা ইত্যাদি এসব কিছুই মানুষের কর্মেরই ফল। আল্লাহ্ এর মাধ্যমে মানুষকে সর্তক সাবধান করতে চান, বিপর্যয় থেকে ফিরিয়ে আনতে চান।

■ আল্লাহর নিদর্শন দেখে তাকে স্মরণ করার জন্য দুনিয়ায় ভ্রমণ করা উচিত। যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এসব ভ্রমণ হয়ে থাকে তা হলে সেটা ইবাদাতের মধ্যে গণ্য হবে। আর যদি শুধু শুধু আনন্দ ফুর্তি করার জন্য অহেতুক যা বর্তমানকালে হয়ে থাকে ভ্রমণ করা হয়, তাহলে তার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। এতে সাময়িকভাবে মনের তৃপ্তি হবে বটে কিন্তু কোন নেকী হবে না।

■ আর যারা দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করেন তাদের ঘুরে ঘুরে দেখতে হবে যে আল্লাহ্ অতীত জাতির সাথে কি ধরণের ব্যবহার করেছিলো। তিনি তাদের যুলুম এবং মুশরিকী আচারণের জন্য তাদেরকে ধ্বংস স্তুপে পরিণত করে দিয়েছেন।

আহ্বান ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা / বোনেরা ! এতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনাদের সামনে সূরা রূমের ৩৩ থেকে ৪২ আয়াত পর্যন্ত যে দারস পেশ করলাম, এতে যদি আমার অজান্তে এবং অজ্ঞাতে কোন ভুল-ত্রুটি কিংবা বাড়াবাড়ি হয়ে যায় তার জন্য আমি মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর এই দারস থেকে যেসব শিক্ষণীয় বিষয় আমরা জানতে পারলাম, তা যেন বাস্তব জীবনে কাজে লাগাতে পারি সেই তাওফীক কামনা করে আমি আমার দারস শেষ করছি। অয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন।

পাঁচ

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার মৌলিক নীতিমালা

সূরা বানী ইসরাঈল – ১৭

আয়াত- ২৩-৩৮

نَحمَدُه وَنُصَلِّي عَلى رَسُولِه الكَرِيم اَمَّا بَعدُ

فَاَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطٰنِ الرَّجِيمِ

بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّاتَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ط
اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْكِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ
اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ○ وَاخْفِضْ
لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا
رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ○ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَافِيْ نُفُوْسِكُمْ ط اِنْ
تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا ○ وَاٰتِ ذَا
الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَاتُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ○ اِنَّ
الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ط وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ
كَفُوْرًا ○ وَاِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ
تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُوْرًا ○ وَلَاتَجْعَلْ يَدَكَ
مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَاتَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا

مَحْسُوْرًا ○ اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ ط
اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًا م بَصِيْرًا ○ وَلَاتَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ
خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ط نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ط اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ
خِطْاً كَبِيْرًا ○ وَلَا تَقْرَبُوْا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ط وَسَآءَ
سَبِيْلًا ○ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ط وَمَنْ
قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفْ فِّى الْقَتْلِ ط
اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا ○ وَلَاتَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِىْ
هِىَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ص وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ج اِنَّ الْعَهْدَ
كَانَ مَسْئُوْلًا ○ وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ
الْمُسْتَقِيْمِ ط ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ○ وَلَاتَقْفُ مَا لَيْسَ
لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ط اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ
عَنْهُ مَسْئُوْلًا ○ وَلَاتَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا ج اِنَّكَ لَنْ
تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا ○ كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ
سَيِّئُهٗ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهًا ○

সরল অনুবাদ ঃ ইরশাদ হচ্ছে – (২৩) তোমার রব আদেশ করেছেন যে, (এক) তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করবে না। (দুই) পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করবে। তোমাদের নিকট যদি তাদের মধ্যে কোন একজন অথবা উভয়ই বৃদ্ধাবস্থায় থাকে, তবে তাদেরকে 'উহ' শব্দটি পর্যন্ত বলবে না এবং তাদেরকে ধমক দিবে না ; বরং তাদের সাথে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা বলবে (২৪) এবং বিনয় ও নম্রতার সাথে তাদের সামনে

নতো হয়ে থাকবে। আর এই দোয়া করতে থাকবে ঃ “হে আমার রব ! তাঁদের উভয়ের প্রতি রহম করো, যেমন করে তারা আমাকে বাল্যকালে স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে লালন-পালন করেছে।” (২৫) তোমাদের রব তোমাদের ভালভাবেই জানেন তোমাদের মনে কি আছে। তোমরা যদি নেক চরিত্রবান হয়ে থাকো, তবে তিনি তাওবাকারীদের জন্য ক্ষমাশীল। (২৬) (তিন) আত্মীয়–স্বজনকে তার হক দিয়ে দাও এবং মিসকীন ও সম্বলহীন পথিককেও দাও তার অধিকার। (চার) আর কিছুতেই অপব্যয়–অপচয় করো না। (২৭) নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার রবের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ। (২৮) (পাঁচ) তুমি যদি তোমার রবের রহমত পাবার আশায় অপেক্ষমান থাকা কালে কোন সময় তাদেরকে (অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজন, মিসকীন ও সম্বলহীন পথিক) পাশ কেটে থাকতে চাও, তাহলে তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বলো। (২৯) (ছয়) তোমরা একেবারে মুষ্টিবদ্ধ (কৃপণ) হয়ো না, এবং একবারে মুক্তহস্তও (দাতাও) হয়ো না, তাহলে তোমরা তিরস্কৃত হবে এবং নিঃস্ব হয়ে বসে থাকবে। (৩০) নিশ্চয় তোমার রব যাকে ইচ্ছা বেশী বেশী রিযিক দান করেন, আবার তিনিই যাকে চান তার রিযিক সংক্রীর্ণ করে দেন। তিনি তাঁর বান্দাদের অবস্থা সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত আছেন এবং তাদেরকে দেখছেনও। (৩১) (সাত) দারিদ্রের ভয়ে নিজের সন্তানকে হত্যা করো না। তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই রিযিক দিয়ে থাকি। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মস্তবড় অপরাধ। (৩২) (আট) যিনার ধারে-কাছেও যেও না। নিশ্চয় এটা অত্যন্ত খারাপ কাজ এবং নিকৃষ্ট পথ। (নয়) প্রাণ হত্যার অপরাধ করো না, যাকে আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন-তবে ন্যায় ভাবে। আর যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হয়, আমি তার ওলিকে (উত্তরাধিকারীকে) কেসাস দাবী করার অধিকার দান করেছি। অতএব সে যেন হত্যার ব্যাপারে সীমালংঘণ না করে। তার সাহায্য অবশ্যই করা হবে। (৩৪) (দশ) আর এতিমদের ধন-মালের কাছেও যেও না। একমাত্র তার কল্যাণ কামনা ছাড়া, যতদিন না সে যৌবন লাভ করে। (এগার) ওয়াদা (অঙ্গীকার) পূর্ণ করবে। ওয়াদা সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। (৩৫) (বারো) পাত্র দ্বারা মাপ দিলে পূর্ণভাবে ভর্তি করে দিবে। আর ওজন করে দিলে ক্রুটিমুক্ত দাঁড়িপালা দিয়ে ওজন দিবে। এটা খুবই ভাল নীতি, আর এর পরিণামও অতি উত্তম। (৩৬) (তের) যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই , তার পিছনে

লেগে পড়ো না। নিশ্চয় কান, চোখ ও দিল এদের সবকিছুকেই জিজ্ঞাসিত হতে হবে। (৩৭) (চৌদ্দ) যমীনে চলাফেরার সময় দম্ভভরে চলাফেরা করো না। তোমরা না যমীনকে কখনো বিদীর্ণ করতে পারবে, আর না উচ্চতায় পর্বত প্রমাণ হতে পারবে। (৩৮) এসবের মধ্যে যেগুলো মন্দ ও খারাপ কাজ, সেগুলো তোমাদের রবের নিকটও অপছন্দনীয়।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ وَ -এবং। قَضٰى -ফয়সালা করে দিয়েছেন/ নির্দেশ দিয়েছেন। رَبُّكَ -আপনার প্রতিপালক। اَلاَّ -যে না। تَعْبُدُوْٓا -তোমরা ইবাদত করো। اِلاَّ - ছাড়া। اِيَّاهُ -শুধু/কেবলমাত্র। وَ -ও। بِالْوَالِدَيْنِ -পিতা-মাতার সাথে। اِحْسَانًا -উত্তম/ভাল ব্যবহার। اِمَّا - যদি। يَبْلُغَنَّ -তারা পৌঁছে। عِنْدَكَ -তোমার কাছে। الْكِبَرَ - বার্ধক্যে। اَحَدُهُمَا -তাদের দু'জনের একজন। اَوْ -বা/কিংবা। كِلٰهُمَا-তাদের উভয়ে। فَلاَ - তবে না। تَقُلْ - বলবে। لَهُمَا - তাদের দু'জনকে। اُفٍّ -'উহ' শব্দ। لاَتَنْهَرْهُمَا -তাদের দু'জনকে ধমক দিবে না। قَوْلاً - কথা। كَرِيْمًا -সম্মানজনক। وَاخْفِضْ-এবং নতো করবে। جَنَاحَ -বাহু। الذُّلِّ -নম্রতার। مِنَ الرَّحْمَةِ -দয়া/মমতাবশে। رَبِّ -হে আমার রব। ارْحَمْهُمَا-তাদের দু'জন কে দয়া করো। كَمَا-যেমন। رَبَّيٰنِيْ -দু'জনা আমাকে পালন করেছে। صَغِيْرًا -বাল্যকালে। رَبُّكُمْ - তোমাদের রব اَعْلَمُ-বেশী জানেন। بِمَا -ঐ সম্পর্কে। فِيْ -মধ্যে। نُفُوْسِكُمْ -তোমাদের অন্তরসমূহের। تَكُوْنُوْا -তোমরা হও। صٰلِحِيْنَ - সৎকর্মশীল। فَاِنَّهُ -তবে নিশ্চয়ই তিনি। كَانَ -হলেন। لِ -জন্যে। اَوَّابِيْنَ -অভীমুখীদের। غَفُوْرًا - ক্ষমাশীল। اٰتِ -দিবে। ذَاالْقُرْبٰى -আত্মীয়-স্বজন। حَقَّهُ -তার প্রাপ্য/ অধিকার। الْمِسْكِيْنَ -অভাবী। ابْنَ السَّبِيْلِ -পথিক/মুসাফীর। لاَ -না।

الْمُبَذِّرِيْنَ-অপব্যয় করো। تَبْذِيْرًا-কোন অপব্যয়। اِنَّ-নিশ্চয়। تُبَذِّرْ
-অপব্যয়কারীরা। كَانُوْا-হলো। اِخْوَانَ-ভাই। الشَّيٰطِيْنِ-শয়তানদের।
لِرَبِّهٖ-তার রবের। كَفُوْرًا-অকৃতজ্ঞ। تُعْرِضَنَّ-উপেক্ষা/পাশকাটানো।
عَنْهُمْ-তাদের থেকে। ابْتِغَاءَ-সন্ধানে। رَحْمَةٍ-অনুগ্রহ। تَرْجُوْهَا-তা
তোমরা আশা করো। فَقُلْ-তখন বলো। لَهُمْ-তাদেরকে। مَيْسُوْرًا-
সহজভাবে। تَجْعَلْ -রেখো। يَدَكَ-তোমার হাত। مَغْلُوْلَةً-আবদ্ধ।
اِلٰى- দিকে/সাথে। عُنُقِكَ-তোমার গলা। تَبْسُطْهَا-তা প্রসারিত করো।
كُلَّ -সম্পূর্ণ। الْبَسْطِ-প্রসারিত। فَتَقْعُدَ-তা হলে বসে পড়বে। مَلُوْمًا-
নিন্দিত। مَحْسُوْرًا-অক্ষম অবস্থায়। يَبْسُطُ-প্রশস্ত করেন। الرِّزْقَ-
রিযিক/জীবিকা। لِمَنْ يَّشَاءُ-যাকে ইচ্ছা। يَقْدِرُ-সীমিত/সংক্রীর্ণ করেন।
اِنَّهٗ-নিশ্চয়ই তিনি। كَانَ-হলেন। بِعِبَادِهٖ-তাঁর বান্দা সম্পর্কে। خَبِيْرًا-
খুব অবহিত। بَصِيْرًا-সর্বদ্রষ্টা। لَاتَقْتُلُوْا-তোমরা হত্যা করো না। اَوْلَادَ
كُمْ-তোমাদের সন্তানদেরকে। خَشْيَةَ-ভয়ে। اِمْلَاقٍ-দারিদ্রের। نَحْنُ-
আমরা। نَرْزُقُهُمْ-তাদের রিযিক দেই। اِيَّاكُمْ-তোমাদেরকেও। قَتْلَهُمْ-
তাদের হত্যা করা। خِطْاً-পাপ। كَبِيْرًا-বিরাট। لَاتَقْرَبُوْا-তোমরা যেয়ো
না। الزِّنٰى-যিনার। اِنَّهٗ-নশ্চয়ই তা। فَاحِشَةً-অশ্লীল কাজ। سَاءَ-নিকৃষ্ট।
سَبِيْلًا-পথ/পন্থা। النَّفْسَ-কোন প্রাণ। الَّتِىْ-যা। حَرَّمَ-নিষিদ্ধ করেছেন।
اِلَّا -ব্যতীত/ছাড়া। بِالْحَقِّ-ন্যায়ভাবে। مَنْ-যে। قُتِلَ-নিহত হয়েছে।
مَظْلُوْمًا-নির্যাতিত হয়ে। فَقَدْ-সেক্ষেত্রে অবশ্যই। جَعَلْنَا-আমরা দিয়েছি।
لِوَلِيِّهٖ-তার উত্তরাধিকারীকে। سُلْطٰنًا-অধিকার/ক্ষমতা। فَلَا-সুতরাং না।
يُسْرِفْ-সে সীমালংঘন করে। فِى الْقَتْلِ-হত্যার ব্যাপারে। مَنْصُوْرًا-

সাহায্য প্রাপ্ত। لَاتَقْرَبُوْا -তোমরা নিকটে যেও না। مَالَ الْيَتِيْمِ- ইয়াতীমের ধন-সম্পদের। اِلَّا -ছাড়া। بِالَّتِىْ- সেটা। هِىَ -যা। اَحْسَنُ- অতি উত্তম। حَتّٰى -যতক্ষণ। يَبْلُغَ- সে পৌছে। اَشُدَّهٗ- তার যৌবনে। اَوْفُوْا -তোমরা পূর্ণ করবে। بِالْعَهْدِ -শপথ/অঙ্গীকার। كَانَ -হলো। مَسْئُوْلًا -জিজ্ঞাসা করা হবে। اَلْكَيْلَ -মাপ/ওজন। اِذَا -যখন। كِلْتُمْ- তোমরা মেপে দেবে। وَزِنُوْا-এবং তোমরা ওজন করবে। بِالْقِسْطَاسِ -দাড়িপালা দিয়ে। اَلْمُسْتَقِيْمِ - সঠিক/ঠিকঠিক। ذٰلِكَ -ঐটা/এটা। خَيْرٌ– উত্তম। اَحْسَنُ - উৎকৃষ্ট। تَاْوِيْلًا- পরিণামে। تَقْفُ -পিছনে পড়ো। مَا- যা। لَيْسَ -নাই। لَكَ -তোমার জন্য। بِهٖ- তা সম্পর্কে। عِلْمٌ- কোন জ্ঞান। اَلسَّمْعَ -কান। اَلْبَصَرَ- চোখ। اَلْفُوَادَ -অন্তর। كُلُّ -প্রত্যেকটি। اُولٰئِكَ -ঐসবগুলো। كَانَ-হলো। لَاتَمْشِ -চলাফেরা করো না। مَرَحًا- দম্ভভরে। اِنَّكَ -নিশ্চয়ই তুমি। لَنْ -কক্ষণ না। تَخْرِقَ -দীর্ণ করতে পারবে। تَبْلُغَ -তুমি পৌছবে। اَلْجِبَالَ -পাহাড়সমূহ। طُوْلًا -উচ্চতা। سَيِّئُهٗ-তার খারাপ দিক। عِنْدَ - কাছে/নিকটে। رَبِّكَ- তোমার প্রতিপালক। مَكْرُوْهًا -অপছন্দনীয়।

সম্বোধন ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা ! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি অয়া বারাকাতুহু। আমি আপনাদের সামনে দারস পেশ করার জন্য পবিত্র কালামে হাকীম আল কুরআনের "বানী ইসরাঈলের" ২৩ থেকে ৩৮ পর্যন্ত মোট ১৬ টি আয়াত তিলাওয়াত ও সরল অনুবাদ পেশ করেছি। আল্লাহপাক যেন আমাকে আপনাদের সামনে আয়াতগুলোর দারস সঠিক ভাবে পেশ করার তাওফীক দান করেন।

সূরার নামকরণ ঃ অত্র সূরার ৪ নং আয়াতে وَقَضَيْنَا اِلٰى بَنِىْ اِسْرَاءِيْلَ فِى الْكِتٰبِ উল্লেখিত بَنِىْ اِسْرَاءِيْلَ শব্দটিকেই এই সূরার নাম হিসেবে

বেছে নেওয়া হয়েছে। بَنِىْ اِسْرَاءِيْلَ অর্থ “ইসরাঈলের বংশধর।” তবে এটা মনে রাখতে হবে যে, এই সূরার আলোচ্য বিষয় বানী ইসরাঈল নয়। এই জন্য এই সূরার নামকরণ কোন শিরোনাম হিসেবে করা হয়নি, বরং অন্যান্য অধিকাংশ সূরার ন্যায় প্রতীকী বা চিহ্ন হিসেবে এই সূরার নাম ‘বানী ইসরাঈল’ রাখা হয়েছে। তবে যা কিছু করা হয়েছে ওহীর নির্দেশ অনুযায়ীই করা হয়েছে।

সূরাটি নাযিল হওয়ার সময়কাল ঃ সর্বসম্মতিক্রমে সূরাটি মাক্কী। প্রথম আয়াতটি হতে নিঃসন্দেহে বুঝতে পারা যায় যে, এই গোটা সূরাটি নবী করীম (সঃ) এর মি'রাজের সময় নাযিল হয়েছে। বিশুদ্ধ হাদীস ও জীবন ইতিহাসে উল্লেখিত অধিকাংশ বর্ণনার দৃষ্টিতে জানা যায় যে, হিজরাতের এক বছর পূর্বে এই মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল। সুতরাং এই সূরাটিও মাক্কী পর্যায়ের শেষের দিকে নাযিলকৃত সূরাসমূহের মধ্যে একটি নাযিলকৃত সূরা।

সূরাটি নাযিলের পটভূমি ঃ নবী করীম (সঃ) দাওয়াতের মাধ্যমে মক্কা নগরীতে তাওহীদের আওয়ায বুলন্দ করেছিলেন। তাঁর এই দাওয়াতী অভিযান ইতোপূর্বে প্রায় বারো বছর পার হয়ে গেছে। তাঁর এই দাওয়াতের কাজে বাধা দানের সর্বশেষ চেষ্টা চালাতেও তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা দ্বিধাবোধ করেনি। কিন্তু তাদের সকল প্রকার বাধা-প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তাওহীদের দাওয়াত ইতোমধ্যে এমনভাবে প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌছে গেছে যে, তাঁর এই দাওয়াতে দু'চারজন লোকও প্রভাবিত হয়নি এমন কোন একটি গোত্রও গোটা আরবে ছিলো না। এমনকি মক্কা নগরীতেই এমন একদল নিষ্ঠাবান লোক গড়ে উঠেছিলো, যারা এই মহান তাওহীদি দাওয়াতের সফলতার জন্য যে কোন বিপদ-আপদের ঝুঁকি গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলো। ইতোমধ্যে মদিনায় আওয়াস ও খাজরাজের মতো শক্তিশালী দু'টি গোত্রের বিরাট সংখ্যক লোক তাঁর সমর্থক হয়ে গিয়েছিলো। আর এরই মধ্যে সেই সময়টিও অতি নিকটবর্তী হয়ে এসেছিলো, যখন নবী করীম (সঃ) মক্কা থেকে মদীনায় চলে যাবার এবং চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মুসলমানদেরকে একটি স্থানে একত্রিত করে একটি পূর্ণাংগ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার সুবর্ণ সুযোগ হাজির হয়ে গিয়েছিলো। আর ঠিক এরূপ অবস্থাতেই মি'রাজের বিস্ময়কর ঘটনাটি সংঘটিত হয়। মি'রাজ হতে ফিরে এসে নবী করীম (সঃ) বিশ্ববাসীর সামনে এই ভাষণটি পেশ করেছিলেন।

সূরাটির মূল বক্তব্য ঃ এই সূরার মূল বক্তব্য তিনটি। ১. সাবধান ও সতর্কতা। ২. বুঝ-সমঝ প্রদান এবং ৩. শিক্ষাদান। এই তিনটি বিষয় আনুপাতিক সামঞ্জস্যের সাথে এই সূরায় পরিবেশন করা হয়েছে।

তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর মূল বক্তব্য ঃ তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোতে প্রাথমিকভাবে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার মৌলিক বিধি-বিধান ও নীতিমালা আলোচিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা ! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে দারস বুঝার সুবিধার্তে কতিপয় অথচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরা হলো। এখন আমি আপনাদের খিদমতে তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর ধারাবাহিকভাবে ব্যাখ্যা পেশ করছি।

আয়াতের প্রথমেই وَقَضٰى رَبُّكَ **তোমার রব নির্দেশ দিচ্ছেন** এই কথা বলে পরবর্তীতে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্য প্রাথমিকভাবে ব্যক্তি,পরিবার , সমাজ ও রাষ্ট্রের বিধি-বিধানগুলো পরপর মহান আল্লাহ তা'লা নবী করীম (সঃ) এর মাধ্যমে গোটা দুনিয়াবাসীর সামনে তুলে ধরেছেন। আর এটা ছিলো নবী করীম (সঃ) এর মাক্কী জীবনের শেষ পর্যায়ে এবং মাদানী জীবনের প্রারম্ভকালে। নির্দেশগুলো হলো এই –

এক. اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ **তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারোরই ইবাদাত করবে না**। এর অর্থ শুধু এতোটুকুই নয় যে,আল্লাহ ছাড়া অপর কারোও পূজা-অর্চনা করবে না, বরং এর সাথে এটাও যে, দাসত্ব , আনুগত্য এবং অনুসরণ বিনা শর্তে মেনে চলতে হবে একমাত্র আল্লাহ তা'লাকে।তাঁর নির্দেশকেই একমাত্র নির্দেশ এবং তাঁর আইনকেই একমাত্র আইন বলে স্বীকার করতে হবে এবং মেনে চলতে হবে। তাঁকে ছাড়া আর কারোর প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়া যাবে না। আল্লাহ তা'লাই বিশ্ব জাহানের মালিক ও বাদশা এবং সার্বভৌম। আর তাঁরই দেয়া শরীয়তই গোটা দেশের জন্য আইন।

দুই . وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ط اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا

আর পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করবে। তোমাদের নিকট যদি তাদের মধ্যে কোন একজন অথবা উভয়ই বৃদ্ধাবস্থায় থাকে, তবে তাদেরকে 'উহ' শব্দটি পর্যন্ত বলবে না এবং তাদেরকে ধমক দিবে না; বরং তাদের সাথে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা বলবে এবং বিনয় ও নম্রতার সাথে তাদের সামনে নতো হয়ে থাকবে। আর এই দোয়া করতে থাকবে, 'হে আমার রব ! তাঁদের উভয়ের প্রতি রহম করো, যেমন করে তারা আমাকে বাল্যকালে স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে লালন-পালন করেছে।

আল্লাহর ইবাদাতের পর দ্বিতীয় যে নির্দেশটি দিচ্ছেন তা হলো বাপ-মায়ের অধিকার আদায় সম্পর্কে। মহান আল্লাহ তা'লা সন্তানদেরকে নির্দেশ দিয়ে বলছেন যে, তারা আমার পরই বাপ-মায়ের আনুগত্য করবে, তাদের সেবা-যত্ন করবে এবং আদব রক্ষা করবে। সমাজ ব্যবস্থার সামগ্রীক নৈতিক ব্যবস্থা হবে এরূপ যে, সন্তানেরা বাপ-মায়ের ব্যাপারে বেপরওয়া হবে না। বরং এর পরিবর্তে অনুগ্রহশীল ও সম্মানবোধ সম্পন্ন হবে। সন্তানকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন বৃদ্ধ পিতা-মাতার খিদমত করতে যেয়ে অতিষ্ঠ হয়ে 'উহ' শব্দ করে না বসে। অথবা বাপ-মা যেন সন্তানের আচারণে কষ্ট পেয়ে 'উহ' শব্দ করে না বসে। কথা বলার সময় বাপ-মা সে শিক্ষিত হোক অথবা অশিক্ষিত হোক তাদেরকে তিরস্কার করা যাবে না;বরং সম্মান দিয়ে কথা বলতে হবে। আর সে যতই ধনাঢ্য বা পন্ডিত ব্যক্তি হোক না কেন বাপ-মায়ের সামনে সর্বদা নতো থাকবে, নম্র-ভদ্র থাকবে। সতর্ক সাবধান থাকতে হবে,যেন কোন সময়ের জন্য তাদের সাথে কথা ও কাজে বিয়াদবি না হয়ে যায়। আর মনের সবটুকু আবেগ উজাড় করে এই দোয়া করবে, "হে আমার পরওয়ারদিগার ! আমার বাপ-মায়ের প্রতি এমনই দয়া ও রহম করো যেমন ভাবে তারা আমার শিশুকালে প্রাণ উজাড় করে দয়া-স্নেহ দিয়ে লালন-পালন করেছে।

তবে হ্যাঁ, কাফির বা মুসরীক পিতা-মাতার জন্য মু'মিন সন্তানদের দোয়া করা চলবে না এবং তাদের কুফরী বা শিরকী কথা শুনাও যাবে না ও মানাও যাবে না, তবে দুনিয়ার আর সমস্ত অধিকার তারা সন্তানদের কাছ থেকে ভোগ করতে পারবে।

হযরত আসমা (রাঃ) নবী করীম (সঃ) কে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমার মা একজন মুশরীকা। তিনি আমার সাথে দেখা করতে

এসেছেন। তাকে আদর-আপ্যায়ন করার অনুমতি আছে কি ? তিনি (সঃ) বললেন , صلى أمك "তোমার মাকে আদর-আপ্যায়ন করাও।"

(সহীহ বুখারী)

কাফির বাপ-মা সম্পর্কেও স্বয়ং আল কুরআনে বলা হয়েছে-

وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا "যার বাপ-মা কাফির তাদের আদেশ পালন করা জায়েয নয়, কিন্তু দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে হবে।" প্রকৃতপক্ষে আয়াতে "মা'রুফ" বলে তাদের সাথে আদর-আপ্যায়নমূলক ব্যবহার বুঝানো হয়েছে।

এ বিষয়ে সকল ওলামায়ে কিরাম এবং ফিকাহবিদগণ একমত হয়েছেন যে, পিতা-মাতার আনুগত্য শুধু মা'রুফ কাজে ওয়াজিব। অবৈধ বা মুনকার কাজে আনুগত্য ওয়াজিব তো নয়ই, বরং জায়েযও নয়। হাদীসে বলা হয়েছে لَاطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ "সৃষ্টিকর্তার নাফরমানী করে কোন সৃষ্টিজীবের আনুগত্য করা বৈধ নয়।"

অতঃপর পরবর্তী আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন –

رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِىْ نُفُوْسِكُمْ ۭ اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا

তোমাদের পরওয়ারদিগার তোমাদের ভাল ভাবেই জানেন তোমাদের মনে কি আছে। তোমরা যদি নেক-চরিত্রবান হয়ে থাক, তবে তিনি তওবাকারীদের জন্য ক্ষমাশীল।

এই আয়াত দ্বারা ঐ লোকদের বুঝানো হয়েছে যাদের হঠাৎ করে বাপ-মায়ের সাথে এমন কথা হয়ে যায় যেটা তাদের নিজের মতে কোন দোষের ও পাপের কথা নয়। তাদের নিয়্যাত ভাল বলেই আল্লাহ তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। যারা বাপ-মায়ের অনুগত এবং নামাযী, তাদের দোষত্রুটি আল্লাহ ক্ষমা করে দেন।

لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا এর اَوَّابِيْنَ এর অর্থ বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকম করেছেন। তবে এখানে যে অর্থটি সবচেয়ে বেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ তাহলো

ঈমাম জারীর (রহঃ) এর উক্তি। তিনি বলেন, أَوَّابِيْنَ হলো তারাই, যারা গুনাহ্ হতে তাওবা করে অবাধ্যতা থেকে আনুগত্যের দিকে ফিরে আসে, আল্লাহ্র কাছে যা অপছন্দনীয় কাজ তা ত্যাগ করে এবং যে কাজে তিনি সন্তুষ্ট সেই কাজ করতে শুরু করে। এই উক্তিটিই সঠিকতম। কেননা, أَوَّابُ শব্দটি أَوْبُ শব্দ হতে বের হয়েছে এবং এর অর্থ হচ্ছে 'ফিরে আসা'।

তিন. وَاٰتِ ذَاالْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَاتُبَذِّرْتَبْذِيْرًا

আত্মীয়-স্বজনকে তার হক দিয়ে দাও, আর মিসকীন ও সম্বলহীন পথিককেও দিয়ে দাও তাদের হক।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার তৃতীয় যে মৌলনীতি তা হলো, আত্মীয়-স্বজন, অভাবী এবং নিঃস্বল পথিক বা মুসাফিরকে তাদের হক তথা প্রাপ্য দিয়ে দিতে হবে।

এই তিনটি মৌলিক নীতির লক্ষ্য এই যে, ব্যক্তি তার উপার্জিত ধন-সম্পদকে নিজের জন্যই কেবলমাত্র সংরক্ষিত করে রাখবে না বরং নিজের প্রয়োজন পূরণ করার পর নিজের আত্মীয়-স্বজন অর্থাৎ নিকট থেকে দূরবর্তী আত্মীয়-স্বজন, মিসকীন অর্থাৎ অভাবী, যার অত্যন্ত প্রয়োজন আছে কিন্তু সামাজিক লজ্জার কারণে চাইতে পারে না এমন ব্যক্তি এবং সম্বলহারা পথিকদের প্রয়োজন পূরণের জন্য খরচ করতে হবে। সামাজিক জীবনে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা, সহানুভূতি ও অধিকার জানা ও মানার ভাবধারা সৃষ্টি করতে হবে। প্রত্যেক আত্মীয় অপর আত্মীয়ের সাহায্যকারী হবে এবং প্রত্যেক সামর্থবান ব্যক্তি আপন আপন নিকটবর্তী অভাবী লোকদের জন্য সাহায্যকারী হবে। একজন মুসাফীর সে যেখানেই উপস্থিত হবে, সেখানেই সে নিজেকে অথিতিপরায়ণ লোকদের মধ্যে নিজেকে দেখতে পাবে। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের উপর এবং নিজের ধন-সম্পদের উপর চারপাশের অন্যান্য লোকদের অধিকার অনুভব করবে। সে তাদের খিদমত করবে এই মনোভব নিয়ে যে, সে তাদের অধিকার আদায় করতেছে। এ আয়াতে আত্মীয়-স্বজন, অভাবী এবং মুসাফীরদেরকে আর্থিক সাহায্য করাকে তাদের হক বা প্রাপ্য গণ্য করার ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাদের প্রতি দাতার অনুগ্রহ বা দয়া প্রকাশের কোন কারণ নেই। কেননা, তাদের হক তার যিম্মায় ফরয। দাতা সে ফরযই পালন করছে মাত্র, কারও প্রতি সে অনুগ্রহ করছে না।

চার. وَلَاتُبَذِّرْتَبْذِيْرًا ○ اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓااِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا

কিছুতেই অপচয় করো না। নিশ্চয় অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার রব এর প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ।

পবিত্র কুরআনে অপচয়কে দু'টি শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। একটি হলো- تَبْذِيْر এবং অপরটি হলো- اِسْرَاف আলোচ্য আয়াতে تَبْذِيْر অর্থাৎ অপচয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আর وَلَاتُسْرِفُوْا আয়াতে اِسْرَاف নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

এখানে অপব্যয়-অপচয় নিষেধ করা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের কৃপণ হওয়াও যেমন উচিত নয় তেমনি অপব্যয়ী হওয়াও উচিত নয়, বরং মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা উচিত। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে-

وَالَّذِيْنَ اِذَا اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا

"যখন তারা খরচ করে তখন তারা অপব্যয় করে না,কৃপণতাও করে না, বরং তারা এ দু'টোর মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করে।"

(সূরা আল ফুরকান-৬৭)

অতঃপর অপব্যয়ের খারাপ গুণের কথা বর্ণনা করে মহান আল্লাহ্ বলছেন- اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓااِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ "নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই।" تَبْذِيْر বলা হয় অন্যায় পথে ব্যয় করাকে। কেউ যদি তার সমুদয় মাল আল্লাহর পথে খরচ করে দেয় তবে তাকে অপব্যয়কারী বলা হবে না। পক্ষান্তরে অল্প সম্পদও যদি অন্যায় পথে খরচ করে , তবুও তাকে অপব্যয়কারী বলা হবে।

আর শয়তান তো মানুষকে সর্বদা অন্যায় পথে খরচ করার নির্দেশ দিয়েই থাকে। আর যারা অন্যায় ও অবৈধ পথে খরচ করে তারা শয়তানের পথই অনুসরণ করে চলে বিধায় অপব্যয়কারীকে শয়তানের ভাই বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর শয়তান তো তার রব এর প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ অর্থাৎ কুফরী করে থাকে।

পাঁচ. وَاِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلاً مَّيْسُوْرًا

তুমি যদি তোমর রব এর রহমত পাবার আশায় অপেক্ষমান থাকা কালে কোন সময় তাদেরকে (অর্থাৎ আত্নীয়-স্বজন, মিসকীন,মুসাফীর) পাশ কেটে থাকতে চাও, তাহলে তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বলো।

এই আয়াতে মহান আল্লাহ তা'লা রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর মাধ্যমে সমস্ত উম্মতকে উন্নত নৈতিক চরিত্রের শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, যদি কোন সময় অভবী লোকজন তোমার কাছে কিছু চাই আর তোমার কাছে দেয়ার মতো কিছু না থাকার কারণে তাদের থেকে মুখ ফিরাতে বাধ্য হও, তবে এ মুখ ফিরানো যেন ঐসব লোকদের জন্য অপমানজনক ও মনোকষ্টের কারণ না হয়, বরং তা তাদের নিকট প্রমাণিত হয় যে, তুমি কেবলমাত্র অপরাগতা ও অক্ষমতার কারণেই তাদেরকে পাশ কেটে চলছো। আর এই অপরাগতার জন্য তাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে এবং আগামীতে যেন তাদের খিদমত করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারো এবং আল্লাহ পাকও যেন তাকে এই যোগ্যতা দান করেন তার জন্য দোয়া চেয়ে নিতে হবে।

ছয়. وَلَاتَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَاتَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا ○ اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ ط اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا

তোমরা একেবারে মুষ্টিবদ্ধ (কৃপণ) হয়ো না এবং একেবারে মুক্তহস্তও (দাতাও) হয়ো না-তা হলে তোমরা তিরস্কৃত হবে এবং নিঃস্ব হয়ে বসে থাকবে। নিশ্চয় তোমার রব যাকে ইচ্ছা বেশী বেশী রিযিক দান করেন , আবার তিনিই যাকে চান তার রিযিক সংক্রীর্ণ করে দেন। তিনি তার বান্দাদের সম্পর্কে ভালভাবেই অবহিত আছেন এবং তাদেরকে দেখছেনও।

এই নীতিমালাতেও খরচের ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'লা এখানে বলেছেন, খরচের বিষয়ে তোমরা মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো। একেবারে কৃপণও হয়ো না, অবার অপব্যয়ীও হয়ো না। তোমার হাত তোমার গলার সাথে বেঁধো না। 'হাত বাঁধা' একটি রূপক কথা। এর দ্বারা বুঝায় কার্পণ্য। আর হাত ছাড়িয়ে দেয়ার অর্থ অপচয়-অপব্যয়-বেহুদা খরচকে বুঝায়।

মদিনার ইহুদীরা এই বাক পদ্ধতির ব্যবহার করতো। ৪র্থ দফার সাথে এই ৬ নং দফার অংশটুকু মিলিয়ে পড়লে মূল বক্তব্য স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। আর তাহলো মানুষের মধ্যে এতটুকু নীতিবোধ থাকা প্রয়োজন যে, তারা না কৃপণ হয়ে ধন-সম্পদের আবর্তনকে বাধাগ্রস্থ করবে, আর না অপচয় ও অপব্যয়ী হয়ে নিজেদের অর্থনৈতিক শক্তিকে বিনষ্ট করবে। পক্ষান্তরে তাদের মধ্যে ভারসাম্যতার এমন এক নির্ভুল অনুভূতি বর্তমান থাকতে হবে যে, তারা প্রয়োজনীয় খরচ হতে বিরতও থাকবে না এবং বেহুদা খরচের কারণে তারা বিপর্যয়ের মধ্যেও পড়বে না। অহংকার, রিয়া এবং লোক দেখানোর কাজে অর্থ ব্যয় করা, বিলাসিতা ও পাপ কাজে অর্থ ব্যয় করা এবং প্রকৃত প্রয়োজনীয় ও কল্যাণময় কাজে অর্থ বিনিয়োগের পথে অর্থ ব্যয় না করা আসলে আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতি চরম অকৃতজ্ঞতা। যেসব লোক নিজেদের ধন-সম্পদ এসব কাজে ব্যয় ও ব্যবহার করে তারা প্রকৃতপক্ষেই শয়তানের ভাই।

কার্পণ্য এবং অপব্যয় এর কারণ বর্ণনা করে মহান আল্লাহ বলেন, কৃপণতা করলে তোমরা নিন্দার পাত্র হয়ে যাবে। সবাই বলবে যে লোকটি বড়ই কৃপণ। সুতরাং সবাই তোমার থেকে দূরে সরে থাকবে। কারণ, তারা জানে যে, তোমার কাছ থেকে কোন কিছু পাবার আশায় নেই। যেমন যুহায়ের ইবনে আবি সালমা তাঁর মুয়াল্লাকায় (কবিতায়) বলেছেন -

ومن كان ذامال ويبخل بماله على قومه يستغن عنه ويذمم

"যে মালদার হওয়ার পরও তার মাল তার জাতির জন্য খরচ করতে কার্পণ্য করে, তার থেকে মানুষ অমুখাপেক্ষী হয়ে তার দুর্নাম করে থাকে।"

সুতরাং কৃপণতার কারণে মানুষ মন্দ হিসেবে গণ্য হয়ে যায় এবং সে মানুষের চোখের বালি হয়ে পড়ে। সবাই তাকে ভৎর্সনা করতে থাকে। অপরপক্ষে যে লোক দান-খয়রাত করার ব্যাপারে সীমা ছাড়িয়ে যায়, শেষ পর্যন্ত সে অসমর্থ হয়ে বসে পড়ে। তার হাত শুন্য হয়ে যায় এবং এর ফলে সে দূর্বল ও অপারগ হয়ে পড়ে।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কৃপণ ও দাতার উদাহরণ ঐ দু'ব্যক্তির মতো যাদের গায়ে বুক থেকে গলা পর্যন্ত দু'টি লোহার জুব্বা রয়েছে। দাতা যখন খরচ করে তখন ওর কড়াগুলি পৃথক হয়ে যায় এবং তার হাত খুলে যায়-শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং ওর চিহ্ন মিটিয়ে দেয়। আর কৃপণ ব্যক্তি

যখনই খরচ করার ইচ্ছা করে তখনই তার জুব্বার কড়াগুলি আরো জড়ো হয়ে যায়। সে যতই ওটাকে প্রশস্ত করার চেষ্টা করে ততই তা সংক্রীর্ণ হয়ে যায় এবং আর কোন জায়গাই থাকে না। (সহীহ বুখারী, মুসলিম)

সেই সময়ের ইসলামের নৈতিক প্রশিক্ষণের প্রভাব বর্তমান মুসলিম সমাজের উপরও প্রকট হয়ে আছে। মুসলমান যেখানেই থাকুক না কেন, তারা কৃপণ ও অপব্যয়কারীদের ঘৃণার চোখেই দেখে থাকে। আর দানশীল মানুষকে আজও সর্বত্র সম্মানের চোখেই দেখে থাকে।

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন, "আল্লাহই হচ্ছেন তার বান্দাদের রিযিক দাতা। তিনিই যার জন্য ইচ্ছা রুযি বৃদ্ধি করে থাকেন আবার তিনিই কমতি করে থাকেন। তিনিই যাকে ইচ্ছা ধনী এবং যাকে ইচ্ছা গরীব করে থাকেন। তাঁর প্রতিটি কাজ হিকমতপূর্ণ। তিনি ভালভাবেই জানেন, কে সম্পদ লাভের যোগ্য, আর কে গরীব অবস্থায় জীবন-যাপন করার যোগ্য"।

হাদীসে কুদসীতে রয়েছে যে, মহান আল্লাহ বলেন, আমার কতক এমন বান্দাহ রয়েছে যারা গরীব থাকারই যোগ্য। আমি যদি তাদেরকে ধনী করে দিই তাহলে তাদের দ্বীন ধ্বংস হয়ে যাবে। আবার কতক বান্দাহ এমনও রয়েছে, যারা ধনী হওয়ারই যোগ্য। যদি আমি তাদেরকে গরীব করে দিই তবে তাদের দ্বীন নষ্ট হয়ে যাবে। তবে হ্যাঁ, এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, কতগুলো লোকের পক্ষে সম্পদের প্রাচুর্য ঢিল বা অবকাশ হিসেবে হয়ে থাকে এবং কতকগুলো মানুষের পক্ষে গরীব শাস্তি স্বরূপ হয়ে থাকে।

(ইবনে কাসীর)

সাত. وَلَاتَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ط نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا

দারিদ্রের ভয়ে নিজেদের সন্তানকে হত্যা করো না। তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই রিযিক দিয়ে থাকি। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মস্ত বড়ই অপরাধ।

পূর্ববর্তী ধারাগুলোতে একেরপর এক মানবিক অধিকার সংক্রান্ত নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য এই ধারাতে জাহেলী যুগের একটি নিপীড়নমূলক অভ্যাস সংশোধনের উদ্দেশ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। জাহেলিয়াতের যুগে

কেউ কেউ জন্মের পর পরই সন্তানকে বিশেষ করে মেয়ে সন্তানকে হত্যা করতো, যাতে তাদের ভরণ-পোষণের বোঝা বহন করতে না হয়। আলোচ্য এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা তাদের এই কার্যকলাপ যে অত্যন্ত জঘণ্য ও ভ্রান্ত তা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তাদেরকে অনুধাবন করতে বলা হয়েছে যে, রিযিকদানের তোমরা আবার কে ? এটা তো একান্তভাবে আল্লাহ্ তা'লার কাজ। তিনি তো তোমাদেরকে রিযিক দিয়ে থাকেন। যিনি তোমাদেরকে রুযি দান করেন, তিনিই তাদের জন্যও রিযিকের ব্যবস্থা করবেন। অতএব তোমরা কেন সন্তান হত্যার অপরাধে অপরাধী হচ্ছো ? বরং এক্ষেত্রে রুযি দেয়ার বর্ণনায় সন্তানদের কথা আগে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করেছেন যে, আমি আগে তাদেরকে ও পরে তোমাদেরকে রুযি দিবো। এর প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো এই যে, আল্লাহ তা'লা যে বান্দাকে নিজের পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণ ও অন্যান্য গরীব লোকদের সাহায্য-সহযোগিতা করতে দেখেন, তাকে সে হিসেবেই দান করেন, যাতে সে নিজের চাহিদাও মেটাতে পারে এবং অন্যদেরকেও সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারে।

এক হাদীসের বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন,

بضعفائكم انم تنصرون وترزقون

"তোমাদের মধ্যে দুর্বলদের জন্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের সাহায্য করা হয় এবং তোমাদেরকে রিযিক দেয়া হয়।"

এতে জানা গেল যে, পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য বাপ-মা যা কিছু পায়, তা দুর্বল নারী ও শিশু সন্তানদের ওসিলাতেই পায়।

প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিভিন্নভাবে জন্ম নিয়ন্ত্রনের যেসব আন্দোলন চালিয়ে আসছে, আলোচ্য এই আয়াতে এর অর্থনৈতিক ভিত্তিকে চূড়ান্তভাবে নির্মূল করে দেয়া হয়েছে। জাহেলিয়াতের যুগে দারিদ্রের ভয়ে মানুষকে নিজেদের শিশুসন্তানকে হত্যা করা ও গর্ভপাত করার কাজে উদ্বুদ্ধ করতো। আর বর্তমান সময়ে তা এক তৃতীয় পন্থা অর্থাৎ গর্ভ নিরোধের দিকে দুনিয়াবাসীকে ঠেলে দেয়া হয়েছে। কিন্তু ইসলামের এই ধারাটি সাধারণ মানুষকে এই শিক্ষাই দিচ্ছে যে, তারা যেন দারিদ্রের ভয়ে লোক সংখ্যা কম করার ধ্বংসাত্মক প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করে এমন সব গঠনমূলক প্রচেষ্টায় নিজেদের শক্তি ও কর্মক্ষমতা নিয়োগ করে,

যার ফলে আল্লাহর বানানো স্বভাব-নীতি অনুযায়ী রিযিকের প্রাচুর্য লাভ করা সম্ভব হয়।

এই শিক্ষার ফলেই পবিত্র আল কুরআন নাযিল হওয়ার সময় কাল হতে বর্তমান সময় কাল পর্যন্ত কোন যুগেই মুসলমানদের মধ্যে বংশ হত্যার সাধারণ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় না।

আয়াতের শেষে সন্তান হত্যার পরিণতি সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا "নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ।"

خِطْاً শব্দটি অন্য পঠনে خَطَاءً রয়েছে। আর উভয়ের অর্থ একই।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ) ! আল্লাহ তা'লার কাছে সব চেয়ে বড় পাপ কোনটি ? উত্তরে তিনি বলেন, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় পাপ হলো এই যে, তুমি তাঁর সাথে শরীক করবে- অথচ তিনি একাই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন, এরপর কোনটি ? তিনি জবাবে বলেন, তুমি তোমার সন্তানদের এই ভয়ে হত্যা করে ফেলবে যে, সে তোমার সাথে খাবে। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, এরপর কোনটি ? তিনি উত্তরে বললেন, তুমি তোমার প্রতিবেশীর সাথে যিনা করবে। (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

আট. وَلاَ تَقْرَبُوْا الزِّنٰى اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ط وَسَاءَ سَبِيْلاً

যিনার ধারে কাছেও যেও না। কেননা এটা অত্যন্ত অশ্লীল ও নিকৃষ্ট পথ।

এখানে যিনা হারাম হওয়ার দু'টি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম কারণ হলো, এটি একটি অশ্লীল কাজ। মানুষের মধ্যে লজ্জা-শরম না থাকলে সে মনুষ্যত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়।অতঃপর তার দৃষ্টিতে ভাল-মন্দ লোপ পেয়ে যায়। দ্বিতীয় কারণ হলো, সামাজিক বিশৃংখলা। যিনা-ব্যভিচারের কারণে এটা এতো বিস্তার লাভ করে যে, এর কোন সীমা-পরিসীমা থাকে না। এর অশুভ পরিণতিতে অনেক সময় গোটা গোত্র ও সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দেয়। বর্তমান বিশ্বে গোলযোগ, চুরি-ডাকাতি ও হত্যার যে ছড়াছড়ি তার মূল কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, অর্ধেকেরও বেশী ঘটনার কারণ কোন পুরুষ ও নারী এ অপকর্মের সাথে জড়িত। তাই এই নির্দেশটি যেমন ব্যক্তি হিসেবে মানুষের প্রতি,তেমনি সামগ্রিকভাবে গোটা সমাজের প্রতিও।

ব্যক্তির জন্য এই নির্দেশের তাৎপর্য হলো এই যে, তারা কেবল যিনার কাজ থেকে বিরত থাকাকেই যথেষ্ট মনে করে না, বরং সেই সংগে যিনার উদ্ভাবক ও প্রেরণাদানকারী অন্যান্য যাবতীয় কাজ ও মাধ্যম থেকেও দূরে থাকতে হবে। কেননা, এ সবই মানুষকে যিনার পথে টেনে আনে।

সমাজের জন্য কর্তব্য হলো এই যে, সামগ্রীক জীবনের ক্ষেত্রে যিনা, যিনার উদ্বোধক ও যিনা ঘটার কারণসমূহের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা। এই উদ্দেশ্যে আইন-কানুন তৈরী ও প্রয়োগ, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, সামাজিক পরিবেশের সংশোধন, সামাজিক জীবনের পূর্ণগঠন এবং এ ধরণের অন্যান্য উপায় ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

এই ধারাটি ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার এক ব্যাপক অধ্যায়ের ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এই দৃষ্টিতে যিনা ও যিনার মিথ্যা অভিযোগকে ফৌজদারী অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। পর্দার বিধান জারী করা হয়েছে। নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতাকে পূর্ণ শক্তি দিয়ে দমন ও বাধাগ্রস্থ করা হয়েছে। মদপান, গান-বাজনা, নাচ ও ছবি-চিত্র ইত্যাদিকে যিনা-ব্যভিচারের নিকটবর্তী কাজ হিসেবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। আর এমন এক পারিবারিক দাম্পত্য জীবনের জন্য বিধান তৈরী করা হয়েছে, যার ফলে বিয়ে সহজসাধ্য হয়ে গেছে এবং যিনা-ব্যভিচারের সামাজিক কার্যকলাপ চিরদিনের জন্য মুলোৎপাটিত হয়ে গেছে।

নয়. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ط وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفْ فِّى الْقَتْلِ ط اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا

প্রাণ হত্যার অপরাধ করো না, যাকে আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন, তবে ন্যায় ভাবে। আর যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হয়, আমি তার ওলীকে কেসাস দাবী করার অধিকার দান করেছি। অতএব সে যেন হত্যার ব্যাপারে সীমালংঘণ না করে। তার সাহায্য অবশ্যই করা হবে।

এই আলোচ্য ধারায় চারটি নীতিমালা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমতঃ অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা না করা। দ্বিতীয়তঃ ন্যায়ভাবে হত্যা করা। তৃতীয়তঃ ওলীকে কেসাস বা বদলার অধিকার দেয়া। চতুর্থতঃ হত্যার ব্যাপারে সীমালংঘণ না করা।

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ "আল্লাহ যা হারাম করেছেন এমন কাউকে হত্যা করো না।"

প্রথমত ঃ অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা না করা। অন্যায় হত্যা যে বড় অপরাধ তা বিশ্বের দলমত ও ধর্ম-অধর্ম নির্বিশেষে সবার কাছে স্বীকৃত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, "একজন মু'মিনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার চেয়ে আল্লাহর কাছে গোটা বিশ্বকে ধ্বংস করে দেয়া ছোট অপরাধ।" অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, "যদি আল্লাহ তা'লা সাত আসমান ও সাত যমীনের অধিবাসীরা একত্রিত হয়ে কোন মু'মিনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে , তবে আল্লাহ তা'লা সবাইকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।"

(ইবনে মাজাহ, মুসনাদে হাসান, বায়হাকী, মাযহারী)

রাসূলুল্লাহ (সঃ) আরও বলেন, "যে লোক কোন মুসলমানের হত্যাকান্ডে একটি কথা দ্বারাও হত্যাকারীকে সাহায্য করে, তবে হাশরের মাঠে সে যখন আল্লাহর সামনে হাজির হবে, তখন তার কপালে লেখা থাকবে "এই লোকটিকে আল্লাহর রহমত হয়ে নিরাশ করে দেয়া হয়েছে।"

(ইবনে মাজাহ-মাযহারী)

অন্য এক হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, প্রত্যেক গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করবেন বলে আশা করা যায়, কিন্তু যে ব্যক্তি কুফরী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে অথবা যে ব্যক্তি যেনে-শুনে ইচ্ছাপূর্বক কোন মুসলমান ব্যক্তিকে হত্যা করে, তার গুনাহ ক্ষমা করা হবে না। (বায়হাকী)

অন্যায় হত্যার ব্যাখ্যা ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে মুসলমান আল্লাহ এক এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল বলে সাক্ষ্য দেয়, তার রক্ত হালাল নয় ; কিন্তু তিনটি কারণে তা হালাল হয়ে যায়। (এক) বিবাহীত হওয়া সত্ত্বেও যদি সে যিনা করে, তবে তাকে পাথর মেরে হত্যা করাই তার শরীয়তসম্মত শাস্তি। (দুই) সে যদি অন্যায়ভাবে কোন মানুষকে হত্যা করে, তবে তার শাস্তি এই যে, নিহত ব্যক্তির ওলী তাকে কেসাস হিসেবে হত্যা করতে পারে। (তিন) যে ব্যক্তি ইসলাম ত্যাগ করে, তার শাস্তিও হত্যা।

(সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয়তঃ ন্যায়ভাবে হত্যা করা - اِلَّا بِالْحَقِّ "ন্যায়ভাবে হত্যা করা।" এ বিষয়ে ইসলামী আইন 'সত্যতার সাথে হত্যা' এর পাঁচটি ক্ষেত্র চূড়ান্তভাবে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। তাহলো এই, (এক) ইচ্ছাপূর্বক হত্যাকারীকে

কিসাসের দন্ড হিসেবে হত্যা করা। (দুই) দ্বীন ইসলামের পথে বাধাসৃষ্টিকারীদের সাথে যুদ্ধ করা এবং সেই যুদ্ধে হত্যা করা। (তিন) ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা উৎপাটনের চেষ্টাকারীদের দন্ড হিসেবে হত্যা করা। (চার) বিবাহীত নারী-পুরুষ যিনা করলে তার দন্ডস্বরূপ সঙ্গেসার করা এবং (পাঁচ) মুর্তাদ অর্থাৎ ইসলাম ত্যাগকারীকে দন্ডস্বরূপ হত্যা করা। কেবলমাত্র এই পাঁচটি অবস্থাতেই মানুষের জীবনের সম্মান শেষ হয়ে যায় এবং তাকে হত্যা করা বৈধ হয়ে পড়ে।

তৃতীয়ত ঃ ওলী বা ওয়ারীসকে কেসাস বা বদলা নেয়ার অধিকার -

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا "আর যে ব্যক্তি অন্যায় ভাবে নিহত হয়েছে, তার ওলীকে কেসাস দাবী করার অধিকার দান করেছি।"

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, এই অধিকার নিহত ব্যক্তির ওলীর। যদি রক্ত সম্পর্কিত ওলী বা ওয়ারিস না থাকে, তবে ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার প্রধান এই অধিকার পাবে। কারণ, সরকারও একদিক দিয়ে সব মুসলমানের ওলী।

এখানে سُلْطَانٌ অর্থ হুজ্জত বা অকাট্য যুক্তিভিত্তিক অধিকার। যার কারণে যে কেউ কিসাসের দাবী করতে পারে। এ থেকে ইসলামের এই নীতি প্রমাণিত হয় যে, যদি রক্ত সম্পর্কিত ওলী থাকে, তবে হত্যার ব্যাপারে সরকার প্রধান নয়, বরং নিহত ব্যক্তির ওলীই হবে আসল বাদী। হত্যাকারীকে হত্যা করার দাবী করা অথবা হত্যাকারীকে মাফ করে দেয়া কিংবা কিসাসের পরির্বতে রক্তমূল্য গ্রহণ করার পূর্ণ এখতিয়ার বা অধিকার তার রয়েছে।

চতুর্থত ঃ হত্যার ব্যাপারে সীমালংঘণ না করা। মহান আল্লাহ্ বলেন-

فَلَا يُسْرِفْ فِّى الْقَتْلِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا

"অতএব সে (ওলী) যেন হত্যার ব্যাপারে সীমালংঘণ না করে।"

এটা কিসাস সংক্রান্ত ইসলামী আইনের একটি বিশেষ নির্দেশনা। এর সারমর্ম হলো এই যে, অন্যায়ের বদলা অন্যায়ভাবে নেয়া বৈধ নয়। বদলা নেয়ার বেলায়ও ইনসাফের প্রতি নজর রাখা উচিত। যে পর্যন্ত নিহত ব্যক্তির ওলী ইনসাফের সাথে কেসাস নিতে চাইবে, সেই পর্যন্ত শরীয়তের

আইন তার পক্ষে থাকবে। আল্লাহ্ তা'লাও তার সাহায্যকারী হবেন। পক্ষান্তরে সে যদি প্রতিশোধের উম্মাদনায় উন্মুক্ত হয়ে কিসাসের সীমালংঘণ করে, তবে সে মজলুমের পরিবর্তে জালিমের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে এবং জালিম মজলুম হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর আইন এখন তার সাহায্য করার পরিবর্তে প্রতিপক্ষের সাহায্য করবে এবং তাকে যুলুম থেকে বাঁচাবে।

কিসাসের ব্যাপারে সীমালংঘণ ঃ হত্যার ব্যাপারে নানারূপ ও নানা অবস্থা হতে পারে। আর এসবই সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, প্রতিশোধ গ্রহণের তীব্র উত্তেজনায় মূল অপরাধী ছাড়া অন্যকেও হত্যা করা অথবা হত্যা করার পর তার লাশের উপর সমস্ত আক্রোশ ঢেলে দেয়া কিংবা রক্তমূল নেয়ার পরও অপরাধীকে হত্যা করা ইত্যাদি।

জাহেলী যুগে আরবে সাধারণত এক ব্যক্তির হত্যার পরিবর্তে হত্যাকারীর পরিবার অথবা সঙ্গী-সাথীদের মধ্য থেকে যাকেই পেতো, তাকেই হত্যা করতো। আবার কোন কোন সময় নিহত ব্যক্তি গোত্রের সর্দার অথবা বড়লোক হলে তার পরিবর্তে শুধু এক ব্যক্তিকে কেসাস হিসেবে হত্যা করা যথেষ্ট মনে করা হতো না, বরং এক খুনের পরিবর্তে দু-তিন কিংবা আরও বেশী মানুষকে খুন করা হতো। আবার কেউ কেউ প্রতিশোধে উম্মুক্ত হয়ে হত্যাকারীকে শুধু হত্যা করেই থাকতো না বরং হত্যা করার পর তার নাক-কান ইত্যাদি কেটে অঙ্গ বিকৃত করে দিতো। ইসলামী কিসাসের আইনে এসবগুলো অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি এবং হারাম। তাই فَلَا يُسْرِفْ فِّي الْقَتْلِ আয়াতে এ ধরণের বাড়াবাড়িকে প্রতিরোধ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, কিসাসের বিধান নিজস্বভাবে কোন ব্যক্তি বা দল কার্যকরী করতে পারে না। এটা ইসলামী সরকার বা বিচার বিভাগের দায়িত্ব। কেননা, শরীয়াতে তাদেরই এরূপ করার দায়িত্ব রয়েছে।

দশ. وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ

আর ইয়াতীমদের ধন-মালের কাছেও যেও না। একমাত্র তার কল্যাণ কামনা ছাড়া, যতদিন না সে যৌবন লাভ করে।

এটি ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার দশম ধারা। এখানে বলা হয়েছে যে, তোমরা ইয়াতীমদের মালের ধারে-কাছেও যেও না। অর্থাৎ এতে যেন শরীয়ত

বিরোধী অথবা ইয়াতীমদের স্বার্থ বিরোধী কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা না হয়। যাদের প্রতি ইয়াতীমদের সম্পদের হিফাজত বা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পিত হয় তাদের এ বিষয়ে খুবই সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। তারা কেবলমাত্র ইয়াতীমদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে খরচ করবে। এ ধারা ততদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, যতদিন না তারা শৈশবকাল পার হয়ে যৌবনে পদার্পণ করে নিজের মাল-সম্পদ নিজেই হিফাজত করতে সক্ষম না হয়। এর নিম্নতম বয়স পনের বছর এবং সর্বোচ্চ বয়স আঠার বছর।

অবৈধ পথে যে কোন ব্যক্তির সম্পদ খরচ করা বৈধ নয়। এখানে বিশেষ করে ইয়াতীমদের কথা উল্লেখ করার কারণ হলো এই যে, সে নিজে কোন হিসাব নেয়ার যোগ্য নয়। আর অন্যরাও এ সম্পর্কে জানতে পারে না। যেখানে মানুষের পক্ষ থেকে হক বা প্রাপ্য দাবী করার কেউ থাকে না, সেখানে আল্লাহর পক্ষ থেকে দাবী করা কঠিন হয়ে যায়। এতে ত্রুটি হলে সাধারণ মানুষের অধিকারের তুলনায় গুনাহ্ বেশী হয়।

এটা কোন নৈতিক হিদায়েত নয়। পরবর্তীকালে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর ইয়াতীমদের অধিকার রক্ষার জন্য প্রশাসন ও আইন উভয় ব্যবস্থাকেই কাজে লাগানো হয়।

এগার. وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا

তোমরা ওয়াদা বা অঙ্গীকার রক্ষা করবে। ওয়াদা বা অঙ্গীকার সম্পর্কে তোমাদেরকে জবাবদিহী করতে হবে।

এই ধারাই ওয়াদা বা অঙ্গীকার পূর্ণ করার তাগীদ দেয়া হয়েছে। ওয়াদা রক্ষা করা না করা মু'মিন ও মুনাফিকীর গুণাবলীর কথা কুরআন এবং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা মু'মিনুনে ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করাকে মু'মিনের গুণাবলী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে হাদীসে ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করাকে মুনাফিকীর লক্ষণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ওয়াদা বা অঙ্গীকার দুই প্রকার। (এক) বান্দাহ ও আল্লাহর সাথে ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি। যেমন সৃষ্টির সূচনালগ্নে বান্দাহ আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিলো যে, 'নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের রব'। এই অঙ্গীকারের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া হলো এই যে, তার দেয়া সমস্ত নির্দেশাবলী মানতে হবে এবং সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে। এই অঙ্গীকারতো সেই সময়ে প্রত্যেকেই করেছে-দুনিয়াতে সে মু'মিন হোক অথবা হোক সে কাফির।

(দুই) বান্দার সাথে বান্দার ওয়াদা। যা এক মানুষ অন্য মানুষকে করে থাকে। এতে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত ওয়াদা বা চুক্তির মধ্যে রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক এবং লেনদেন সম্পর্কিত ওয়াদা বা চুক্তি রয়েছে।

উভয় প্রকার চুক্তি বা অঙ্গীকার পূর্ণ করা সকলের জন্যই কর্তব্য। তবে শর্ত হলো গুনাহ্র কাজে কোন ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি পালন করা জরুরি নয়, বরং তা ভঙ্গ করাই কর্তব্য। তবে তা ভঙ্গের জন্য নির্ধারিত কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। অতএব ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি দেয়া বা করার সময় এটা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে , সেটি যেন কোন ভাবেই গুনাহ্র কাজে ওয়াদা বা অঙ্গীকার না হয়।

মানুষের সাথে মানুষের চুক্তি বা ওয়াদার স্বরূপ দু'টি। একটি হলো, একপাক্ষিক বা একতরফা ওয়াদা বা অঙ্গীকার। আর দ্বিতীয়টি হলো দ্বিপাক্ষিক চুক্তি বা ওয়াদা। অর্থাৎ দু'জন ব্যক্তি বা পক্ষ সম্মত হয়ে যে চুক্তি বা ওয়াদা করা হয়।

একতরফা ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে আইনের আশ্রয় নেয়া যায় না, তবে ভঙ্গকারী গুনাহ্গার হবে। পক্ষান্তরে দ্বিপাক্ষীক চুক্তি ভঙ্গ করলে প্রতিপক্ষ তার বিরুদ্ধে চুক্তি ভঙ্গের মামলা করে তার চুক্তি পূর্ণ করতে বাধ্য করতে পারে। এটাও নিছক কোন ব্যক্তিগত নৈতিকতারই একটি ধারা ছিলো না। বরং পরবর্তীতে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর একেই গোটা জাতির জন্য আভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক রাজনীতির ভিত্তিগত হিসেবে তার আইন হিসেবে গণ্য করা হয়।

বার. وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ط ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلاً

পাত্র দিয়ে মাপ দিলে পূর্ণভাবে ভর্তি করে দিবে। আর ওজন করে দিলে ত্রুটিমুক্ত দাঁড়িপালা দিয়ে ওজন দিবে। এটা খুবই ভাল নীতি, আর এর পরিণামও অতি উত্তম।

এই ধারাই মহিমান্বিত আল্লাহ মাপ ও ওজন সম্পর্কে সতর্ক করে বলেছেন, তোমরা যখন কোন কিছু মেপে দিবে, তখন মেপে দেয়ার সময় পূর্ণভাবে মেপে দিবে। মোটেই কম করবে না। আর কোন জিনিস ওজন করে দেয়ার সময় ত্রুটিমুক্ত দাঁড়িপালায় ওজন করে দিবে। এখানে কাউকেও ঠকাবার চেষ্টা করবে না।

এই হিদায়াতটিও কেবলমাত্র ব্যক্তিদের পরস্পরের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর উহার অন্যান্য কর্তব্যের মধ্যে এটাও একটি কর্তব্য হলো এই যে, সে বাজারে-বন্দরে পরিমাপ ও ওজনের যন্ত্রসমূহের উপর কড়া নজর রাখবে এবং তাতে কম ও হ্রাস করাকে পূর্ণ শক্তি দিয়ে বন্ধ করবে। এখান থেকে একটি ব্যাপকভিত্তিক মূলনীতিও জানা গেল যে, ব্যবসা ও অর্থনৈতিক লেনদেনের ব্যাপারে সব ধরণের বেঈমানী ও অধিকার হরণ করার পথ বন্ধ করে দেয়া সরকারের অন্যতম কর্তব্য।

ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَّأَحْسَنُ تَأْوِيلًا - "এটা খুবই ভাল ও পরিণামের দিক দিয়েও এটা অতি উত্তম।" অর্থাৎ দুনিয়ায় এবং পরকালেও। দুনিয়াতে এর ফল ভাল হবে এই জন্য যে, এর ফলে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক অবস্থা স্থাপিত হবে। বিক্রেতা ও ক্রেতা একে অপরের প্রতি নির্ভর করতে এবং আস্থা রাখতে পারবে। আর পরিণামের দিক দিয়ে মূল ব্যবসায়ের কাজে যথেষ্ট উন্নতি এবং সাধারণ ভাবে ব্যবসায়ে স্বাচ্ছন্দ্য এবং সচ্ছলতার সৃষ্টি হওয়া সম্ভব হবে।

আর পরকাল, সেখানে চূড়ান্ত কল্যাণ লাভ করা তো সম্পূর্ণভাবে ঈমান ও তাকওয়ার উপর নির্ভর করে।

হাদীসে এসেছে, "রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে লোক কোন হারাম জিনিসের উপর ক্ষমতা রাখার পরও আল্লাহর ভয়ে তা ছেড়ে দেয়, আল্লাহ তা'লা তাকে তার চেয়ে উত্তম জিনিস দান করবেন"।

তের. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার পিছনে লেগে পড়ো না। নিশ্চয় কান, চোখ ও দিল এদের সবকিছুকেই জিজ্ঞাসিত হতে হবে।

এই ধারাটির লক্ষ্য এই যে, মানুষ যেন নিজেদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে ভিত্তিহীন ধারণা-অনুমানের পরিবর্তে স্পষ্ট জ্ঞানের অনুসরণ করে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় এই লক্ষ্যটির বাস্তব ও ব্যাপক ভাবে রূপ ধারণ করে নৈতিক চরিত্রে, আইন-বিধানে, রাজনীতিতে এবং প্রশাসনিক কাজে-কর্মে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও শিক্ষা ব্যবস্থায় এক কথায় জীবনের সকল দিক ও

বিভাগে। আর জ্ঞানের পরিবর্তে অমূলক ধারণা অনুমানের অনুসরণ করার ফলে মানুষের মনে যেসব মারাত্মক ত্রুটি দেখা দেয়, তা থেকে মানুষের চিন্তা ও কর্মকে সুরক্ষিত করে দেয়া হয়েছে।

নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়ে হিদায়াত দেয়া হয়েছে যে, সব ধরণের অমূলক ধারণা-কল্পনা হতে দূরে থাকতে হবে। কোন ব্যক্তি বা দলের উপর প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত কোন দোষারোপ করা যাবে না।

আইনের দিক দিয়ে একটি স্থায়ী বিধান হিসেবে গণ্য করে দেয়া হয়েছে যে, কেবলমাত্র সন্দেহের উপর নির্ভর করে কারও বিরুদ্ধে কোনরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না। আর সন্দেহের উপর ভিত্তি করে কারও সম্পর্কে গুজব রটানও যাবে না।

শিক্ষা ব্যবস্থার দিক দিয়েও অমূলক ধারণা- অনুমান পছন্দ করা হয়নি। সবচেয়ে বড় কথা হলো, আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্র হতে অমূলক ধারণা পূজার মূলোৎপাটন করা হয়েছে যে, তারা যেন কেবলমাত্র তাই সত্য বলে বিশ্বাস করে যা আল্লাহ্ ও রাসূল (সঃ) এর দেয়া জ্ঞানের দৃষ্টিতে প্রমাণিত।

নিশ্চয় কান, চোখ ও দিল বা অন্তর এদের সবকিছুকেই পরকালে জিজ্ঞাসা করা হবে। আয়াতে বলা হয়েছে যে,কিয়ামতের দিন কান,চোখ এবং দিলকে প্রশ্ন করা হবে কানকে প্রশ্ন করা হবে, তুমি সারা জীবন কি কি শুনেছো ? চোখকে প্রশ্ন করা হবে, তুমি সারা জীবন কি কি দেখেছো? দিলকে প্রশ্ন করা হবে, তুমি সারা জীবন মনে মনে কি কি কল্পনা করেছো এবং কি কি বিষয় বিশ্বাস করেছো ? যদি কান শরীয়ত বিরোধী কথা-বার্তা শুনে থাকে, যেমন কারও গীবত শুনে থাকে কিংবা হারাম গান-বাজনা শুনে থাকে।চোখ যদি শরীয়ত বিরোধী কোন জিনিস দেখে থাকে, যেমন বেগানা স্ত্রীলোক কিংবা সুশ্রী বালকের প্রতি কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করে থাকে। যদি দিল কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী বিশ্বাসকে স্থান দিয়ে থাকে অথবা কারও সম্পর্কে প্রমাণ ছাড়া কোন অভিযোগ মনে স্থান দিয়ে থাকে। এসব প্রশ্নের জবাব সঠিক দিতে না পারলে পরকালে আযাব ভোগ করতে হবে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ প্রদত্ত সমস্ত নি'য়ামত সম্পর্কেই জিজ্ঞাসিত হতে হবে। যেমন বলা হয়েছে-

لَتُسْئَلُنَّ يَوْ مَئِذٍ عَنِ النَّعِمِ "কিয়ামতের দিন তোমাদের সব নি'য়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।" এসব নি'য়ামতের মধ্যে কান, চোখ ও দিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাই বিশেষভাবে এখানে এগুলোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

চৌদ্দ. وَلَاتَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا ج اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا

দুনিয়াতে চলাফেরার সময় দম্ভভরে চলাফেরা করো না। তোমরা না যমীনকে বিদীর্ণ করতে পারবে, আর না উচ্চতায় পর্বত প্রমাণ হতে পারবে।

নবীজি মি'রাজ থেকে ফিরে আসার পর ভাবী ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার জন্য মহান আল্লাহ যেসব মৌলিক নীতিমালা অবতীর্ণ করেছিলেন, তার মধ্যে সর্বশেষ ধারাটি হলো চলাফেরার ক্ষেত্রে দাম্ভিকতা পরিহার করা। এই আয়াতের তাৎপর্য হলো এই যে, অহংকারী ও গর্বিত লোকদের আচরণ ও চরিত্র হতে দূরে থাকতে হবে। এই হিদায়াত ব্যক্তিগত কর্মনীতি ও জাতীয় আদর্শ উভয় দিকের উপর সমানভাবে প্রযোজ্য। আর এই হিদায়াতের ভিত্তিতে মদীনায় প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের শাসক ও পরিচালক, গভর্ণর ও সেনাপতিদের জীবনে অহংকার ও গর্বের নাম-গন্ধও খুঁজে পাওয়া যেতো না। এমনকি মূল সংগ্রামের ময়দানেও কখনও তাদের মুখে অহংকার ও গর্বের কোন কথাবার্তা উচ্চারিত হতো না। তাদের প্রতিটি কর্ম যেমন– উঠা-বসা, চলা-ফিরা, পোষাক-আশাক, যানবাহনে চলাচল ও সাধারণ আচার-ব্যবহারেও বিনয়-নম্রতা এমনকি ফকিরী ও দরবেশীর ভাবধারা পুরো মাত্রায় লক্ষ্য করা যেতো। আর তেমনি তারা যখন বিজয়ী বেশে কোন শহর, নগর বা জনপদে প্রবেশ করতো, তখনও দাপোট ও প্রতাপ দেখিয়ে তারা জনগণের মধ্যে ভীতি সৃষ্টি করতেও চেষ্টা করতো না।

অতঃপর আয়াতের সর্বশেষে মহান আল্লাহ বলেন -

كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهٗ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهًا **এ সবের মধ্যে যেগুলো মন্দ ও খারাপ কাজ। সেগুলো তোমাদের রবের নিকটও অপছন্দনীয়।**

অর্থাৎ- وَقَضٰى رَبُّكَ থেকে এ পর্যন্ত যেসব হুকুম-আহকাম ও নিষেধাজ্ঞার বর্ণনা দেয়া হয়েছে, তাতে যতো প্রকারের খারাপ কাজ বা গুনাহর কাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এগুলো সবই আল্লাহ তা'লার নিকট অপছন্দনীয় কাজ। আর অন্য কথায় বলা যায়, যে হুকুম বা নির্দেশই অমান্য করা হবে, তা আল্লাহর নিকট কিছুতেই পছন্দনীয় হতে পারে না।

প্রিয় ভাইয়েরা / বোনেরা ! আলোচ্য আয়াতসমূহে ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার চৌদ্দটি ধারা বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে প্রথমে আল্লাহর হক ও পরে বান্দার হক সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, সমগ্র তাওরাতের বিধানাবলী সূরা বানী ইসরাঈলের পনেরটি আয়াতে সন্নিবেশিত করে দেয়া হয়েছে। (মাযহারী)

শিক্ষা ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা ! এতক্ষণ আপনাদের সামনে সূরা বানী ইসরাঈলের ২৩ থেকে ৪২ নম্বর পর্যন্ত মোট ১৬ টি আয়াতের দারস পেশ করা হলো। এই ১৬ টি আয়াতের মধ্যে ১৪ টি ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার মৌলিক রূপ-রেখার ধারাসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। নিম্নে সেগুলো থেকে আমাদের জন্য কি কি শিক্ষণীয় রয়েছে তা উল্লেখ করা হলো ঃ

■ এই ধারাগুলোতে কিছু গ্রহণীয় আর অধিকাংশই বর্জণীয় হিদায়াত রয়েছে। যা পুরোপুরি কার্যকরী করার জন্য ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার আবশ্যকতা রয়েছে। সুতরাং আল্লাহর এসব বিধি-বিধান মানার জন্য সকলকেই সম্মিলিতভাবে ইসরামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরীক হওয়া একজন মুসলমানের জন্য ফরজ বা অবশ্যই করণীয় কর্তব্য।

■ এক আল্লাহকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে এবং সর্বক্ষেত্রে একমাত্র তাঁরই ইবাদাত বন্দেগী করতে হবে।কেবলমাত্র তাকেই সৃষ্টিকর্তা,রিযিকদাতা পালনকর্তা, আইন দাতা এবং সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে বিশ্বাস করতে হবে এবং তাঁর ছাড়া অন্য কারও বিধি-বিধান মানা চলবে না।

■ পিতা-মাতা গরীব হোক আর ধনী হোক, শিক্ষিত হোক আর অশিক্ষিত হোক, কালো হোক আর ফর্সা হোক, সুস্থ-সবল হোক আর অসুস্থ-দুর্বল হোক, জুয়ান হোক আর ঠনঠনে বুড়ো হোক, তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করতে হবে। বৃদ্ধাবস্থায় খিদমত করতে করতে অতিষ্ঠ হয়ে কিংবা বিরক্ত হয়ে 'উহ' শব্দ পর্যন্ত করা যাবে না, অথবা সন্তানের আচার-আচরণে যেন বাপ-মা মনে কষ্ট পেয়ে 'উহ' শব্দ করে না বসে সেদিকে অবশ্যই সতর্ক খেয়াল রাখতে হবে। কোন সময়ের জন্যও তাদেরকে ধমক দেয়া যাবে না, কিংবা ধমকের সুরে কথা বলা যাবে না, বরং তাদের সঙ্গে বিনয়ের সাথে ভদ্রভাবে কথা-র্বাতা বলতে হবে। নিজে যতই জ্ঞানী বা ধনাঢ্য ব্যক্তি হোক না কেন আর বাপ-মা যতই গরীব বা মূর্খ হোক না কেন তাদের

সামনে নম্র-ভদ্র ও বিনয়ী থাকতে হবে। আর প্রাণ খুলে মনের সবটুকু আবেগ দিয়ে এই দোআই করতে হবে যে, "হে আমাদের পরওয়ারদিগার! তুমি তাদের উভয়ের প্রতি এমনভাবে রহম করো যেভাবে তারা শিশুকালে মন উজাড় করে স্নেহ-ভালবাসা, দয়া-মায়া দিয়ে আমাদের লালন-পালন করেছে।"

■ যদি মনের অজান্তে কোন সময়ের জন্য বাপ-মায়ের সাথে খারাপ আচারণ হয়ে যায়, কিংবা খিদমত করতে যেয়ে বাধ্য হয়ে অপারগ হয়ে যায়, তাহলে তাদের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। আর আল্লাহর কাছেও ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে।

■ আত্মীয়-স্বজন তা মুহরিম হোক অথবা গায়ের মুহরিম হোক, সকল প্রকার আত্মীয়-স্বজনের হক বা অধিকার আদায় করতে হবে। আর এই অধিকার বা প্রাপ্য আদায় করতে যেয়ে মনে এই ধারণা রাখা যাবে না যে আমি তার খুব উপকার করলাম। প্রাপ্য এটা কোন দান নয় বরং তা তার অধিকার। সুতরাং হককে হক হিসেবেই আদায় করতে হবে। হক আদায় করার পর অতিরিক্ত আর যা কিছুই করা হবে তাই হবে দান বা সহানুভূতি।

অনুরূপভাবে মিসকীন অর্থাৎ অভাবী-দরীদ্র লোক, যারা নিজের মান-সম্মানের কারণে প্রচন্ড অভাব থাকলেও তা প্রকাশ করতে পারে না এমন শ্রেণীর অভাবী এবং নিঃস্ব লোকদেরও হক রয়েছে। তাদের এই হক বা প্রাপ্য যথাযথ ভাবে আদায় করতে হবে।

তাছাড়া সম্বলহীন মুসাফীর বা পথিকেরও হক বা প্রাপ্য রয়েছে। তাদের প্রাপ্য পুরোপুরি আদায় করতে হবে। এ ধরণের মুসাফীর সে যেখানেই যাবে সেখানেই সে নিজেকে একজন অতিথিপরায়ন অধিকার বা প্রাপ্য আদায়কারী হিসেবে পাবে।

■ সম্পদের অপব্যয়-অপচয় করা যাবে না। সম্পদ আছে বলেই অপ্রয়োজনীয় বাহুল্য খরচ করা যাবে না, বরং প্রয়োজন আনুযায়ী খরচ করতে হবে। অপব্যয়-অপচয় করা শয়তানী কাজ। এ অকৃতজ্ঞ শয়তানী কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে।

■ যদি বাধ্য হয়েই আত্মীয়-স্বজন এবং মিসকীনদের হক আদায় করতে না পারার ফলে লজ্জায় পাশ কেটে চলতে হয়, তাহলে তাদের সাথে খারাপ বা উদ্ধত আচরণ করা যাবে না, বরং নিজেকে অপরাধী মনে করে

নম্র-ভদ্রভাবে তাদের সাথে কথা বলতে হবে। আর আগামীতে যাতে তাদের প্রাপ্য বা অধিকার আদায় করা যায় এই জন্য তাদের কাছ থেকে দোয়া চেয়ে নিতে হবে।

■ একেবারে মুষ্টিবদ্ধ অর্থাৎ কৃপণ হওয়াও যাবে না এবং একেবারে মুক্তহস্ত অর্থাৎ দাতাও হওয়া যাবে না। বরং মধ্যমপন্থী বা মিতব্যয়ী হতে হবে। যদি কৃপণতা করা হয়, তাহলে তার থেকে মানুষ দূরে সরে যাবে এবং তিরস্কার করবে, ঠাট্টা-বিদ্রুপ করবে। আর যদি একেবারে মুক্তহস্ত হয়ে সবকিছু খরচ করে দেয়া হয়, তাহলে এক সময় নিঃস্ব হয়ে বসে থাকতে হবে। তাই ভারসাম্যপূর্ণ জীবন-যাপন করতে হবে।

■ রুজির মালিক তো আল্লাহ্ তা'লার এখতিয়ারে এ কথা মনে-প্রাণে বিশ্বাস রাখতে হবে। তিনি যাকে চান বা যার জন্য চান তার রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং তিনি যাকে চান রিযিক সংক্রীর্ণ করে দেন। তিনি সকল বান্দাদের অবস্থা সম্পর্কে ভালভাবেই অবগত আছেন এবং তিনি তাদেরকে সার্বক্ষনিক পর্যবেক্ষণও করছেন।

■ অভাবে পড়ার ভয়ে নিজের সন্তানকে হত্যা করা যাবে না। জাহেলী যুগে সন্তানকে জীবন্ত হত্যা করা হতো। আর বর্তমানে প্রযুক্তির যুগে বাত কন্ট্রলের নামে অসংখ্য ভ্রুণ নষ্ট করা হচ্ছে। এটা নর হত্যার শামিল। আর সবচেয়ে বড় অপরাধ হলো খাওয়ার দায়িত্বটা নিজের দায়িত্বে নিয়ে এসব করা। অথচ আল্লাহই তাদের এবং আমাদের রুজির ব্যবস্থা করে যাচ্ছেন।

■ যিনা-ব্যভিচারের ধারে কাছেও যাওয়া যাবে না। এটা অত্যন্ত জঘণ্য অপরাধ। এই অপরাধের শাস্তি হলো বেত্রাঘাত বা সঙ্গেসার করা। এখানে যিনা থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে। আর এজন্যই পর্দা করা ফরজ করা হয়েছে। কেননা, জিনার দরজা হলো বেপর্দা, তাই এই ফরজ পর্দা পালন করতে হবে এবং সকল প্রকার অশ্লীলতা বন্ধ করতে হবে। এটা প্রত্যেককেই ব্যক্তিগতভাবে খোদার ভয় মনে রেখে এ অপরাধ থেকে দূরে থাকতে হবে এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে এসবের পথ বন্ধ করে দিতে হবে। কিন্তু আফসোস! বর্তমান সমাজে তার উল্টোটাই হচ্ছে। এজন্যই ইসলামী রাষ্ট্র বা সমাজ ব্যবস্থার প্রয়োজন। রাষ্ট্র ছাড়া কেউ কোন দিন এ ব্যবস্থা চালু করতে পারবে না।

■ মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা মহা অপরাধ। এজন্য অন্যায়ভাবে কাউকেও হত্যা করা যাবে না, তবে ন্যায়ভাবে হত্যা করা যাবে। এই ন্যায়ভাবে হত্যা করার জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের বা বিচার ব্যবস্থার প্রয়োজন। পাঁচটি কারণে যে হত্যার সুযোগ রয়েছে তার অধিকাংশই ব্যক্তিগতভাবে করার কোন সুযোগ নাই। কোন কোন হত্যা ব্যক্তি নিজেই করে থাকে, কিন্তু সেটা রাষ্ট্র বা বিচার বিভাগের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা করে দিলে ব্যক্তি তার অধিকার আদায় করে মাত্র।

যে পাঁচটি কারণে হত্যা করা যাবে তা হলো, ১. কিসাসের দন্ড হিসেবে হত্যা করা যাবে।২. দ্বীন ইসলামের পথে যুদ্ধ করতে যেয়ে হত্যা করা যাবে। ৩. ইসলামী রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার চেষ্টাকারীদেরকে দন্ড হিসেবে হত্যা করা যাবে। ৪. যিনার অপরাধ হিসেবে বিবাহীত নারী-পুরুষকে দন্ড হিসেবে হত্যা করা যাবে এবং ৫. মুরতাদ অর্থাৎ ইসলাম ত্যাগকারীর দন্ড হিসেবে হত্যা করা যাবে। এই পাঁচটি ছাড়া অন্য কোন কারণে হত্যা করা বৈধ নয়।

■ অপ্রাপ্ত ইয়াতীমদের ধন-মাল খরচ বা ভোগ করা যাবে না। যদি কোন কিছু খরচ করতেই হয়, তবে তার কল্যাণেই খরচ করা যাবে। প্রাপ্ত বয়স্ক অর্থাৎ যৌবন প্রাপ্ত হলে তাদের সমুদয় মাল-সম্পদ তাদেরকে বুঝিয়ে দিয়ে মালিক বানিয়ে দিতে হবে।

■ যে কোন ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতে হবে। তা আল্লাহর সাথেই হোক বা বান্দার সাথেই হোক, তা পূর্ণ করতে হবে। তবে বান্দার সাথে ওয়াদা যা গুনাহর কাজে করা হয়নি এমন সকল প্রকার ওয়াদা বা চুক্তি বাস্তবায়ন করতে হবে। ন্যায়গত ওয়াদা একপক্ষ থেকে করা হোক অথবা দ্বিপাক্ষীক চুক্তি বা ওয়াদা করা হোক, হোক তা একদল অন্য দলের সাথে অথবা এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের সাথে, সকল প্রকারের ওয়াদা বা চুক্তি বাস্তবায়ন করা অব্যশই কর্তব্য।

■ ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোন জিনিস পাত্র দ্বারা মেপে দিলে তা পূর্ণভাবে ভর্তি করে মেপে দিতে হবে। আর দাঁড়িপালা দিয়ে ওজন করে দিলে তা ত্রুটিমুক্ত দাঁড়িপালা দিয়ে ঠিক ঠিক ভাবে ওজন করে দিতে হবে। যদি কেউ একাজ করে তাহলে গ্রাহকের বিক্রেতার প্রতি আস্থা অর্জন হবে এবং তার ব্যবসা-বাণিজ্যের সুনাম-সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে এবং তার ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসার ঘটবে। আর এই বৈধ ব্যবসার জন্য পরকালেও সে আল্লাহর কাছে উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে।

■ ধারণার উপর ভিত্তি করে কোন কিছুর পিছনে লেগে পড়া যাবে না। না দেখে, না শুনে, না বুঝে অনুমানের ভিত্তিতে কোন কিছুর পিছনে দৌড়ানো যাবে না। কেননা, আমাদের অবশ্যই এটা স্মরণ রাখতে হবে যে, আমার কান, আমার চোখ এবং আমার অন্তরকে দুনিয়ার প্রতিটি কাজ বা পদক্ষেপের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে।

■ দুনিয়াতে চলার সময় অহংকার বশে চলাফেরা করা যাবে না। সকল প্রকার দাম্ভিকতা পরিহার করে চলাফেরা করতে হবে। আমরা এমন নয় যে, যমীনকে বিদীর্ণ করতে পারবো অথবা পাহাড়সম উঁচু হতে পারবো। এইজন্য একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে দুনিয়ায় চলাফেরা করতে হবে। অহংকার, দাম্ভিকতা হলো আল্লাহর হক বা অধিকার। হাদীসে এটাকে আল্লাহর চাদরের সাথে তূলনা করে বলা হয়েছে যে, "অহংকার হলো আমার চাদর, যারা অহংকার করে তারা যেন আমার চাদর নিয়ে টানাটানি করে"।

■ সবশেষে বলা যায় যে, খারাপ বা গুনাহর কাজকে খারাপ বা গুনাহর কাজ হিসেবেই গ্রহণ করতে হবে। উপরোক্ত আয়াতগুলোতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যেসব খারাপ বা গুনাহর কাজ বা কথার উল্লেখ করা হয়েছে এগুলো সবই আল্লাহ তা'লার নিকটও খারাপ বা অপছন্দনীয় কাজ।

আহবান ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের খিদমতে সূরা বানী ইসরাঈলের ২৩ থেকে ৩৮ আয়াত পর্যন্ত যে দারস পেশ করা হলো, তাতে যদি আমার অজান্তে এবং অজ্ঞাতে কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে যায় তার জন্য আমি মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর এখান থেকে যেসব শিক্ষণীয় বিষয় জানতে পারলাম, তা যেন আমরা ব্যক্তিগত জীবনে ও রাষ্ট্রীয় জীবনে আ'মল করতে পারি সেই তাওফীক কামনা করে আমি আমার দারস শেষ করছি। 'অয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন'।

যুদ্ধ-জিহাদে বৈষয়িক কোন কিছু লাভের উদ্দেশ্যই আসল না হয়ে বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভই আসল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার জন্য দুর্বলের মুকাবিলা না করে সবল শক্তির মুকাবিলা করা।

সূরা আনফাল - ৮

আয়াত-১-৮

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ كَفٰى وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنفَالِ ط قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ج فَاتَّقُوا اللهَ

وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ص وَاَطِيْعُوا اللهَ وَرَسُوْلَهٗٓ اِنْ كُنْتُمْ

مُّؤْمِنِيْنَ ○ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ

وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ○

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ○ اُولٰٓئِكَ

هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ط لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ

كَرِيْمٌ ○ كَمَآ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ م بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ص وَاِنَّ فَرِيْقًا

مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكٰرِهُوْنَ ○ يُجَادِلُوْنَكَ فِى الْحَقِّ بَعْدَ

مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُوْنَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ○ وَاِذْ
يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ
ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ
بِكَلِمٰتِهٖ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَ ○ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ
الْبَاطِلَ وَلَوْكَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ○

সরল অনুবাদ ঃ ইরশাদ হচ্ছে – (১) (হে নবী!) আপনার নিকট লোকেরা গনীমতের মাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, আপনি বলে দিন, গনীমতের মাল তো হলো আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের। অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং নিজেদের পারস্পরিক অবস্থা ঠিকঠাক করে নাও। আর আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাকো। (২) প্রকৃত ঈমানদার তো তারাই, যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণের সময় ভয়ে কেঁপে উটে। আর যখন তাদের সামনে আল্লাহর কালাম পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা তাদের পরওয়াদিগারের উপর ভরসা ও আস্থা রাখে। (৩) যারা সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা হতে (আমার পথে) ব্যয় করে। (৪) তারাই হলো সত্যিকার মু'মিন। তাদের জন্যই রয়েছে তাদের পরওয়ারদিগারের নিকট উচ্চ মর্যাদা, আছে অপরাধের ক্ষমা এবং উত্তম রিযিক। (৫) (এই গনীমতের মালের বিষয়ে সেই রকম অবস্থারই সৃষ্টি হয়েছিলো তখন, যখন) আপনার রব ন্যায় ও সৎকাজের জন্য ঘর থেকে বের করে এনেছিলেন, অথচ ঈমানদারদের একটি দল (তাতে) সম্মত ছিলো না। (৬) তারা আপনার সামনে এই সত্য ও ন্যায়ের বিষয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়েছিলো। অথচ তা পুরোপুরি সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। তাদের অবস্থা এই হয়েছিলো যে, তারা যেন দেখতে দেখতে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছে। (৭) (আর হে নবী!) স্মরণ করুন সেই সময়ের কথা, যখন আল্লাহ আপনার নিকট ওয়াদা করেছিলেন যে, দু'টি দলের মধ্যে একটি তোমরা পাবে, আর তোমরা কামনা করতেছিলে যে, দুর্বল দলটি তোমরা পাবে। অথচ আল্লাহর ইচ্ছা ছিলো এই যে, তিনি তার কালামের দ্বারা সত্যকে

সত্যরূপে প্রতিভাত করে দেখাবেন এবং কাফিরদের শিকড় কেটে দিবেন, (৮) যাতে হক তথা সত্যকে সত্য এবং বাতিল তথা মিথ্যাকে মিথ্যা হিসেবে প্রমাণিত হয়, তাতে পাপী লোকদের জন্য তা যতই অসহনীয় হোক না কেন।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ يَسْئَلُوْنَكَ-আপনাকে তারা জিজ্ঞাসা করে। عَنْ - সম্পর্কে। اَلْاَنْفَالِ-যুদ্ধলব্ধ সম্পদ। قُلْ-বলুন/বলো। لِلّٰهِ-আল্লাহ্র জন্য। فَاتَّقُوْا-অতএব তোমরা ভয় করো। اَصْلِحُوْا- তোমরা সংশোধন করো। ذَاتَ-অবস্থা। بَيْنِكُمْ- তোমাদের মধ্যকার। اَطِيْعُوا- তোমরা আনুগত্য করো। اِنْ -যদি। كُنْتُمْ- তোমরা হও। اِنَّمَا -প্রকৃত পক্ষে। اَلْمُؤْمِنُوْنَ - ঈমানদার। اَلَّذِيْنَ -যারা। اِذَا - যখন। ذُكِرَ- স্মরণ করা হয়। وَجِلَتْ - কেঁপে উঠে। قُلُوْبُهُمْ- তাদের অন্তরসমূহ। تُلِيَتْ- পাঠ করা হয়। عَلَيْهِمْ - তাদের নিকট। اٰيٰتُهٗ -তাঁর আয়াতগুলো। زَادَتْهُمْ -তাদের বৃদ্ধি পায়। اِيْمَانًا-ঈমান। عَلٰى- উপর। رَبِّهِمْ- তাদের প্রতিপালকের। يَتَوَكَّلُوْنَ - তারা ভরসা করে। يُقِيْمُوْنَ-কায়েম করে। اَلصَّلٰوةَ -নামায। مِمَّا- তা হতে যা। رَزَقْنٰهُمْ -আমরা তাদের রিযিক দিয়েছি। يُنْفِقُوْنَ-তারা খরচ করে। اُولٰـئِكَ -ওরাই। هُمْ -তারাই। حَقًّا-প্রকৃত/খাঁটি। لَهُمْ- তাদের জন্য। دَرَجٰتٌ-মর্যাদাসমূহ। عِنْدَ-কাছে। رَبِّهِمْ-তাদের রবের। مَغْفِرَةٌ- ক্ষমা। رِزْقٌ -রিযিক/জীবিকা। كَرِيْمٌ -সম্মানজনক। كَمَا -যেমন। اَخْرَجَكَ-তোমাকে বের করেছিলেন। رَبُّكَ -তোমার রব। مِنْ- থেকে। بَيْتِكَ- তোমার ঘর। بِالْحَقِّ- ন্যায়ভাবে। اِنَّ -নিশ্চয়ই। فَرِيْقًا- একদল /কিছুসংখ্যক। مِنْ -হতে। لَكٰرِهُوْنَ - অবশ্যই অপছন্দকারী। يُجَادِلُوْنَكَ-তোমাদের সাথে তারা বিতর্ক করে। فِى الْحَقِّ- সত্যের ব্যাপারে।

يُسَاقُوْنَ - পারে। مَا -তা/যে। تَبَيَّنَ -সুস্পষ্ট হওয়ার। كَاَنَّمَا -যেন। بَعْدَ - তারা চালিত হচ্ছে। اِلَى -দিকে। اَلْمَوْتِ-মৃত্যুর। هُمْ -তারা। يَنْظُرُوْنَ -প্রত্যক্ষ করছে/দেখছে। اِذْ - যখন। يَعِدُكُمْ -তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো। اِحْدَى-একটির। الطَّائِفَتَيْنِ -দু'দলের (মধ্যে)। اَنَّهَا -যে তা। لَكُمْ -তোমাদের জন্য। تَوَدُّوْنَ -তোমরা চেয়েছিলে। اَنَّ -যে। غَيْرَ-নয় যে। ذَاتِ الشَّوْكَةِ -অস্ত্রধারী (দলটি)। تَكُوْنُ -তা হবে। يُرِيْدُاللهُ-আল্লাহ চান। اَنْ يُّحِقَّ -সত্যে পরিণত করতে। اَلْحَقَّ -সত্যকে। بِكَلِمٰتِهٖ -তার বাণীসমূহ দিয়ে। يَقْطَعَ -কাটবেন। دَابِرَ -জড়/মূল। لِيُحِقَّ-যেন সত্যে পরিণত করেন। يُبْطِلَ -বাতিলে পরিণত করেন। لَوْ - যদিও। كَرِهَ -অপছন্দ করে। الْمُجْرِمُوْنَ -অপরাধীরা।

সম্বোধন ঃ দারসে কুআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় দ্বীনি ভাইয়েরা/ বোনেরা/ভাই ও বোনেরা ! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্। আমি আপনাদের সামনে সূরা আনফালের ১ থেকে ৮ নং পর্যন্ত মোট ৮ টি আয়াত তিলাওয়াত ও সরল অনুবাদ পেশ করেছি। আল্লাহ তা'লা যেন আমাকে দারস সঠিকভাবে পেশ করার তাওফীক দান করেন। আমীন।

সূরার নামকরণ ঃ সূরার প্রথম আয়াতে উল্লেখিত–يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ এর اَنْفَالٌ শব্দটিকেই এই সূরার নাম হিসেবে সূরা আনফাল রাখা হয়েছে। اَنْفَالٌ শব্দটি نَفَلٌ থেকে উৎপত্তি। যার অর্থ – অতিরিক্ত। এখানে গনিমত অর্থাৎ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। পুরো বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করলে মনে হয় অন্যান্য সূরার ন্যায় প্রতীকী বা চিহ্ন হিসেবে সূরার নামকরণ করা হয়নি, বরং শিরোনাম হিসেবেই নামকরণ করা হয়েছে।

সূরাটি নাযিল হওয়ার সময়কাল ঃ সর্বসম্মতিক্রমে সূরাটি মাদানী। এই সূরাটি হিজরী ২য় সনে বদর যুদ্ধের পরে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে ইসলাম

ও কুফরী শক্তির মধ্যে সরাসরি প্রথম যুদ্ধের বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়েছে। সূরার আলোচ্য বিষয়সমূহের প্রতি দৃষ্টি দিলে মনে হয় , সম্ভবত ঃ সম্পূর্ণ এই ভাষণটি এক সংগেই অবতীর্ণ হয়েছে। তবে এটাও সম্ভব যে, এর কোন কোন আয়াত বদর যুদ্ধজনিত সমস্যা ও বিষয়াদি সম্পর্কে পরে অবতীর্ণ হয়েছে এবং ভাষণের ধারাবাহিকতায় উপযুক্ত স্থানে সন্নিবেশিত করে একটি ধারাবাহিক ভাষণের রূপদান করা হয়েছে।

সূরাটির মূলবক্তব্য ও বিষয়বস্তু ঃ পবিত্র আল কুরআনের এই সূরায় ইসলাম ও কুফরী শক্তির সাথে প্রথম যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। তবে দুনিয়ায় আর যেসব রাজা-বাদশাহ্রা যুদ্ধ জয়ের পর নিজেদের সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে পর্যালোচনা করে, এই পর্যালোচনা তা হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

এতে প্রথমতঃ সেইসব দোষ-ত্রুটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, নীতি-নৈতিকতার দিক দিয়ে যা এখনো মুসলমানদের মধ্যে অবশিষ্ট রয়ে গেছে। এই পর্যালোচনায় তাদেরকে আরো বেশী পূর্ণতা লাভের জন্য চেষ্টা করার আহবান জানানো হয়েছে।

পরে বলা হয়েছে, এই বিজয়ের ফলে কতটুকু আল্লাহর রহমত নাযিল হয়েছিলো, যেন তারা নিজেদের সাহস-হিম্মত ও বাহাদুরীর ফল মনে করে অহেতুক গৌরবে ফেটে না পড়ে। বরং আল্লাহর উপর যেন আরো বেশী তাওয়াক্কুল ও নির্ভরতার শিক্ষা লাভ করে এবং আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য করার প্রয়োজনীয়তা পুরাপুরি উপলব্ধি করতে পারে।

যেসব উন্নত নৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মুসলমানদেরকে হক ও বাতিলের এই প্রত্যক্ষ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে নামানো হয়েছিলো, তার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আর যেসব নৈতিক গুণের কারণে এই যুদ্ধে জয় লাভ করা সম্ভব হয়েছিলো তাও আলোচনা করা হয়েছে।

যেসব মুশরিক, মুনাফিক ও ইহুদী বন্দী করে আনা হয়েছিলো, তাদেরকে সংশোধনের জন্য শিক্ষণীয় পন্থায় কথা বলা হয়েছে।

যুদ্ধলব্ধ মাল-সামান সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। এ বিষয়ে মুসলমানদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, এগুলোকে নিজের সম্পদ মনে না করে, রবং আল্লাহর সম্পদ মনে করবে। আল্লাহ তাতে তাদের জন্য

যেটুকু অংশ ঠিক করে দিবেন, কৃতজ্ঞতার সাথে তাই গ্রহণ করবে এবং যে অংশ আল্লাহ্ নিজের কাজের জন্যে এবং গরীব লোকদের সাহায্যের জন্যে নির্দিষ্ট করে দিবেন, তা মনে-প্রাণে সন্তুষ্টচিত্ত্বে মেনে নিবে।

যুদ্ধ ও সন্ধি সংক্রান্ত কতিপয় নৈতিক হিদায়াত দেয়া হয়েছে। যেন মুসলমানরা যুদ্ধ ও সন্ধির ক্ষেত্রে জাহেলিয়াতের সমস্ত নিয়ম-কানুন ত্যাগ করে দুনিয়ায় তাদের নৈতিক প্রভাব ও প্রতিপত্তি স্থাপিত হয় এবং ইসলাম প্রথম হতেই নৈতিকতার উপর কর্মজীবন প্রতিষ্ঠিত করার যে দাওয়াত দিচ্ছে, বাস্তব কর্মজীবনে তার ব্যাখ্যা ও রূপ কি দাঁড়ায় তা যেন দুনিয়ার মানুষ স্পষ্ট করে দেখতে পায়।

সবশেষে ইসলামী রাষ্ট্র শাসনের আইনের কতকগুলি ধারার উল্লেখ করা হয়েছে। এতে দারুল ইসলামের অধিবাসী মুসলমানদের আইনগত মর্যাদা উহার বাইরের মুসলমানদের থেকে আলাদা করে দেয়া হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতগুলির মূল বক্তব্য ঃ যুদ্ধলব্ধ মাল-সামান সম্পর্কে সাহাবাদের প্রশ্নের উত্তর, নৈতিক সংশোধন ও প্রকৃত ঈমানদারদের পরিচয় এবং তাদের মর্যাদা ও প্রতিদানের বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী ইসলামকে সূচনালগ্নে বিজয়ের জন্য মুসলমানদেরকে সশস্ত্র কাফির বাহিনীর সাথে যুদ্ধের বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা ! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে মূল ব্যাখ্যা পেশ করার পূর্বে দারস সহজে অনুধাবন করার জন্য প্রয়োজনীয় অথচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক কিছু বিষয় তুলে ধরা হলো। এখন নিম্নে ধারাবাহিকভাবে তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা পেশ করছি। মহান আল্লাহ্ বলেন—

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ط قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ج فَاتَّقُوا اللّٰهَ
وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ

হে নবী ! আপনাকে লোকেরা গনীমতের মাল-সামান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, আপনি তাদেরকে বলে দিন, গনীমতের মাল তো হলো আল্লাহর এবং তাঁর রাসূলের। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং নিজেদের পারস্পরিক অবস্থা ঠিকঠাক করে নাও। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাকো।

আয়াতের শানে নুযুল বা অবতরণের কারণ ঃ এই আয়াতটি ইসলাম এবং কুফরের মধ্যে প্রথম সংঘটিত বদর যুদ্ধের ঘটনার সাথে সম্পর্কিত। আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যার পূর্বে ঘটনাটি জানা থাকলে এর দারস বুঝতে সহজ হবে বলে আশা করি।

ঘটনাটি হলো এই যে, কুফর ও ইসলামের প্রথম সংঘর্ষ বদর যুদ্ধে বিজয়ের পর মুসলমানদের হাতে কাফিরদের গনিমতের কিছু মাল-সামান হাতে এলো, তখন তার বিলি-বন্টন নিয়ে সাহাবায়ে কিরামদের মধ্যে যে মতানৈক্য দেখা দিয়েছিলো যা নিঃস্বার্থতা, ইখলাস ও ঐক্যের সেই উচ্চমানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ' ছিলো না, যার ভিত্তিতে সাহাবায়ে কিরামদের গোটা জীবন সাজানো ছিলো। অবশ্য এটা তাদের পূর্বেকার প্রচলিত নিয়মের কারণেই হয়েছিলো। এই বিষয়ে কোন স্পষ্ট বা অস্পষ্ট দিক নির্দেশনা না থাকার ফলেই এমনটি হয়েছিলো। সে জন্য সবার পূর্বে এ আয়াতে তার সমাধান দেয়া হয়েছে। যাতে করে এই পুতঃপবিত্র এবং নিস্কুলষ সম্প্রদায়ের অন্তরে বিশ্বাস ও নিঃস্বার্থতা এবং ঐক্য ও আত্নত্যাগের প্রেরণা ছাড়া অন্য কিছু থাকতে না পারে।

ঘটনার বিস্তারিত বিররণ হলো এই, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আয়াতে উল্লেখিত 'আনফাল' শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এই আয়াতটি তো আমাদের অর্থাৎ বদর যুদ্ধে যারা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। ঘটনাটি ছিলো, গনীমতের মাল-সামান বিলি-বন্টনের বিষয়ে আমাদের মাঝে সামান্য মতোবিরোধ হয়ে গিয়েছিলো, যাতে এটা আমাদের চরিত্রে একটা অশুভ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। মহান আল্লাহ তা'লা এই আয়াতের মাধ্যমে গনীমতের মালামাল আমাদের হাত থেকে নিয়ে রাসূলে করীম (সঃ) এর দায়িত্বে অর্পণ করেন। আর রাসূলে করীম (সঃ) বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সবার মধ্যে তা সমানভাবে বন্টন করে দেন।

ব্যাপার ঘটেছিলো এই যে, বদর যুদ্ধে আমরা সবাই নবী করীম (সঃ) এর সাথে বেরিয়ে পড়ি এবং উভয় দলের মধ্যে তুমুল লড়ায়ের পর আল্লাহ তা'লা যখন শত্রুদের পরাজিত করে দেন, তখন আমাদের সৈন্যবাহিনী তিনটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়েন। একটি গ্রুপ শত্রুদের পিছনে ধাওয়া

করেন, যাতে তারা আর পুনরায় ফিরে আসতে না পারে। দ্বিতীয় গ্রুপ কাফিরদের ফেলে রাখা গনীমতের মাল-সামান সংগ্রহ করতে থাকেন। আর তৃতীয় গ্রুপটি নবী করীম (সঃ) এর পাশে এসে দাঁড়ায়, যাতে গোপনে লুকিয়ে থাকা কোন শত্রু মহানবী (সঃ) এর উপর আক্রমণ করতে না পারে। যুদ্ধ শেষে যখন সবাই নিজেদের অবস্থানে এসে হাজির হলেন, তখন যারা গনীমতের মাল-সামান সংগ্রহ করেছিলেন, তাঁরা বলতে লাগলেন যে, এসব মাল-সামান যেহেতু আমরা সংগ্রহ করেছি, কাজেই এতে আমাদের ছাড়া আর অন্য কারো ভাগ নেই। আর যারা শত্রুবাহিনীকে ধাওয়া করে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা বললেন, এতে তোমরা আমাদের চেয়ে বেশী হকদার নও। কারণ, আমরাই তো শত্রুবাহিনীকে ধাওয়া দিয়ে হঠিয়ে তোমাদের জন্য সুযোগ করে দিয়েছি যাতে তোমরা নিশ্চিন্তে গনীমতের মাল-সামান সংগ্রহ করে আনতে পারো। অপরপক্ষে যারা মহানবী (সঃ) এর হিফাজতের জন্য পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁরা বললেন, আমরাও ইচ্ছা করলে গনীমতের এই মাল-সামান সংগ্রহ করার জন্য তোমাদের সাথে যোগ দিতে পারতাম, কিন্তু আমরা জিহাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হুজুরে আকরাম (সঃ) এর হিফাজতে নিয়োজিত ছিলাম। অতএব আমরাই এর অধিকারী।

সাহাবায়ে কিরামদের এসব কথাবার্তা নবী করীম (সঃ) পর্যন্ত পৌছালে পর এই আয়াত يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ....الخ নাযিল হয়।

(মুসনাদে আহমদ, তিরমিজী, ইবনে মাজাহ, মুসতাদরাকে-হাকেম প্রভৃতি)

এই আয়াতে বলা হয়েছে, হে নবী করীম (সঃ), লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে গনীমতের মাল সম্পর্কে ? আপনি তাদেরকে বলে দিন আনফাল বা গনীমতের মাল হলো আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের (সঃ)।

গনীমতের মালকে মূল বানীতে বলা হয়েছে – اَنفَال (আনফাল) اَنفَال বহুবচন আর একবচনে বলা হয় – نَفَل । আরবীতে نَفَل বলা হয় আবশ্যকীয় ও মূল পাওনার অতিরিক্ত জিনিসকে। এখানে মূল বক্তব্যের অর্থ এই যে, এই জিজ্ঞাসাবাদ, এই তর্ক-বিতর্ক এবং এই ঝগড়া-বিবাদ কি আল্লাহর দেয়া দান সম্পর্কে করা হচ্ছে। যদি তাই বলা হয়ে থাকে,

তাহলে প্রশ্ন হলো এই যে, তোমরা এই জিনিসের মালিক হলে কেমন করে ? তোমরা নিজেরাই বা উহার ভাগ বাটোয়ারা সমাধান করবে কিভাবে ? প্রকৃতপক্ষে যিনি এই মাল-সামান দিয়েছেন, তিনিই ফয়সালা করবেন এই মাল কাকে দেয়া হবে, আর কাকে দেয়া হবে না ! আর যাকে দেয়া হবে তাকে কত অংশ দেয়া হবে।

যুদ্ধের এই পর্যায়ে এটা ছিলো একটা বড় নৈতিক সংশোধনমূলক হিদায়াত। প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের যুদ্ধ কখনো দুনিয়ার বস্তুগত ফায়দা লাভের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয় না। বরং তা অনুষ্ঠিত হয় দুনিয়ার নৈতিক ও তমুদ্দুনিক বিপর্যয় রোধ ও সত্য আদর্শের ভিত্তিতে তা সঠিকভাবে গড়ার উদ্দেশ্যে। অতএব সংশোধনকামী ব্যক্তিদের নজরকে নিজেদের মূল লক্ষ্যের উপরই নিবদ্ধ রাখা উচিত, উদ্দেশ্য লাভের জন্য কাজ ও চেষ্টা-সাধনা করার কারণে পুরস্কার হিসেবে আল্লাহর অনুগ্রহ যা পাওয়া যায়, তার দিকে আদৌ লক্ষ্য রাখা উচিত নয়। প্রথম দিকেই যদি সেই দিক হতে তাদের দৃষ্টি ফিরানো না হয়, তা হলে খুব শিঘ্রই নৈতিক পতন ঘটবে, আর এই ফায়দা লাভই তাদের চরম লক্ষ্য হয়ে বসবে।

যুদ্ধের গনীমতের ব্যাপারে এটা একটি প্রশাসনিক সংশোধনীও বটে। প্রাচীন কালের রীতি ছিলো, যুদ্ধের ময়দানে যে মাল যার হস্তগত হতো, সেই তার মালিক হয়ে যেতো অথবা স্বয়ং বাদশাহ কিংবা সম্রাট বা সেনাপতি সবকিছু দখল করে বসতো। প্রথম অবস্থা হলে প্রায়ই এমন হতো যে, বিজয়ী সেনাবাহিনীর লোকদের মধ্যে গনীমতের মাল নিয়ে বড় রকমের মনোমালিন্য দেখা দিত। আর দ্বিতীয় অবস্থা দেখা দিলে সৈন্যরা চুরিতে অভ্যস্ত হতো এবং গনীমতের মাল-সামান লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করতো।

পবিত্র আল কুরআনে গনীমতের মালকে اَنْفَالٌ (আনফাল) আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের সম্পদ বলে ঘোষণা করে দিয়ে এই নিয়ম ঠিক করে দিলো যে, যুদ্ধের ময়দানে প্রাপ্ত সম্পদ কোন প্রকার কম বেশী করা ছাড়াই ইমাম বা রাষ্ট্র প্রধানের সামনে উপস্থিত করতে হবে। পরে এই গনীমতের মাল বন্টনের একটা প্রয়োজনীয় আইন তৈরী করে দেয়া হয়। আর তা হলো এই যে, ১/৫ অংশ আল্লাহর কাজের জন্য এবং তাঁর গরীব বান্দাদের সাহায্যের জন্য বায়তুল মাল-এ জমা রাখতে হবে। আর বাকী

৪/৫ অংশ যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সৈন্যদের মধ্যে সমানভাবে বন্টন করে দিতে হবে। এর ফলে জাহেলীয়াতের যুগ থেকে চলে আসা দু'টি ত্রুটিপূর্ণ প্রথাই খতম হয়ে গেল।

এখানে একটি বিষয় পরিস্কার হওয়া প্রয়োজন যে, এই আয়াতে اَنفَال এর বিষয়ে সমস্ত বিষয়টি 'উহা আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের' বলেই সমাপ্তি টানা হয়েছে। এখানে তার বিলি-বন্টন সম্পর্কে কোন প্রশ্নই তোলা হয়নি। এরূপ করার মূল উদ্দেশ্যই হলো প্রথম অবস্থায় আল্লাহর নিকট পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করার পূর্ণতা লাভ করা। অতঃপর পরবর্তী ৫ম রুকুতে উহার বিলিবন্টনের নিয়ম-কানুন বলে দেয়া হয়েছে। এই কারণে এখানে উহাকে اَنفَال (আনফাল) বা 'আল্লাহর অতিরিক্ত দান' বলা হয়েছে। আর ৫ম রুকুতে যেখানে উহার বিলিবন্টনের কথা আলোচিত হয়েছে, সেখানে এই মাল-সামানকেই 'গানায়েম' বা গনীমতের মাল বলে অভিহিত করা হয়েছে।

প্রিয় ভাইয়েরা / বোনেরা ! এই আয়াতের শেষে সাহাবায়ে কিরামদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে–

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗٓ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

"অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং পারস্পরিক সম্পর্ককে সুদৃঢ় করো। আর তোমরা যদি মু'মিন হয়ে থাকো, তাহলে তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং আনুগত্য করো তাঁর রাসূলের।"

এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে, সে ঘটনার প্রতি যা বদর যুদ্ধে গনীমতের মাল-সামান বিলি বন্টনের ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামদের মাঝে ঘটে গিয়েছিলো। এতে পরস্পরের মধ্যে তিক্ততা এবং অসন্তুষ্টি সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা ছিলো। কাজেই আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন নিজেই গনীমতের মাল-সামান বিলি বন্টনের বিষয়ে এ আয়াত দ্বারা পরে মীমাংসা করে দিয়েছেন। তারপর তাদের আভ্যন্তরীন সংস্কার ও পারস্পরিক সম্পর্ককে সুন্দর ও মজবুত করার উপায় হিসেবে বলা হয়েছে-যার কেন্দ্রবিন্দু হলো তাকওয়া বা আল্লাহভীতি।

وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ "(তাকওয়া ও পরহেযগারীর মাধ্যমে) পারস্পরিক

সম্পর্ককে সংশোধন করো।" এরই কিছুটা বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে وَاَطِيْعُوااللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗٓ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ "যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাকো, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পূর্ণ আনুগত্য করো।" অর্থাৎ ঈমানের দাবীই হলো আনুগত্য করা। আর আনুগত্যের ফল হলো তাকওয়া। কাজেই মানুষ যখন এই বিষয়গুলো লাভ করতে সমর্থ হয়, তখন তাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ, লড়াই-ঝগড়া আপনা থেকেই বিদায় হয়ে যায় এবং শত্রুতার বদলে অন্তরে অবস্থান করে নেয় প্রেম, ভালবাসা ও সৌহার্দ। অতঃপর পরবর্তী আয়াতে মহান আল্লাহ তা'লা বলেন –

اِنَّمَاالْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَاللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ○ اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার তো তারাই, যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণের সময় কেঁপে উঠে। আর যখন তাদের সামনে আল্লাহর আয়াত তিলাওয়াত করা হয়, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা তাদের পরওয়ারদিগারের উপর ভরসা ও আস্থা রাখে। যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।

আলোচ্য আয়াত দু'টিতে সেসব গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথাই বলা হয়েছে, যা প্রতিটি মু'মিনের মধ্যে থাকা অবশ্যক। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রতিটি মু'মিন তার নিজের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন অবস্থার পর্যালোচনা করে দেখবে, যদি তার মধ্যে এসব গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকে, তবে সে এ বলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে যে, তিনি তাকে মু'মিনের গুণে গুণান্বিত করেছেন। আর যদি এগুলোর মধ্যে কোন একটি গুণ তার মধ্যে না থাকে কিংবা থাকলেও তা একেবারে দূর্বল বলে মনে হয়, তাহলে তা অর্জন করার কিংবা তাকে সবল করে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করবে। নিম্নে মু'মিনদের পাঁচটি গুণ-বৈশিষ্ট্যর কথা আলোচনা করা হলো ঃ

(এক) আল্লাহর ভয় ঃ আয়াতে মু'মিনদের প্রথম গুণ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে – اَلَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَاللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ "তাদের সামনে যখন

আল্লাহর আলোচনা করা হয়, তখন তাদের দিল আঁতকে উঠে।" অর্থাৎ তাদের দিল অল্লাহর মহত্ত্ব ও প্রেমে ভরপুর, যার দাবী হল ভয় ও ভীতি।

পবিত্র কুরআনে অন্য এক আয়াতে আল্লাহ প্রেমিকদের সুসংবাদ দিয়ে বলা হয়েছে – وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ
"(হে নবী!) সুসংবাদ দিয়ে দিন সেসব বিনয়ী, কোমল প্রাণ লোকদেরকে, যখন তাদের সামনে আল্লাহর আলোচনা করা হয়, তখন তাদের দিল ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে।"

উপরোক্ত আয়াত দু'টিতে আল্লাহর আলোচনা ও স্মরণের একটা বিশেষ অবস্থার কথা বলা হয়েছে, তা হলো ভয় ও ত্রাস। আর অন্য এক আয়াতে আল্লাহর যিকিরের এই বৈশিষ্ট্যও বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাতে অন্তর বা দিল প্রশান্ত হয়ে উঠে। বলা হয়েছে – اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ
"যেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই আত্মা প্রশান্তি লাভ করে।"

এতে বোঝা যায় যে, আয়াতে যে ভয় ও ভীতির কথা বলা হয়েছে, তা মনের প্রশান্তি ও স্বস্তির বিপরীত নয়। যেমন হিংস্র জীব-জন্তু কিম্বা শত্রুর ভয় মানুষের মনের শান্তিকে ধ্বংস করে দেয়। আল্লাহর স্মরণের কারণে যে ভয় সৃষ্টি হয় তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

(দুই) ঈমানের বৃদ্ধি বা উন্নতিঃ মু'মিনের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যে বলা হয়েছে– وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا "আর যখন তাদের সামনে আল্লাহর আয়াত তিলাওয়াত করা হয়, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায়।"

অর্থাৎ তার সামনে যখন আল্লাহর আয়াত পাঠ করা হয়, তখন তার আ'মল বৃদ্ধি পায়। সমস্ত ওলামায়ে কিরাম, মুফাসসীরীন ও মুহাদ্দীসগণের সর্বসম্মত মতে, ঈমান বৃদ্ধির অর্থ হলো, ঈমানের শক্তি, অবস্থা এবং ঈমানী জ্যোতির উন্নতি। আর এটা প্রমাণিত যে, সৎকাজের দ্বারা ঈমানী শক্তির এমন আত্মিক প্রশান্তি সৃষ্টি হয়, তাতে সৎকাজ মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। তখন গুনাহ করতে গেলে খুবই কষ্ট হয় এবং তার প্রতি একটা প্রকৃতিগতভাবে ঘৃণার সৃষ্টি হয়, যার ফলে সে তার কাছেও যেতে চায় না। ঈমানের এ অবস্থাকেই হাদীসে 'ঈমানের মাধুর্য' শব্দের বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সুতরাং আয়াতের সারমর্ম হলো এই যে, একজন পরিপূর্ণ মু'মিনের এমন গুণ-বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন যে, তার সামনে যখনই আল্লাহর আয়াত পাঠ করা হবে, তখন তার ঈমানের উজ্জলতা বৃদ্ধি পাবে, তাতে উন্নতি লাভ করবে এবং সৎ কাজের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হবে।

(তিন) আল্লাহর উপর ভরসা ও আস্থা ঃ মু'মিনের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে যেয়ে বলা হয়েছে - وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ "আর তারা তাদের পরওয়ারদিগারের উপর ভরসা ও আস্থা রাখে।"

অর্থাৎ নিজের যাবতীয় কাজ-কর্মের পরিপূর্ণ আস্থা ও ভরসা থাকে শুধুমাত্র আল্লাহ তা'লার উপর। বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (সঃ) বলেছেন, এর অর্থ এই নয় যে, নিজের প্রয়োজনের জন্য দুনিয়ার উপায়-উপকরণ এবং চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে ত্যাগ করে বসে থাকবে। বরং এর অর্থ হলো এই যে, দুনিয়ার উপায়-উপকরণকেই প্রকৃত কৃতকার্যতার জন্য যথেষ্ট বলে মনে না করে বরং নিজের সামার্থানুযায়ী দুনিয়ার উপায়-উপকরণের আয়োজন ও চেষ্টা চরিত্রের পর সাফল্য আল্লাহ তা'লার উপর ছেড়ে দিবে এবং মনে করবে যে, যাবতীয় উপকরণও তাঁরই সৃষ্টি এবং সেসব উপকরণের ফলাফলও তিনিই সৃষ্টি করেন। বস্তুত পক্ষে হবেও তাই, যা তিনি চাইবেন।

(চার) সালাত প্রতিষ্ঠা করা ঃ মু'মিনের চতুর্থ গুণ বৈশিষ্ট্য হলো–

اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ "যারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে।" ইতোপূর্বে মুমিনদের আকীদাগত গুণ-বৈশিষ্ট্যর কথা আলোচনা করার পর আল্লাহ তাদের আ'মল সম্পর্কে গুণ-বৈশিষ্ট্যের সংবাদ দিচ্ছেন যে, তারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে। সালাত প্রতিষ্ঠা হচ্ছে আল্লাহর হক সমূহের মধ্যে একটি হক। এখানে একটি বিষয় স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এখানে কেবল মাত্র নামায পড়ার কথা বলা হয়নি; বরং নামায প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে।

اقَامَتٌ -শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো কোন কিছুকে সোজা করা, দাঁড় করানো। কাজেই اقَامَتِ صَلٰوةً এর মর্মার্থ হচ্ছে নামাযের আদব-কায়দা, রীতি-নীতি ও শর্তসমূহ এমনভাবে আদায় করা, যেমনভাবে

রাসূলে করীম (সঃ) কথা ও আ'মলের মাধ্যমে বাতলে দিয়েছেন। আদব-কায়দা, রীতি-নীতি ও শর্তসমূহের কোন ত্রুটি হলে তাকে নামায পড়া বলা গেলেও নামায প্রতিষ্ঠা বলা যেতে পারে না।

নামাযের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে পবিত্র আল কুরআনে বলা হয়েছে –

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ (নিশ্চয় নামায লজ্জাহীনতা ও পাপ থেকে বিরত রাখে।) তা নামায প্রতিষ্ঠা করার উপরই নির্ভরশীল। নামাযের আদব-কায়দা, রীতি-নীতি ও শর্তসমূহে যখন কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে, তখন ফতোয়ার দিক দিয়ে তার সে নামাযকে জায়েয বলা হলেও ত্রুটির পরিমাণ হিসেবে নামাযের বরকত ও কল্যাণ থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হতে হবে।

(পাঁচ) আল্লাহর পথে ব্যয় : মু'মিনদের পঞ্চম গুণ-বৈশিষ্ট্য হলো-

وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ "আর তারা তাদের রিযিক থেকে ব্যয় করে।" অর্থাৎ আল্লাহ তাদেরকে যে রুজি দান করেছেন তা থেকেই তারা আল্লাহর পথে খরচ করে। আল্লাহর পথে খরচের অর্থ ব্যাপক। এতে যেমন শরীয়ত নির্ধারিত যাকাত ও ফিৎরা রয়েছে। তেমনি এর বাইরেও নফল অর্থাৎ অতিরিক্ত দান-খয়রাত, মেহমানদারী, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, বড়দের কিংবা বন্ধু-বান্ধবদের আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতা ইত্যাদি সব রকমের দান-খয়রাতই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

উপোরক্ত পাঁচটি গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী প্রকৃত মু'মিনদের বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে – اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا "এসব লোকেরাই হলো সত্যিকার মু'মিন।" অর্থাৎ এমনসব লোকেরাই হলো সত্যিকারের মু'মিন যাদের ভিতর ও বাহির এক রকম এবং যবান ও অন্তরও ঐক্যবদ্ধ রয়েছে। পক্ষান্তরে যাদের মধ্যে এসব গুণ-বৈশিষ্ট্য অবর্তমান, তারা মুখে যতই কালেমা শাহাদাৎ উচ্চারণ করুক না কেন, তাতে অন্তরে না থাকে তাওহীদের রং, আর না থাকে রাসূলের আনুগত্য। তাদের আ'মল বা কর্ম তাদের কথা কে প্রত্যাক্ষান করে। কাজেই এই আয়াতে এই ইঙ্গিত-ই দেয়া হয়েছে যে, প্রত্যেক সত্যেরই একটা তাৎপর্য থাকে, তা যখন অর্জিত হয় না, তখন সন্তুষ্টিও লাভ হয় না।

উপোরক্ত আয়াতগুলোতে প্রকৃত মু'মিনের গুণ-বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণাদি বর্ণনা

করার পর তাদের মর্যাদা ও প্রতিদানের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে –

لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ

তাদের জন্য রয়েছে তাদের পরওয়ারদিগারের নিকট উচ্চমর্যাদা, আছে অপরাধের ক্ষমা ও উত্তম রিযিক।

আয়াতের এই অংশে প্রকৃত মু'মিনদের প্রতিদান হিসেবে তিনটি বিষয়ের ওয়াদা করা হয়েছে। ১. সুউচ্চ মর্যাদা ২. মাগফিরাত বা ক্ষমা এবং ৩. সম্মানজনক রিযিক।

তাফসীরে বাহরে-মুহীতে উল্লেখ রয়েছে, এর পূর্বের আয়াতে মু'মিনদের যে গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে সেগুলো তিন ধরণের। যেমন–

প্রথম ধরণ হলো ঃ যেসব গুণ-বৈশিষ্ট্য যার সম্পর্ক অন্তর ও অভ্যন্তরের সাথে। যেমন ঈমান, খোদাভীতি, আল্লাহর উপর ভরসা বা আস্থা।

দ্বিতীয় ধরণ হলো ঃ যার সম্পর্ক দেহের কর্মের সাথে সম্পর্কিত। যেমন নামায, রোজা প্রভৃতি।

তৃতীয় ধরণ হলো ঃ যার সম্পর্ক ধন-সম্পদের সাথে। যেমন আল্লাহর পথে ব্যয় বা খরচ করা।

এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের পরিপেক্ষিতে তিনটি প্রতিদানের কথা বলা হয়েছে। আত্মিক বৈশিষ্ট্যের জন্যে সুউচ্চ মর্যাদা, দৈহিক আ'মল বা কর্মের জন্যে মাগফিরাত বা ক্ষমা,আর আল্লাহর পথে খরচের জন্যে সম্মানজনক রিযিক। অতঃপর বদর যুদ্ধের প্রসঙ্গ তুলে ধরে মহান আল্লাহ্ তা'লা বলেন–

كَمَآ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكٰرِهُوْنَ ۝ يُجَادِلُوْنَكَ فِى الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوْنَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ

(এই গনীমতের মালের বিষয়ে সেই রকম অবস্থারই সৃষ্টি হয়েছিলো তখন,যখন) আপনার রব ন্যায় ও সৎকাজের জন্য ঘর থেকে বের করে এনেছিলেন, অথচ ঈমানদারদের একটি দল (তাতে) সম্মত ছিলো না। তারা আপনার সাথে এই সত্য ও ন্যায়ের বিষয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়েছিলো। অথচ তা পুরাপুরি সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। তাদের অবস্থা এই হয়েছিলো যে, তারা যেন দেখতে দেখতে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছে।

অর্থাৎ তখন এসব লোকেরা যেভাবে বিপদের মুখোমুখি হতে ভয় পাচ্ছিল, অথচ তখন দাবী এই ছিলো যে, বিপদের মুখে ঝাপিয়ে পড়তে হবে। তেমনিভাবে এখন গনীমতের মাল-সামান হাত ছাড়া করতে তাদের কষ্ট হচ্ছে, অথচ প্রকৃত দাবী ছিলো এই যে, এটা তারা ছেড়ে দিবে এবং এ সম্পর্কে আল্লাহর বিধান নাযিল হওয়ার অপেক্ষা করতে থাকবে।

এর আরও একটা অর্থ হতে পারে এই যে, তোমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করো এবং নিজেদের নফসের চাহিদার পরিবর্তে রাসূলের কথা মেনে নাও, তা হলে এরূপই ভাল পরিণতি দেখতে পাবে, যেমন এই বদর যুদ্ধের সময় দেখতে পেয়েছো। কুরাইশ সেনাদের মুকাবিলা করতে যাওয়া তোমাদের কাছে দুঃসাধ্য মনে হচ্ছিলো, বরং তোমরা তাকে ধ্বংস ও মৃত্যুর নামান্তর মনে করতে, কিন্তু তোমরা যখন আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ মেনে নিলে, তখন এই বিপদমূলক কাজই তোমাদের কাছে সঞ্জীবনী হয়ে দেখা দিল।

বদর যুদ্ধ সম্পর্কে জীবন-চরিত্র ও ইতিহাস গ্রন্থে সাধারণত যেসব বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে, কুরআনের এই বর্ণনা তা প্রতিবাদ করতেছে। এসব গ্রন্থে বলা হয়েছে, নবী করীম (সঃ) ও মুসলমানরা প্রথমেই কুরাইশদের বাণিজ্যিক কাফিলা লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে যাত্রা শুরু করেন, কিন্তু কয়েক মঞ্জিল পথ চলার পর তারা যখন জানতে পারলেন যে, কুরাইশ সৈন্যরা উহার হিফাযতের জন্য এগিয়ে আসছে, তখন বাণিজ্যিক কাফিলার উপর হামলা করা হবে, না সৈন্য বাহিনীকে বাধাদান করা হবে, সেই বিষয়ে পরামর্শ করা হয়। কিন্তু আল কুরআন এর সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলে। এতে বলা হয়েছে, নবী করীম (সঃ) যখন নিজের ঘর থেকে বের হয়ে আসলেন, তখনই তিনি কুরাইশ সৈন্যদের উপর আক্রমন করার কথাই চিন্তা করছিলেন এবং তিনি প্রথমেই মনে করেছিলেন যে, কুরাইশ সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করা হবে। আর পরামর্শ করা হয়েছিলো তখন, যখন বাণিজ্য কাফিলা ও সৈন্যবাহিনী এই দু'য়ের মধ্যে কার উপর আক্রমণ করা হবে তা ঠিক করার প্রশ্ন দেখা দিয়েছিলো। আর সৈন্যবাহিনীর সাথেই যে সম্মুখ যুদ্ধে মুকাবিলা করতে হবে এই সম্পর্কে মু'মিনদের যদিও সুস্পষ্ট ধারণা বর্তমান ছিলো, তা সত্ত্বেও একদল লোক এই সরাসরি যুদ্ধ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য বিতর্ক করতে শুরু করে। শেষ পর্যন্ত যখন

সেনাবাহিনীর সাথেই মুকাবিলা করার সিদ্ধান্ত করা হয়। তখন এই দলের লোকেরা মদীনা হতে একথা মনে করে বের হয়ে এসেছিলো যে, তারা সরাসরি মৃত্যুর মুখোমুখি হতে যাচ্ছে। (তাফহীমুল কুরআন)

অতঃপর আল্লাহ বলেন- وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللهُ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَ يَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَ

(হে নবী !) স্মরণ করুন সেই সময়ের কথা, যখন আল্লাহ আপনার নিকট ওয়াদা করছিলেন যে, দু'টি দলের মধ্যে একটি তোমরা পাবে, আর তোমরা কামনা করতেছিলে যে, দুর্বল দলটি তোমরা পাবে। অথচ, আল্লাহর ইচ্ছা ছিলো এই যে, তিনি তার কালামের দ্বারা সত্যকে সত্যরূপে প্রতিভাত করে দেখাবেন এবং কাফিরদের শিড়ক কেটে দিবেন।

দু'টি দলের একটি অর্থাৎ হয় বাণিজ্য কাফিলা নতুবা কুরাইশ সৈন্যবাহিনী। আর মুসলমানেরা চাচ্ছিলো আনুপাতিক হারে দুর্বল দলটি অর্থাৎ বাণিজ্য কাফিলা যাদের সাথে মাত্র ৩০/৪০ জন রক্ষী ছিলো। যাদের সাথে যুদ্ধ করা লাগবে না, অথচ অতি সহজেই শত্রুদের মালামাল হস্তগত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে আল্লাহর ইচ্ছা ছিলো কাফিরদের শিকড়কে চিরতরে উপড়ে ফেলার জন্য কুরাইশ সৈন্যবাহিনীর মুকাবিলা করে সত্যকে চিরতরে প্রতিভাত করা।

এর পর আল্লাহ বলেন-لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ

যাতে করে সত্যকে সত্য হিসেবে এবং বাতিলকে বাতিল হিসেবে প্রমাণিত করা হয়, তাতে পাপী লোকদের জন্য তা যতই অসহণীয় হোক না কেন।

প্রকৃতপক্ষে তখন কি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো, তা এই কথা হতেই অনুমান করা যেতে পারে। এই সূরা সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনায় যেমন বলা হয়েছে, কুরাইশ সৈন্যদের এগিয়ে আসার ফলে মূলত এই প্রশ্ন দেখা দেয় যে, ইসলামী আন্দোলন না জাহেলী ব্যবস্থা এ দু'টির মধ্যে কোনটি আরব ভূখন্ডে বেঁচে থাকবে ? এই সময় যদি মুসলমানরা পরিপূর্ণ বীরত্বের সাথে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে না পড়তো, তা হলে ইসলামের ভবিষ্যৎ বলতে কিছুই থাকতো না। কিন্তু মুসলমানরা সম্মুখ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ায় এবং প্রথম

আক্রমনেই কুরাইশ বাহিনীর শক্তির দাপট চুরমার হয়ে যাওয়ায় এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, যার ফলে আরবের বুকে ইসলামের শিকড় মজবুত হয়ে বসবার সুযোগ লাভ করে এবং এরেই ফলে জাহেলী ব্যবস্থা ক্রমাগতভাবে পরাজয় বরণ করে বিলীন হতে থাকে।

শিক্ষা ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা/ বোনেরা ! এতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনাদের সামনে সূরা আনফালের ১ম থেকে ৮ নং পর্যন্ত আয়াতগুলোর দারস পেশ করলাম। এখন এখান থেকে আমাদের জন্য কি কি শিক্ষণীয় রয়েছে তা আলোচনা করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। শিক্ষণীয় বিষয়গুলো নিম্নরূপ ঃ –

■ আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নিঃস্বার্থভাবে জড়িত থাকতে হবে। গনীমতের মাল পাবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ না করে বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ-জিহাদ করতে হবে। যদি আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টিই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তা হলে দুনিয়ার পাওয়া না পাওয়াতে কোন প্রকার অসন্তুষ্টি আসে না এবং পরস্পরের মধ্যে নূন্যতম সম্পর্কের অবনতি ঘটারও কোন সম্ভাবনা থাকে না।

■ মু'মিন ব্যক্তি সর্বদা আল্লাহকে ভয় করে চলবে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে এবং ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ককে সংশোধন করে মজবুত করে নিবে।

■ প্রকৃত মু'মিন হতে হলে পাঁচটি গুণের অধিকারী হতে হবে। তা হলো ১. আল্লাহর স্মরণের সময় আল্লাহর ভয়ে মন-দিল কেঁপে উঠবে। ২. আল্লাহর কালাম তথা আল কুরআন পাঠের সময় তার মর্ম উপলব্ধি করে ঈমান বৃদ্ধি এবং মজবুত হবে। কোন প্রকার অন্যায় এবং পাপ কাজ করবে না। ৩. কোন আ'মল বা কাজ করার পর তার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করতে হবে এবং আল্লাহর উপর ভরসা ও আস্থা রাখতে হবে। অধৈর্য হলে চলবে না। ৪. সালাতের যাবতীয় আদব-কায়দা, রীতি-নীতি ও শর্তসমূহ পালনের মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে সালাত প্রতিষ্ঠা করতে হবে, কোন প্রকার ত্রুটি রাখা যাবে না। সর্বোপরি সমাজ জীবনে পরিপূর্ণভাবে সালাত কায়েমের আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। ৫. আল্লাহ তা'লা যতটুকু আমাদের রুযি দান করেছেন তা থেকে যদি নিসাব পরিমান অর্থ-সম্পদ থাকে তা হলে পরিপূর্ণভাবে হিসাব করে যাকাত আদায় করতে হবে।

ফিৎরাসহ অন্যান্য যাবতীয় দান-খয়রাত করতে হবে এবং আত্নীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীর সাধ্য মত সাহায্য সহযোগিতা করতে হবে।

■ যদি কেউ উপোরক্ত গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে পারে তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনটি প্রতিদানের ওয়াদা করা হয়েছে, আর তা হলো ১. উচ্চ মর্যাদা ২. অপরাধের ক্ষমা এবং ৩. অতি উত্তম রিযিক।

■ সত্য ও ন্যায়ের বিষয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়া যাবে না। বরং যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন সত্য বা ন্যায়ের নির্দেশ আসে তাহলে সেটা পালন করা যতই ঝুঁকিপূর্ণ হোক না কেন অথবা মৃত্যুর আশঙ্কা থাক না কেন তা যথাযতভাবে পালন করতে হবে।

■ কুফরী শক্তিকে চিরতরে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য কঠিন ঝুঁকি গ্রহণ করতে হবে। যেমন মুসলমানরা বদরের যুদ্ধে সৈন্যবাহিনীর সাথে মুকাবিলার পরিবর্তে কম ঝুঁকিপূর্ণ বাণিজ্য কাফিলার হামলা করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলো, কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিলো মুশরিকদের সৈন্যবাহিনীর মুকাবিলা করে তাদের শক্তিকে দূর্বল করে দেয়া। সেইভাবেই মুসলমানরা বাণিজ্য কাফিলার পরিবর্তে মুশরিক সৈন্যবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করেছিলেন,ফলে আল্লাহ তা'লা তাদেরকে সাহায্য করে কুফরী শক্তিকে পরাভুত করে ইসলামী শক্তির বিজয় দান করেছিলেন।

■ পাপী লোকদের জন্য যতই বেদনাদায়ক হোক না কেন আল্লাহ তা'লা হক তথা সত্যকে সত্য হিসেবে এবং বাতিল তথা মিথ্যাকে মিথ্যা হিসেবে প্রমাণিত করে ছাড়বেন, যদি মু'মিনেরা জীবনের ঝুঁকি গ্রহণ করতে পারে।

আহবান ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা/ বোনেরা ! এতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনাদের সামনে সূরা আনফালের ১ম থেকে ৮ম আয়াত পর্যন্ত যে দারস পেশ করলাম, তাতে যদি আমার অজান্তে কোন ভুল-ত্রুটি কিংবা বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, তার জন্য আমি মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর এই দারস থেকে যেসব শিক্ষণীয় বিষয় আমরা জানতে পারলাম, তা যেন বাস্তব জীবনে আ'মল করতে পারি সেই তাওফীক কামনা করে আমি আমার দারস শেষ করছি। 'অয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন।'

নারী-পুরুষ সকলেই আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য হিজরত করা। বাড়িঘর থেকে বের করে দেয়া এবং নিহত হবার প্রতিদান।

সূরা আলে ঈমরান – ৩

আয়াত ১৯৪–২০০

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَاتُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ
اِنَّكَ لَاتُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ۝ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّىْ لَاۤ اُضِيْعُ
عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۚ
فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِىْ سَبِيْلِىْ
وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ
تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ
عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ ۝ لَايَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِى
الْبِلَادِ ۝ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ قف ثُمَّ مَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝
لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ

لِّلْاَبْرَارِ ○ وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا
اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ لا لَايَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ
اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ط اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ط اِنَّ اللّٰهَ
سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا
وَرَابِطُوْا قف وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

সরল অনুবাদ ঃ ইরশাদ হচ্ছে – (১৯৪) হে আমাদের পরওয়ারদিগার ! তুমি তোমার রাসূলগণের মাধ্যমে যা ওয়াদা করেছো-তা তুমি আমাদেরকে দাও, আর কিয়ামতের দিন তুমি আমাদেরকে অপমানিত করো না। নিশ্চয় তুমি ওয়াদা খেলাপ করো না। (১৯৫) জবাবে তাদের পরওয়ারদিগার বললেন ঃ আমি তোমাদের কারো পরিশ্রমই নষ্ট করি না, তাতে সে পুরুষ হোক কিংবা হোক নারী। তোমরা সবাই একই জাতির অন্তর্ভুক্ত। কাজেই যারা আমার জন্য হিজরত (দেশ ত্যাগ) করেছে এবং আমার পথে যাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দেয়া হয়েছে, যারা আমার জন্য লড়াই করেছে ও নিহত হয়েছে, তাদের সমস্ত গুনাহ আমি মাফ করে দিবো এবং তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবো যার নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে। এসব হলো আল্লাহর নিকট তাদের প্রতিদান। আর আল্লাহর কাছেই রয়েছে সবচেয়ে উত্তম প্রতিদান। (১৯৬) হে নবী ! নগরীতে কাফির লোকদের চালচলন যেন আপনাকে ধোঁকায় ফেলে না দেয়। (১৯৭) এটা নিছক কয়েকদিনের আনন্দ-ফুর্তি মাত্র। এরূপর তারা সবাই জাহান্নামে চলে যাবে, যা অত্যন্ত নিকৃষ্ট জায়গা। (১৯৮) অপর পক্ষে যারা তাদের নিজেদের রবকে ভয় করে জীবনযাপন করে তাদের জন্য রয়েছে এমন জান্নাত, যার নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। এ হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য মেহমানদারীর উপকরণ। আর যা কিছু আল্লাহর কাছে আছে, নেককার লোকদের জন্য তাই উত্তম। (১৯৯) আর আহলি কিতাবদের মধ্যে এমনও কিছু লোক আছে, যারা আল্লাহর উপর ঈমান আনে ও তোমাদের কাছে যে কিতাব পাঠানো হয়েছে তার উপর ঈমান আনে এবং এর পূর্বে

তাদের নিজের কাছে যে কিতাব পাঠানো হয়েছিলো তার উপরও ঈমান রাখে, যারা আল্লাহর সামনে বিনয়াবনত থাকে এবং আল্লাহর আয়াতকে সামান্য মূল্যে বিক্রয় করে না, তাদের প্রতিদান রয়েছে তাদের রবের কাছে। আর তিনি সব হিসেব চুকিয়ে দেয়ার ব্যাপারে দেরী করেন না। (২০০) হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য ধারণ করো এবং বাতিল পন্থীদের মুকাবিলায় দৃঢ়তা অবলম্বন করো। হকের খিদমত করার জন্য উঠেপড়ে লেগো এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। আশা করা যায় যে তোমরা সফলকাম হবে।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থঃ رَبَّنَا -হেআমাদের প্রতিপালক। اٰتِنَا - আমাদেরকে দাও। مَا -যা। وَعَدْتَّنَا -আমাদের সাথে ওয়াদা করেছো। عَلٰى -উপর/ মাধ্যম। رُسُلِكَ -তোমার রাসূলদের। وَلَا -এবং করো না। تُخْزِنَا - আমাদেরকে অপদস্ত। يَوْمَ -দিন। الْقِيٰمَةِ -কিয়ামত। اِنَّكَ -নিশ্চয়ই তুমি। لَا -না। تُخْلِفُ -খেলাপ। الْمِيْعَادَ -ওয়াদা। فَاسْتَجَابَ -অতঃপর উত্তর দিলেন। لَهُمْ -তাদের জন্যে। رَبُّهُمْ -তাদের রব। اَنِّىْ -নিশ্চয় আমি। اُضِيْعُ -নষ্ট করি না। عَمَلَ -পরিশ্রম। عَامِلٍ -পরিশ্রমকারীর। مِّنْكُمْ - তোমাদের মধ্যে। مِنْ -থেকে। ذَكَرٍ -পুরুষ। اَوْ -কিংবা। اُنْثٰى -নারী। بَعْضُكُمْ -তোমাদের পরস্পর। بَعْضٍ -পরস্পরের। فَالَّذِيْنَ -অতঃপর যারা। هَاجَرُوْا -তোমরা হিজরত করেছো। اُخْرِجُوْا -তোমাদের বের করে দেয়া হয়েছে। مِنْ -হতে। دِيَارِهِمْ -তাদের ঘরবাড়ি থেকে। وَ -এবং। اُوْذُوْا -তোমাদের কষ্ট দেয়া হয়েছে। فِىْ - মধ্যে। سَبِيْلِىْ -আমার পথে/ জন্যে। قٰتَلُوْا -তোমরা লড়াই করেছো। قُتِلُوْا-তোমরা নিহত হয়েছো। لَاُكَفِّرَنَّ-অবশ্যই ক্ষমা করে দিব। عَنْهُمْ-তাদের থেকে। سَيِّاٰتِهِمْ -তাদের গুনাহ/অপরাধসমূহ। وَ -এবং/আর। لَاُدْخِلَنَّهُمْ-অবশ্যই তাদের প্রবেশ করাবো। جَنّٰتٍ -জান্নাত। تَجْرِىْ -প্রবাহিত হয়। مِنْ -থেকে। تَحْتِهَا -

উহার নীচ দিয়ে। اَلْاَنْهٰرُ -ঝর্ণাধারাসমূহ। ثَوَابًا -প্রতিদান। عِنْدَاللّٰهِ - আল্লাহর নিকট রয়েছে। عِنْدَهٗ -তার কাছে রয়েছে। حُسْنُ -উত্তম। الثَّوَابِ - প্রতিদান। لَايَغُرَّنَّكَ -আপনাকে ধোকায় না ফেলে। تَقَلُّبُ - চলাফেরা। الَّذِيْنَ -যারা। كَفَرُوْا -কুফরী করেছে/কাফির লোকদের। فِيْ - মধ্যে। اَلْبِلَادِ – নগরী/ শহর। مَتَاعٌ -(আনন্দ-ফূর্তির) সামগ্রী। قَلِيْلٌ - স্বল্প (কয়দিনের)। ثُمَّ -অতঃপর/এরপর। مَاوٰهُمْ -তারা সবাই চলে যাবে। جَهَنَّمُ -জাহান্নাম। بِئْسَ -নিকৃষ্ট। اَلْمِهَادُ -বসবাসের স্থান। لٰكِنِ الَّذِيْنَ- পক্ষান্তরে যারা। اِتَّقَوْا -তোমরা ভয় করো। رَبَّهُمْ -তাদের প্রতিপালক। لَهُمْ-তাদের জন্য। خٰلِدِيْنَ -চিরদিন। فِيْهَا -উহাতে। نُزُلًا -মেহমানদারীর সামগ্রী। مِنْ -হতে। عِنْدِاللّٰهِ -আল্লাহর পক্ষ/নিকট। وَمَا -এবং যা কিছু। عِنْدَاللّٰهِ -আল্লাহর কাছে আছে। خَيْرٌ -উত্তম/উৎকৃষ্ট। لِلْاَبْرَارِ -নেককার/ পূণ্যবানদের জন্য। اِنَّ -যদি/ এমনও। اَهْلِ الْكِتٰبِ -আহলি কিতাব (ইহুদী-নাছারা)। لَمَنْ يُّؤْمِنُ -যারা ঈমান আনে। بِاللّٰهِ -আল্লাহতে। وَمَا- এবং যা। اُنْزِلَ -অবতীর্ণ হয়েছে। اِلَيْكُمْ -তোমাদের নিকট। اِلَيْهِمْ - তাদের নিকট। خٰشِعِيْنَ-যারা বিনয়ী থাকে। لِلّٰهِ -আল্লাহর জন্য। لَايَشْتَرُوْنَ -তারা বিক্রয় করে না। بِاٰيٰتِ -আয়াতসমূহকে। ثَمَنًا - মূল্যে। قَلِيْلًا - সামান্য/ অল্প। اُولٰٓئِكَ -ওরাই/ তারাই। لَهُمْ -তাদের জন্য। اَجْرُهُمْ - তাদের প্রতিদান। عِنْدَ -কাছে/ নিকটে। رَبِّهِمْ -তাদের প্রতিপালকের। اِنَّ اللّٰهَ-নিশ্চয় আল্লাহ। سَرِيْعُ -বুঝিয়ে দেন। الْحِسَابِ -পাওনা। يٰاَيُّهَا - ওহে/হে। الَّذِيْنَ -যারা। اٰمَنُوْا -ঈমানদার। اِصْبِرُوْا -তোমরা ধৈর্য ধরো।

وَاتَّقُوا اللهَ -এবং আল্লাহকে ভয় করো। لَعَلَّكُمْ -আশা করা যায়। تُفْلِحُوْنَ - তোমরা কৃতকার্য হবে/ সফলকাম হবে। صَابِرُوْا -দৃঢ়তা দেখাও। رَابِطُوْا -উঠেপড়ে লাগো।

সম্বোধন ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা / বোনেরা ! আসসালামুআলাইকুম ওয়া রহমাতুলাহি ওয়া বারাকাতুহ। আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কালামে হাকীম আল কুরআনের সূরা আলে ঈমরানের ১৯৪ থেকে ২০০ নম্বর আয়াত অর্থাৎ সূরার শেষের সাতটি আয়াত তিলাওয়াত ও সরল অনুবাদ পেশ করেছি। আল্লাহ্ পাক যেন আমাকে আপনাদের খিদমতে সহীহ্ সালামতে দারস পেশ করা তাওফীক দান করেন।

সূরার নামকরণ ঃ এই সূরার ৩৩ নম্বর আয়াতে উল্লেখিত اَلْعِمْرَانْ শব্দ থেকে এই সূরার নাম 'আলে ঈমরান' রাখা হয়েছে। আলে ঈমরান অর্থ হলো-ঈমরানের বংশধর। এই সূরাটির নামকরণ কোন শিরোনাম হিসেবে করা হয়নি বরং সূরার পরিচিতির জন্যে প্রতীকী বা চিহ্ন হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। (সূরার নামকরণ সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ প্রথম খন্ডের এক নম্বর দারসে দেখুন)

সূরাটি নাযিল হওয়ার সময়কাল ঃ সূরা আলে ঈমরান সর্বসম্মভাবে মাদানী সূরা। তবে একই ভাষণে পুরো সূরাটি নাযিল হয়নি। মোট চারটি ভাষণে সূরাটি সমাপ্ত হয়েছে।

প্রথম ভাষণ ঃ প্রথম ভাষণ সূরার শুরু তেকে চতুর্থ রুকুর দ্বিতীয় আয়াত পর্যন্ত চলেছে এবং এটি সম্ভবত বদর যুদ্ধের কাছাকাছি সময়ে নাযিল হয়েছে বলে মনে হয়।

দ্বিতীয় ভাষণ ঃ দ্বিতীয় ভাষণটি সূরার চতুর্থ রুকুর তৃতীয় আয়াত তেকে শুরু করে ষষ্ঠ রুকুর শেষে গিয়ে শেষ হয়েছে। নবম হিজরীতে নাজরানের প্রতিনিধি দলের আগমনের সময় এটি নাযিল হয়।

তৃতীয় ভাষণ ঃ সূরার তৃতীয় ভাষণটি সপ্তম রুকুর শুরু থেকে নিয়ে দ্বাদশ রুকুর শেষ পর্যন্ত চলেছে। প্রথম ভাষণের সাথে সাথেই এটি নাযিল হয় বলে মনে হয়।

চতুর্থ ভাষণ ঃ এটি সূরার সর্বশেষ ভাষণ। ত্রৈবিংশ রুকু থেকে আরম্ভ করে সূরার শেষ পর্যন্ত চলেছে। ওহুদ যুদ্ধের পর এটি নাযিল হয়। এ বিষয়ে মহান আল্লাহই সবচেয়ে বেশী ভাল জানেন।

সূরাটির বিষয়বস্তু বা আলোচ্য বিষয় ঃ সূরা আলে ঈমরানে দু'টি দলকে সম্বোধন করা হয়েছে। একটি দল হলো আহলি কিতাব (ইহুদী ও নাছারা) এবং দ্বিতীয় দলটি হলো রাসূলের অনুসারী মুসলমান।

সূরার প্রথমে আহলি কিতাব তথা ইহুদী-খৃষ্টানদেরকে জোরালো ভাষায় তাদের আকীদাগত বিভ্রান্তি এবং চারিত্রীক দোষ সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে রাসূল (সঃ) এবং আল কুরআনকে মেনে নেয়ার আহবান জানানো হয়েছে।

দ্বিতীয় দল তথা রাসূলের অনুসারী মুসলমানদেরকে শ্রেষ্ঠতম দলের মর্যাদার কথা স্মরণ করে দিয়ে তাদের মহান দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে। সত্যের পতাকা বহণ এবং বিশ্ব মানবতার সংস্কার ও সংশোধনের জন্য পূর্ববর্তী উম্মতদের ধর্মীয় ও চারিত্রীক অধঃপতনের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরে তাদের পথ অনুসরণ না করে দূরে থাকার জন্য সতর্ক করা হয়েছে। একটি সংস্কারবাদী দল হিসেবে তারা কিভাবে কাজ করবে এবং যেসব আহলি কিতাব ও মুশরিক মুসলমানেরা আল্লাহর দ্বীনের পথে নানা ধরণের বাধা সৃষ্টি করছে তাদের সাথে কি আচরণ করতে হবে, তাদেরকে সেই কথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে। ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের মধ্যে যেসব দূর্বলতা দেখা দিয়েছিলো, তার পর্যালোচনা এবং দূর্বলতা দূর করার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতসমূহের মূল বক্তব্য ঃ মুসলমানদের পক্ষ থেকে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করা হয়েছে যে, রাসূল (সঃ) এর মাধ্যমে তাদের যা কিছু ওয়াদা করা হয়েছে , তা পূরণ করার জন্য আহবান জানানো হয়েছে। প্রতিউত্তরে মহান আল্লাহও বলেছেন, আমার জন্য যারা হিজরত করেছে, বাড়িঘর থেকে বিতাড়িত হয়েছে, কষ্ট করেছে এবং আমার পথে লড়াই করতে করতে নিহত হয়েছে, তাদের সকলকেই নারী হোক আর পুরুষ হোক আমি আমার পক্ষ থেকে কৃত জান্নাতের ওয়াদা অবশ্যই পূরণ করা হবে। নবী (সঃ) কে কাফিরদের চালচলনে ধোঁকায় পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। এটা তাদের কয়েক দিনের জন্য আনন্দ-ফুর্তি মাত্র। তাদের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ।

যারা আল্লাহকে ভয় করে চলে তাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। যারা সকল কিতাবকে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহর আয়াতকে সল্প মূল্যে বিক্রয় করে না এমন কিছু আহলি কিতাবী রয়েছে, তাদের প্রতিদানের কথা বলা হয়েছে।

পরিশেষে ঈমানদারগণকে ধৈর্যের মাধ্যমে দৃঢ়তার সাথে বাতিল পন্থীদের মুকাবিলা করে হকের প্রতি টিকে থাকার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ প্রিয় ভাইয়েরা / বোনেরা ! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের খিদমতে দারস বুঝার সুবিধার্তে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কতিপয় বিষয় তুলে ধরা হলো। এখন তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা আপনাদের সামনে পেশ করছি। মহান আল্লাহ বলেন –

رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ٥

হে আমাদের পরওয়ারদিগার ! তোমার রাসূলের মাধ্যমে আমাদের সাথে যেসব ওয়াদা তুমি করেছো সেগুলো পূর্ণ করো, আর কিয়ামতের দিন তুমি আমাদের অপমানিত করো না। নিশ্চয় তুমি ওয়াদা খিলাপ করো না।

অর্থাৎ আল্লাহ তা'লা নিজের দেয়া অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করবেন কিনা এ ব্যাপারে মু'মিনদের কোন সন্দেহ নেই। তবে সেই অঙ্গীকার তাদের উপর কার্যকর হবে কিনা, এ ব্যাপারে তাদের সন্দেহ রয়েছে। তাই তারা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে বলছে যে, এসব অঙ্গীকার তাদের ব্যাপারেও কার্যকর করা হোক। দুনিয়াতে তারা নবীর উপর ঈমান আনার কারণে কাফিরদের দ্বারা ঠাট্টা-বিদ্রুপের শিকার হয়েছে, আবার কিয়ামতের দিনও যেন তাদেরকে কাফিরদের সামনে অপমান ও লাচ্ছনা পোহাতে না হয়। কাফিরেরা যেন সেদিন তাদের উপর এভাবে বিদ্রুপ না করে যে, ঈমান এনেও তাদের কিছু লাভ হলো না। এ ধরণের পরিস্থিতির স্বীকার যেন না হয়, মু'মিনরা এই আশায় করে।

অতএব হে আমাদের পরওয়ারদিগার, নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে জান্নাতের নি'য়ামত সমূহের যে ওয়াদা তুমি করেছো তা আমাদেরকে দান করো, তুমি তো ওয়াদা ভঙ্গ করো না।

মু'মিনদের এরূপ ফরিয়াদের জবাবে মহান আল্লাহ্ তা'লা বলেন–

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّىْ لاَاُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ج بَعْضُكُمْ مِّنْ م بَعْضٍ ج فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِىْ سَبِيْلِىْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ج ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ O

জবাবে তাদের পরওয়ারদিগার বললেন, আমি তোমাদের কারো পরিশ্রমই নষ্ট করি না, তাতে সে হোক পুরুষ কিংবা হোক নারী। তোমরা সবাই একই জাতিভুক্ত। কাজেই যারা আমার জন্য হিজরত করেছে এবং আমার পথে যাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দেয়া হয়েছে ও কষ্ট দেয়া হয়েছে এবং যারা আমার জন্য লড়াই করেছে ও নিহত হয়েছে, তাদের সমস্ত গুনাহ্ আমি ক্ষমা করে দিবো এবং তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবো যার নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহীত। এসব হলো আল্লাহ্র নিকট তাদের প্রতিদান। আর আল্লাহ্র কাছেই রয়েছে সবচেয়ে উত্তম প্রতিদান।

আয়াতের শানে নূযুল ঃ হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) একবার রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে জিজ্ঞেস করেন, আল কুরআনের কোথাও কোন জায়গায় আল্লাহ তা'লা নারীদের হিজরতের কথা বলেননি, এর কারণ কি ? তখন মহান আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াতটি নাযিল করেন।

আনসারগণ বলেন যে, সর্বপ্রথম যে স্ত্রীলোকটি হাওদায় চড়ে মক্কা থেকে মদীনায় আমাদের নিকট হিজরত করে এসেছিলেন তিনি ছিলেন উম্মে সালমা (রাঃ)। (ইবনে কাসীর)

আয়াতটির ভাবার্থ এই যে, জ্ঞানীগুণী ও ঈমানদারগণ যখন পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে উল্লেখিত প্রার্থনা মহান আল্লাহর নিকট পেশ করলেন তখন আল্লাহ্ তা'লাও তাদের প্রার্থনার জবাব দান করেন। এইজন্য আয়াতটি ف অক্ষর দ্বারা আরম্ভ করা হয়েছে। যেমন অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ্ তা'লা বলেন–

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ

"(হে নবী!) আমার বান্দারা যখন আমার বিষয়ে আপনাকে জিজ্ঞেস করে, তখন (তাদেরকে বলে দিন) আমি নিকটেই আছি, যখন কোন আহ্বানকারী আমাকে আহ্বান করে, তখন অবশ্যই আমি তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে থাকি; সুতরাং তাদেরও উচিত যে, তারাও যেন আমার আহ্বানে সাড়া দেয় এবং আমাকে বিশ্বাস করে, তাহলে তাতে বিস্ময়ের কিছুই নেই যে, তারা সুপথ লাভ করবে।" (সূরা বাকারা–১৮৬)

অতএব মহান আল্লাহ তা'লা নারীদের প্রার্থনা কবুল করে আয়াতে উত্তর দিচ্ছেন যে, আমি কোন কর্মীর পরিশ্রমই নষ্ট করি না, বরং তার কর্মের পূর্ণ প্রতিদান দিয়ে থাকি। তাতে সে পুরুষই হোক বা হোক সে নারী। নেকী ও প্রতিদানের ব্যাপারে আমার নিকট সবাই সমান। সুতরাং যারা অংশীবাদের স্থান ত্যাগ করে ঈমানের স্থানে আগমন করে। কাফিরদের দেশ হতে হিজরত করে। আল্লাহর জন্য নিজের ভাই, বন্ধু, প্রতিবেশী এবং আত্মীয়-স্বজনকে ত্যাগ করে। মুশরিকদের দ্বারা নিপিড়ণের কষ্ট সহ্য করতে করতে অতিষ্ঠ হয়ে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয় এবং নিজের জন্মভূমি ত্যাগ করতেও যারা দ্বিধাবোধ করে না ; অথচ তারা মানুষের কোন ক্ষতি করেনি, তাদের অপরাধ একটাই সেটা হলো তারা আমার পথের পথিক। তারা আমার পথে চলার কারণেই তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের শাস্তি দেয়া হচ্ছে। যেমন মহান আল্লাহ অন্য আয়াতে উল্লেখ করে বলেছেন – يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللهِ رَبِّكُمْ

"তারা রাসূল (সঃ) কে এবং তোমাদেরকেও এই কারণেই দেশ থেকে বের করে দিয়েছে যে, তোমরা তোমাদের পরওয়ারদিগার আল্লাহর উপর ঈমান এনেছো।" (সূরা মুম্‌তাহিনা -১)

অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ তা'লা বলেন–

وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلاَّ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ

"তারা তাদের সাথে শত্রুতা শুধু এই কারণেই করেছে যে, তারা ক্ষমতাধর ও প্রশংসিত আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে।" (সূরা বুরূয–৮)

অতঃপর তারা وَقَٰتَلُوا۟ وَقُتِلُوا۟ "তারা লড়াই সংগ্রাম করেছে এবং শহীদ ও হয়েছে।"

সহীহ বুখারী এবং সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে, জনৈক এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে প্রশ্ন করেন, যদি আমি ধৈর্যের সাথে সৎ নিয়াতে আল্লাহর পথে জিহাদ করি, তাহলে কি আল্লাহ আমাকে মাফ করবেন ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, 'হ্যাঁ'। দ্বিতীয়বার তিনি লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি যেন কি বলছিলে ? লোকটি পুনরায় সেই কথাই জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন 'হ্যাঁ'। তবে ঋণ থাকলে তা ক্ষমা করা হবে না। এ কথাটি আমাকে জিবরীল আমীন এখনই বলে গেলেন।

তাই আল্লাহ তা'লা বলেন– لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ আমি উপরোক্ত গুণ-বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন লোকদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দিবো এবং তাদেরকে এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করাবো যার নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হচ্ছে। সেই ঝর্ণাধারাগুলো কোনোটি দুধের, কোনোটি মধুর, কোনোটি সুরা'র এবং কোনোটি স্বচ্ছ পানির। এছাড়া সেখানে সেসব নি'য়ামতও এমন রয়েছে যা কোন কান কোনদিন শুনেনি, কোন চোখ কখনো দেখেনি এবং কোন অন্তরও কোনদিন কল্পনাও করেনি। এসবই হচ্ছে আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে প্রতিদান।

স্পষ্ট কথা হলো এই যে, যিনি সকল সম্রাটের সম্রাট তাঁর কাছ থেকে যে প্রতিদান পাওয়া যাবে তা কতই না উত্তম ও অমূল্য, তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। যেমন কোন কবি বলেন –"তিনি যদি শাস্তি দেন তবে সেই শাস্তিও হবে ধ্বংস ও বিনাশকারী, আর যদি তিনি পুরস্কার দেন তবে সেটাও হবে বে-হিসাব ও ধারণার বাইরে।" কেননা, তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন, তিনি কারও ধার ধারেন না। সৎ কর্মশীলদের উত্তম বিনিময় আল্লাহর নিকটই রয়েছে।

হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তা'লার ফয়সালার উপর তোমরা চিন্তিত ও অধৈর্য হয়ে যেয়ো না। জেনে রেখো, মু'মিনের উপর কখনো যুলুম করা হয় না। তোমাদের যদি আনন্দ ও শান্তি লাভ হয় তাহলে আল্লাহ তা'লার প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায় করো। আর যদি তোমাদেরকে কষ্ট ও বিপদ-মুসিবত স্পর্শ করে, তবে তোমরা ধৈর্য ধারণ

করো ও তাঁরই নিকট আশ্রয় চাও এবং নেকী ও প্রতিদানের প্রত্যাশা করো। আর আল্লাহ তা'লার নিকটই উত্তম ও পবিত্র প্রতিদান রয়েছে।

(ইবনে কাসীর)

প্রিয় ভাইয়েরা /বোনেরা ! পরবর্তী আয়াত দু'টিতে মহান অল্লাহ্ তা'লা তাঁর নবীকে উদ্দেশ্য করে বলেন – لَايَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِى الْبِلَادِ ○ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ثُمَّ مَاوٰهُمْ جَهَنَّمُ ط وَبِئْسَ الْمِهَادُ

হে নবী ! দুনিয়ায় বিভিন্ন দেশে আল্লাহর নাফরমান লোকদের চলাফেরা যেন আপনাকে ধোঁকায় ফেলে না দেয়। এটা নিছক কয়েক দিনের আনন্দ-ফুর্তি মাত্র। এরপর তারা সবাই জাহান্নামে চলে যাবে, যা অত্যন্ত নিকৃষ্ট জায়গা।

এখানে মহান আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নবীকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, হে নবী (সঃ) ! আপনি কাফিরদের মাতলামী, আনন্দ-ফুর্তি, সুখ-শান্তি, জাঁকজমক ও ঠাঁটবাটের দিকে নজর দিবেন না। কেননা, অতিসত্তর এসব কিছু বিলীন হয়ে যাবে। আর বাকী থাকবে কেবল তাদের দুস্কর্মের শাস্তি। তাদের এসব সুখের সামগ্রী আখিরাতের তুলনায় অতি নগণ্য। এসব বিষয়েরই অনেক আয়াত পবিত্র আল কুরআনের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে।

যেমন এক জায়গায় মহান আল্লাহ্ বলেন – مَا يُجَادِلُ فِى اٰيٰتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِى الْبِلَادِ

"আল্লাহ্ তা'লার আয়াতসমূহের বিষয়ে কেবলমাত্র কাফিররাই ঝগড়া করে থাকে, সুতরাং তাদের নগরে ফিরে আসাই যেন আপনাকে প্রতারিত না করে।" (সূরা মু'মিন - ৪)

অন্য এক আয়াতে রয়েছে –"নিশ্চয় যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়, তারা পরিত্রাণ পায় না ; তারা দুনিয়ায় কিছু দিন লাভবান হবে, কিন্তু আখিরাতে তো তাদেরকে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে, তখন আমি তাদেরকে তাদের কুফরীর প্রতিশোধ হিসেবে কঠিন শাস্তি প্রদান করবো।" অন্য এক স্থানে রয়েছে –"আমি তাদেরকে অল্প কিছুদিন উপকার পৌঁছাবো, তারপর তাদেরকে পুরু শাস্তির দিকে আকৃষ্ট করবো।"

আর এক জায়গায় রয়েছে –"আমি কাফিরদেরকে কিছু সময়ের জন্য সুযোগ দিয়ে থাকি।"

অন্য এক জায়গায় রয়েছে –"যে লোক আমার উত্তম ওয়াদা পেয়ে গেছে, আর যে ব্যক্তি দুনিয়ায় আরাম ভোগ করছে, কিন্তু কিয়ামতের দিন শাস্তির মুখোমুখি হবে তারা কি সমান হতে পারে ?"

এভাবে অসংখ জায়গায় মহান আল্লাহ তা'লা কাফিরদের দুনিয়া এবং আখিরাতে কুফরীর প্রতিদানের কথা ব্যক্ত করেছেন।

অতঃপর মহান আল্লাহ তা'লা মু'মিনদের কৃতকর্মের প্রতিদানের কথা উল্লেখ করে পরবর্তী আয়াতে বলেন–

لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِاللّٰهِ وَمَا عِنْدَاللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ

পক্ষান্তরে যারা তাদের নিজেদের রবকে ভয় করে জীবন-যাপন করে তাদের জন্য রয়েছে এমন জান্নাত, যার নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহীত। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। এ হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য মেহমানদারীর সামগ্রী। আর যা কিছু আল্লাহর কাছে আছে, নেককার লোকদের জন্য তাই উত্তম।

উপরের আয়াতে কাফিরদের দুনিয়া এবং আখিরাতে প্রতিদানের কথা উল্লেখ করার পর এই আয়াতে মু'মিন লোকদের তাদের কর্মের প্রতিদানের কথা ব্যক্ত করে বলছেন, যেসব মু'মিন দুনিয়াতে আল্লাহকে ভয় করে নিজের জীবন-যাপন করে, এসব নেক লোকদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে মেহমানদারী হিসেবে তাদের দেয়া হবে বিভিন্ন পানিয় এবং প্রবাহমান ঝর্ণাধারা বেষ্টিত জান্নাত।

তাফসীরে ইবনে মিরদুওয়াই রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, তাদেরকে নেককার বলার কারণ এই যে, তারা তাদের বাপ-মা ও সন্তান-সন্ততির সাথে ভাল ব্যবহার করে থাকে। যেমন তোমার উপর তোমার বাপ-মায়ের হক রয়েছে তেমনি তোমার উপর তোমার সন্তান-সন্ততিরও হক হয়েছে।
(হাদীসটি হযরত ইবনে উমর (রাঃ) হতে মাওকুফ সূত্রে বর্ণিত)

হযরত হাসান বসরী (রাহঃ) বলেন, "নেককার ঐ ব্যক্তি যে কাউকেও কষ্ট দেয় না"।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যেই

মৃত্যু উত্তম। সে ব্যক্তি ভালই হোক অথবা মন্দই হোক। যদি সে সৎ হয় তবে তার জন্য আল্লাহর নিকট যা কিছু রয়েছে তা খুবই উত্তম। আর যদি সে অসৎ হয়, তবে আল্লাহর শাস্তি ও তার পাপসমূহ যা তার দুনিয়ার জীবনে বৃদ্ধি পাচ্ছিল সেই বৃদ্ধি এখান থেকেই শেষ হয়ে যাবে।

প্রথমটির দলীল হচ্ছে আয়াতের শেষাংশ- مَاعِنْدَ اللهِ خَيْرٌلِّلْاَ بْرَارِ
"আল্লাহ তা'লার কাছে যা কিছু রয়েছে তা নেককার লোকদের জন্য উত্তম।"

দ্বিতীয়টির দলীল হচ্ছে - وَلَايَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ اِنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ لِيَزْ دَادُوْٓا اِثْمًا ج وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ
"কাফিররা যেন ধারণা না করে যে, আমি তাদেরকে যে সুযোগ দিচ্ছি তা তাদের পাপ বৃদ্ধি হয় এবং তাদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।"
(আলে ঈমরান -১৭৮)

হযরত আবু দারদা (রাঃ) হতেও এটাই বর্ণিত হয়েছে।

অতঃপর পরবর্তী আয়াতে মহান আল্লাহ তা'লা ঈমানদার আহলি কিতাবদের উল্লেখ করে বলেন - وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللهِ وَمَآاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِنَّ اللهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ

আর আহলি কিতাবদের মধ্যেও এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা আল্লাহর উপর ঈমান আনে এবং এর পূর্বে তাদের নিজের উপর যে কিতাব পাঠানো হয়েছিলো তার প্রতিও ঈমান রাখে, যারা আল্লাহর সামনে অবনত থাকে এবং আল্লাহর আয়াতকে সামান্য মূল্যে বিক্রয় করে না, তাদের প্রতিদান রয়েছে তাদের পরওয়ারদিগারের কাছে। আর তিনি হিসাব চুকিয়ে দেয়ার ব্যাপারে দেরী করেন না।

এই আয়াতে মহান আল্লাহ তা'লা আহলি কিতাব অর্থাৎ ইহুদী নাসারাদের ঐসব লোকদের প্রশংসা করছেন, যারা পুরোপুরি ঈমান এনেছিলো। তারা আল কুরআনেও বিশ্বাস করে এবং নিজেদের কিতাবের প্রতিও বিশ্বাস রাখে। তাঁর আদেশ পালনে সদাসর্বদা লিপ্ত থাকে। পরওয়ারদিগারের সামনে তারা বিনয় প্রকাশ করে কান্নাকাটি করে থাকে। তাদের কিতাবে

শেষ নবী (সঃ) সম্পর্কে যেসব বর্ণনা রয়েছে তা তারা গোপন রাখে না, বরং তারা তা প্রকাশ করে সকলকেই মেনে নিতে উৎসাহ প্রদান করে। এসব লোকই আল্লাহ তা'লার নিকট নেকী লাভ করবে, তাতে তারা ইহুদীই হোক বা খ্রীষ্টানই হোক। যেমন অন্য জায়গায় এ বিষয়টি এভাবে বর্ণিত হয়েছে - اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ۝ وَاِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِهٖٓ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَآ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا وَيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

"যাদেরকে আমি এর আগেও কিতাব দান করেছিলাম তারা তার প্রতিও ঈমান আনে এবং এই কিতাব (আল কুরআনে) যখন তাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন তারা স্পষ্টভাবে বলে, আমরা এর উপর ঈমান এনেছি। এটা আমাদের পরওয়ারদিগারের নিকট হতে সত্য কিতাব। আমরা তো প্রথম থেকেই এটা মান্য করতাম। তাদেরকে তাদের ধৈর্যের দ্বিগুণ প্রতিদান দেয়া হবে। তারা মন্দের জবাব ভাল দ্বারা প্রদান করে এবং তাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।" (সূরা কাসাস -৫২-৫৪)

অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে -"যাদেরকে আমি কিতাব প্রদান করেছি এবং যারা ওটা ঠিকঠাক ভাবে পাঠ করে।"

অন্য আর এক জায়গায় এভাবে বলা হয়েছে - "যাদেরকে আমি কিতাব প্রদান করেছি এবং যারা ওটা ঠিকঠাকভাবে পাঠ করে, তারা তো তাৎক্ষণিক এই কুরআনের উপরও ঈমান এনে থাকে।"

আর এক জায়গায় এভাবে বলা হয়েছে -

وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰٓى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ

"হযরত মূসা (আঃ) এর জাতির লোকদের মধ্যে একটি দল সঠিক পথ দেখাতো এবং সত্যের সঙ্গেই সুবিচার প্রতিষ্ঠাকারী ছিলো।"(আ'রাফ -১৫৯)

অন্য এক জায়গায় এভাবে বলা হয়েছে - (হে নবী সঃ আপনি বলুন,) "হে লোকসকল ! তোমরা ঈমান আনো আর নাই আনো, আগে থেকেই যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, যখন তাদের নিকট আল কুরআনের

আয়াত পাঠ করা হয়, তখন তারা মুখের ভরে সিজদায় পড়ে যায় এবং বলে, আমাদের পরওয়ারদিগার পবিত্র, নিশ্চয়ই তাঁর ওয়াদা সত্য হয়েই থাকবে। এরা কাঁদতে কাঁদতে মুখের ভরে পড়ে যায় এবং তাদের বিনয়তা বৃদ্ধি পায়।”

ইহুদীদের মধ্যে এমন গুণের লোক পাওয়া যায়, যদিও তাদের সংখ্যা ছিলো খুবই কম। যেমন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালমা (রাঃ) এবং তাঁর মতো আরও কয়েকজন ঈমানদার ইহুদী আলেম ছিলেন, কিন্তু যাদের সংখ্যা দশ জনের বেশী হবে না।

আর খ্রীষ্টানদের অধিকাংশই সুপথে এসে গিয়েছিলো এবং সঠিক পথের অনুগত হয়েছিলো। যেমন বলা হয়েছে –“তুমি অবশ্যই ইহুদী ও মুশরিকদেরকে মু'মিনদের প্রতি ভীষণভাবে শত্রুতা পোষণকারী পাবে এবং তাদের প্রতি ভালবাসা প্রদানকারী পাবে ঐসব লোকদেরকে যারা বলে, আমরা খ্রীষ্টান। এখান থেকে তারা যা বলছে তার বিনিময়ে আল্লাহ তাদেরকে এমন জান্নাত দান করবেন যার নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহীত হবে। তারা সেখানে চিরদিন অবস্থান করবে।”

হাদীস শরীফেও বলা হয়েছে যে, যখন হযরত জাফর ইবনে আবি তালিব (রাঃ) নাজ্জাসীর দরবারে বাদশাহ ও তাঁর মন্ত্রীবর্গের সামনে সূরা মারইয়াম পাঠ করেন তখন তাঁর কান্না এসে যায়, ফলে বাদশাহ সহ উপস্থিত সকলেই কেঁদে ফেলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে তাদের সকলের দাড়ী ভিজে যায়।

সহীহ বুখারী এবং মুসলিম শরীফে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সাহাবাগণকে নাজ্জাসীর মৃত্যুর সংবাদ প্রদান করে বলেন, তোমাদের ভাই নাজ্জাসী আবি সিনিয়ায় (বর্তমান নাম ইথিওপিয়া) মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর জানাযার নামায আদায় করো। অতঃপর তিনি মাঠে গিয়ে সাহাবীগণকে কাতার বন্দী করে তাঁর (গায়েবানা) জানাযার নামায আদায় করেন।

অতঃপর আয়াতের পরবর্তী অংশে বলা হয়েছে –

لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا “আর আল্লাহর আয়াতসমূহ সল্প মূল্যে বিক্রয় করে না।” অর্থাৎ তাদের কাছে যে ধর্মীয় শিক্ষা বিদ্যমান রয়েছে তা তারা গোপন করে না, যেমন তাদের মধ্যেকার এক ইতর শ্রেণীর লোকের

ঐ অভ্যাস ছিলো। বরং ঐ লোকেরা তো ঐ শিক্ষাকে বেশী বেশী করে প্রচার করতো।

তারপর তাদের প্রতিদান সম্পর্কে বলা হয়েছে –

أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ "ঐসব লোকদের প্রতিদান তাদের পরওয়াদিগারের নিকট রয়েছে।"

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা ঐ আহলি কিতাবদের বুঝানো হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর পূর্বে ছিলো। তারা ইসলামকে বুঝতো এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর আনুগত্য করারও সৌভাগ্য লাভ করেছিলো। কাজেই প্রতিদানও তাদের দ্বিগুণ দেয়া হবে। এক প্রতিদান হচ্ছে রাসূলের পূর্বেকার ঈমানের জন্যে এবং দ্বিতীয় প্রতিদান হচ্ছে তার প্রতি ঈমান আনার জন্যে। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবু মুসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, "রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তিন শ্রেণীর লোক দ্বিগুণ প্রতিদান পাবে। তাদের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক আহলি কিতাবের, ঐ ব্যক্তি যে নিজের উপর ঈমান এনেছে এবং আমার উপরও ঈমান এনেছে।"(ইবনে কাসীর)

অতঃপর আয়াতের সর্বশেষে বলা হয়েছে – إِنَّ اللهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ "নিশ্চয় আল্লাহ তা'লা সত্বর হিসাব গ্রহণকারী।" অর্থাৎ সত্বর একত্রিতকারী, পরিবেষ্টনকারী এবং গণনাকারী। তিনি অতিসত্বর হিসাব চুকিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করবেন, এ ব্যাপারে আল্লাহ মোটেই দেরী করেন না।

অতঃপর সর্বশেষ আয়াতে মহান আল্লাহ তা'লা মু'মিনদেরকে কতিপয় বিষয় আ'মল করার নসিহত করে বলেন –

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

হে ঈমানদারগণ ! তোমরা ধৈর্যধারণ করো এবং বাতিল পন্থিদের মুকাবিলায় দৃঢ়তা দেখাও। হকের খিদমত করার জন্য উঠেপড়ে লেগে যাও এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। আশা করা যায় যে, তোমরা সফলকাম হবে।

প্রিয় ভাইয়েরা / বোনেরা ! সূরার এই সর্বশেষ আয়াতে মু'মিনদেরকে চারটি কাজের উপদেশ দেয়া হয়েছে। যেমন- ১. সবর, ২. মুসাবারাহ, ৩. মুরাবাতাহ্ এবং ৪. তাকওয়া।

১. সবর ঃ সবর এর শাব্দিক অর্থ বিরত রাখা ও বাধা দেয়া। আর কুরআন ও সুন্নাহর পরিভাষায় صبر এর অর্থ নফসকে তার প্রকৃতি বিরোধী বিষয়ের উপর দমিয়ে রাখা। এর আবার তিনটি প্রকার রয়েছে।

(এক) 'সবরে আলাওআত' ঃ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রাসূল যেসব কাজের নির্দেশ দিয়েছেন, সেগুলো পালন করতে যেয়ে মনের উপর যতো কঠিনই হোক না কেন তাতে মনকে স্থির রাখা।

(দুই) সবরে আনিল মা'আসী ঃ অর্থাৎ যেসব বিষয়ে মহান আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রাসূল (সঃ) নিষেধ করেছেন, সেসব জিনিস মনের জন্যে যতই আকর্ষণীয় হোক না কেন অথবা যতো স্বাদেরই হোক না কেন, তা থেকে মনকে বিরত রাখা।

(তিন) 'সবরে আলাল মা'সায়েব ঃ অর্থাৎ বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্টের সময় সবর করা, ধৈর্য ধারণ করা, অধৈর্য না হওয়া। দুঃখ-কষ্ট ও সুখ-শান্তিকে আল্লাহরই পক্ষ থেকে আগত মনে করে মন-মগজকে অধৈর্য করে না তোলা।

এক কথায় সবর হলো, সকল প্রকার বিপদ-আপদে বা পার্থিব কোন বালা-মুসিবতে কিংবা কোন অন্যায়-অত্যাচারে, দুঃখে-কষ্টে, রোগে-শোকে, ক্ষধায়-তৃষ্ণায়, ইবাদতে, যুদ্ধ-জিহাদে বিচলিত না হয়ে এবং মেজাজের ভারসাম্য না হারিয়ে-পক্ষান্তরে আনন্দে ও সুখে-শান্তিতে আত্মভোলা না হয়ে মহান আল্লাহর উপর নির্ভর করে, সব কিছুকে সহজ করে অটল-অবিচল থাকাকেই সবর বা ধৈর্য বলা হয়। যে ব্যক্তি এ মহা গুণে গুণান্বিত তাকে 'সাবের' বা ধৈর্যশীল বলা হয়।

২. মুসাবারাহ্ ঃ এই শব্দটিও 'সবর' থেকেই গৃহীত হয়েছে। এর অর্থ শত্রুর মুকাবিলা করতে যেয়ে দৃঢ়তা দেখানো। কুরআনের মূল শব্দ صَابِرُوْا এর অর্থ দু'টি। একটি হলো, কাফিররা কুফরীর ব্যাপারে যে দৃঢ়তা ও অবিচলতা দেখাচ্ছে এবং কুফরীর ঝান্ডা সমুন্নত রাখার জন্য যে ধরনের কষ্ট স্বীকার করছে তোমরা তাদের মুকাবিলায় তোমরা; দৃঢ়তা, অবিচলতা ও মজবুতী দেখাও। দ্বিতীয়টি হলো;তাদের মুকাবেলায় তোমরা দৃঢ়তা, অবিচলতা ও মজবুতী দেখাবার ব্যাপারে পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা করো।

৩. মুরাবাতা ঃ মুরাবাতা এর অর্থ হলো ঘোড়াকে বাঁধা এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। এ অর্থেই কুরআনে বলা হয়েছে وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ

কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় رِبَاط (রিবাত) শব্দটি দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

(এক) সীমান্ত পাহারা দেয়া। অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তের হিফাজতে এমনভাবে সুসজ্জিত হয়ে থাকা, যাতে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তের প্রতি শত্রুরা রক্তচক্ষু তুলে তাকাতেও সাহস না পায়।

(দুই) নামাযকে পাহারা দেয়া। অর্থাৎ জামায়াতে নামাযের নিয়ম-কানুন এমনভাবে মেনে চলা যে, এক নামায শেষ হলে পরবর্তী নামাযের জন্য অপেক্ষমান থাকা।

এ দু'টি বিষয়ই ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত গ্রহণীয় ইবাদাত। এর মাহাত্ম ও মর্যাদা অসংখ্য-অগণিত। নিম্নে এর কয়েকটি মর্যাদা উল্লেখ করা হলো।

ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত হিফাজত করার লক্ষ্যে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষামান থাকাকেই 'রিবাত' বা 'মুরাবাতাহ' বলা হয়। এর দু'টি রূপ হতে পারে। যেমন–

প্রথমত ঃ যুদ্ধের কোন সম্ভাবনা নেই, সীমান্ত সম্পূর্ণ শান্ত। এমন অবস্থায় শুধুমাত্র অগ্রীম হিফাজত বা সংরক্ষণের জন্য তার দেখাশোনা করতে থাকা। এক্ষেত্রে পরিবার-পরিজনসহ সীমান্তে বসবাস করতে থাকা কিংবা চাষ-বাস করে রুযী-রোজগার করাও বৈধ। এমতবস্থায় যদি সীমান্ত রক্ষা করাই নিয়ত থাকে এবং সেখানে থাকা অবস্থায় যদি রুযি কামাই করা তারই আনুসঙ্গিক বিষয় হয়ে থাকে, তবে এমন ব্যক্তিরও 'রিবাত ফী সাবিলিল্লাহ'র সওয়াব হতে থাকবে। তাকে যদি কখনো যুদ্ধ করতে না হয়, তবুও। কিন্তু প্রকৃত নিয়ত যদি সীমান্তের হিফাজত না হয়, বরং রুযী কামাই হয় মূল লক্ষ্য, তা হলে দৃশ্যত ঃ সীমান্ত রক্ষার কাজ করে থাকলেও এমন ব্যক্তি 'মুরাবিত ফী সাবিলিল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহ ওয়াস্তে সীমান্ত রক্ষাকারী হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না।

দ্বিতীয়ত ঃ সীমান্তে যদি শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা থাকে, তাহলে এমন অবস্থায় পরিবারের নারী-শিশুদের সেখানে রাখা বৈধ নয়। তখন সেখানে কেবলমাত্র তারাই থাকবে, যারা শত্রুর মুকাবিলা করতে পারে। (কুরতুবী)

সীমান্ত রক্ষার মর্যাদা ঃ এই দুই অবস্থাতেই 'রিবাত' বা সীমান্ত রক্ষার অসংখ্য ফযীলত বা মর্যাদা রয়েছে। যেমন–

হযরত সাহল ইবনে সা'দ সায়েদী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "আল্লাহর পথে এক দিনের 'রিবাত' বা সীমান্ত পাহারা দেয়া সমস্ত দুনিয়া এবং এর মাঝে যা কিছু রয়েছে সেসব কিছু থেকেও উত্তম। (সহীহ বুখারী)

অন্য এক হাদীসে হযরত সালমান হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, একদিন ও এক রাতের 'রিবাত' বা সীমান্ত পাহারা দেয়া পর্যায়ক্রমে এক মাসের রোযা এবং সারা রাত ইবাদাতে কাটিয়ে দেয়া থেকেও উত্তম। যদি এমতাবস্থায় কেউ মারা যায়, তাহলে তার সীমান্ত পাহারা দেয়ার ধারাবাহিক সওয়াব সর্বদা চলমান থাকবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে তার রিযিক চালু থাকবে এবং সে শয়তান থেকে নিরাপদে থাকবে। (সহীহ মুসলিম)

অপর এক হাদীসে হযরত ফুযালাহ্ ইবনে ওবায়েদ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, প্রত্যেক মৃত্যু ব্যক্তির আ'মল তার মৃত্যুর সাথে সাথে শেষ হয়ে যায়-শুধুমাত্র 'মুরাবিত' বা ইসলামী সীমান্ত রক্ষী ছাড়া। অর্থাৎ তার আ'মল কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। আর সে কবরে হিসাব-নিকাশ গ্রহণকারী থেকে নিরাপদ থাকবে। (আবু দাউদ)

এসব বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, 'রিবাত' বা সীমান্ত রক্ষার কাজটি সমস্ত সাদকায়ে জারিয়ার চেয়েও উত্তম। কারণ, সাদকায়ে জারিয়ার সওয়াব ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত তার সাদকাহ দ্বারা মানুষ উপকৃত হতে থাকে। যখন তার উপকারীতা বন্ধ হয়ে যায়, তখন তার সওয়াবও বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহর রাস্তায় সীমান্ত পাহারার সওয়াব কিয়ামত পর্যন্ত বন্ধ হবে না। কারণ, সমস্ত মুসলমানদের সৎকাজে নিয়োজিত থাকা তখনই সম্ভব, যখন তারা শত্রুর আক্রমন থেকে নিরাপদে থাকে। ফলে একজন সীমান্ত রক্ষীর এ কাজ সমস্ত মুসলমানের সৎ কাজের কারণ হয়ে যায়। সে কারণেই কিয়ামত পর্যন্ত তার সীমান্ত পাহারা দেয়ার সওয়াব অব্যাহত থাকবে। তাছাড়াও সে যতো নেক কাজ দুনিয়ায় করতো, সেগুলোর সওয়াবও আ'মল করা ছাড়াই সর্বদা চলমান থাকবে।

৪. তাকওয়া ঃ মু'মিনদেরকে চতুর্থ যে গুণের নসিহত মহান আল্লাহ করছেন, তা হলো তাক্ওয়া বা আল্লাহ ভীতি। তাক্ওয়ার আভিধানিক অর্থ হলো-ভয় করা, বিরত থাকা, রক্ষা করা, সাবধান হওয়া, আত্মশুদ্ধি, কোন অনিষ্ট থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা, বেছে বেছে চলা ইত্যাদি। সাধারণভাবে অন্তরে আল্লাহর ভয়কে তাক্ওয়া বলা হয়। তাক্ওয়া মু'মিনদের মৌলিক এমন একটি গুণ যার কারণে উপরের তিনটি গুণই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এখানে মহান আল্লাহ মু'মিনদেরকে নির্দেশ দিচ্ছে যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। আর এ ভয় সর্বাবস্থায়, সব সময়, সব কাজে থাকতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত মুআ'য ইবনে জাবাল (রাঃ) কে যখন ইয়ামিনে গভর্ণর করে পাঠালেন, তখন তিনি তাঁকে বললেন, হে মুআ'য ! যেখানেই থাকো না কেন অন্তরে আল্লাহর ভয় রাখবে। যদি তোমার দ্বারা কোন পাপ কাজ হয়ে যায়, তাহলে তৎক্ষণাত কোন নেকীর কাজও করবে, যেন সেই পাপ মোচন হয়ে যায়। আর জনগণের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে।

(ইবনে কাসীর)

অতঃপর আয়াতের শেষাংশে মহান আল্লাহ তা'লা বলেন-

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ "আশা করা যায় যে, তোমরা সফলকাম হবে।" অর্থাৎ যারা এই চারটি কাজ যথা - 'সবর' বা ধৈর্য অবলম্বন, 'মুসাবারাহ' বা বাতিলের মোকাবিলায় দৃঢ়তা প্রদর্শণ, 'রিবাত' বা ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারা দেয়া এবং 'তাকওয়া' বা অন্তরে আল্লাহর ভয় রেখে কাজ করবে, আশা করা যায়, তোমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তোমরা মুক্তি পেয়ে যাবে।

হযরত মুহাম্মদ ইবনে কারাযী (রহঃ) বলেনঃ এর ভাবার্থ হচ্ছে তোমরা আমার খেয়াল রাখবে, আমার ভয়ে কাঁপতে থাকবে, আমার ও তোমাদের কাজের ব্যাপারে সংযমী হবে, আর যখন আমার উপর ভরসা করবে তখন তোমরা মুক্তি পাবে ও সফলকাম হবে। (ইবনে কাসীর)

শিক্ষা ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা আলে ঈমরানের শেষ রুকুর অর্থাৎ ১৯৪ থেকে ২০০ নম্বর আয়াত পর্যন্ত বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেশ করা হলো, এখন আমি আপনাদের খিদমতে এর শিক্ষণীয় বিষয়গুলো তুলে ধরছি ঃ

■ একজন মু'মিনের আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ হবে জান্নাত লাভেরই ফরিয়াদ। আর মু'মিনের এটাও বিশ্বাস রাখতে হবে যে, একজন ঈমানদারদের আ'মলের প্রতিদান হিসেবে নবী-রাসূলদের মাধ্যমে আল্লাহ যে জান্নাত দেয়ার অঙ্গিকার করেছেন, তিনি তা অবশ্যই পূরণ করবেন। কেননা, মানুষ ওয়াদা খেলাপ করতে পারে, কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁর কৃত ওয়াদা অবশ্যই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পূরণ করবেনই।

■ আল্লাহর কাছে পুরুষ-নারী সবাই সমান, সবাই একই জাতিভুক্ত। অতএব পুরুষ-নারীদের মধ্যে যারাই আল্লাহর দ্বীনের জন্য হিজরাত করবে অর্থাৎ দেশ ত্যাগ করবে, নিজেদের ঘর বাড়ি থেকে বিতাড়িত হবে এবং আমারই জন্য দুঃখ-কস্ট ভোগ করবে, আমারই জন্য যারা জিহাদ-সংগ্রাম করবে এবং জিহাদ-সংগ্রাম করতে যেয়ে জেল-যুলুম ভোগ করবে এবং শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়ে যাবে, আমি তাদের প্রতিদান হিসেবে সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দিবো এবং এমন এক নিয়া'মতে পরিপূর্ণ জান্নাত দান করবো যার নীচ দিয়ে দুধ, মধু ও পানীয় এর ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে।

■ কাফির তথা খোদদ্রোহী লোকদের ঠাঁটবাঁট চালচলনে মু'মিন লোকেরা কোন সময়ের জন্যই ধোকায় পড়বে না অথবা প্রতারিত হবে না। বরং মু'মিনদের মধ্যে এই বুঝই থাকতে হবে যে, এটা তাদের দুনিয়ার জীবনের সাময়িক আনন্দ-ফূর্তি মাত্র। আর আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম। আর যেসব মু'মিন তাদের রব আল্লাহকে ভয় করে জীবনযাপন করবে তাদের জন্য রয়েছে তাদের পরওয়ারদিগারের মেহমানদারীর সামগ্রী হিসেবে ঝর্ণাধারা দ্বারা পরিবেষ্টিত অতি উত্তম জান্নাত।

■ আহলি কিতাব তথা ইহুদী-খৃষ্ট্রানদের মধ্যে যারা ঈমানদার অর্থাৎ যারা তাদের উপর যেসব কিতাব নাযিল হয়েছিলো তাতেও যেমন বিশ্বাস করে এবং নবী করীম (সঃ) এর উপর যে আল কুরআন নাযিল হয়েছে তাতেও বিশ্বাস করে। আর যারা আল্লাহর সামনে বিনয়ী থাকে এবং রাসূল (সঃ) এর আনুগত্য করে, এসব ঈমানদার আহলি কিতাবীদের জন্য রয়েছে আল্লাহর কাছে মহা প্রতিদান।

■ প্রতিটি মু'মিনকে সুখে-দুঃখে, আনন্দ-ফূর্তিতে, ধৈর্য ধারণ করতে হবে, বাতিল খোদাদ্রোহী শক্তির দাপটের মোকাবিলায় দৃঢ় পদ থাকতে হবে,

ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারায় নিজেকে নিয়োজিত করতে হবে। বর্তমানে আমাদের দেশ মুসলীম রাষ্ট্র কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র নয়। এই জন্যই প্রথমে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে এবং সদা-সর্বদা সকল কাজেই অন্তরে আল্লাহর ভয় নিয়ে জীবন-যাপন করতে হবে, তাহলেই প্রকৃত সফলকাম হওয়া যাবে।

আহবান ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা ! এতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনাদের সামনে সূরা আলে ঈমরানের শেষর ৭ টি আয়াতের যে দারস পেশ করলাম, এতে যদি আমার অজান্তে এবং অজ্ঞাতে কোন ভুলত্রুটি কিংবা বাড়াবাড়ি হয়ে যায় তার জন্য আমি মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর এই দারস থেকে যেসব শিক্ষণীয় বিষয় আমরা জানতে পারলাম তা যেন বাস্তব জীবনে আ'মল করতে পারি সেই তাওফীক কামনা করে আমি আমার দারস শেষ করছি।' ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন।' আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

— ঃ **সমাপ্ত** ঃ —

রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়। - আল হাদীস

লেখকের অন্যান্য বই

দারসে হাদীস-১ম খন্ড
দারসে হাদীস-২য় খন্ড
দারসে কুরআন-১ম খন্ড
দারসে কুরআন-২য় খন্ড
দারসে কুরআন-৩য় খন্ড
দারসে কুরআন-৪র্থ খন্ড
ইসলামী সংগঠন ও প্রশিক্ষণ
বিষয়ভিত্তিক নির্বাচিত হাদীস
আল কুরআনে মানব সৃষ্টি তত্ত্ব
রাসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) রূহানী নামায
বিষয়ভিত্তিক কুরআন হাদীস সংকলন
বাংলা উচ্চারণসহ ১০০ মাসনুন দোয়া
কুরআন হাদীসের আলোকে ৫দফা কর্মসূচী
ফাযায়েলে ইক্বামাতে দ্বীন বা দ্বীন প্রতিষ্ঠার (চেষ্টার) মর্যাদা

সাহাল প্রকাশনী

সাহাল প্রকাশনী